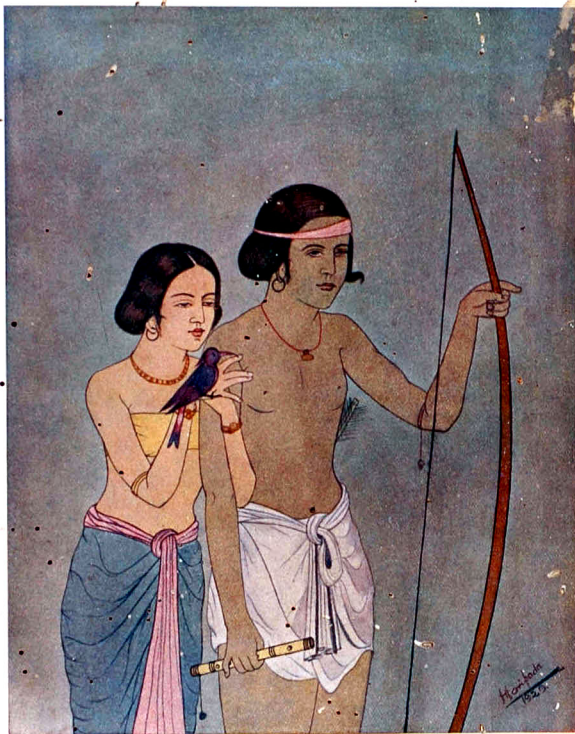


KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABFESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Roll No. KLMUGK 2005	Place of Publication ২০/৪৮, (কলকাতা, ওড়িশা)
Collection: KLMUGK	Publisher প্রকাশক
Title ৩৪৮	Size 7" x 9" 17.78 x 22.86 c.m.
Vol. & Number ৭/২-৭, ২ ৬/৮	Year of Publication: ১৯৮১, ১৯৮২ - ১৯৮৩, ১৯৮৪ ১৯৮৫, ১৯৮৬
	Condition: <input checked="" type="checkbox"/> Brittle <input checked="" type="checkbox"/> Good
Editor প্রকাশক	Remarks:

C.D. Roll No. KLMUGK

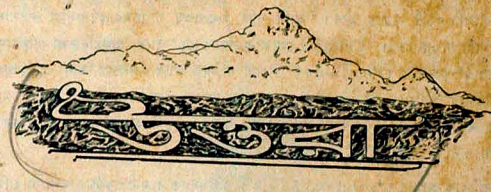
ଓଡ଼ିଆ



ମାଧୀ

ଶିଳ୍ପୀ—ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବସୁ

কলিকাতা পিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৯০/এম, ট্যামার সেন, কলিকাতা-৭০০০০৯



সপ্তম বর্ষ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯-৪০

দ্বিতীয় সংখ্যা

পত্র

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

বিনয়নমস্কার সম্ভাষণ

শরীর ভাল ছিল না, বাস্তব ছিলাম, তার উপরে তোমার প্রশ্ন অত্যন্ত কঠিন। যে চারটি শব্দ তর্জমা করতে অছরোধ করেছ সেগুলি যদি সশ্রম কারাদণ্ডে ব্যবহার করতে দিতে তাহলে তিন চার মাসের মেয়াদ ভণ্ডি হতে পারত।

Intellectual friendship শব্দের ভাষান্তরে তোমাদের প্রস্তাব “আধিমানসিক মিত্রতা-বোধ।” আপত্তি এই, মিত্রতা মানসিক হবে না তোমাদের কা হতে পারে? মানসিক শব্দের অর্থ intellectual-এর চেয়ে ব্যাপক—বস্তুত ওর ইংরেজি হচ্ছে mental। Intellect-কে বুদ্ধি বললে বোঝা সহজ হয়। বুদ্ধিগত বা বুদ্ধিমূলক বা বুদ্ধিপ্রধান মৈত্রী অথবা মৈত্রীবোধ বললে কানে খটকা লাগবে না। ওর প্রতিকূল শব্দ হচ্ছে emotional অর্থাৎ জীবপ্রধান বা হৃদয়প্রধান।

কাল্পনিক চরিত্রের মতী তত্ত্ব

Cultural self শব্দটাকে তর্জমা করা আরো দুঃসাধ্য। তোমাদের প্রাপ্তাব হচ্ছে “আধিসাংস্কৃতিক” এর ঠিক মানোটা আন্দাজ করা অসম্ভব বললেই হয়। প্রথমত culture শব্দের বাংলা একটি করতে হবে। আমি বলি মনঃপ্রকর্ষ বা চিত্তপ্রকর্ষ বললে ভাবখানার একটা ইশারা পাওয়া যায়। Cultured লোককে বলা যেতে পারে প্রকৃষ্টচিত্ত বা প্রকৃষ্টমনা। যদি বলতে হয় অঙ্গশাস্ত্রে তিনি cultured তাহলে বাংলায় বলবে অঙ্গশাস্ত্রে তিনি প্রকর্ষপ্রাপ্ত। অমুক পরিবারে culture-এর atmosphere আছে বলতে হলে বলা যেতে পারে, অমুক পরিবারে মনঃপ্রকর্ষ বা চিত্তপ্রকর্ষের আবহাওয়া আছে। কৃষ্টি কথাটা আমার কানে একটুও ভালো লাগে না। বরঞ্চ উৎকৃষ্টি বললেও কোনোমতে চলত।

যা হোক আমার মতে cultural self-কে চিত্তপ্রকর্ষগত বা মনঃপ্রকর্ষগত সত্তা বা ব্যক্তিত্ব বলা যায়।

আর ছোটো কথা দিয়েছ—Intellectual passion, Intellectual self।

সরাসরি শব্দকে আমি passion অর্থে ব্যবহার করি। অতএব আমার মতে intellectual passion-কে বুদ্ধিগত সরাসরি ও intellectual self-কে বুদ্ধিগত ব্যক্তিত্ব বললে ভাবটা বুঝতে বাধে না।

যাই হোক বহুল ব্যবহার ছাড়া এ সব শব্দ ভাষায় প্রাণবান হয়ে ওঠে না। ইতি ৪ আষাঢ় ১৩৩২

বলা বাহুল্য Physical culture-কে বলতে হবে দেহপ্রকর্ষ চর্চা।

শ্রীহরীচন্দ্রের বনোপাখ্যায়ক নিধিত

বান্দালা-সাহিত্য

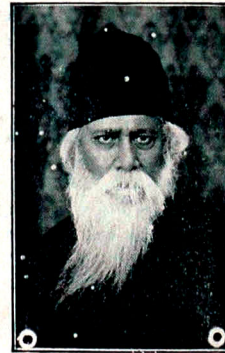
বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

বর্তমান বঙ্গ-সাহিত্য,—যাধা ছোট-বড় উপন্যাসের আর কিছুকাল দিবেন,—তাহাতে তিনজন লোকের প্রভাব আকাবে, মাসিক পরামিতে “ক্রমশঃ” চিহ্নিত গরের সাজে, বিস্তৃত। সেই তিনজনের মধ্যে আমার “একজন,—বিনি



বঙ্কিমচন্দ্র



রবীন্দ্রনাথ—জন্ম ২৭ বৈশাখ ১২৬৩



শরৎচন্দ্র—জন্ম ৩১ কার্তিক ১২৬৩

এবং এককালীন,—প্রত্যয় কতকটা উপভোগ্য চুটকিভাষায় বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসক্ষেত্রে পিতৃস্বামীর, সেই সাহিত্যশাস্ত্রটি কথার রূপে আমাদের সম্মুখে দেখা দিতেছে, এবং হয় ত বঙ্কিমচন্দ্রের বোলচালগুলি, আমরা রূপান্তরিত আকারে,

আজকাল, নানা লেখায় পাইতেছি বটে, কিন্তু তাহাতে, বহির্মের সেই নিপিকেশাল্যপরিব্রতা, তেজস্বিতা ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আচায়েয় দ্বারা হিতৈষিতা কোথাও এ পদাশ্রয় প্রদর্শিত হয় নাই।

অনুনা পণ্ডিতে গেলেই দেখি, বহির্ম, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র—হয় তাঁ সমস্তভাবে না হয় বাস্তবতায় সর্বত্র বিরাজনা। একটু তলাইলেই ইহাদের শাখা ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। স্বতরাং এই তিনজনকে একটু তুলনামূলক আলোচনা অসম্ভব হইবে না।

বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম এক অতি প্রাচীন আনন্দিক, বারোমাসে-তের-পার্কণ-কাঠী সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবাংশে। তাহাতে আবার কুলীন—চট্টোপাধ্যায়। তখন,—বঙ্কিমের জন্মকালে,—(১৮৩৮ খৃঃ অব্দে) অর্থাৎ এখন হইতে চুরানব্বই বৎসর পূর্বে, বাঙ্গালার বেশের সামাজিক অবস্থা অস্বল্প ছিল। মুজি-মিছরি তখন একদলের বিকসিত ন। পিতা বাবদখল একজন বনশী ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে, অতঃপূর্বে অভিজাত বাশের সম্ভ্রান্ত,—ডেপুটি কালেক্টরের সমাজে প্রতাপিতর সীমা ছিল না। ইংরাজ আমলের সেই গোশালী রংগের সময়ে ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি-এ পদা বঙ্কিমও ডেপুটিগিরি চাকরি লইয়া, সর্বপ্রথম বশোহের যান। বঙ্কিম—নিজ একজন কাস্থিমান পুরুষ ছিলেন। ভদ্রস্থান কোথায়?—হলের অথবা ভারতবর্ষের প্রাচীন শিপাবাদির নাবদাতারূপী যে মনবীপ ভাটপাড়া, তাহারই মধ্যে—ভট্টগঞ্জীর একটি পাড়া কাঁঠালপাড়ায়। চারি সহোদরের মধ্যে বহির্ম তৃতীয়। আর তিন ভাইও ইন্দ্র চন্দ্র তুল্য। একে অতঃপূর্বে বংশ, তাহাতে আবার ঐরূপ বান্দে জন্ম, আর তখন, যখন বহির্ম আশিলেন, তখন আমরা এতটা 'পিতা' হই নাই। চম্ভালজা তখনও ধানিকূটা ছিল। তাই বঙ্কিমবাবুর আভির্ভা—প্রাচীন হিন্দুধর্মানেতে ভরা। শুধু আদমবংশবীর বাতায় নৃত্য, সমাজের সকলের ধ্বংসও হিন্দুধর্মের প্রভাব খোঁসিত ছিল। স্বতরাং বঙ্কিম, নান্দ্রতন্ত্রের সচিব, হিন্দুধর্ম পান করিয়াছিলেন।

তাই তাঁহার গ্রন্থের পরে পরে হিন্দুধর্মাবীর ছাপ পাই। রেকম্মাদারীর সাক্ষাৎ পাই। ব্রত-নিরমের কথা পাই। কালী 'বাগদার' সংবাদ পাই। তিনি নিখিতে—তাঁহার সমাজকে শিক্ষা দিতে। কিন্তু সেই শিক্ষকের আসনে বসিয়া, কোন দিনও তিনি গোঁড়ামীর প্রশংসা দেন নাই। হিন্দুধর্মাবীর কল্লকে দেহ আবৃত করিয়া বাহ্যে ভগ্নাদির 'অনিয়' করিত, বঙ্কিমের তীর কণার তাহাদের পৃষ্ঠদেশ ক্ষতবিক্ষত হইত। সারকাসে বাহ্যে তারের উপর নৃত্যকৌশল দেখায়, তাহাদের যেমন সর্বসই সর্বত্র থাকিতে হয় যে, যেন হঠাৎ পড়িয়া না যায়, কত রকম কসরত, কত রকম কায়দা দেখাইয়া, তাহারা দর্শকগণের বিম্বয় উৎপাদন করে, কিন্তু সর্বদা সতর্ক থাকে যে, যেন পা না ফুটায়, সেইরূপ বঙ্কিমচন্দ্র, যত ভ্রম—গোবিন্দলাল—হোহাধি, যত কুন্দ-নগেশ-স্বাধ্যয়ী, যত প্রতাপ—শৈবালী—চন্দ্রেশ্বর, যত দুর্গাশিনী—গিরিভাঙ্গা—হেমচন্দ্র, প্রাঙ্গণ—ব্রজেশ্বর—ভবানীপাঠকই চিত্রিত করুন না-কেন, তাঁহার সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি থাকিত—ঐ সমাজহিতৈষণার ও হিন্দুধর্মের মধ্যকার সংরক্ষণের প্রতি। সনাতন সামাজিক বিবিধাবস্থার উল্লভ্যনের কৃপণ তাঁহার গ্রন্থে ভাষ্যমান।

বঙ্কিম প্রথম কারিগর। তাই তাহাকে অনেক নূতন 'ডিভাইস' করিয়া দেবার সমক্ষ ধরিতে হইয়াছিল। পাঠকেরা, স্ব স্ব রুচি অনুসারে, পছন্দসই 'ডিভাইস' বাছিয়া লইয়াছেন। কেহ চন্দ্রেশ্বরকে প্রজ্ঞা করেন, কাহাও হনয় কুন্দর গ্রন্থে বাসিত। কেহ ভবানীর ক্লমকাজকে প্রশংসা করেন। কেহ বা শৈবালীকে আটা মিকিতে ভর্তেও গ্রন্থপাঠে চিত্ত-প্রাণ-প্রাণে নিমিত হন। কিন্তু সকলেই পরিণতিতে 'আধ্যাত্মের' মায়ায় আকৃষ্ট হইতে 'হয়'। অজান্তায় অজান্তে প্রতি, পাপের প্রতি, বিতৃষ্ণা ও সত্যের প্রতি, সত্যকার্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতে হয়। প্রথম কারিগরকে, নূতন 'আবিষ্কারকে' অনেক বেগ পাইতে হয়, অনেক পাঠিতে হয়। বঙ্কিমকেও হইয়াছিল। একটা মারিকলের খোলে ছেঁদা লুপিয়া একটা কাঠের ছিদ্র-বুক, নলদে লাগাইয়া, জল পুরিয়া, সকলেই এখন হুকা তৈরি করিতে পারে। কিন্তু যে মহাপুরুষ, সর্বপ্রথম

ঐ বিখরীজী যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তিনি কি হোয়ার আচায়ে বহু বা এডিসন অপেক্ষা কম? আজকাল কত রকম নকশাগিরি, ছোট বড় মাঝারি, নানা কারুকার্যে খচিত হুকা তৈরি হইতেছে বটে, কিন্তু প্রথম মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্রের আবিষ্কৃত হুকারে ক্রীড়ামার ও কেহ পৌছিতে পারিবেজেন না। অবশ্য এই না পারার, অর্থাৎ অক্ষমতার আরও কতিপয় কারণ আছে,—তাহা পরাতন্ত্রের বিবৃত করি।

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী শিক্ষাকাননের প্রথম কল্লকর। তিনি পাঠ্যভাষা-সাহিত্যের দূরবীক্ষণের মাধ্যমে নিম্নমধ্যশ্রেণী, প্রাচ্যের—ভারতের অথবা যেন জ্ঞানদশীর দ্বারা দেখিতে পাইয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন; এবং হতশ পা হইয়া, বীরের দ্বারা, শব-সাধনার-প্রসূত হইয়া বীণাপাণিকে ডাকিয়াছিলেন, মৃত জাতিকে পল্লিত জগত্যাছিলেন। জন্মে সেই পক্ষ্মনের পরিণতি নবীন জীবনের নবীন আশাশে, নবজাগরণে স্বজাতিকে তিনি প্রাণবান করিয়া গিয়াছেন। তাই আজ সেই মহদ্রষ্টা স্বপ্নের সময়ে শবদেহে প্রাণসম্ভার হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ যখন জন্মিলেন, তখন বাঙ্গালদেশ আর এক রকম হইয়া গিয়াছে। বঙ্কিমের সে বাঙ্গালা আর নাই। বঙ্গের সারস্বতকুল বঙ্কিমের কল-মধুর সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া আছে, ভারতবন্ধ, চট্টোপাধ্যায়—জগদীশ—প্রভৃতির চিরদাবী গীত-স্বরীতে পরিসৃত বাঙ্গালী-হৃদয় বঙ্কিমের স্বপ্নাত্ম সঙ্গীতে বিমোহিত হইয়া যখন আরও কি যেন চাহিতেছে, বঙ্কিমের অস্বপ্ন-প্রাণী কল্পনার অসুস্থতায় বাধ্য-সম্মতের পরিস্রুত বদ্যাবী যখন সাহিত্যিকাননে আরও অমৃতের সন্ধান উদ্ভবী, তখন বাগদার বাউ একবার বাহায়া পায়, তাড়ের মতন। ঐরূপ উপায়েই বা উপায়ভর বঙ্গের পুনরাগ্রাসির নিমিত্ত এতটা দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া বাঙ্গালী পাঠক-পাত্রিকা যখন প্রত্যাভা-দ্বন্দ্বের বসিয়া যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন, তখনই নাক্ষত্র ক্ষণে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। বঙ্কিমের স্বপ্নত-কমিত সাহিত্যকল্পে নববঙ্গরূপী রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে সর্বত্র রচনা একটা নবীন প্রাণের সাড়া পড়িল, সকলেই রবীন্দ্রকে কণ্ঠে মিশাইয়া গাইয়া উঠিলেন—

"বেলা গেলে—তোমার পথ চেয়ে—"

বঙ্কিমের গঠন নবীন যঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নব সাধ-সম্ভার দেখা দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের গোপাল পরিচয় পূর্ণও করিলেন না। রবীন্দ্রনাথের সমস্তই নিজস্ব, সমস্তই আনন্দ-পাশে তৈরি। লক্ষ্যের কাণ্ডেরে তাঁহার জন্ম। পরশ্বতী যে

গৃহে অচ্ছন্দা, তথায় তাঁহার শিক্ষা। ছোট-খাটো, তুচ্ছ বিষয় বাহাদের নিত্য আলোচ্য, উপরের দিকে চাহিতে বাহাদের চক্ষু কলসিয়া যায়, তাহাদের অনেক উপরে,—নরকে কলিগিরি, জাগ, গুণগোল যেখানে পৌছিতে পারে না, তেমনই নির্মল মুক্ত গগনের তলে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। স্ববিশুদ্ধ। পিতা চারিত্র্য-ভ্রমার, মতের আলোকে মত সমুৎপন্ন। পিতামহ প্রাচ্য ভূগর্ভের অন্তরম প্রদেশে বসিয়া প্রতীক্ষা "জিনিস ধারকানাথ"—আখ্যায় পুস্তিত। জ্ঞাতা একজন হুকরি সন্তোষনাথ ভারতের প্রথম সিভিলিয়ান, অক-রিজেন্সনাথ তদানীন্তন চিত্রাশালী মনথিপণের লীধনাথ। অজ্ঞাত ভ্রাতৃগণ প্রত্যেকই বলেন—"আমার বেণু," এমনই সংস্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আসন পাতা হইল। বঙ্কিমের দ্বারা ভাষ্যগাণের সৌরভ রবীন্দ্রনাথকে মজল করিতে পারিল না। পক্ষিমের বাতাসে বাঙ্গালার হাওয়া তখন অনেকটা মজ রকম হইয়া গিয়াছে, দীপক রাগের আশাণের সময় কাটয়া গিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ অল্প সাহিত্যিক আশায় আরম্ভ করিলেন। লিপিত বসিয়া কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের 'ফটো' তিনি সমুৎপে রাখিলেন না। স্বাধীন, সর্গভিত্তিকবিশুদ্ধ, হিন্দু সংসারের খুঁটি-নাট্য-পূর্ণ সর্ববিধ বাস্তবাত্তার অনুকূল রবীন্দ্র-কবির পূজার জন্ত পূজার বসিলেন। কোনরূপ সম্বল সিদ্ধির কামনায পূজার প্রসূত হইলেন না। সমাজ, লোক-চারিত্র এবং শিক্ষাদান—এই ত্রিধি নৈবেদ্য-সম্ভারে স্বপ্নচিত্তে বসিতে বঙ্কিমের আসন পড়িয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজের বিখিতত্ব হনয়বাণিকে বৈবেজ্ঞপের ভারতীয় পাদপূজে রাখিয়া পূজার বসিলেন। গুজবনে তফাৎ হই।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিধে কোন অকবির কথা বলাই ধুঁট।

তাঁহার নকলে ও তজ্জাতীয় ছোট ছোট গল্পগুপ্ত পূর্ণম উদ্ভেতাগা বহু। ভাব্য বংশবদ্য পরিচারিকার দ্বারা তাঁহার কবিতার পিছু পিছু যে উদ্ভেতাগা দৃষ্টিগোচর, তাহা যে কোন চম্ভুমান চিত্রাশালী পড়িলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার বড় বড় গল্পগুপ্ত ছোটগল্পের মত মনোরম হয় নাই। তাহার কারণ, আমার মনে হয়, একটু একদেয়ে হইয়াছে। কল্পিত ঘটনা,—প্রতি সংসারে বা প্রতি জীবনে বাহা সর্বদা ঘটে না, তাহা কল্পনা লোকে যতই সমুৎপন্ন হউক না কেন, বা 'নিখি' প্রতিম ভাব্য কল্পনামতে যতই মুগ্ধ হউক না কেন, তাহার মারকতা বেশী সময় থাকে না। জ্ঞানবানের 'নৈমিত্ত' মত, গ্রন্থের কিছুকাল পর পর্যন্ত তাহা শুধু মধুর, কিছুকাল থাকেও মধুর কিন্তু প্রভু হইতে ছুটিয়া যায়। নক্সা চোখে বসি, গোরা, রাজা ও রাণী প্রভৃতি একই কণা পড়িয়াছে এবং পড়িয়া বিমিত না হইয়াছি, কিন্তু কল্পনের ধ্বংসের

নিভুৎ কক্ষে তাঁহার লেখা, বিদ্যুৎ, মুগামিনী, কপাল-
কুণ্ডলা প্রভৃতির আলোচ্যবৎ, চিরজাগরু ক' আছে? ছাঃখিনী
কন্দর, দেবোৎসব প্রতাপে—পতিব্রতা স্বাধুস্বরীর বা
তেজস্বিনী আবেশা—ছবির দ্বার ঐ সব গ্রন্থের কথাখানি
ছবি চোখের সমুদ্রে সর্বদা ভাসে? অরুণ একদল লোক
আছেন, ঐরাবত বলেন এবং চিরদিন বলিবেনও যে,
স্বাভিন্দ্রনাথের সমস্তই স্বন্দর। তাঁহাদের সহিত আমার
বিবাদ নাই। তাঁহারা বিমুদ্র। বিমুদ্র ঐরাবত,—ঐরাবত
যে কারণে বা যে কারণেই হউন—তাঁরাদিগকে কথ্য করিতে
হয়, ভালবাদিতে হয়, তাঁরাদিগকে আখ্যাত করিতে নাই।
পাঠক বরুণ অরুণ দ্বারা “সেখ ও রোজ” পড়িতে পারেন,
‘গোরা’ তেমন ভাবে পড়িয়া উঠিতে পারেন না। কিন্তু
শরৎচন্দ্র ও পথ দিয়াই যান নাই। তিনি রবীন্দ্রনাথের
সঙ্গে কোণাও তুলনায় সমালোচিত হইবার বিপদকে ডাকিয়া
আনেন নাই। রবীন্দ্রনাথের বাহ্যিক এবং বাহ্যিক ভাষার
কত সতর্কতায় শাবরিক্ষেপ করা যে দরকার, তাহা শরৎচন্দ্র,
—কথা সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সত্য-সাক্ষী শরৎচন্দ্র অতি
উত্তমরূপেই গোড়ায় ধরিতে পারিয়াছেন এবং তদুপায়ের
রবীন্দ্র-কুর পথ পরিহার পুঙ্ক, এক নূতন, নিজের
আবিস্তৃত পথে যাত্রা করিয়াছেন। তাই তাঁহার এত শক্তি।

শরৎচন্দ্র

প্রতিদিন ছোটগাটো বা বড় বড় ঘরে যে সকল ঘটনা
ঘটে,—প্রতিপলে দীন দীন গৃহস্থকে যে সকল অপরিহার্য
দুঃখ দাবিদায়ের অনলে পুড়িয়া থাকে হইতে হয়,—সহ্যভূতি
মুখ অন্ধকার ঘরের কোণে পড়িয়া অশ্রু-সাগরে ভাসিতে
হয়,—সেই সমুদ্র ছবি শরৎচন্দ্র আঁকিতে বসিলেন। বাহা
অশ্রু-স্রোত, তাহাকে তিনি রূপ দিয়া পাঠকের চোখের
সাধনে ধরিলেন। তাঁহার ছবির রূপ হইল যেন, একটা
বাহুর মায়ের দুখ বাইতরে, আর তার মা—পত্নীখিনী গাভী
ভিত দিয়া সম্মুখের গা চারিতেছে এবং সন্তান-সম্পর্কে
মাতার চোখ বিনিয়া আঁকিতেছে; বড় দুঃখের চিত্র, মানব-
দুঃখের নিত্য স্মরণীয় ছবি, শরৎচন্দ্র ইহাই অর্জন করিলেন।
রবীন্দ্রনাথের গোপীনাথ-বাসন-রত বৈষ্ণবের গান হইতে
হতভাগিনী বান-বিদ্যার ও বিড়ম্বিত, কারাগারবৃক্ষ,
দেবপ্রতিম যুগের অবস্থা, দ্বন্দ্বজন্ম করিয়া লইতে হয়।
আর শরৎচন্দ্রের ঐ সমুদ্রবর্তিনী, সন্তান-বৃত্ত সত্য, শব্দ-স্পর্শ-

নিমীলিতাকী খেছুর ছবির দিকে চাহিয়া, দর্শক, নিজের
অন্তরে লুক্কায়িত ছবিখানির সহিত উহা মিলাইয়া মিলাইয়া
দেখেন। জীবনের দিব্যদামনে দৃষ্ট কত সত্যের ধারার
ছবি, এ ছবি দর্শকে কেন, যেন উন্মাদ করিয়া তোলে।
তফাত এই।

শরৎচন্দ্র হিন্দু সংসারের বয়সীরা পৃথিবীদেবর দ্বন্দ্ব যেন
বাগজেব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহাতে কত স্বপ্ন, কত
অমৃত, কত স্বর্গীয় কাহিনী। শরৎচন্দ্র পাড়াগাঁয়ের শোকা।
পাড়াগাঁয়ের দিন চার বছরের ছেলেমেয়ে হইতে আরম্ভ
করিয়া সন্ধ্যা-পূজা-বিহল, স্বাধরপ, কুটুবি দলপতি
মহাশয়গণ পথান্ত—সকজকেই তিনি দেখিয়াছেন, জানেন,
ভুগিয়াছেন, ভুগিতেছেন। তাঁহার হৃদয়ে-মাঝে কড়িত
পাড়াগাঁয়ের পুতিগন্ধ ও পরিবর্তা ছইইচির করবার তিনি
অধিকারী। স্বন্দররূপে চিত্র করিয়াছেনও। তবে আর
বঠনে তাঁহার তেমন যোগ্যতার পরিচয় কোন পুস্তকেই
ততটা প্রাপ্ত হইয়া যায় না। কিন্তু এ কথা স্মরণেই বলিতে
রাখা যে, তিনি যে পথে লেখনী চালনা করিয়া চলিয়াছেন,
সে ‘পথের দাবী’ একমাত্র তিনিই করিতে পারেন। লেখার
শক্তি অদ্ভুত, ঘটনা সমাবেশের শক্তি অদ্ভুত, বস্ত্র স্থাপনের
শক্তি অদ্ভুত, সম্বোধন—সাধারণ কথাবার্তার ভাষায় বর্ণনা
করিবার শক্তিও অদ্ভুত। এতাহ যাঁহা দেখি, বাই, পরি,
তিনি,—তাহাই তাঁহার সম্মল, এবং সেই কারণেই তাঁহার
গ্রন্থটি কালে আত্মবিশ্বস্ত হই। রবীন্দ্রনাথ তাৎক্ষণিক
গড়েন, আর শরৎচন্দ্র তাহার মিনারের পাতালতা আঁকেন।
রবীন্দ্রনাথ স্বর্ণের পারিজাত আনিয়া মস্তে বসিয়া থালা গায়েন
আর শরৎচন্দ্র—শরৎের মূখ প্রভাতে ধূলামটি হইতে
শেখালিকা কুড়াইয়া ডালি সাধান। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-
স্বন্দরীর কমনীয় কানন শেকালি বধুর কলগীতিকার সুন্দর,
আর শরৎচন্দ্রের—পদ্মা ভবনের আশে পাশের অঙ্গল ঘুঘু,
দোয়েল, জ্ঞানার গান শুনিতে পাই। রবীন্দ্রনাথ অনেক জটিল
অঙ্গের,—কতদিন সমস্তার সমাধান করিয়া পাঠকে সন্দেহ-
বিমুক্ত করেন, আর শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্নের সমাধান পাঠকে
খ খ দ্বন্দ্বের অল্পপাতে করিয়া লইতে হয়। তদুপায়ের
মধ্যেও যদি কোন রক্তের দীপ্তি দেখেন, শরৎচন্দ্র আনি
সেই দিকে ছোটেন। তাঁহার সম্বোধনগী কল্পনার সমক
স্পৃহাস্পৃহ বিচার নাই, বাহা স্বন্দর,—নয়নরজন তাহাই
সমভুক্ত অনলের দ্বার তাঁহার গ্রাহ।

বিশ্বায়

শ্রীকালিদাস রায়

নিম্নায় ছিলাম ভোর,

নয়ন পল্লবে মোর

কে মাখালো বাছুর অঙ্গন?

আজি এ প্রভাতে, এ কি!

বিশ্বপানে চেয়ে দেখি’

বিশ্বায় ভরিয়া যায় মন।

যেই রবি নিত্য উঠে

এনেছে সে করপুটে

কোন কল্পলোকের সংবাদ?

বিশ্বায় সে ফেলে ছেয়ে,

তার পানে চেয়ে চেয়ে

আজি ত আসে না অবসাদ।

গ্রাম পাশে এই নদী

বহে বাহা নিরবধি,

কি শব্দ সে? কোথা চ’লে যায়?

আসে কেন? বায় কেন?

অনন্ত তরঙ্গ হেন

চিরদিন কোথা হতে পায়?

অই তরু শাখে শাখে

কি বাণী লুকায়ে রাখে?

জড় হ’তে পায় দেহপ্রাণ।

করে কলরস তার

মাটি হ’তে আবিষ্কার;

এ লীলার নাই অবসাদ।

এক বড় তুচ্ছ কথা,

অই দীপা স্তব্ধ লতা-

সেও বাড়ে তরুর জড়ায়?

গ্রামে ফোটে লাল ফুল,

গন্ধ মধু কি অতুল,

মাটি হ’তে সেও সবি পায়ে।

পাখীগুলি উড়ে উড়ে

চলে যায় কোন দূরে,

ছোট পাখা—নাহি তবু ভয়।

অপূর্ণ অবাক-করা

কলগানে কণ্ঠ-ভরা

এর চেয়ে কি আছে বিশ্বায়?

আজি কার কথা বলি?

যত চাই কুহুহলী

তত হই বিশ্বায় বিভোর,

পার তলে দূর্বা রয়

সেও আজি তুচ্ছ নয়,

জুগায় রোমাঞ্চ সেও মোর।

দুঃখ এই প্রজাপতি তার কান্ধি তার গতি
অপূৰ্ণ বলিয়া মনে লাগে,
সহসা রহস্য ভরা হলো এ প্রাচীনা ধরা,
কত প্রশ্ন মনে মেরে জাগে।
অপ্তিভঙ্গে শিওসম বিখ্যারিত দৃষ্টি মম,
বার বার চোখ মাজি হাতে,
কালিকার বিষটীরে আজিকে পাই না ফিরে,
নব বিশ্ব হেরি এ প্রভাতে।
এতদিন যাহাদরে নিতাই এসেছি হেরে,
করে নি অবাচ তারা হেন,
এত বার্তা এত কথা এ রহস্য অপূৰ্ণতা,
লুকায় রাখিল তারা কেন ?
সহসা আজিকে তারা কীরে কেন আশ্বহারা ?
মৃত্যু বিনা পুনর্জন্ম মম,
যুগি লাগে চমৎকার প্রথমা কিশোরী মার
সজোক্তা সন্তানের সম।
কি করিব ? কোথা যাই ? আজ কোন কাজ নাই
বিশ্বয়ের গোলক ঝাঁপায়,
আজিকে আমার মন হরিয়াছে এ ভুবন,
কি কাজ করিবে শুধু কায় ?
আজি তুমি দস্তাবেজ সর্বগ্রানি সর্বক্লেশ
সব হলো বিষয়ে মগন,
বিষয়ে পাই না সীমা এ সৃষ্টির কি মহিমা !
অষ্টা এর না জানি কেমন।
আসনি,—সাধনা বিনা জানিনা আসিবে কিনা,
হেন দিন জীবনে আবার,
আজি শুধু চেয়ে থাকা, অপূৰ্ণ মাদুরী-মাখা
এই বিষে নেই কাজ আর।

ভাবলোকে মেটারলিঙ্ক

—পূর্বপ্রকাশিতের পর—

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

‘দুঃখিয়ার’তেও এই ভাবের অদ্বুত এবং রহস্যময় সত্তাকে ব্যাক্তি করিবার অপূৰ্ণ শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকই প্রবাসী পত্রিকায় ইহার বহুস্থান পাঠ করিয়া থাকিবেন। ‘দুঃখিয়ার’ নামকরণ হইতেই আমরা এই একাক্ষর নাটিকার মূল স্বরূপ ধরিতে পারি। বিশ্বরহস্য ও জীবন-সম্বন্ধে মানবদ্বারা অল্পত ও তজ্জনিত ‘অসহায়তা’, ক্রীতি ও অস্বস্তি চিত্রে জাগ্রত করাই শিল্পীর উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়।

সীমাহীন সমুদ্রের মাঝখানে নামনির্দেশনাই একটি ভীষণ এই নাটিকার অবতারণা। সময়—গভীর রাত্রির—নিষ্পন্দ নিস্তব্ধতা। দিবালোকে বাহা সহজ ও সাধারণ তাহাই অন্ধকারে, চম্পালোকের স্বপ্নময় হাওয়ায় রহস্যময়; তাই মেটারলিঙ্ক নাটকের দৃষ্ট প্রায়ই রাত্রির দৃষ্ট, অন্ধকারের দৃষ্ট। মানবদ্বারা যে অন্ধকারজ্ঞে রাত্রির মধ্যেই পড়িয়া আছে; দিবালোকের সন্ধান ত সে পায় নাই। ধীরে ধীরে মধ্যস্থিত ‘অন্ধাশ্রমে চালকের তত্ত্বাবধানে কতকগুলি অন্ধ নবনারী বাস করিয়া আসিতেছে। মাঝে মাঝে চালক তাহাদিগকে ‘আশ্রমপ্রাচীরের বন্ধতা হইতে মুক্ত করিয়া একটু বাহিরের জগতের আলো হাওয়া ও সন্ধ্যার মাঝে লইয়া আসেন।’ আজ বহুকণ হইল তাহারা ‘আশ্রমের বাহিরে আসিয়া চালকের সহিত’ অনেক দূর আসিয়া রাস্তা হইয়া বসিয়া পড়িয়াছে; বহুকণ হইল চালক যেন তাহাদিগকে বসাইয়া রাখিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তাহার আশার কোন অভাবই না পাইয়া অন্ধের দল কতকটা উত্তির হইয়া উঠিয়াছে। রাত ছপুস হইয়া গেছে, প্রতীক্ষা করিতে করিতে সবাই রাস্তা হইয়া পড়িয়াছে; এই জটিল ইহাদের কথাবার্তা নিম্নোক্তের মতই অভোজ্য। চারিদিকে শুধুই করাপাতা, মরাপাছে; এক পা-চলিতেও ভয় হয়। চালকহীন হইয়া অজ্ঞাত দেশে অন্ধের দল আজ নিদপার। প্রাচীর বেষ্টিত আশ্রমে থাকা

ইহাদের অভ্যাস, তাই উদ্ভুক্ত আকাশের নীচে বসিয়া, চারিদিকের অসীম সমুদ্রের ‘অপ্পট’ রহস্যময় ধ্বনি শুনিয়া ইহাদের অন্তর কেমন একটা অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিতেছে; চতুর্দিক হইতে কত রকমের অজানা শব্দ আসিয়া ইহাদিগকে কীটিকণ করিয়া তুলিতেছে। এই চালকহীন অন্ধকারে বসিয়া বসিয়া ইহারা বার বার ‘অসহায় কাতরকণ্ঠে একটি প্রশ্ন করিতেছে “এ আমরা কোথায় আছি? আশ্রম কতদূর?”—আজ যেন সব ঠিক ঠিকানা হারাইয়া গেছে, তাই অস্বস্তির-আর সীমাপরিসীমা নাই। গানের সন্দের স্বরের মত ইহাদের বাস্তবগাণ ও বার বার ‘ওই আশ্রমপ্রাচীরে আসিয়া মিলাইয়া যাইতেছে—এ আমরা কোথায় বহিয়াছি।’ উত্তিতে গেলে গায় কাঁটা লাগিয়া ক্ষত হইতেছে; চারিদিকে মহাপাগরের ‘বিশ্রান্ত ধ্বনি, মাথার উপর মাঝে মাঝে কি এক অদ্বুত সঞ্চার শব্দ (নিশাচর পক্ষীর পক্ষতড়ন শব্দ) মিলিয়া কি জানি কি এক অজ্ঞাত ভীতির সঞ্চার করিতেছে।

ইহাদের মাঝে সবাই অন্ধ। দু একজন দেখার কল্পনা করিতে পারে মাত্র। ইহাদের মধ্যে একটি অন্ধ ধুবতী আছে তাহার মনে হয় যেন চোকের পাতাটা একটু সরাইতে পারিলেই সে আবার তাহার কোন স্বপ্ন শৈশবে দেখা বিশ্বকোন্দ্রমাকে দেখিতে পাইবে। আর তখন স্বপ্নেই শুধু দেখিতে পায়, কেহ বা আলোকে দাঁড়াইলে-যেন বস্তুর ‘অপ্পট’ ছায়াটিকে মাত্র অহুতর করিত পারে।

আজ তাহারা বড়ই অসহায়। তাহাদের বৃদ্ধ চালক কোথায় যে চলিয়া গেছেন, আর আসিচ্ছেন না। শীতবায়ু আসিয়া তাহার তীব্র ‘স্পর্শ’ সবুজকে আরও সজ্জ, বিষন্ন করিয়া, তুলিতেছে। চারিদিকে যেন কুহার ‘অপ্পট’ পদ-সঞ্চার করাপাতার মধ্য শব্দে হ্রস্ব হইতেছে, অথচ আশ্রম প্রাচীরের উত্তরে কেহই। সাড়া দিতেছে না। অকস্মাৎ তাহাদের আশ্রম হ্রস্ব (মানব অন্তরের সহজবোধ) আসিয়া

একজনকে তিনিই লইয়া চলিল। সবাই তাহার সঙ্গে গিয়া যেখানে পাড়াইল সেখানে তাহার তাহাদের মাথামান্বে একটি মৃত্যুঞ্জয়ী স্পন্দ পাইয়া শিহরিয়া উঠিল। ভীত চকিত অন্ধের দল বৃত্তিতে পারিল ইনি তাহারের বুদ্ধ চালক—প্রাণহীন হেহে তাঁহার উপরিব হইয়া আছে।

সর্ব প্রাচীন অকটি তখন বলিতেছে “তোমরাই ত একে ঘেরে বেলেঙ্গ, তোমরা এগুতে চাইলে না, কেবলি বিশ্বাসের জন্ত, খাওয়ার জন্ত সারাদিন অসন্তোষ প্রকাশ করিতে; তাঁর বুকুর সাহস মরে গেছে—.....”

এই অন্ধের দলের মধ্যে একটি শিশু ছিল, তাহারই শুধু দৃষ্টিশক্তি ছিল। সে ভীত চকিত হইয়া কি দেখিয়া অন্ধদের ক্রীড়িতে লাগিল। কে যেন আসিতেছে, শিশুর দৃষ্টি তাহাকে অনুসরণ করিয়া ক্রীড়িতেছে ইহাই অন্ধরা অনুভব করিল। অবশেষে শিশুর দৃষ্টি সেই দীর্ঘ আগমকর্ত অনুসরণ করিয়া তাহাদেরই মাঝে মৃতের পার্থক্য অসিয়া স্থির হইয়া রহিল। ভীতিগ্রস্ত অন্ধের দল আপনাদের নিদ্রাক্ষ অসহায়তা লইয়া, আগমকর্তের বাক্য-নিয়ন্তার আরও ভীতিবদ্ধ হইয়া রহিল—শিশুটা শুধু মহাশয়ের সেই অনন্ত নির্জন অন্ধকারে আরও অর্ধেকট চোঁৎকার করিতে লাগিল।

এবং, ঝাঁক তাঁহার “নিরস মেটোরলিক” পুস্তকে (২৪৪ পৃঃ) এই নাটকীয় “সিদ্ধান্তিক”, নিশ্চয় অর্থটিকে বুঝিতে গিয়া বলিয়াছেন যে চালক হইতেছেন ‘চলিত ধর্ম’ আর অন্ধের দল কেবলি মাত্র সংসার বশে চলিত ধর্মহীনসারী মানব।

এই নাটকীকৃত দৃষ্ট হইতেছে পণ্ডিত সিদ্ধান্তিক মানব-অন্তরের রক্ত বাহ্যের ভাব মুষ্টিয়া উত্তীর্ণাচ্ছে। এই যে জগতে আমরা রহিয়াছি, আমরা ত ইহার কিছুই জানি না! জীবন আমাদের কোথায় রহিয়াছে, কোথায় চলিয়াছে। চলিত ধর্মকে অনুসরণ করিয়া তত্ত্বগতের (আশ্রমে) এক বৃক্ষমী নিকটতায় দিন কাটিতেছিল, কিন্তু সেই ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মানবাত্মা তাহার প্রকৃত অঙ্গতা, নিদ্রাক্ষ অসহায়তা ও অজ্ঞাতের ভীতি অনুভব করিল। * পরস্পরকে বিভ্রান্ত

* মেটোরলিকের মতে বিশ্বমানবের অন্তরাত্মা আলো চলিতধর্মের বন্ধনীয় হইতে বুদ্ধ হইয়া বাসব হস্তের সম্পর্কে আসিয়াছে। মানবাত্মা পূর্ণের

করিয়া বেবিল কেহই কিছু জানে না। এরা নিজকেও জানে না, অপরকেও জানে না, দুঃকর্মের অন্তর শুধু স্বপ্নের মত কতকটা আভাস পায়। শুধু নারী বর্ণিতে পারিতেছে যে সে দেখিয়াছে, শুধু তাহারই সত্য জগতের দৃষ্টি আছে আর সব একেবারেই অন্ধ। কেথো হইতে যে ইহারা এই সিদ্ধবেষ্টিত বীণে আসিয়াছে তাহাও ইহারা জানে না। এই না-জানার রাজ্যে একবার নির্ভর ছিলেন চলিত ধর্ম; কিন্তু আল সে ধর্মও মৃত। মাহুয জীবনের ধর্মটিকে না-চলিয়া-চলিয়াই মারিয়া ফেলিয়াছে; আভিকার ধর্মের মুখে তাই কোন প্রাণপ্রাপ্তন নাহি, আনন্দ নাহি। “পৃথগুস্তাংগের বেদনাক আজ তাঁহার চোক দিয়া বন্ধ হইয়া মুটিতে চাহিতেছে—” +

যেমন অন্ধছিল, আলও সে যেমন অন্ধ, কিন্তু তাহার মধ্যে একটি পার্থক্য পাঁজাচ্ছে। তিনি বলেন: “We were, it might be said, like blind men, who should imagine the outer world from inside a shut room. Now we are those same blind men whom an ever-silent guide leads by turns into forests, across the plain, on the mountain and beside the sea. Their eyes have not yet opened, but their shaking and eager hands are able to feel the trees, to rumple the spikes of corn, to gather a flower or a fruit, to marvel at the ridge of a rock or to mingle with the cool waves, while their ears learn to distinguish, without needing to understand, the thousand real songs of the sun and the shade, the wind and the rain, the leaves and the waters.”

Double Garden (Leaf of Olive) p 282.

অর্থাৎ “আমরা এতদূর অন্ধের মত স্বপ্নঘরে মাঝে বসিয়া শুধু পরিচয়ের কর্তব্য নাই। ইহা জানি।” —এবংও আমরা সেই অন্ধই সত্য, কিন্তু চিরদিনেই চালক আমাদের এমন, কখনও অরণ্যে, কখনও প্রান্তরে, কখনও পর্বতে, কখনও পাহাড়ের উপর লইয়া আসেন। পূর্ণ আত্মাটিকে বর্জিতঘরের মত বন বিস্তরভূমি বিস্তরে, প্রবণ আত্মটিকে আলো ছায়ায়, বাতাস বাসনে, গর বর্ষের ও জলকানোদের সহরে সহস্রাঙ্গীত কনাইতেছে। বাতব হস্তে সম্পর্কে এখানে ভ্রাতৃত্বভাবের কথা নাই। কারণ এ যেখাটি পৃথিবীভার ভাব বর্না করিতেছে সত্য, কিন্তু এ লোভাটী প্রায় তের বৎসর তরুর লেখা। তখন মেটোরলিকের জীবন একটি পরিভ্রমণ আসিয়াছে, তখন তিনি বলিতে শিখিয়াছেন যে জীবনের পক্ষে সাহসই সত্য, ভয় নিয়ম। +

+ “His eyes seem bleeding beneath a multitude of innumerable sorrows and tears”—

১৩০৯

আমার মনে হয় এই নাটকীকথনা রবীন্দ্রনাথের ‘অচলার-তনের ভাবের দিক (Negative side)। মেটোরলিক তারপর কিছু না পাইয়া বিশ্ববহুবেষ্টিত মানবাত্মার অজ্ঞাত-জানিত অসহায়তাকেই শুধু প্রকাশ করিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ অচলারতন ভাঙ্গিয়া আপনার বিশ্বাসকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এটাইটই পার্থক্য।

উল্লিখিত ‘ছাপনা’ নাটকের অপর ভাবপরিকল্পনার তুলনায় ‘লে সেপ্ত প্রিন্সেসে’ (‘সপ্ত রাজকুমারী’) নাটকীকথনি নিত্যন্ত সামান্য বলিয়া মনে হয়। হৃৎযান্তের সময় সাতটি রাজকুমারী নিজস্ব বিবাহের হইয়া আছে; মনে হয় যেন ইহারা কখনও জাগে নাই, জাগিবেও না। রাজকুমারের আগমন প্রতীক্ষায় থাকিয়া থাকিয়া রাত্রি হইয়া ইহারা অবশেষে ঘুসাইয়া পড়িয়াছে। রাজকুমার আসিয়া এখন ইহাদের রক্ত ঘরে প্রবেশ করিলেন তখন ছয়টি রাজকুমারী জাগিয়া উঠিল, রাজকুমারের প্রেমপাণ্ডীতি (Ursula) মৃত্যুর ভিত্তিমাত্র তেমনি অঙ্গাঙ্গ হইয়া রহিল। নাটকের নাবিকদের কথোপকথনের মধ্যে সুসূত্রে বিধগ্ন হ্রস্ব, একটা চিরবিচ্ছেদের স্বর মুষ্টিয়া উত্তীর্ণাচ্ছে।*

* নাটকীকথনি পান্থিয়ার্লু বৃদ্ধ কেনন একটা অজুত ভাব জাগাইয়া, তাহাবিধে আবার কটা কুমারীজ্ঞ জগাখিল এবং ওক ও পাইন কনাই, চারিজন মাত্র গিয়া একটি খাল সমুদ্রে দিকে দিগন্তে নিশায়া গিয়াছে, খালটির মাঝেও লগ্নভাঙে ছিল নাই; হৃৎশাসের প্রকাণ্ড উইপোপালের ভূগায় ঘলোর কুস্তায় জল যেন অকটি বিবাহের মত পড়িয়া আছে। এমন পান্থিয়ার্লু কুস্তায় মাঝে কাচের পান্ডা লেখা একটা রক্ত গৃহের মাঝে হৃৎযান্তের রানালোকে স্নাত জাগিয়া সাতটি বিবাহ প্রাণ-কেনন রাজকুমারী রাত্রি হইয়া দীর্ঘকালের প্রতীক্ষার অবসর হইয়া ঘুসাইয়া আছে এবং ইহাদের একটি এই হৃৎযান্তের সঙ্গে সঙ্গে চিরবিবাহ লগ্না নৃত্যের মাঝে আসতে হইয়া গেছে। দীর্ঘকাল পর রাজকুমারের প্রাসার মুহূর্তে এই অবসান এবং সেই মুহূর্তে ঘুরে ঘুরে আলো হইতে নাবিকদের চির বিলায়ের গান নাটকীকথনিক এক অজুত বিলায় বিলায়ের বাজনার ভায়ায় তুলিয়াছে। এ নাটকীকথনি সেই জাহাজ চিত্র বাহার মধ্যে স্পষ্ট জাহাজ, বিলায়, শরীরা লেখার মত কোবাই বস্তু নাই, অথচ বাহার সমগ্রতার মাঝে ইহা একটি অজুত বিলায় জাগিয়া নিবাতের মনোভব আশ্রয় মত স্তম্ভীভুক্ত কেনন অভিক্রুর, কথো বেলিতে থাকে। মেটোরলিকের সিদ্ধান্ত হইয়া বৃদ্ধ পরিকল্পনার মধ্য গিয়া স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

অনেক সমালোচকই ইহার কোন প্রশংসা করিতে পারেন নাই। কারণ এই নাটকের চরিত্রগুলির সিদ্ধান্ত বা রূপকাণ্ঠি অত্যন্ত অস্পষ্ট হইয়া পড়ায় ইহা একরূপ অর্থহীন হইয়া গিয়াছে, এইজন্য সমালোচকেরা ইহার নিন্দা করিয়াছেন + এই বৎসরেই যে তিনি মিষ্টিক সাংখ Ruybroeck-এর লেখার অনুবাদ প্রকাশ করেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মিষ্টিকদের অন্ধবল্লভ সত্যই যে একমাত্র নিশ্চয়তা দিতে পারে এই কথাটি তিনি উক্ত অনুবাদের ভূমিকায় প্রচার করেন। যৌবনে জেহুইটদের শিকার প্রভাব তাহার চিত্তকে মিষ্টিকদের প্রতি আকর্ষ করিয়াছিল বলা হইয়াছে। মিষ্টিকদের অন্ধবল্লভ সত্যই যে জাহাজ চরিত্রের বিশেষত্ব হইলেও Ruybroeck, বেহেন, হুয়েডেনবার্গ প্রভৃতির লেখা আরও বিশেষভাবে তাহার মধ্যে এই আকর্ষণটিকে প্রবণ করিয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল।

ইহার পর মেটোরলিকের যে নাটকীকথনি প্রকাশিত হয় তাহা তাহার একখানি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। আখ্যানাংশের দিক দিয়া দেখিতে গেলে Stephen Phillips ষ্টীফেন ফিলিপ্‌স নামক শক্তিশালী তরুণ কবির (১৮৬৮—১৯১৫) বিখ্যাত Paolo and Francesca গল্পে ও ফ্রান্সেসকা (১৮৯২) নাটকের সহিত ‘পীলিয়াস ও মেলিডাও’র (১৮৯২) মধ্যেই পান্থ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

এই পণ্ডিত মেটোরলিকের নাটকে আমরা কেবলি অদৃষ্ট শক্তির একটা নির্দয় বিজীকী দেখিয়াছি। মুক্তা যেন নাহুকে গ্রাস করিবার জন্ত চারিদিক হইতে দৃষ্টা মেলিয়া হাঁ করিয়া আছে তাহাই। মেটোরলিক আত্মজ্ঞাকে দেখাইয়াছেন। যেন এ জগতে মানবাত্মার শাখকতার ও আনন্দের বস্তু কিছুই নাই; সে আসিয়াছে যেন কি এক অজ্ঞাত বিলায়ের ভায়া বহন করিতে করিতে, আরার চলিয়াছে কোথায় তাহাও সে জানে না—ইহাই শুধু সে

+ Bithell's Life and Writings of M. Maeterlinck pp. 55-6.

দেখিতেছে যে চারিদিক হইতে মৃত্যুর অন্ধকার তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে।

কিন্তু ধীরে ধীরে মেটারলিঙ্কের অমূল্য আর একটি বিশ্বধর্মভাৱে পরমাশ্রয় শক্তি ও সত্য ধর্ম্য দিতেছিল, সেটি মানবাত্মার গভীর প্রেমতৃষ্ণা। নিলাশ মৃত্যুর সমুখে হানুয়াইয়াও মানবাত্মা যে একমাত্র মেমেকই চায়, এই প্রেমের মধ্যেই যে তাহার অন্তরতম সার্থকতা ও কথাটি মেটারলিঙ্কের পরবর্তী নাটকে মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া যাত্রীরা উঠিয়াছে।

সর্ব প্রথম 'পীলিয়াস ও মেলিভাণ্ডা'র আশ্রয় প্রেমের সত্য মন্থনা ও শক্তির পরিচয় পাইলাম। এখানেও নিরতি পূর্বেরই মত নিষ্ঠুর রূপ লইয়া ফিরিতেছে সত্য কিন্তু মানবাত্মা তাহার ভয়ে আতুর হইয়া কপিতে কপিতে চোক বুজিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে না। এখানে মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া একটি আত্মা আর একটি আত্মার অন্তরতম পরিচয়ের মধ্যে আপনাকে পাইতে চাহিতেছে। পীলিয়াস এবং মেলিভাণ্ডা হইতেছে সেই 'মূল্য বাহাদের পরস্পরের মিলনেই জীবনের চরম সার্থকতা'। মেটারলিঙ্ক এই মূল্যের ভালবাসা (destined love) সম্বন্ধে একটি বিশেষ মতবাদের পোষণ করেন; এই নাটক প্রকাশিত হওয়ার কয়েক বৎসর পরে তিনি এই মতবাদটি স্পষ্টভাবে প্রচার করিয়াছেন। এখানে তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, কারণ, এই নাটকেই তিনি সর্বপ্রথম সেই মূল্য তত্ত্বটি প্রয়োগ করিয়াছেন দেখিতে পাই।

মেটারলিঙ্ক বলেন, "নিশ্চয়ই আমাদের জ্ঞানের বাহিরে এমন একটি দেশ রহিয়াছে, যেখানে কেহই আমাদের অপরিচিত নহে, সেই স্বদেশে আমরা সকলেই বাহিতে পারি ও পরস্পরের পরিচয়টি পাইতে পারি".....সেখানেই আমাদের নিত্যকারের প্রিয়ারকে আমরা বরণ করিয়া লইছি; এইজন্য এই প্রেমের ক্ষেত্রে ভায়াও যেমন ভুল করিতে পারে না, আমাদেরও তেমনি ভুল করা অসম্ভব।..... আমাদের জীবনের সকল কর্মক্ষেত্রে বেঁটন করিয়া যে মনোভাব অঙ্কিত হইয়া আছে, তাহার বাহিরে যাওয়ার চেষ্টা করিয়া

আমরা আমাদের অন্তর-মেন্ডা সহজ বোধটিকে (instinct) বিপর্যাস্ত করিবার চেষ্টা করিতে পারি কিন্তু তবু আমাদের ভাগ্যনির্দিষ্ট প্রাণদীপ্তিকে পরিভাগ্য করিবার শত চেষ্টা করিলেও অবশেষে সেই আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবে।*

মাঘ বাহিরের দিক দিয়া যেমন আপনার পরিচয়টিকে পাইতে পারে না, তেমনি অগ্নরের পরিচয়ও পায় না। অর্পণ অন্তরের গভীর রহস্তলোকেই শুধু সত্যকার পরিচয় সম্ভব। সে রহস্তলোকে একদিন মেটারলিঙ্কের নিকট একটা বিলীকিলা ছিল, কিন্তু পরে তিনি বৃত্তিতে পারিয়াছিলেন যে এই রহস্তলোকেই মানবের সত্যকার অস্তিত্ব; এখানে অন্ধকার নাই। এখানেই সত্যকার আলোক রহিয়াছে। পূর্বম এই রহস্তলোকে হইতে বহুদূরে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে কিন্তু নারী এখনও মানবাত্মার চিরপরিচয়লোকে হইতে চিরবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। এই জ্ঞান নারীর নিকট মাঘের সত্যকার পরিচয়টি কিছুতেই গোপন রাখা চলে না; এক নিমেষেই নারীর নিকট সত্যপরিচয়টি উন্মোচিত হইয়া পড়ে। পূর্বম আপনার বিচার বুদ্ধি (intellect) দিয়া আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বাতন্ত্র্যের গভীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেছে; নারী তাহার গভীরতম সত্যের সহিত যোগ একিষ্টও হারায় নাই। মানবাত্মার গভীর রহস্তলোকে যে মূল্য সম্বন্ধটি স্থির হইয়া গিয়াছে, বহিলোকে যদি সেই মূল্য আত্মা পরস্পরের সমুখে আসিয়া দাঁড়ায়-তাহা পাইলেই এ জীবন পরিচয়ের আলোকে সার্থক হইয়া যায়। পীলিয়াস

* Doubtless must there be regions outside our ken where none are unknown, a common fatherland whither we may go and meet each other.....And it is in this common fatherland also that we choose the women we loved wherefore it is that we cannot have erred, nor can they have erred either. (Treasures of the Humble p.81).....though in our struggle to break through the enchanted circle that is drawn around all the acts of our life, we do violence to the instinct that moves us, and try our hardest to choose against the choice of destiny, yet shall the women we elect, always have come to us from the unvarying star (Tr. Hu. pp 77-8). Cf. Betrothal.

ও মেলিভাণ্ডা এই বিষয়ের পথে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া আপনাদের সেই পরিচয়টিকে পাইয়া মৃত্যুকেও তুচ্ছ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

জ্যোতি রাক্ষসের গোলাও এক গহন অরণ্যে শিকার করিতে গিয়া এই শিশুপ্রাণ মেলিভাণ্ডাকে ধ্বংস করিতে গেল। প্রথম সাক্ষাৎতে মেলিভাণ্ডা ভীত হইয়া পলায়ন করিতে উদ্ভত হয়। যাহোক পরে গোলাও তাহাকে প্রাসাদে লইয়া আসিয়া বিবাহ করিল। প্রাসাদের চারিদিকে ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন গহন অরণ্য, প্রাসাদও তেমনি প্রাচীন, অন্ধকার; তাহার নীচে এক বিরাট গহবর, তাহার মধ্য হইতে অগ্নিমান্ন হুতুর তর্পণ বাহির হইতেছে। এখানে মানুষ হাগিতে পারে না, অন্তর আপনা হইতেই যেন হাগিতে চুলিয়া যায়।

মেলিভাণ্ডা আগার পর হইতেই বিষম, তাহার অন্তরে যেন আগম মৃত্যুর ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। পীলিয়াসকে দেখার পর হইতে তাহাদের পরস্পরের পরিচয় আরম্ভ। তার পর হইতেই যেন কেমন একটা ভয় আসিয়া মেলিভাণ্ডাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে; পীলিয়াসও দূরে চলিয়া বাইতে গায়। এই বৈকটকীভীত হইলেও কিন্তু অন্তর্য কণ্ঠ জনিত মৃত্যুর প্রভুত্ব বাল্যা মুখিলে চলিলে না। এ ভীতি নিরস্তির দিকে চাহিয়া; ইহাদের অন্তরাত্মা যেন বৃত্তিতে পারিতেছে যে অদৃষ্ট ইহারিগকে এই প্রেমের মাক দিয়াই মৃত্যুর মুখে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। অদৃষ্টের অলজ্ঞা মল্লি পীলিয়াসকে দূরে বাইতে দিল না। এটিকে গোলাও ইহাদের পরস্পরের মধ্যে স্থগীতী আকর্ষণ দেখিয়া অন্তর্য সন্দেহ করিয়া দীর্ঘায় পাগল হইয়া উঠিল। পীলিয়াস শেষে চলিয়া যাওয়াই স্থির করিল; কিন্তু চলিয়া যাওয়ার পূর্বে শুধু একবার মেলিভাণ্ডার মুখে শুনিয়া বাইতে গায় যে এ পরিচয় তাহারই মৃত্যু অন্তরের কল্পিত স্বপ্নমান নহে, জানিয়া বাইতে-গায় এ সত্য, এ পরিচয় তাহাদের উভয়েই। জীবনের পরম সত্য। এই জ্ঞানটির মুখেই গোলাও আসিয়া পীলিয়াসকে হত্যা করিল। এখন তাহারা পরস্পরকে চূড়ন করিতেছে গোলাও তখন তরবারি লইয়া তাহারিগকে হত্যা করিতে আসিতেছে; ইহা জানিয়াও কিন্তু পীলিয়াস এবং

মেলিভাণ্ডার আনন্দের আর পার নাই। কত সন্ধানের ও কত সুখীর্ণ প্রতীক্ষার পর তাহারা পরস্পরকে পাইয়াছে; তাই মৃত্যুকে দেখিয়া মেলিভাণ্ডা বলিতেছে 'ভালই হল গো, ভালই হ'ল' (অঙ্ক ৪ দৃশ্য ৫) —মিথ্যা বন্ধনের হাত হইতে যে যে আজ মুক্তি পাইল!

সেখানে সত্যমোলোচন নাটকখানার ব্যক্তিগত জীবন গিয়া উঠাকে মাত্র একটা সামাজিক ঘটনার জিহ্ন বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহার নিশাবাদ করিয়াছেন। জীবন মেলিভাণ্ডার প্রতি প্রেম, ভাৱার তাহা জানিতে পারিয়া ভ্রাতা এবং স্ত্রীকে হত্যা—অন্তি সাধারণ ঘটনা। ইউরোপীয় সমাজে এ কিছু একটা অস্বাভাবিক চিত্র নহে। কিন্তু এইভাবে দেখিলে এই নাটকের প্রাণ এবং চৌরব ততখানিই নষ্ট করা হয়, রাস্তারঘের প্রেক্ষালীলাকে পরদী লীলালা ও অসঙ্গিক বলিয়া ধরিলে তাহার প্রাণ ও চৌরব যতটা বিনষ্ট হয়। মৈফব করিয়া যে রূপকটি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা হয়ত তৎকালীন সমাজে একটা সাধারণ ব্যাপার ছিল; কিন্তু বৈফব কবি সেই রূপকের মাক দিয়া কি অপূর্ণ নির্মল রসমাগুদী না প্রকাশ করিয়াছেন! মেটারলিঙ্কও তেমনি একটি রূপকের মাক দিয়া মানবাত্মার সত্যকার প্রেম পরিচয়ের মৃত্যুভীতি গোঁবর ছুটাঁয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। এ প্রেম লালাসাহীন, শুদ্ধ—মৃত্যুর পূর্ণ সুহৃৎ পন্থ্য মেলিভাণ্ডা তাই সহজকণ্ঠে শিশুর মত শীকার করিতে এতটুকু স্মৃতি হয় নাই যে সে পীলিয়াসকে ভালবাসে। তাহাদের চূড়নকে গোলাও উদ্ভার লাঙ্গলার প্রদর্শন করিয়া লইয়া 'বিশ্ব অম পড়িয়াছিল'—এ কথা চিরপরিচয়কে পাই তাহাদের চূড়নের মাক দিয়া অন্তরাত্মার কি গভীর বেদনাক্রন্দ না উদ্ভাসিয়া উঠিতেছে। তাই তাহাকে পাই যে পীলিয়াস যখনই মেলিভাণ্ডার নিকটে থাকিত তখনই তাহারা ছলনে দাঁড়বে। কেবলই কাদিত—এ কথা চিরপরিচয়কে নতুন করিয়া এই হারান জগৎকে ফিরায়া পাওয়ার কথা। মেটারলিঙ্ক একসঙ্গে বলিয়াছেন যে মানবের সত্যকার মিশন তাহার শৈবিক মিলনের বহুদূর—মানবাত্মার প্রেক্ষালোকে। সেই প্রেমলোকের চিরন্তন অবসরের মধ্যে মানবাত্মার পরিচয়ের আনন্দবেদনা প্রতিনিয়ত অক্ষমল উৎসারিত—হইয়া

উচিত্তেছে, * পীলিয়াস ও মেলিভাণ্ডার পরস্পরকে পাওয়া সেই প্রেমলোককে ঘাটাইলিশ—এ মিলন বাহিরের সামাজিক ঘটনা নহে। এই ভুলই এ নাটকখানিকে 'নিম্বলিক' না ভাবিয়া সামাজিক বিচারের কোঠায় ফেলিলে, নাটকখানির ঘোর অপমান ও অবজরা হইবে বলিয়া আমার মনে হয়।

প্রেমের দিকে মানবাত্মার এই বিপুল আকর্ষণ মেটোরালিকের দৃষ্টপথে আসিয়া পড়িলেও মৃত্যু আসিয়া যেরূপ নিষ্কর ভাবে দলিত করিয়া ফেলে, যে মৃত্যুতে প্রেম-পরিচয়ের আলোকে মানবাত্মা পুণ্ডিত হইয়া উঠিতে থাকে তখনই যে মৃত্যুর আশাম্বর স্পর্শে সব ভ্রমে পরিণত হইয়া যায়, এই কথাটি তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিলেন না; তাই আবার তাহাকে মৃত্যু বিদ্যিকার দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে দেখি। একজন সমালোচক এই ভুলই ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত নাটিকা তিনখানিকে মেটোরালিকের ভাববিকাশের ইতিহাসে একটা ঘটনা বিপর্যয় (anachronism) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাদের সম্বন্ধে কবির নিজ মত আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ উদ্ধৃত করিচ্ছি।

“আলাদীন ও প্যালোমিডিস”, “অন্দরে” এবং “ভিত্তাঞ্জিলের মৃত্যু” এই তিনখানি নাটকের সহিত পঞ্চাশকমে মেটোরালিকের পূর্ণলিখিত ‘পীলিয়াস ও মেলিভাণ্ডা’, “অন্যদৃষ্ট” এবং ‘প্রিন্সেস্ মোবাইন’-এর ষটের মূলগত সমস্তার বেশ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। জে. বিবেল মহাশয় তাহার পুস্তকে (পৃ. ৩৬) এ বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

“আলাদীন ও প্যালোমিডিস” এ দেখিতে পাই যে বৃদ্ধ রাজা অ্যাবমোর (Ablamor) তরুণি আলাদীন (Alladine)-কে আপনার প্রেমবিধি করিয়া পাইতে এবং কখনো এস্তোলেইন (Astolaine)-কে প্যালোমিডিসের সহিত বিবাহ দিতে

চান। কিন্তু নিয়তির বিধান অল্পরূপ। আলাদীন ও প্যালোমিডিস পরস্পরকে পাগলের মত ভালবাসিয়া বসিল। এস্তোলেইন আপনার দৃষ্টির সমস্ত কামনা বলি দিয়া প্রণয়বিগ্ৰহের মিলনকেই একান্তভাবে কামনা করিতে লাগিল। কিন্তু রাজার কোপ পড়িলে আলাদীন ও প্যালোমিডিসের উপর; উভয়েই ভীষণ গুহাঘাত নিক্ষেপ হইল। এস্তোলেইন যখন তাহাবিগ্ৰহকে মুক্ত করিতে আগিল তখন গুহার বিখাল বায়ু তাহাদের সর্গদান করিয়াছে। অচিরেই মৃত্যু আসিয়া উদ্ভাস্ত প্রণয়বিগ্ৰহের করুণ কন্দন ঢাকিয়া দিল।

পীলিয়াস ও মেলিভাণ্ডার সহিত যে মৃত্যুস্তরের কথা বিবেল, বলিয়াছেন তাহা অতি সার্মাঙ্ক। মেলিভাণ্ডার মত আলাদীন আর একজনকে দেখামার নির্দিষ্ট স্বামী কথ্য বিবৃত হইল, এইটুকুই সাদৃশ্য; মৃত্যুবা ইহাকে মেলিভাণ্ডার প্রেমপ্রাপ্তির পরমানন্দ নাই, বরং উভয়েই মৃত্যুর সময় একটা স্বপ্ন ভ্রমের করুণ কন্দন কণিত্তেছে দেখিতে পাই; উভাদের প্রেম যে আলোকপাত করিয়া সব স্বন্দর করিয়া

† এ ভাবামাত্র কিন্তু অস্তরায়ার পদম সৌন্দর্যের প্রতি ভালবাসা নহে। রাইলেনের অস্তরায়ার সৌন্দর্যের সমুদ্রে হালকাই যে কিছুই নহে তাহা প্যালোমিডিস ও ব্রিগার্লিয়া। তাই সে রাইলেনের পদম সৌন্দর্যের সমুদ্রে ডাড়াইয়া ব্রিগার্লিয়া “হৃদয়রত অস্তরের সৌন্দর্যের চেয়েও, হৃদয়রত মূখের সৌন্দর্যের চেয়েও দুরূহো একটা কিছু আছে তা আমি বুঝিতে পারিছি আর তাহা শক্তিও এত বেশি যে আমাকে হার হারাম্বাখা পীকার করিতেই হবে……” কিং যে আর্মি হারাম্বা তা আমি জানি, কার্য আমি জানি তাহা অস্তরায়ার হোমার কুলসার শিশুর মত শক্তির মত আমার অর্ধহৃদয়ের কবলার শক্তি নহে।” এবলিক যখন প্যালোমিডিসকে নিজস্ব অস্তরায়ার দেখিতে পাই, অপরিক বিয়া আনরা তখনই রাইলেনের অস্তরের শক্তির প্রকাশ দেখিতে পাইঃ

‘I have recognised there must be something more incommensurable than the beauty of the most beautiful soul, or the most beautiful face; and mightier, too, since I must needs obey it…… I know what I shall lose, for I know her soul is a child’s soul, poor strengthless child’s, beside yours, and yet I cannot resist it’ (Act II Sc. IV, p. 141).

Pellées & Meliandae and other plays. Trans. Richard Hovey. Dodd & Mead & Co. 1915. pp. 205. French Preface by Mr. M. Maeterlinck.

তুলিয়াছিল তাহা মিথ্যাস্বপ্নের মতই মিলাইয়া গেল।* আমার মনে হয় ‘এই নাটিকার মধ্যে মেটোরালিকের পরবর্তী লেখা’ ‘থ্যাগডেন ও সেনীস্টেট’ নাটকের বীজ নিহিত রহিয়াছে। এখানো এস্তোলেইনের গভীরতর সৌন্দর্য ও শক্তি দেখিবার প্যালোমিডিস আলাদীনকেই চাহিতেছে, তাহাকে ছাড়িতে পারিতেছে না; কিন্তু পরবর্তী নাটকে মিলোয়াগার থ্যাগডেনের গভীর সৌন্দর্যের পরিচয় পাইয়া সেনীস্টেটকে পরিত্যাগ করিতেছে। যে বাধা হোক, থ্যাগডেনের মত শক্তিমত্তী নারীস্বপ্নির চেষ্টা প্রথম এস্তোলেইনেই সফল হয়।

“অন্দরে” নাটিকার মধ্যে, এম, ক্লার্ক মহাশয়ের মতে, সৌন্দর্যের সৌন্দর্যতা ও শক্তি বুঝি স্বন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। অনেক সমালোচকই ইহাকে মেটোরালিকের একখানি সার্থক সৃষ্টি—কেহ কেহ ইহাকে ‘সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলিতেও সঙ্কট হইতে পারেন।†

ইহার আখ্যান ভাগ সংক্ষিপ্ত এবং জটিলতর। একটি পরিবারের দুই মেয়েটি জ্বলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। তাহার মৃত্যু সংবাদ বহন করিয়া যখন ছুটি লোক আসিয়া বাড়ীর পেছনের বাগানে উপস্থিত, তখন বাতান্ন রিয়া আনরা দেখিতে পাইতেছি যে পরিবারস্থ সকলেই পরম নিশ্চিন্তভাবে সান্দ্য-বিশ্রাম উপভোগ করিতেছে। অতি নিরাক্ষণ অজ্ঞাত শোকের সমুদ্রে একটি পরিবার নিদ্রাধির শান্তি উপভোগ করিতেছে, এ দৃশ্য দেখিবার লোক ছুটির সময় সাহস, অস্থিরিত্ত হইয়া গিয়াছে। এদিকে মৃতদেহও প্রায় ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এনিম সমস্ত হওয়ার প্রবেশ করিয়া মৃত্যুর ভীষণ রূপটিকে পরিবারের দিল্লু সৃষ্টীর সমুদ্রে অনায়াত করিয়া দিল; এবং নিম্নের নিবিড়তর সাক্ষ্য নিশ্চিন্ততা হৃদয়শ শোকে আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

“নাহুহ” এই নাটিকার মধ্যে এস্তোলাইন মৃত্যুকে বাস্তবায়ন দ্বারা প্রত্যেক করাধারী চেষ্টা দেখিরাছি, সেই মৃত্যুরই বাস্তব প্রকাশের মাধ্যমিয়া মেটোরালিক শোকের হৃদয়হীনতাকে নিম্নের নিম্নপুত্রার সফল সৃষ্টিয়া তুলিয়াছেন।‡

* Alladine & Palomides Act V.
† Cf. Bithell p. 77.

‡ “অন্দরে” (Translated as ‘Home’ by Hovey) নাটকখানির এত প্রকাশের মূল্য, আমার মনে হয়, ইউরোপীয় নাটকের আশ্চর্যজনকতাই

‘ভিত্তাঞ্জিলের মৃত্যু’ ও প্রিন্সেস মোবাইনের মৃত্যু। যাত্যাতিকের জীবন করিয়া সৃষ্টিয়া তুলিয়াছে। সেখানে মোবাইনের হত্যা যেমন ভীষণ এখানে শিশু ভিত্তাঞ্জিলের হত্যাও তেমনি ভয়ানক।

রাষ্ট্রীর (মৃত্যু) নিষ্কর আবেশ হইয়াছে, শিশু ভিত্তাঞ্জিলকে ধরিয়া আনিয়া হত্যা করিতে হইবে। ইয়েন (Ygraine) এবং বেলাঞ্জিয়ার (Bellangere) তরুণীরকে ভক্ত ভালবাসার ভাইটি। ইহার এবং বৃদ্ধ পরিচারক এস্তোলেইন (Aglovalle) প্রাণপণ সতর্কতা রিয়াও হারাম্বা রাষ্ট্রীর কল্য কল হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। একটি মৃত্যুতে অতর্কিতে যুগ্ম বাসক অপহৃত হইল। ইয়েনের সকল মিনতি ও অশ্রু বার্থ হইল; বাসকের চাঁচকর অহুসরণ করিয়া যখন সে গিয়া দাঁড়াইল, তখন সৌহ-

বেশি গিয়া। ইহার মধ্যে মৃত্যুর হৃদয়হীনতাকে প্রকাশ করিয়া জন্ম মেটোরালিক এটুকুও অস্বাভাবিক অস্তরায়ার করেন নাই, এমন কি তাহার নিম্ননিম্নের ঘাও কোনও অজ্ঞান বিদ্যাকালকে বাজ করিবার প্রয়াস পান নাই। বাহ্যেতে উপর এই অস্বাভাবিক নারিয়ার আদিরূপে তাহারিগকে আনরা একটি কথাও বলিতে দেখি না; শুধু বাড়ীর পূজাতর উভয়ের অন্ধকার হইতে বাতান্ন রিয়া তাহারে নিম্নশ শব্দের অবসানটুকু দেখিতে পাই—তাহাদের নিম্নশব্দের মধ্য দিয়া তাহাদেরই চিত্তের অন্ধ শোকের প্রকাশ, এ এক আশ্চর্য পদ্য মেটোরালিক এই নাটিকার আখ্যায়িক করিয়াছেন। এই নাটিকার মধ্যে শুধু মৃত্যুবাগবাহারী ঠাট্টিক ও অপরিচিত ব্যক্তির বার্তাধারী আনরা কখনও পাই, সে বার্তাধারের মধ্যেও আনরা ভীষণতরবার নিম্নে প্রকাশ পাই না। তাহারা যে কিছুতেই মৃত্যু সম্ভাব্য বলিবার মত সাহস রাখা করিতে পারিতেছে না ইহার শুধু হারাম্বার যে সম্ভাব্য প্রকাশ পাইয়াছে। দুই হইতে একজন লোক উঠে নীচ পদ্য বারিয়ার নিম্ন জলপাতের পলায়কের ব্যাটিকের বহন করিয়া আনিতেছে, এদিকে অন্ধের মাজপান ও ভয়ানক নীচের বহন করিয়া আনরা বারিয়ার ঠাট্টিক ছুটি লোক মৃত্যুবাগবাহারী বহন করিতেছে— শুভম্ভবে এই নিম্নশ চিত্রটির মাধ্যমে মেটোরালিক মৃত্যুর অন্ধ বাসককে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। এই নাটকখানিকে নাটিকা না বলিয়া এখানো চিত্র বলিলেও চলে—কয়েকটি পুষ্ঠার মাধ্যমেই মেটোরালিক একখানি শিশু প্রথম জিজ্ঞাসা করিয়া দেখাইয়াছেন।

[এই নাটিকার ঠাট্টিকের কাব্যার্থ (পৃ. ১০৭) আমার মেটোরালিকের ঠাট্টিকের সম্বন্ধে লিখিত ‘Prodoine’ অংশের দ্বারা পাই।]

* “The Kingdom of love is before all else, the great Kingdom of certitude, for it is within its bounds that the soul is possessed of the utmost leisure. There, truly, they have naught to do but to recognise each other, offer deepest admiration, and ask questions—tearfully like the maid who has found the sister she had lost—while far away from them arm links itself in arm and breaths are mingling.” (Tr. Hu p. 81-2).

কবীরের অপর পার্শ্বে বাসকের হঠাৎ চলিতছে; তাহার
কক্ষ কঠোর চাঁৎকার শুষ্ক ইয়াগেনের নিকট শেষ বিদায় লইয়া
স্বচ্ছ হইয়া গেল। *

* এই পঞ্চম নাটকখানির মধ্যে দুই জিনিষ বিশেষ ভাবে পাঠকের
দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে। একটি ইহাওয়ে ইহার atmosphere অর্থাৎ
এই নাটকখানির পারিবারিক দৃষ্টের মাঝে পরিষ্কৃত অস্বস্ত ভাবের
আধারতা। একটি অস্বস্তিকর এবং বিবাকের মুহূর্তটি তুলিতে যের
বিশেষ কক্ষা দেখাইয়াছেন এবং দুইটি উপায়ে তিনি এই ভাবটিকে
সুটাইয়াছেন। নাটকের পারিপার্শ্বিক দৃষ্টান্তই এমনতর: যখন এবং যখন
—মুসলিম, উপাধারক অবস্থান। চারিদিকে অস্বস্ত পল্লবকলি,
তাহার মাঝে নিমোপ্রত্যক্ষা মর্যাদায় যেরা একটি বহুভাষী, তাঁ
ভাষ্যায় প্রাণ হ্রা যায় বেগলঞ্জলি সব জাতিয়া কাটা পড়িয়াছে। ইহার
মানবদেহ অঙ্গ কয়টিতে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার
কোথাও এই মনোপ্ৰকাশের চিহ্ন নাই, সব সময়ে এই দুর্গ-শাসক
হায়াহায়া, এই টাওয়ারই অস্বস্ত রাগের বালভবন বসিয়া বিদিত। এই
রাগীও হস্তেস্তা; কাহারা এই রাগের অস্বস্তকে কেহই তাহা জানে
না; কিন্তু কখন যে কাহার উপর চির বিরোধের নিম্নেপ্ৰকাশ আসিয়া
নামিরে সেই ভয়ে সকলেই ভয়ানক। সপ্তাহই যেন দুইটি গুহ পাতিয়া
বসিয়া আছে। নাটকটির এই ভাবটিকে সুটাইয়া তুলিতে যে দ্বিতীয়
উপায় আছে, কয়টিতে তাহা হইতেছে ইহার বর্ণনায়। কথার
মাঝে সময়েই একটা কক্ষজাত, সময়েই অসমাপ্ত উক্তির বর্ণ্য মানবের
কৌ। নাটকের চরিত্রগুলি যেন ভয়ে অশ্ব হইয়া আছে। এমতাবস্থায়
বিশেষ বিবর্তে গতিয়াছে। ত্রিভাষ্যে তখন কয়টিতে চাহিয়াও বলিতে
“আমির বিবর্তে চাহার আমার এতকুলা সাহসও নাই—আমাদের হাত
কেনে কাড়ার হাত, ইহা বিরা কাহাওয়ে মোবার কাটা নাই। এই
হাতের কাহা হইয়া, সমস্ত সৃষ্টি কৌ।” হিহাওয়ে হাত কাড়ার অঙ্গ কখন
কৌকোবট উল্লসিত হইতেছে তখন কোন মানুষকেই কোথা যায় না, যেন
কোন এক কক্ষের দৃষ্টান্ত এই সব কয়টিতে দেখাই একটা কাহা
জাতকে ভীতি দিলে কয়টিতে গেল। ত্রিভাষ্যে দৃষ্টের ভাষ্যটাত এই
নিম্নেপ্ৰকাশের অস্বস্তিতে সপ্তাহের মধ্য দিয়া কাহাওয়ে কয়টিতে
পাইয়াছে। (অঙ্ক ৩, ১১৮ পৃঃ) এই পেল নাটকের অস্বাস্থ্য ও ভীতির
কথা। দ্বিতীয় বস্ত্র যার পাঠকের চোকে পড়ে তাহা হইতেছে এই
নাটকের একটি মধ্য চরিত্র—ইয়েমেন—এই নিম্নের অস্বস্তিকর
দৃষ্টের বিকাশ। এতমাত্র ইয়েমেনই এই দুইটি জিনিষকে কাহা
আনন্দকে বহন করিতে বসিয়া দুইমুহূর্তে ইহা উল্লসিত দেখিত পাই।

নাটকের প্রারম্ভে ইয়েমেন যেন তাহার জায়গার বর্ণ্য কয়টিতে
পাই। যে বলিতেছে “এখানে কুছই আনন্দও যাত আসা না ছুট

উপরোক্ত নাটিকা তিনখানি প্রকাশ হওয়ার কিছুকাল
পরেই ১৮৯৯ সালে মোতারলিক কোর্ডের “It is Pity She's
A Whore নাম নাটকখানির অর্থবাদ Annabella নাম
দিয়া প্রকাশ করেন এবং নোভালিসের (Novalis)
ভাবমতী রচনাও ভূমিকাসহ প্রকাশিত করেন। কেবল
যে নাটক অর্থবাদেই মোতারলিক এলিজাবেথান সাহিত্যের
প্রতি তাহার অর্থবাদ দেখাইয়াছেন তাহা নহে। “নিষ্টিক”
সাহিত্যের প্রভাবের মত এলিজাবেথান সাহিত্যের প্রভাব
তাঁহার লেখায় বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু তা বসিয়া এলিজাবেথান কোর্ডের চরিত্র-সৃষ্টি ও
মোতারলিকের চরিত্র-সৃষ্টির পার্থক্য নিম্নোক্ত সামান্য নহে।
কোর্ডের চরিত্রগুলি এই বাস্তব-জগতের সীমা ছাড়িয়া
কোথাও বিচরণ করে না; ইহাদের জীবন বাস্তব-জগতের
জীবনকেই পদার্থ বসিয়া অস্বস্ত করিয়াছে, তাই ইহাদের
চেতনার উপর অস্বস্তিকার কোন ভাবন রহস্ত চাপিয়া
বসিয়া, ইহাদের জীবনকে পিঠিয়া ফেলিতে উদ্ভত হয় নাই;

সেদন্ত সূত্রই প্রবর্তী আছে মনে হয়। একনিঃ আদি আমার নিম্নেপ্ৰকাশ
অন্তরে এই কথাটি বসেছিল—ভগবানও তা হইতে ভ্রমতে পান নি—
যে আদি স্থান হই। বাল, আর বেশি কিছুই অগোচর হইল না। অতঃ
কালের মধ্যেই আমাদের বৃদ্ধ দিয়া মারা গেলেন। আমাদের ছুটি ভাই
কমলা—একটি অস্বস্ত হইতে পেল যে কেঁদে বসিতে পারে না যে তারা
কোথা যাই। ত্রিভাষ্যে, এখন আমি ততোধিক আর নোভেলিক
নিম্নোক্ত একা; ভবিষ্যতে আর আমার বিশ্বাস নাই।” (অঙ্ক ৩, পৃঃ ১১২-৩)
“বকালে এই বীণে আমি অন্ধের মত গিলাম; সহই আমার পথারিক
মনে হই।—কিন্তু একদিন রাতে আমি জানতে পারিলাম যে এখানে আর
কিছু নিম্নেপ্ৰকাশ আছে। পালগো ইহাও হইছিল আমার, কিন্তু পালগাম
না—(অঙ্ক ৩, ১১৮ পৃঃ) অস্বস্তের নিম্নেপ্ৰকাশ রূপেই ভবিষ্যৎ
ইয়েমেন আর সকলের ভ্রম বিবলতার দিকে চাহিয়া বলিতেছে “এখন আমার
মনে হইতে—আমরা জানি না তার পিঠি কোথায়; তবে আমি জানি
তার ‘চাঁদাওয়ে’ ঘায়ায় থাকে না—যাও, যাও, তোমরা দুজনেই
যাও, যদি তোমরাও কীপ, তা হলে আমার একটি ঘাওতে দাও—
আমি তার প্রভাব কর” (অঙ্ক ২, পৃঃ ১১৩) ইহার পরও পেল পদার্থ
অস্বস্ত ত্রিভাষ্যের অস্বস্তে ইয়েমেনকে অস্বস্তিকর নিম্নোক্ত কয়টিতে পাই।
দুইটি হস্তের পদার্থ নিম্নোক্ত পদার্থও ইয়েমেন চরিত্রের এই নিম্নোক্ত
পদার্থও শব্দের আধার, মোতারলিকের ‘ভাববিবর্তে একটি বিশেষ বস্তু
করিবার বিবর্ত।

কোন অস্বাস্থ্যবিক বিঘাতের অন্ধকারে ইহাদের চিত্রাকাশ
অন্ধর হইয়া যায় নাই। এই বাস্তব-জগতের আলো
হাওয়ার সহজজন্মে ইহাদের জীবন অবশ্যে প্রবাহিত হইয়া
চলিয়াছে; আর বসিবার কোথাও সৃষ্টি করিতেছে, তাহার
মূলও বাস্তব-জগতেরই, শক্তি-সমূহের সম্ভাতি বিঘটন
রহিয়াছে। কিন্তু মোতারলিকের নাটকের চরিত্রগুলি যেন কি
এক অস্বস্ত বিধান—(শেলির ‘Antenatal gloom’)
—লইয়া কোন নিম্নোক্ত বস্তুগোলে বিচরণ করিতেছে।
সেখানে যেন হৃদয়ের আলোক চিত্রকালের জন্তই নিবিয়া
গিয়াছে; প্রভাতের সরস বায়ু, ফুলের মধুর আবেশময় গন্ধ,
পাখীর উজ্জ্বলিত আনন্দ সঙ্গীত সব যেন কোন অতীত যুগে
ভ্রম পাইয়া দিগ্বিরিক পলায়ন করিয়াছে। এরা যেন বিধান-
পূর্য্য-সিদ্ধহারা অন্ধকারের মধ্য দিয়া ভীষণ নিম্নোক্ত কবলে
আত্ম-সমর্পণ করিতে চলিয়াছে—মুষ্টি এখানে পাপসেলের স্বপ্ন,
নিম্নোক্ত এখানে অস্বস্ত। *

* মোতারলিকের ভাব-জীবনের বিকাশ ও পরিণতির দিক
দিয়া বিচার করিতে গেলে আমরা এইখানেই তাহার প্রথম
আধায়ে সমাপ্তি দেখিতে পাই। ইহার পরই ইহার ভাব-
জীবনের একটি অস্বস্ত পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথম যুগে তাঁহার রচনায় কেবলই মানবনিম্নোক্ত একটি
নিম্নেপ্ৰকাশ ভাবরূপে সৃষ্টিয়া উঠিয়াছে এবং এইজন্য তাঁহার
সৃষ্টি মানব-চরিত্রের আমরা ব্যক্তির অস্বাস্থ্যতা ও
শক্তিহীনতা দেখিয়াছি। তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে
মানব-জীবনকে অস্বস্তের তাড়নে বসে হইয়া যুগের নিকট
আত্মসমর্পণ করিতেই হইবে। জগতের অস্বস্ত ও ভগবান
নিম্নোক্ত অস্বস্ত; ইহার মানব-জীবনের সকল প্রয়াসকে
বার্ষ্য করিতেই হইবে।

“...Those young queens imagined by Maeterlinck
who have so little will, so little self, that they are
like shadows sighing at the edge of the world”—W.
B. Yeats in Per Amica Silentia Lunae p 13.

এ প্রথম যুগের পেল দ্বিতীয় মোতারলিক জীবনে যে একটি নৃতন
শক্তি আধার পাইয়াছেন তাহা আমরা দেখিয়াছি, যেন যে সৃষ্টিতে লগন
করিতে বসিয়াছেন ও আপনার আনন্দের পিঠি দিয়া কুছ করিতে পারেন,

মোতারলিকের নাটকের এই যে অস্বাস্থ্যতা ও বিধান;
নৈরাশ্র ও অস্বাস্থ্য, ইহা অনেকের চোকেই ভাল লাগে নাই।
অনেকে ইহাকে অস্বাস্থ্য বসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন।
কিন্তু এই প্রসঙ্গে এন্, রার্ক মাহারের মন্তব্যটি প্রবাসনযোগ্য
বলিয়া মনে হয়। তিনি বলিতেছেন—

এই “অস্বস্ত চরিত্রগুলির সঙ্গে কি আমাদের একটিও
পরিচয় আছে? আমাদের মধ্যে ইহাদেরই মত কি কিছু
আমরা অস্বস্ত করি না? আমাদের সকলের মাঝেই আদম
মানবদ্বারা যে স্বভাবটি গোপন রহিয়াছে, এই চরিত্রগুলি
তাঁহাকে প্রকাশ করিতেছে—ইহার মানবদ্বারা সম্ভাতি ও
শক্তিপ্রভাববদ্ধিত সেই অস্বাস্থ্যটিকে দেখাইতেছে, যখন সে
আদম প্রাণের সহজবোধ হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই।
ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাই মানবের উদ্ভট শিশু-অত্যা-বিশেষ
বিশৃঙ্খল, অজ্ঞান, ভীষণ শক্তিপুঞ্জের সঙ্গোপে দাঁড়াইয়া
কাঁপিতেছে; এই শিশু-অত্যা জানে না কোথা হইতে সে
সাহস সঞ্চয় করিবে, তাই সঞ্চয় নিম্নোক্ত ও অন্ধকারের
মাঝ দিয়া ভীতি ও অন্ধতার মাঝ দিয়া সে কাঁপিতে
কাঁপিতে চলিয়াছে। আশা নাই বলিলেই হয় এবং
বিশ্বায্যাপারের মূল্যত মনোবল প্রতি বিশ্বাস ও ভরসা ত
একবারেই নাই।

ঠম জেমসন তাঁহার ‘ইউরোপে নবনাটক’ (১৯২০)
পুস্তকে মোতারলিকের এই প্রথমযুগের নাটকে অস্বাস্থ্য মানব-
চরিত্র সৃষ্টির জন্ত তাঁহাকে সাহিত্যে উদ্ধৃতি দিতে চাহেন
নাই। তাঁহার সমালোচনায় বেশ ভাবিবার কথা আছে;
এইজন্য আমরা তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি:
“তাঁহার নাটক আর বাহাই হোক ‘নিষ্টিক’ নহে;
ভাবা এবং চরিত্রের দিক দিয়া ইহার ‘সিরাণিক’ (বাস্তবায়ক)
বাটে। মানবদ্বারা গোপন জীবনটিকে প্রকাশ করিতে গিয়া
তারা ব্যস্তান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মানবদ্বারা
অতীত মুগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, ইহাদের সঙ্গীত গভীর অস্বস্তের

মেন যে দুঃস্বপ্নকে বর্ণন করিতে পারে ইহার আধার আদম পাইছিল।
কিন্তু ইহার সত্যকায় পরবর্তী যুগেই হইয়াছে—এইজন্য ইহাকে অস্বস্ত
যুগের বিশেষ বলিতে পারা যায় না।

ইঙ্গিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। 'মানবজীবনের জ্ঞানগিরি' হইতে মৌটারলিঙ্গ মানবের গোপন অন্তরাখ্যাকে আন্ধান করিয়াছেন। চেতনার গভীর স্তরে যে সব অপ্রত্যাশিত ও অন্ধ কামনারাশি জাগিয়া উঠে ও মিলাইয়া যায়, ইনি তাহারিগকে রূপ দিয়াছেন, জীবন দিয়াছেন। তাঁহার প্রথম যুগের নাটকের অশ্রুত আলোকে যে সব মানবাখ্যা দেখিতে পাইতেছি তাহার আলোকে পরিপালা লইয়া, একাকী যাতনাক্রিষ্ট চিত্তে চিরকালই অন্ধকারে ঘুরিয়া মরিবে। বৃহত্তর জন্ত জাগিয়া ইহারা চিরকরেই নিরুদ্দেশ হইয়া যাইবে।*

জেনসন আরও বলেন :

'যদি (প্রথম যুগের নাটকে) ভাষার 'অতুলনীয় ছন্দ, যন্ত্র বাজনাশক্তি ও স্বন্দর মানব-অন্তরের অশ্রুত সৌন্দর্যের বিকাশ লইয়াই তৃপ্ত হইতে চান তাহা হইলে নিম্নত শিশু-সৌন্দর্য এবং পরিপূর্ণ জটিলতাহীনতা ইহাদের মধ্যে পাইবেন। অবিকল্প ইহাদের মধ্যে একটি অভিব্যক্তি নাটকীয় রীতি দেখিতে পাইবেন, বাহার সহায়তায় অন্তরাখ্যার গভীরতম অশ্রুতবল সঙ্গীতে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে শক্তির সন্ধান, জীবনে গৌরবোন্মেষের সন্ধান, অতীন্দ্রিয় বিশ্বস্ততার গভীর বিশ্বাসের সন্ধান, অথবা কোন গভীর দার্শনিকতার সন্ধান করিবেন না, কারণ ইহার কিছুই এ সব নাটকে নাই।†

* "Mystical his plays are not : Symbolic they are in their language and in their characters. The words pass into symbols striving to make articulate the buried life of the soul. The past echoes in them, their music comes upon the ear bearing subtle suggestions of a deeper sense. From the "hills where life rose" M. Maeterlinck has called man's hidden self. To dim thoughts and blind longings that stir and die in the depths of being, he has given form and life. They are the souls of men who move in the half-light of his early dramas, desiring the light, doomed to wander in obscurity, lonely or suffering. For a moment they touch and in a moment are gone beyond recall." pp 195-6.

Storm Jameson :

Modern Drama in Europe

† "If you are content to value it for the exquisite cadence of its language, for its subtle power of suggestion, for dim grace of its lovely drifting

মোট কথা, জেনসন মহাশয়ের মতে শ্রেষ্ঠ সমালোচনার মাপকাঠি দিয়া বিচার করিতে গেলে মৌটারলিঙ্গের নাটকগুলি গড়াইতে পারে না। কারণ তাঁহার মতে শ্রেষ্ঠ শিল্পের উদ্দেশ্য হইতেছে, জীবনে প্রকৃত শক্তির সন্ধান দেওয়া। মানবাখ্যার অপরিসীম শক্তির সন্ধান দিতে না পারিয়া যে শিল্পী জীবনকে একটি অসহায় জন্মদে পথাবলিত করিয়া দেখান তিনি প্রকৃত শিল্পী হইতে পারেন নাই। এই কথাগুলির সারবত্তা বোধ করি সকলেই উপলব্ধি করিবেন। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁহার সমালোচনার অসহিষ্ণুতা-জনিত ত্রুটি একটি ঘটনা। তিনি বলেন এই সব চরিত্র-সৃষ্টি শিল্পীর জীবনে শক্তিহীনতার প্রমাণ ; কিন্তু আমার মনে হয় মৌটারলিঙ্গের চরিত্রের এই বিলাদ শক্তিহীনতার চিহ্ন নহে, উহা শক্তিশক্তির পক্ষে একটি বিবেচ্য অবস্থাকে নাজ সূচিত করিতেছে। বৃহত্তর জীবনের মধ্যে একটি গভীরতর আত্মপরিকল্পনের সন্ধান, অজ্ঞাত-পথের অন্ধকারে মানবাখ্যার যে জন্মদে তাহাই হইতেছে এই সব নাটকীয় চরিত্রের এবং চরিত্র প্রষ্টার বিচারের মৌলিক কারণ।

souls, you will find there the charm of perfect art and perfect simplicity. You may find, more over, a new dramatic vision in these plays where the soul's most intimate feelings pass into music. But do not search for strength or the glory of life, or a mystical faith, or any deep philosophy, for they are not there" p. 198.

Storm Jameson : Modern Drama in Europe.

মৌটারলিঙ্গ যখন এই নাটকগুলির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার প্রকট লেখা হইতে উদ্ধৃত করা হইল :

"The keynote of these little plays is dread of the unknown that surrounds us. I or rather some obscure poetical feeling within me..... seemed to believe in a species of monstrous, invisible, fatal power that gave heed to our every action, and was hostile to our smile, to our life, to our peace and our love (p. 109-10). "The problem of existence was answered only by the enigma of annihilation (p. 111)..... a disquiet legitimate enough in itself, perhaps, but not so inevitable as to warrant its own complacency" (p. 109) 'Such a conception of life is not healthy whatever show of reason it may seem to possess' (p. 112) : The Buried Temple : The Evol. Mystery 1899-1900.

আমরা দুই প্রকারের মানব-প্রকৃতি সাধারণতঃ দেখিতে পাই *। একজাতীয় প্রকৃতির মধ্যে জীবনী-শক্তির প্রাচুর্য্য এত বেশি যে তাহার সমুদয় জগতের কোন বাধাই নৈরাশ্র জাগ্রত করিতে পারে না ; এই প্রকৃতির মানুষেরা অত্যন্ত সঙ্গোমপ্রিয় এবং অনেক সময়ই ভাব-প্রবণতাহীন। জন্মকাল হইতেই ইহারা আশাবাদী, কারণ আশাকে বার্য করিতে পারে এমন কোন শক্তিকে ইহারা স্বভাবতই মানিতে পারে না। কিন্তু অপর প্রকৃতির মানুষ একটু বেশি নান্দ্রিয় অমৃতব্রতপ্রবণ ; বিশ্বজগতের অপরিসীম রহস্য নানাভাবে নির্যতই ইহাদের চিত্তকে আলোড়িত করিয়া তোলে, এবং চিত্তরীণার লক্ষ তাহাদের মস্তককে একটি হৃৎস্পন্দ

* এম, ব্রাক্স ওয়াহর যুক্তক এই শৈল্পী-বিভাগে রচিয়া মৌটারলিঙ্গের বিষয়ের কারণ ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছেন। আমি এখানে ওঁহার মতেরই সমর্থন করিয়াছি।

শামজন্তের মধ্যে আনিয়া মিলাইতে ইহাদের যে সঙ্গোম করিতে হয় তাহা স্বভাবতই "প্রথম অবস্থায় ইহাদিগকে বিশ্ব ও অবসন্ন করিয়া ফেলে। অনেক সময়, বিষাদেই ইহাদের জীবন অবগান হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু বিষাদ শেষে ইহারা যে সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয় তাহা "প্রথম প্রকৃতির মানব-কর্তা পাইতে পারে যে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সে বাধাই হোক, মৌটারলিঙ্গের চরিত্র যে দ্বিতীয় পথায়ের তহাতে কারো সন্দেহ নাই। ওঁহার অমৃতব্রতপ্রবণতার আদিকাই তাহাকে যৌবনে রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্বয় করিয়া তুলিয়াছিল। এবং এইজন্তই পরে ওঁহারে রবীন্দ্রনাথেরই মত মৃত্যু-বিভাবিকা জয় করিয়া নবীন আশা ও আনন্দের ব্যগ্নি প্রচার করিতে দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন আকস্মিক নহে, ইহা চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশেরই পরিণাম বলিয়া জ্ঞানাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। — জেনসন :



ইহাদের ঘিরি ঘুরিছে পৃথী নীরব নির্বিকার—

—গল্প—

শ্রীশৈলজানন মুখোপাধ্যায়

প্রাক্তন তেতলা ব্যারেড্‌। ব্যারেটি গৃহস্থ পরিবার
মেয়েছেলে লইয়া সেখানে বাস করে।

একই ছাদের নীচে মুখোপাধ্যায় ব্যারেটির সংসারের ওই
অন্তঃনিম্ন মাঠে, কিছু কেষ্ট কাহারও খবর পায় না। বহু-
বিচিত্র জীবনের দ্বারা দিনের পর দিন গড়াইয়া গড়াইয়া চলে।

সকাল-সন্ধ্যা ব্যারেটি উমান্ একসঙ্গে ধরানো হয়।

কলার ধোঁয়া বাহির হইবার পথ পায় না। এ-থরের
ধোঁয়া ও-থরে গিয়া, ও-বাড়ীর ধোঁয়া এ-বাড়ীতে আসিয়া
চারিদিক একেবারে গুলুকার করিয়া দিয়া সিঁড়ির কাছে
কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে। ব্যারেটি বাড়ীর
অধিকাংশ পুরুষ ব্যাটীছেলেয়া আপিস-কারখানায় চাকুরি
করিতে যায়, মেয়েরা ভাত রান্ধে, কাপড় কাচে, ঘর-সংসারের
কাজকর্ম করে, ছেলেপুলের মা হয়। ছোট ছোট

ছেলেমেয়েরা কখনও সিঁড়িতে, কখনও ছাদে ছুটছুটি
দৌড়াইয়া দৌড়িয়া বেড়ায়। ক্রিরিগুয়ালা সরাসরি সিঁড়ি
খরিয়া উপরে উঠিয়া আসে। অগভীরতা, কাগাকাতি,
কলহ-কোলাহল বাহা কিছু হয় যথের ভিতরেই হয়। বাহিরে
শুধু দেখা যায়, প্রত্যাহ বৈকালবেলা অল্পবয়সী বাড়ীর
বৌ-ঝিরা কাপড় ছাড়িয়া চুল বাঁধিয়া রাস্তার দিকের
কোণের গায়ে কুঁকিয়া পড়িয়া পথের উপর লোক-চলাচল
দেখিতেছে।

তিন নম্বর ব্যারেডের কালীচরণের কাজকর্ম কিছু
নাই। বুড়া বাপ যৌবনে সন্দেহিত করিয়া কিছু অর্ধগণ্ড
করিয়াছেন, এখন জরাজীর্ণ বর্দ্ধকো পেপন ভোগ
করিতেছেন। তাঁহারই একমাত্র পুত্র কালীচরণ—বয়স
প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ, গায়ের রং কালো, বটে-বাটো—চরম
মাছটি, চেঁহারা বেশিলে মুপেক্ষের ছেলে বলিয়া মনে
হয় না। তা না হোক, কিছু ওই কালীচরণই শুধু একমাত্র
মাছ, যে, এই ব্যারেটি সংসারের যোগ্যত্ব একটুখানি

বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। সকাল হইতে রাত্রি
পর্যন্ত এই তাহার একমাত্র কাজ। এক নম্বর হইতে
ব্যারেটি নম্বর পর্যন্ত সর্বত্রই তাহার অবাধ গতি।
কিন্তু পুরুষদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক তাহার—একরকম
নাই বলিলেই চলে। মেয়েদের লইয়াই তাহার কারবার।
মেয়েদের মত করিয়া কথা বলে, মেয়েদের মত হাঁটে,—চল-
চলন হাব ভাব সবই তাহার মেয়েদের মত।

ছোট লোক বলে, ভগবান তাহাকে মেয়ে গড়িতে গিয়া
পুরুষ গড়িয়াছেন।

ছেলেগুলা ক্ষেপায়। দেখিতে পাইলেই ডাকে, 'ও
কালিদাসী?'

কিন্তু কালীচরণ সেরিক জুকেণ করে না। সে আপনার
কাজ লইয়াই বাস্ত।

সেদিন সে চার নম্বর গিয়া ডাকিল, 'কি গো, মাসীমার
কি হচ্ছে?'

রাস্তাঘরে বসিয়া মাসীমা ময়সা মাঝিতেছিলেন। বলিলেন,
'এই যে বাবা, এসো।'

'ময়সা মাঝছেন?' বলিয়া কালীচরণ তাঁহার কাছে
গিয়া বসিল।

বলিল, 'দিন চাকা-বেলুনটা, আমি বেলে দিই, আপনি
ভেজে নিন।'

এই বলিয়া নিজেই চাকা-বেলুন টানিয়া লইয়া কালীচরণ-
লুটি বেগিতে আরম্ভ করিল। অল্প কেষ্ট হইলে মাসীমা
নিষেধ করিতেন, কিন্তু কালীচরণকে নিষেধ করা বুঝা। সে
বলিবেই।

ঠিক মেয়েদের মত লুটি বেগিতে বসিয়া মুখ নাড়িয়া
নাড়িয়া কালীচরণ বলিতে লাগিল, 'আপনার বৌমাগো—
মাসীমা, বলি, সব কাজই শিখলো, শুধু এই লুটি বেলানি ছাড়া।'

মাসীমা বুঝিতে পারেন নাই। ভাবিয়াছিলেন তাঁহার
নিজের বৌমার কথা। বলিলেন, 'কেন বাছা, বৌমা ত
আমার লুটি বেলেতে জানে।'

কালীচরণ, মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিল, 'আ-ময়ন!
মাসীমা বড় আড্ডে বোকে! বৌদিদির কথা বলি নি, বলছি
আমাদের বৌটার কথা। বিতা, বিতা—আমার অজাদিনী!
হলো ত' এবার। খায়াপ কথা না বললে আর—হ'।'
বলিয়া কিছু করিয়া একবার হাসিয়া লজ্জায় যেন একেবারে
মরিয়া গিয়া কালীচরণ বাড়ি হেঁট করিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া খুব
জোরে-জোরে হাতের বেলুনটা চালাইতে লাগিল।

মাসীমা বলিলেন, 'না বাছা, বুঝতে পারি নি।
তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, তাই। কিছু জানে না মাসীমা! মেয়েদের হুঁচুল
পড়ে শুধু পান গাইতে শিখেছে, আর সেলাই কন্ডে জানে।
বাধের বাড়ী থেকে কিছু শিখে আসে নি মাসীমা, আমিই সব
হাতে ধরে' ধরে' শেখালাম। বলি হি'জর ঘরের বৌ, মেয়ে-
মানুষের বা কাজ তা বরি না শিখি'ব' পোড়ারমুখী.....'

মাসীমা মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিলেন। বলিবার
মত আর কোন কথা তিনি খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না।

কিন্তু কালীচরণকে কিছু বলাইতে হয় না, সে নিজেই বলে।

বলিল, 'তবে শুধু মাসীমা, আপনার পেটে মাসীমা থাকে,
তাই আপনাকেই বলি।' বলিয়া সে চুপি চুপি বলিতে
লাগিল, 'রাগাবা! এখনও পর্যন্ত সবই আমাকে করে' দিতে
হয় মাসীমা, ও শুধু ঘর-বার করে' লোক দেখে। লোকজন
কেউ এলেই আমি হৈসুল ছেড়ে' দিয়ে উঠে পাড়াই; বাবা!
বুড়া মাঘল, চোখে কালো দেখতে পান না তাই রকে!'
.....'বিভাকে যেন বলবেন না মাসীমা!'

মাসীমা বলিলেন, 'না বাছা, তাই আবার বলে নাকি!
আজ্ঞা হাঁ বাবা কালীচরণ, পরর রাতে মনে হ'লো যেন তুমি
খুব কাঁদছ। শুধার শুধাব করে' আর মনে থাকে না।'

কালীচরণ হাসিয়া। বলিল, 'সুনেছেন তাহ'লে? বলি,
তবে শুধু মাসীমা!'

বলিয়া সেই সরে সে বলিতে শুরু করিয়াছে, এমন সময়
এ-বাড়ীর বৌ বাণীপানি তাহাদের কাছে আসিয়া পাড়াইল।

সেোহারা গড়ন, বয়স একটুখানি মোটাই বলিতে হইবে, রং
পরিষ্কার, চেঁহারা চমৎকার। আসিয়াই সে ভাতাভাড়ি
কালীচরণের হাত হইতে চাকা-বেলুন কাড়িয়া লইল। বলিল,
'ওটা, ওটা ঠাকুরপো, ওটা। ব্যাটীছেলে মেয়েদের কাজ
করে দেখলে অষ্টাদ আমার জলে' যায়। বাও সেবি, বিভাকে
চুট করে' পারিয়ে দাও গো, বাও!'

কালীচরণ এই বৌটিকে একটুখানি ভয় করিয়া চলে।
ভাতাভাড়ি সে উঠিয়া পাড়াইল। বলিল, 'দেখেছেন মাসীমা,
বৌদিদি ত' মম, মনে দখি!'

'খা' আর ঢাকানি করতে হবে না—তুমি বাও।'

বলিয়া কটমট করিয়া তাহার মুখের পানে ফিরিয়া
তাকাইতেই কালীচরণ পলায়ন করিল। বাইবার সময়
বলিয়া গেল, 'বিতা আমাদের চুল বাঁধছে, এখন সে আসতে
পারবে না মাসীমা। আমি সাত নম্বর চলালাম।'

বলিয়া সে ঠিক মেয়েদের মত হাত নাড়িতে নাড়িতে
হেলিয়া গুলিয়া চার নম্বর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া
নীচে নামিয়া সাত নম্বরে গিয়া চুকিল।—'বলি, কোথায় গো
আমার খুঁটা! কোথায়? বলি হাঁরে খুকি, তুই এই
রাস্ত্রিরহাসি কল চালিয়ে মেলাই করছিস? চোখ যে তোার
যাবে হ'লি!'

খুকি এই বাড়ীর মেয়ে। হেঁটমুখে কল চালাইয়া
সেলাই করিতেছিল। ছিপ ছিপে লগ্না মেয়েটি, সাধা
ধপ ধপে গায়ের রং, গোখর দুইটি অস্তর তীক্ষ্ণ, বুজি যেন
ত্রিভায়া পড়িতেছে। কলের ঝড় ঝড় শব্দে কালীচরণের
গলার আগুয় বোধ হয় সে সন্মিতে পায় নাই। সে যেন
তাঁহার পাশে গিয়া পাড়াইয়াছে তাহাও বোধ হ'ল সে দেখিতে
পায় নাই। সহসা মুখ তুলিতেই, কালীচরণকে দেখিয়া সে
চমকিয়া উঠিল।—'সরনাশ! না বলল-করে কাছে এসে
পাড়িয়েছে? আমি ত' ঢাকো উঠেছিলাম।' তাখো ত',—
না বাপু, কথা কয়ে যাবে চুকতে হাঁ!'

কালীচরণ তাহার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিল,
'আর ছাকরা করতে হয় না পোড়ারমুখী।' চেঁচিরে চেঁচিরে
থরে এলো ঢুকানাম, সারা ব্যারেডটা হস্ত সন্মতে পেয়েছে,
আগ তুমি সন্মতে পাও নি? ময়ন আর কি!'

খুকি তাহার মুখের পানে তাকাইয়া হাসিয়া বলিল, 'কলের শব্দ হজিল যে!'

'কি হ'লো কি বাবা কালীচরণ, গগড়া কিসের?' বলিয়া খুড়ীমা গুঁচ কুকিলেন।

কালীচরণকে বলিতে হইল না। খুকিই বলিল,—'আচ্চকা রাতীতবে দেখলে বাপু আমার গা ছম্‌ছম করে।—জাখো ত' মা, কালীমা একেবারে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে; কলের শব্দ কিছু শোনাও যায় না ছাই—!'

খুড়ীমা বলিলেন, 'ও! এই! তবে এমন চোঁচাছিল কেন মেঘোঁরমুখী?'

খুকি বলিল, 'বেশ করব আমি চোঁচাব, তোমার কি!' খুড়ীমা বলিলেন, 'সবই ওর অনাছিন্তি বাবা কালীচরণ, বরের ছুনি চিঠি আসতে দেরি হয়েছিল ত' কি রকম করলে দেখলেন না?'

মিক্‌ করিয়া একবার হাসিয়া খুকি বলিল, 'না, করবে না!'

খুড়ীমা আর সেদিকে তান দিলেন না। বলিলেন, 'এসো বাবা এসো কালীচরণ, হুটো গল্প কর, তুমি এলেও তাও দশবের কথা শুনতে পাই!'

কালীচরণ জিজ্ঞাসা করিল, 'রাত্রাবায়া নেই খুড়ীমা?'

'না বাবা, ওববার বিচুড়ি রাত্রা হয়েছিল, তাই আবার গরম ক'রে দিলাম, সকাল সকাল আভ আমাদের সব খাওয়া হয়ে গেছে। এসো!'

কালীচরণ খুকির দিকে তাকাইয়া বলিল, 'বা নামে খুকি, চার নম্বরের সেই মুটুকি বৌদি—সেই ডাকাটাত, তোকে একবার ডাকছে, যা।' অন্নি 'আমাদের বিভাকেও একবার ডেকে নিয়ে যা তাই, একলাটি আছে, চুল বাঁধছিল বেখে এলাম, এতক্ষণ হ'য়ে গেছে। যা না লজী বিদি আমার!'

খুকি জিজ্ঞাসা করিল, 'রাত্রে চুল বাঁধছিল? কেন?'

রাত্রে চুল যে বাঁধতে নেই কালীমা!'

'তা জানি।' বলিয়া কালীচরণ একবার খুকির দিকে একবার খুড়ীমার দিকে তাকাইল। বলিল, 'ওর কথা আর বোসো না খুড়ীমা, শোনো তবে চুল-বাঁধার বিস্তার

শোনো। চুল একবার ও বেঁধেছিল। বোঁপাটা দেখে আমার পছন্দ হোলো না, বললাম, 'ও কি বোঁপা হয়েছে? কেন, বিড়নি কবতে পারোনি?' বাসু, আর যায় কোথা! ওই না শুনেই হয়ে গেল রাগ।' ফস্‌ ক'রে বোঁপাটাকে হাত দিয়ে টেনে খুলে ফেললেন। বললাম, 'ও কি হোলো?' বাসু, আর মুখে রা নেই! আছা, অজ্ঞাটাত কি এমন বলেছি কই তুমিই বল ত' খুড়ীমা, ওই অতবড় মেয়ে, আঁঠু বাদ কাণ পাঁচটা ছেলেসে বা হবি,—বিড়নি বাঁধতে জানে না গা!.....খেবে কি আর করি, বললাম, 'এসো, বসো এইখানে।' ব'লে দরদার থিলু বড় ক'রে নিজেই দিলাম বিড়নি পাকিয়ে.....' বলিয়াই জিব কাটায়া লজ্জায় কালীচরণ হাসিয়া একেবারে মুচুচুটি! বলিল, 'বা খুকি, যা না ভাই, ওকে নিয়ে যা তুই একবার চার নম্বরে।'

খুকি বলিল, 'আমায় দাঁড়িয়ে দিতে হবে কিন্তু।' সিঁড়ি দিয়ে একা বেতে আমার ভর্য করে; ইয়া—!'

'সুখো রাত, ইলেক্ট্রিকের আলো, ভর্য করে কি রে? চুল তবে তোকে দাঁড়িয়েই দিয়ে আসি।' বলিয়া কালীচরণ তাহাকে ধাক্কাইয়া দিতে গেল।

বাহির হইতে খুকির গলায় আওয়াজ শোনা গেল; সে বলতেছে, 'তুমি জানো না কালীমা, চার নম্বর থেকে আসছিলাম সেদিন, সিঁড়িতে দেখি এক মিন্‌সে দাঁড়িয়ে আছে, আমায় দেখে আর মড়তে চায় না। আমি ত' ভয় কাঠ! ভাগ্যিস তোমাদের দরজাটা খোলা ছিল। ছুটু গিয়ে চুকলাম তোমাদের বাড়ীতে।—ইয়া, জানো না ত' মেয়েমানুষের কি জাগা তা যদি জানতে—!'

ব্যাবেরে একবয়সী মেয়ে আরও 'অনেক আছে, কিন্তু কেহ কাহারও খবর বড় একটা রাখে না। যে তিন জনের কথা একজন বলিলাম, মাত্র এই তিনজনকে প্রায়ই একসঙ্গে দেখা যায়।—তিন নম্বরের কালীচরণের বৌ বিভা, চার নম্বরের বাবা আর সাত নম্বরের খুকি। এই তিনজনের ভাব বেন একটুখানি বেশি। ভাব হইবার কারণ হয়ত অনেক থাকিতে পারে কিন্তু একটা কারণ এই, যে, ছেলে

কাহারও হয় নাই, অথচ ছেলে হইবার বয়স সকলেরই হইয়াছে।

তবে কালীচরণের ডাক্তার-বৌদির বীণা সেখা বিশ্বাস করে না। কালীচরণ এই কথাটাই সেদিন তাহাদের বলিতেছিল। 'বীণা বলিল, 'না গো না তুমি জানো না। তা নয়। আমাদের তিনজনকে এত ভাব কেন বলতে ত' পারলেন না। আমি বলি শোনো। আমরা তিনজনেই বুব স্ত্রন্দরী ব'লে।'

স্ত্রন্দরী বলিয়া গর্ভ তাহার চিরকালের। বলে, 'আমায় ভাই যে স্ত্রন্দরী না বলে তার ওপর সত্যিই আমার ভারি রাগ হয়।'

বিভা স্তম্ভ হাসিয়া বলে, 'কেউ যদি না বলে ত' তাকে কি তুই জোর ক'রে বলারি?'

বীণা বলে, 'কেন, আমি কি স্ত্রন্দরী নই নাকি, যে আমায় জোর ক'রে বলতে হবে? আছা তুইই বল না বিরা, আমি স্ত্রন্দরী নই?'

বিভা তাহার মুখের পানে তাকাইয়া একটুখানি হাসিল।

বীণা বলিল, 'খাসি নয় বিভা, ছেলেবেলায় আমার মা বলতো—'মেম'-সাহেবের মত মেয়ে আমার, সায়েবদের সঙ্গে বিয়ে দেব। তা মাইরি বলছি, এই খুকিটার মত পারের যদি আমার রং হতো, তাহ'লে সায়েবেরা এদিন আমার ঘরে'নিয়ে পালাতো।'

কথাটা শুনিয়া 'বাবা রে!' বলিয়া খুকি এমনভাবে চোঁচাইয়া উঠিল,—মনে হইল বেন সত্য-সত্যই তাহাকে সাহেবে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে।

খুকির ব্যাপার দেখিয়া 'বীণাও 'আচ্চকা ঢমকিয়া উঠিয়াছিল; রাগিয়া কটমট করিয়া খুকির মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'আ-মর! চং দেখে আর বাঁচিলে, স্রাকো হারামজাবী, ওই জুতো তোকে দেখলে আমার অষ্টাধ জলে যায়। তুই ভাই বা আমাদের কাছ থেকে। না কি বল বিভা!'

বিভার মুখে কথা নাই। কথা কহিবে কি, সে তাহার 'কিছর ছুঃ লইয়াই দিগারদি মনগুণ!

কেই আর কোনও কথা বলে না, সকলেই চুপ্‌!

বিভাই প্রথমে কথা কহিল। সোজা হইয়া বসিতে গিয়া ঠাঁয়ের কাছে হাত দিয়া একবার 'উঃ' করিয়া উঠিল এবং রান একটুখানি হাসিয়া বলিল, 'ভয়ানক সেগেছে ভাই, কি করি বল দেখি বীণা?'

বীণা জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন লা, লাগলো এমন?'

বিভা বলিল, 'আর বলিস্‌ কেন ভাই, সবাই বলে ওর রাগ নেই অভিমান নেই, আমিও তাই ভাবতাম, কিন্তু বাপু রে বাপু, কাল বে-মারু' আমায় মেরেছে—এই জাখ'না ভাই, এইখানটায় একেবারে—'

কথাটা বীণা তাহাকে আর শেষ করিতে দিল না। স্পষ্ট কথা বলা নাকি তাহার চিরকালের অভ্যাস। বলিল, 'কে মেরেছে? তোরা বর? না ভাই বিভা, ও-কথা আমি ষ্টকে দেখলেও বিশ্বাস করব না। তোর মিছে কথা।'

বিশ্বাস করা অবশ্য কঠিন। খুকিও মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

বিভা একটুখানি অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই তাহার রাগটা গিয়া পড়িল খুকির উপর। বলিল, 'আমায় দেখে তুই এমন হাসিস্‌ কেন লা? তোর আমি কী করেছি?'

'করাব আবার কি? বা-রে, হাসি পেলে মানুষ হাসবে না? কালীমা মেরেছে? মারতে ও জানে না?'

বলিয়া হাসিতে হাসিতে খুকি একেবারে গড়াইয়া পড়িল।

বীণাকে সন্ধ্যা করা ছাড়া আর উপায় নাই। বিভা বলিল, 'জাখ' লো জাখ' বীণা জাখ'। মারতে বৃষ্টি এক

তোরা বর ছাড়া আর কেউ জানে না?'

'না লো না, সবাই জানে।' বলিয়া বীণাও হাসিল। হাসিয়া খুকিকে বোথ করি সে একটা শব্দ কথাই বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বিভার অদৃষ্ট মন্‌, কথাটা তাহার মুখ হইতে বাহির হইবার পূর্বেই তিন নম্বরের একটা ঘুমুঘুমির পক্ষে কালীচরণের ডাক শোনা গেল।—'বলি আ মাসীমা, আমাদের বিভা রয়েছে ওখানে? একবার 'পাঠিয়ে দেবেন ত!'

খুকি হাসি তখনও থাকে নাহি। হাসিতে গেলেই ডাগর ডাগর চোখ চুইট ত'হার জলে ভরিয়া যায়। 'আল দিয়া চোখ মুছিয়া বলিল, 'ওই শোনে বাণা-মোদি! মেয়েছিল কি না ভিজ্ঞাসা করব?'

'দুঃখের। কাল থেকে কথা কহিতে না পেয়ে মরছেন' নেন।' বলিয়া বিরক্ত হইয়া বিভা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পাঁড়াইল। খুকির পানে কিরিয়া তাকাইয়া বলিল, 'ক'ব না কি ভিজ্ঞাসা করবি? লজ্জা সরম তোর যে নেই তা আমার জানি। না ভাই, খুকি এলে আর আমি আসব না তোর এখানে।' বলিতে বলিতে বোধ করি রাগ করিয়াই বিভা সেখান হইতে চলিয়া গেল।

এত বলিয়াও বেচারা বিভা তাহার স্বামীকে আর কিছুতেই পারিয়া ওঠে না।

কালীচরণ তাহার নাক মলিয়া কান মলিয়া প্রতিজ্ঞা করে, যে, এবার সে ঠিক বাধা বলিয়া দিবে তাহাই করিবে, কিন্তু ক্ষতীভাবক বাইতে না বাইতেই, কালীচরণ আবার যে কে দেই! আবার ঠিক তেমনি করিয়া কাগড়ের আলোটা গায়ে দিয়া মেয়েদের মত হাত নাড়িতে নাড়িতে হয় বীণাদের বাড়ীতে নর পুত্রদের বাড়ীতে গিয়া হাঙ্কির!

হাতজোড় করিয়া সজলচক্ষে বিভা বলে, 'দোহাই তোমার ছুটি পায়ে পড়ি' তুমি চার নম্বর আর সাত নম্বর ছাড়ি' তোমার যেখানে পুশি যোয়ে।'

কালীচরণ বলে, 'কেন, আর ত' আমি গিয়ে গল্প করি না। গল্প করা একদম ছেড়ে দিয়েছি।'

'তবে বাও কি করে মরবে?'

কালীচরণ বলে, 'ভাখো পরের উপপার একটুখানি করতে হয়। এটা-সেটা কাজকর্ম করে দিই, ওরা আমার সব ভালোবাসে।'

বিভা বলে, 'ছাই বাসে। তোমার দেখলে সব হাসাহাসি করে। কেন, পুরুষ বেটাগুলো—মেয়েদের কাছে কাছে গুরে বেড়াতে, মেয়েদের কাজ করতে তোমার লজ্জা করে না?'

কালীচরণ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া শুধু তাহার মুখের পানে তাকাইয়া থাকে।

বিভা বলে, 'আর যদি কোনোদিন যাবে'ত' আমি গলায় দড়ি বেঁধে মর ত' কোনোদিক দিয়ে পলাব।'

কালীচরণ ভয়ে একেবারে কাঠ হইয়া যায়। তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া দয়া হইবে কি, বিভার সর্দার জলিয়া ওঠে। বলে, 'ভগবান তোমায় কেন যে পুরুষ মানুষ' করে পাড়িয়েছে তাই ভাবি। বাবারে বাবা! এইবার আমার মরণটা হ'লে আমি বাঁচি, আমার হাড় জুড়োয়।'

মুখে তাহার একদম পরে কথা ফুটে। বলে, 'বালাই মাটি, ছি, ওই কথা কি মুখে আনতে আছে বিড়ু? আমি আর যাব না, বলছি, দেখো তুমি—'

বলিয়াই সে তাহার কাছে সরিয়া গিয়া একটুখানি আঁদর করিবার-কতই বোধ হয় হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিতে যাইতেছিল, বিভা তাহাকে এক স্বাকামি দিয়া সজোরে চেলিয়া ফেলিয়া দিল। বলিল, 'ধবন্যর তুমি আনাথ ছ'তো না বলছি! গা আমার বিন্ বিন্ করে।'

'ভাবিল, হয়ত' একটু রাগিবে, কিন্তু কালীচরণ নিষ্কার। দেখিল, চোখ দুইটা তাহার জলে ভরিয়া আসিয়াছে, মুখে সঙ্কপ নিমিত্ত চিহ্ন।

বিভা আর সহ করিতে না পারিয়া স্নানঘরে গিয়া ঢুকিল।

সেখানেও রক্ষা নাই। স্বামী তাহার পৃষ্ঠাতে গিয়া পাঁড়াইয়াছে।

ইচ্ছা করিয়াই বিভা সেদিকে আর কিরিয়া তাকাইল না। যত্নের এককোণে কলার গদার কাছে বসিয়া উদান ধরাইবার গুজ কলসা বাঁহিতে লাগিল।

ছোট ছোট কলসার টুকরাগুলি সে বাছিয়া বাছিয়া ছোট একটু চূপড়ির উপর রাখিতেছিল, ফস করিয়া পিছন দিক হইতে চূপড়িটা কাড়িয়া লইয়া কালীচরণ কলসা বাঁহিতে বসিল। বলিল, 'না, তোমাকে আজ আমি আর কাজ করতে দেবো না বিড়ু, তুমি রাগ করো—'

বিভার আশ্রয়ভক্ত জলিয়া উঠিল। কলসা-ভাড়া ছোট হাতুড়িটা পড়িয়াছিল তাহার হাতের কাছে। মুখে আর

কোনও কথা না বলিয়া তৎক্ষণাৎ সে তাহাই তুলিয়া লইয়া নিজের কপালের উপর এমন জোরে এক থা বসাইয়া দিল যে, বেধিতে দেখিতে কাঁচা রক্তে তাহার সমস্ত মুখখানা ভাসিয়া গেল। কাপড়ের বুটে রক্তটা সে একবার মুছিয়া লইল মাত্র, মুখ দিয়া একটি কথাও সে উচ্চারণ করিল না।

কিন্তু পে না করুক, করিল কালীচরণ। সে একেবারে মাথা চাপড়াইয়া বুক চাপড়াইয়া হাং হাং করিয়া জল আনিয়া ভাড়া আনিয়া টিন্‌চার আইজনের শিশি আনিয়া ক্রীড়িয়া কাটিয়া গোলমাল করিয়া একটা হৈ চৈ কাও বাধাইয়া তুলিল। বিভা তাহার পায়ে ধরিয়া হাত জোড় করিয়া মুখে চাপা দিয়া কোনোদিকমেই তাহাকে থামাইতে পারিল না।

কুড়া বাপ লাঠি ধরিয়া হাত-ভাইতে হাত-ভাইতে বাহিরে আসিয়া পাঁড়াইল। বিভা চুপি চুপি স্বামীকে তাহার মিনতি করিয়া বলিল, 'ওগো তোমার পায়ে পড়ি, তুমি বল যে, আমি দোষ করেছিলাম, তুমি মেরেছ।'

কিন্তু স্বামী তাহার সে মিনতির অর্থ বুঝিল না। এদিকে গোলমাল শুনিয়া চার নম্বর হইতে মাসীমা আসিলেন, বাণা আসিল, খুকি আসিল, স্নাত নম্বরের ছোট একটু ছেলে আর একটি নোলক-পরা মেয়ে আসিয়া পাঁড়াইল, এবং তাহাদের সকলের স্বত্বই কালীচরণ ফস করিয়া বলিয়া বলিল, 'হাঁ, তা আমার বল না! দোষ তুমি করনি তবু তোমার দোষ দিয়ে বলি কিনা আমি মেরেছি!'

খুকি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মাসীমা বুদ্ধিতে পারেন নাট। ভিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হয়েছে বাবা কালীচরণ?'

কালীচরণ বলিল, 'তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি 'মাসীমা আমি কিছু' করিনি, শুধু-শুধু, বলা নেই কওয়া নেই, কাছে গিয়ে দাড়িয়েছি আর বাস, কলসা-ভাড়া হাতুড়ি দিয়ে—এই ভাখো মাসীমা, বৌদি এসে তুমিও দেখে যাও, আর একটু হ'লে কি সন্দেহ না যে হ'তো—' বলিয়া বিভার মাথার কাপড়টা তুলিয়া কপালের কাটা পাশটা কালীচরণ ভাল করিয়া দেখাইয়া দিল।

তাহার পর দেখা যায়, বিভা আর সহজে ঘর হইতে বাহির হয় না। সংসারের কারিকর্ম করে আর পড়িয়া পড়িয়া শুধু কাঁদে। কাপড় জামা ময়লা, মাথার চুলে তেল নাই, মুখখানি দ্বান। কেহ ডাকিতে আসিলে সর্দার দরজায় বিল বন্ধ করিয়া দেয়।

ভাল ভেলের শিশি হইতে ভেল বানিকটা বাটিতে চালিয়া কালীচরণ তাহার কাছে গিয়া পাঁড়ায়। বলে, 'এসো লজী মণিক আমার—'

বাটিবদ্ধ তেল বিভা মেয়ের উপর উটাইয়া ফেলিয়া দিয়া বলে, 'তুমি যাও।'

কালীচরণ ভয়ে-ভয়ে বলে, 'আমি ত' আর কারও বাড়ী যাই না বিভা।'

বিভা বলে, 'যোয়ে।' কালীচরণ তখন ক্রীড়িতে বসে। ঠিক মেয়েদের মত করিয়া চোখে কাপড় দিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদে আর বলে, 'ও মা গো, তুমি আজ কোথায় বইলে গো!'

বিভা উঠিয়া পাঁড়াইয়া তাহার কাছে গিয়া চড় চড় করিয়া তাহার হাতে ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া দিয়া বলে, 'বাহিরে কীদোগে যাও।'

এখনই হয়ত কি করিতে কি করিয়া বসিবে ভাবিয়া কালীচরণকে চুপ করিতে হয়।

কিন্তু অল্পময় অল্পময় সমানে চলিতে থাকে।

বিভাও তখন কারণে অকারণে ইচ্ছা করিয়াই এমন সব কাণ্ড করিতে শুরু করে বাহাতে মায়ের রাগ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু কালীচরণকে বিধাতা যে কি দিয়া তৈরী করিয়াছেন কে জানে, রাগ করা দুই-র-কথা, মুখ দিয়া একটা শব্দ কথাও সে উচ্চারণ করিতে পারে না।

অথচ এমন করিয়া দিনে পর দিন একসা ঘরে বসিয়া কানটেনো অসম্ভব।

পাঠনির পরে বিভা সেদিন তাহাদের সদর দরজার একটি কপাট একটুখানি ফাক করিয়া মুখ বাড়াইয়া

ভাবিতছিল, বীণার কাছে যাইবে কি না। মনে হইতছিল, সে নিজেই যেন 'অপরামিতি'। স্বামী তাহার ভৈরবকম বলিয়া সকলেই যেন তাহাকে একটুখানি রূপার ঢাকে দেখে, চোখের অভঙ্গ হইলে সবাই হয়ত' এই লইয়া হাসাহাসি করিতে থাকে।

শুকি অনিবেছিল বীণার কাছে। বিভা তাহাকে দেখিতে পায় নাই। সিঁড়ির উপর হঠাৎ তাহার গলার আঙুল পাইয়া সে চমকিয়া উঠিল।—‘এই যে লো তুই বেরিয়েছিস বিভা, আর না।’

অতদিন হইলে বিভা হয়ত' তাহার মুখের উপরেই মরমটা বহু করিয়া দিত, কিন্তু সেদিন সে তাহার মনকে অনেক করিয়া বুঝাইয়াছে। বীরে বীরে সিঁড়ির উপর আসিয়া বলিল, ‘চল।’

গিয়া দেখিল, বীণা তাহার সঙ্গে কথা বলে না। হয়ত' রাগ করিয়াছে।

বিভার কান্না পাইতে লাগিল। মনে হইল, এ পৃথিবীতে যেন তাহার চাঞ্চল্য বৃদ্ধির কেষ্ট নাই। অথচ এ চাঞ্চল্যের কথা কাহাকেও সে মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারে না।

অবশেষে অতিক্রমে মুখ ফিরাইয়া চোখের জল মুছিয়া নিজেই সে এখানে কথা কহিল। বলিল।—‘কথা কইবি না বীণা?’

‘বীণা বলিল, ‘কেন কইব? আমাদের ওপর রাগ করে কপালে সেদিন হাতুড়ি ঠোকা হলো—’

কিন্তু রাগ সে যে তাহাদের উপর করে নাই সে কথা সে বুঝাইতে পারিল না। বীরে বীরে বসে পড়াইয়া থাকা ছাড়া তাহার আর উপায় নাই।

বীণা যেন অস্বস্তি করিয়া বলিল, ‘আর, বাস্।’ বিভা বলিল, বীণা বলিল, শুকি বলিল।

মাগীমা কল-তালার ছিলেন, ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন, ‘জাখ, দেখি মা, এমন না হ’লে মানায়। বিভা এ ক’দিন আসিনি ত’ কেমন যেন কাঁকা কাঁকা তৈকছিল। সবাই মিলে আনন্দ কর না, এই ত’ আনন্দ করবার বয়স তোমাদের।’

কথাটা শুকির ‘বড় ভাল লাগিল। হাসিয়া বলিল, ‘ঠিক বলেছ মাগীমা।’

‘আমি ত’ ঠিক কথাই বলি বাছা।’ বলিয়া তিনি আবার চলিয়া গেলেন।

আনন্দ করিতে বিভাও আসিয়াছে। কিন্তু আনন্দ বাহার অদৃষ্টে নাই সে তাহা পাইবে কেমন করিয়া।

বীণা বলিয়া বলিল, ‘বলি হীলা বিভা, নিজেও আসবি না, আবার বরটিকেও বারণ করা হয়েছে?’

শুকি বলিল, ‘তবু তোমাদের বাড়ী নয় বৌদি, আমাদের বাড়ী যেতেও বারণ।’

বিভার মুখখানা হঠাৎ রাঙা হইয়া উঠিল। কানদুইটা আগা করিতে লাগিল। কি যেন সে বলিতে বাইতেছিল, কিন্তু শুকির কথায় তাহা চাপা পড়িয়া গেল।

শুকি জিজ্ঞাসা করিল, ‘হীলা তুই নাকি কান্দারাকে লাগি মেরেছিস? স্বপ্নজ তেলের একটা শিশিহুড়ু উজুটে কেলে দিয়েছিস নাকি শুনবু?’

বিভা আর কোনোপ্রকারেই নিজেই সামলাইতে পারিল না। ঘাড় নাড়িয়া ‘হ্যাঁ’ বলিতে গিয়া চোখ দুইটা তাহার জলে ভরিয়া আসিল।

এতকণে বীণা একটুখানি অগ্রসৃত হইয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, ‘শেষ করোছে। এমন খারীকে লাগি মাংসের না ত’ কি করবে? ও যে আর-কিছু করে না এই চের।’

বিভার কি যে হইল কে জানে, কথাটা শুনিবামাত্র নিতান্ত হেলেনাপথের মত সে তাহাদের চোখের স্বমুখেই হুঁক হুঁক করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বীণা বলিল ‘কান্না কিসের না? কাঁদিসনে।’

ইহার বেশি আর কি-বা সে তাহাকে বলিতে পারে। তাই সে নানারকমে বিভাকে হাসাইয়া একটুখানি খুশী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বলিল, ‘আর ভাই, বারান্দার পাড়াইগে আর। লোক দেখি।—কিন্তু দেখিস শুকি, তুই যেন কাউকে পছন্দ করে বসিসনে।’

শুকি একটু লজ্জিত হইয়া হাসিয়া বলিল, ‘মাঃ! তিনজনকেই বারান্দার সেলিংয়ের উপর খুঁকিয়া পাড়াইয়া।

অনতিদূরে তেতলা একটা বাড়ীর ছাদের উপর ফুটফুটে ছোঁই একটা ছেলে কোলে লইয়া হুশুশী একটা মেয়ে পান্ডাচারি করিয়া বেড়াইতেছিল। অন্তঃসারী হুহুহুহু আলো আসিয়া ছাদে পড়িয়াছে। বিভার দৃষ্টি সেইদিকেই নিবন্ধ। সে একটু কথাও বলিল না।

শুকি বলিল, ‘ও একদমেই ত’কিয়ে কি দেখেছে জানো বৌদি?’

‘কি দেখেছে?’

আঙুল বাড়াইয়া হুহুহুহুহু ছাদের সেই মেয়েটিকে দেখাইয়া দিয়া শুকি বলিল, ‘ওই মেয়েটিকে রেখেছিস, না বিভা?’

বীণা বলিল, ‘আহা, ‘অমনি একটা ছেলে যদি আমার হ’তো!’

বিভাও হাসিল, শুকিও হাসিল।

বীণা বলিল, ‘হাসিলি যে? ‘আচ্ছা বস্ ত’ শুকি,

আমাদের তিনজনের মধ্যে ছেলে কার আগে হবে?’

শুকি বলিল, ‘তোমার।’

বীণা বলিল, ‘আচ্ছা তাহ’লে ভাল। ঠিকই বলেছিস।’

শুকি হাসিতেছিল। বলিল, ‘আর যদি বিভার হয়?’

বীণা বলিল, ‘তাহ’লে হুন পাইয়ে মেরে দেবো।’

শুকি বলিল, ‘কেন, মারতে আমার দেবো কেন?’

বীণা বলিল, ‘কেনই বা দিবিনি শুনি? তোরা ছেলে কোলে নিয়ে বেড়াবি, আর আমি বৃষ্টি-চোয়ে চোয়ে দেখব? মাইরি বলছি, আমার তা সহ্য হবে না।’

বিভাকে একটুখানি হাসাইতে পারিয়াছে ভাবিয়া বীণা অত্যন্ত খুশী হইল। অতদিন ঐক্য-একটা কি কথা বলিলে সে আরও হাসে, তাহাই সে ভাবিতেছিল, এমন সময় শুকির ছোট ভাই কিরণ আসিয়া খবর দিল যে, তাহাদের জামাইবাবু আসিয়াছে। শুকি ও-বাড়ীর একমাত্র মেয়ে, স্বভাবঃ জামাইবাবু মানে—শুকির বর।

শুকি একেবারে আনন্দে আটখানা হইয়া গিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘এসেছে? কখন? এলো? এজনি? তুই দেখিলি? আমার ডাকছে?’

একদমে এতগুলি প্রশ্নের মধ্যে কোনটার জবাব দিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া বেচারি কিরণ একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া বলিল, ‘হ্যাঁ,—মা বলেছে।’

‘আমি ভাই বাই।’ বলিয়া শুকি চলিয়া বাইতেছিল। বীণা বলিল, ‘ওলো থাম্। অত বাড়োবাড়ি ভাল নয় বর আমাদেরও আছে।’

হাসিতে হাসিতে শুকি চলিয়া গেল।

বিভা বলিল, ‘এবার আমিও বাই। তোরা বরও ত’ আসবে আপিস থেকে।’

বীণা বলিল, ‘হ্যাঁ আসবে, কিন্তু আমি ত’ ভাই শুকি নই!’

বিভা চুপ করিয়া রহিল।

বীণা বলিল, ‘বরটিকে তোরা আচ্ছা ক’রে ধমকে দিতে পারিস না?’

হঠাৎ তাহার এক-কথা বলিবার অর্থ বিভা ঠিক বুঝিতে পারিল না, জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে একবার তাকাইল মাত্র।

বীণা বলিল, ‘তুই তাকে লাগি মেরেছিস না কি করেছিস, এ-সব কথা ও যেখানে-সেখানে বলে বেড়ায় কেন? বারণ করে দিস। ছি!’

বিভা আবার একটুখানি হাসিয়া অন্তরিকে মুখ ফিরাইল।

এতদিন পরে বাড়ী হইতে বিভা আজ বাহির হইয়াছিল দেখিয়া কান্দীচরণ অত্যন্ত খুশী হইয়া কি যেন বলিতে বাইতেছিল, কিন্তু বিভার মুখের চেহারায় দেখিয়া কথাটা তাহার মুখেই আটকাইয়া রহিল।

কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল না, তবু সেদিন কি ভাবিয়া বিভা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল,—‘তোমার কি বন্ধ-বান্ধব কেউ নেই?’

কান্দীচরণ বলিল, ‘কেন থাকবে না? অনেক আছে।’

বিভা বলিল, ‘কই একটাও ত’ দেখি না!’

‘কেস, কুতো, পিটু, মাগকে, বসিক, ভোলা—’

বিভার অষ্টাদ অলিয়া গেল। বলিল 'মুখে আগুন। ওই ছেলগুলো তোমার বন্ধু! ওই যে গুলো রাস্তায় নাট, খোঁষার?'

কালীচরণ বলিল, 'বা! ভোলা, মাগকে ত' আমার বড়েনী। আর তাছাড়া—আমাদের অমরদা। সে ত' মত্ত মিনয়ে গো! তার কাছে গিয়েও ত' আমি গল্প করি।'

বিভা বলিল, 'এবার থেকে তারই কাছে যোগো। ব্যাপ্তকে ব্যাপ্তকে ঘুরে বড়ি বেড়াও ত' আমি মরব তাহলে—এই আমার শেষ কথা বলে দিচ্ছি।'

ছেলোছায়েবর মত বাড় নাড়িয়া কালীচরণ বলিল, 'বেশ।' বলিয়া সে তাহার কাছে আগাইয়া আসিয়া ভয়ে ভয়ে হাতধানি, বাড়াইয়া বিভার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'আমার গপের রাগ তোমার ভেতরে ত' বিভা? লক্ষ্মী রাণী আমার।'

বিভা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'হ্যাঁ ভেদেছে। কিন্তু তোমার ওই অমরদা না কি বললে, গুরু সঙ্গে চলিষকটা যদি না থাকোত' আমি আবার রূপ করব।'

কালীচরণ বলিল, 'অমরদার একটা কলের গান আছে বিজু, তুমি যদি শুনতে চাও ত' আমি আনতে পারি।'

বিভা বলিল, 'এনা।'

পরদিন হুগুপে দেখা গেল, একজন কুলির, মাথার উপর কাঁকায় বসাইয়া একটি গ্রামোফোন ও কতকগুলি রেকর্ড লইয়া কালীচরণ বাড়ী ঢুকিতেছে। কুলির মাথা হইতে কাঁকা নামাইয়া কালীচরণ, হাঁকিল, 'বিভা, বিভা, দেখে ধাত, কি এনেকি দেখে ধাত।'

বিভা গরই ছিল, দরজার কাছে একবার উকি দিয়াই সেইভাই আমার ঘরে ঢুকিল।

কুলি বিদায় করিয়া কালীচরণ বিভার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'বিজু! তুমি খুশী হ'লে না?'

বিভা একটা বই পড়িতেছিল। কথা বলিল না।

কালীচরণের বুক পিতা তাঁহার এই পূজাটিকে চেয়েন।

কথাবাদী কাহারও সঙ্গেই তিনি বড়-একটা বলেন না। সেদিন কিছু পুত্র তাঁহার কিং-আনিয়াছে জানিবার জন্ম ভিজাস্য করিলেন, 'কি এনেছি কালীচরণ, কই দেখি।'

কালীচরণ বলিল, 'কি আর তুমি দেখবে বাবা, চোখ থাকলে দেখতে।'

তিনি আর উচ্চবাচ্য করিলেন না।

বিভা তাহার হাতের বইখানা মুড়িয়া রাখিয়া বলিল, 'লোকের গ্রামোফোন নিয়ে এলে, বাজাতে জানো ত? তার চেয়ে বার তিনিম তাকেই ডেকে আনলে পারতে।'

কালীচরণের মুখখানা সহসা আমলে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। 'ভাকব? অমরদাকে ডাকব বিজু? তুমি কিছু মনে করবে না-ত?'

বিভা বলিল, 'মনে আবার কি করব? কেন?'

বলিয়াই কিছুদিন পূর্বের একটা ঘটনা তাহার মনে পড়িয়া গেল। পাহা বলিয়া পাড়ার একটা ছোকরাকে কালীচরণ প্রায়ই তাহার সঙ্গে লইয়া আসিত। শেষে দিনকতক এমন হইল যে, কালীচরণ বাড়ীতে থাকে আর না থাকে—পাহা সন্ধ্যার ঘরে ঢুকিয়া বিভার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। হাসিয়া বলে, 'গুড, এমিং বৌদি, কালীদা কোথায়?' জবাব দিলেও সে নড়িতে চায় না। বলে, 'বৌদি, তুমি গান গাইতে জানো? চুপি চুপি গেয়ে একটা শোনাও না ভাই!'

ছোঁড়াটার এই রকমের সব কথাবাদী শুনিয়া কালীচরণকে বিভা একদিন এই বলিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিল যে, আজ হইতে কোনও পুত্রম বাটাচ্ছেলে যেন তাহাদের বাড়ীর দরজা আর না মাড়ায়।

বিভা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'না, কিছু মনে করব না। তুমি ভালো! পরের তিনিম, বাজাতে জানো না, ভেদে-টেদে বাজা দিও—'

'ঠিক বলেছ বিজু, তুমি ঠিক বলেছ।' বলিয়া হাসিতে হাসিতে হাত নাড়িয়া কোমর ঘুরাইয়া সে এক অপরূপ ভঙ্গীতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তাহার পরেই অমরদার আগমন।

'অমরদা' প্রস্তুত হইয়াই ছিল। 'ভাকিবায়া ভাল মিহের ভালা পরিয়া, তুতা পায়ের দিগা, সর্গাদে এসে, মাখিয়া গ্রামোফোন বাজাইতে আসিল।'

পাশাপাশি ছ'খানি মাত্র ঘর। একটি ঘরে বুদ্ধ পিতা থাকেন, আর একটি ঘরে বসিয়া যদি গ্রামোফোন বাজানো চলে ত' বিভাকে বসিতে হয় রান্নাঘরে।

অমর আসিবারাত্র রান্নাঘরে গিয়াই সে বসিয়াছিল, অমর বলিল, 'গাখ, কালী, তুই আমার আর দালা-টার বলিসনি বাপু, আমি তোরা চেয়ে বয়েসে ছোট, দেখতে অমনি বেঁটে-খাটোটি আছিস তাই লোকে কিছু বলে না; বুরলি? নইলে মেয়ে মেয়ে বেলা হয়েছে অনেক।'

বলিয়া সে নিজেই রসিকতায় নিজেই হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

হাসি খামিলে বলিল, 'বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে অমর কালীচরণ, নইলে গান শুনে অকুণি বিস্তর লোক জড়ো হয়ে যাবে।'

কালীচরণ ছুটায় তৎক্ষণে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল। বলিল, 'বাঁজাও। তুমি আরম্ভ কর অমরদা।'

'বা-রে! তুই ত' বেশ লোক দেখছি। একটি ভঙ্গলোক যে এলো বাড়ীতে ত' বোকে তোর রুটো পানই না হয় সেজে দিতে বল।'

পান সাজিবার আসবাবপত্র এই ঘরেই। সাজিয়া দিতে হইলে বোকে এ-ঘরে আসিতে হয়। কালীচরণ নিজেই উঠিয়া গিয়া পানের বাটটা হাতের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, 'এই যে দিচ্ছি অমরদা, দিচ্ছি। ভুল হয়ে গেছে, কিছু মনে কোরো না।'

'মনে করব না কিরকম? বৌ থাকতে তুই পান সাজবি কি রে। সাথে তোর বৌ তাকে অমনি করে। ডাক ডাক—বোকে ডাক, আমি তোর দাদা নই কালীচরণ, তোর বৌ আমার বৌদিদি হয়। বিয়ের পর থেকে বোকে তোর ত' আমি দেখিওনি, শুনি নাকি পুত্র-স্বন্দরী বৌ, চমৎকার বৌ—'

আমতা আমতা করিয়া কালীচরণ উঠিয়া গেল। কিছু তাহার সোভাগ্য, কিছুই তাহারে বলিতে হইল না, বিভা স্বকণ্ঠে সেই শুনিয়াছে। কালীচরণ কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া—মাত্র বিভা বলিল, 'গাখ আর বলতে হবে না, শুনেছি।'

এই বলিয়া সে লম্ভ একটুখানি হাসিয়া গায়ের কাপড়টা একবার ঠিক করিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কালীচরণের পশ্চাতে এ-ঘরে আসিয়াই সে পানের বাটীর কাছে গিয়া সম্বোধ্যে জড়োপড়া হইয়া পান সাজিতে বলিল।

অমর সেই অবসরে পকেট হইতে তাহার খোসবর-মাখানো কমলাখানা বাহির করিয়া মুখখানা তাহার মুখিয়া লইতেছিল। বিভা দৈরিক তখনও তাকায় নাই।

অমর তাহার হাতছুটি কপালে ঠোকাইয়া বলিল, 'নমস্কার বৌদি, মুখখানি একবার ভাল করে তুলন, দেখি।' দেখুন, কালীচরণ এতদিন আপনাকে ভুল বিশ্বাসে, আমি গুরু দাদা হই না, ওই আমার দাদা হয়।'

বলিয়া সেই বিপদে পান তাকাইয়া সে হাসিতে লাগিল। একসময় অনেকগুলি পান সাজিয়া সবত্র একটি ভিসের

উপর সেগুলি সাজাইয়া বিভা হাত দিয়া ভিসখানি অমরের দিকে সজোরে ঠেলায় দিয়া এতক্ষণে একবার মুখ তুলিয়া হাসিল। এবং হাসিতে গিয়াই অমরের সঙ্গে তাহার চোখো-চোখি হইয়া গেল।

অমর যেন একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, 'এবার দেখছি। বা বা বা বা, চমৎকার, চমৎকার, সত্যিই চমৎকার! বা-রে কালীচরণ, তোর ভাগ্য ভালো। এমন বৌ যদি আমার পেতাম—হেসো না বৌদি, সত্যি বলছি, তাহলে...পাখ।' কি করতাম দেখনা আর নাই-বা বলতাম।'

অমরের মুখের পানে তাকাইয়া বিভা আর-একবার হাসিয়াই মুখ নামাইল।

অমর বলিল, 'তাহলে আরম্ভ করা বাচ্। তুমি ছায়ে বৌদি, কেমন করে বাজাতে হয় শিখে নাও।' 'তুনি' বলাজি আমি কিছু মনে কোরো না।' বলিয়াই অমর তাহার গ্রামোফোনে চাবি ঘুরাইয়া মন দিতে আরম্ভ করিল।

বিভার একবার মুখ ফুটিয়া কথা-বিনিবার ইচ্ছা করিল।
ভাবিল, বলে যে,—পরের জিনিস—বাজাইতে শিখিয়াই বা
তাহার সাক্ষি। কিন্তু মুখ কান তখন তাহার রাঙা হইয়া
উঠিয়াছে, কপালে ও নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা
দিয়াছে। 'কথা তাহার আর বলা হইল না।' মুখের ঘোমটা
মাথায় তুলিয়া, মাটিতে একখানি হাত রাখিয়া, পিছনের
দিকে পা ছুটি বাঁকাইয়া সে এক অঙ্গরূপ ভদ্রীতে নীরবে
নতমুখে বসিয়া বসিয়া গ্রানোফোনের গান শুনিতে
লাগিল।

বিভা আজকাল আর তাহার উপর রাগ করে না—এই
আনন্দেই কালীচরণ আশ্বাস্য।
গ্রানোফোনটা সেই অবধি বিভার কাছেই আছে।
অমর আর সেটা লইয়া ঘাইবার নামও করে না।
কালীচরণের মুখে অমরদার স্থগাতি আর ধরে না।
রোজ রাতে আসিয়া সে বিভার কাছে অন্তরের
গল্প করে।

বিভা বলে, 'থানো। চেহারার ভাল হ'লেই যে লোক
ভাল হবে তার কি নামে।'
কালীচরণ বলে, 'তুমি জানো না বিভা, অমরদা তোমার
খুব স্থগাতি করে। দিনে নৈই রাত নৈই, অমরদার' মুখে
শুধু তোমারই কথা। কাল অমরদা আশ্রয় ভাঙতে
এসেছিল, আমি বাড়ী ছিলাম না বলে তুমি কথা কওনি,
সে আমার বলেছে। কেন বিভা, কথা কইলেই ত'
পারতে?'

নিভাত্ত সন্ধ্যাপনে বিভা একটুখানি হাসিল। বলিল,
'না, তুমি বাড়ী থাকবে না, আর আমি যার-তার সঙ্গে
কথা বলব?'

কিন্তু কথাটা 'সে' মিথ্যা বলিয়াছে। গত পঁচেনেরো-
মেকো দিন দরিয়া অমর প্রায় রোজই আসে এবং বিভা
তাহার সঙ্গে কথাও বলে।

পরদিন স্থগাতের পর, তখন সন্ধ্যাও ঠিক হয় নাই,
দিবের আলোও নিখরায়, ঠিক এমনি সময়—দেখা গেল,
তলার রবার-দেওয়া ক্যাশিশের ক্ষুভা পায়ে গিয়া নিঃশব্দে
অমর এই ভিন নবর ব্যারেকে আসিয়া ঢুকিল।

বিভা তখন তাহার খয়ের মধ্যে ইলেক্ট্রিকের আলোটা
জালিয়া দিয়া সবেমাত্র তাহার প্রসাধন শেষ করিয়া আশীর
সুখুখ দাঁড়াইয়া কপালে সিঁড়রের টিপু, পরিচেষ্ট।

দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া ছিল বলিয়া অমরকে সে
দেখিতে পায় নাই।

অমর বলিল, 'যে জন বিবসে মনের হরণে—জানো ত?'
বলিয়াই ফটু করিয়া হুইচ, টপিয়া আলোটা নিবাইয়া
দিয়া দীরে-দীরে সে বিভার দিকে আগাওয়া গেল।

অমরকণ্ঠে, বিভা কহিল, 'না, বজ্জো বাড়ীবাড়ি স্বক
করেছ দেখছি। তুমি যাও।'

অমর তাহার চোখ-মুখের চেহারা দেখিয়া বেশি দূর
অগ্রসর হইল না। 'খানিকটা তফাতে থাকিয়াই বলিল,—'না
যাব না।' অনেকদিন হ'য়ে গেল। আজ তোমার জবাব
'আমি শুভতে চাই।'

বিভা ভয়ে-ভয়ে দরজার কাছে আগাইয়া বাইতেছিল,
অমর বলিল, 'ভয় নেই। তোমার সে হুম্যানটিকে আমি
মিউনিসিপাল্‌ মার্কেটে পাঠিয়েছি একটা জিনিস কিনতে।'

বিভা হাঙ্গিল। মুহূর্ত্তি বড় চমকবার একটুখানি
হাসি। বলিল, 'হুম্যান বললে? আমি যদি রাগ করি?'

অমর বলিল, 'রাগ করবার কি আছে? তুমি যদি হও
মুন্সের মালা, তাহ'লে ত' ও-ছাড়া তার আর নাম খুঁজে
পাই না বিভা!'

বিভা একটুখানি সরিয়া গিয়া বলিল, 'তা বেশ। তাকে
না হয় পরাণে মার্কেটে, কিন্তু তোমার বিধাতকে—তোমার
মহাজ্ঞানকে—কোথায় পাঠিয়েছ? জাহাংনামে?'

অমর এবার হেসে কহিয়া হাসিল। বলিল, 'ও-সব
কথাও কি তুমি ভাবো নাকি বিভা?'

'হ্যাঁ' বলিয়া বাড়ী বাড়িয়া বিভা বলিল, 'ভাবি বই-কি!
মিস্টার ভাবি।'
'কি ভাবো?'

'তাও তোমায় বলতে হবে?' বলিয়া একবার এরিক-
ওদিক তাকাইয়া বিভা কি যেন ভাবিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস
ফেলিয়া কহিল, 'ভাবি—তোমার মত একজন মানুষকে আমি
সব জেনেচেনও এত প্রশ্নের দিলাম কেমন ক'রে? আর
কেনই বা দিলাম?'

অমর বলিল, 'প্রশ্নর আবার কোথায় দিলে বিভা?
প্রথম দিন থেকেই তোমায় আমার অন্তস্ত ভাল লাগল,
তাই আমিই জোর ক'রে তোমার কাছে আমার মনের কথা
জানিয়ে ফেললাম। কিন্তু কই তোমার মনের কথা আমি ত'
অজ্ঞ পদ্যন্ত—'

হাত নাড়িয়া বিভা বলিল, 'ধাক্কা। আর স্ফাকি
করতে হবে না। কিন্তু শোনো, আমি কিন্তু ছ'দিক'বজায়
রেখে লুকাচুরি করতে পারব না। সেসকল ছুরে বেঁচে
থাকার চেয়ে মরা ভালো।'

অমর বলিল, 'লুকাচুরি? কিসের লুকাচুরি? কার
সঙ্গে লুকাচুরি?'

'স্বামীর সঙ্গে।'

অমর হাসিল। বিজ্ঞপের ভঙ্গীতে হাত-মুখ নাড়িয়া
বলিল, 'আ! কি আমার স্বামী গো!'

বিভা বলিল, 'তাই বৃষ্টি আমার ছুঁতে একটুখানি ঝরনা
করতে চাও?'

হঠাৎ এক-কণার জবাব দিতে না পারিয়া অমর অল্প কণা
বলিয়া বসিল। বলিল, 'ধাক্কা আর তর্ক করতে পারিনে,
একটুখানি বোখাপড়া শিখে মাগো তোমার খাপস হয়ে
গেছে বিভা, যা বলতে হয় ধরে বোসো, এখন শোনো,
তুমি—'

বিভা তাহাকে কথাটা আর শেষ করিতে দিল না।
'হাসিয়া বলিল, 'ঠিক বলেছ। বাঁচতে হয় পরে বেঁচে,
এখন একবার মর ত'! কেননা? এই না?'

'আর পারি' না, আর পারি না বিভা, তুমি ভীত ছুঁ,
ভীত ছুঁ।'

বলিতে বলিতে অমর ঠিক পিছরাবদ্ধ বাঘের মত ঘরের
মধ্যে পুস্কাচারি করিতে লাগিল।

বিভা একটুখানি ভাবিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া

বলিল, 'আজ্ঞা শোনো, তুমি আমার সারাজীবনের তার নিতে
পারবে?'

এতক্ষণ পরে অমর যেন অকূলে কুলু পাইল।
তাড়াহুড়ি তাহার কাছে গিয়া বলিয়া উঠিল,—'পারব,
পারব, নিশ্চয়ই পারব।'

'না, শুধু পারব নয়, হেরে জাবো, এখন থেকে আমার
নিচে যেতে হবে।'

'যাব।'

'কোথায় নিয়ে গিতে রাখবে? নিজের বাড়ীতে ত
রাখতে পার না?'

অমর বলিল, 'নিজের বাড়ীতে কেন? শহরের মধ্যে
এমন এক জায়গায় ঘর ভাড়া নেবো, যেখানে কেউ জানবে না।
শুনবে না, আমরা ছ'জনে বেশ থাকব।'

'আমার জন্মে তুমি সব পরিত্যাগ করবে? বিয়ে ত
এখনও করনি শুনেছি।'

অমর হাসিল। বলিল, 'তোমার জন্মে কি পরিত্যাগ
করতে পারি না বিভা? সব পারি। আত্মীয়-স্বজনের কথা
বলছ—বুড়ী এক পিসিমা, দাদা আর বৌদিদি। তা
আমি যদি বাড়ী থেকে চলে যাই, বৌদিদি তাহলে বাঁচেন—
পৈতৃক বাড়ীখানার অর্ধেক ভাগ তাহ'লে আর কাউকে দিতে
হয় না। টাকাকড়ি বাবা যা রেখে গিয়েছিলেন তার অর্ধেক
ত' আমি আগেই নিয়েছি স্বতরাং বুঝতেই পারছ, বাবার
বাধা আমার কিছু নেই।'

জবাবের অপেক্ষায় বিভার মুখের পানে অমর তাকাইয়া
রহিল। দিবসের যে স্রাব আলোটি কুঁ বারাদা অতিক্রম
করিয়া এতক্ষণ পরে আসিয়া পড়িতেছিল, ইতিমধ্যে তাহাদের
কথাবার্তার মাঝখানে তাহাও কোন্ সমর মীরে দীরে
অপসারিত হইয়া গেছে। দূরের জিনিস সন্ধ্যার স্বাভাব্য
অন্ধকারে কিছুই আর ভাল দেখা যায় না। অমর আরও
একটুখানি আগাইয়া আসিল। কিন্তু অনেকক্ষণ হইতেই
মৌন নতমুখে বিভা সেই যে তাহার পাঠের দিকে একটু
তাকাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তখনও তেমনি সে চুপ কহিয়া
দাঁড়াইয়া রহিল। কোনও কণার জবাব দিল না।
'মৌনতা নাকি সম্ভবিত লক্ষ্য। মনে-মনে অমর যেন

একটুখানি ভরসা পাইল। ঘরের মধ্যে মশা ভুন ভুন করিতেছিল। আলো জ্বালার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সে দিকে দৃষ্টি দিতে গেলে অমরের চলে ন।

এতদূর পুরে যে আর নিম্নে কোনও প্রকারেই সঞ্চার করিতে পারিল না। অন্ধকারে ঘীরে-ঘীরে বাঁহা-গাখানি বাড়িয়া অত্যন্ত স্তম্ভরূপে বিভার কাঁধের উপর রাখিল। কিন্তু আশ্চর্য্য, বিভা একটুখানি সরিয়াও গেল না, মুখে একটা কথাও বলিল না। নীরব নিষ্কার্যর যেন পাখরের সুরি।

অমর তখন তাহার ডান হাত দিয়া বিভার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া সাধরে সজোরে ভরকণ্ঠে ঘীরে-ঘীরে ডাকিল, 'বিভা! বিভা! কথা কও! চল লম্বাটী আমরা চলে নাই। এখানে কি যুখে তুমি—'

এই পথান্ত বলিয়া কথাটা সে আর শেষ করিতে পারিল না। নিম্নের মুখখানা তাহার মুখের কাছে আগিয়া আনিতেই, বিভার যেন সহসা চমক ভাঙ্গিল। নিতান্ত সহজভাবে হাতখানা তাহার সরিয়া দিয়া তাড়াহাড়ি দরজার কাছে গিয়া সে হুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিল এবং অমরের মুখের পানে তাকিয়া বলিল, 'তুমি যাও, তুমি এখন যাও। কাল বকব। তুমি কাল এসো।'

বিভার ভাবনার আর অন্ত নাই!

ভাল করিয়া কথা কহিবার ভক্ত রাগে তাহাকে কালীচরণ এত সাধাসাধনা করিল, কিন্তু ভাল করিয়া কথা বলা দূরে থাকি, বার-কতক অহুগেণ কহিবার পরেই ধমক খাইয়া বেচিয়া কালীচরণ চুপ করিল।

কাল-কাল মুখে কালীচরণ জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি আবার কি যোগ করলাম বিদ্যু?'

বিভা চুপ করিয়া রহিল।

কালীচরণ বলিল, 'বলবে না?'

বিভা বলিল, 'কি বলব? চুপ ক'রে থাকবারও উপায় নাই।'

কালীচরণ আর কথা বলিল না।

অনেক রাতে একবার ডাকিল, 'বিদ্যু?'

'জাখো, অত আদর করে আমার ডেকে না।'

'এখনও জেগে আছে? বা-হে! আদর করব না?'

বিভা বলিল, 'না।'

কালীচরণ বলিল, 'খুকির বর এসেছে জানে?'

'জানি।'

'দেখেছ খুকির বরকে?'

'নাহে।'

কালীচরণ বলিয়া উঠিল, 'জাখনি? আহা, ভারি সুন্দর।

চমৎকার চেহারা।'

কথাটা সে এমন ভাবে বলিল, যেন খুকির বরকে না দেখা একটা মন্ত অপরাধ।

বিভা বলিল, 'ভারি সুন্দর তাকে কার কি বলে গেল?'

কালীচরণ একটা চৌকি গিলিয়া বলিল, 'না ভা পলিনি বিদ্যু, বনজিলাগে যে, খুকির বর আজ খুকিকে মেসে একবারে আদ-মরা ক'রে দিয়ে রেগে পালিয়েছে—তুনেছ ত?'

বিভা তাহা শোনে নাই। বলিল, 'মেরেছে? মেরে পালিয়েছে? কেন?'

কালীচরণ বলিল, 'না, সে আর তোমার শুনে কাজ নেই বিদ্যু, ভারি নোয়া কথা। মা গো মা! এদিকে ত' ছুঁড়ি দিন স্নাত 'বর' 'বর' করে, একদিন চিঠি না এলে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়ায়.....'

বিভা জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হ'লো কি, বলই না!'

'তুমি কাঁউকে বলবে না বল! কাউকে বলতে খুজীমা বারণ ক'রে দিয়েছে।'

'না বলব না।'

কালীচরণ চুপি-চুপি বলিল, 'তবে শোনে বিদ্যু!

গোপাল ব'লে একটু চোকা আছে না ভদের বাড়ীতে..... মা গো মা, কি ঘোষার কথা.....'

বিভা বলিল, 'ধাক্কা আর বলতে হবে না। বুঝেছি।'

কালীচরণদের তিন নম্বর ব্যারেকে বীণা খর কমই আসে। কিন্তু তাহার পরের দিন সকালে রানোর ঘর হইতে

বাহির হইয়াই বিভা দেখিল, বীণা আসিয়াছে। বলিল, 'ভেবেছিলাম কথা কওরা ভেরে সঙ্গে আবার বন্ধ করব বিভা, কিন্তু পারলাম না, আমার নিজেই আসতে হ'লো।'

বিভা আজ ছত্ৰদিন তাহার কাছে যায় নাই, গুদিকে খুকির বর আসিয়াছিল বলিয়া সেও আসে নাই,—বীণার রাগ হইবারই কথা।

বিভা তাহার এই না-বাওয়ার ভক্ত মনে-মনে একটা অজুহাত খুঁজিতেছিল, কিন্তু বীণা তাহার হাতে ধরিয়া ঘরের মধ্যে একটুখানি আঁড়ালে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল, 'তুনেছিন?'

বলিয়া সে তাহার কানে-কানে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি যেন একটা সংবাদ দিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বিভা যান একটু হাসিয়া কাপড় ছাড়িয়া জাণা গায়ে দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় শুনিল?'

বীণা বলিল, 'কেন গো, গেজেট ত' তোমারই ঘরে। তোর বর বললে, আবার কে বলবে?'

'কিন্তু ওকে না ওরা বলতে বারণ ক'রে দিয়েছিল?'

মুখে কিছু না বলিয়া বীণা শুধু চোখ টিপিয়া একবার হাসিল। হাসির অর্থ এই যে, নিযেখ-বারণ শুনিবার মত লোক সে নয়।

বীণা আবার বলিল, 'তুই যে একদিন কেন আমার কাছে ঘাসনি, তাও কি আমি জানি না মনে করেছিল নাকি?'

বিভা বলিল, 'কেন যাইনি কই বল দেখি?'

বীণা বলিল, 'অমরবার জজ্ঞে। সে তোকে গ্রামে-কোন দিয়েছে, ছ'দিন বাড়ে শুনব—আরও কত-কি দিয়েছে।'

এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

কি জবাব দিবে বিভা সহসা ঠাহর করিতে পারিল না।

কিন্তু মনে চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'গোমোফেন বাগাবার জজ্ঞে মিন্কে একদিন ম'রে নিয়ে এসেছিল ভাই.....'

কথাটা বীণা তাহাঙ্গে শেষ করিতে দিল না। বলিল, 'হী, তোরপর জজ্ঞোফো হয়ে মাখায় ঘোমাটা টেনে পান

সেজে দিয়েছিল, কোনোরকমে ছুটা কথাও বোঝাই, বসে

বসে গান শুনেছিল, তারপর আবার আর-একদিন নাকি এসেছিল, কথা না ক'য়ে সেদিন' ভাড়িয়ে দিয়েছিল..... সব জানি লো আমি সব জানি।'

বিভার মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটিল। বলিল, 'জানিস ত' আমার বয়ে গেল।'

বীণা তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'তা নাহয় গেল, কিন্তু আজ যিকেল তুই আমার কাছে ঘাবি কিনা বল। না ঘাবি বাস ত'—'

বলিয়া ওত জোরে হাতটা সে তাহার টিপিয়া দিল যে, 'উ' বলিয়া বিভা চাঁৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'ঘাব, ঘাব।'

গুদিকে অমরের সায়গারি ঘুম নাই।

বিভার আজ জবাব দিবার কথা।

বেলা তখন চারটা। বিভা আজ বোধকরি অনেকদিন

পরে বীণার কাছে ঘাবিবার ভজই ইহারই মধ্যে বলা বোধিয়েছে, ভাল একখানি সাড়ী পরিয়াছে, জাণা পরিয়াছে; পায়ে আলতা, কপালে শিঁড়ের টিপ! মানাইয়াছে চমৎকার!

কালীচরণ সাধারণত বাড়ীতে এসময় থাকে না। তাহার উপর ছুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরেই বিভা আজ তাহার সঙ্গে কণ্ডা করিয়া বলিয়াছে, 'তুমি বেরোও আমার চোখের সবুজ থেকে।'

বিভা বলিয়া বসিয়া একখানা বই পড়িতেছিল। পাশের ঘরে যখনও দিবাভাঙ্গা বোধকরি তখনও ভাঙ্গে নাই।

'কালী কোথায়? কালীচরণ?' বলিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে হাসিতে অমর আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

'বিভা আর সুন্দরভাবে বিশ্রাম না করিয়া বলিল, 'আজই রাতে।' শেষ রাতে। বাইসেই দরজা খোলা থাকবে, এই ঘরের দোরে এসে টুক টুক ক'রে ছটি আওয়াজ করো।

আমি বেরিয়ে যাব।'

অমরের মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

বলিল, 'বেশ!'

উপর আসিয়া পড়ে; দেখিল, তাহাও পড়ে নাই। 'হয়ত' তাহার মনের ভুল ভাবিয়া' খিল বন্ধ করিয়া বিভা আবার তাহার শয্যায় গিয়া শয়ন করিল।

এবার আনু চোখে তাহার ঘুম আসিল না। নানান ভাবনার মাধুর্য ক্রিতরতা তাহার গোলমাল হইয়া বাইতেছে। হীনবর ব্যাবেকের বড় বাড়িটার ঢং ঢং করিয়া চারটা বাজিল। হীনবর তাহার আসিবার সময় হইয়াছে। বিভার কান রহিল দরজার দিকে।

শেষে সন্তি আসিল।

দরজার টুক টুক টুক টুক করিয়া চার বার শব্দ হইল। এবার আর ভুল নয়। এবার স্পষ্ট পরিকার।

বিকাবে বাইতে হইবে।

দীর্ঘে দীর্ঘে সে উঠিয়া পাড়াইল। কিন্তু আশ্চর্য, ঘুরে ক্রিতরতা যেন ধব ধব করিয়া কাঁপিতেছে, পা টলিতেছে। মাথাটা একবার কেমন যেন ঘুরিয়া গাইতেই বিভা বসিয়া পড়িল। এমন করিয়া মাথা তাহার মাঝে মাঝে ঘোরে। মস্তবকঃ তরঙ্গলতার জল। তা হোক। আর ভেড়া করিলে চলিবে না। বিভা আবার উঠিয়া পাড়াইল। অন্ধকার ঘর। হুট-কেসটা ছিল হাতের কাছেই। তাড়াহাড়ি সেটা সে তুলিয়া লইয়া দরজার কাছে আগাইয়া গেল। আবার শব্দ!

দরজার খিল খুলিবার জ্ঞক বিভা হাত বাড়াইয়াছিল, শব্দ শুনিয়া হাতটা সরাইয়া লইল।

খিল খুলিয়া দরজার চোকাঠ-টি একবার ডেঁড়াইতে পারিলেই—সব শেষ!

বিভা মুহূর্তের জ্ঞক কি ভাবিয়া যেন থমকিয়া পাড়াইল। পিছন কিরিতেই দেখে, বীণাদের ব্যাবেক হইতে বেগালার ঘুলঘুলির পথে আলো আসিতেছে। উঠিয়া হয়ত তাহারা আলো আসিয়াছে। একটুখানি অপেক্ষা করা উচিত।

হুট-কেসটি আগে বেধানে ছিল বিভা তাড়াহাড়ি সেটি আবার সেইখানেই নামাইয়া রাখিয়া দেওয়ানের 'দেই' দুপালির কাছে গিয়া পাড়াইল। বীণারা দুই বাণী-রীতে শুইয়া শুইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কথা কহিতেছে। কথাবার্তা অপষ্ট। কিছুই ভাল শোনা যায় না। কিন্তু ওই হাসি?—নিশ্চয় নিকলঙ্ক পবিত্র হাসি! বীণাও হাসিতেছে। তাহার স্বামীও হাসিতেছে।

কি ভাবিয়া কে জানে, বিভা তাড়াহাড়ি তাহার নিজের ঘরের আলোটা হুইট টিপিয়া জালিয়া ফেলিল। নিতান্ত অসহায় শিশুর মত স্বামী তাহার অকাতরে নিশ্বাস বাইতেছে। কাছে গিয়া গায়ে হাত দিয়া ডাকিল, 'ওগো শোনা!'

বাহিরের অন্ধকার ব্যাবন্ধার উপর কাহার যেন ক্রান্ত পরশ শোনা গেল। 'অমর বোধধর পলায়ন করিতেছে।

কালীচরণকে এইবার খুব জোরে-জোরে নড়া দিয়া বিভা বসিয়া উঠিল, 'আচ্ছা দুম বাহোবা' ওগো, শুনছো, শোনা!'

জাগিয়াই কালীচরণ তড়াঙ্ক করিয়া উঠিয়া বসিল।—

'কি! কি হ'লো?'

বিভা বলিল, 'জাখো ত' বাইরে কে যেন—'

তৎক্ষণাৎ 'কে' 'কে' বলিয়া উঠিয়া কালীচরণ দরজা খুলিয়া বাহিরে গেল। দেখিল, অন্ধকার ব্যাবন্ধার কেহ কোথাও নাই। শহর-প্রান্তে নিরন্তর রাতি শুষ্ক ক্ম ক্ম করিতেছে।

বাহিরের দরজার কাছে গিয়া দেখিল, দরজাটা খোলা। 'চেন' বলিয়া সিঁড়ির উপর একবার উঠি মারিয়াই দরজাটা বন্ধ করিয়া-দিয়া ভয়ে কালীচরণ এক রকম ছুটিয়াই ঘরে আসিয়া ঢুকিল। বলিল, 'হ্যাঁ ঠিক। বাইরের দরজা খোলা। চোর এসেছিল হয়ত।'

বিভা বলিল, 'তা হবে।'

বলিয়া সে একবার কালীচরণের দিকে মুখ তুলিয়া তাকাইল। কিসের যেন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা কাতর হইয়া বিভা তাহার বিজ্ঞানর উপর লুটাইয়া পড়িতেই; নিতান্ত ব্যাবল-কঠে কালীচরণ জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হ'লো বিভা, এমন করছ যে? মাথাটা টিপে রেখো?'

'বাও' বলিয়া সে নিতান্ত অসহায় বালিকা মতই শুইয়া শুইয়া কাঁদিতে লাগিল।

নানা-রঙা!...

খপনের মালপত্র সতাই সংক্ষেপ। জমিদার-পুত্রের মালপত্রটিতে দেখিলে অসম্ভব রকমের সংক্ষেপ বই কি। ছুটি ছোট্ট গ্লাডস্ট্রোন বাগ ও একটি হুটকেস, বাসু। প্যাক করতে দশ মিনিটও লাগে না। স্বপন বিলাসী বটে, কিন্তু ভগবৎ প্রকৃতিরও ভেঁ।

প্যাক শেষ করে রেতের একটি হোলান-কেন্দ্রার 'টেনে এনেও' বসল তার ঘরটির সামনেকার অর্ধচক্রাকৃতি ব্যালকনি ব্যাবন্ধার কাছে। সামনেই বিস্তীর্ণ নীল-হরিৎ জলাশয়। মনে পাপা মেলতে হয় তো এরই সামনে। তাছাড়া হাতে হ'লটা মনও রয়েছে যে! তার মনটা ঘুরির আসতে জাগে হ'লো ওঠে!...

ইসাবেলের শব্দ মধুর বই কি। কিন্তু আরও মধুর বৃষ্টি ছাড়া পেয়ে সে-সময়ের গুণ্ডিলির নানান টুকরো নিয়ে জাঘর কাটতে বসে যাওয়া;—তাদের 'পরে' নানারকম সম্ভাবনা-অসম্ভাবনার তিগাক রঙ কেসে ঘুরিয়ে কিরিয়ে দেখা। জীবনের বাস্তবতার রস? - কতটুকু সে? তার উপর আলো ঢেলে, গন্ধ মাখিয়ে, স্বভি জড়িয়ে, কল্পনার পটভূমিতে বিছিয়ে তবে না প্রাভাহিক সত্য হৃদয় হ'লো ওঠে, গড়ম্বর ব্যাবাল্প স্বপ্নহিমালয় হ'লো ওঠে!...

ধর এই যে ইসাবেল, কী হৃদয়ঙ্গরী! কি স্বপন মা-মা বসল তার নিজের জীবনের সম্বন্ধে তা-কি সত্য বাস্তব! না, না, না। ইসাবেলের জীবনের হাসি-অশ্রু স্বপনের মনের মেঘে যে-ইন্দ্রধনু ছুটিয়ে তুলল সেই আলো ছায়া, আনন্দ বেনদাই তো তার কাছে প্রোমাণ; নর? অবশ্য এ-ধরনের কল্পনাময় বাস্তবতাও আছে, সত্য। তার মনে পড়ে 'আজই চার বড়ছিল লাভেলের অস্বস্তী দার্শনিক সোশির একটা গল্প। সোশি বেড়াতে বেড়াতে বললেন; "মাছেরা ঐ জলে কী আনন্দেই না আছে!" তার দার্শনিক বন্ধ

দোলা

প্রীতীলীপকুমার রায়

বললেন: "তুমি তো মাছ নও, জানলে কি ক'রে মাছেরা আনন্দে আছে কি না?" সোশি হেসে বললেন: "তুমিও তো আমি নও, কেমন ক'রে জানলে যে আমি জানতেই পারি না মাছেরা আনন্দে আছে, না—না?"

কিন্তু এসব তর্কাতর্কি ছেড়ে দিলে বোধ হয় বলা যায় যে মানুষের সাহিত্যে তথা জীবনে খতিয়ে চরম লাটুটর হচ্ছে পাণ্ডার রস—জানার রস নয়। তাই ইসাবেলার আভ্যন্তর কংসনা বাস্তবিকই অজ্ঞা। জীবকে যে যে-চোখে দেখে রসের দিক থেকে সেই-দেখাই তার কাছে প্রোমাণ। একথা কেবল সে খুশি হ'লো ওঠে। ইসাবেলাকে নানাভাবে কল্পনা করে, নানা দিক থেকে দেখে, নানা রূপে উপভোগ করে! কী চমৎকার লাগে!...এই-ই যদি না বল, তবে ইসাবেলার তার কাছে সার্থকতা কী তুমি? নানা দিক থেকে নানারঙা আলোতে রঙিয়েই যদি তার আনন্দবেননা, আশা আকাঙ্ক্ষা, ভাড়াগড়াকে না দেখল তবে আর কল্প কী?

সে ভাবে আরও কত কী!...ইসাবেলা আশ্চর্য হৃদয়ঙ্গরী। কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য জীবন। সে দেশে কত মেরেই তো দেখেছে। 'দেখে চোখ মুদ্র হ'য়েছে—কিন্তু প্রাণে ডেউ তোলেন নি তো কেউ?—এক সম্ভা ছাড়া-অজ্ঞান। আর কেন লোকে বলে বল দেখি-যে রেখাও ববিজ্ঞাসেই সৌন্দর্য? কথ খনো না। না, না, না। সৌন্দর্য হচ্ছে—পাঠিত্র; মানে—সৌন্দর্যের তত্ত্বই হচ্ছে গতির ইচ্ছা—সাজেগড়ান। তার হঠাৎ মনে পড়ে যায় পাণ্ডার সময় যখন ইসাবেলা চুপ করে থাকিল—এক এক সময়ে, তার খুঁজবার 'অল হ'লো উঠছিল—যেন ঠিক পাথরের সত্যনা-আর তখন তাকে কী সাধাধরই না লাগছিল! তার ঠিক চাইতেও যেন ইচ্ছে করছিল না। কারণ যে-মুহূর্তে তার মুখ

সলতা হারায় সে-মুহুর্তে তার সৌন্দর্য হ'য়ে যায় বেন একেবারে বোবা। তার মনে পড়ে যায় চাং-ও একদিন এই কথাই ব'লেছিল। ব'লেছিল : "ওকাসুরা খুব খাট কথাই ব'লেছেন যে "অনন্তের সব চেয়ে গুহ্য রহস্য নিহিত ইম্প্রিসে—কম্পেকশনে, যে অল্পে "all maturity fails to impress because of its limitation of growth." সেদিন সে ওকাসুরার একথার ভরক ক'রেছিল—বোব হয় বোব চেষ্টে উঠেছিল ব'লেই। ব'লেছিল : "আটের মধ্যে তা'হলে পার্কে'শ্বন ও মেটিওরিট-র মূল্য এত বেশি কেন সেকলেই?" চাং ভাত্তে হেসে উত্তর করেছিল : "সকলে কোথায় দেব? এদেশের লোকে দেব বলতে পারো, কিন্তু চীন জাপান ভাে কোনো দিনই দেয় নি।" আদ্যম মূল্য দিয়ে এসেছি বাক্যের আটের এই রহস্যসম্বন্ধ—suggestiveness-এর।" স্বপন ব'লেছিল : "বাস, যেন তার মূল্য এরাই দেয় না। আটের যে সাজেস্টিভ হওয়া চাই-ই এরাও তো নিতাই ব'লে।" চাং হেসে ঈর্ষ্য বাড় নেড়ে ব'লেছিল : "বলে, কারণ ও-কথাটির মানেই এরা জানে না। তাঁর খ্যাতিনামা কাপানী-মাটের সমালোচনায় নেওড়তি ও কথা ব'লেছেন দেখতে পারে। ব'লেছেন যেচারী মূগোপীয়দের ধারণাই নেই "suggestion" কথাটি তারা প্রাইই বাবাবার করে মানে না বুঝে।" স্বপন আপজি করার চাং ব'লেছিল : "কথাটা আমার গায়ের জোরের কথা নয় স্বপন, বিশ্বাস কোরো। কেমন জানো? এই ধর, যে লোক প্রেমকে বড় বলে সে যদি বেশ সত্যীভব ও আকাশে, তুলছে তা'হলে কী সিদ্ধান্ত করো? হয়, সে প্রেম বি-বস্ত্র জানে না, নয় সত্যি কথাটির মানে বোঝে না। বটে তো? এ-ও ঠিক তেমনি। এরা দেখবে কথার কথার 'পার্কে'শ্বন পার্কে'শ্বন' ক'রে তারথরে চোয়। কিন্তু বল দেখি, যে-লোক 'পার্কে'শ্বনের' ভরগান করতে পারে কখনো? অথচ আশ্চর্য এই যে আদ্যম চকলমার চোটে পাখিই জ্বল গেছে। অবশ্য বলতে পারো—এরকম আশ্ববিবোধ সব জাতির মধ্যেই থাকে। মানি। কিন্তু তাতে আমার কথা অগ্রদ্রাণ হয় না।"

সেদিন সে পুরো সায় দেয় নি একথার। কিন্তু আদ্য তার মনে হয় চাং মিথ্যা বলে নি। তার শত বোব শত ক্রটি সবেও গতির মধ্যে কোথায় একটা অসুস্থত মারকাটা রয়েছে নেই কি। তাই তো ইয়াবেলাশকে তার-এত ভালো লেগেছে।...শুরভের মেঘের মতন তার মুখখানি : কার সাধ্য এক নিমেষের রূপ দেখে গুঁের নিমেষ সবেই একটুও ভরসা পায়? অন্তঃময়ের বাসন্তী আকাশের মতন : এতটুকু আশার অপসরণে কত রকমই না রঙের ফুল-কাটা! তার মনে পড়ে যায় চাঙের কোবলাইশির একটি রচন উদ্ধৃত করা :

‘কুটিল্য বহিরা বহিরা চল ঘো, চল ঘো পথিক চল,

জীবনের স্রোত ধার দেখিয় না শিরশ উজ্জল।’

খুব ঠিক কথা। আর বোব হয় চাঙকে তার প্রথমটা হৃদয়ের লাগেনিও এক জন্মেই। তার মুখেই পেশোণ্ডি যেন বড় বেশি স্থির। অথচ—কী আশ্চর্য—তাঁর আঁকা ছবি কী অদ্ভুত সঙ্গ—বসিতগতি! ইয়াবেলা ও চাং! হৃদয়ের ছন্দের মধ্যে এ-রোমান্স পড়ে উঠল কী করে? এ-হুই অনাস্বীয় সেহে মনে? নিরু'রের সঙ্গে শাব্যের রোমান্স! তার মনে পড়ে তার পারিসের এক অধ্যাপক বন্ধক। লোকটি কী আশ্চর্য অগ্রসিক : যে মুহূর্তমান আচাধ্য প্রকৃতবী মহোপাধ্যায় বিনি ভগবানের বিমূলবিলস'ও চাং! হৃদয়ের ছন্দেই শোভারের মনে স্বর্গ করেন দারশনী নীরসতা। অথচ তারই ভাগ্যে শ্রীও জুটেছে কি তেমনি। 'আনন্দ-প্রতিভা যেন।—হেসে গেয়ে মেচে কুঁদে আশ্ব'—অগ্রপ্রের। স্বপন ওদের বাড়ি গেলে তাদের কাছে হরবোলা ভঞ্জে, টেনিস খেলে, ছোট শিশুর সঙ্গে দৌড় করিয়ে, নিজে তারের বোঝা হ'য়ে হমাগড় দিয়ে—হোঙ্গ সে কী অস্বাস্ত বারিপ্রপাত! অথচ ম'সিয়ে বোমার তাকে বলেছিলেন যে ওরা পরম্পরকে ছেড়ে দূরওও থাকতে পারে না। লোকে ভেবেই পায় না—এমন! শুধু জাতির জীবনে নয় দাম্পত্য-জীবনেও এ-ব্যবহারিণে নিতা। নয়?

স্বপনের অধরপ্রাণে হাসি ফুটে ওঠে। সত্যিই তাই। জীবন এ-দ্বিই অপরাধ-কাজি বটে। কোন্ অলিগনি দিয়ে যে কোন্ পথিক কোন্ গন্তব্যস্থানে পৌছয় কেউ কি কোনো-দিন তার দিশা পেয়েছে? এই দেখ না কেন, সে তো

নিজেকে ভাবে চলকল শিল্পী—প্রেমিকপ্রবর—বিবেকনিষ্ঠ, আরও কত কী। নয়? অথচ কেমন ক'রে আনার মাচোষে সন্ধ্যার প্রাতি অহরাগ তার আশ্চর্য রকম জট-গতিতে ক'মে গেল! অহরাগ? না, না...ভাবতেও ব্যথা বাজে বে।...সে কি এতই চকলমতি? না না, অহরাগ তার (মানে সন্ধ্যার প্রাতি, আনার প্রাতি নয় অহরা) ঐ সাগরের মতনই নীল, গভীর, অমেঘ...আরও অনেকগুলি বিশেষণ সে বেশ মুখোচক ক'রেই উচ্চারণ করে। কিন্তু না, একটু বাড়াবাড়ি হ'য়ে পড়ে বুঝি বা।...ভবে অন্তশত না হোক—ভালো সে বাসতে জানে এ প্রব। এবং—ভাভতে গরল হয়—মানে প্রাণে বিবেকী বই কি। বুখা'ই কি সে প্রকৃতবী বাবর সার্বন শুনে এসেছে সপ্তাহের পর সপ্তাহ। কিন্তু...তার বাহা ছিল যেন? ও—আনার সাহচর্যে সন্ধ্যার স্থিতি এলো আব'ছা হ'য়ে। অহরাগ আট থাকে থাকুক—কিন্তু স্থিতি যে এসেছে আব'ছা হ'য়ে অর্ধাকার ক'রে লাভ কি? আনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার মুখে সন্ধ্যার কথা তার ক'বার মনে হ'ত প্রতিদিনে? আবার ইয়াবেলাশকে কাছে গৈয়ে পারিসে ফিরতে ইচ্ছে করে না। অথচ আনার প্রাতি ও ইয়াবেলাগ প্রাতি তার মনোভাব কতই তফাৎ! কিন্তু...অনিচ্ছাসঙ্কও ভাবে...সত্যিই কি তফাৎ?—সম্ভাবনা-অসম্ভাবনার নানা উল্টা-পাল্টা স্রোত পুনরাবর ধয়ে আসে কলোচ্ছ্বাস। বডি ধর, চাং না, থাক্ত—বডি ধর চাং না ফিরত—কিন্তু। অতি দূরে ভবিষ্যতের কোটায় এসো—ধর, বডি তাদের হৃদয়ার এখানে ভিন চার মাস থাকতেই হ'ত একত্রে, ও তাকে হ'তে হ'ত এ-অভিজ্ঞাত-ব্যাখ্যার্তার রক্ষাকর্তী। তাহ'লেও কি যে সত্যই কবি লরেন্সের মতন বলত—

সবী, শুও হও সন্নিম-প্রীতির টানে
মুখ বোহাশ তালে চলি যেন ধৌয়ে উজানে;
মুদ্রকিনী যেমন মূরু ধরি ধরিয়া
তব সান নিতি তেহি মধ্যে আমার দিগ্না
ভুঁই দ্বিগু ভগ্নিরা!

হঠাৎ হোরে আখাত হয়।
মেডের হোরে একটু চিটি।

সম্ভার চিটি!—

চিটিটির শিরোনামা দেখেই, তার মনের কুলে কুলে জ্বলে ওঠে সন্ধ্যা উজ্জল স্রোতারের গদগদ। তরঙ্গা পেয়ে ভাবে সে—কত কথা! কিন্তু তক্ষনি আবার মনে হয়—গত বেলে সন্ধ্যাকে শুধু এদের একটু আখটু গুণময় খবর বেওয়া ছাড়া যেমন কিছু সরস মধুর চিটিতো সে লেখেনি। অবশ্য ঠিক খবর বলতে বা বোঝা, তেমন কিছু ছিল না বটে লেখার—তবু... খামটি নিয়ে সে বেশ আত্মই উল্টে পালাতে দেখে। এবার সন্ধ্যা হঠাৎ ভায়োলেট রঙের খাম কিনেছে দেখছি!...সত্যি তাকে সন্ধ্যা কত ভালোপালে!...ভালোপালে—ভালোপালে—ভালোপালে—কথাটা। হৃদিন-বার উল্টে পালাতে উচ্চারণ করে নীরব রসময়। তাকে রসনা ওঠায় তবু মনও বেশ সঙ্গল হয়ে ওঠে। আর হৃদয়ের রিগড়ে ছায়াভরা রঙভরা একমণ্ড আবেশের মেঘ উকি রিতে হুকু করে। সে-মেঘটির বুক রঙগুলি ধীরে ধীরে হ'য়ে ওঠে ছাটিকণা—স্বয়ংদীপ। তাদের ঝিকঝিক...মলয় রিহোল সে উগ্ৰভোগ করে রিহয়ে রিহয়ে...চিটি পেনেই বুলুতে হবে—এর মানে কি? সে নানা ভাবে দোলায় খামটি হাতে ক'রে নিয়ে। ওজন ক'রে দেখে। ক' তোলা? কিম খুব ভারি নয় তো। মনটা কেমন একটু স্থব্ব হয়।...কিন্তু তা হোক। সন্ধ্যার চিটি ভাের না কাটুক ধামে কাটে বৈ। অত্যন্ত প্রীত হ'য়ে সে একবার চাং খামনের দিশাভিত্তিতা নীলকঙ্কাল জলধির দিকে...আর একবার চিটিটির দিকে—বার লেখিকাও বৈজিত্য-ভরবে' বড় ফেলা যান না। ভাবতেই তার বুকুর মধ্যে সন্ধ্যার এলোচুলের গন্ধে কেমন যেন তার ওঠে।...সঙ্গে সঙ্গে একটা অত্যন্ত স্পষ্ট বাসনার ভাে প্রাণের কুলে তরঙ্গ উঠল হ'য়ে। ওঠে!...সে সবক অর্ধাকার ক'রে নিয়ে চিটিটা খোলে। মনে হয় লরেন্সের আদর্শিত বড়ই বেশি প্রাণসুলভ আদর্শ দেখে।

খামটি বুলুতেই—আতরের গন্ধে ভুর ভুর ক'রে ঘর দেখে যায়—ছাই রঙের চিটির কাগজের আভা এত হৃদয় হোয় যায়।...সে আরও চকল হ'য়ে ওঠে সেই বাসন্তী-মুখর বদনায়। গাটিকত হ'য়ে পড়তে হুকু ক'রে দে—

“ওগো

চন্দ্রকান্ত স্বপ্নকান্তি আমার।

বাঃ, তুমি বুলান থেকে পারিসে যাবে বলে এক নৌড়ে গেলে তি না লোভিলে—আর তা আবার এয়াহোয়েনে চেপে। কসানী অভিনাশে এহই নাম বুঝি—“চিত্রকলার তালিন” হইবে বা। কিন্তু সে যাই হোক, তুমি এনিমেষে হৃদয়ের তপনবীর ওপরেও টেকা রিলে দেখছিল। তিনি তবু হ’দিন স্বস্তির মহলা দিয়ে একদিন জিরিয়েছিলেন, আর তুমি গিয়ে আসগেই জিরোনোর মহলা দিতে শুরু করিলে।

“ওঃ, কী দেশের কাজই করে বেড়াচ্ছ নটরাজ, নৃত্যের তালে তালে।” যদি জান্তাম এই-ই তোমার মনে ছিল, তবে আমার বাতঁটাও সব ফেলে সটাং তোমার সঙ্গ নিতাম হইত। দেশের কাজ করবার প্রবল ইচ্ছা অংলা বহুবারের ক্লান্তকেও সমরে সমরে দ্বিষ্ট করে উঠে থাকে কেনো।

আমার সময়ে সময়ে মনে হয় আর একটা রূপকথা বা আজ অবধি বলা হয়নি : এক যে ছিল রাণী, (মানে শিরদ্বীপী) তার ছিল দুই স্বামী—কেনো ছুয়ে ও অপরজ্ঞা সুয়ে। কেবল সুয়েয়াগার অবস্থার একটু বিশেষ আছে। সুয়েয়াগা শুই ছিলেন ভাগ্যবতী, কিন্তু এ-সুয়েয়াগার কারও বুঝি দৃষ্টান্ত—মানে ভাগ্য-অভাগ্যের উর্দ্ধে। অসঙ্গ ভাগ্যবতীর বা নেই তা এ সুয়েয়াগার আছে, কথা টাকা। আর ভাগ্যবতীর বা আছে তা এর নেই থাণ, পুত্রবল্লভ ভাবনা চিত্তা। (যে কলয়ের তার পিতৃহৃদয়ে সে কলর ও নামের অযোগ্য এটা উহু হইল অসঙ্গ) রূপস্বতী—(ART—বড় হরকে) তথা বৈদ্যদ্যাক্ষপাণ দেবের কাজ তো এমনি সুয়েয়াগাদেরই জন্মে চিত্তাকাল একচেটে হ’য়ে আছে। একশোবার। তুমি ‘মন্দ লোকের সন্দ’ শুনে না ঠাকুর। তোমার মন্দকে একবারেই আমল দিয়ে না। বিশিয়ে যাও শুধু—গুরু। তোমার ভাগ্যে অক্ষয় হোক নিরঙ্কুশ ভামামাণের আনন্দ। আর আশ্বিনের ভাগ্যে? অক্ষয় হ’য়ে থাকুক—হাতের নোয়া, সিঁথির সিঁদুর, পতি-পরম-শুভ চিত্রণি এবং রাজ্যের দেবীসন্তবা কল্যাণিগৌরীরা কাজ—থাক। শশুর-বন্দন, ভাণ্ডার-সঙ্গম,

অম্বর-সম্মার্জন, ও—সর্বোপরি—কাজের কাজকে দিতে দিতে চিঠি-লেখা। তবু যদি এ-শ্রমবিভাগের জন্মে সুয়েয়া-রাজাদের কাজ থেকে কৃতজ্ঞতার ছিটে ফোটাও মিলত, অষ্টগ্রহের অন্তে না হ’ত যে বাঙালিনী কসানিনী নয় নয় নয়। নয়ই তো। যা নয় তাই! হবে কোথা থেকে শুনি? ভাঁড়ার-রক্ষণী চিত্ততোষিণী হয় আবার কবে?—বিশেষ বাঙালী কর্তব্যের গৃহে—যেখানে ভাঁড়ার শশীর পটিকার সোনার-পিনি, সিঁদুর-কড়ি প্রভৃতি নানা জিনিষ থাকতে পারে, কিন্তু চিত্তের ভাঁড়ে আছে শুধু একটি জিনিষ মা তবানী।”

স্বপনের অধর-কোণে হাসি ফুটে ওঠে। এত ভালো লাগে—এ টাং—আশা সজ্জা বটে। কিছু চলে।

“কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাস্য করি : এতখানি নির্জলা কসানিনী-প্রীতি কি নির্জলা সামাজ্যিক গবেষণারই ফল? না, এর মধ্যে ‘বুঝ লোক যে জানে সন্ধানের’ মতন কিছু আছে? শোনা, ঠাট্টা না। জাফানী, হুইজল ও, আলসেস, লোয়েন, বুলোন, দেভিল—সব তো চ’য়ে বেড়ালে, কিন্তু কই, (এতখানি অশ্রদ্ধাধীন কসানিনী-প্রতির উপচার সত্ত্বেও) কোনো বিশেষণীর ধরন-পয়ের অম্বর মহলে উকি মারবার অবকাশ পেলো না একবার? কোনো হাল আমলের ষাট-পরা শক্ততার নাইটকেল-সুহৃদিত “শান্তরাসপুঙ্গ-বিদ্যামন্ত্রণে” নেহাৎ পক্ষে কোনো উড়নচড়ী প্রোচিত-ভর্তুকতার অস্বাভাবিক সাং-তে? একেবারে নিরামিণি? এক একটা কথা হ’ল রসসঙ্গ?

“সন্তা, লড়কি খেলা দেখে, টু দি পয়েন্ট কথা কও তো একবার। সম্প্রতি গত হ’দিন নৈমিত্ত তোমার চিঠির টোন যেন একটু...কী বলব?...নাঃ—কিন্তু না বলাই ভালো। কাজ কি? কেঁচো খুড়তে কেউটে বেকবাবর ভদ্র ধনন রয়েছে। তাই শুধু,

যুগাই তোমার জিওনির হাণ, স্বপ্নবাস্তব কাজের কি হোখার
ফুল না গো ফুলটি ধপন-বাণ ?—
কিনা কোনো রু:ফল চন্দ্রমাণ,
দীপল না জল জলধুর ভায়।

“কিনা স্বপ্নবাস্তব কথা বাধাবাস্তব কাছে বলাটা অশোভন বলেই বা ভুলে ভুলে...”

স্বপনের মনের মধ্যে হাসির আলোর ওপর মেঘ উড়ে আসে। তবু সে জোর করে হাসে; পড়ে :

“কিন্তু না গো না। অত ভয় পেয়ো না আমার ‘পাছ ভয় পাওয়া’র কথা ভেবে। আর ধর যদি আমি ভয়ই পাই। তাতেই বা কী? তোমার না জীবনের একটা অস্তমত মতো—Do well and right and let the world sink? আমিও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বলি : “বটেই তো, Do love and win and let the wife blink. জানো তো কবি ত্রিাদিশীপঙ্কমার মহাপ্রকাশ বেশ বজ্রনাগদেই বলেছেন সেদিন তাঁর ‘পরকায়’ মহাকাব্যে :

“যদি জানো যোকা করে চল যি। জগত? যাক না গুরাণ-তলে, নিতি মন যাক চাখো। যত?—হু—এসেছে যে জেসে যানর জগে।”

আবার মস্তাও করা হ’য়েছে।—“ভয় নেই—শ্রামলিনী বাধাবাস্তব তাঁদের মনোভাবকে যে চোখে দেখে থাকেন দ্বলিনী অপাঙ্গস্বপ্নবাস্তবের পক্ষে তাঁদেরকে সে চোখে দেখে যার কোনো আশ্রয় সন্ধানই নেই।” আবার এ-শাইনকট লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানে—ভূদাপিণী সুনীচেন—এই না? কিন্তু ওগো দয়িতাগরী নরাজিৎ! ঠাকর, করো দেখো কি যে এ-বিনয়ের সন্ধ্যারাগিণীর গড়র একতিলও বাড়ে না? কারণ এই যে তার সবচেয়ে বড় অপবাদ। নারী সব সইতে পারে, পারে না কেবল তার করি গারে ফুলো দেওয়া—নিশেষ তার বসন্ত সম্পর্কে। শ্রামলিনীকে ‘রাখিলে রাখিতে পারো, মারিলে মারিতে পারো’ কিন্তু তার চিত্তচোরকে ছোট করা—ঐ—শ, সাধা কি :—ওগো

শ্রামলিনীর মন যে চতুর হবে
গায়বে না সে—ইচ্ছা যদি করে
জিন্দে হোয়ায় তুমার-দ্বলিনী।

চুক-খাঁচি যখন যাবে—তার
নীল মনমা টুলেতে ক’বু পারে?
চায় কে বলা হইতে উল্লাসিনী?

যে মালো যার সন্ধ্যা কালিনী
চাইবে না তার কল-উল্লাসিনী।
গাওয়ার কুণা মিটেব তাহে কেনে?

চিত্র বন্দন বাহা উল্লা গো
কেনম যে হয় বাহা কি থকা গো?
রঙের বাহা কেনে চল কি কেনে?

“অতএব ‘সমাসখিনি’ ওগো ভয়বিধল। কেনম! আর মারবে চিল—বাঙালিনী কসানিনী নয় বলে? তাহ’লে কিন্তু জেনো পাটকেনটি ক্ষেত দিতে অবলাগাও জানে।

ইতি স্বপ্ন-অশ্রুতি—সন্ধ্যারাগিণী।

তারপরে গোলাগা কানজেল লেখা আর একটা চিঠি। স্বপনের এত ভালো লাগে :

“পুনশ্চ। এ চিঠিটা ডাকে দিতে যাবে এমন সময় তোমার আনার জীবনী সনেত পেলাম হু-চুটি চিঠি এখরে। গত সপ্তাহে ছিল বন্ধের ওদিকে রেলষ্টাইক, তাই তোমার আগের চিঠি ছুটি—তোমার এ চিঠি ছটির আগে এসে পৌছতে পারে নি—বিরহিনীর অদৃষ্ট রেলষ্টাইকও বাদ লাগে। কিন্তু সে যাক আমি কেবল ভাবছি জন্মের তপনবই বটে। নইলে যে-বিশেষণীর মনের খবর অহমিনই কামনা করছি—ও সে-কথা আজই লিখেছি—তার দিশা কি আজই মেলে?

“স্বস্তান্ত এ-পুনশ্চ হয়ত একটু বড়ই হয়ে যাবে। তবে পুনশ্চকে আসল চিঠির চেয়েও টেনে লখা কর্তে তোমার বামের না এইজন্মে গুরুখা নিজিয়েই লিখি, কি বল? করি কোঁস?

“অগ প্রথম কোঁস।—অত বৌটা দেওয়া হ’য়েছে কেন শুনি? কেবল সন্ধ্যারাগিণী কি অগ্গহামিনী? আর স্বপ্ন-দেহতা বুঝি মার্কওয়ের মতনই চিরস্থায়ী? আমাদের সন্ধ্যারাগিণী কণিকের রঙে ‘প্রোজিত’ হ’য়ে উঠে? কিন্তু তুমি ঠাকুর যে ধুককে—তার হিসেব আছে কি? আমাদের দ্বয়াকাশে গোখলির জীভাধারণ না হয় প্রতি-দিনই মেলায়। কিন্তু আবার প্রতিদিন কেন ওঠে? কিন্তু ওগো নিপট, তুমি? তুমি আজ যে-সন্ধ্যারাগিণী

বুক জুড়ে ওঠো কাল তাকে অমানবমনে ঝেড়ে ফেলো—
তার কি? আজ পূজা? কতটা সম্ভবিত্ব—কার্ণাধায়া
করো লক্ষ বোজন দূরের কোন্ শনিগ্রহের পায়ে লুটোতে;
তার কি?

“কিন্তু আমি সবচেয়ে রাগ করেছি তোমার ভরসা
সেওয়ার; ‘অকলমিবি’ কথাটি যে নীল পেগিলে রাগ
দেখাও বাদ যায় নি—তাইতে। কিন্তু হিসেবে যে এবার
একটু চুক হয়ে গেছে প্রভু। সম্পত্তিজ্ঞান আমাদের না—
ও যে তোমাদেরই একচেটে—সেই মাকাতার পৃথ থেকে।
আমাদের যে-ভাক সে হচ্ছে আঁচল পেতে, পথ চেয়ে,
চটাক মেলে বহুল স্থলের মালা গোঁথে প্রতীক্ষমানার
জাক। আর তোমাদের?—সে তো ডাক না—দাবী;—
রক্তচক্ষে, রেহস্তে, ভরগাছার—দাবী। ‘রাগসের চুমো
মাংস ডুনা ডুনা’। ‘কিন্তু ঠাট্টা থাকুক।’ আবার ছোটটি
তুলিতে কি রকম একেছ আনি না, কিন্তু কথার একেছ
ভালো—মানুষই হবে। কেবল একটা কথা বাবু বুক
হাত দিয়ে? সত্যিই কি সে অত ভাল কথা বলে, না
তুমি সত্যিই শুকিয়ে রং ফলিয়ে রাখা পরিবে প্রতিমাটিকে
অমন ভেলকলামকুতা পাড় করিয়েছ? বেশি জিজ্ঞাসা
করবেও তবু হয়। তোমরা যে সন্দিগ্ধ—পাছে আমাদেরও
তাই ভবে বসো।

“কিন্তু সত্যি বলছি, তোমার চিঠি পড়ে আমার আনাকে
ভারি বেহতের ইচ্ছে করছে। কেবল আমার মনে হয়, কি
জানো? নব্বু? কিন্তু সাবধান—আনাকে বোলা না।
—আমার মনে হয় আমার সঙ্গে তোমার আলাপ-পরিচয়ের
সময়ে—কিন্তু না, কাজ নেই। পাগলাকে শীকো নাড়ার
বিপদ সবচেয়ে সাবধান করে দেওয়া কোনো স্বাধীনই
অসম্মান করেন না।

“এমন মুহুর্তে ফেল্লে তুমি কি?। আমার সবচেয়ে
নানা কথা জানতে ইচ্ছে করে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করতেও
আবার বাধে। তবু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি বুকুটেকে।
—আজ্ঞা সে যে মরিসেবে ছাড়া—সে কি নিছক আবেশই
খাটিলে? না, নেপথ্যের রক্তীন কোনো আশার ছ’একটা
কিরণ স্পষ্টত তার সামনের আঁধার পথকে আলো

ক’ছেছিল? ‘অমাবস্তা না পেরোলে চাঁদের আশা ছাড়া
এ কথা কি তার যুগাকরেও মনে হয় নি?—সে চাঁদ
যাই হোক না কেন।

“আনাকে একটু অভিনয়ী বলা হচ্ছে এতে ক’রে?
মানি। কিন্তু সেজলজ রূপে হ’লেও রাগ করো না—
নটরাঙ্গ, ছুটি পায়ে পড়ি। ইংরাজ মহাশয়ের কথাটা
খুব ভাল কি?—আমরা সকলেই অভিনয়ী নই, কি—
শুধু কম আর বেশি? তুমিই তো একটি চিত্রেতে একবার
লিখেছিলে কে রমেশচন্দ্র না তার কথা—যে যখন আমরা
সবচেয়ে রূপে উঠে বলি প্রশংসা চাই না, তখন এই না-
চাওয়ার ভয়েই চাই সব চেয়ে সুখাচ্ছ রক্তহ প্রশংসাসৌভব;
—মনে আছে?। মাহুর বুককে এড়িয়ে চলতে পারেন
সহজেই। কিন্তু হুম প্রাতঃপাতকে? বিশেষ ক’রে বেয়েছা?
—যাদের’ ধরা পড়বার লজ্জা স্বভাবতই পুরুষের চেয়ে বেশি?
জগো বিশ্রুতি?। অস্ততঃ নারীর দ্বন্দ্ব সবচেয়ে একটুও তো
আমাদের আনবার কথা।

“কিন্তু না—এসব প্রশংসও বিপদজনক। কে জানে
কখন—কোন্ ছিন্ন পেয়ে—না, কাজ কি স্বপ্নাঙ্ক?
শোনো, তুমি আমার এ সব ইঙ্গিতে সাবধান হ’তে বোঝো
না বেনে। সত্যিই বিশ্বাস করো—আমি কোঁহুলবশই
এ সব জিজ্ঞাসা ক’রে ফেললাম—তোমাকে লজ্জার সাবধান
ক’রে দিতে না।

“আমার সময় নেই—এখনি ভকে না গিলে এ মেল
দরতে পারব না। নইলে হয় ত এখনি সব ফেলো আগে
আমার জীবনী নিয়ে হৃদ্যভারত-প্রণাম মস্তব্য লিখতে
ব’সে যেতাম। দেখা যাক পরের মেলে কী চিঠি আসে।
মস্তব্য দেওয়া তো আর দুঃসংকে না।

“কিন্তু শোনো, কবে তুমি ফিরবে সময়ে সময়ে এত
মনে হয়!...সময়ে সময়ে কিছু ভালো লাগে না। চিঠিতে
ফেনিয়ে উজ্জ্বল আমার আসে না। ‘হালুকা তুমি কর
পাছে হালুকা করি তাই’—আর কি?

“কিন্তু তুমি ওখানে আনন্দে আচ্ছ, থাকো। তাই বেন
থাকতে পারো।

“আমার সে গানটা কালও গাইছিলাম।

‘হায় ছবি তার মুখি নীতি ভরে বাধনে?
তাই মেঘচোরে—নাগাশ-সমান গণে?’

“কিন্তু না এ গান কেন? বাধনহারা যে তোমরা।
তোমাদের কি ‘আমাদের’ বাড়ীর দিক টানা উড়িত? তাই
শোনো বলি, ‘আমি এ গান সর্বদাই গাইতে গাইতে
রক্তকণ্ঠা হয়ে থাকি ভবে বোসো না বেন। বাস্তবিক খুব
কম সময়েই আমি শূন্যরূপে মতন ‘বসনে পরিপূর্ণ বসনি’
বা কাচি ‘কাল্পনা’র ‘ময়নশালিশোপীড়-স্ফাবকাশ’
হ’য়ে কালি কর্তন করি। আমি তোমার এ চিঠি পড়ে
একটি ছোট গান তৈরি ক’রে গাইছিলাম আজই—

মোর কাঁধে গ্রাম বঁদল ঘিরে এসে না কবি,
খদি চাষো—যেখানে যেকো কেনে তোমারি মরি।
খদি যেও ঘুরে—চাষো খদি,
ডেহের ডেহেরে নিরখি,
বরির অকুল নদী—কামনা ছবি
খাঁকিতে থকো না ব’সে—কুল-পথই।

তোমার অন্তর্জাতি সন্ধ্যারাগী।”

প্রতিক্রিয়া...

সন্ধ্যার চিঠির প্রথম দিকটা পড়তে পড়তে স্বপনের
ঠোঁটের প্রত্যঙ্গদশে যে হাসি বিকসোদুখ হ’য়ে উঠেছিল,
যে দিকটা পড়তে না পড়তে যায় আরে। সম্ভ্রতি ইনা-
বোলার আর্কবর্ষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছিল আনা একাই।
প্রতিযোগিতা করত। স্তন্যে গারাপ, কিন্তু যতই কেন না
লয়েলোর কথটা ‘আপ্তাঙ্ক—সনের কোনো সে দেশ’
জেনেছিল যে এই ছই বিশেষিনীর পৃষ্ঠের প্রতিক্রিয়া এক
হলে এক...হব্ব এক...আর্চর্ধ্য রকম এক। টাকার
গোটে বিশ্বমনের সাড়া যেমন সর্বদেশে সর্বকালে এক—
প্রায় তেমন। ত্রিক অন্তটা নয় অবশ্য...কিন্তু নয়ই বা
কেন? তত্বেই যেটুকু শুধু হযোগ নিয়ে নয় কি? মনে
হযোগ পেলে ইনাবোলো? কি প্রায় হব্বই আনা হ’য়ে উঠে
না—সে বসতে চায়? না, ‘একদিন চাইত হয় ত, আজ আর
চায় না।’, যুরোপে এসে একটা ভিন্নি অস্ততঃ সে, সুখ্যার
কিনারায় এসেছে: যে নারীর জ্বারিনী শক্তির বিপদজনক

দুল দিকটা বিশ্বজনীন—সার্বভৌম। যতই কেননা স্থায়
কোটিং দাও গুর মধ্যে তিক্ততা সঞ্চিত একরকমের ততো
—এবং তিনিরা আবরণটুকু সবসময়েই প্রায় একই রকমের
পাতলা। মুখে দিতে না দিতে যায় মিলিয়ে। অর্ধট মজা
এই যে ঐ একটুখানি ক্ষণস্থায়ী মিষ্টতার জন্মে মাহুর
কইই না সয়!...ভ্রাসন বাধা রেখে জ্বাধোলা—ঐ
একটুখানি আশা-আলোয়ার হাতছানিতে! একটুখানি
নগরবিহারের লোভে জ্ঞানী ওয়রও সমস্ত পুঁজি বিলিয়ে দিতে
রাখি...

Ah take the cash and let the credit go,
Nor heed the rumble of a distant Drum.
আর জীবনধর্মবতার কাছ থেকে কখন এর বেশি চায়?
মনটার মধ্যে হঠাৎ কেমন বেন অশ্রদ্ধা আসে মাহুরের ‘পরে’
নিজের ‘পরে’। এ ধরনের মিনিক বিজ্ঞতা তার
একটুকুও ভালো লাগে না...কারণ ‘আসলে এবে ভিথিরি-
পনা।’ অথচ একটুখানি নগরবিহারের লোভেই তো সে
কিরছে পারিসে—আনার কাছে। আর কিরছে সমস্ত
যেনেগুনে একটুকু বাগশা না দেখে!...মনের মধ্যে কেমন বেন
একটা অধিরাত্রা বনিয়ে আসে...একটা নিরর্দেহ বিদ্য...

সে হঠাৎ স্থির করে পারিসে জানে না। না না—
কিছুতেই না। কেন যাবে! এখনো যে সে কত ছল্লল
তা কি সে ইয়ারেশার সংশ্পর্কে! এসে বার বার অহব
করে নি? তবে! তবে কোন্ সাহসে পারিসে ফিরে যাবে
এখনি? আগে...একটু সবল হ’য়ে নিচ্—বাঃ! যে জন্মে
তার স্বনিভায়া করা। সে তো বোলো আনাই বিভ্রম
এখনো। গিয়েই তো তাকে পড়তে হবে ম’সিয়ে বেনার ও
আনার মধ্যে।

হঠাৎ সন্ধ্যার চিঠির শেষ কয় পাঠা আবার পড়ে।
গানটি। শেষ কয়টি লাইন তার কানের কাছে গুণগুনিয়ে
ঠেটে:

‘তুমি যেও ঘুরে—চাষো খদি
মেঘের ডেহেরে নিরখি
বরির অকুল নদী—কামনা ছবি
খাঁকিতে থকো না ব’সে কুল-পথই।’

সহ করতে হ'ল ব'লে। কিন্তু এসব থাকে না। দার্শনিক গবেষণা ক্ষেত্রে ব্যাপারটা বহিঃক্ষেপে।

“আমার এর পরেই আসে একটা দায়বিক প্রতিক্রিয়া। সঙ্গে প্রকাশ জর। তবে গতি সম্ভাহে সে পথ ক'রেছে মিন পনের প্রশাণ ব'কে—কৈদে কেটে—বেচারী। এত রোগা হ'য়ে গেছে!...তার একটা snap কাল নিরেছিলাম এই সঙ্গে পাঠানাম।”

খশন ব্যগ্রভাবে চিঠি পড়া হুগিত রেখে খামের মধ্যে খোঁজে। কই?—হঠাৎ মনে হয় এতখানি ব্যগ্রতা!... নিজে কাকে স্বীকার করতেও লজ্জা হয়। ফটোটা বুকে না পেয়ে জোর ক'রেই খুঁদি হয়। কিন্তু তখন দেখে paper-clip দিয়ে চিঠিরই শেষ পাতার সঙ্গে আঁটা!... সত্যিই তো! এত রোগা হ'য়ে গেছে!... তার মন কল্পনায় ভরে যায়!—বাসনার সাথে ধরল!—অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখে। এত অল্পদিনে এত ক্লম!... কিন্তু তবুও কী স্বপ্নের! চোখ দুটো বেন আরও বড় দেখাচ্ছে—আর তার মধ্যে এমন একটা ব্যাখা—অন্ধ দৃঢ়তা!...তার মনের কুলে কুলে ফের আনার প্রতি শ্রদ্ধার জোয়ার ব'য়ে যায়। সঙ্গে একটা নতুন ধরনের টান। আহা, কী ব'লে সে চ'লে এসে!...সাগরে ফের চিঠিটা পড়া হুক করে:

“এ থেকে বেশেত পারে সে কত একলা। এবার আমি আমার বক্তব্য।

“ডাক্তার বলে—চাই প্রশান্তি, বায়ুপরিবর্তন ও সাধুসঙ্গ। অর্থাৎ মহাশুধি। এই যে তরুণীর পক্ষে বৃদ্ধের সান্নিধ্য শুধু সাধুই হ'তে পারে, সঙ্গ হয় না। এবং আমার পক্ষে ‘সাধু’র চেয়েও বেশি দরকার এখন ‘সঙ্গ’। বৃদ্ধলে তো? তাই তোমাকে এ-প্রস্তাব।

“তোমার কথা আমার মনে হ'ল বিশেষ ক'রে আর একটা কারণে: আনা আরের খোঁজে তোমার নাম ক'রেছিল বহবার:—

খশনের বৃদ্ধের বৃদ্ধ ভ্রত বয়। এ ছত্রটি ধবার পড়ে।
—এসব জ্ঞাতিকি বলা কিদ্ধ। আনা যে অভি-
মানী—তোমাকে এসব ব'লেছি জানলে সত্যিই আমাকে
কমা করবে না কখনো—মনে রেখো। এবং অল্প খেচ্ছে

উঠে অবধি তোমার নাম, প্রসঙ্গ নিতুর ভাবেই এড়িয়ে চলে। আশা করি এতে দ্বন্দ্ব থাকবে না?”—

হুগ? খশনের সবচেয়ে আনন্দ হয় এই খবরেই যে! সে সাগ্রহে প'ড়ে চলে: “ওহো না, এতে দ্বন্দ্ব হবার তোমার কথা না, গরিত হবারই কথা। কিন্তু এসব গবেষণা থাকে এখন। হাতে হঠাৎ ছুটি গদিত লড়-বন্ধুর চেহারা স্বীকার কর্ণাস রয়েছে। এত খাটতে হচ্ছে! আনা ভাই হয়ত আরো একলা বোধ করছে।

“এখন কথা হচ্ছে—তুমি কি এসে তাকে কোথাও নিয়ে যেতে পার না? দক্ষিণ ক্রাসেই কোথাও? নৌসে নয়—বড় ভিড়। পাশে এসে কিবা ম'পেলিয়েতে কোনো ছোটোটা হোটেল? মানে একটু নিচ্ছন কোনো ব্যায়ার আর কি। ওর সত্যিই বন্ধ বসতে কেউই নেই। ও ওর মনস্ত জীবন মরিসের মধ্যে জুড়িয়ে দিয়ে একবারে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ছিল এতদিন। এবং পতিপরাধনার যে বন্ধ থাকে না এ-ও বিশ্ববিস্তৃত। একমাত্র বন্ধ ছিল ওর—নীরা। তবে বৃদ্ধ ছই ত—অন্ততঃ নীরাকে উপস্থিত ক্ষেত্রে ডাকা যায় না ওকে সঙ্গদান করতে! তাছাড়া গুজব—মরিস আনাকে ভাইতোল' ব'রেই নীরাকে বিয়ে করবে। আহা নীরা যেচোরী একটু হুকী হোক! আমি তার সত্যি কোনো দোষই দেখি না।

“কিন্তু ওয়া বা ইচ্ছে ককক, তুমি কি এ সময়ে সত্যিই আসতে পারো না? ডাক্তার বলছিলেন আনার সবচেয়ে দরকার প্রহুর থাকা ও প্রায়শ্চলীর বিশ্রাম। নইলে চাই কি ওর একটা শরু কিছু রোগ দাড়িয়ে যেতে পারে।”

“বৃদ্ধের মধ্যে হঠাৎ কোথায বেন মোচড় দিয়ে ওঠে।

“তাই যদি সম্ভব হয় আসবে চ'লে পরপাঠ? কিন্তু আসো বা না আসো—পরপাঠ একটা তার করতেই চাও। কারণ তুমি যদি না পারো তবে আমাকেই—কাজ ফেলগে—
—কোথাও নিয়ে যেতে হবে ওকে। কিন্তু কাজ ফেলার জন্তে তত ভাবি না—ভাবি, মণু-পিগাসিতাকে ইজুস দিয়ে কি শাস্ত করা যাবে? ইতি।

তোমার—

হস্তাক্ষরটি পিয়ের বেনার।

“পুনশ্চ। ইংরাজীতে বলে না, ‘এমন মেঘ নেই যার কোনো প্রায়েই রক্ততেরা ঝিলিক মারে না?’ তাই একটা আনন্দ সংবাদ দেই। আমার বায়ুপরিবর্তনের পরচপ্তারে একটা অপ্রত্যাশিত বিলিবাযস্থা হ'য়ে গেছে, ঠিক কালই। আমার-আশা আমার সেই প্রকাণ্ড বিশিষ্টা প্রশ্রনীতে ভারি নাম করার এক আমেরিকান দন-নামব গুটি কিনেছেন পক্ষার হাজার ক্রাফ দিয়ে ক্যাশ—কালই। আমি আনাকে বললাম এর অন্ততঃ অর্ধেক ওর প্রাপ্য। পরবর্তী ফৌস ক'রে উঠলেন: ‘ক'খখনো না ম'সিয়ে, মডেল আমার কবে ছবি-বিক্রিটা টাকার অংশদার হয়?’ বিপদ বই কি। তবে অনেক সাধা সাধনা ক'রে—শেষটা অভিমানে নিপুণ অভিনয় ক'রে ওকে দশ হাজার ক্রাফ নিজে রাজি করিয়েছি। এত রোগাশো মেয়ে—কোথাও দানের একটু বন্ধ পেয়েছি কি রেগে টং। কিন্তু শেদটা কৈদে সারা। বলে কি জানো? আমিই ওর একমাত্র বন্ধ, আমার দান স্বীকার ক'রে নিয়ে আমাকে হারাতে চায় না। পাগলী কি না! আমার ভারি আশ্চর্য লাগে মনে, জানো? আমাদের এ অর্থসর্গষ সভতার বেধাপক্ষকে সবই বেধাও চলে কেবল অর্থ রইল বৈরিক আত্মীয় কিবা কুলান্দার পুজোত একচেটে। মাতৃহ আত্মময় জীবনের মধ্যে থেকে থেকে ভুলে যেতে ব'সেছে যে দানের জন্তে উপরতের চেয়ে দাতার লাভের বেশি। এ শুধু জীবনে রস নিতা স্বত স্বাধপ্রোতে বয় যে কাউকে কিছু বেগার

সৌভাগ্যটা—কিন্তু না, ফের গবেষণা এসে যাচ্ছে।—এখন তোমাকে ভড়কে দেওয়া কোনো ভাজের কথা না।

“আমার শুধু এই দ্বন্দ্ব রইল সেন, যে ঠিক এই সময়েই তুমি অদৃষ্ট হ'লে একটু কারণও না জানিয়ে। ‘ক্লক ব'লে তোমার কাছে কিছুই চাই নি কোনো দিনও—কিন্তু যেহাঙ্গানের কাছ থেকে একটা চিঠির ‘আশা’ করা কি নিঃসঙ্গ বৃদ্ধের পক্ষে ‘বড় বেশি আশা’?”

শেষ কথা করতীতে তার মন এত ভিজে ওঠে! সে তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাম আদিয়ে গিয়ে এক লম্বা টেলিগ্রাম করল ম'সিয়ে বেনারকে:

“বড়ই বাধিত ঠিক সময়ে জানিয়েছেন ব'লে। ওদের দুজনকে নিয়ে আমি আজই রাগের ট্রেনে পারিস রওনা হ'ছি। ওদের খবর খানিকটা এ'চে নিয়েছেন আশা করি। ওদের পিছনে লোক লেগেছে। সে সব এক আ্যভনুজনার। আপনার চিঠি আজ না পেলে কাল হয়ত কারোরে বেড়াতে রওনা হ'তাম। আনাকে বলবেন, আমাকে কমা করতে। তার জন্তে যদি কিছু করতে পারি সেজন্তে আমার আনন্দের অবধি থাকবে না। কেন হঠাৎ চ'লে এসেছিলাম সব দেখা হ'লে বদ্ব। আমার নাম ইচ্ছে ক'রেই দিশান না ওদের জন্তে। সে সব সহজেই বুঝবেন। রোমহংক! আপনাকে চিঠি না-লেখার জন্তে অপরাধ ক্ষমা করবেন এ ছাড়া আর কি বসতে পারি? আমি সত্যিই বড় অন্ততঃ।”

—ক্রমশ:

বিজয়া-দশমী

গল্প

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

ছবিশ বছর বয়স আর এমন কি—কিন্তু অসীমানন্দ বক্যোপাধায়ে মাথার চুলগুলি ক্রমে ক্রমে সাধা হইয়া উঠিল। চমৎকার স্বাস্থ্য, দীর্ঘ ক্ষুদ্র দেহ, প্রশস্ত বক্ষ, মুখের মস্তক চর্ক কোনোখানে বৃদ্ধিতে হয় নাই, ললাটে রেখা পড়ে নাই—তবু তুহার-শীর্ণ দিগ্বিশেষ মত, অসীমানন্দের সাধা মাথা জড়িয়া ঘন সাধা চুল :—দৈব ত্বণ্টনা হয় ত, কিন্তু তাহার-ও একটি গুণ্ডীর সৌন্দর্য আছে।

ভীবনের যে দিনগুলির উপর দিয়া যৌবন নদী-স্রোতের মত প্রবাহিত হইয়া গেল, অসীমানন্দ প্রায়ই সেই-দিনগুলির কথা ভাবেন :—প্রবল বস্তা বেন, অথবা যুদ্ধ,—দেহের, মনের, মস্তিষ্কের; কিন্তু সে বস্তা গ্রামলতার ইন্দ্রিত দিয়া গিয়াছে; সে যুদ্ধ শেষ হইয়াছে ভয়-লাভে; বোঝা অসীমানন্দ ইচ্ছা-চোরে ক্লান্ত বেধ এলাইয়া সেই দিনগুলির কথা ভাবেন—কর্ম, প্রেম, আশা আর উৎসাহে চঞ্চল দিনগুলি!

চোখের কোণে বিন্দু বিন্দু আসিয়া জমা হয়, ললাট মাঝে মাঝে ঘামে ভিজিয়া যায়; ভালো করিয়া সেগুলি মুছিয়া ফেলিয়া ছোট টেবিলটির সমুখে টানিয়া লইয়া রাশীকৃত কাগজ-পত্রের মধ্যে আব্রহ্মসম্পর্কের স্তোত্র করেন; দাপানের জাক-বগিলির ঠিক দিয়া জ্ঞান আলো আসিয়া পড়ে। বাবাম পাছগুলির মধ্য পল্লবের মধ্যে অসংখ্য পাখী কলরব করিতে থাকে; অসীমানন্দ কখন যে অমৃতমন্ডল হইয়া পড়েন তাহা আর বৃষ্টিতে পারেন না! যখন জ্ঞান হয়, ভাবেন, এই বৃষ্টি বয়স! 'ঠেক, আগে ত এমন ছিল না! সুকর পশ্চিম বাড়িয়া যায়—আবার কাগজপত্র রাখিয়া উঠি-চোখের মধ্য দিশিরা বাইতে ইচ্ছা হয়।

সাধা চুলে, অনাবশ্যক অকারণ ক্লান্তিতে, শীতলীর্ণ পাছগুলির পরমধরে, চারিপাশের নির্জন নিমঃপতায়, বড়

ঘড়ীটার অবিশ্রাম টেক-টেক শব্দে অসীমানন্দের মনে হয় বয়স বাড়িয়া চলিয়াছে—ইহার পর জরা—তাহার পর জীর্ণ বাড়িকা!

ভালার বলিলেন—ও-সব কিছু না, অসীমবাবু; মিছিমিছি রুড-প্রোয়ারের কথা ভাবেন কেন? চমৎকার হেল্প আপনায়! একটি দিনকত্তক বাইরে ঘুরে আহ্নন—সব ঠিক হয়ে যাবে!

দশ বছরের ছেলে থোকা আসিয়া বলিল—বাবা, আমাদের ত ছুটি আছে : সবাই চলে গেলে বেড়াতে, চলো আমরা-ও যাই!

পিতৃ পুত্রের মাথার ঘনকৃষ্ণ চুলগুলির মধ্যে আঙুল বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—বেড়াতে যাবি? মনে মনে ভাবিলেন—আশ্চর্য! ইহাধা বাবার কাছে আসিয়া আব্দার জানাইতে একটুও ভয় পায় না! অথচ আমরা ছোট বয়সে বাথকে কী ভয়-ই না করিতাম! বলিলেন—তোরা মা কোথায় রে থোকা?

পুত্র পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—মা? মা ত নীচে আছে! বল্ বাবা, মাকে—বেড়াতে যাওয়ার কথা?

অসীম হাসিয়া বলিলেন—যাও, বঁশে এস! চঞ্চল প্রজাপতির মত থোকা বেন উড়িয়া বাহির হইয়া গেল!

স্ত্রী নীহার। বয়স তিরিশ। নীহার আর সে নীহার নাই—অসীমানন্দ ভাবেন! বয়স আর সময়—সবই বয়স আর সময়—অলক্ষ্যে অগোচরে শব্দহীন স্রোতে বহিয়া

১৩৩৯

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

উত্তরা

১২৭

চলিয়াছে—আবর্তে আর ঘূর্ণিতে শুধু নব নব রূপ, নব নব পরিবর্তন! নীহারের কটিদেশ বেঠন করিয়া ধরিতে আগে শুধু বামহাত-ই ছিল পধ্যাঙ্গ! যৌবনের পরিপূর্ণতাকে নীহার যেন একটু বেশিমানায় অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। নীহারের চোখের কোণে বেন আর রং নাই—গতি বেন স্থির, মধুর হইয়া আসিয়াছে। অসীমানন্দ তাহার নিজের মাগাচুলের কথা-ও ভাবেন! সবই বয়স আর সময়—পাখীর মত উড়িয়া চলিয়াছে, কাহার ঘরে দিয়া নীড় বাধিব কে জানে?

এই যে, এখানে দাও—বলিয়া অসীমানন্দ টেনিলের উপর, হাতে কাগজ-পত্র, ফাইল, বই প্রভৃতি সবাইয়া ফেলিলেন : নীহার একহাতে চাঁর পেয়ালা, অর্ধর হাতে থাবারের রেকাবি লইয়া টেবিলের কাছে আসিয়া পাড়াইয়াছে। মাথায় গুঠনের প্রাক, ছুটি হাত বাস্ত থাকা, অবিস্তৃত কেশ-পুঞ্জের কিনারে আসিয়া লাগিয়াছে; থাবার আর চাঁর পেয়ালা টেবিলের উপর নামাইয়া দিয়া অসীমের চোয়ারের একটু কাছে সুবিধা আসিয়া নীহার যুদ্ধক্ষেত্রে বলিল—হঠাৎ বেড়াতে যাঁবার সম্ভ হল যে, কি ব্যাপার!

স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া অসীম দেখিলেন, সেখানে একটু হাসির উজ্জলতা আছে : বলিলেন—কেন, তোমার কি ইচ্ছে নেই?

গুঠনের প্রাক্স কখন মাথা-ইহাতে নামিয়া কানের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে, নীহারের তাহা মনে নাই। অসীম তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, মনে মনে ভাবিলেন, ইহা বোধ হয় নৃতন, রাড়ীতে আর ত কেহ নাই—তা ছাড়া বয়স-ও হইয়াছে, যৌবনের সঙ্কটচ্যুতকে বয়স-ই কাড়িয়া লয়—অসীমের মন এমনি উড়িয়া চলে! নীহার কিন্তু হাসিয়া বলে—না, ইচ্ছে আবার কার না হয়? তবে কোথায় যাবে—বাড়ী-ঘর-ঘোর—?

প্রশ্ন করার ভঙ্গীতে নীহার স্বাধীর দিকে চাহিয়া থাকে। প্রীবার দ্বিগত আবেলানে নীহারের স্মৃগঠন লগাটের চুলগুলি

ছলিয়া উঠে। অসীম তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—বাড়ী-ঘর-ঘোরের ভক্ত ভাবনা? কি? বেশি গিনের ব্যাপার ত নয়—এই ধরো দিন পদে! বেশ একটু চেজ হবে—

মকেতুকে অসীম পত্তীর সম্মতি প্রার্থনা করেন। বাড়ী-ঘর-ঘোর, বাগান,—এ সবের মাঝা কাটাওয়া কখন যে নীহার সম্মতি দেয়, তাহা সে নিজে ঠিক বৃষ্টিতে পারে না। হুহুত সে অসীমের সাধা চুলগুলিকে আবার নৃতন করিয়া দেখিয়া লইল, অথবা অসীমের লগাটের ও চোখের ক্লান্ত নীহারের দৃষ্টি এড়াইল না!

ঘোঁটের বন্ধমান অবধি যাওয়া স্থির হইল। সেখান হইতে ট্রেনে আর-ও দূর। তবু একটু নৃতনহ আবে। অসীম ভাবেন, 'অভাব যখন নাই, তখন বৈচিত্র্য-ই চাই—তাহাকে সৃষ্টি করিতে হইবে—সময়কে জয় করিতে হইবে, তীব্রবেগে আর গতিতে।

ছুইবারের অসংখ্য পোকান, অপরাধ সাধ-সজ্জা, সমুদ্রের আকাশটুকুর অজস্র তারের জাল, পাশের ট্রাম-লান্স, মাড়োয়ারীদের জবজব করণের পল্লী, নানা বিচিত্র শব্দ আর কোলাহলের সংঘাত তীব্রবেগে অতিক্রম করিয়া অসীম সপরিবারে চলিলেন। মাঝে মাঝে হর্ণের শব্দ—অগণ্য পথচারীদের বিহ্বল, বিরক্ত, শঙ্কিত দৃষ্টি—তাহার পরই উদ্ভুক্ত, উদার গঙ্গা—কালো কালো নৌকা, আর তরল জলস্রোত।

গ্র্যাণ্ডট্রাক রোডের অবস্থা আকর্ষণীয় ভালো। গাড়ীকে হোট্ট বাইতে হয় না—কিছুদূর পধ্যাঙ্গ। কড়ের বেগে গাড়ী সমুখে অগ্রসর হয়—থোকা হাততালি দেয়, আর বলে—কি মজা!

হোট্ট হোট্ট কয়েকটি ব্রিজ অতিক্রম করিয়া গাড়ী যখন একটি উপনগরীর মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল, বৃষ্টি-বাহুর বুদ্ধ শিশুগাছগুলির দিকে চাহিয়া অসীম একটু নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বোধহয় পুষ্ক-বৃষ্টি; চারিদিকের

বাঁকীগুলি ঠাণ্ডার পরিচিত। নীহারের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—নাক, এ জায়গাটা তোমার মনে পড়ে ?

‘নাক’ নামটি সেকালের। আজকাল নীহারের কোনো ডাকনাম নাই। তাই, নীহার একটু বিস্মিত হইয়া বলিল—
কৈ, না ? কি নাম এ জায়গাটার ?

—মনে নেই তোমার ? এখানে যে ছ’বছর ছিলে !

—ও, বৃদ্ধি; ঐ যে সেই মন্দির—ঐ যে সেই বাজার ; সেই ধানের ঘাট—মনে পড়েছে ; কতদিন আপেকার কথা—মন ?

অসীম অক্ষ মনে করিলেন—হ্যাঁ। মন ঠাণ্ডার ঘোল বৎসর পিছাইয়া গেল। এখন-ই সেই বাড়ীটির কাছাকাছি গাড়ী আসিয়া পড়িলে। ঐ যে বাড়ীটি দেখা যায়। আশ্চর্য—এ যে একবারে ভোল বহলাইয়া ফেলিয়াছে। কি যেন একটা ‘আশ্রমের’ সাইন-বোর্ড চোখে পড়িল। পিছনের সেই বিস্তার বেড়াটির বদলে চমৎকার পাচিল উঠিয়াছে, অপরাধিতার লতাগুলি বা কোথায় ?

গম্বার ধার হইতে রাস্তা ক্রমশঃ সরিয়া গেল। অসংখ্য কুটির, ক্ষেত-খামারের মধ্য দিয়া রাস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। গম্বা পিছনে পড়িয়া রহিল, সেই বাড়ীটিও পিছনে পড়িয়া রহিল। অসীম ভাবিলেন, মোটরের মতোই ঠাণ্ডার জীন-হু-শব্দ ছুটাই আসিয়াছে। মোটরের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু জীবনের শব্দ কে শুনিবে ?

অসীমের স্মৃতি ঈমারের সার্কুলাইটের মত অতীত জীবনের অন্ধকার কূলে কূলে আলো ফেলিতে লাগিল—
শূন্য নাকি, স্পষ্টতা নাই। অসীমের স্মৃতিকে বিখাল করিয়া লাভ কই—আলোয়ার মতই সে এখানে সেখানে বারে-বারে জলিয়া উঠিলে—ভাবনার স্বরগুলি বর্তমানের ক্ষুরধার তীক্ষ্ণতার বারে বারে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইবে। তাহার চেয়ে কাহিনি শুনিয়া রাখা ভালো ; সেটি এইরূপ :

—অসীমের বয়স হুড়ি, নীহারের বয়স চোদ্দ—বিবাহ হইল ; সত্যতঃ আকর্ষিত বিবাহ। কারণ, অসীম তখননা

ছাত্র ; আর নীহার একেবারে ছেলেমানুষ, সরল আর অভিমাত্রী।

অসীমরা তখন গম্বার ধারে ঐ বাড়ীটিতে ছিল। বাল্যকাল হইতেই উভয়ের জানা-শোনা থাকিলেও, নীহার-রা মনো কয়েক বৎসর বিহার-অংশে ছিল। হঠাৎ বিবাহের কথাবার্তা হইতে হইতে একেবারে সমস্ত স্থির হইয়া গেল। বিহারের নালিক আর বাগানের প্রাচুর্য লইয়া নীহার-রা যখন কিরিয়া আসিল, তখন অসীম নীহারের সঙ্গে দেখা করিতে একটা অদ্ভুত সঙ্কোচ অনুভব করিল। জীবনে এই প্রথম, তবু সঙ্কোচটুকুে তাহার বেশ লাগিল। সেই সঙ্কোচকে অতিক্রম করিয়া সে আর নীহারদের বাড়ীর দিকে গেল না।

প্রতিদিন যাহাকে দেখিয়াছে, রূপগঠিত যে, সে কি করিয়া মনকে আকর্ষণ করে, এ-সমক্ষে অসীমের মনে-মনেয় ছিল—কিন্তু অসীম ভুল করিয়াছিল, নীহারের কৈশোর আর যৌবনের বয়সসন্ধিকে সে দেখে নাই—বালিকা নীহারকে সে দেখিয়াছিল ; তাই বিবাহের পর প্রথম রাত্রের অসীম যখন অনুভব করিল যে, ঘরপানিতে নীহার আর সে ছাড়া অস্ত কেহ নাই, তখন নীহারের অর্ধগুপ্তিত মূখের দিকে চাহিয়া সে বিস্মিত হইল ; তাহার মনে হইল এ নীহারকে সে প্রেমে নার—এ তাহার কাছে অপরিচিত ; অমনি একটি অপরিচিত নারীর বেই ও মনের হৃদয় উন্মাদিনী তাহার মনকে জাগ্রত এবং পূর্ণগত করিয়া তুলিল।

কিন্তু সে যে কিছুই জানে না—মুখটি-নামাইয়া যে বহু অভ্যস্ত উদগার ভঙাঠে বসিয়া আছে, চমৎকার একখানি নীলারঙী সাড়ীর মধ্য হইতে বাহার গম্বার কাছে রাউনের বানিকটা অংশমাত্র দেখা যায়, বাহার হুগোল হাতের সৌর আভা নীলাধরী ঢাকিতে পারে নাই,—তাহাকে কি করিয়া সে প্রথম সম্ভাব্য জানাইবে ?

কি কথা বলা যায়, কি কথা। ক্রমশঃ কথাগুলি মনের মধ্যে ভিড় জমাইতে থাকে। বুকের মধ্যে ভোলপাড় করিয়া ভারি একটা অস্বস্তিকর অবস্থা আনিয়া দেয়। অংশে নীহারের হাতপানি সে হাতে তুলিয়া লয় ; বিছানা-পুঞ্জের মত হাতপানি সরাইয়া লইয়া নীহার ঘাটে একবারে প্রান্তে দিয়া বসে।

অসীমের মুখ দিয়া প্রথম সম্ভাব্য বাহির হয়—ও কি, তুমি স্তম্ভ চুপ, হ’লে কবে থেকে ?

গুপ্তনের মধ্য হইতে ‘অজ্ঞোজ্ঞারিত শব্দ বাহির হয়—
নিজে বড় কম কিনা—যাও ! তারপর অসীম আর কথা হ’জিয়া পায় না—‘শব্দহলা’, ‘ওগেলো’, ‘নাড়োঁট অব’
‘কেনিস’ এ-সমক্ষে কোনো কথাই লেখে না !

মুখ টিপিয়া টিপিয়া নীহার হাসে ; সে হাসি অসীম দেখিতে পারে না। অংশে অসীম কোনোমতে মনকে সন্ধি করিয়া লয়—কিন্তু সে সন্ধির স্থায়িত্ব ক্ষণকালের ; সাধারণতঃ ধরিয়া মান-অভিমানের পালা চলে।

অগ্নি আর গুপ্তের উপমাটি শাস্ত্রকারদের রচনা—কিন্তু উপমাটি এখনো স্পষ্ট এবং পরিষ্কার রহিয়াছে, তাই উভয় পক্ষের অভিভাব্যদের আর বিশ্রাম নাই। অসীমের পরীক্ষা অসম, এবং নীহার অনেকদিন এ-বাড়ী আসিয়াছে, এখন কিছুদিন তাহারে ‘ও-বাড়ী’ যাইতে হইবে।

নীহারের মুখে সবেমাত্র একটি মধুর লাগনা স্মৃতিতে আরম্ভ হইয়াছিল, অসীমের সঙ্গে চোখোচোখি হইলেই একটি সলজ মধুর হাসি সবেমাত্র বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল, এমন-সময় পাঠ-নিমগ্ন অসীম সহসা একদিন লক্ষ্য করিল, নীহার নাই।

অভিভাব্যদের মর্যদা বাহু হইল, অসীমের পড়াশুনার বিষয় ঘটিল ; জানালাটি গুলিলেই যে গম্বার ঢকল, উজ্জল, তরল জলপ্রোত মনটিকে অংশকে হৃদয় ভরিয়া দিত, সেই গম্বার, দিকে চাহিয়া অসীম শান্তি পাইল না। কাহাকেও কিছু না বলিয়া অসীম একদিন নীহারদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল।

—কেন এসে ?

—কেন আসূর না ?

—যাও, একুনি চ’লে যাও বহুজি—পাশ দিতে হ’বে না ?

—না হ’বে না, শোনে বহুজি—

—শুনব না—যাও শীগগির পালাও—ওকি ? বাঃ, না—ওসব চলেবে না—তুমি কিশোরী পুরজার দিকে ক্রমশঃ সরিয়া যাও—কিন্তু পিছনে চাহিয়া দেখিতে তোলে না।

অসীম বানিকক্ষণ শুক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সহসা কোণার চটির শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়,—দরজা গুলিয়া নীহার পলায়ন করে।

অসীম অনেকক্ষণ বিমূর্ষের মত দাঁড়াইয়া থাকে। চটির শব্দ মিনাইয়া গেলে সকলের ‘অলক্ষ্যে’ আবার বাহির হইয়া যায়।

আলো আনিয়া বই গুলিলেই অক্ষরগুলি চোখের সম্মুখে ভিগ্ন বাজী খাতিতে খাতিতে একে অপরের বাড়ি পড়িয়া দৃষ্টি ঝাপসা করিয়া দেয়।

যের শান্তি নাই, বাহিরের শান্তি নাই—চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসে।

একদিন শোনা গেল সহরে এপিডেমিক দেখা দিয়াছে ; নীহারের বাবা অত্যন্ত অসুখ-ভীক লোক ; পাড়ার কোনো বাড়ীতে অর হইয়াছে শুনিলেই নিজের বাড়ীতে সাঙ ফিলাইয়া থাকিতেন ! এপিডেমিকের আবির্ভাব ঠাণ্ডার সহ্য হইল না। পোটলা-পুটলি বাধা হইল, বাস্তবিক অভ্যাস প্রভৃতি লইয়া একদিন নীহার-রা পশ্চিম-বাড়ী ট্রেনে বসুন্স হইয়া গেল। অসীম সেদিন বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিতে রাত্রি করিল ; পরীক্ষা আসিয়া পড়িয়াছে, অথচ পড়তানা বিশেষ কিছুই হইল না। অর্নবক সন্ধান সন্ধান বাড়ী ফিরিয়া মনোযোগী ছাত্রের ভাণ করিতে তাহার আর ইচ্ছা হইল না। পশ্চিম চলিয়া গিয়া-নীহার সব নষ্ট করিয়া গেল—তাহাদের শূন্য বাড়ীটার দিকে চাহিয়া থাকিলে চোখ যেন জ্বালা করে।

বাড়ীর সম্মুখে আসিয়াই অসীম দেখিল, বাহিরের ঘরপানি খোলা। ঘরে আলো জ্বালা হইয়াছে এবং খোলা দরজা দিয়া সেই আলো অন্ধকার পথের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

অসীম বাহিরের ঘর দিয়াই যাইবে। ভিতরে আসিতেই দেখিল, ঢোকীর উপরে মিনি বসিয়া আছেন, ঠাণ্ডাকে সে কখনো দেখে নাই। সেখানে আর না দাঁড়াইয়া ভাড়াভাড়ি সে বাড়ীর মধ্যে যাইবে, এমন সময় তিনি বলিলেন—

—আমি তোমার কাঁকা হই, বাবাকী, আমাকে ত কখনো দেখো নি, আর কি ক'হেই বা দেখবে?

অসীম ঠাণ্ডার দিকে ফিরিয়া চাহিল। মুখে বহুদিন ক্ষৌরকাঁবা না হওয়ায় চিরু রহিয়াছে। প্রায় সম্মানীয় বেশ—গোঁফা চারখানি বেশ করিয়া গায়ে জড়াইয়া বসিয়া আছেন—পরিচয় দিতে গিয়া অর্দ্ধ কৌতুক, অর্দ্ধ স্নেহ, এবং স্নেহতরঙ্গিত স্বর মাথু বেশ উজ্জ্বল।

—আজ্ঞে না, আমি ত দেখি নি, কখন এলেন?—
বলিয়া অসীম হেঁট হইয়া ঠাণ্ডাকে প্রণাম করিল।

—বিকেলের গাড়ীতে এসছি বাবা—দীর্ঘাঘু হও।—
ভাড়াভাড়ি তিনি অসীমের মাথার হাত দিয়া বলিলেন—
ব'সো!

—এত দেরী হ'ল কেন রে?—অসীমের বাবার কণ্ঠস্বর শুনিতো পাওয়া গেল। অসীম আপাদমস্তক একবার শিহরিয়া উঠিয়া কীৰ্ত্তকণ্ঠে বলিল—বীরেন্দ্রবের বাড়ীতে ছিলাম—পড়াছিলাম!

—বাও, আর দেরী ক'রো না, পড়তে ব'সো গে বাও!—
অসীম দলানো আসিয়া দেখিল, মা কেওলা সে দিয়া বসিয়া আছেন, ভাই-বোনগুলি আশেপাশে মাজরের উপর দুইদ্বীয়া পড়িয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল,—না, রামা শেখ হ'ল তোমার?

মা ভালো করিয়া উঠিয়া বলিলেন, বলিলেন—না, আজ ত, ব'দি নি আমি! কে এসেছে জানিনি না বুঝি!

—হ্যাঁ মা, বসুলে, কাঁকা হ'ল আমার—সম্মানী, তিনি ত?

—দূর সম্পর্কের কাঁকা? সম্মানী হয়েছে চণ্ড, ক'রে—
আর, ওর সঙ্গে যে এসেছে—?

—জো না?
—সম্পর্ক এমন-ই বা কি? হোর কাকীমার, বোনে—
পায়েই ছিল এতদিন, বড় ভালো মেয়ে রামাবামার ভূর

দেবার সঙ্গে তা'কেই আনাশাম বাপু, আমি আর পারি নে!

—বেশ হয়েছে মা—বলিয়া উপরে যাইতে যাইতে অসীম একবার রামাঘরে উঠি দিয়া গেল। অসীম দেখিল উঠুনে প্রকাণ্ড ভতের হাড়িতে ভাত ফুটিতেছে, আর তাহারই সম্মুখে শিড়ির উপরে বে বসিয়া আছে, অসীমের মনে হইল, সে বিধবা। তাহার মুখ ভালো করিয়া দেখা যায় না—
পদমূল সচকিত হইয়া রেখা দরজার দিকে চাহিয়া দেখিল কিন্তু অসীম তখন তাহার পড়বার খরে চলিয়া গিয়াছে।

অসীমের মনে হইতেছিল, ইহাকে লইয়া আসা কেন? নীহারকে রাখিয়া বিলেই ত হইত; অসীম আসো আলিল, কিন্তু পড়িতে বলি না। সমস্তই বিচক্ষিয়ার বিষয়, মনে হইতেছিল। এই মন, লাইয়া পড়িতে বসা যায় না—তাহার ছাত্র-জীবনের ভিত্তিকে কে বেন উলাইয়া দিয়াছে।

সম্মানী মনিকাকা রহিয়া গেলেন, আজ যাই, কাশ যাই করিয়া ঠাণ্ডার আর বাওরা হইল না। এদিকে ঘন বর্ষা নামিল। বাসবরিক উৎসবের মত একবার করিয়া এই সময়ে বিভিন্ন অর্ধবিশ্বদেবের পাল। অসীমের ছুটি ভাই বোনে ভূগিয়া ভূগিয়া কল্যাণার হইল। ঘন ঘন ডাক্তারের, আনা-বাওরা এবং অনেক রানি-কাগরদের পরে সকলেই যখন স্নানহিত্তে অবসর, তখন ডাক্তার বলিলেন—এই সমস্তা দিন কতক চেজের দরকার।

চেজের বাওরাই স্থির হইল। অসীমের পরীক্ষা আসন্ন—
কাজেই অসীমকে থাকিতে হইবে। মনিকাকা বধন-আছেন, তখন বুড়ী কি এবং রেখা থাকিলেই চলিবে। এই জগৎ স্থির করিয়া অসীমের বাবা ছুটি লইলেন এবং সকলকে লইয়া চেজে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—
মনি, দেখানোনা ক'রো সব। এরা একটু স্নেহে উঠিলেই আমি কিরব। অসীমের পড়াশুনোর দিকে একটু লক্ষ্য রেখো!

মনি কাঁকা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—আমি ত বেশীদিন থাকতে পারবো না দাদা! বাড়ীতে সব—

—আরে তুমি সম্মানী মাহল,—গলাবান করো—
পূজা-আলিক করো—তোমার প্রথম ভাড়া কেন? থাকো; আমি না এলে তোমার বাওরা হ'বে না!

মনিকাকার পক্ষে আর কিছু বলা সম্ভব নয়।

অসীমের মা রেখাকে ডাকিয়া বলিলেন—বাড়ী-ঘর-দোর হইল বোন, দেখি! অসীমের এগু-জামিন, তা' না হ'লে সবাইকেই নিয়ে যেতাম।

রেখা জানমুখে যাড় নাড়িয়া জানাইল যে, সে সব দেখিবে। তাহার, অস্বস্ত সয়ল ছুটি চোখের পলক ভিজিয়া ভারী হইয়া উঠিল। শূন্য বাড়ীতে চারিদিক নিস্তব্ধ, হইয়া যাইতে—আর ঐ ত মনিবাবু—একবার গীতা পুসিয়া বসিয়াছিল, ত আর কিছু বলিবার নাই। আঁশের পুটি দিয়া চোখ মুছিয়া রেখা চলন্ত গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিল।

অসীম আসন্ন পরীক্ষার জন্ত প্রাণপণ প্রয়াস হইতে থাকে। চারিদিকে তাকাইয়া দেখিবারও যেন তাহার সময় নাই। সময় থাকিলে দেখিতে পাইত, রেখা নিঃশব্দে কাপড় তুলিতে আসিয়াছে। নিঃশব্দে রানীকৃত কাপড়ের মধ্যে গাছাইয়া মুদ্র-মুদ্রিতে পাঠ-রত অসীমকে দেখিতেছে। রেখার কাছে এ দৃশ্য নতুন। আর, অসীম, অজুত ছেলে,—
রেখাকে মাসীমা বলিয়া ডাকা দূরে থাকুক, নাম ধরিয়াই ডাকে। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, তুমি আমার চেয়ে বড়ত তিন চার বছরের বড়—তাই বলে তোমাকে মাসীমা বলব? কখনো না! ও সব আমার দ্বারা হ'বে না।

একদিন পড়িতে পড়িতে হঠাৎ অসীম শুনিতো পাইল, বুড়ী কি কাছাকে বেন বলিতেছে—হ্যাঁ গো, ভালো আবার চাই! বিধবা মানুষের আবার একপটি চুল থাকে নাকি বাপু! আমরা হ'লে কোন্ কালে সব বুড়িয়ে ফেলতাম। জোরের কণ্ঠস্বর নীচু করিয়া বলিতেছে—অনু হয বাপু! আমরা! ছাবের পরে বিকেল বেলা পায়চারি-করা—

সাবান মাথা—এ সব কখনো দেখি নি। এখনো—সামান্য পক্ষি, যার সর তাই ভাঙো—তা না একটু আবার শ্রুত পাড় থাকা চাই!

অসীম পড়িতে পড়িতে চাঁৎকার করিয়া উঠে—এই বুড়ী, কি হচ্ছে সব? চুপ, কন—অন্ত চ্যাচারিস্ কেন? বুড়ী চুপ করিয়া গেল। কিন্তু অসীমের আর পড়া হইল না, রেখা যে বুড়ী ফির পুষ্টি আর্ষণ করিয়াছে, এতখান্য তাহার কাছে বড়ই বহুতময় বলিয়া মনে হইল।

—রেখা, টেম্পারেচারটা একবার দেখো ত! জানো ত দেখতে?—ঐ যে ওখানে থার্মোমিটারটা আছে!

রেখা নিঃশব্দে থার্মোমিটারটা তাকিয়া অসীমের হাতে দিল। অসীমের আজ তিন-চারদিন হইল জ্বর হইয়াছে।

ইহার পূর্বেই একদিন মনিকাকা তাহার খোলালুলি গুছাইয়া বলিলেন—আমি চললাম রেখা, ৭৮ দিন পরেই আবার ফিরব। আমি না থাকায় বাড়ীর যে কি হাল হচ্ছে, তা ত বুঝতে পারো—দাদাকে জানিও না বেনে,—আমি খুব শীগগির ফিরব!

শীঘ্রই ফিরিবেন জানিয়া রেখা বিশেষ আপত্তি করে নাই। কিন্তু সাত আট দিন শেষ হইয়া গেল, মনিবাবু ফিরিলেন না। এদিকে অসীমেরও জ্বর—এখান থেকে শুরু হইয়া গেল।

অসীমের পরীক্ষার আর চার পাঁচ দিন বাকী—আশঙ্কায়, উৎসে অসীমের প্রাণ-শব্দা তাহার কাছে এক এক সময় বড় নিরাশ্রয় বলিয়া মনে হয়। অসীম অস্থির করে, তাহার মানসিক স্থিতি যেন ধীরে ধীরে—শিথিল হইয়া আসিতেছে। সমুদ্র শিখি রাঙে—শরীরের উত্তাপ তরঙ্গের মত উঠিতে নামিতে থাকে।

জ্বর কিছু ছাড়িল না, অসীমের মনে হয়, মেরুভাগের উপর দিয়া শির-শির করিতে করিতে যে কম্প সমস্ত দেহময় ছড়াইয়া পড়িল, তাহা জর নয়, তাহা যেন 'একটা' দমন—
অসুখা গুঠ দিয়া যেন সে শরীরের সমস্ত রস, প্রাণ-পেশী-

হুজা হইতে শুবিয়া লইতেছে। প্রতিদিন প্রাতে যখন জরের বেগ একটু কম থাকে, অসীম বিছানার উত্তীর্ণা বসে, রেখা প্রতিদিন সেই সময়ে দান করিয়া ভিজা কাণ্ড ছাড়িয়া একখানি শুক মৌত বস্ত্র পরিয়া আঁচলি মাথার উপর দিয়া একটু টানিয়া দেয়, যখন রক্ত ক্রমিক কেশ মাথার পাশে রেখা যায়—কান চাকিয়া পিঠের দিকে চলিয়া গিয়াছে। একটু হৃৎ-স্পন্দন-স্বিত সৌভেদ ঘরখানির প্রসবতা জাগিয়া উঠে। অসীমের চক্ষু বিদ্র হই—জরের উত্তাপ যেন একটু কমিয়া আসে।

—রেখা, আর ছাট বেদনা আমাকে ছাড়িয়ে দাও ত। মগি-কাকা বোধ হয় আর এলেন না—কেমন? রেখা নতমুখে বেদনা ছাড়াইতে বসে। অসীম হাত বাড়াইয়া কানাকুলি লইয়া মুখের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। চিবাঁইতে চিবাঁইতে বলে—কি বিদ্রি! জর হ'ল বলে দেখি! পরীক্ষা বোধ হয় বেজোরা হ'ল না।

কিছুকণ কোনো কথা নাই।
মুড়কট্ট রেখা বলে—ভয় কি? ও কিছু নয়। ডাক্তার বাবু কি বলছেন?

—কি জানি? ওষুত তা আজ ছ'দিন ধ'রে খেয়ে চলেছি।

—রেখা, তুমি লিখতে জানো কি?

রেখা বাড় নাড়িয়া বলে,—হ্যাঁ, জানি।

—তা হ'লে একখানা চিঠি বাৎকে কিংবা মা'কে লিখে দিয়ে ত! আমার অন্তরের কথা লিখে দিয়ে।

—রেখা একটু হাসিয়া অসীমের দিকে চাহিয়া বলিল—

তোমার বলবার আগেই আমি লিখে দিয়েছি।

রেখা চলিয়া গেলে তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া অসীম ভাবে, শুধু যাব বুঝি কি থাকিত—তাড়া হইলে কি অবস্থা! তবু রেখা কোথা—হইতে আসিয়া পড়িয়াছে—

তাই হইবে; নাহিলে অন্তরের এত গুঁটি-নাট দৈবিক কে?

—পরীক্ষার দিন আসিয়া পড়িল। রোগশয্যা অসীম খোলা জানালা দিয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া থাকিত। একে

একে পরীক্ষার দিনগুলি শেষ হইয়া গেল। অসীমের এখন বিছানা হইতে উঠিতে কষ্ট হয়। মস্তকের দায়ু-কেন্দ্রগুলি অসম্ভব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে—ছেঁটি একটি পাখীর শব্দ, সমুদ্রের অপরাক্রান্তার ঝংঝং নীল কুল—আরো একটু দূরে চাহিয়া দেখিলে গঙ্গার বিস্তীর্ণক অসংখ্য নৌকার ব্যতায়িত—মাঝিগানদেব কলসর সমস্তই অসীম দেখিতে এবং ভাবিতে পার, কিন্তু এই সকল দৃশ্য আর শব্দের ব্যতী হইয়া অসীম তাহার মনকে বেশি দূরে পঠাইতে পারে না।

দেখিবার আর ভাবিবার পর একটু চাকলা—তাহার পরই গভীর অহসাদ ও মৈত্রাস—মাথাটা সময়ে সময়ে কিছু কিছু করিয়া উঠে। তাহার কাছে সমস্তই যেন নীরে নীরে পান্যপের মত নিপন্য হইয়া আসিতেছে।

অসীম ত ভেমন লক্ষ্য করে না—কিন্তু রেখার মূখে একটা গভীর বিষয়তার ছায়া ঘনাইয়া আসে।

—বালিশটা জানলার দিকে ক'রে দি; মাথাটার একটু হাওয়া লাগুক, কেমন? অসীম বাড় নাড়িয়া সম্মতি জানায়। সে যেন একটা শিশু, রেখা হুজা করিলে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া যেমন করিয়া ইচ্ছা, শোয়াইয়া দিতে পারে।

উজ্জল রং যেন নিবিয়া গিয়াছে—নির্মাণোবধু ধীপশিখা যেন শুধু কালি আর ধূম ছড়াইয়া ছড়াইয়া স্রাস্ত হইয়া পড়িতেছে। কেবল উজ্জল ছটি চোখ আর স্থায়ী নাসিকা লক্ষ্য করিবার বস্তু; বাকী সব শীর্ণ কয়েকখানি অস্থি—পারের আঙুলে হস্তীক চক্ষু বিকরিয়া যেন একটা অসুস্থ 'ভাঙ্গায়া'র এককণ্ঠের মধ্যে তাহার দেহের সমস্ত রক্ত নিশেমে টানিয়া লইয়াছে।

—বাবু! কণ্ঠে রেখা বুঝি কৈ প্রব্র করে—বি, কোনো চিঠিপত্র আসেনি বাইরে?

—না বাবু! কি অলক্ষণ যে হ'ল না, কিছুই ভালো বুঝি নে আমি!

কেমনি বাবু! কণ্ঠে রেখা ডাক্তার বাবুকে প্রব্র করে—এ কী অসুখ ডাক্তার বাবু? জর যে ছাড়তে চায় না—

—ভয় কি মা? একটু দৌরী হ'বে যাবতে এই যা; নৈলে কোন্ এমন কিছু সিরিয়স নয়!

পক্ষিমের ভল-হাওয়া সম্ব হইল না। অসীমের ভাই রজন আবার অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। চিঠি আসিল—আর আসিল টাকা। রজন সুস্থ না হইলে কাহারও এখন আসা হইতে পারে না। তবে নৌহার-রা শীঘ্র বাইতেছে। দেখা বৃদ্ধিমতী—রেখা যেন সমস্ত বাস্তব করে। তা' ছাড়া মনি আছে। সে-ও দেখতে শুনে। অসীম একটু সুস্থ হইলেই যেন পক্ষিমে-চলিয়া আসে।

এবল জরের ঘোর অসীম প্রলাপ বকিতে থাকে। রেখার হাতখানি বুকের উপর টানিয়া লইয়া অসীম বলে—নৌহার, তুমি এলে,—আমার পাশ ধেকো যে হ'ল না নৌহার! জুরের প্রলাপ—কোনো বাধা কোনো সঙ্কোচ নাই। নিরঙ্ক অস্ত্রপ্রোত কথার মধ্য দিয়া দৃষ্টিয়া বাহির হয়। রেখা চোখে আঁচল দিয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকে—নৌহারের গাড়ী কখন আসিবে!

অবশেষে নৌহার-রা আসিল। নৌহারের মা আর বাবা আসিয়া অসীমকে দেখিয়া গেলেন। নৌহারের বাবা ডাক্তারের সঙ্গে কি পরামর্শ করিলেন, তাহার পর বাড়ী আসিয়া নৌহারের মাকে বলিলেন—হ'ল না; ডাক্তারের নিষেধ ও কেনে চলতেই হবে!

নৌহার যেন ও-বাড়ীর দিকে ভুলেও না যায়! সেলেও অসীমের কাছে বাড়িয়া গুর নিযুক্ত।

—ও মা, সে কি গো? জামাই-এর জর, মেয়ে গিয়ে দেখ বে না?

—কাজকেও দেখতে হ'বে না—একা রেখা দশজনের কাছ কছেন—চমৎকার সেবা-শুশ্রূষা করেন, ডাক্তার বলছেন—

—বা! ভালো-বোঝো ক'রে বাবু, আমি ও-সবের মধ্যে নেই। অসীমের কপালে পাচটি টাকা ছুঁয়ে তুলে রেখেছি—

হুভাভাবালি সেরে উঠে যে মায়ের পুজো দেব!

অসীম সেদিন বাগিষে হেলানু দিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। আজ সকাল হইতে জর একটু কম। ডাক্তার আশা দিয়া গিয়াছেন, শীঘ্রই জর ছাড়িবে। রেখা ও-বাড়ী গিয়াছে।

আমিন মাস, কান্ড-বর্ধণ অপরায়। পুন্ডার আর বেশি দৌরী নাই—রাপার লোক লাচল বীরে ধীরে নদীর জোয়ারের মত বাড়িয়া উঠিতেছে। বাহিরের অগতের বিচিত্র কোলাহল—ছেলেদের উচ্চ হাসি, তীর চীৎকার—জীবনের চকল আনন্দ-প্রোত অসীমের কানে বড় বিষম অশ্রুত ঝুঁরে বাজিতে লাগিল। সে যেন এই সব শব্দের অস্বস্তি হইতে বঞ্চিত লাগিল। সে যেন এই সব শব্দের অস্বস্তি হইতে বঞ্চিত। সে যেন অপরচিত পবিত্র—বাহিরের ঘরে বসিয়া আছে, আনন্দ-নিকেতনের অস্ত্রপুর্বে তাহার যেন প্রবেশাধিকার নাই। বালিশটি টানিয়া মাথায় দিয়া অসীম বিছানায় শুইয়া পড়িল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল—এখনই অসংখ্য প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিবে,—সুখের প্রদীপ, আনন্দের প্রদীপ—ঘূর্ণের সৌরভ ভাসিয়া আসিবে। অগণ্য মাহুষের স্বাস্থ্য আর উজ্জাসের ভিগ্নাম থাকিবে না; অসীম ভাবিল, কোথায় পড়িয়া আছে সে—জড়বৎ মৃতপ্রায়, সবল সুস্থ জগৎ হইতে নির্মাসিত!

সহসা একটা মুগ্ধ এসেলের গন্ধ রোগীর দেহ-মনকে পুলকিত করিয়া তোলে। সূজীর একটু অস্পষ্ট ঋ-ধ্ব-শব্দ অসীম শুনিতে পার; হুই-একটা অশ্রুত স্ফার টুকরা কান ভাসিয়া আসে—

—কি হ'য়েছে তা'তে? এলো না একবার!

—না না; আমি যাই!

কিছুকণ পরে রেখা আসিয়া যত্নে আসে জালিল। অসীম বিছানায় উঠিয়া বসে; দুইহাত দিয়া কপালটি টিপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করে—কে এসেছিল রেখা? নৌহার নাকি?

রেখা আসোটি একটু কমাইয়া দিয়া অসম্মতের মত বলে—হ্যাঁ!

—এখানে একবার এলো না?

হ্যাঁ, হাসিয়া রেখা বলে—না, আমি ওকে জোর করে ধ'রে এনেছিলাম। হাজার হোক ছেঁদোমহুত ত!

কেন আনতে গেলে রেখা? যে আসতে চায় না, তাঁকে কেন জোর করা?—একটি সহজ স্থলভ বাণোচ্ছুকসে অসীমের কণ্ঠ ধ্বজ হইয়া আসে। মান আলোকে অসীমের বুকের রিকে তাক দৃষ্টিতে চাহিয়া রেখা বলে—তুমি কেন উঠে বসে, বলে ত! নড়াচড়া যে একবারে বাধণ করে গেছে—

আমার বেঁচে থাকাই বাধণ হয়ে গেছে রেখা! অসীমের চোখটি অশ্রুতে টলমল করিয়া উঠে।
দীপকে রেখা অসীমের কাছে আসিয়া পাড়ায়। অসীমের কলাটে হাত রাখিয়া ঝাঁস দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দেয়; বলে—শোও লম্বীটি, অমন করে বসে বেক না!

এমন কতবার হইয়াছে, রাজে রেখা ঘুমাতে পারে নাই। অসীমের পাশের ঘরেই সে থাকে। বুট করিয়া একটু শব্দ হইলেই তড়াহাড়ি অসীমের ঘরে আসিয়া একবার তাহাকে দেখিয়া আসে।

সেদিন অসীম তাহাকে বাইতে দিল না। বলিল—আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও, রেখা! কিছুতেই ঘুম আসছে না।

রেখা অসীমের শিরের কাছে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। সমুখের জানালাটি খোলা ছিল। উৎসবময়ী রাজি—পূজা আসিয়া পড়িয়াছে। প্রাণের ঢকল উজ্জল প্রবাহ যেন সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া আজ চতুর্দিক ভাসাইয়া দিবে। নীহারদের বাড়ীর ছাদে কে যেন গান গাথিতেছিল; সে গানের মধ্যে কারুণ্য নাই; তরানীত নাই। জীবনের যে দিক তরল, ফেনিল, আবহুদম—বাসনাময়, গানের মধ্যে ছিল সেই স্বর, সেই ভাষা।

অসীম একটু দীর্ঘ হাসিয়া বলিল—নীহারদের বাড়ীতে গান হচ্ছে, না রেখা?

রেখা নৃদকট বলিল—হ্যাঁ, নীহারের ভবীপতি এসেছেন কিনা; তিনিই গাইছেন।

অসীম কিছু বলিল না। কিন্তু তাহার মনের মধ্যে যেন তীব্র আগার যন্ত্রণা উঠিতে লাগিল। একদিকে মৃত্যু ঘরের মান আলোয় রোগীর মুখে দীর্ঘ ছায়া ফেলিয়াছে, আর অপরদিকে উদ্ভুক্ত জীবন মুখের কল্যাণ-প্রোতে বহিয়া চলিয়াছে।

রেখার মনের মধ্যে সেই বেদনা ত্বরিত হইয়া উঠিতে লাগিল। উপেক্ষা, অবহেলাকে সে-ত দেখিয়াছে, সে-ত তাহা চেনে। কিন্তু এ বড় বিজিক্তি—যাহার সব আছে, অথচ কিছু নাই, তাহার নিঃসঙ্গ অন্তরের নিঃশব্দ হাহাকাধর রেখার চিত্তকে পীড়িত করিতে লাগিল।

মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে রোগী কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহা সে জানে না। এইবার পাশের ঘরে উঠিয়া বাওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু রেখা উঠিল না। চেষ্টা করিলেও বোধ হয় রেখা উঠিতে পারিত না। অভাগিনী;
—তাহার ঘন ক্রম চুলগুলির শীর্ণ নীমন্ত-রেখায় সিন্দুরের জিহ্মাভ নাই। বসনধানির কোনো প্রান্তে জীবনের প্রদীপ্ত বাসনার কোনো রাগ-রেখা অঙ্কিত নাই কিন্তু তাহার আয়ত কালো চোখ দুটির মধ্যে একটা স্থগভীর রহস্ত ফুটিয়া উঠিল।

রেখা ধীরে ধীরে মুখানি নত করিয়া অসীমের অন্তঃস্থ শীর্ণ কলাটে তাহার পূর্ণ প্রস্তুতিত রক্ত-পুষ্পের মত পেলব অধর স্থাপন করিল। শুধু মুহূর্তের ভ্রূত। অসীম ঘুমের ঘোরে একবার পাশ ফিরিয়া শুইল মায়।

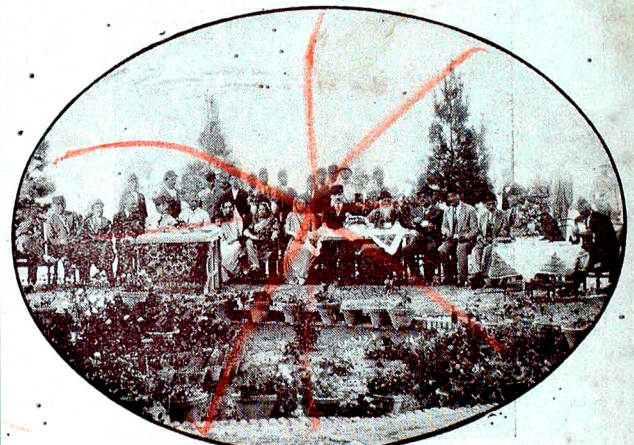
পাংশোন্মিতারের হৃদয় পাগুর রেখাটি পরদিন বেশদূর উঠিল না। অব ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। গাঙ্গার ঘাটের দিকের জানালাটি খুলিয়া দিয়া অসীম নিঃশব্দে বসিয়াছিল। শরতের রৌদ্র ঘরের মধ্যে বহিষ রেখায় আসিয়া পড়িয়াছে—কতকগুলি চুর্ণ রেংকুণা সেই তীব্র দীপ্ত রৌদ্রের মধ্যে চিক্-জিক্-জিক্-জিক্ করিতেছে। অসীমের দৃষ্টি উদাস—রোগ যেন তাহার বোধশক্তিকে অনেকখানি বাড়াইয়া দিয়াছে। সকাল হইতে কতলোক ধান করিয়া গেল—ঘাটের কাছে দিল্ল বগে পাড়াইয়া কত

পারশু-বাজী রবীন্দ্রনাথ

বিধবির রবীন্দ্রনাথ পারশু-রাজকে আমরণে, বিনাম পণে বৃন্দগণ ও গোপালগণ বেশ—পারশু ও ইরাক জনক করিয়া সম্মতি দেশে গিয়াছিলেন। ভারতের ভাব-সাম্রাজ্য কুস্তির সহিত, বৃহত্তর ভারতের "শ্রাটনতম সভ্যতার জ্যোতির্কর্ম"তিনি নির্মিত করিলেন, উপনিষদের সামর্যে উজ্জীবিত তপস্বী ভারতকে তিনি মর্যাদা প্রদান করিলেন, হৃদয়বাহী কামল-করণ, হৃদয়বাহী সঙ্গীতের মতো গ্রন্থিত করিলেন, আর পরিচিত করিলেন আটান হিন্দু নির্দুশ উদারতা এবং তপ মুক্ত ইন্দ্রপালনে মত্ত মৈত্রীকে।

যে-প্রথা, যে-গঠন পারশু ও ইরাকের কাছে আর তিনি দাঁড় করিলেন, তাহা ভারতের প্রাতি সমগ্র জগতের। এই বায়ু-তরী-বিহার সম্পর্কে অন্তর তিনি বাহ্য লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম এই:
নাটর মাসুদের সঙ্গে আকাশের যে-অন্তরঙ্গ পরিচয়ে এত হৃদয়, এত বৈজিয়া তাহা আমাদের জানাচ ভারের অভাব আছে গিয়াই—সেখানে হৃদয়ের সহায় সঙ্গম।

তৎস্বায় ভ্রম ভ্রমে তাহার পুত্রবৎ শ্রীমতী শ্রীমতী দেবী এবং কন্দ-সম্বন্ধগণে সঙ্গী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ অমিত্রভ চক্রবর্তী ও শ্রীকৃষ্ণ কোশলনাথ চট্টোপাধ্যায়।
এখানে আমরা তাহার বিমান-বিহার-নাট্যরূপ কবিতাময় ছবি মুদ্রিত করিয়া দিলাম।



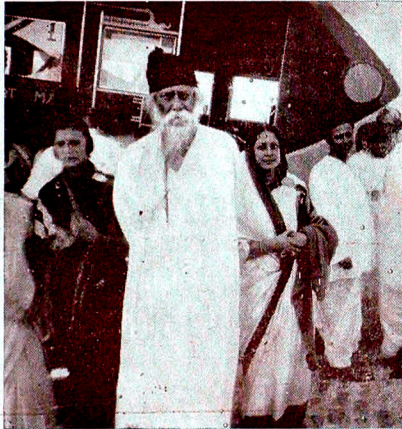
শিরের রবীন্দ্র-সংঘর্ষ



পারভেজ হকীমসাহেব



হাফিজের কবরে—কবি



শ্রীহরিশ্রী

লোক সৃষ্টান্তে 'আওড়াইয়া' গেল, এক-একটি করিয়া কুল-বেলের পাতা দিয়া কত মেয়ে পূজা সারিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল—এই কণ্ঠস্রোত, এই বিচিত্রতা তাহার প্রাণে একটা উদাস-রাসিগীর স্বর বাজাইতে লাগিল। শুধু অগাধ উদ্বুদ্ধ জগতের অভিমুখে যেতে ভাসিয়া চলিয়া যাওয়া—এই অহুত্বটি অসীমের রম্য শরীরে একটু আনন্দ-লহরী জগাইয়া তুলিল।

বাঁধানে বটতলার পাশ দিয়া ছুটি মেঘের দান করিয়া যাইতেছেন—প্রতি পদক্ষেপে সিক্ত বস্ত্র হইতে জল খরিয়া খরিয়া শুক পথের উপর যেন 'আলপনার' রেখা আঁকিয়া আঁকিয়া চলিয়াছে। *একটি মেয়েরকে 'অসীম' চিনিলা—সে তাহার স্মৃতিলা—পিছনে যে যাইতেছে, সে কে? নিশ্চয়ই নীহার ৯ নীহারকে দুই হইতে সে বড় একটা দেখে নাই। হঠাৎ নিজের শরীরের দিকে চাহিয়া 'অসীমের' মন সঙ্কোচে যেন বিমূঢ় নির্মম হইয়া উঠিল! কি অজ্ঞপ্ত গতি-ভঙ্গির স্রবণা—সিক্ত বস্ত্রের মধ্য হইতে উদ্ভাসিত যৌবন-শ্রী যেন কুলস্মারিনী নদীর মত—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে উজ্জলিত হইয়া উঠিতেছে। আর, 'অসীম' চিরকালের জন্য আপনাকে সজ্জিত করিয়া ফেলিয়াছে। বাতায়ন চিরদিনের মত রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে—বাহিরের বিজ্ঞানমক ঘরের মধ্যে আসিয়াও আসিতেছে না!

—অর বোধ হয় আর আসবে না—কেমন? রেখার কণ্ঠস্থের সত্যকিত হইয়া 'অসীম' মুখ তুলিল। রেখার দুই চোখেই যেন একটি আর্দ্র ঘেহকরণ বিষমতা! 'অসীম' মন কণ্ঠে বলিল—কি-জানি? 'আমা' না 'আমা' আমার পক্ষে সমান হ'বে গেছে! কোনো আশাই আর দেখি নে! একটি আঁধা হাসির রেখা 'অসীমের' শীর্ণ ওষ্ঠে ফুটিয়া উঠিল।

ওখা তবু বলিল—ভয় কি? আর অর হ'বে না। এঁরবার চোখে চ'লে যাও।

—হ্যাঁ, অর হোক আর না হোক, আমি যা'ব। আর ভুলো লাগছে না এখানে রেখা!

রেখা ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ভালো লাগিতেছে না—কিছুই ভালো লাগিতেছে না—একটা

'অবিচ্ছিন্ন' বিচ্ছেদের স্বর রেখার মর্মস্থলে গিয়া 'আমাত' করিল। কোনো কিছুই প্রত্যক্ষা' নাই—সকলেই চলিয়া যাইতেছে। রেখার চোখ জল জলে ভরিয়া আসে।

—আজ যে দশমী, 'আজই চ'লে যা'বে? আজ যে কোথাও যেতে নাই!

—না, 'আজই যা'ব রেখা, বাবা-মার কাছে যা'ব—তা'তে কি দিনকণ লাগে? আমার যে বড্ড বেগতে ইচ্ছে করছে!

—তা'লে সঙ্গে কারেকও নিয়ে যাও; রেখা শরীর—এতটা পথ যেতে কই হ'বে রে! অর ছাড় লেই ত আর শরীর স্বস্ত হর না!

—তা না হোক, স্ট্রেনে যা'ব, আরাম আর আনন্দে—কেউ সঙ্গে থাকলে সব মাটি হ'বে। তুমি এক কাজ কর, আমার যা'ব দরকার সব ঠিক ক'রে গুছিয়ে দাও; রেখা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইত, 'অসীমের' ছুটি চোখ একটা তীর অধীর আনন্দে জলিয়া উঠিয়াছে। স্বপ্ন, সমল কর্মশীল জগতের সঙ্গে মিলিবার 'আলাপ'! 'অসীম' দশমীর দিনই যাত্রা করিল। স্ট্রেনে যাইবার পথে 'অসীম' একটু প্যারে ইটিয়া গেল।

সবই যেন 'আজ' ভালো লাগিতেছে। রাত্তার তীক্ষ্ণ উত্তপ্ত থোয়াগুলিও 'অসীমের' ভালো লাগিল; ছাপানের ডোবাগুলিতে বহু কুহুমের মেলা—কালভসিলা আর গুলফের থোকা-থোকা কুল; 'অসীম' তারঙ্গ পাড়াইয়া সেগুলি দেখিয়া লইল। অলস রোজে দীর্ঘ নারিকেলের পাতাগুলি ঝির-ঝির করিতেছে; আজ 'বিজ্ঞান-দশমী'; 'অসীমের' মনে হইল কয়েক দিনের উচ্চ 'আনন্দ-কোলাহল' আজ রাতে একবারে শানাই-এর করুণ রাসিগীতে বেনদার রূপান্তরিত হইবে। ভাগ্যে যদি কাহাকেও বেননা দিতে হাও, তবে 'আজই' সে শুভদিন—নীহার কি একবারও আজ তাহার কথা ভাবিবে না?

কিন্তু 'অসীমের' শূন্য রোগতপ্ত শয্যা পড়িয়া আর একজন যে নিঃশব্দ ক্রন্দনে আকুল হইয়া উঠিল, তাহার কথা জগতের

আর কেহ জানিল না। চলন্ত ট্রেন বসিয়া অসীম চারিদিকেই ধাবমান জগতের রূপ দেখিতে পাইল। বিজয়া-দশমীর পালা চলিয়াছে—আকাশ হইতে পৃথিবী পধ্যন্ত, গ্রহ-নক্ষত্র হইতে পৃথিবী পধ্যন্ত বায়তীয় বস্তুর অন্তরালে বিজয়া-দশমীর বিজ্ঞানের বাজনা বাজিয়া উঠিয়াছে—মান, করুণ, স্নিহমান।

কিছু যে ট্রেনের অসীমের নামিবার কথা, সেখানে সে নামিল না, দূরে আরো দূরে—অনেক দূরে জীবনের আনন্দ-রকিত অসীম চলিয়া গেল—ট্রেনের লাল আলো বহুদূরে অন্ধকারে বিলীন হইল, সে ট্রেনে কেহই নামিল না।

সেই রাতে নীহার অসীমকে দেখিতে পাইল, একেবারে স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ। এমন করিয়া ইহার আগে সে আর দেখে নাই। বিজয়া-দশমীর মিলনোৎসব তাহার কাছে শূন্য, নিরর্থক বসিয়া মনে হইল। অন্ধকার ঘরে জানালার গরাদে থরিয়া নীহার বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। সাজ-সজ্জায় ঝলমল অপরূপ স্বর্ণবর্ণ প্রতিমা কালো জলের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছে। চিরকালের মত চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল। আশা নাই, উৎসাহ নাই—ভবিষ্যতের নিরাময় দিনগুলির কথা মনে করিয়া তাহার সর্গশরীর শিহরিয়া উঠিল। সে দেবতা কিসের—বে এত গ্রন্থে দেয়! জানালার গরাদের উপর মাথা রাখিয়া নীহার রক্তবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাহিরে রেখা আসিয়া পাড়াইয়াছিল।

—এসো না, এসো!—বসিয়া নীহারের মা রেখাকে ডাকিয়া আনিলেন।

—অসীম আজ কেমন আছেন, মা?

রেখা রানমুখে বলিল—সে যে আজ বাবার কাছে বাঁচ ব'লে পশ্চিম ঢাল গেল, কত মানা করলাম, কিছুতেই অনুন্ন না!

—ও মা, সে কি গো! আজ তা'কে ছেড়ে দিলে কেন? আজ যে দশমী,—বসিয়া গৃহিণী কপালে কড়াঘাত

করিয়া বসিয়া পাড়লেন। বলিলেন—তোমাদের কোনো আক্ষেপ নেই বাছা—তা' আবারো তা একবার শুধোলে পারবে!

রেখা নীহারকে খুঁজিতে আসিয়াছিল। রান আলোকে নীহারকে ঐ ভাবে জানালার পাড়াইয়া কাঁদিতে দেখিয়া রেখা বেমন আশিয়াছিল, তেমনি গৃহের বাহির হইয়া গেল। নীহারের গ্রন্থ সে বুঝিয়াছে; নীহার জানিল না তাহার অন্তঃস্পর্শী গ্রন্থের অন্ততঃ একজন আজ মাথা ছিল!

ইহার কয়েক দিন পরে অসীমের বাবা সকলকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। অসীমকে তাহার সঙ্গে না দেখিয়া রেখা বিস্ময়ে তত্ত্বিত হইয়া গেল। তবে সে কোথায় গেল?

বিস্ময়ে ভরে গ্রন্থে রেখার চরিত্রোৎসাহ হইল।

বুড়ী কি মাছ বাছিতে বাছিতে বলিল—আমি তখন বলেছিলাম, 'ও সব অলক্ষণ-অলক্ষণ! নাও, এখন—ছেলে ফিরিয়ে দাও, যেখান থেকে পাঠো!'

রেখার কাছে সমস্ত স্ত্রীমা অসীমের বাবা গম্ভীর হইয়া পেলেন। ছুই বাড়ীতে জন্মদের রোল উঠিল। রেখার-ই অপরাধ স্থির হইল। এইবার তাহার বিদায়ের পালা!

একদিন গোপাল-অন্ধকারে অস্পষ্ট ছায়া মুগ্ধির মত রেখা আবার তাহার পুরাতন জীবনে ফিরিয়া চলিল। ছুই চোখের অবিরল জলধারে—তাঁহার দৃষ্টি কাঁপ কাঁপসা হইয়া আসিল।

এক বৎসর পরে আর একটি বিজয়া-দশমীর রাতে প্রকাণ্ড ছাদে ঈশ্বর রান চোখগুলোকে অসীম-কে দেখা গেল—দীর্ঘাকার, খায়াবান, স্বন্দর মুখ।

নীহার গলায় খাঁল দিয়া অসীমের পায়ের কাছে নত প্রণাম করিল। একটু সরিয়া আসিয়া অসীম একেবারে

নীহারের কটিদেশ বেঠেন করিয়া তা'কে বুকের উপর টানিয়া লইল। শুভ, স্বন্দর, পরিপুষ্ট কপোলের উপর হইতে চুলগুলি সরাইয়া সরাইয়া সেখানে একটি নিবিড় চুখন মূর্ত্তিত করিয়া দিল!

কলহাৎ কলহের নীহার অসীমের বাহুবন্ধনের মধ্য হইতে বসিয়া উঠিল—প্রাণিহ বিলে না কি?

অসীম উত্তর দিল; কিন্তু কথার কি আর শেষ আছে?

বহুক্ষণ পরে ঘরে আসিয়া নীহার আলো আলিল, অসীমকে বলিল,—একটি জিনিষ দেখা'ব তোমায়, দেখবে? আমি বড় ব্যস্ত করে তুলে দেবোছি।

—কৈ দেখি!—বসিয়া অসীম হাত বাড়াইয়া নীহারের হাত হইতে একখণ্ড চিত্রির কাগজ লইল। আলোর সমুদ্রে ধরিয়া দেখিল—একখানি অর্দ্ধচন্দ্র কাগজে সুস্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

অসীম,

তুমি বড় ভুল করিয়া গেলো। যদি একটু জানাইয়া দাউত কোথায় গাইছে, তাহা হইলে আরও কিছুদিন এখানে থাকিতে পারিতাম।

আমার মনে হয়, আরও একটি ভুল তোমার আছে। তুমি নীহারকে চিনিত পার নাই। বিজয়া-দশমীর রাতে আমি তা'কে যে বেশে যে ভাবে দেখিয়াছি, তাহাতে আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে, যে, নীহারের সত্য পরিচয় পাওয়া যরকাল।

ফিরিয়া আসিয়া নীহারকে চিনিত ছোট্ট করিত। কিন্তু তুমি ফিরিয়া আসিবে কি?

হাত—

রেখা

অসীম প্রসন্নমুখে নীহারের দিকে চাহিয়া বলিল,—ও, সেই রেখা! বড় ভালো মেয়ে! নীহার অত সক্ষেপে উত্তর দিতে পারিল না। অসীমের হাত হইতে চিত্রিখানি লইয়া সে বাগ্গে রাখিয়া দিল।

বিজয়া-দশমীর উৎসব রাত্রি শেষ হইতে চলিল। ছুটি যৌবন-খুশি পিত্ত দেহ নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে পরস্পরের গুহ কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। নীহারের মনে রেখার অস্পষ্ট মুক্তি কখন উদিত হইয়া অসীমের চুখন-বৃষ্টির মধ্যে আবার কখন বিলীন হইয়া গিয়াছে!

বহুমান ট্রেন। এখন-ই ট্রেন আসিয়া পড়িবে। ওয়েটিংরুমের ইজি চেয়ারে নীহার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। থোকাও বহুক্ষণ ঘুমাইয়াছে। ইহাদের জগাইতে হইবে। কিন্তু অসীমানন্দ অন্তরমনের মত চুপট ধরাইয়া কি যেন ভাবিতেছেন।



শাহজাহান-মহল

সম্রাট শাহজাহানের ইচ্ছা ছিল যে তাজমহলের পদাঙ্কে যমুনার পরপারে তাজমহলের
অনুরূপে নিজের জন্য একটি কৃষ্ণদর্পণের সমাধি দশির নির্মাণ করিবেন।
কিন্তু তাঁহার সে অভিলাষ আর পূর্ণ হয় নাই।

বসে আছি 'তাজের' চত্বরে—
নিয়ে কলস্বরে
বহে যায় শীর্ণকায়া যমুনার জল।
ভীর্ণযাত্রী আসে অবিরল
অদেশী বিদেশী কত—
নয় শীর্ণ বঙ্গবাসী বত,
শিরে ইছদীর ক্ষেজ নবা মুসলমান,
দীর্ঘদেহ স-উক্ষীয় পঞ্জাব-সন্তান,
মারোয়াড়ী (মানাবর্ণ শির পাঁচ পরা
ধোপদস্ত জামা আর ধূতি দুলিভরা),
কোলটুপি শুভ্র পারসীক;
সর্বোপরি ধ্বনিত করিয়া দশ দিক
মার্কিন টুরিষ্টরূপ আসে দলে দলে—
পিছে পিছে চলে
টিপ্পো-লোভী গাইডের দল,
কহে অনর্গল
গ্রামোক্ষোদ-রেকর্ডের সম বাঁধা বুলি,
“মাননীয় মহাশয় দেখ চক্ষু খুলি
এই সে বিখ্যাত তাজ শাহ জাহানের
এত 'শ' এত খুঁটানো সমারস্র এর
এত সনে হল শেষ
এত কোটি স্বর্ণমুদ্রা করিয়া নিশেষ।”
ইত্যাকার—
অনর্গল কহে বার বার।

শ্রী অরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়

যমুনার দিকে আসি'
অবশেষে শ্বেতাক্ষে সজ্জাবি'
আশেষ বিনয় সহ কহে : “মহাশয়
এই যমুনার জলে হের ভিত্তিচয়
কৃষ্ণদর্পণ প্রস্তরে নির্মিত
বাদিশার ছিল অভীপ্সিত
ওখানে দ্বিতীয় তাজ করিতে নির্মাণ
কৃষ্ণ মর্ম্মরের রাশি করিয়া সন্ধান—
আপনার সমাধি-নিরাস!
কিন্তু সেই মন-অভিলাষ
সমাপ্ত হল না আর—
ততক্ষণ অস্ত্র একদার
শ্রোতাৱা গিয়াছে সরি'
দূর-গত অর্থলাভ স্মরি
গাইড চলিল সেথা চঞ্চল-চরণে
নিতান্ত-সম্মত-শুভ্র শ্রদ্ধাহীন মনে
ইতি উত্তিত অতিবাস্ত দেখিতেছে চাহি
স্বর্গে গিয়ে যাহাদেরও কভু স্বস্তি নাই
ডলার-কণ্ঠ তি-কীর্ণ-ক্ষিপ্ত-দেহ-মন
মার্কিন টুরিষ্টরূপ অপূর্ণ রতন!
“সমাপ্ত হল না আর!”—
দূরে দুর্গ-প্রাকারের পারে সূর্য্য ডুবে গেল পুনর্বার

অন্ধকারে অবসন্ন দ্বীপ
স্নানতর হয়ে এল দিন।
নামায়ে মাথার বোঝা শূন্য মনে কর্ম্মক্রান্ত দেহে
ফিরে যায় জনস্রোত দূরপথে আপনার গেহে।
নদীপার্শ্ব জনশূন্য, শুণ্ড বালুচরে
ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্রে কৃষকের ঘরে
জলে দীপ নিঃসঙ্গ একাকী।
অন্ধকার শব্দীর মাঝে থাকি থাকি
শুধু জেগে উঠে ভাষা বিষম কাতর
“দিন গেল রাত্রি এল—ওরে অতপার
তোল সাজ পাট,
ভেঙে দে কণ্ঠের হাট—
যেটুকু হয়েছে সারা যতখানি তার
সমাপ্ত হল না আর।”
হে সম্রাট শাহজাহান! যদি কোন দিন
জীবনের সন্ধাবেলা সংশয়-মলিন
‘সমন-বুরুজে’ বসি’ নিতান্ত একেলা
ভেবে থাক মনে মনে গুটাইয়া খেলা
কতটুকু হল শেষ কতখানি তার
সমাপ্ত হল না আর!
দিল্লীপুর্ন!
পারনি হইতে আপনার ভাগ্যের ঈশ্বর।
তাই আজ ও তাজমহল
মুহূর্ত্তাহীন অগ্নান-উজ্জল!
বার্তা তার মুখে মুখে নিতা চলে ভাসি'
স্তুতি গান কাব্য ছবি অমুক্তিরাশি
ছড়ায় সৌরভ তার!
শাহজাহান-মহলের কথা একবার
স্মরণে আনে না কেহ
অশ্রাব্যী প্রেতাশ্রয় দেহ!

সত্যই কি কোথা নাই কোনখানে নাই!
যৈ-কুড়ি উঠেন ফুটে সত্যই কি
হয়ে গেছে ছাই!
যে-মুকুল লভনিক ফল
তার কি গো সকলি বিফল!
হে সম্রাট কবি!
এস আজ ভেবে দেখে সেই পূর্ণ ছবি—
মধ্যে নিরবধি
বহে যায় বিচ্ছেদের নদী,
ওপারে নিকম-কালো শাহজাহান-মহল
এপারে মর্ম্মর-শুভ্র তাজ নিরমল—
রাত্রি আর দিন!
প্রভাতে উদয়াকাশে শুভ্র অমলিন
হাসিত তরুণী উষা
সর্ব-শুক্রভূষা
হাসিয়া উঠিত তাজ অরুণ-আলোকে
শাহজাহান-প্রিয়তমা সুপ্রোখিত চোখে;
মধ্যদিনে উজ্জগত সূর্য্যপানে চাহি'
সজস্রাতা স্নানরীর সম অর্থা বাহি'
নীরবে করিত নিবেদন
তোমার অমর প্রেম করিয়া স্মরণ!
ক্রমে দিন স্নান হ'ত—সূদে যাওয়া পদ্মবন হতে
অলকিত পথে
সহসা রাত্রির পাখী উঠিত আকাশে
আধার-পাথর ভরে স্তম্ভির বার্তাসে।
তখন তখন সেই তারাতারা স্তিমিত আলোকে
নামহীন রূপহীন জ্যোতির্হীন অন্ধকার-লোকে
তোমার নিকম-মুগ্ধি উঠিত জাগিয়া!
নক্ষত্রেরা দেখিত চাহিয়া
স্রষ্টার মানসতীর্থ রহস্য-দুর্গম!—
গম্ভীর বেদনা-ভরা নিঃসঙ্গ নির্দম

চির-সুখ অন্ধকার যে কন্দর হ'তে
ভাবনা-প্রবাহগুলি পর্বতে পর্বতে
আলোকে উল্লাসে মাতি ঘন কলরোলে
নিত্যকাল নিত্য নব পথে পথে চলে।

ক্রমে রাত্রি হ'ত গাঢ়তর,
ছইকূলে উজ্জ্বলিত যমুনার ধারা খরতর
বাহু যেত কমলের বনে,
বাঁলুচের কৃষক-অঙ্গনে
একে একে নিভে যেত দীপ,
কুহেলি-আচ্ছন্ন বনে ব্যাখায় করিত কুন্দনীপ,
মাঝে মাঝে থাকি থাকি চবাচবা

গেয়ে যেত গান—

এপারেতে মমতাজ ওপারে বিরহী শাহজাহান!

হে কবি-সম্রাট!

তোমার তাজের গান গেয়ে গেছে বহু দীন ভাট

কৃতকার্যতার মুক বিদ্যায় স্তম্ভিত।

সদা ভয়-ভীত

কৃপণের দল

আপনার পুঞ্জিগুলি আনন্দে-বিস্ফল

না পাওয়ার জানে না সন্ধান।

তোমার সৃষ্টির তারা নিত্য করে গান

তোমারে না বুঝে,

তারা কি দেখেছে কভু খুঁজে

শাহজাহান মমতাজ ছুটি দেহ রাখি' এক ঘরে

হে বিরহী, তব প্রেম কতখানি তারা খর্ব করে!

এত ভূমি চাহ নাই হে কবি-সম্রাট

ভূমি ছিলে বিপুল বিরাট

হে নীচক, হে বিজয়ী বাট!

সভ্যভীত যাহারা অধীর

কৃতি-স্বীকারের ক্ষণ সাহস নাহিক যার

তারা শুধু বলে বার বার

মরনের অন্ধকার-পারে

কেহ নাহি ছেড়ে থাকে কা'রে।

তা'রা পুঁথি লিখে বলে : বিয়োগ-অস্তুক

লিখো না নাটক,

চক্ষু কর্ণ তুচ্ছ করি' ভয় কর সার,

মিলনে লভুক অস্ত্র যত কিছু কাহিনী তোমার!

হে সাহসী সভ্যস্রষ্টা বীর

প্রাকৃত জনের মত ভূমি কভু হওনি অধীর,

সত্যের আলোকে ভূমি পাও নাই ভয়

ভূমি তাই বলেছিলে : "এ বিচ্ছেদ ঐক্য সত্য,

হোক তার জয়!"

অসমাপ্ত শাহজাহাঁ-মহল

আজও সমুজ্জ্বল।

তাই কবি কবির মানসে

নিখিলের বেদনার রসে।

যে-কোকিল মরে গেছে বসন্তের না হতে বিকাশ

যে-ময়ূর চলে গেছে প্রাপ্তির না করি সম্ভাষ

যে কুঁড়ি ঝরিয়া গেছে নাহি দিয়ে ফল

যে প্রারম্ভ হয়েছে বিফল

তা'দের সবার মাঝে মহাকাল অঙ্গনের তটে

অকৃত কণ্ঠির তব নিত্যকাল জয়ধ্বনি রাটে!

যে তাজ গিয়াছ গড়ি' দেশে দেশে জাগায় বিশ্বয়

তবু যেনে এই সব নয়!

আজি শূন্য স্তম্ভ রাতে যেন মনে লাগে

নদীপারে নদকূলের দীপালোকে জাগে

নিমন্তক গম্ভীর-গুপ্তি শাহজাহাঁ-মহল—

মাঝে বিরহের নদী বহে কলংকল

থাকি' থাকি' অন্ধকারে চবাচবা গেয়ে উঠে গান—

এপারেতে মমতাজ ওপারে বিরহী শাহজাহান!

বাংলা-ছন্দে হসন্ত

[খোলা চিঠি]

শ্রী অনিলবরণ রায়

দ্বিদিগীপকুমার রায়

বরকমল—

আপনি ইতিপূর্বে বাংলা-ছন্দ সম্বন্ধে আমাকে যাহা
লিখিয়াছিলেন, আপনার "মনানীর" ভক্ত লিখিত ভূমিকা
এবং "পরিচয়"র ভক্ত লিখিত প্রবন্ধ বিশেষ আগ্রহ ও
ভূমিসংকারে পাঠ করিয়াছি। স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রকৃতি
আগনি যেভাবে দেখাইয়াছেন তাহাতে আপনার স্বল্প কবি-
কৃতিরই পরিচয় পাই। আপনারের এই সব আলোচনা
হইতে বাংলাছন্দের টেকনিকট অনেক পরিষ্কার হইতেছে,
এবং বাংলা কবিতার প্রগতির দিক দিয়া ইহার মূল্য বুঝি
বৈশি তাহা বলা বাহুল্য। এই প্রসঙ্গে আমার মনে ছই
একট কথা উদ্রিয়াছে, তাহা বলিবার ভয়ই এই পত্রের
অবতারণা।

পৌষমাসের "বিচিত্রায়" রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র
সেনের প্রথমে প্রতিস্থাপিত কবিতা যাহা লিখিয়াছিলেন
প্রবোধচন্দ্র সমগ্রসেই তাহার উত্তর দিয়াছেন। ছন্দ-চর্চায়
রবীন্দ্রনাথকেই আধুনিক বাংলার গুরু বলিয়া স্বীকার
করিয়াছেন, বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের বিপুল কাব্য-সাহিত্যই
প্রবোধচন্দ্রের ছন্দ-শাষের ভিত্তি, কিন্তু তাই বলিয়া ছন্দ-
শাষেও রবীন্দ্রনাথকে যে সেইরূপ উচ্চস্থান দিতে হইবে
প্রবোধচন্দ্র পটভাবই যে বিষয়ে কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন।
কিন্তু আমার মনে হয় শুধু ছন্দ-চর্চাতেই নহে, ছন্দের
ওষধিচারেও রবীন্দ্রনাথ বাংলায় গুরুত্বান্বিত। প্রবোধচন্দ্র
বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি লইয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাংলা-ছন্দের
আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার বহুদিনের সাহিত্য-
সাধনা এই দিকই প্রয়োগ করিয়াছেন। এতদিন বাংলা-
ছন্দের টেকনিক বা গঠন-কায় শিখিবার বিশেষ কোনো
সহিদা ছিল না, প্রবোধচন্দ্রের চেষ্টায় এই মন্ত অবতারণা
পূর্ব হইতে চলিয়াছে, এজন্য তিনি সমস্ত বাঙ্গালীর ওকাঙ্ক্ষ
কৃতজ্ঞতার পাত্র। কিন্তু তিনি পথটি এই ধরিয়ছেন মাত্র।

বাংলা-ছন্দের যে নিয়মগুলি তিনি বাহির করিতেছেন,
সেগুলি খুবই দোটাটো, বাস্তবিক first formulations,
রবীন্দ্রনাথ বাহ্যিক বলিয়াছেন, "পাঠকের মানবও", "কল্পিত
মানবও"। এ-সবেরও প্রয়োজন আছে, কিন্তু এই সব
বাহিরের নিয়মের পিছনে যে মূল স্বরগুলি রহিয়াছে,
রবীন্দ্রনাথ তাহার স্বল্প দৃষ্টি লইয়া সেইগুলিই দেখাইয়া
দিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতি হইতে প্রবোধচন্দ্রের
পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রবোধচন্দ্র হইতেছেন বৈজ্ঞানিক,
আর রবীন্দ্রনাথ কবি, যখন তিনি সমালোচনা করিতেছেন,
ছন্দ-বিচার করিতেছেন, তখনও তিনি কবি। বৈজ্ঞানিক
সত্যকে দেখেন, কবিও সত্যকে দেখেন, কিন্তু উভয়ের
দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বিভিন্ন, উভয়ের রীতি, পদ্ধতি, লক্ষ্য সম্পূর্ণ
বিভিন্ন। ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিতেছেন সেগুলিও
হইতেছে রস-স্বস্তি কাব্যের হারই উপাদেয়। বৈজ্ঞানিকের
বাধ্যধরা, কাটাছটা পদ্ধতি লইয়া তিনি চণ্ডিতছেন না;
এইজন্যই বৈজ্ঞানিক প্রবোধচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কথায় অনেক
অসঙ্গতি দেখিতে পাইতেছেন; অল্পপক্ষে কবি রবীন্দ্রনাথের
নিকট প্রবোধচন্দ্র চকোধ্য, তিনি বলিতেছেন, "আইনের
জটিল ভাষায় আসামিকে যখন অভিভূত করা হয় তখন
ভাবগতিক বৈধে হতভাগ্যর মুখ শুকিয়ে যায় কিন্তু যুক্ত
পারে না নাগিশের বিষয়টি কি। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্রের
প্রবন্ধটি পড়ে আমার সেই রকম খাঁপা লেগেছে।" এইটি
হইতেছে কবি ও বৈজ্ঞানিকের মধ্যে চির-বন্ধের দৃষ্টান্ত।

বাংলাছন্দে হসন্ত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন
তাহার সার সংগ্রহ হইতেছে এ—

"বৎসর তিন মাত্র। কিন্তু সেতাবের মৌড় লাগাবার
মতো অল্প একটু টানলে বেহর লাগে না। থকা—

সংবাদে উৎসবে বৎসর যার

কবে মরি বিরহের কৃৎসনগাথা।

টান কনিয়ে দেওয়া যাক্,

ইহাদের রাস্তিনে মূলঙ্গীণ হার
হারকাই নৈকো হেঁচু কুঁকিয়ে গার।

দেখা যাচ্ছে এটুকু কনি-বশিতে মামলা চলে না, বাংলা ভাষার স্বভাবের মধ্যেই যথেষ্ট প্রশ্ন আছে।^{*} কবি রচনা একস্থানে বলিয়াছেন: “বাংলা ভাষার স্বরবর্ণের ধ্বনিমাত্রা বিকল্পে দীর্ঘ ও ত্রুণ হ’য়ে থাকে, নতুকের ছিলের মতো, টানলে বাড়ে, টান হেঁচু দিলে কমে।”^{*} রবীন্দ্রনাথের এই dictum বা মন্তব্যটিকে বাংলাছন্দের একটি মূল সূত্র বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু এই সূত্রের প্রয়োগ কি হইবে, স্বরবর্ণ বোধ্যের কতটা টান চাপের বা চাপের না, সে যথক্বে তিনি কোনও মামলায় নিয়মের মধ্যে যান নাই, “কানের ওজন রেচু” ছন্দ রচনা করিবার কথা বলিয়াছেন। প্রবেশচক্র দেখাইয়াছেন যে কিরূপ কানের ওজন রাখিয়া ছন্দ রচনা করিলেও, বাংলা কবিরের রচনা এ-বিষয়ে কতগুলি নির্দিষ্ট^{*} বীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, এবং তদনুসারে তিনি বাংলাছন্দকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। এক প্রকার ছন্দে হস্ত বর্ণের পূর্ববর্তী স্বর সর্বত্রই ছই মাত্রার ওজন পায়, ইহার নাম তিনি দ্বিরাঙ্কন মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। আর এক প্রকার ছন্দে হস্ত বর্ণ কোন প্রকার গণনার মতোই আসে না, তাহার পূর্ববর্তী স্বর মাত্রাবৃত্ত ছন্দের মতো ছই মাত্রার ওজন পায় না, ইহাই স্বরতৃত্ত ছন্দ। আর এক প্রকার ছন্দে শব্দের মধ্যে ত্রিত হস্ত বর্ণ গণ্য হয় না, ত্রিক স্বরবৃত্তের মত, কিন্তু, শব্দের অন্তে স্থিত হস্ত বর্ণ তাহার আশ্রিতে পূর্ববর্তী স্বরকে ছই মাত্রা করিয়া দেয়, ত্রিক মাত্রাবৃত্তের মত। এই ছন্দেরই তিনি নাম রাখিয়াছেন অক্ষরবৃত্ত বা যৌগিক। এই ভাবে বাংলাছন্দকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা ত্রিক কি না রবীন্দ্রনাথ সে-সময়ে এ-পর্যন্ত কোন মত প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। আপনাদের মতে এই বিভাগ ত্রিকই হইতাজে। কিন্তু কাব্যায়:

* ইহার একটি স্থবর দ্বিরাঙ্কন দ্বিরাঙ্কন মূল্যপাঠ্য

চলিত ভাষায় লিখিত গুণ হইতে—

গুন ঘরে “ও” বিন মাত্রা
ওর কপালে ঘনি। অত মতে হইত
এত বিন ওর বিটেক। গুণ বিনে বৈত

গুন ঘরে “ও” বিন মাত্রা
চিত্রিত হইতে ছই মাত্রা

এইরূপ বিভাগে ক্রিষ্ণ মুখিল হস্ত, ছই একটি দ্বিরাঙ্কন দ্বিরাঙ্কন দেখাইতেছি।—

বাংলাভাষায় যেমন বহু যুক্তাক্ষর প্রচলিত এবং তাহারা এক ‘অক্ষর’ বলিয়াই গণ্য হয়, তেমনি বহু যুক্ত শব্দ (Compound words) আছে, এবং সেগুলিকেও একটি শব্দ বলিয়া ধরা হয় এবং সেই ভাবেই লিপিবদ্ধ করা হয়। ইহার দ্বিরাঙ্কন বীজিয়া বাহির করিতে হয় না, যেখান সেখান হইতে ভূমিয়া দিলেই হইল। যথা—

সেবিন এ বস্ত্রায়ে শ্যাব-বর্ণাধার একধারে

নিশপ চরণ

আমিল বদনকণ্ঠী হ্রস্ব-পথের অক্ষকারে

রাস-নিদাহান।

বস্তুতঃ আপনাদের মতোকে ‘অভিহিত করি’

নিদা’ চুপে চুপে:

যাকের মানবও দেখা দিল গোহাল শরীরী

রাজক-নিদাহান।

এখানে একধারে মানবও, রাজকও প্রাকৃতিক কথাত্মক একটি শব্দ ধরিল না ছইট। ইহা বিয়াকে যদি ছইট শব্দ বলিয়া ধরিতে হয় তাহা হইলে পদ্য-বিপণি, স্বর-পদ্য প্রভৃতির স্রায় ইহাদেরও মধ্যে হইফেন্-(-) চিহ্ন, দেওয়া হয় না কেন? উপরোক্ত কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত, অতএব এই শব্দগুলিকে যদি এক একটি শব্দ বলিয়া গণ্য করা হয়, তাহা হইলে ‘অক্ষরবৃত্তের নিয়ম’ অনুসারে ইহারায় হয় তিন মাত্রা কিন্তু এখানে ইহাদিগকে চারিমাাত্রা বলিয়া ধরা হইয়াছে। আমরা সাধাব্যবসায় এই শব্দগুলিকে যে-ভাবে উচ্চারণ করি তাহাতে মর্যোগ ক, ম, জ, হস্ত বর্ণ হয় এবং ইহাদের পূর্ববর্তী স্বরগুলি টানিয়া পড়া হয়, এই ভুলই ইহারায় চারি মাত্রার ওজন পায়।

কিন্তু প্রবেশচক্রের প্রাথমিক নিয়ম ‘অনুসারে মাত্রাবৃত্ত ছন্দেই শব্দের মধ্যে এইরূপ করা চলে, অক্ষরবৃত্তে নহে। আপনি হস্ত বলিবেন, আমারও আশাভাবাপূর্ণ অমূলক, কারণ কোন কবিই প্রায় করিবেন না উহারের কয়দারা। এস-ব শব্দ বাস্তবিকই ছইট স্বরতৃত্ত কথা সামান্যতঃ হইয়া এক হইতাজে, ছন্দের হিগাবে সকলেই এইগুলিকে স্বরতৃত্ত কথা বলিয়া ধরিলেন। কিন্তু এইগুলি হইতেছে, their end

of the wedge. প্রবেশচক্রের যে-কথাটি ‘আপনার বেশ ভাল লাগিয়াছে, লেখার পদ্ধতি অনুসারে ‘অক্ষরের ওজন বদলায়, সেইট এখানে মনে করুন। ভাষা ত্রিক logic মানিয়া চলে না, ছইট। কথাকে যখন একসাথে লেখা দ্বীতি হয়, জননা: তাহা একটা কথা হইয়াই পড়ায় চপের কাছে, কানের কাছে, মনের কাছে, এবং এইভাবে নানা গোলাঙ্গলের সৃষ্টি হইতে পারে। হয় ‘আপনারা একটি আমলাসে’ আজ হইতে ভারী করুন যে, আলারা কথাকে ঠাক ঠাক করিয়া শব্দ মাঝে হাইফেন্ দিয়া লিখিতেই হইবে, নতুবা কি নিম্নাট ঘটিতে পারে দ্বিরাঙ্কন দ্বিরা তাহা দেখাইতেছি। প্রবেশচক্রের নিজের কথাটি এখানে ভূমিয়া দিই—

“উচ্চ-বিক্রান্ত-তলে নেমে এসে”

—পাঠিলে বৈশাখ

এখানে দ্বি-প্রান্ত-শব্দে তিন ‘অক্ষর’ ধরা হইয়াছে। কিন্তু ‘দ্বি-’ কথাটি অল্প কথার সঙ্গে সামান্যতঃ হ’লেও একটি স্বরতৃত্ত শব্দ এবং এর ‘অক্ষর’ একটি যুগ্মধ্বনি রয়জে। সুতরাং ‘অক্ষরবৃত্তের নিয়ম’ অনুসারে এই একস্বর শব্দটিকে ষিমান্বিত ব’লেও ধরা যায় এবং তাহ’লে দ্বি-প্রান্ত কথাটিতে তিন না ধরে চার ধরতে হবে। সুতরাং তাহা হইলে সেখান ‘উপরের দ্বি-প্রান্ত-তলে নেমে এসে’ এরূপ লিখলেও ‘অক্ষর-বৃত্তের নিয়ম’ অব্যাহত থাকত।*

—বাংলাছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান।

তাহা হইলেই দেখুন, দ্বি-প্রান্ত অতি স্পষ্টভাবে ছইট স্বরতৃত্ত কথা অথচ রবীন্দ্রনাথ ইয়াকে একটি কথা বলিয়া ধরিয়াজেন এবং সেইভাবেই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রবেশচক্রও বলিতেছেন “এই একস্বর শব্দটিকে (‘দ্বি-’) ষিমান্বিত ব’লেও ধরা যায়” অর্থাৎ একমান্বিত বলিয়াও ধরা যায়। তাহা হইলে, বস্তু, মা ভারা, পাড়াই কোথা? বাংলাভাষাতে যে এমন শব্দ শব্দ নহইয়াছে, সর্বত্রই যদি এইরূপ বিকল্প করা চলে তাহা হইলে প্রবেশচক্রের আবিস্কৃত নিয়মের মূল্য থাকে কি? প্রবেশচক্র বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের বিপুল কাব্য-সাহিত্যে*

এইরূপ ছ’একটি ব্যতিক্রম দেখা যায়, তাহা নগণ্য। কিন্তু কবিরের নিয়মগুলি যেমন বেধিতে হয়, তেমনিই তাহাদের ব্যতিক্রমগুলিও লক্ষ্য করিবার জিনিষ, গণনার জিনিষ। কারণ এইগুলি হইতেই ভাষার প্রাথমিক শাসন-কালের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাও কোন দিকে মুখিতহে, বা বহিতে পারে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আজ যেটাকে আমরা ‘মূনির ন্যস্তম বলিতেছি, সেইটাই হয়ত ভবিষ্যতের কোন নূতন পথের সূত্রপাত, আজ যেটাকে আমরা বাক্যের মানবও বলিয়া উপেক্ষা করিতেছি, কাল সেইটাই হয়ত রাজত্বও হইয়া আদ্যাবধি কাল শাসন করিবে, নড়িবার নামটিও করিবে না।

‘আপনি নিশ্চয়ই বলিবেন, এই একটি দ্বি-প্রান্ত কথা লইয়া আমি ‘অতিশয় বাড়ারাড়ি’ করিতেছি। দ্বি-প্রান্ত এবং প্রান্ত বাংলার ছইটা স্বরতৃত্ত কথা আছে বটে কিন্তু দ্বি-প্রান্ত একধারে নূতনকথা, রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি, উহার এখনও আকৃতি ত্রিক হয় নাই, উয়াকে কি একধার, একধার, রাজত্বও, মানবও প্রাকৃতিক অতি পুরাতন কথার সচিত্র তুলনা করা যায়? ইহাদের আকৃতি গঠিত হইয়া গিয়াছে, ইহারায় যে কখনও একধার, মানবও, এইরকম অস্বত্ব রূপ পরিগ্রহ করিয়া তিন মাত্রার কোঠায় নামিয়া যাইবে তাহা কখনই সম্ভব নহে। আপনাদের এই আশাভাবী মানিয়া লইলেও, আরও একটি গুরুতর কথা থাকে। কিন্তু সে কথাটি বলিবার পূর্বে আমি দেখাইতে চাই যে, দ্বি-প্রান্তের স্রায় ব্যতিক্রম বা মাত্ৰম রবীন্দ্রনাথের বিপুল কাব্যসাহিত্যে ‘অনুসন্ধান করিলে ছ’একটি নূনৈ অনেকই মিলিতে পারে। যথা—

নিমিষ কালের মধ্যে—

মুখণ্ডিও গড়িয়া আছে

কেনতারে ভেঙে ভেঙে বসিছে সেখান।

—পূর্ববর্তী উক্তি

অথবা,

মুখণ্ডিও কিরায় হির রক্তপদ-অর্থ-উপহারে

ভক্তিরে কদম্বশে শেখ মুখা দুখিয়াছে তারে

—এবার দ্বিরাঙ্কন মৌরে

* কিন্তু এটা কোন বাণ্য শোনাও কিনা শালিঙ্গের লজ রবীন্দ্রনাথ কবিরের উপর বরাং দ্বিরাঙ্কন।

অথবা

হে যামা শিবালি
তব ভাল উজ্জ্বলিমা এ ভাবনা উড়িৎসমভাবৎ
এসেছিলো নারি—
এক ধ্বংস-রাশি
খণ্ড-ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভাঙ
বেঁধে বিব আমি।

—শিবালি-উৎসব

এখানে ধ্বংসপট, মৃৎপিণ্ড চিন্নমাত্রা ধরা হইয়াছে এবং তত্ত্বপ্রকটা চারিমাত্রা ধরা হইয়াছে। সম্প্রতি বাংলাধর ধ্বংসপট ব্রহ্মবিহার জন্ম তিনি যে-সব ছন্দ দৃষ্টান্ত স্বরূপ রচনা করিয়াছেন সেখানেও মৃৎপ্রাণী, ধ্বংসপিপাসা প্রকৃতিক এইভাবেই গণ্য করা হইয়াছে। আর রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রমাণ ছাড়া এ-বিষয়ে উত্থার সন্দেহ করার সাফল্য প্রমাণত আশানার কাছই রহিয়াছে। বুদ্ধদেবের “ধ্বংসপটে রক্তধারা” লইয়া উত্থার সহিত আপনাদের যে তর্ক উত্থিরাছিল, সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মত জিজ্ঞাসা করার তিনি বলিয়াছিলেন, “বুদ্ধদেব এমন ভুলটা কেন করলে?” উত্থার মতে ধ্বংসপটকে চিন্নমাত্রা ধরিতে হইবে, চারিমাত্রা নহে।

একটি বিশেষ কথার প্রয়োগ সম্বন্ধে তর্ক উঠিলে শ্রীঅরবিন্দ একবার বলিয়াছিলেন, “If Tagore favours it that ends the debate.” বাংলাছন্দ রচনার একটিলে প্রধান বাবহারিক নীতি, “If Tagore favours it that ends the debate.” কিন্তু কোন বিশেষ কথার কোন বিশেষ কথার প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথ সন্ধান করিলেন কিনা তাহা নির্ধারণ করাও সকল সময়ে সহজ হয় না। উপরে দৃষ্টান্তেই দেখেন রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডে বলিয়াছেন এবং ছন্দ রচনা করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, বঙ্গের কথারিক টানিয়া বড় করা চলে, চারিমাত্রা করা চলে, কিন্তু ধ্বংসপটের বেলায় তিনি বলিলেন, এটিকে চারিমাত্রা গণনা করা ভুল হইয়াছে। অথচ ধ্বংসপট originally দুইটি স্বতন্ত্র কথা এবং গুণনেও বঙ্গের অপেক্ষা বড়। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ এখানে একটি প্রভেদ করিতেছেন। তিনি যে হয় নির্ধারণ করিয়াছেন : “এটুকু কবি-বেশিতে মামলা চলে না, বাংলাভাষার স্বভাবের মোহাই যথেষ্ট প্রশ্নর আছে” এখানে

তিনি বাংলা ভাষা কৃষ্ণতে চলিত ভাষাই বুঝিয়াছেন, সাধুভাষা নহে। এইজন্যই তিনি সাধুভাষার রচিত ছন্দে ধ্বংসপট, মৃৎপিণ্ড প্রকৃতিকে চারিমাত্রা গণনা করার বিরোধী। একস্থানে তিনি পাণ্ডেই বলিয়াছেন, “বাংলা প্রাকৃত ভাষার কাব্যে স্বরধ্বনির যে প্রানবান স্বচ্ছন্দতা আছে, সাধুত বাংলা ভাষা, যাকে আমরা সাধুভাষা বলি, তার মধ্যে পড়ে সে কেন জেনানা মেয়ের মতো দেয়ালে আটকা পড়ে গেল।” তার কারণ সাধুত বাংলা কৃত্রিম ভাষা, এখানে বাইরের নিয়মের প্রাধান্য, তার আপন নিয়ম অনেক কাণ্ডহার কৃত্রিম।

এখন রবীন্দ্রনাথের চায় আমিও প্রশ্ন তুলিতেছি, বুদ্ধদেবের মত কবি, বাহার ছন্দ সম্বন্ধে এমন হৃদয় বোধ রহিয়াছে, তিনি “কল্পনাতে বক্তব্যটা” এরূপ ভুল কেন করিলেন? আর একস্থানে লিখিয়াছিলেন,—

কিছুতেই ভুলি নারি যেত মন মন
সুংগাহে অমৃতের গবে আশান,

আপনিই রবীন্দ্রনাথের নকীর দেখাইয়া একদিন বলিয়াছিলেন, এখানে সুংগাহ চারিমাত্রা ধরা হইয়াছে, এটাকে অধিকাংশ কবিরই কানে লাগিলে “অকস্মতঃ, ছন্দে।” কিন্তু ঠিক এই ভুলটিই করিয়াছেন “নিশ্চরই” বিখ্যাত কবি মোহিতলাল—

কহ মোরে, কাহিনী? কবে তুমি করিলে পান
ধ্বংসের সুংগাহে অমীর জলধির রস?

এখন প্রশ্ন হইতেছে, কবির কানের গুণন রাখিয়া ছন্দ রচনা করিতে গিয়া এইরকম ভুল কেন করিতেছেন? এই পন্থেই আমি একবার, একধা, রাঁধণও, মানদও প্রকৃতি বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হস্ত-মধ্যা মধ্যা কথার নকীর দেখাইতেছি। এইগুলি : ধ্বংসপট, সুংগাহের সহিত এক পর্দায়ের নহে ইহা সত্য, কিন্তু উভয় পর্দায়ের মধ্যে একটা analogy বা সাধুত রহিয়াছে আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন, এবং সকল ভাবাত্ত্ববিধি জানেন যে, ভাষার উপর analogy’র প্রভাব কতখানি। বাহার একবার উত্তর সম্বন্ধেও প্রকৃতিতে এ, রা, মা কে টানিয়া পড়িত চির অত্যন্ত, তাহার আনাগো সুংগাহ ধ্বংসপট প্রকৃতিতেও

নু, জ কে টানিয়া পড়িলে, অতএব এখানে ছন্দ-ভঙ্গ হইবার কোনো আশঙ্কা নাই। তাহাই যদি হয় তাহা হইলে কৃত্রিম নিয়ম বাধিয়া কবিরের এই স্বাধীনতাটুকু হরণ করিবার চেষ্টা কেন? Railway embankment-এর দ্বারা বাংলার স্বাভাবিক জলস্রোতগুলিকে বাধা দেওয়ার সমস্ত দেশ যেমন ম্যাসেরিয়ার পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, এই সব কৃত্রিম বাধা রচিত হইলে বাংলা কবিতাক্ষেত্রেও কি আবার সেই দশা হইবে। তবে ভরসা এই যে, বক্তার মুখে এ-সব বাধা টিকিবে না।—বাধ নির্মাণ যদি করিতেই হয়, তাহা হইলে প্রথম হইতেই বড় বড় Calverts রাখিবার ব্যবস্থা করণ, স্রোতের জল যেন স্বচ্ছন্দে বহিয়া যাইবার পথ পায়।

আমার পজট ইতিমধ্যেই পূর্ব বড় হইয়া পড়িয়াছে, আর ইহাকে টানিয়া বাড়াইতে গেলে ছন্দ-ভঙ্গ হইবে নিশ্চয়ই। আমি কেবল একটি অতি সত্য কথারই পুনরাবৃত্তি করিতে চাই (and truth can bear repetition) যে, ছন্দ সম্বন্ধে নিয়ম বাধিয়া দেওয়া সহজ নহে। ছন্দ বাহিরের প্রতীতি, কবিরের আত্ম-প্রকাশের বাহন : ছন্দে-নিয়ম কবিরের স্বচ্ছন্দ আত্মপ্রকাশে বাধা দিলে সে-সমকে ভিন্নাষ্টয়া বাইতেই হইবে, সর্বস্বার্থানু পরিভাষা। কবির অস্তরের মধ্যে যে ছন্দ জাগিয়া উঠিয়াছে, শুধু বাহিরের কান দিয়া নহে, অস্তরের কান দিয়া তাহা শোনা অভ্যাস করিতে হইবে, তাহাতেই যদি নিয়মভঙ্গ পাশে পাশী হইতে হয়, তাহাতেও পশ্চাৎপদ হওয়া চলিবে না, “তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে হুহু”।

এই প্রশ্নের শ্রীঅরবিন্দ আমাকে বাহা লিখিয়াছিলেন, আপনাকে কেবল সেই কথাগুলি স্মরণ করাইয়া দিয়াই—
আমার এই পত্রখানি এইবার নিশ্চয়ই সমাপ্ত করিব—

“It is not very dear why the dictum about বঙ্গের should not apply to ধ্বংসপটে and সুংগাহে। My own feeling is against the extra syllable because in these words (দিক্‌প্রাণ seems to me different, because দিক্ is a separate word in Bengali), but neither feeling nor logic can stand against usage. A language is like an absolute queen; you have to obey her laws, reasonable or unreasonable, and not only her laws, but her caprices—so long as they last,—unless you are one of her acknowledge favourites and there you can make hay of her laws and (sometimes) defy even her caprices provided you are quite sure of her favour. In this case, Tagore perhaps feels the absoluteness of some usage with regard to these particular words. But one can always breath through law and usage and even pass over the judgement of an arbiter of elegances— at her own risk.”—Sri Aurobindo

ইতি—শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীঅনিলবরণ রায়

দুইখানি আধুনিক কবিতার বই

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

প্রথমেই একটুখানি সাফাই ঘেঁষা দরকার। কারণ, যে-কই কবির চরনা নিয়ে আমি 'স্বাভোচনা' কর্তৃক বাজি, তাঁরা হ'লেনই আমার অনেকবানকারী বন্ধু। এবং আমারই দেশে একটা কৃষ্ণাঙ্কর আঁকা, বা'তে কোনো কোনো এবং তাঁর কোনো বস্তু। রমনার সমাধোচনা করবার অধিকার থেকে বঞ্চিত। সমাধোচনা 'অগ্রশ্রম' হ'লে বন্ধুবান্ধবের 'আশঙ্কা থাকবে' এবং স্মৃতিমূলক হ'লে একলা 'লোক ভাবে'—এর নাম বস্তু। সম্ভবিত, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গ-প্রবাসিত কবিতার বই 'প্রথমাব্দ' 'বিশেষের' রক্ত সমানোনি কর্তৃক চাটলে কর্তৃপক্ষ আমাকে 'পরিষদ' 'পঠান' যে আমি প্রেমেন্দ্রস্বাবুর বস্তু বই বিবিত; হুতরাং আমার মতাবতারে ওপর পাঠসম্পাদণ সম্পূর্ণ অস্বাভাবন না-ও হ'লে পারেন, এবং তা'তে প্রেমেন্দ্র-স্বাবুরই কতি হ'বে। জানিনি, এক-খণ্ড সত্য কিনা। বরি হ'লে, তা'কে 'আশ্চর্য' কী কীনা কী কী; কারণ, পাঠক-সম্ভারেরে হুত্বজি ওপর আমি কোনোকালাই খুব অস্বাভাবন ছিলান না। সমবাবল্যায়ী লোকের মধ্যে পটভিৎ, এমন কী, ক্ষুদ্রতা ওকণন আ-একজন যথেষ্ট কিছু বলে 'তা'র কারণে একজন আর-একজন যথেষ্ট কিছু বলে 'তা'র কোনো দোষ থাকবে না, এমন-জিহ্ব, অর্থনি ধূসরাণর এই জড়বুজি বহুসংস্টি সম্ভব। কারো লেখা পড়ে' আমি যদি 'গভীর ও 'খাখা' আনন্দ পেয়ে থাকি, তা হ'লে সেই লেখক আমার ব্যক্তিগত বস্তু, শুধু-এই অপর্যবে 'সে-আনন্দ প্রকাশে জ্ঞাপন কর্তৃক আমি পার্থক্য না। সমাধোচনা করবার অধিকার অঙ্গ-সমুখি থাকবে, শুধু 'আমারি' থাকবে না, যে-কেউ লেখকের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত প্রীতির বদন আছে। 'অঙ্গ-সমার' কাহাি পাঠ্যসাধারন ভক্তিরে অস্বাভাবন করবে, যুগু আমার কথাই ধারেন না, কেননা লেখকের সঙ্গে মারো-না-একটি যুগু বেগোতে যোগ্য যায় চমকরা, চমকরা। নর-হুত, দেব-হুত অখোজিক্ততা

বাঁকি হোয়, সাধস কর' তবু শিখতে বসুম। যে-
লেখা আমি সমস্ত অস্থর দিয়ে উপভোগ করেছি, তা'র
উচ্চসিগ প্রণয়াস করত আমি কখনো স্মৃতিত হ'তেনা না-
যদি এমন ভ্যানক ব্যাপার হই যে সে-লেখা আমার বসুর।
আমিরে মনে মনে সত্যোক্ত্য সাধারত প্রণয়াসবিমুখ;
সর্বদাই তাঁদের মনে ভর থাকে, পাছে' বেশি ব'লে ফেলিলে
তাঁদের গাষ্টায়ী নই হ'য়ে বাত, না-হর কোনো লেখকে
ভুলে অন্তরাবকন উচ্চ আসন দিয়ে কেমন। গাষ্টায়ী-
বটে তাই! আসল কথা হচ্ছে এই যে তাঁদের প্রণয়াস-
ওপর বিশ্বাস হই; তাই—তাঁরা ব্যাকিছু বলেন, দুর্জল,
কথী, বার্ষভাও বলেন। যে-কথা বলিছি, নিজে আন্তরিক-
ভাবে তা বিশ্বাস করল তবু তা অজ্ঞ লোককে তা বিশ্বাস
করেনা যায়। কোনো লেখা পাড়ে' আমি যদি গাষ্টায়ী
আনন্দ পেয়ে থাকি, তা'র লেখা আমি নির্ভয়ে, অকপটে
নবুঝা—আমার মনে সাধনা না-ও হ'তে পারে, কিংবা পরবর্তী
কালে তা ভুল প্রমাণিত হ'তে পারে—অত কথা ভাবার
সময় কোথায়? আর, তাই-তো সমালোচকের প্রকৃত
কাজ; নিজে সাহিত্য থেকে গভীরতম আনন্দ শোষণ করি
সেই আনন্দ শব্দভরণ, দৃঢ়তরে সর্বসমালোচনা হয় না, উপা-
কথা। আজ নিরেন্দ্র ন' ছাড়া মনেমনে হ'য় না, কথা-
কটাকটি হয়।

আমি আর আমার বন্ধু অজিতকুমার দত্ত বছর^১ সাতক
আগে প্রবল উম্মাছে একযোগে কান্দাঙ্গীতে প্রবৃত্ত হয়েছি।
দুবীন্দ্রনাথ আর সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে তখন আমার আচ্ছন্ন
মিলে, অল্পপ্রাণে, অল্পকানে, concealed—এ আমি তখন
কবিতাকে সবার সাজানোর, ‘কান্দাঙ্গী-দগাধার’ আবৃত্তি
করতে করতে তাড়া দিরে ইটুটান; চায়ের বাকোনে বসে
‘কমিকার’ প্রবর্ত্তা আলোচনা করতে করতে চা’ গাও
হ’য়ে যেতে সীতাম। এমন সময় আকাশে এক নটর

তারার উদয় হলো। একদিন ছোট্ট সাইজের একখান
'কলো' আমাদের হাতে এসে পড়লো; গুলে দেখি, প্রথম
পৃষ্ঠায় 'কবি-নাস্তিক' বলে' এক কবিতা :

এই ভুবনের মধুর দিনের পথিক যত—

આમૂળ ચારા

हामूल यात्रा

অনেক ভালোবাসিল যারা,

আজকে তারা সন্ধ্যা, তো

পাকা মো

গলাবি হাৰে

ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ

— **संस्कृत** **संस्कृत**

যে-কোনো গেলি ক

কপোলি ছু

গেল চলে

याहा बल

हाप्रद्वय हास,

হাবিয়ে যাব,

সকল কথা আসন্ন এই অবসরে ।
পড়তে পড়তে কবিতার মূল কথায় পৌছনো গেলো—

এই দেহ তোর দিন-চু'একের স্বর্গ রে,

ଅର୍ଥା ନେ ।

মহা দেহের চেয়ে, মূৰ্খ, মোক্ষ নয় মহার্ঘ্য রে

अर्थात्

মুখ, মুখ হ'য়ে গোলায় । রক্তমাখা, গতোক্তমাখ ছাড়াও বাঙালী
শেখো আরো একজন কবি আছে, এই আঁখিকারে সমস্ত অস্তরায়
আলাড়িত হ'য়ে উঠিলো । এই কবিরা ভাব, ভাষা, স্ব-
rhythm—সব রকম গতোক্ত থেকে একেবারে আলায় ।
অর্থ, অর্থ । বসন্ত-গতোক্তের ধরণ ছাড়াও বাঙালী
ভাষায় কবিতা লেখা হ'তে পারে । স্বর্ণ-লোকের অশ্রুত
হেঁচু এই প্রাণীকৃত্তসিত, সত্যের পেগানিজন—আমাদের
সব যৌবনের দলজাতির প্রকাণ্ড ভাব, যুব, কবীরী হৃদয়ে
লাগা । মধুরা হর-আলোকের চরণে এই সাহসিক
ruggedness, ভাবার এই স্পষ্টতা, directness—সব
হ'লো, হঠাৎ অশ্রুতের সরে গিয়ে বাঙালী কবিতার নন্দ-
একটি রূপ প্রকাশ পেলো । আনন্দ, বিশ্বের সেই রূপের
অভিনন্দন কবীশ ।

এই কবিতাটি প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর সম্বন্ধ-কারণিত কবিতার বই 'প্রথম' থেকে বার দিয়েছেন। কেমন, জানি নে। যোধ হয় পশ্চিম বঙ্গের তাঁর প্রথম যৌবনের এই কবিতা 'আর কবিতা লাগি নি'। সত্যি কথায় কবিতাটি অনুরক্ত নয়; অশ্লিষ্টও নমোনের অনেক লগ্নেও বর্তমান। কিন্তু বেশ-স্বন্দয়মান প্রাণশক্তির জন্ত মনস্ত দীর্ঘ কবিতাটিকে এক মদকে পড়ে বাঙালা প্রায়, যে-উৎসাহ, যে-আগেপ্রাণবল্য তাঁর প্রতি ছুড়ে, ছন্দের প্রতি নোড়ে বর্তমান, তাঁর 'কল্যাণ'। তার চেয়ে অনেক নিষ্ঠুর, বোলা-কোলা-কোলাই হইবে স্থান পেয়েছে; 'কবি নিষ্ঠাক্ষক অর্থাভ্যন্তর করের' প্রেমেন্দ্র মত্ত ভুল করেছেন। তেমনি ভুল করেননি 'কল্যাণ' প্রকাশিত 'ওরা ভয় পায়' নামের ছোট একটি কবিতা বার দিয়ে; প্রেমেন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কবিতার-মধ্যে একটি। শুভি থেকে যে-কবিতা বিকল্পভাবে উদ্ধার করত পারছি:

ওরা ভয় পায়—

গুণা চোখ বুজে থাকে ।

इले, 'मिना, गता किहू न।

আনার ভবনে কিন্তু ফুল ফোটে, ফল ফলে রোজ,

স্বতন্ত্র আদে যাহ রূপে রমে গকে ভরপুর.....

কামান শিনের আলো আলোবেসে

20/05/2020

কাজে এসে

कभी कभी ;

ଆମାର ରାଜିର ୫

শেখের ছাই পংক্তি, কবিতা কি? এই হৃদয়, বহু-বিবর্তিত
প্রশ্নের মূর্তি উদ্ভব। কবিতা হচ্ছে নম্র, অলঙ্কার নয়,
কল্পের নয় বড় আইডিয়া নয়, রে-হেজ, বে-সৌন্দর্য,
বে-মানে প্রশংসা কবিতার নকী—এখানে তাই পাওয়া
যাবে; জ্বি সহজ, সাধারণ কয়েকটি কথা, অতি সহজ
এক অসুস্থের নিবিড়, অস্বাভিক প্রকাশ। কবিতা কী—
হাজার কটি-বিবর্ত করে 'কেউ' কখনো 'তা' বোঝাতে পারে
না; কিন্তু এই রকম পংক্তি'কে' এসে 'অতর' খাঁর
রস-সেধ আছে, সে মূহুর্তে তা উপলব্ধি কল্পতে পারে।

‘আর একটি—আমার কাছে বা ক্রটি মনে হয়েছে, তার উল্লেখ করি। ‘প্রথম’র দেখছি ‘মৃত্যুর’কে মর্মে রাখি’ কবিতা এই ভাবে আরম্ভ হয়েছে:

মৃত্যুরকে মনে রাখি—

মৃত্যু যায় মুছে।

কিন্তু আমার মনে পড়ে মূলে এই রকম পাঠ ছিলো—

মৃত্যুরকে মনে রাখি—

মৃত্যু সে তো মুছে যায়।

দুইয়ের মধ্যে দ্বিতীয় পাঠই যে অনেক বেশি জোরালো এবং বাস্তবায়নিক থেকে শ্রেষ্ঠতরো ছিলো, তা ছাড়া অংশ পর-পর একবার পড়লেই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। এই পরিবর্তে প্রেমেন্দ্র নিজের প্রচুর ক্ষতি করেছেন। বিশেষ করে ‘যায় মুছে’র inversion ‘অন্তর্য’ আশঙ্কিত; তাতে কবিতার স্বরই ‘অন্তর্য’ চূর্ণল হয়ে পড়েছে। স্বজ্ঞাত্যর সিন্ধুপ্রয়োগ প্রেমেন্দ্রের পক্ষে এ-ধরনের ‘Poetic’ ভ্রমে ব্যবহারের ফল ‘অন্তর্য’ অন্তর্ভুক্ত হ’তে বাধ্য। সমস্ত কবিতার মূল স্বরের হঠাৎ বেনে তাল কেটে যায়। ‘আমার মনে হয়, তিনি যদি ‘মৃত্যু মুছে’ যায়’ও লিখতেন, তা হ’লে মূল পাদের সঙ্গে কোনো তুলনা না হ’লেও এতটা অবনতি বোধ হয় হ’তো না।

‘কবিতাভিত্তিক’র পর থেকে কয়েল ও ‘অন্তর্য’ সাময়িক পরে প্রকাশিত প্রেমেন্দ্র নিজের প্রতিটি কবিতা আনি সাহেব, সানন্দে, লুচ্ছিত্তে, মুচ্ছিত্তে পড়েছি—একটি নতুন প্রতিভার গৌরবময় বিকাশ। কখনো বর্তমান বয়তাত্তিক জীবনের নিদ্রুতা:

আমি এই অজান্তেই আশীর্বাদখানি
লগত স্নান, মনে,
যে নদী,

লগত সব ধূলি-দুধ-দুগ্ধ তাঁটা বিহীন পিরে।
তব সৌন্দর্য-কাঁটা শিলা কারাবার হ’তে
রক্তমণী-কণ্ঠিত, যজ্ঞ-জড়িত ওষ
ক’র ছাড়া ছুটি

আমি এই অজান্তেই রক্ত মনবধার।

কখনো বাস্তবের কুশীতা, দুঃখ থেকে পলায়ন-কামনা—

জীবন-বিষয়ের বসি বস বেলা কোল;—

ওরে বর্ষা-বায়ুতরঙ্গ,

সে নিখার মর হ’তে সত্য তোর কোল।

কখনো সমাজ বিখণ্ডিত জীবনের এক অংশও মূর্তি—

জীবন-মহাভয়ের মূর্তা দেখতে ক’ল পাদ, তবুনি কিরে কামে?

মুখ কবি মর মোহেরে পানে!

কখনো বা বিশ্বস্ত প্রেমের সজল কলস-তা—

যাযাবর হাঁস নীল বেগুনি বন-হাসের স্নেহে,

আকাশ-পখের মতো সীমাত্তে থেমে;

সে করে আমার মনে

তুয়েদের বিশ্রামে।

আমি ক’র তার শব্দ নিছক নিবি,

হ’বশ আশার উদাস অলস মোমাই মরে ফিরি।

আবার কখনো মৃত্যু-জ্ঞান জীবনের চিরন্তন প্রাপ্তি—

মৃত্যু শোক-শব্দ গুহাঘরে

আসে বারে বারে

সমরোহে শিশুর উৎসাহ

কেনার অন্ধকার বিরাটো প্রতিবিন দেখে বসে ক্রোধের দৌরব,

নিরঞ্জ শিশুর হাসি।

কবিতার সুতিকার অবশেষে অশ্রুধার

তুমে জাগে প্রাণ অবিনশী।

এ-সব কবিতার মধ্যে সব চেয়ে যে-জিনিষটি আমার মনে লেগেছিলো, তা হচ্ছে তাদের ‘অদ্বুত বাকচোরা ভ্রম’—মিলনীয়, তাঁর ও ক্রান্ত, পরস্পর ও সঙ্গী। এই ভ্রমের ধ্বনি মনে মনে আমি অনেকদিন জ্বলনা করেছি। এই free verse-কে পালিশ করে’ নিজের মনের সঙ্গে ‘মানিয়ে’ নিয়ে আমি আমার জীবনের প্রথম উল্লেখযোগ্য কবিতা ‘শাপমন্ত্র’ লিখ লুম। ও-কবিতায় প্রেমেন্দ্র নিজের প্রচুর হৃদয়ঙ্গমিত্য কাছে আসে অনেক বিষয়ে ধরা পড়ে।

আজ সেই সব কবিতা হৃদয়ঙ্গম লাগে ‘অদ্বুত’ হয়ে বইয়ের আকারে আমার সামনে উপস্থিত। বইয়ের প্রায় সব কবিতাই আমার ‘অতি পরিচিত’-বসন্তে গেলে, মুগ্ধ। আজ আবার দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে

পুনঃসঙ্গনের ‘আনন্দ’ নিয়ে কবিতাও ‘পড়ে’ দেখছি। ভয় ছিলো, পাছে কাঁচা বয়সের উচ্ছৃঙ্খল উৎসাহে মনকে বা ‘অমন করে’ নাড়া দিয়েছিলো, ‘আজ’ তার মধ্যে ‘আভাব’, ‘অসম্পূর্ণতা’ চোখে পড়ে। কিন্তু না—সাত বছর আগে যে-আনন্দ পেয়েছিলাম, ‘আজো’ তাই পাচ্ছি; কোথাও রক্ত, ফিকে হয় নি, রস হালুকা হয় নি। প্রেমেন্দ্রের কবিতা তাঁর স্বকীয়তার উজ্জল; তাঁর কল্পনা সংসারের তুচ্ছ ‘পুঁনি’টি থেকে মানুষের ভাগ্য বিধাতার চরণপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত; পুরোনো খবরের কাগজ, ভাড়াটে বাড়ি থেকে ‘আরম্ভ’ করে’ সীমাহীন আকাশে সূর্য্যমান গ্রহ-উপগ্রহ পর্যন্ত তাঁর গতিবিধি। তাঁর রচনা-রীতি গুরুশৈলী—ভাব প্রগাঢ়তার গতিবেগে তা স্বতঃই তুচ্ছ হ’য়ে ওঠে। মানুষের বার্তা, হীনতা, চূর্ণলতা মধ্যক গভীর চেতনাবোধ তাঁর কবিতার মর্মের কথা। যাত্রিক সভ্যতার রক্ত-লিপ্ত পিণ্ডাটী মূর্তি তিনি দেখেছেন; ‘স্বপ্ন ও শোণিত’ দিয়ে ‘কৃতদাস’ মানবের মৃত্যু-পুর হ’তে বিদ্রোহী তিনি জীবন-বিখাতাকে নমস্কার জানাচ্ছেন। মানুষের ঘরে তাঁর দেবতা জন্ম নেন, কিন্তু ঘটনা-সংঘাত দেখা যায়, কোণের দেবতা?—

আজ

বিকৃত স্থানর কাছে বসে বসে আমার গণনায় কীরে।

আধুনিক গণতান্ত্রিক ভাব তাঁর কারো পারিষদ?—

বহালাঘের মনোহীন মূলে

হস্তভাষার বন্ধকীভূত ভাই,

জগতের ঘর, ভাড়া বাহাঙ্কের ভিড়!

নিজের মুখেই তিনি বলেছেন যে

‘আমি কবি যত কবিতার আর কবিতার আর দুটোরের

মুটে মল্লেরে,

—আমি কবি যত হইতরের।

জীবনে স্বপ্নের সময় নেই, প্রেমের সময় নেই।—

জাতির কাটান জালাবার মূর্তি

পড়ে ত্যাগবীর্য ছাড়া,

জিয়ার কোলেতে কীরে দারস

খাব নিশিথ মায়া।

দীপহীন ঘরে আবে নিমিত্ত

সে ছাড়া আঁখির কোলে,

মুগি ছাড়া খোঁটা অশ্রু-জলের

মধুর মিনতি বোলে।

সে মিনতি রাখি সময় যে হার নাই,

বিশ্বকর্মা যোয়ার মর কণ্ঠে হাভার করে

সেখা যে চাঞ্চল্য চাই!

অনিচ্ছিত প্রেমেন্দ্রের কবিতার এ-দিকটিকে ‘অতিরিক্ত প্রাধান্য’ দেয়া সম্ভব; এবং এ নিয়ে ইতিপূর্বে অনেক বাক্যে কথা বোঝা হয়েছে। তাঁর ডেমক্রেসিকে প্রসঙ্গ জেনে উল্লেখ করা যায় যার; কারণ, সেটা আসল জিনিস নয়। বিষয়-বস্তু নিয়ে কবিতা হয় না। আসল জিনিস হচ্ছে তাঁর সভ্যতার কবিত্বশক্তি, যা তাঁর রীতিতে, ভাবীতে, ধর্মীতে, অতীততে, কল্পনায় প্রকাশিত হয়েছে; জীবনকে সমগ্রভাবে দেখবার শক্তি, জীবনের নয় মূর্তিকে সূচামুখি দেখবার জ্ঞানবস। কবির মধ্যে তিনি কবি।

দ্বিতীয় যে-কবিতার বইয়ের ‘আলোচনা’ কর্ণো, তা হচ্ছে ‘অজিতকুমার’র দত্তের ‘স্বপ্নমের মাস’। বেড় বন্ধুর আগে এই ছোট বইখানা বেরোয়, কিন্তু সে-সময়ে কেউ তা বিশেষ লক্ষ্য করে নি; ‘অজিতকুমার’ এখনো অপেক্ষাকৃত ‘অজ্ঞাত’। সাহিত্যের কোনো দ্বন্দ্বোপা নিয়ম-অঙ্গসারে কখনো-কখনো অনেক ভাঙো জিনিসও কিছুদিনের জ্ঞা চালা পড়ে থাকে। আমি মনে করি, ‘স্বপ্নমের মাস’ বাঙালি সাহিত্য-জগতের বদলভাবে পরিচিত ও প্রসারিত হ’তে বাধ্য; কারণ, ঠিক ও-ধরনের কবিতা বাঙালি ভাষার আর নেই। ‘অজিতকুমার’র বদন প্রথম লিখিত ‘আরম্ভ’ করেন, তখন থেকেই আমি তাঁর কবিতার ভক্ত; এবং হালে ‘স্বপ্নমের মাস’ আমার প্রিয় বাঙালি কবিতার বই হ’য়ে উঠেছিলো। আজ তাই সে-বই মধ্যক প্রকাশভাবে কিছু বলবার স্বযোগ করে’ নিলাম।

প্রেমেন্দ্রের ‘প্রথম’ আর ‘অজিতকুমারের’ ‘স্বপ্নমের মাস’ একবারে বিপরীত; ‘দ্বৈতানি’ কবিতার বইয়ে এর

চেয়ে বেশি বৈপরীত্য করা কঠোর নয়। 'প্রথম' ক্ষত ও ভীষণ, 'কৃষ্ণ' মনের মনুষ্য ও কোমল; 'প্রথম' প্রাধান্য গুণ যদি হয় vigour, 'কৃষ্ণ' মনের মনুষ্য হইবে tenderness। প্রেমের কবিতায় প্রেমের মনের কোনো উচ্চাঙ্গের সন্ধান নেই; অজিতকুমারের প্রায় সব ক'টিই প্রেমের কবিতা। সে-প্রেম তীব্রতার উচ্চস্রুতি নয়; তা কোমল, আদর, শীতল। লঘু বসনের মত তা যেন প্রিয়তার সঙ্গীত, সমস্ত অন্তর-মন জড়িয়ে আছে। নম্রতায় তা ঘেঁষের মত; প্রতিটি কথা একটি আদর। প্রতিটি কথা বর্ষার কোনো সিক্ত ফুলের মত স্পর্শ, লঘু সৌরভ। 'প্রথম'র পর 'কৃষ্ণ' মনের পড়ল মনে হ'বে, তারা-তারা উত্তর-বাহির 'অন্ধকার, উষ্ণ রক্ত' থেকে এক কান্তবর্ণ, গন্ধ-মধুর, বিদ্যে বর্ষা-প্রভাতে ছেঁড়া-মেঘ আকাশের নীচে এসে ঝড়িয়েছে। শীতল—এর চেয়ে ভালো কোনো বিশেষণ অজিতকুমারের কবিতার পক্ষে আমার মনে পড়ছে না। সমস্ত মন যেন জড়িয়ে যায়।

'কৃষ্ণ' মনের 'অন্তর্গত' বেশির ভাগ কবিতাই সনেট—ইতালীয় ছ'চেয়ার। প্রথমেই বলে থাকি, টেকনিকের দিক থেকে অজিতকুমারের সনেটগুলো 'অনবদ্য, বাঙালীভাষার শ্রেষ্ঠ'। সনেট-রচনার এমন নিষ্ঠুর তুলনাতা কেউ দেখাতে পারেন নি—বেবেঞ্জর সেন নন, প্রমথ চৌধুরী নন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ নন, বুদ্ধদেব বসু নন। সনেটে তত্ত্বাবহতার জ্ঞান যেন সব জিনিষ দরকার—ভাষার মিতব্যয়িতা, বাজনার সূচন, কাবের কঠোরতা—সব অজিতকুমারের পরিপূর্ণভাবে আছে। আমি জোর করে বলতে পারি, অঙ্গসৌষ্ঠব ও গঠনের অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ চিত্রণও এই সনেটগুলো সহজেই উদ্ভারতে পারেন। তার এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকেও এরা বাটী লিরিকের পথ্য্যে পড়ে; লিরিক মানে যদি সে-কবিতা হয়, যাতে মনের কোনো নিত্যজ্ঞ ব্যক্তিগত আবেগ সজ্জ, সংক্ষেপে, হৃদয় করে প্রকাশ করা হয়েছে, তা হলে তার এর চেয়ে ভালো উদাহরণ বাঙালী ভাষার আমার জানা নেই। হ'লনার গোপন গুণ্ডরগ—প্রত্যেকটি কথার প্রেম-বাক্য লক্ষ্যসংলগ্ন ধর্মিত হইছে। ছোট কথা, ভীষণ আশা, লজ্জাকর বাসনা—তারি ভেতর দিয়ে একটি মৃদুদ্রব প্রিয়তার

কাছে নিজকে ঢেঁপে দিচ্ছে। সনেটগুলো (এবং তাই বইয়ের শ্রেষ্ঠ অংশ) ভালোবাসার বিভিন্ন mood-এর এক-একটি ছবি; প্রত্যেকটি ঘিরে একটি বিশেষ atmosphere, যাঁর মধ্যে মন অনায়াসে মগ হ'য়ে যায়। প্রথম কবিতার কবি 'কৃষ্ণ' মনের 'প্রিয়াকে আদান করছেন:

আমিও কৃষ্ণ-মিঃ। আনিকো তো কৃষ্ণের মন।
যোর হাতে হাত রাখ। চোখো ঘাই কৃষ্ণ-বিশ্রামে।
বসিমা নিভৃত কুঞ্জে করিবে তোয়ার কানে-কানে,
কেন ফুলে জরিয়াছি জীবনের মধু-বন্যকান।

পূর্বের কবিতারও 'আমন্ত্রণ'—

এখন কবিতা রচনা। পাতাগুলি হাওয়ায় ঢেঁপে
যেখানে, সেখানে চোখো। মেঘে আঁজ হারিয়েছে শব্দ।
চোখো ঘাই খানখানের পুরুষের ঘাটে গিয়ে যদি;
বাহায়ে উড়ুক তুমি এলোমেলো উড়ুক আঁচল।
তোমার চোখের 'পরে' আঁধার করিবে ছল ছল,
তোমার চোখের মত উজ্জলবে কাজল-সরসী,
তোমার পাখের মতো কখনো বলবে উড়িবে হাবি!
জেনোকারি হাওয়াগুলি পড়ায়ের মত অবিকল।

'আট লাইনের মধ্যে বাইরের একটি সম্পূর্ণ ছবি ও মনের একটি mood—হ'য়ে মিলে' একটা ঘন অব্যাহাতি তৈরি করা—জয়দেবের 'পদ্য'র আন্তরিকতার সঙ্গে প্রচুর রচনাশক্তি না থাকলে তা সম্ভব হয় না। প্রেমিক ধ্রুপদের মিনতি আর ব্যাকুলতা, বাসনার সঙ্গে লজ্জা, অকর্ণটতার সঙ্গে ভীষণতা মিশ্রিত হ'য়ে এক বিরল সৌন্দর্য উদ্ভূত করেছে—
—তা করণ এবং মধুর, সহজ এবং সজল:

তুমি এসে এতদূর? এতদূর এসেছো কখন?
কেনমনে বিনিমে পথ রহ, হীন এমন কখন?
ভাবিয়েছিলো আমি এতখন কেবল তোমার।
তোমারইে তব যোগ এক-একা থাকিবেতখন।
পুল' বেয়ে আদিত্যো হ'বোতের মূর কীর্ণ?
এমন ছায়ার মত আনিত কি হে নিরাশায়?
এখনি মিলিত হ'বে—? এলে তবু দেখিতে আনায়?
এলে যদি এতদূর, এ তোমার খোলা কেমণ?

পদ্যীর 'অন্তরঙ্গতার' মৃদুস্বর নিঃশব্দে মত এসে পড়ছে:

কান যে বেরছে পথ, অপরূপ? কবির সে-কথা?
অপূর্ণ কারিনি সেই, চুপে-চুপে করিবে তোমার।
সবাই মুগ্ধে পরে এসে থেঁকা টিপি-টিপি পাখ।
চকল কখন-কখনে জেতো না রাজির মীরাহ?
হাতের দেখেছি পথে? পাখা! যে হ'তে পারে লতা?
যাহারে দেখেছি কাল, কান-কানে শোনে যদি জার—
তা হলে ঘুমিই হ'বে।

একদিন 'গুণ্ডরগ' মনের কথ্য কবিতার 'অজিয়ার' কবি প্রিয়তার কাছে এক রাশ জল চেয়েছিলেন; গোপন প্রণয়ের ভাষা বৃষ্টিতে পেয়ে সে লাল হ'য়ে উঠেছিলো। সেই লজ্জাক্রমিক মুখে কবি মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন:

যোর হাতে কতদিন করেছি তো অনেক আদর,
নিরাশা, চুপে-চুপে। কত খা খেয়েছি কপালে,
কশিত চোখের 'পরে'। কতবার কত যে খোলায়ে,
কত ভাবে দেখেছি তো নিটোনা, নিষ্ঠুর জগত।
তবু এই লজ্জাক্রমিক গাখিমে কো অদ্বিতীয় মধুর,
গুণ্ডরগের মাঝে আলো-তারা লজ্জা-বিকালে।

'অঁরে' নামক কবিতায় কবির 'প্রণয়-বীকাকালি, প্রণয়-প্রার্থনা, নিশেষে আশ্ব-সমর্পণ। যে-কথা ধ্রুপদের সব চেয়ে মৌলিকত্ব, তা বাবা সহজ নয়; মাহুয়ের ভাষা তার পক্ষে বড় ক্লেশ মনে হয়; অস্পষ্ট আলো-ছায়া-সম্পাত, অস্বুত জ্ঞানে-মনের মধ্যে যে-ছবি, যে-সঙ্গীত বিনীত হ'য়ে থাকে, তাঁকে বাইরে বেরিয়ে আনতে গেলেই যেন ভাবার তীর আশোয়, জন্মের উচ্চ ধর্মিততে সেই আসল কথা, নিত্যজ্ঞ মনের কথাটি হারিয়ে যায়। সেই জল্প কবিতার শরৎ নিতে হয় উপহার, জ্ঞানকে—'আদালো, আদালো প্রণয়বাহি যদি বলা হ'য়ে যায়! সহজ, স্বজ্ঞ, নিরাক্রম্য ভাষার মনের কথা সম্পূর্ণ তবে', একান্ত করে' বলতে পারা—আমার আদার কোনো মর্মান কাঁড়ির চাইতে এক-এক কম নয়। এই কীর্ষি অজিতকুমারের 'অঁরে' কবিতায় সম্পূর্ণ উজ্জ্বল বর্ণনার সোভ সর্বদয় করছে। পারছি না:

ঘন এ পৃথিবীর নিমগ্নতা কবি অহুতব—
তখন শরীর মত লুপ্তহে বায়ু কবি
তুমি আলো মনে পালে নিশিদের ছায়া-পথ ঘিরে
তুমি ছায়া কবিনি কীভাবে লক্ষ করায়।

সংগে-বাধন মাগে তুমি যোর একাঙ্গ বাধন,
নিশা-রূপে তুমি মোর সাথে থাকো, হৃদয়-লক্ষী,
ফুলের গন্ধের মত তুমি আতো সার মন ভরি'
তপালি জীবনে তুমি ঈশ্বরের মন হইবে।

আমি তুমি এসো কাছে বেবেঞ্জর অপর মধ্য।
জায়ে, আর কেহ ঘাই হইছে দূর নাপার মাখিত;
হৃদয় জিনিষ কাছে, এমন কে আছে পৃথিবীর?
হোয়ার মন, বৈ, ধর্মামী রূপে কোয়ার?
অতুল-জর্জর বৈ, ঘুম ঘাই চোখে পাতার,
একবার এসো কাছে আমি এই বিখান নিশিবে।

কবি প্রেমের তাঁর স্বর্ণকে হারিয়েছেন, এই তাঁর গোঁব।
বেদান্ত তিনি স্বর্ণ থেকে একদিন নেমে এসেছেন; 'বিজির পৃথিবীর বিজিরি মিছিল দেখে বিষয়ে মুগ্ধ হ'লেন,' কিং
অকস্মাৎ বাহুমে সে-মিছিল বন্ধ করি' বিরা'
পৌরমে রঞ্জিত মন, মহীশী, তুমি এসে ঘিরে:

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহান্তর গুচে' গেলো, পাখা পড়লো পলে',
স্বর্ণ থেকে তিনি চিরকালের মত পৃথিবীর পথে 'উঠে' গেলেন;
স্বর্ণের বিনিময়ে লাভ করলেন প্রেম:

তোমার হ' চোখের তিমিরে
লোষ্ট্র সম সপ্ত বর্ষ' গেলো মুগ্ধে কাঁপিয়া—

মুঠা 'আগবে—একদিন মুঠা 'আগবেই; 'অবিরীর বিজিরি মিছিল—'মূল, ফল, নীলাকা' ছেড়ে তেতে হ'বে বলে
কবির রক্ত নেই, অনায়াসে তিনি ঘুমিয়ে পড়তে পারতেন—

কত যদি পৃথিবীরে যেন যেন তেতে নাহি হ'ত
কিছু হারিয়ে স্পর্শ, আগ্নিত রূপের হবার,
শিশির-কোমল বৃষ্টি, কোনো কালি মল জায়গা,
পদ্মর পিলু-বিলু, মৃৎ-পরে কবোকে নিখর্য।
যদি যেন নাহি হ'ত লক্ষ লক্ষ পৃথিবীর মত—
যদি যেন নাহি হ'ত তারা-তারা সহস্র আশা।

উপলি-উজ্জ্বল 'আশা—বিশেষ করে' শেষের দুই পঙ্ক্তি ব্যাকুলতায়, উৎকণ্ঠায়, মিলনের আনন্দে, বিহের আশঙ্কায় পরবর্তন করে' কাঁপছে। লক্ষ-লক্ষ পৃথিবীর মত, তারা-তারা সহস্র আকাশের মত যে-প্রেম, সমস্ত জীবন দিয়ে তাঁর সম্পূর্ণ পণ্ডিত্য জানা বাস না, অমৃত মৃত্যুতে তাঁর পূর্ণচ্ছেদ! এই নিঃসঙ্গতা ছাৎকে, ভূঁয়ের সঙ্গে কণিক উড়ুপালের

পালাতক আনন্দক কবি বে-ভায়ে প্রকাশ করেছেন, তাঁর সৌন্দর্য্য এইখানের মত।

অজিতকুমারের সনেটগুলো নিয়েই বেশি আলোচনা করবুম, কারণ এতেই তাঁর কাব্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয়—কেমনা, the better contains the good। তবু, ‘অজিত কবিতার মধ্যে ছ’ একটির উল্লেখ না করলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ‘মালতী’ Spenserian stanza-র লেখা দীর্ঘ এক কবিতা। পূর্বযৌবনা নারী মালতী এক চৈত্র পূর্ণিমার রাত্রে সজ্জা, পুষ্প-কুণ্ডলে, পুষ্প-শৌর্যে নিরুপমা হয়ে শ্রীমন্তের প্রতীক্ষা করছে; গলে-গলে রাত্রি কহ’ য’রে গেলে—সে এলো না; শেষে এলো তাঁর অন্তিম প্রেমিক—মৃত্যু। কবিতাটি কয়েকটি আশ্চর্য্যকর স্থানবর্ণনের সমাবেশ; রঙে রেখার সম্পূর্ণ, স্তম্ভঙ্গ; যনের সঙ্গে-সঙ্গে তা চোখকেও মুগ্ধ করে। কখনো কখনো এই ধরণটি ইংরেজ প্রিয়ারফেসাইট কবিতাদের মনে করিয়ে দেয়। আর-একটি কবিতা আছে; তাঁর নাম, ‘মালতী ঘুমায়’, যা অজিতকুমারের সনেটের কবিতার মধ্যে আমার সব চেয়ে প্রিয়। ঘরের মধ্যে মালতী যখন ঘুমিয়ে আছে, বাইরে তুমুল ঝড় হচ্ছে, আর কবি লক্ষ্যপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাঁর ‘নিদ্রের বসে’ আছে। ঝড়ের হুচনা, উদ্‌মনতা ও নিদ্রার সঙ্গে-সঙ্গে মালতীর ঘুমের বর্ণনায়, ছন্দকোশলে, পুনরাবৃত্তিতে, প্রাকান্ত কথার সঙ্গে মনে-মনে-বলা কথার মিশ্রণে, ছবিত্তে, স্বপ্নাব্যবহা—এবং সমস্ত জিনিসের অন্তরালে প্রবহমান, সর্বত্র পরিব্যাপ্ত প্রণয়-বেদনার অজিতকুমারের এই কবিতাটি তুলনামূলক।

অজিতকুমারের কাব্যে কোনো উচ্চ Pretensions নেই; তা সহজ, স্বচ্ছ, অনাড়ম্বর, অনাভরণ। অত্যন্ত সাধারণ কথা, পৃথিবীর মত পুরোনো সব ভাব নিয়ে তিনি

তাঁর নিবিড় কাব্য-রস সৃষ্টি করেছেন। সাধারণ কথা যে-অদ্ভুত বাস্তব-বিশ্বায় কাব্যে পরিণত হয়, তাতে তিনি কৃতবিদ্য; ইংরেজিতে বাঁকে verbal magic বলে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গ এই ছোট বইখানার প্রতি পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত। যে-সব কথা আমার রোজ শুনি এবং বলি, সে-সব কথা, বলতে গেলে, কবিতার মাদুলি পুঁজি, সে-সব কথায় নতুন গ্রাণ সঞ্চার করে’, নতুন ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ করে’, নিজের স্বপ্নের রসে উজ্জীবিত তিনি তাঁর অশ্কাব্য শব্দ-সৌন্দর্য্য নির্মাণ করেছেন। বর্তমান বাস্তবতার কবিতার মধ্যে তিনি প্রথম প্রবীণ।

আমুন—আপানাদের সহায়ত্বিত প্রার্থনা করি !!

ভূদেব উইভিং ফ্যাক্টরী

কারখানা :— “অসিমান”
বেনারস দিটি।

সকল রকমের খুদে শীর্ষে মনোহর প্রস্তুত
বেনারসী সাজী ও জ্যাকট

শুভাচরণের প্রসারজনীন ও প্রিয়জনের

উপহার উপযোগী

যাবতীয় তসর, গরদ, চাকরা, চাদর, বন্দর,
বেনারসী, ভাঁড়ের সাজী, প্রকৃতি আধুনিক
রংয়ের ও ফাগানের প্রস্তুত হয়।

সো-করম :—
গোখিল্লা
বেনারস দিটি।



রসচক্র

৯

শ্রীরাধাশ্রী দেবী

গিরিবালা আরোগ্য লাভ করিয়াছে কিন্তু এখনও অসুখপা পায় নাই। গুরুত্ব বড়ের অবসানে কচি ফুলের চারার মত তার শীর্ণ তরুণ্যনিতে প্রাণল রোগের আক্রমণ-চিহ্নে স্থগুপ্ত বর্তমান। নিশ্চল-চাহনির স্তম্ভ অবসন্নতা, রক্তহীন ওষ্ঠাধরের মান হাসিটুকু, ক্ষীণ দুর্গল হাত পা-গুলি, তৈলহীন দৃষ্টি চুলের রাশি তার সর্বদেহে একটি শুদ্ধ মান কাব্যের ‘সৃষ্টি’ করিয়াছে।

খিষ্টের দিকে দুই হিনতা বালিশ উপরি-উপরি সাজাইয়া তাহাতে চৈশ দিয়া গিরিবালা বসিয়াছিল।

শিশির ও বুড়ী তাহার বিছানার একপাশে বসিয়া ‘লুডো’ খেলিতেছিল। গিরিবালা ও খেলার একজন কীড়কের অংশ গ্রহণ করিয়াছিল,—কিন্তু বারে বারে হাত নাড়িয়া খেলিবার সামর্থ্য না থাকায় তার খেলার চাল শিশির ও বুড়ীই চালিয়া দিতেছিল।

খেলা বেশ জমিয়া আসিয়াছে। গিরিবালা একান্ত মনোযোগের সহিত খেলার ঘূঁটির চাল নিরীক্ষণ করিয়া ফলাফল সখ্যক আনন্দ করিতেছিল। এমন সময়ে জ্যা একটা এনামেলের বাটা হাতে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। গিরিবালায় প্রতি চাহিয়া হাসিয়া বলিল,—এই যে, উঠে বসে খেলাও শুরু হয়ে গিয়েছে দেখছি।—দেখো,—খেলার ক’বে যেমন পক্ষে বসে থেকে মাথা-টাগা ধরিয়ে বোসোনা বেন।—এই নাও, আজ স্তোমার জন্তে একটু মৃত্তরের ঝোল তৈরী করে এনেছি; গরম-গরম খেয়ে নাও।

গিরিবালা লুকনোতে জ্বার হাতের বাটাটির দিকে তাকাইয়া উৎসাহ গুণে হাত বাড়াইল।

জ্যা মুগ্ধ হাসিয়া সকৌতুক বালিকার হাতটি পছন্দদিকে টানিয়া লইয়া বলিল,—ঈশ! স্বপ্ন সহজে না যে মেয়ের! এখন ঘরী না দিই খেতে?

গিরিবালা চকল ককণ-কণ্ডে শুদ্ধ হাসিতে হাসিতে

বলিল,—ইং, তাই বৈকি!! না—সত্যি, পায়ে পড়ি কাকিমা,—দীপ-গিরি দাও, বড় ফিদে পেয়েছে কিন্তু!—

জ্যা যেহ-স্বগতীর নেত্রে কণকাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া, সংশ্লিষ্টতবে একখানি চামচ লইয়া মৃত্তরের ঝোল খাওয়াইতে বলিল।

গিরিবালা ব্যস্ততবে বলিল,—আজ আর চামচে করে খাবনা কাকিমা! নিজে বাটা হাতে নিয়ে বসে বসে খাব আগে থাকতেই বলে রেখেছি যে!

জ্যা গিরিবালায় খাওয়ার অত্যধিক আগ্রহ বোধিয়া তৃপ্তচিত্তে বলিল,—আজ্ঞা, নিজের হাতে বাটা ধরে খেতে পাবে, কিন্তু তাড়াতাড়ি করে খেলে হবে না। আস্তে আস্তে একটু একটু করে খেতে হবে।

ইতিমধ্যে বুড়ী চিংকার করিয়া উঠিল,—

—বকুলবুল, ও তাই জাখ—শিশিরবা কি ভয়ানক জোকাটী করছেন! না না—ও হবে না, ও দান আমরা কিছুতেই বেবনা বলে দিচ্ছি! পড়লো ‘পাঁচ’ তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে বয়েন ‘ছহ’ পড়ছে! তারপর চটপট আবার ‘ছহ’ আর ‘তিন’ ফেলে এখন আমার পাকা ঘূঁটীটা কাটাির মনসব!—

শিশির হাসিতে হাসিতে বলিল,—দেখ গিরিবালা,তোমার বকুলবুলটি নিজে জোকাটী করে!—উঠে আমাকে কেমন জোজোর পাঁচ করাকো! নিজের পাকা ঘূঁটীটা কাটা পড়ছে কি না, সেইজন্তে এখন আমার ‘ছহ’র দানকে ‘পাঁচ’ বলে আবারকার দানটাই মাটা করবার কলী!—

বুড়ী তার স্বপ্নের মুখানি রান্ধা করিয়া উত্তেজিত-কণ্ডে দূতকর্কে শিশিরের কথা যে সভা নহে তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্ত প্রাণপণে লাড়িতে লাগিল।

শিশিরও ছাড়িবার পাত্র নয়। সে মুগ্ধ মুগ্ধ হাসিতে

হাসিতে অঞ্চল নিকের জেদ বজায় রাখিয়া তাহার সহিত কথা-কাটাকাট করিতে লাগিল।

গিরিবালা মুতরের ঝোলের আঁধার লইতে লইতে খেলা ও কণ্ডার দিকে সমান আগ্রহে তাহার উগ্রগ্রীব দৃষ্টি মেথিয়া রহিল।

তরঙ্গ মাত্রা গন্ধ হইতে সপ্তমে উঠিল, তবু কোনও পক্ষই আপন দাবী হুতাশ মাত্র ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে দেখিয়া গিরিবালা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। সে বুড়ীর দিকে তাকাইয়া চোখের ইসারা করিল এবং কণ-কণে বলিল,—আজ্ঞা হারটা না-হয় ছেড়েই যেনা কাই বকুলহয়! যাকনা তোর একটা পাকাটুটা। তোর বদি হকের দান হয়, এগুনীই ভটা আবার শেকে বাবে। যে ভোজুচী করে তার কঞ্চো জিত্ব হয় না জানিস তো।—

গিরিবালার কথা সমাপ্ত হইতে-না-হইতেই শিশির বলিয়া উঠিল,—ঠিক বলেছ গিরিবালা! যে ভোজুচী করে তার কঞ্চই জিত্ব হয় না!

কথাটা বলিয়া শিশির এমন ভাবে গিরিবালা ও বুড়ীর দিকে ক্রমাগত তাকাইতে লাগিল,—যেন ভোজুচীটা-যে বুড়ীই করিয়াছে এবং হারটাও যে বুড়ীরাই হইবে ইহাতে গিরিবালা ও শিশির উভয়েই হুনিশ্চিত।

বুড়ী আরও উত্তেজিত হইয়া ফেপিয়া উঠিল।—না, কঞ্চনো নয়, কিছুই নয়। আমার পাকা টুটা মিছিমিছি ভোজুচী করে' কাটতে দেব কিসের জন্তে?—শিশিরদা যখনই দেখোয় হারতে হারতে কখন তথুনি ভোজুচী হুক করে' দেই। এ জন্তেই তো শিশিরদা'র সঙ্গে খেলতে চাইনে আমি!

শিশির বলিল—বাবো! এ' খেলায় তো হার-জিত্ব শেষে মুহুর্তে টেপ পাওয়া যায় না। কখন কা'র পড়তা পড়ে খেলা যাবে বাবো কেউ কি বলতে পারে? "হারতে আরম্ভ করলেই ভোজুচী হুক করেন"—এ কী রকম কথা হ'ল? হারের কাবার আরম্ভ আছে নাকি?—

তারপর গিরিবালার দিকে তাকাইয়া মুহুর্তে মুহুর্তে হাসি হাসিয়া চোখ চিটচিটি করিয়া শিশির বলিল—বৎসলে গিরিবালা, এ জন্তেই তো আমি মেয়েমাথের সঙ্গে খেলতে

ভালবাগি দে। বিশেষ আবার তোমার এই 'বকুলহয়' খবন নেহাতুই পাড়াগোঁয়ে-মেয়ে!

বুড়ীর দ্বন্দ্বমিতা ছিল কেহ তাহাকে 'মেয়েমাথ' বলিয়া অপেক্ষা করিলে বা বিশেষ করিয়া 'পাড়াগোঁয়ে মেয়ে' বলিয়া অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিলে তাহার আশ্র-সন্ধান ও অস্থির অন্তর আবার লাগিত। সে হান কাল পাত ভুলিয়া ক্রোধোত্তেজিত হইয়া, মেয়েমাথ যে পুরুষমাথের অপেক্ষা কোনও জুগে নিম্নেই নয় এবং পাড়াগোঁয়ের মেয়েরা যে উচ্চশিক্ষিতা সঘরের মেয়েদের অপেক্ষা কোনও অংশেই নীচ নয় ইহা প্রতিপন্ন করিতে পাগল হইয়া উঠিত।

আজও তাহার বাতিক্রম ঘটিল না। বুড়ী রাগে আগুন হইয়া উঠিয়া, খেলার ছুটি টান মারিয়া সমস্ত চলন্ত-চুটিগুলি একত্রে নিশায়া দিয়া তর্ক করিতে বসিল।

শিশির হাঁ হাঁ করিয়া বলিয়া উঠিল,—আরে! আরে!! এ বাবা! এমন কমে ভটা খেলটা নষ্ট করে দিলে বুকু। নাঃ, তুমি দেখচি নেহাতুই হারতে রাজী নও! তাই ঠিক হারবার-হারবার মুখেই খেলাটা পও করে দিয়ে লজ্জার হাত থেকে রেহাই দেবে!—সত্যি কথা বলতে কি, তুমি তো প্রায় হেরেই এসেছিলে,—হারটা নিতান্ত অনিবার্য দেখেই না শেষ-পর্যন্ত বগড়া'কাটা বাধিয়ে দিলে,—বাতো খেলাটা মাটি হতে পারে!...নাঃ, এ' সকল বুদ্ধিতে কিন্তু পুরুষমাথের চেয়ে মেয়েমাথের এবং সঘরের মেয়েদের চেয়ে পাড়াগোঁয়ে মেয়েরা অনেক বেশি স্তম্ভার, আমি নিজে থেকেই বোকার মতো।

বুড়ী কোকি চাপে অনন্দে আত্মহারা হইয়া কথা কহিতেই পারিতেছিল না। তাহার সমগ্র মুখখান ও কান ছাটিতে রক্ত জন্মিয়া, ঘোমুলি আকাশের সিন্দূরবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। টানা টানা ভাষা চোখ ছাটি এতকাল দীপ্তভাবে জ্বলিতেছিল, এবার জল-ছলছল হইয়া উঠিল। জগার দিকে কাতর-অভিমান ও অহযোগপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া বুড়ী বলিল,—দেখুন না ব'খোঁদী!—অতিরিক্ত জ্বলে অভিমানে রাগে তার কণ্ঠ কঙ্ক হইয়া গেল। চোরা করিয়াও আর কিছুই বলিতে পারিল না।

জগা এতকাল দাঁড়াইয়া সত্যেকটো ইহাদের কলহ উপভোগ

করিতেছিল। কোনও কথা কহে না। বুড়ীর কাতর অভিযোগে হাসিতে হাসিতে শিশিরের দিকে চাহিয়া বলিল—সত্যি শিশির! তুই বড় বুড়ীর পেছনে লাগিস! ছেলেমাথ, ওকে জালাতন করে তোর কী আমোদ বাড়ে শুনি?

শিশির বুড়ীর রান অশ-ছলছল চোখ ছাটি ও আরক্তিম হৃদয় মুখখানির পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়াছিল। জগার কথায় মুগ্ধ কিরাইরা হাসিয়া বলিল,—নাঃ, নেহাৎ বাচ্চা ছেলেমাথ! পাড়াগোঁয়ে মেয়েরা যে এত ছেলেমাথের হয় তা' জানতুম না। তা' হলে কি খেলতে বসি?

জগা হাসি চাপিতে চাপিতে রক্তিম কোপে ধমক দিয়া উঠিল—কেস তুই ওর সঙ্গে লাগছিস?—

গিরিবালার মুতরের হৃদয়ও খেপে হইয়া গিয়াছিল। হাতের আঙুল চাটিতে চাটিতে বুড়ীর দিকে সহস্রকৃতিপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া সে যেহেতু আশে বলিল—তুই অন্তো রেগে যাস কেন বকুলহয়?—সেই জন্তেই তো তোকে মাথের বেশি করে ফোয়ার মজা দেখবার জুজ। তোকে কেউ 'মেয়ে-মাথ' কিবা 'পাড়াগোঁয়ে মেয়ে' বললে তুই এয়ার থেকে জবাব দিবি,—হ্যাঁ আমি, মেয়েমাথ, পুরুষ নই। আর, পাড়াগোঁয়ে হামিছি, বড় হয়েছি, পাড়াগোঁয়ে হবোনা তো কি, সঘরে-জুত হবো নাকি?—

শিশির হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—এইরে—মুতর ভালেও শরীরে বল-সকার করে শুনেছিলুম,—এ যে রমানোভেও দিবি বল-সকার করে দেখা বাবে!—মাথাতে বোহ হয় কলহশক্তিও, স্কার করে! না দিবি?—শিশির জগার পানে তাকাইয়া হাসিতে লাগিল।

জগা গিরিবালার গিটের বালিশগুলি সরাইয়া সাধবানে সমস্তে তাহাকে শোরাইয়া দিয়া—পযের উজ্জিট বাটাটি উঠাইয়া লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া বাইতে বাইতে বলিল—তোরা সারাদিন শুণ্ড এ' বগড়াই কর বসে বসে।

জগাকে বাইতে দেখিয়া বুড়ীও উঠিয়া চলিয়া যাবার উৎসাহ করিল। গিরিবালা ব্যগ্রভাবে বলিল—ওকি! তুই এগুনী চলে যাচ্ছিস নাকি বকুলহয়?—এই তো এলি! আরেকটু বাবে ঘাসনা তাই

বুড়ী উদাস-গম্ভীর মুখে উত্তর দিল—না—আজ বাই, দরকার আছে। ঠাট্টা একটু ঈগণির করে দিতরতে বলে দিয়েছেন। ও'বেলা আবার আসবে। 'খন।—তারপর শিশিরের দিকে একটু বিজ্ঞপ-অপাদে চাহিয়া লইয়া গিরিবালার পানে তাকাইয়া বলিল—কেন ভাই? এখন তো আর তোমার একলাটি থাকতে হয় না যে অস্থক করলেই এই পাড়াগোঁয়ে বকুলহয়কে আসতে হবে? তোমার সঙ্গে গল্প ক'রবার জন্তে তো এখন খাটী কলকাটা সঘরের সহচর-মাথব রয়েছেন!—

গিরিবালা সগল-কাতরতার সহিত বলিয়া উঠিল—ও হরি! তুই বৃষ্টি তেরেছিস শিশিরদা আমার কাছে সারা দিন বসে থাকেন, গল্প করেন?—ভাই! এ' তুই বকুলহয় আমার কাছে থাকিস ভাই, শিশিরদাও সেইটুকুশ থাকেন। গল্প করেন, বই পড়ে শোনান, তাগের মাজিক দেখান। তারপরে তুইও বই উঠে বাস শিশিরদাও 'অমনি একটা ছুতো করে চম্পট দেন। এই তো ওঁর সামনেই বলে দিচ্ছি! সত্যি-মিথো বলুন না উনি?—

শিশির গিরিবালার এই অভিযোগে অতিরিক্ত লজ্জার অপ্রতিভ হইয়া পড়িল এবং তাড়াতাড়ি সেটা সামান্যইরা লইবার জন্ত অশ্রদ্ধা পান্ডিরা বলিল—তা' তো বকুলহয় গিরিবালা,—কিন্তু তুমি যে কী হুজুর আমাকে 'শিশিরদা' বলতে হুক করেছো সেটা আমি আজও পঞ্চাশ ট্রিক আবার করে উঠতে পাচ্চিনি এই হয়েচে মুফিল!—শিশির মুখে চপে একটা রক্তিম মহাচিন্তিত ভাব বুটাইয়া মাথার কৃষ্টিতে কেশরাশির মধ্যে ডান হাতের পাঁচটি অঙ্গুলি ঘন-ঘন সঞ্চালিত করিতে লাগিল।

গিরিবালাও হঠাৎ অত্যাশ্রুজিত ও অপ্রতিভ হইয়া উঠিল। বুড়ী শিশিরের সেই ভাবভঙ্গী ও রকম রকম দেখিয়া বিপুল গাভীরের মধ্যেও হাসিয়া ফেলিল। শিশিরের সঙ্গে চোখেচোখি হইবার তাড়াতাড়ি হাসি সামলইয়া লইয়া গম্ভীরভাবে গিরিবালার দিকে চাহিয়া বলিল—জবাব দে'না বকুলহয়! বল, আমার খুশী! আমি যে-নামেই ডাকাবো। তারজন্তে কারার কাছে কবাবদিহি করতে পারবোনা।

বুড়ী কথা বলার এবার শিশির বিগুণ উৎসাহে সোজা হইয়া বলিল এবং গিরিবালার দিকেই তাকাইয়া বলিতে লাগিল—‘তা’ না হয় বোকা গেল গিরিবালা,—তুমি থাকে কেন—নামেই হচ্ছে ডাকতে পারে। শিশিরকে রাখাল, রাখালকে বিষ্ণু, বিষ্ণুকে দামিনী, দামিনীকে অক্ষয়,—বকুলফুলকে বিহুফুল—যাকে বা ‘শুশী’ তোমার সেই নামে ডাকতে কোনো বাধা নেই! কিন্তু—আমার প্রমটা হচ্ছে—কী সম্বন্ধের হয়ে তুমি আমাকে ‘দাদা’ বলতে শুরু করেচ সেটা যদি এই ‘সম্বন্ধে’ কৃতের গোবরভরা মাথায় একটু বসায় করে চুকিয়ে দাও!! আমার উদ্দিষ্ট তোমার কাকীমা, অথচ আমাকে বলচ ‘দাদা’,—‘দাদা’র ভাবের সমস্ত গুণগোল হয়ে জগা-বিচুড়া পাকিয়ে যাচ্ছে! ঠিক খেই দরতে পাঙ্কি না কিছুতেই!—

শিশির ছই হাত দিয়া নিজের মাথাটা ধরিয়া একবার সজোরে কাঁদুনি দিয়া উঠিল।

বুড়ী এবার আর তার সবরক্ষিত ক্রটিম গাথাঁবা রন্ধা করিতে পারিল না। মুখ চোখ গুঁড়ির ভেদ করিয়া হাসির নিকৃতি ছড়াইয়া পড়িল।—মাগো না,—খাখাটা লম্বা ভাঙের হাড়ির মত ছই হাতে কাঁদুনি দিয়া বুদ্ধি খিতাইয়া লইতেছে, এমন মাহুষ যে ভেদে দেখে নাই বাপু!

গিরিবালা অত্যন্ত লজ্জিত-কণ্ঠে আমতা আমতা করিয়া কহিল—আমি কি জানি? বকুলফুল যে আপনাকে ‘তুই’ বস্কা ডাকে! আমিও তাই ওর দেখাওনি—কথাটা সম্পূর্ণ না করিয়াই সে অপ্রতিভ ভাবে চুপ করিল। তারপর আবার আপনা-আপনি বলিতে লাগিল—আমাকে তো কেউ বলে দেয়নি, কি বলে আপনাকে ডাকবে। কাকীমাও কিছু শিখিয়ে দেননি!—শ্যেস্ত কথাটার বেশ একটু অভিনয় ধ্যানিত হইয়া উঠিল।

এবার বুড়ী কথা কহিল। সখীকে প্রতিপক্ষের কাছ পড়াঞ্জিতায় হেঁচকা স্বাধী পক্ষ গ্রহণ করিয়া বলিল,—কেন? বলে দেবার শিখিয়ে দেবার কী আছে? তুই বলনা,—সম্বন্ধের হয়ে খুঁজে পাচ্ছেন না, কণ্ঠভার হয়ে তো খুঁজি খুঁজে পানু দেখতে পাই। আমি আমার বকুলফুলের সম্বন্ধেই আপনাকে ‘দাদা’ বলি। বকুলফুলের যদি আপনি

‘শিশিরবা’ হ’তে পারেন সেই হুজ আমারও ‘শিশিরবা’ হ’তে আটকায়না কিছু। এর জন্তে আমার কাকীমা জ্যাঠাইমাদের কাছে শিখতে যাওয়ার কিছু নেই এবং আপনারও এত মাথা ঘামিয়ে ছুটুতা ভোগের কারণ নেই।

শিশির ক্রটিম অপ্রতিভতার ভাণ করিয়া মাথা চুকাইয়া আমতা আমতা করিয়া বলিল—ও—হ্যাঁ—তা’ ঠিকই বলেচ বুড়ী! তোমার সম্পর্কের হিসেবে তোমার বকুলফুল আমাকে ‘শিশিরবা’ বলতে পারেন নিশ্চয়ই। ওটা আমার মাথাতেরই মোটে ঢোকেনি। ধরোনা, এই তোমার বিনি ইয়ে—কি বলে—বর আসবেন, তাকে তুমি যেমন ‘ওগো—হ্যাঁগো—’ বলে’ ডাকবে, তোমার বকুলফুলও—তো তাকে ‘ওগো হ্যাঁগো—’ বলেই ডাকবেন। অর্থাৎ তোমার বিনি দাদা তিনি তোমার বকুলফুলেরও দাদা, সে হিসাবে তোমার বিনি বর, তিনি তোমার বকুলফুলেরও—

শিশিরের কথা শেষ হইবার পূর্বেই গিরিবালা উঠিয়া বসিয়াছিল। সে ছইহাতে, সজোরে-নিজের মুখখানি আবৃত করিয়া চোঁচাইয়া উঠিল—ওমা—ছী ছিছি—

বুড়ী কিন্তু এবার সকেতুক অথচ সলজ্জ হাসি চাপিতে না পারিয়া অস্থিরকৈ মুখ ফিরাইয়া বলিল।

শিশির দেখিল ঠাকুরী সিদ্ধ হইয়াছে। সে ভাতাভাতি উঠিয়া গিয়া তাকের উপর হইতে তাম জোড়া পাড়িয়া আনিয়া বলিল—আজ্ঞা, ওঁসব সম্পর্ক-টপ্পারের ‘অগ্রয়’ আলোচনাটা এখন বন্ধ থাক্, এস তিনজনকে একহাত গোলামজের খেলা থাক্।

বুড়ী সজোরে মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে জীবনে কখনও তাহার সহিত আর কোনওরকম খেলা বেশিরে না। গিরিবালাও তাহাতে সায় দিল। শিশিরের মত বিবদ জুয়াচুরীতে সিদ্ধহস্ত মাহুষের সহিত খেলিতে বসাই নাকি ভয়ানক ভুল ইত্যাদি।

শিশির হাসিয়া তাস ভাজিতে ভাজিতে বলিল—আজ্ঞা—‘প্রাসি’ কছি, একটুও জোচ্ছুরী কোঁরবোনা এবার। বরং বাজী রেখে খেলবো। যদি তোমরা আমার দ্বারাতে পারো,—বা চাইবে তাই-ই সেব ঠিক দেখে নিও।

বকুলফুলেরা তবুও রাজী হইল না। তাহারা নাকি নাক-কান মলিয়া শূণ্য গ্রহণ করিয়াছে যে, শিশিরের মত কলহপ্রিয় প্রভাতকের সহিত কখনই আর জীবনেও খেলিতে বসিবেনা।

তখন হইয়া শিশির তখন তাসগুণ ভাজিয়া ও সাজাইয়া মাজিক দেখাইতে বলিল।

অক্ষয় পরেই বুড়ী আবার উঠিয়া পড়িল। গিরি-বালাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—বেলা হয়েছে, এখন মাই ভাই বকুলফুল! ওবেলা যদি পারি তো—

গিরিবালা সাগ্রহে বাধা দিয়া বলিল—যদি পারি-টারি নয়, নিশ্চয়ই ওবেলা ‘অম্মা চাই-ই’। বকুলে?—

শিশিরও তাস ফেলিয়া উঠিয়া পাড়াইল। ভূই হাত মাথার উপরে পাড়া উঁচু করিয়া ধরিয়া অলস ভাঙিতে ভাঙিতে হাই ভুলিয়া শিশির বলিল—তোমার বকুলফুলটিকে বাজী পৌঁছে দিয়ে আসি। কি বোলা গিরিবালা? পাড়াপাঁয়ের মেতে, যদি রাস্তা হারিয়ে ফেলে তা’হলে ও’বেলা আর তোমার কাছে আসতে পারবেনা যে!

বুড়ী প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল,—না, আমি একদাই বেশ যেতে পারবো। কাউকে আমার সঙ্গে যেতে হবে না।

শিশির উত্তর দিল—কিন্তু ঠাকুমা যে কাল আনায় বলছিলেন আর নাকি ‘তোমার একরা একরা রাগার গাভারত করা’ বাগানে বাগানে ঘুরে পরের গাছের ফল ফল চুরি করে বেড়ানো, পুঁহুরে জিপ্ ফেলে বসে মাছধরা, গাছে দোলা টাঙিয়ে দেুলু পাওয়া—এ’ সমস্ত উচিত নয়। এই সব নিষিদ্ধ কাজ করছো বলেইনা ঠাকুমা শীগগির শীগগির তোমাকে—

—আজ্ঞা আজ্ঞা, আপনি চুপ করুন তো মহাই! আপনাকে আর অতো বাধ্যা করে বলতে হবে না কিছু। আমার বা’ খুশী তুই কোঁরবো আপনার তাকে কি?

গিরিবালা স্তম্ভস্থ হাসিতছিল। সে বলিল,—না ভাই বকুলফুল, শিশিরবা—তোকে পৌঁছে দিয়েই আসুন। একলা বাজী ফিরলে, ঠাকুমা হরতো আবার ওবেলা তোকে আসতে দেখেনা না।

বুড়ী গিরিবালায় কথার সত্যতা মনে বন্ধিয়া শিশিরের সঙ্গে যাওয়াতে আর বাধা দিল না।

পথে বাইতে বাইতে বুড়ী বলিল—বকুলফুল তো প্রায় সেরে উঠিল, এইবার বোধ হয় আপনি কলকাতায় ফিরবেন, না শিশিরবা?

শিশির বলিল—কেন? তোমাদের খেঁচা কি আর টিকছেনা বুড়ী? এবার নিয়ে থেকে বিদায় না হলে শেষ পর্যন্ত বোধ হয় তোমরা ধনময় দিয়ে—

বুড়ী ভাতাভাতি ভিচ্ কাটিয়া বাবিত বিশ্বয়ে বলিয়া উঠিল—ওকি? ছিছি, চুপ করুন। কী যে আপনি বলেন শিশিরবা, তার কোনও মানেই হয় না।

শিশির বলিল—কেন? তোমরা কি আমাকে নিয়ে এই ক’মাসেই যথেষ্ট উত্তাক হয়ে ওঠেনি বুড়ী? সাতা করে বসো।

অকস্মিক সরলতার ভরা হৃদয় চোখ ছাট শিশিরের দিকে পরিস্পূর্ণ দৃষ্টিতে স্থাপন করিয়া বুড়ী উত্তর দিল—একটুও না। বরং আপনার চলে যাওয়ার কথা মনে হচ্ছে মনটা খারাপই হয়ে যায় আমাদের।

তারপর ক’দূর একটু নামাইয়া ঈষৎ বিষম্বদেয় বাঁমতে লাগিল—তা’ছাড়া আপনি চলে গেলে আমাদের খুশী হওয়ার বা নিশ্চিন্ত হওয়ার কী আছে বলুন? আপনি তো আমাদের বাড়ীতে থাকেন না কিবা থানওনা। আমরা এত গরীব বলেইনা আপনাকে একদিন নেমন্তন্ন করে পাওয়াতে পধ্যস্ত পারিনি। ঠাকুমা রোজই তো সেম্বন্ধে ছুগু করেন কত!

শিশির ব্যগ্র উৎসাহে বলিয়া উঠিল—সত্যি বলচ বুড়ী, আমি কলকাতা চলে গেলে তোমার ‘মদে’ হুগু হবে? সত্যি?—

বুড়ী হাঁটিতে হাঁটিতে একটু থমকিয়া পাড়াইয়া নিতান্ত বিশ্বস্ত মুখে শিশিরের দিকে চাহিয়া বলিল—সত্যি না তো কি,—মিথো বলচি শিশিরবা? আমার কথা বিশ্বাস না করেন, ঠাকুমা বকুলফুল ওদের সমাইকে ভিজাঙ্গা করে দেখবেন।

শিশি: চমৎকৃত ভাবে বলিল,—ওদের কী জিজ্ঞেসা করতে বলছো?—

বুড়ী বলিল—জিজ্ঞাসা করবেন, ওদেরও মন কেমন করবে কিনা আপনি চলে গেলে। আমার একলাই যদি মন কেমন করতো তা'হলে না হয় না-ই বিশ্বাস করতেন। কিন্তু ঠাকুরা ঠোঁড়ার মিছে কথা কইলেন না।

শিশুর বুড়ীর অক্লান্ত সারল্যময়িত স্বন্দর বৃথানির প্রতি নিম্নে অতৃপ্তমনে তাকাইয়া থাকিয়া একটু অস্বমনক-স্বরে উক্ত দিল—হুঁ, ঠিক বলেছি।

বাঁকী রাস্তাটা তারা প্রায় চুপচাপ করিয়া চলিয়া আসিল। বুড়ীদেব বুড়ীর সামনে একটা মোটা তৈল-গাছের গায়ে একটি কেশটেলের রঙীন বিজ্ঞাপন কাহারো জীটিয়া দিয়া গিয়াছে। বিজ্ঞাপনটিতে বড় বড় অক্ষরে লেখা—“হরতি পুষ্পের কেশটেল” বুড়ী সেমিকে চাইয়া ঘনকিয়া ষাটাইল এবং বিজ্ঞাপনটি মনে মনে গড়িতে গড়িতে হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল।

শিশির বুড়ীর দল্লির অস্বমনে বিজ্ঞাপনটার দিকে চাইয়া তারপর একটু বিস্মিতভাবে বলিল—হাসিচ্ছে কেন বুড়ী?

বুড়ী হাত উঁচু করিয়া তরুণী নিদর্শে বিজ্ঞাপনটি দেখাইয়া বলিল—ওটা কা'র নাম নতুন তো?

শিশির আবার বিজ্ঞাপনটির উপরে চোব ব্লাইয়া লইয়া বলিল—“হরতি পুষ্পের কেশটেল” আবার কা'র নাম? জানিনে।

বুড়ী হাসিয়া ষাটাইয়া পড়িল।
—দূর “হরতি পুষ্পের কেশটেল” কা'র কি নাম হতে পারে? ওর মধ্যে একটা কথা হচ্ছে একজনের নাম।

শিশির সর্কাতুক বলিল—“একজন” সে কে আগে বলো, তা'হলে ঠিক বল দেব তার নাম কি।

বুড়ী হাসিতে হাসিতে নিজের বক্ষে অঙ্গুলি ঠেকাইয়া ইস্তারা মাথা মাড়িয়া নিজেতে দেখাইল।

শিশির বিস্ময়-বিমিশ্রস্বরে বলিয়া উঠিল,—তুমি? তোমার নাম?

বুড়ী হাসিতে হাসিতে মাথাটি তলাইয়া তলাইয়া বলিল—হ্যাঁ। এইবার বুনুন তো কোন কথাটার আমার নাম রয়েছে।—

শিশির বলিল—যাঃ তোমার নাম তো বুড়ী! আমি ও অক্লান্ত বুড়ী তুমি। “বিকশিত-হাস্ত-মার্কী” বলে ব্রাও লাগিয়ে গিলে মল হান। অত কা'র সঙ্গে আর আর বলছেন বা জাল জল্পনাই করতে পারবেন। কেউ।

বুড়ী অসহিষ্ণুভাবে মাথা মাড়িয়া বলিল—পুং, বুড়ী তো আমার ডাক-নাম। আমার ভাল নামটা কি, তাই বুনুন। দেখি! ঠিক একবারেই বলা চাই কিছু। ছাবারে বললে চলেবেন।

শিশির তৈল গাছের গায়ে বড়-বড় অক্ষরে লেখা রঙীন কাগজ খানির দিকে ফলকাল চাইয়া থাকিয়া, গুটিকিতে একটুখানি ভাবিয়া লইয়া বলিল—বলবো? ঠিক বলবো বুড়ী?—তোমার ভাল নাম “তৈলবাগা”।

বুড়ী কলহাতে হতাশালি দিয়া আনন্দোচ্ছ্বাসিতকণ্ঠে চোকাইয়া উঠিল—হ'লনা—হ'লনা—পারলেন না বলতে,—তুমি হেরে গেলেন।

শিশির কপট আশ্চর্য হইয়া বলিল—কেন? আমি তো ঠিকই বলেছি। তোমার দিদির নাম যখন শৈলবাগা—তখন তোমার নাম নিশ্চয়ই তৈলবাগা। এ'না হয়ে পারে না।

বুড়ী তাড়াহাড়ি বাধা দিয়া বলিল—আজ্ঞে না দশাই! আমার নাম পুষ্পবাগা। পুষ্প—পুষ্প—বুঝলেন? “হরতি পুষ্পের কেশটেল” এটা পড়েও আপনি দরতে পারলেন না বুঝি, কী আমার নাম? সত্যি, কী বোকা আপনি!!

শিশির গম্ভীরমুখে বলিল—ওহ! তাই বলা! আমি তপসি, কী না জানি কি মতনতরো নাম বুঝি কিছু হবে! পু—পু, ওতো আমার জানাই। এ'আর নতুন কথা কি?—

বুড়ী অবিশ্বাসে মুখে বাঁকাইয়া বলিল—ঈশ্ব! তা'ই বলে বলতে পারলেন না কেন?

শিশির বলিল—আরে, আমি ভেবেছি বুঝি তোমার নতুন গোয়াকী নাম আরও কিছু আছে। “পুষ্প” যে তোমার নাম, এটা আমি যদি না জানবো তো জানবে কে? আমি ভিন্ন পুষ্প যে হতেই পারে না!

বুড়ী কপাল ক্লিষ্ট করিয়া ক্রী বাঁকাইয়া বলিল—তার মানে?—

শিশির নিতান্ত নিরীহ-হৃদয়ে বলিল—আরে!

এটাও বুঝি জানো না?—সাধে কি আর “মেঘমাছ” বলি?—কেন? তোমাদের পড়ার বইতে পড়ে নি বুঝি?—

শিশির বিদে কছু কি কাননে

পুষ্প কোটে?—

শিশির না হলে পুষ্প ফুটতেই পারে না, বুঝলে? বইয়েতে লেখা আছে।

বুড়ী এবার হঠাৎ অপরিমীম লজ্জার রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। শিশিরের দিকে মুহূর্তেক লাঞ্ছনক নৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—যান! তারা হয়ে আপনি।

তারপর কিপ্রচলন পড়ে ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। শিশির স্বদমনক তার হরিণীমূলত গতির দিকে তরুণতবে তাকাইয়া রহিল।

—ক্রমশঃ



দাস্তুর স্বপ্ন

—শিল্পী—প্রাথের দৃষ্টি



সপ্তম বর্ষ

ভাদ্র, ১৩৩৯

তৃতীয় সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথের গান

[গ্রামহীন, গীত-নালিকা, কেকতকী, শোফালি ও বসন্ত অবলম্বনে লিখিত]

কাজী আবদুল ওজুদ

রবীন্দ্রনাথের স্বর-স্বষ্টিতে মৌলিকতা অনেকখানি। কিন্তু সেই স্বর বাণ দিয়ে কবিতা-হিসাবেও তাঁর গানগুলো পড়া যেতে পারে, আর পড়ে বে-আনন্দ পাওয়া যায় তার স্বাদ বেশ নূতন রকমের। এগুলো যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা এ-সংক্ষেপে ভুল হবার-সম্ভাবনা অবশ্য নেই, তবু রবীন্দ্রনাথের অস্বাভাবিক কবিতার সঙ্গে, এমন কি গীতাঞ্জলি, গীতিমালা ও গীতানির কবিতার সঙ্গে তুলনায়ও এ-সবের পার্থক্য চোখে পড়তে দেবী হয় না।

গীতাঞ্জলি, গীতিমালা প্রভৃতির কবি তাঁর গভীর আত্মিক অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে বিচার-পরায়ণও বটেন। কোনো বিশেষ মতবাদে পৌছা অবশ্য কখনো তাঁর কামা হয়ে ওঠে নাই তবু নিজে যখন জীবনের পথে সত্যাকার চলা চলাতে চাচ্ছেন তখন তাঁর চার পাশের লোকের চিন্তা ভাবনার সঙ্গে তাঁর পার্থক্যটি সহজেই যে তাঁর ভাবনার বিষয় হবে এ স্বাভাবিক। এই গানগুলোর ভিতরে গেই বিচার-বিশ্লেষণের ভাব নাই রয়েই চলে। তাঁর নিজের বিশেষ একটি ভাব-মুহূর্ত, কল্পিত বিশেষ একটি রূপ, এই সবই আশ্রয় বাঁধা

হাতে একে একে তিনি চলেছেন। বাংলা ভাষা এক অদ্ভুত গৌন্দ্যা-মাথা সজ্জিত-প্রাণ ভাষা হয়ে উঠেছে তাঁর হাতে।

তাঁর এই সব গানের সম্পর্কে বাংলার বাউল সঙ্গীতের কথা অগ্রণ করা যেতে পারে। কিন্তু অবদান-প্রিয় বাড়িঘরে কেমন-একটি বিশেষ রৌক এক স্থপতি তত্ত্বের পানে। এই সব গানের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নিতান্তই অ-রূপের রূপের শিল্পী।—

পর্যাপ আমার বাঁধ হারায়
নিশীথ রাতের তায় আমার
আকাশ আমার কর কী যে কঁদ কেঁদা জানে।

অথবা—

নিশাংগার রাতের এ গান বাঁধ আমি কেমন হয়ে ?
কোন রজনীগন্ধা হতে আনন্দ সে তান কর্তে সুরে ?

সুখের কাঙাল আমার বাণা—

ছায়ার কাঙাল মৌল যথা—

সাঁধ নকালে যখন পথে উদাস হয়ে বেড়ায় সুরে।

এই সব গানের রচয়িতা যে ভক্ত বা সত্যাবোধী নন তা নয়, কিন্তু বিশেষ ভাবে তিনি শিল্পী; তাঁর ভক্তের অন্তশলশ ও রত্নীন দ্বারা তীক্ষ্ণ সত্যভীর এই সব তাঁকে সাহায্য করেছে এই অর্জুত শিল্প-চাতুর্য্য লাভে।

এই সব গানের সব চাইতে বড় সংগ্রহ প্রবাহিনীতে গান-মূল্যে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে—গীতগান, প্রত্যাশা, পূজা, অবসান, বিবিধ ও পঙ্ক-চক্র। কিন্তু এই ধরণের বিভাগের চাইতে রচনার ক্রম-অনুসারে সাজালেই হয়ত পাঠকদের বেশী উপকার হতো। স্বন্দ্র অতি স্বন্দ্র—ভাবের খেলা, বাস্তব-প্রতিবাদ, এ সব গানে এত বেশী যে তারই অল্প কোনো ধরণের প্রবী-বিভাগ বার্থ হওয়াই স্বাভাবিক।

‘প্রত্যাশা’ বিভাগ থেকে একটি গান নেওয়া যাক—

আমি আসব না মোর বাতায়নে অধীশ আমি।
আমি তখন বসে আঁধার-ভরা পতীর ঘাণী।
আমার এ-বেশ মন মিলিয়ে যাক নিশিখ রাতে,
আমার মুকিয়ে যেটা এই রূপের পুষ্পপাতে
খানকা ঢাকা মোর কৈন্যার গন্ধমানি।

আমার সকল ক্ষম উদ্যোগ হবে তারার মাঝে
যেখানে ওই আঁধার বীণার আলো বাজে।
আমার সকল বিনের পথখোলা এই হল সারা
এখন দিগ্বিকিরের শেষে এসে, দিশাহারা
দিশের আশায় বসে আছে অন্ধর মানি।

এতে শেষের চরণে প্রত্যাশার কথা আছে বটে; কিন্তু এই কবিতার রস হয়ত প্রত্যাশারই রস নয়? কবির এই-বে সব কথা—

আমার এ-বেশ মন মিলিয়ে যাক নিশিখ-রাতে
আমার মুকিয়ে যেটা এই রূপের পুষ্পপাতে
খানকা ঢাকা মোর কৈন্যার গন্ধ মানি

অথবা

আমার সকল ক্ষম উদ্যোগ হবে তারার মাঝে
যেখানে ওই আঁধার বীণার আলো বাজে

এ-সব প্রত্যাশার চাইতে কেমন-এক অ-প্রত্যাশার সৌন্দর্য্য, উপভোগ্যই আমাদের বেশী করে চোখে পড়ে।

‘প্রত্যাশা’ বিভাগের ‘অল্প একটি কবিতা থেকে এক কথাটি আবার ভালো করে বোঝা যাবে।—

কেন যে মন ভোলো আমার মন জানে না।
তারে মানা করে কে আমার মন মানে না।
সেই থেকে না তার
সে যে যেখানে না আপনাকে।
সময়ী কখনা বিয়ে যায়, সে ত কানে আনে না।
তার খেলা খেলা পারে
সে যে হইল নবীর খারে।
কাল করে সব সারা
এগিয়ে গেল কাল
আমি মন-মন সে-বিক পানে চুপ্তি হানে না।

‘অ-প্রত্যাশা’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর, প্রতি-শব্দরূপে ‘অল্প একটি শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে—নিঃসঙ্গতা। কিন্তু এই চরয়েরই ভক্ত একটু খানি ভূমিকার হয়ত প্রয়োজন।

আমাদের প্রত্যেককেই মনের হয়ত এই দুইটি দিক আছে; একদিকে আমাদের মনের সঙ্গে যুক্ত—সেখানে ভাল মনের লড়াই, সজয় ক্ষয়, তৃপ্তি অতৃপ্তি, এ সবার আর ‘অল্প নেই’, আর একদিকে আমাদের নিত্যন্ত নিঃসঙ্গ—সেখানে শুধু নিঃসঙ্গ আকাশ আমাদের বন্ধ, আর কেউই নয়। সাধারণ মানুষ এই নিঃসঙ্গতা বা নিঃসীমতা স্পন্দন-এক ভাবের চক্রে দেখেন, কিন্তু প্রতিভাবান এতে ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে কেমন-এক গোপন পুলকও অহুভব করেন।

এই নিঃসঙ্গতা বা নিঃসীমতার রস রবীন্দ্রনাথের ‘অজ্ঞাত কবিতায়ও কিছু কিছু আছে। কিন্তু তা যেন এক সহজ মহিমা লাভ করেছে এই সব গানে। এমন কি নিঃসঙ্গতাই এই গানের প্রধান রস, বলা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের এক সম্বন্ধের পরমপ্রিয় দরাসী ভাবুক এমিলেল (Amiel) নিঃসঙ্গতা-রসিক। তিনি সময় সময় হচ্ছেছেন নিঃসঙ্গতার রসে একেবারে বীণ। তাঁর গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় Mrs. Humphry Ward তাঁর এই মানসিক লক্ষণের নাম দিয়েছেন intoxication of the infinite. রবীন্দ্রনাথ নিঃসঙ্গতার প্রেমিক।

কিন্তু এর ভিতরে বৃন্দ হয়ে যাওয়া, এটি তাঁতে হয় নাই। বৃন্দ হয়ে যাবার ভক্ত কেমন-এক আগ্রহ সময় সময়, তাঁর ভিতরে জেগেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর ব্যক্তিত্বের রস তাঁর ভক্ত মধুর হয়ে গেছে। ‘অনন্ত’-সমুদ্রের কুলে হাওয়া খাওয়া তাঁর পুর হয়েছে, সময় সময় তাতে বাঁপিয়ে পড়বার হুসাহসও তাঁতে চেগেছে, কিন্তু একটুখানি সীতার দিয়ে আবার কুলে উঠে সে-সমুদ্রের পানে তিনি চেয়ে দেখেছেন।

‘অনন্ত’-সমুদ্রের ‘আমিষ’-কমলের এমনি এক পরম নিগূঢ় রূপ আর একজন কবির ভিতরে দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে—তিনি ‘ইয়োয়োগের কবিসুপ্তক’ গোটে। বশেছি, নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথের এইসব গানের প্রধান রস। এ কথাটি অল্পভাবেরও বলা যেতে পারে। একটি গান-ওওয়া যাক—

তোমার হৃদের দ্বার করে খোয়ার ত্রি পরি
সেবে কিণো বাসা আমার একটি দ্বার।
আমি ভবব ক্ষমি কানে,
আমি ভবব ক্ষমি কানে,
সেই আনিত ভিবিয়ায় তাঁর বীণের বাজে মারে।

আমার নীরব বোনেই তোমারি হৃদে হৃদে
ফুলের ভিতর দ্বার মতো উঠবে পুর।
আমার বিন হৃদাবে হবে
বৃন্দারি আঁধার হবে
ফুলে মোর গানের তারা উঠবে ফুটে সারে সারে।

এখানে কবি আর তাঁর প্রেম্যাম্পদের কথা আছে বটে কিন্তু এই কবিতার শেষের কাঁট চরণের যে আবেশন

(আমার নীরব বোনেই তোমারি হৃদে হৃদে
ফুলের ভিতর দ্বার মতো উঠবে পুর।
আমার বিন হৃদাবে হবে
বৃন্দারি আঁধার হবে
ফুলে মোর গানের তারা উঠবে ফুটে সারে সারে)

—আর এই কাঁট চরণেই হয়ত এই কবিতার বিশেষ সৌন্দর্য্য ফুটেছে—সেটি হৃদয় সিংসঙ্গতারই আবেশন। মিলন, মিলনের আশা, এ সব যে কবির অবস্থিত তা বলব না, কিন্তু শুধু নিঃসঙ্গতাই মাধুর্য্য তাঁর ভক্ত কন্য নয়।

এই ধরণের আরো কয়েকটি গানের উল্লেখ করা যেতে পারে—

ফুল থেকে মোর গানের তরী বিলম্ব ফুলে—
মাগর মাগে ভাসিয়ে বিশেষ পাখি তুলে।
যেখানে ওই কোকিল ফুলে ছাড়াওয়ে—
সেখানে নয়।

যেখানে ওই শ্রাবের বধু আসে জলে
সেখানে নয়।
যেখানে নীল মরব-নীলা উইছে ফুলে
সেখানে মোর গানের তরী বিলম্ব ফুলে।

এবার বীণা তোমার আমার আমার একা।
অন্ধকারে নাইবা করে গেল তেমা।
ফুলেরে শাখা হতে যে ফুল তোলে
সে ফুল এ নয়।

বাতাসের পাতা হতে যে ফুল সেলে
সে ফুল এ নয়।
দিশাহারা আকাশ-তরা হৃদের কুলে
সেইদিক মোর গানের তরী বিলম্ব ফুলে।

পানী আমার নীচের পানী অধীর হলো কেন জানি।
সে কি পোবে আকাশ কোলে ভোরের আলোর কানায়নি।
জল উঠেছে সেবে সেবে
অপার পানী উঠল জেলে
লাগল তারে উদাসী ঐ নীল পল্লবের পরশপানি।
আমার নীচের পানী এখার ওখার হলো আকাশ মাঝে।
যাচনি করো সন্ধান সে, যাচনি যে সে কোনো কারে।

গানের গুণা উঠল হৃদে
চায় দিতে তাই উদ্যত করে
নীচের গানের সাগর মাঝে আপন আশের সকল বাণী।

সেখের কালো বাঁচুরে ঢেকে বকর পাঁচি।
ওরা যথেষ্ট মোর মনের কথা বার বৃষ্টি ই গাঁথি গাঁথি।
হৃদয়ের বীণার পর
কে ওদের ক্ষম হবে,

ছরাপার ছরাপের উদাস করে—
সে কোন উদার হাওয়ার পাগলামিত্তি পানী ওদের ওড়ে মারে।

ওদের গুল ফুটেছে তর টুটেছে একেবারে
অলক্ষ্যেতে লক্ষ্য ওদের—শিখন পানে তাকার মারে।

যে বাসা ছিল জানা
সে গুহর ছিল জানা,

না-জানার পথে গুহর মাইরে মানা;
একটি দিনের শেষে দেখেছে কোন্ মনোহরণ আঁধার রাত্রি।

গমন রাত্রে শ্রাবণ ধারা পড়িয়ে করে
কেন গো মিছে জাগাবে গুহর?
এখনো তুটি আঁধার কোণে ঘায়ের দেখা
জলের বেলা,

না-জনা বর্ণি রহছে কেন অধর করে।

না হয় যেহে গুহরির ধীরার তারে

মনের কথা শুন-ধারে।

না হয় যেহে মালতী-কলি শিখিল কোণে
নীরবে বেলে,

না হয় রাধা পথের বেলায় ফুলের ডোরে

কেন গো মিছে জাগাবে গুহর?

এ সব কবিতা সম্পর্কে কেউ যদি বলেন এ সব বিরহের
প্রকাশ বড় মধুর হয়েছে, তাহলে সে-কথার প্রতিবাদ না
করে' শুধু এই কথাটি বলুন—এ সব কবিতার বাক্যবহুরই যে
এক গুর মধুর আশ্রয় আছে তার পানে চোখ না রাখলে
কবিতাগুলোর প্রতি অবিচার করা হবে।

২

কিন্তু কবোঁর রস-আশ্রয়নে কোনো হৃদয়ের সাহায্য
একান্ত ভাবে গ্রহণ করা বিড়ম্বনা বৈ আর কি। অতএব
'নিসঙ্গতা' 'বিরহ' ইত্যাদি কথা থাকুক।

অস্বস্ত বহুতাবের কবিতাও প্রাথমিক, গীতমালাকা প্রভৃতি
এই স্থান পেয়েছে। যেমন—থ্রেদের কবিতা—

অগকে কুণ্ডল তা বিজো
তবু শিখিল কবনী ব্যিহো।

কালানবচিন সজল মনে

কলর-দুঃখোথা বিজো।

আনন্দ আঁচলে পদিক চরণে

মহাশয়ের কাঁধ ধারিহো।

না করিহা বার মনে বাসে বাসে

নিরাধা নীরবে পাণ্ডিহো।

এস এস বিনা দুঃখবৈ
দোষ সেই তাহে দোষ নেই।

যে আসে আনন্দক ই তব রূপ
অনন্দ—হাসে ছাঁদিয়ে

তবু হাসিখানি অধিকোণে হাসি
উত্তরা দলর ধারিহো।

অথবা

নিশি না পোহাতে জীবন-শ্রীপা আলাইয়া যাও সিয়া
তোমার অনল দিয়া।

কবে যাবে তুমি সংসার পথে দীপ্ত শিখাটি বাহি,
আছি তাই পথ চাহি।

পড়িয়ে বলিয়া রুয়েছে আশার আদার নীরব হিয়া
আশা আঁধার নিরা।

নিশি না পোহাতে জীবন-শ্রীপা আলাইয়া যাও সিয়া।

কিন্তু এই সব গানের প্রিয়তার আর সুকী-কবিরের মা'তক
(beloved) হয়ত একই দেশের মোহিনী।

প্রাথমিকের একটি কবিতায় প্রকাশ-ভঙ্গির সৌন্দর্য
অত্যন্ত। চিন্তাবাদী স্থপরিচিত, কিন্তু নূতন প্রকাশ-
ভঙ্গিমার ভঙ্গ এ কত নূতন!—

মাটির
বুকোর মাঝে বন্ধি যে জল নিগিয়ে থাকে
মাটি পানো তাকে।

কবে কাটিয়ে ধান পালিয়ে যখন যায় সে মূত্র,
আকাশ পুরে,
তখন
কাজল মেঘের সজল ছায়া ফুলে থাকে
মাটি পানো তাকে।

পেনে বসে তাকে বাজার বাগা বলি আলাচ,
কথা তারে দিগ্‌বিদিক কাটিয়ে ঢোলাচ।

তখন
কাছের দন যে দুঃখ থেকে কাঁদে আসে
বুকুর পানে

তখন
চোখের জলে নাসে যে যে চোখের জলের ডাকে
মাটি পায় তে থাকে।

এই গানগুলোতে কিন্তু একটি বিশেষ লক্ষ্যযোগ্য ব্যাপার
এই যে যে-মাটির প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ এত বেশী একান্তভাবে
সেই মাটির মহিমা-সংক্ষেপে গান তাঁর গুব কমন। "এইত ভাল
সেগেছিল আশোর নীচন পাতায় পাতায়" অথবা "যেদিন
পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে" প্রভৃতি মাটির
মহিমাজ্ঞাপক কয়েকটি হৃদয় কবিতা এই সব সংগ্রহে

আছে, কিন্তু তাঁর সংখ্যা খুব কম। কেউ কেউ বলতে
পারেন, ক্ষুদ্র-সংখ্যে তাঁর যে অজস্র গান সে-সবত মাটিরই
মহিমার গান। কিন্তু বাস্তবিক হয়ত তা নয়। ক্ষুদ্র বৃত্ত
সমারোহ সে মাটিরই সমারোহ একথা কবি ভাল করেই
জানেন, তিনি নিজের বসে 'আজেনে মাটিরই উপরে, কিন্তু
এই সমারোহ তাঁর চোখে সার্থক হয়েছে কোন্ হৃদয় থেকে
আগা আলোর ধারায় আর সেই হৃদয়ের প্রতি তাঁর দৃষ্টি
প্রায় নির্ণয়ময়।

প্রাথমিকের 'পূজা' বিভাগের কবিতাগুলোর চাইতে গীতি-
মাণ্ডের অনেক কবিতা আমাদের ভাল লাগে বেশী, পূজার
ভাষি সেখানে যেন আরো নিবিড়, তবু এ বিভাগেও কয়েকটি
ভারি হৃদয় কবিতা আছে।

তোমার কিছু বেলায় বলি চার যে আমার মন
নাহি তোমার থাকল প্রয়োজন।

যখন তোমার পেলায় বেলা

অন্ধকারে একা একা

ফিরেছোলে বিজন গভীর বন—

ইচ্ছা ছিল একটী ব্যক্তি আলাই তোমার পথে

নাহি রত্নাবার থাকল প্রয়োজন।

বেয়েছিলে হাটের সোকে তোমারে দেব গালি,
দেখে তোমার জড়ায় স্থালালি।

অগমনের পথের মাঝে
তোমার গীণা নিভা বাজে

আশা হুয়ে আপনি নিবন।

ইচ্ছা ছিল বরণমালা পরাই তোমার পালে

নাহি তোমার থাকল প্রয়োজন।

বলে বলে আসে তোকে রূঢ়ে তোমার পুর
নানা ভাবার নানান করলব।

ভিক্ষা মাগি তোমার ঘারে
আমাত কঠোর ঘারে ঘারে

কত যে শাপ কত যে স্পন্দন।

ইচ্ছা ছিল নিগোপে আপনাকে দিই গারে

নাহি বা তোমার থাকল প্রয়োজন।

তোমার ঘারে কেন আসি
তুলেই যে বাই—

কতই চাই

দিনের শেষে ঘরে এসে লাগা যে পাই।

সে সব চাওয়া হুয়ে লুপে

হেসে বেড়ায় কেন্দ্র মূখে,

গভীর হুক

যে চাওয়াই পোদন তাহার কথা যে নাই।

যাদনা সব বাঁধন যেন কুড়ির গারে

কেটে যাবে গুহর যাবে দলিন বায়ে।

একটি চাওয়া ভিতর হতে

ফুটেবে তোমার হোরে আলোতে—

আশের বেগে

অন্তরে সেই গভীর আশা যবে বেড়াই।

এই সব গানের অল্প কয়েকটিতে তত্ত-চিন্তা সম্পন্ন, কিন্তু
সেগুলোর আলোচনা এই সম্পর্কে না হওয়াই ভাল। মোটের
উপর এই সব গান নিতান্তই কলিকার গান—এক একটি
আদি—অন্ত—বিবজ্জিত মুহূর্ত রূপে রসে পরমশয়ের মতো
চিকমিক করে উঠে কোন্ অন্তরে গিয়ে জমেছে। কবির সেই
সব বিচিত্র আঁশ-মুহূর্তের বিস্তারিত আলোচনা এক অসম্ভব
ব্যাপার। হয়ত তা 'অগ্রয়োজনীয়ও কেননা সে সবার একান্ত
প্রতীক্ষা রসিক পাঠকের অত্যন্ত রসবোধের। মাত্র ছোট
কবিতা উদ্ধৃত হচ্ছে, যথাক্রমে তার নাম দেওয়া যেতে পারে
'অবসান' ও 'সন্ধ্যানীপ'—

কোথা হতে অন্তরে যেন পাই

'আকাশে আকাশে বলে, বাই।

পাতার পাতার ঘাসে ঘাসে

জেনে গুটী গভীরাসে

হাট-পাশে নাই তার নাই।

কত দিনের কত কথা

হাওয়ার জড়ায় বাহুল্য।

চলে যাওয়ার পথ যেদিক

সেদিক পানে অনির্ঘোষে

আজ কিংবা চাই কিংবা চাই।

আমি সম্মানীপের শিখা

অন্ধকারের লগাটমায়ে পরাধীন।

তার কপন মোর আগের পরশ
মাগিরে মিল গোপন হইব,
মস্তুরে তার হইল আমার
অধর দেখেই মিথ্যে।

আমার নির্জন উৎসবে
অশ্রুতল হৃদয় উঠল গাখীর কলহরব।

খন তরঙ্গ রচির রচর গেলে

নিখিল ভুবন উঠবে মেগে

তখন আমি মিলিরে যাব

কবিক মরীচিকা।

স্বত্ব বর্ণনায় এই ভাব-বৈচিত্র্য খুব স্পষ্ট।

৩

বরীশ্রনাথ বর্ষার কবিরূপে প্রসিদ্ধ। কিন্তু গ্রীষ্ম, শরৎ
ও বৃষ্ণ-বর্ণনায়ও তাঁর কৃতিত্ব অস্বাধার্য।

এই গানগুলোতে স্বত্ব বর্ণনার যে বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে
লক্ষ্য করবার মত সেটি হচ্ছে কবির নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গি ও
বর্ণন-ভঙ্গি। স্বত্বের সহজ সরল বর্ণনা এসব আগে নয়।
তাঁর এই নূতন মনের উপর স্বত্বের বিভিন্ন রূপের ছায়াপাত,
প্রভাব, কেন্দ্র হয়েছে এসব তারই বর্ণনা মুখ্যতঃ অথচ
স্বত্বের বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন ভাবও সূটেছে স্বন্দর। নিম্নাং
সম্পর্কে ছুটি কবিতা নেওয়া যাক—

যে তাপস, তব শুধু কঠোর রমের গভীর রসে
মন আঁধি মোর উষ্মা বিস্তার কেন্দ্র সে ভাঙের বশে।

তব শিশল জটা

হানিকে দীপ জটা,

তব দৃষ্টির বালিস্তি অতুল-নিরে পনে।

নৃশি না কিংবা না জানি

মর্মে আমার কোন তোমার কি বলে ক্রম বর্ণা।

রিপ-বিগত দহি

ভ্রাস্থঃ তাপ দহি

তব নিবাস আমার ককে রহি তব নিবাসে।

সাতা হতে এল তব

সম্মানসেবার মায়ার মন্দির নিগোষে হবে লীন।

দীপ্তি তোমার তলে
শায় হইয়া যবে
তারায় তারায় নীরব মস্তুরে ভরি দিবে শূন্য সে।

নাই রস নাই, লাক্ষণ দাহন যেনো।

খেল খেল তব নীরব উত্তর যেনো।

খরি করে পড়ে গড়, ক পাঠা

রান হতে যাক মালা পাঁখা

ধাক কানহীন পথে পথে মরীচিকা-জাল যেনো।

স্বত্ব জ্বালা খসে-পড়া ফুলবলে

স্বাী আঁচল উড়াও আকাশ তলে।

প্রাণ যদি কর মকসম

তবে তাই হোক, হে নির্দম,

তুমি একা আর আমি একা কঠোর মিলন যেনো।

নিদ্রাঘোর "দারশন দাহন যেনো" ছুটিতেই সূটেছে

কিন্তু নূতন বর্ণনভঙ্গির সঙ্গে শৈব্যাক্ত কবিতাটি আমাদের
মর্ম্ম স্পর্শ করে যেন দেখী।

স্বত্ব-সম্পর্কিত এই সব গানে ছন্দোগতি খুবই লক্ষণ-
যোগ্য। এই ছন্দোগতিই বিশেষভাবে সাহায্য করেছে
স্বত্বের ভাব-বৈচিত্র্য প্রকাশে।

নিদ্রাঘোর দাহনে ধরণীর অসহায়তার ছবি আমরা
দেখছি, কালবেশাখীর হঠাৎ প্রচুর বর্ণণে তার যে ছবি
তা সূটেছে অল্প একটি গানে—

শুধু সাগরের গার হতে এল কেন্দ্র পরবাসী

মস্তুরে বাজার ঘন ঘন

হাওয়ায় হাওয়ায় মন মন

সাপ খেলোয়ার বান্দী।

সহসা তাই কোথা হতে

কুণ্ড কুণ্ড কলযোগে হতে

দিক দিকে গুলের ধারা ছুটেছে উল্লাসী।

আম দিগন্তে ঘন ঘন গভীর গুণ্ড গুণ্ড

ডমক রব হয়েছে এ হুগ।

তাই শুনে আঁচ গখন তলে।

পলে পলে হলে হলে

অবিবরণ মানদণ্ডিনী ছুটেছে উল্লাসী।

এর পরই বর্ষার বিপুল ও বিভিন্ন আয়োজন।

বর্ষা আরম্ভ হয় নাই শুধু রসপূর্ণ গাছপাশার মাথার
উপর দিয়ে বাতাসের বেগে মেঘ ভেসে বাচ্ছে তার
ছবিটি এই—

আকাশ তলে হলে মেঘ-বে ঢেকে যাব,

আর আমি আর।

কানের ঘন আন্দের ঘন রব উঠেছে তাই

যাই, যাই, যাই।

উড়ে বাওয়ার সাথ কাশে তার পুলক-ভরা ডালে

পাতার পাতার।

নদীর ধারে ধারে ধারে মেঘ-বে ঢেকে যাব

আর আমি আর

কাশের ঘন কণে কণে রব উঠেছে তাই

যাই, যাই, যাই।

মেঘের গানে তরীগুলি তান মিলিয়ে গেলে

পাল-কোলা পাখা।

বর্ষার সূচনা হয়েছে। বর্ণনোপস্থ অত্যন্ত কালো
মেঘ, তার কোলে কোলে বিছাটের চমক—এর এই
মোহন মূর্তি কবি একেছেন—

কীপিয়ে বেহতলা পর পর।

চোখের জলে আঁধি ভর ভর।

বোলল ভগলেরি বদলয়া

তোমাগিরি-নিরসি নিল কাটা,

বালদ নিশীথের স্বর স্বর

তোমার আঁধি পরে ভর ভর।

যে কথা ছিল তব মনে মনে

চমকে অধরের কোণে কোণে।

নীরব হিয়া তব মিল অরি

কী মায়া খপলে যে মরি মরি,

আঁখার কাননের মর মর।

বালদ নিশীথের স্বর স্বর।

এই ছুটি কবিতায় সারাদিন স্বর স্বর বৃষ্টির ছবি আঁকা
হয়েছে অল্প ছুটিতে পার্থক্য যথেষ্ট—

আম আকাশের মনের কথা তব স্বর বাজে

সাতা গ্রহের আমার সুকের মাঝে।

দিগির কালো জলের পরে
মেঘের চাড়া ঘনিবে বুকে,
বাতাস পথে দু'পাখীরের প্রাচীন যেনো যে
সাতা গ্রহের আমার সুকের মাঝে।

আমার বাহারে

একসা আমার কানাকানি ঐ আকাশের সঙ্গে।

রান পুতির শাখি বত—

পল্লব মর্দং-এর মত

সজল হুরে ওঠে মেঘে ক্রিসম্বন্ধর নীচে

সাতা গ্রহের আমার সুকের মাঝে।

বালদ-বালদ বাজারের একতারা

সাতা বোলা পরে স্বরস্বরস্বর সাতা

কানের ঘন ঘনের মেঘে

আপন তানে আপনি তানে

নেচে নেচে হল সাতা।

ঘন জটার খটা ঘনর আঁখার আকাশ বলে,

পাতার পাতার টিপে টিপে নুশে মধুর বায়ে

ঘর-ভাড়া-না আনুল ঘরে

উল্লাস হয়ে কোঁচর তব

পুলে হাওয়া সুহাওয়া।

'কেতকী'র কয়েকটি গানে কবির প্রবল রূপ প্রকাশ
পেয়েছে—যেমন—

আঁখার লাগ্ন হয়ে এলে দিগে,

মেঘ-বাললে নিলে ঘিরে।

গুণ্য হাওয়া, হাওয়া তার,

আঁখার পথ ধর যে হাওয়া,

চেই নিজেই নদীর নদীর।

সকল আকাশ, সকল ঘর

কবীরে শাখি ভরা।

স্বর স্বর বাজার মতি

বাজে আমার আঁখা-জাতি,

বাজে আমার শিরে শিরে।

অম্বা

আম নাহি নাহি নিশা-খনি পাতে।

তোমার ভবন তলে, হেরি স্রোণি বলে,

দূরে বাহিরে ভিমিরে আমি লাগি মোড়োহাতে।

অম্বন কানিছে পথচারী পথনে
রজনী মুখ্য পথস্থানিছাৎ পথনে।
হার খোঁসো হে হার খোঁসো।
শ্রুত করে দয়া বৈধে খোঁসো হারখোঁসো।

কিন্তু সাধারণতঃ তাঁর এই সব গানের আবেগনে
কোনো প্রবলতা নেই। সেই প্রবলতার অভাবই এ
মবের এক বিশেষ সৌন্দর্য—যেন নিস্তরঙ্গ জলে একরাশি
কুমুদ!

অপর একটি কবিতায় বর্ষার জুহুযোগ প্রদর্শন এ সবার
ছবি আঁকা হয়েছে সুন্দর, কিন্তু তার আবেগনে কোনো
প্রবলতা নেই বরং উল্টে—

শর শর বরষে বাহিরা
হয় পথচারী, হার খতিয়ান, হার পথচারী।
কিরে বাহু হাওয়াখরে, ডাকে কারে
জননী জননী শ্রান্তরে,
রজনী আঁখার।

অবীরা কখন তরল-আকুমা তে, তিমির-কুসুমারে।
নিখিড়ী মীর যখন শর শর বরষে সন্ধ্যা,
চকমা চকমা চমকে নাহি শনিহার।

দীর্ঘ বর্ষাব্যাপনের পর শরৎ-বর্ষার প্রসঙ্গ নয়ন-উদ্দীপকনের
ছবিটি বড় মনোরম—

এবার অবগুষ্ঠন খোঁসো খোঁসো।
গহন মেঘমাগার বিহীন বনছায়ায়
তোমার আঙ্গনে অবগুষ্ঠন সাধা হোলে।

শিউলি হুড়কি রাতে
বিবশিত কোঁচগায়ে
হু হু মর্দর গানে তব মস্তকের বাঁধি খোঁসো।

বিধার অঙ্গরাজে—
মিলুত নয়ন হারি
মাগলী বিতান তলে
বালুক বীরু বীদি।

শিশির নিক্র বায়ে
বিজড়িত আলো ছায়ে
বিরহ ফিলানে গাঁথা

নব প্রাণের সোলায় সোলায়।

প্রথম শরতের কালো মেঘ ও উজ্জ্বল সৌর্যের গানটিতে
কবি জীবন-সম্বন্ধেও একটি বড় ও ভাল কথা বলেছেন;
কিন্তু সেসব মনে না এনেও এর রচনামাধুর্যে কত মুগ্ধ
হওয়া যায়—

ফালম শোভন আশ্ব ছাড়া, নাইবা খেলে
সমগ্র বিশ্বেল আলস মেলে।
পূব হাওয়া কহ, "ওর যে সময় গেলে চলে,"
শরৎ বলে, "ভয় কি সময় খেলে বলে,"
দিনাকালে আকাশ মাছে কাটবে বেলা
অসময়ের বেলা খেলে।

কালো মেঘের আর কি আছে বিন
ও যে হলো সাবীহীন।
পূব হাওয়া কহ, "কালের এবার বাওয়াই ভালো,"
শরৎ বলে, "নিগবে হুগল কালের আলো,
সারজে বালম সোনার সাজে আকাশ মাছে
কানিনা ওর দুটরে ফেলে।"

শরতের শিশির ও সৌর্যের ত্রৈধতা 'শরৎ তোমার
অরুণ আলোর অঞ্জলি' শীর্ষক সুপরচিত গানটিতে এক
চমৎস্বরূপ রূপ লাভ করেছে; প্রবাহিনীর গানগুলোতে কিন্তু
শরতের আকাশ বাতাসের চাক্ষুষ, উদ্ভাস ভাব, এসবই
বেদী পরিচ্ছন্ন—সে-উদ্ভাসভাবে যেন কি এক ছাড়া আছে—

তোমরা যা থল তাই বল আমার খোঁসো মনে।
আমার বাত খোঁসো যাও যবে কেমন বিনা কারণে।

এই পাগল হাওয়া
কী গান যাওয়া
ছড়িয়ে গিরে খেল স্নানি শরৎ খপবে।
সে গান আমার মাগলি যে খোঁসো মাগলি মনে,
আমি কিসের মধু দু'জো খেড়াই জমর গুজনে।

ঐ আকাশ ছাওয়া
কাহার চাওয়া
এমন করে লাগে আলি আমার নমনে।

হেমন্ত ও শীতের বর্ণনা—এই সব গানে তেমন নাই।
তার বড় কারণ হয়ত এই যে বাংলা দেশে এ প্রকার 'রূপ'
তা হচ্ছে সূর্যের রূপ—

"আরও মোড়া ফলস কাটি।....."

কিন্তু কবির এই সব গানের বা রূপ তাকে বলা যায়
অপচয়ের রূপ—চকল সৌন্দর্যের সঙ্গে মৃদুত্বের জঙ্গে
চোখেচোখি।

বসন্তের রূপ-বৈচিত্র্য এই সব গানে দৃষ্টিতে বেশ।
পৌষের পাতা-করা শীর্ণ শাখায় বসন্তের যে আগমনী বাজছে
কবির কানে তা প্রতিধ্বনিত হয়েছে এই ভাবে—

সব দিবি কে সব দিবি গার!
আর, আর, আর!

ডাক পড়েছে ঐ শোনা যার
আর আর আর!

আসবে যে সে ধর্মরূপে
আগবি কায়া রিক্তপথে

পৌষ রজনী তাহার আশায়
আর আর আর!

সবক কেমন তাহার খোঁসো!
হায় হায় হায়!

তার পরে তার বাবার বেলা
হায় হায় হায়!

চলে গেলে আখবি ঘরে
খন রতন খোঁসো হারে,

বহন করে হলে যে গার!
হায় হায় হায়!

বসন্তের সন্ধ্যা পাতার গানটি বড় কদম্ব—

পাগনের প্রল হতেই শুকনো পাতা করল যত
তারা আর কেঁদে শুভার
সেই ডালে কল হুইল কিণো?
তুণা কে ও ফুলি কত।

তার কহ, "হঠাৎ হাওয়ায় এসে ভাসি
মধুরের পূর্ব হাসি—হায়,
আগা হাওয়ায় আকুল হয়ে দূরে গেলেন শত শত।"

তার কহ, "আজ কি তবে এসেছে সে
নবীন বেশে?"

আজ কি তবে এতক্ষণে আসল যেন
যে গান ছিল মনে মনে?

সেই পারতা কানে নিয়ে ঘাই চলে এইবারের মত।

বরে-পাড়ার আনন্দ নয় কেমন এক বেদনা-কাতর-তৃষ্ণা
রয়েছে—এই সব পাতার মুখে।

বসন্তের বহু রূপ কবি একেছেন। যেমন কাননের
ডাল পালা ও রজনী ফুলের উৎসবের গান—

সংসা ডাল পালা তেজ উত্তা সে!
(ও চাঁপা ও করবী)

কারে কুই দেখতে-গেলি
আকাশ মাছে
জানিনা যে।

কোন বরের মাতল হাওয়ায় এসে
ঝেড় খেলে,
(ও চাঁপা ও করবী)

কার নাচনের নুপুর বাজে
জানিনা যে।

তারে কখন কখন চমক লাগে।
কেন অজানার খোঁসো তোমার

মনে লাগে?
কেন রঙের মানস উল্লসে

ফুলে ফুলে
কে সাগলে রজনী সাজে

জানিনা যে।

ফাল্গুন পূর্ণিমার গান—

ভালো হাসির বাঁধ।
অবীর হয়ে মাতল কেন
পূর্ণিমার ই চাঁদ।

উত্তল হাওয়ায় কখন-কখনে
মুগুলাছাড়া বহুল ঘনে
বোল দিয়ে যার, পাগল্য পাতার

নতীর পরমা।

দূরের আঁচল আকুল হ'ল
কি উল্লাসের ডরে।

গগন যত ছড়িয়ে গ'ল
নিক নিপলয়ে।

আজ রাতের এই পাখাঘাসিত
বাঁধলে বলে কে ও কিতরে,

শাস বাঁধিকার ছাড়া কেঁদে
তাই পোহরে ফিরে।

বসন্তের এই সমাগোহের ভিতরে যেটো ফুলটির কথা
কবি ভোলেন নি—

আমি পদমি বাতাসে
মান-না-মান কোন্ কনকল
ফুলি বনের ঘাসে
ও মোর পদের সাথী পদে পদে
গোপনে ঘাই আসে।

কুকড়ার ছুড়ার সাথে,
বহুল তোমার মালার মাকে,
শিখি তোমার ভবনে সাজি
ফুটেছে সেই আশে
এ মোর পদের বাঁশির গুরে গুরে
কুকিতে কাঁদে হাসে।

ওরে দেখ বা নাই দেখ, ওরে
যাও বা না যাও তুলে।
ওরে নাইবা দিলে দোলা, ওরে
নাই বা নিলে তুলে।
সভার তোমার ও কেহ নহ,
ওর সাথে সেই ঘরের প্রদর
গাওয়া আসার আভাস নিয়ে
রয়েছে এক পাশে।
ওগো ওর সাথে মোর প্রাণের কথা
নিশাসে নিশাসে।

অশ্রুস্রাবী বসন্তের বিদায়ের রূপটি কবি একেছেন
এইভাবে—

না তোমারা যেনা নাকো।
মিলন শিখারী মোরা
কণী সাথে কথা রাখে।

আমো বহুল আসা হারা, হারয়ে—
ফুল ফোটারো হারনি সারা,
সাজি ভয়েনি,
পৃথিবী ওগো থাকো থাকো।
চাঁদের চোখে জাগে দেখা
হারে জাগো গানে গল্প দেখা।
কেন তেরে কোন্ কখনার, হারয়ে—
মরিকা ওই দায় চলে যায়
অভিমানিনী!
পথিক তারে ডাকো ডাকো।

এমন কিত মুহূর্ত অপরূপ হয়ে আছে এই সব গানের
ভিতরে! রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের দান দেশের কাব্য-
রসিকরা শ্রদ্ধাভূত আনন্দে গ্রহণ করেছেন। তাঁর বান্ধিক্যের
‘নিরাসক্ত যৌবন’র এই দানও কালে কাব্য-হিসাবে পরম
আদরে গৃহীত হবে সন্দেহ নাই। এই সব গানের পদগুলো
যেন সৌন্দর্য ও আনন্দের অদূরস্ত উৎস।
আর একটি গান উদ্ধৃত করব। যে নিঃসঙ্গতা-প্রীতি
এই সব গানের প্রধান স্বরভেদে ছি ‘তা হরত তেমন নাই
এই গানটিতে। তা না থাকুক। কবি স্থির হয়ে এক অপরূপ
সৌন্দর্য দেখছেন, আমাদের সাক্ষরই জগৎ এ-বেশা সার্থক
হোক—

আমার মন ঢেরে রয় মনে মনে ফেরে মাগুরী।
মনর আবার কণাল হতে সরনা মুরী।
ভেত্রে ভেত্রে মুকুর মাপে গুজরিল একতারা যে,
মনেরথের পদে পদে বাজল বাস্তরী।
ফুলহারি কোন্ হসের সরসারের
মূলহারি কুল ভাসে জলের পরে।
হারের ধরা ধরুত গেলে, ঢেউ দিয়ে তার দিই যে ঢেলে,
আপন মনে স্থির হয়ে রই করিলে চুরি।
ধরা বেগুনার ধন সে ত নয় অপর মাগুরী।

ভাবলোকে মেটারলিক্স

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

মেটারলিক্স যে প্রথম যুগেই প্লোটিনাস, কনিস্ত্রোক,
নোভালিস, এমারগন, কাশাইল প্রভৃতির শিখর গ্রাণ
করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার
নাটক আবার আমাদের নিকট এই কথাটিই প্রমাণ
করিয়াছে যে মিটিকগণের অহভব জগৎ মেটারলিক্সের
ভিত্তিক লুপ্ত এবং আত্মপ্রকরণে তিনি সে-জগতে প্রবেশ
করিতে পারিতেছিলেন না। মিটিক সাধকগণের নিকট
বাহা বসন্তসিদ্ধের মতই ছিল, ইনি তাহার জন্ত শুধু
হাতড়াইতেছিলেন। তাঁহার অহভবাত্মা অচলায়তনের
পঞ্চক্লের মত কেবলই যেন কাঁদিয়া গাহিতেছিল—

আবার বাঁশ দাও গো চুটে।
আবার বাঁশে বাঁধে আঁচি
আমার লও কেটে লও হুটে।

কনিস্ত্রোকের ভূমিকায়াই তিনি মিটিকদের লক্ষ্য করিয়া
বলিয়াছিলেন যে নিক্তিত সত্তার সন্ধান ইহাদের নিকটই
শুধু পাওয়া যায়। ইহা হইতেই ‘মিটিকদের প্রতি ইহার
অগাধ বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। ‘মিটিক শব্দটি বাস্তব
নহে। অথচ আমি হুবহার এই শব্দের মধ্যস্থি প্রকাশ
না করিয়াই বাহ্যার করিয়া আসিয়াছি। এখানে মিটিক
বলিতে আমরা সাধারণতঃ কী বৃত্তি, অন্তঃকরণ, ভ্রমসম, মনোহা,
মেটারলিক্সকে মিটিক বলিতে আশ্রিত করিতে গিয়া মিটিক
শব্দটির যে অর্থ মনে মনে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাই এখানে
প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব। ইংরাজী ভাষায় এই শব্দটি
এত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত যে তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে
গিয়া কেহ কেহ বিরাট পুস্তক লিখিয়া বসিয়াছেন। মিটিকের
সম্প্রদায় লক্ষণ হইতেছে একটি গোপন, অতীন্দ্রিয় বিশ্ববাস
চেতন শক্তির প্রতি দৃঢ়স্বভাব হইতে উদ্ভূত একান্ত এবং
অপরিমিত-বিশ্বাস। এ বিশ্বাস শুধু সেই অন্তঃকরণের উপর
নহে; সেই অনন্তশক্তি যে পরম মঙ্গলময়, পরম হৃদয় এবং

তাহার সহিত মানবাত্মা যে মূলতঃ অন্তর এবং তাহার
সহিত একাত্মতা লাভই যে মানবাত্মার চরম ও পরম সার্থকতা
ইহাও মিটিকের একান্ত অবিকলিত বিশ্বাস। মেটারলিক্স
অন্তরে এই বিশ্বাসটিকে কিছুতেই যেন পাইতেছিলেন না।
অবশেষে যেন তিনি ‘অক্সম্মাং একটু আলোক প্রাপ্ত হইলেন।
তাহারই ফলে ‘দীনের সম্পদ’ (Tresor des Humbles)
পুস্তকখানা লিখিত হইল। ইহাতে মানব অন্তরের হৃদয়
গভীর অহভবানিশি বিকাশ ও তজ্জনিত আনন্দময় আশার
আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

১৮২৬ সালে মেটারলিক্স প্রবন্ধাকারে তাঁহার নবজীবন-
লক্ষ সত্যটিকে ব্যক্ত করিবার প্রয়াস পান। এই বইখানি
মাত্র গড়িলেই যে মেটারলিক্সীয় ‘অহভবের’ সম্যক পরিচয়
পাওয়া যায় তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। এই বইখানি পড়িলেই
মনে হয় যেন মেটারলিক্স স্বীয় জীবনে একটি কোন পরম
মুহূর্তের সাক্ষ্য পাইয়াছেন। সেই মুহূর্তের অপরিসীম
আনন্দের বিপুল উজ্জ্বলতা যেন তাঁহার অন্তরের সকল সংশয়
ঝেড়া হাওয়ার মুখে শেষের মত কোথায় উড়িয়া গিয়াছে।
তাই এই বইখানির প্রতি ছুরে ব্যক্তিগত অহভবের প্রবলতা
পাঠকের মনের ‘অবিশ্বাসকেও’ অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্ত
ভ্রান্তি করিয়া রাখিতে পারে। মিটিক তাঁদের প্রতি
অহরাগ্র তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল এবং যৌবনের শিক্ষা তাঁহার
সেই অহরাগ্রাটিকে আরও প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল। এবার
তাঁহার আপনার জীবনে উপলব্ধ কতকগুলি অহভব যেন
ইহাৎ সেই মিটিক তত্ত্বগুলিকে এইভাবে আনন্দভোজিতে
উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। এইজন্য বসন্ত তাঁহার অহভবের
স্পষ্ট ইচ্ছা সত্যই ধরা দিয়াছিল, মনে হয়, যেন আনন্দের
বেগে, সৌন্দর্যের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণের প্রাবল্য এবং
নবগত বিশ্বাসের প্রাচুর্যে তিনি তাঁর চেয়ে আরও বেশি
অতি প্রবলভাবে প্রচার করিয়া দেখিয়াছেন। বোধ করি

সেইজনই পরবর্তী জীবনে তাঁহাকে তাঁহার সত্যপ্রিয়তার টানে কারনিক সৌন্দর্যগোচর হইতে নামিয়া আসিতে হইয়াছে; এই ভ্রমই পরবর্তী লেখায় তাঁহাকে আমরা এই পৃথকে প্রচারিত অনেক বিশ্বাস বন্ধন করিয়া কতকটা মধ্যপন্থীর বেশে দাঁড়াইতে দেখি।

সে বাহাই হোক, এই বইখানির মধ্য দিয়া এমন একটা প্রবল আশাবাদ মেটারালিক প্রচার করিয়াছেন যে সেই ভ্রমই এই বইখানির পাঠক সংখ্যা খুব বেশি; তাঁহার নাটক হইতেও এই বইখানির সমাধার ও প্রচার অনেক বেশি। মেটারালিক তাঁহার নাটকে অদূতের দৃষ্ট প্রভাবটিকে কি জানি কোন হৃৎ পরেও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। "ভ্রাতৃত্ব" (১৯০৩) নাটকের পরমানন্দের পঞ্চাভেও মালিনের নিদারুণ নিষিদ্ধি রক্ষা বাবিনকা দেখিতে পাই। কিন্তু "দ্বৈতের সম্পদে" আমরা মেটারালিককে অস্পর্শ আশাবাদী দেখিতে পাই।

রহস্ত-লোকের সমুখ আর তিনি বিব্রণ অবসাদ ভার লইয়া কীট চিত্তে দাঁড়াইয়া নন, তিনি বিশ্বদে আমনক পরিপূর্ণ হইয়া রহস্ত-সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া আছেন, অতল রহস্ত-সাগর হইতে ভাবুক "ভুবী" যে কয়টি অঙ্গরূপ মুক্তা তুলিয়াছেন তাহার বিকে শিশুর দিত বিস্থিত আমনক তিনি চাহিয়া আছেন এবং বিশ্ববাসীকে ডাকিয়া দেখাইতেছেন।

মেটারালিকের বাবের দীপ এই পৃথকে অস্বস্তি হইয়া পরে তাহা নানা লেখায় বিব্রণ ভাবে বিকশিত হইয়াছে—বিলম্বে বেশি ভুল হইবে না। এইজন্য এই বইখানির বিস্তৃত আশোচনা করিয়া মেটারালিকের ভাব লোকের দ্বৈত পরিচয় পাইবার চেষ্টা করিব।

"দ্বৈতের সম্পদ" প্রকাশিত হওয়ার পূর্ণ পথান্ত মেটারালিক নাটকে যে জীবনকে আমাদের সমুখ উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে মানব নিষিদ্ধির বিভীষিকাই আমরা দেখিয়াছি।

তাহার মধ্যে আমনদের স্ফেনই বস্তু নাই; যদিও প্রেম "আসিয়া" মুক্তা মত মানবাত্মাকে বলীভূত করিয়া তুলিয়াছে, তবু সত্যের ভীমজ্যোতি-বীজকে বিরাজাই আছে। "কিৎ" কতকাল পরে আলোক আসিয়া এই অন্ধকারকে অপসারিত করিল। কোথা কোথা লেখায় যদিও তাঁর পূর্ণভাবের প্রকাশ পাই, তবুও এই বইখানির সর্বত্রই সেই ভাবটিকে জয় করিবার

চেষ্টাও দেখিতে পাই। একটা নবীন আশা ও নুতন আমনদের বেগে যেন সত্যের বিভীষিকাটা সরিয়া যাইতেছে। জুখ আসিয়া একদিন অন্তরাষ্ট্রাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলাছিল; অসহায়ের মত মানবাত্মা সেদিন সত্যের দিকে চলিয়াছিল। কিন্তু এখন যেন এই ভ্রমের বাহিরে দাঁড়াইয়া তিনি দ্রুত পাকের অন্তর্নিহিত বাণীটিকে প্রত্যাক করিতেছেন। যদিও তিনি বলিতেছেন যে অদূত মাহুদের জ্ঞান হৃৎ কখনও আসেন না; সে দ্রুত লইয়াই আসে^১, যদিও তিনি বলিতেছেন যে সত্যই একমাত্র পরিণাম^২, তবু এ বলার মধ্যে অসহায় আর্দ্রানদের সুর নাই। কারণ তিনি দ্রুতের একটা মহান মুখা নির্দেশ করিতে পারিয়াছেন। আমাদের বৈদ্যনার মতোই যে আমাদের সত্যকার পরিচয় সত্যকে পরিক্রুত ইহা বৃষ্টিতে পারিয়া তিনি দ্রুতের তাই আছন্ন করিতেছেন^৩। এটি সম্ভব হইত না যদি তিনি জীবনে দ্রুতের স্বীকৃত কোন নুতন সত্যের আভাস না পাইতেন। তিনি আভাস যে পাইতেছেন তাহা বেশ বোকা যায়। তিনি বলিতেছেন প্রত্যেক চরিত্রটার মাঝে, নিমেষের জ্ঞ হইলেও, আমাদের অন্তরের সহজবোধ্য বলে যে অদূত আমাদের প্রভু নয়, আমরাই অদূতের প্রভু^৪।

প্রথমবার লেখায় কোথাও কোথাও যেটুকু দ্বিধা দেখা যায়, পরের লেখায় তাহাও অস্বস্তি হইয়াছে। যদিও কোথাও স্পষ্টাকারে তিনি সত্যকে অস্বীকার করিয়া আশ্বাস জয় ঘোষণা করেন নাই, তাঁর কথার সুরে এটি বেশ জোড়াল হইয়া উঠিয়া উঠিয়াছে। তিনি দার্শনিক জিজ্ঞাস্য করিয়া "নিজের মতাবলম্বীটিকে কোন নির্দেশ ছাড়ির উপর স্থাপন করার চেষ্টা করেন নাই। জীবন-সংকল আমাদের অস্তরের কতকগুলি নিগূঢ় অহুতবের মধ্যে তিনি মানবাত্মার অসীম সৌন্দর্যের সন্ধান পাইয়া তাহারই প্রেরণায় আপনাব

১ Star (গ্রহ) প্রবল হইয়া।

২ Predestined (নির্দিষ্ট) প্রবল হইয়া।

৩ Tr. Hu. (The Star) p. 130.

৪ পর Wisdom and Destiny "অদূত ও স্বতন্ত্র" পৃথকে তিনি অদূত হইতে ভাবটিকে দার্শনিক ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মেটারালিকী মতবাদ দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের আলোচনা করা হইয়াছে।

কথাগুলি বলিয়া গিয়াছেন। এইজন্য কোথাও বিশ্বাস ও অহুতবের প্রকাশ যেন প্রকাশ পাইয়াছে, কোথাও তেমনি পূর্ণ জীবনের বিশ্বাস ধারণাও আশ্বাসোপন করিবার চেষ্টা করে নাই। কিন্তু সমগ্রভাবে বিচার করিয়া মেটারালিকের এই রচনার মধ্যে আমরা এক অত্যন্তব্য; আমনকে প্রত্যাক করিতেছি। তিনি মানবাত্মাকে এক অসম্ভব মহিমা ও গৌরবের মধ্যে, পরিভ্রমণ ও সৌন্দর্যের মধ্যে প্রত্যাক করিয়াছেন; এইখানেই মেটারালিকের vision, এখানেই মেটারালিক আপনাব বিশেষত্ব লইয়া বিশ্বমানব সত্যের পাইয়াছেন। মানবজীবনে স্বর্গীয় স্বরূপে প্রত্যাক করিয়া দেখার মধ্যেই মেটারালিক সার্থক।

মেটারালিক যে আগমনবস্তুগের বাণী প্রচার করিয়াছেন তাহা জ্ঞান না-ও হইতে পারে কিন্তু তাঁহার এই বাণী প্রচারের মূলে একটি নুতন সত্যের আবিষ্কার রহিয়াছে। তাঁহার বিশ্বাস যে একটা অধ্যাত্মস্থ আগমন হইয়া আসিয়াছে +। এজোয়ার্ড কার্পেটার, অরবিন্দ, ভাস্কার বান্দ^১ এক অভিনব অধ্যাত্মগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। মাহুদের সন্দেহ মাহুদের অন্তরতম পরিচয়টা নানা আবেগে আচ্ছন্ন হইয়া আছে; আগমনবস্তুগের হাওয়া লাগিয়া সেই আবেগগুলি আজ সারিয়া যাইতেছে বলিয়া মেটারালিকের বিশ্বাস। মানবাত্মা যে পরম্পরের নিকটতর হইয়া আসিয়াছে তাহার প্রত্যেকগুলি নিদর্শন রহিয়াছে। শুষ্ক পরম্পরের নিকট নয়, মাহুদ আজ আপনাব অন্তরাষ্ট্রাকেও নিকটতর করিয়া আনিতে পারিতেছে।

মানব-জীবনের যেটুকু অজানতা তাহা হইতে তাহার সত্যকার গভীর জীবনটি যে একবারে স্বতন্ত্র হইয়া মেটারালিক বার বার করিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন এই যে আমাদের জীবন, ইহা আমাদের সত্য জীবন নহে, আমাদের চিত্তা ও ধর্মপ্রাণ হইতে আমরা স্বতন্ত্র^২। জীবনের একটি দিক আছে সে দিকটা চাঁদের অপরাহ্নের মত বসন্ত জীবনের স্বর্গলোকে কখনও প্রকাশ পায় না—আর সেই আমাদের

শ্রেষ্ঠতম, পরিভ্রমণ এবং মনঃম দিক। তাহাকে মাহুদের কর্মে ও চিত্তায় এবং বাহ্যিক প্রকাশের মধ্যে কিছুতেই ধরিতে পারা যায় না।

মাহুদের সেই দিকটি তাঁর গভীরতর জীবন^৩ সেই জীবন ও এই বহির্জীবনের মধ্যে একটি রহস্তময় আবরণ রহিয়াছে, ইহাকে অপসারিত করা অসম্ভব বলিয়াই বহিরে তাহার সত্য পরিচয়ের সন্ধান করিতে মাওয়া বুঝা^৪। মানবাত্মার অন্তরলোকে প্রবেশ করিতে হইলে তাহা হইলেই মানবের সত্য পরিচয়—অর্থাৎ মানবাত্মা যে চিরপরিচয়, চিরমহত্তর ও মঙ্গলময়—ইহা বৃষ্টিতে পাকা যাইবে।

মেটারালিক জানেন যে এ তত্ত্ব শুধু তর্ক করে না। শুষ্ক অহুতবের মাঝেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মাহুদকে যে আমরা বাহির দিয়া বিচার করি না, বরং আমরা যে তাহার অন্তরে দিক দিয়াই বিচার করিতে শিখিতেছি তাহার প্রমাণ কোথায়? তিনি বলেন, এমন হইয়া থাকে যে যাহাকে আমরা সাধু না বলিয়া আর কিছুই মুক্তির দিক দিয়া বলিতে পারি না, তাহার নিকট গেলেও আমাদের অন্তর উত্তর না হইয়া সন্তুষ্ট হইয়া পড়িতে পারে, আবার বাহ্যিক কর্ম নিতান্ত ইহা তাহার নিকট গেলেও আমাদের অন্তর তত্ত্ব শুভিভাব তরিয়া উঠিতে পারে। এই বিচারপ্রণালী মুক্তি দিতে পারে না, ইহা মানবের অসম্ভবম সত্যবোধ হইতে উদ্ভূত। হয়ত চিত্তায় ও কর্মে একজন সাধু, কিন্তু তাহার নিকট তাহার অন্তরতম আশ্বাস শুভতা সহজ হয় নাই। মাহুদ আপনাব অজ্ঞাতে তাহার অন্তর দিয়া মাহুদকে দেখিতে পায়^৫। এ শক্তি এ যুগের স্বপ্ন নহে; বর্তমান যুগে শুষ্ক

১ cf. Mystic Morality.

২ ১৯০৭ সালে প্রকাশিত "জীবন ও পূর্ণ" পৃথকে The Forgiveness of Injuries প্রবন্ধে মেটারালিক তাঁহার এই মতটিকে ব্যক্ত করিতে গিয়া সত্য পরিচয় বস্তু যে তেমন সাধারণ জ্ঞ তাহা বলিয়াছেন। এমন জীবনে অহুতবের মত হইয়া তিনি যাহাকে মঙ্গল-মায়াগের সম্পদ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন তাহা যে বাস্তবিক তাহা নহে, জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি তাহা মুক্তা জানিয়েছেন "It is quite true that the life that animates him has an indefinable but powerful self-revealing face. It conveys a host of promises, which are probably deeper and more sincere than the

৩ cf. Awakening of the Soul.

৪ cf. Dr. Bucke's Cosmic Consciousness.

৫ cf. Predestined. (Tr. Hu. p 55)

মানবজাতি সাধারণভাবে এ শক্তির অধিকার পাইতে চলিয়াছে, ইহাই মৌটারগিধের বক্তব্য।

এই গভীর সত্যজীবনের পরিচয়কে পাইতে হইলে মানুষকে নীরব হইয়া, উদ্বুখ হইয়া থাকিতে হইবে। এই গভীরতর জীবন নিত্যকাল হইতেই রহিয়াছে। যে কোনও ঘটনা আমাদের অন্তরঙ্গ জীবন আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিতে পারে। এই জগতের প্রত্যেকটি তুচ্ছতম ঘটনা অতি মহান, প্রত্যেকটি দিন একটি পরম দিন^১ আমাদের অন্তরকে সজাগ রাখিতে পারিলেই শুধু এই গভীরতর জীবনকে পাইতে পারি। নীরবতার মধ্যেই আমাদের গভীরতর জীবনের পরিচয় সম্ভব।

মৌটারগিধকে বৃত্তিতে হইলে তাঁহার নীরবতাটিকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। মৌটারগিধ তাঁহার নাটকে এই নীরবতাকে অতি উচ্চ স্থান দান করিয়াছেন। কারণ তিনি বলেন যে মানুষের সহিত মানুষের সত্য পরিচয়, প্রেম একমাত্র নীরবতার মধ্যেই সম্ভব। বর্তমান পর্য্যন্ত দ্রুত ব্যক্তি একমাত্র নীরব হইয়া থাকিতে পারে না এই তত্ত্বকে তাহারই পরিচয় হয় নাই। নীরবতার মধ্যেই আমাদের অন্তরাত্মা পরস্পরকে দেখিবার সুযোগ পায় এবং নিজদেরও গভীরতর স্বরূপটিকে দেখিতে পায়। কথাবার্তা দ্বারা আমরা শুধু একটা আড়াল সৃষ্টি করিয়া পরস্পর হইতে দূরে থাকি; বস্তু আমাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটে তখন বাক্য বহু পদাঘাতে পড়িয়া থাকে। সেই রহস্যময় পরিচয়ের সন্ধান আমাদের বুদ্ধির অগোচর। নীরবতার মধ্যে যে পরিচয় ঘটে তাহা বাহিরের পরিচয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত হইতে পারে*। মৌটারগিধ

words or actions that will ere long belie them. But this great sign has little more than ideal value. We are in a world wherein either through force of circumstances or as the result of an initial error, very few beings live in accordance with the truth which their presence there foretells†. At long last, our pitiful experience teaches us to take no further account of this too mysterious face. p. 176.

† Cf. The 'Deeper Life'.

এই পরিচয়ের মূলা নীরবতার গুণগত ক্ষেত্রের বাহাি়ি বহি হইয়া যায়। নীরবতা ছাড়া অন্তরে কখনও এক হইতে পারে না। নীরবতার মধ্যে আমরা পরস্পরকে জীবন্তভাবে গভীর বৃত্তিতে পারি এবং সেই পরিমাণে আমাদের লক্ষ্যের গভীরতাও বৃদ্ধি হইয়া যায়।

বলেন এই নীরবতা উচ্চতম সত্যের দূত, তাহার নিকটই দ্বন্দ্ব আমাদের রহস্যময়ের স্বাক্ষর পায়। বাহ্য নীরব হইতে পারে নাই, অন্তরের স্বাক্ষরাতীত নিষ্কণে বাহ্য প্রবেশ করিতে পারে নাই, তাহারে নিকট সত্যের নিমগ্নতা আসিতে পারে না। নীরব পরিচয় অতি মধুরও হইতে পারে, আবার মর্মান্বিতক বিশেষেরও কারণ হইতে পারে। কারণ নীরবতার নিম্নন একেবারে 'অসম্ভব' হইয়া দাঁড়ায়। নীরবতার বিচার অসম্ভব, যে আমাদের 'অদৃষ্ট জানাইয়া দেয়।

স্বতন্ত্র গভীরতর জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে এই নীরবতাকে জীবনে আগ্রহন করিতে হইবে। বৃত্তা শোক কিম্বা অদৃষ্টের অজ্ঞাত নিমগ্ন আমাদেরিগকে কখনও কখনও এই নীরবতার মাঝে টানিয়া লয়। আমরা কথায় প্রকাশ না করিতে পারিলেও মৃত্যুর সম্মুখে আমাদের নীরবতা যে একটা মূঢ় নর, তখন আমাদের অন্তরঙ্গ জীবনের মধ্যে যে এক অসীম রহস্যের জাগরণ হয়, তাহা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু প্রেমের নীরবতাই আমরা কতকটা স্বেচ্ছায় পাইতে পারি, ইহাই মৌটারগিধের মত। যদিও নীরবতা মাঝেই আমাদের জীবনের গোপন গভীর রহস্যকে জাগাইয়া তোলে, প্রেমের নীরবতাকেই তিনি শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। শোকের অবাতে জাগরণের চেয়ে প্রেমের গভীর তন্ময়তার মাত্র দ্বিগুণ জাগরণই কি প্রেম নয়?

অন্তরের গভীর গভীরতর প্রকৃত জীবনে এত বড় স্থান দিয়াছেন বলিয়াই নাটকীয় রীতি-সম্বন্ধে মৌটারগিধ এক অকিনয় সিদ্ধান্ত উপনীত হইয়াছেন। প্রেমকেই যখন মৌটারগিধ গভীরতর জীবনে উপনীত হইবার শ্রেষ্ঠ উপায় করিয়াছেন, তখন এখানে তাঁহার প্রেম সম্বন্ধে আশোচনা কল্পাসঙ্গিক হইবে না। আমরা তাঁহার পূর্ণ লিখিত নাটকে এই কথাটির আভাস পাইয়াছি যে মৃত্যুর সম্মুখে বহি জগতের কোন শক্তি অবিচলিত হইয়া দাঁড়াইতে পারে তবে সে শক্তি একমাত্র প্রেমেরই আছে। পীড়নের 'সম্পর্কে' মৌটারগিধ নতুন প্রেমকে আরও স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন। আমাদের অন্তর এই বিশ্বস্ততার 'পদাঘাতে' যে রহস্যময় শক্তি রহিয়াছে তাহাকে রহস্যময় বলিয়া স্বীকার

করিলেও এখন তিনি তাহার অজ্ঞেয়তাকে জীবন বলিয়া স্বীকার করিতেছেন না। স্বপ্নের বলিতে তিনি বাহ্য কিছু পরমহুন্দর, মনীয়^১ ও পরম মঙ্গল তাহাকেই নির্দেশ করিয়াছেন, মানব জীবনের গভীরতর সত্তা যে এই পরম রহস্যময়, পরম সৌন্দর্যময় তাহাও তিনি বহুস্থানে স্বীকার করিয়াছেন। প্রেম ভালবাসাকে এই জ্ঞত মৌটারগিধ সেই অনন্ত রহস্ত শক্তির সহিত 'পরম একতার দৃষ্টি' (a recognition of great primitive unity—) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কোথায় 'যেন' এই মানবাত্মা পরস্পরের সহিত একাত্ম হইক, যেন সকলেই একই শক্তির সন্ধান এই বোধটি প্রেম আমাদের মধ্যে জাগাইয়া দেয়।

প্রতি মানবের মধ্যে আমাদের একটি নিত্যকালের পরিচয় নিহিত রহিয়াছে। এই পরিচয়টিকে শুধু আমাদের অধিকার করিতে হইবে। মৌটারগিধ বলেন মৌটারগিধের রহস্তলোকে প্রতি মানবের অন্তরাত্মা নিয়তই বাস্তবায়িত করিয়া থাকে বলিয়া মনে হয়†। এমন একটি জগৎ আমাদের জ্ঞানের অতীত হইয়া আছে, যেখানে আমরা পরস্পরকে জানিয়া বসিয়া আছি; সেখানেই আমরা পরস্পরকে জানিয়া ও চিনিয়া বসিয়া আছি‡। যুগলতন্ত্র প্রণয় আমাদের দেখিয়াছে যে মৌটারগিধের মতে পুরুষ এই রহস্তলোকে হইতে একান্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে; কিন্তু নারীই শুধু এখনও সেই চিরদিনের শোকের স্রবিকার হারাইয়া বসে নাই। ইঙ্গিত মানেই যে এই বিশ্লেষণের সমস্ত তুচ্ছতাকে অতিক্রম করিয়া এক নিমেষে সেই অন্তরলোকে উপনীত হইতে গায়ে ও অন্তরঙ্গম আশ্রমে সাজা যিতে পারে। শিতও যে অন্যভাবে মানবাত্মার অন্তরঙ্গ রূপটিকে দেখিতে পার, তাহার স্বচ্ছ দৃষ্টির সম্মুখে যে অদৃষ্টলোকের কিম্বা গোপন থাকিতে পারে না, ইহা মৌটারগিধ যে এই পুস্তকেই প্রথম প্রচার করিয়াছেন^৪ তাহা নয়, পানিগ্রাস ও মেলিগ্রাস নাটকেও (অঙ্ক ৬, দৃশ্য ১) এই পুস্তকের প্রয়োণ আমরা দেখিতে পাই।

পরবর্তী নাটকেও তিনি এই বিশ্বাসটিকে প্রচার করিয়াছেন।

* Cf. Invisibile Goodness.

† Cf. Invisibile Goodness (Tr. Hu p. 162).

‡ Cf. On Women.

২ Cf. Awakening of the Soul (Tr. Hu p. 339).

মৌটারগিধ মানব অন্তরের পরম সৌন্দর্য ও পবিত্রতাকে অপরূপ শক্তিমান বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। বাহ্যর অন্তর আপনার মধ্যে এই গভীরতর জীবনকে জাগ্রত করিয়া পাইয়াছে সে তাহার সম্বন্ধে সচেতন নাও হইতে পারে, এমন কি না-হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ চেতনা আমাদের জীবনের বাহিরের স্তরের কথা; কিন্তু বাহ্যর মধ্যে এই গভীরতর জীবন ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার চারিদিকের মানুষও এই জীবনের প্রভাব অহুত্ব করিয়া হৃদয় হইয়া উঠিতে। সচেতন সৌন্দর্য ও মঙ্গলের উপর মৌটারগিধের শ্রদ্ধা নাই; চেতনার মধ্যে যে সৌন্দর্য ও কল্যাণবোধ আত্মপ্রকাশ করে তাহা প্রাণহীন। কিন্তু অন্তরের গভীরতর সন্ধান সহিত একীভূত যে সৌন্দর্য ও কল্যাণ তাহা অদৃষ্টের কঠোরতাকেও কোমল করিয়া ভুলিবার শক্তি রাখে।

‘দীনের সম্পদ’ মৌটারগিধ মানব জীবনকে পরম গৌরবময় ও পরম হৃদয় বলিয়া সানন্দে প্রচার করিতে বিধা করেন নাই। এইজন্য তিনি মানব জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা এবং কর্তব্য পরম মহান (divinely great) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রত্যেক মানবের অন্তরঙ্গম স্বরূপটি যে মঙ্গল ও সৌন্দর্যেরই প্রতিরূপ তাহা বলিতে গিয়া তাঁহার কোণাও শঙ্ক দেখিতে পাই না। কিন্তু তাহা হইলে মানুষের বিচার করি আমরা কি বিয়া? সবই যদি একময় তত্ত্ব হইত তাহা হইলে এই জগতের ভাগ মন্দের সমস্ত বিচার এক একটা আগলের নীতিপ্রণ? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে যদিও প্রতি মানবের অন্তরঙ্গম সত্তা একটি, তথাপি এই সত্তাকে প্রতি মানব আপনার মধ্যে সত্য করিয়া গ্রাস্ত হয় নাই। আমরা ভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গভীরতর জীবনের 'ভিত্তি' হইতে বহুদূরে হারিয়া রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। কখনও কখনও জীবনের গভীর মুহূর্ত্তে আমরা সেই পরম ভিত্তির উপর গিয়া পড়ি। সত্য। কিন্তু সেখানে

* Cf. Invisibile Goodness (Tr. Hu p. 161).

† There's not man

That lives who hath not known his Godlike hours.

The Prelude B. K. III.

Wordsworth.

আমাদের সত্য প্রকৃষ্টি হয় নাই বলিয়া আমাদের এই পরিচয়টি নির্ধারিতের পরিচয়। সেই পরম সত্যরূপ হইতে আমাদের দূরত্ব বা নৈকট্য বিয়াই সেজন্য আমাদের ইহলগ্নতের বিচার। এইজন্যই প্রতি মানবাখ্যা মূলতঃ পরম হৃন্দর বলিয়া স্বীকার করিলেও এই জীবনের পথে আত্মার আত্মার অনিলের সম্ভাবনাও মেটারলিঙ্ক জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই জন্মই, এই দুঃখটুকু আছে বলিয়াই এই নির্ধারিত মানব পরম্পরকে পায় না। পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে পরিপূর্ণ মিলন সম্ভব, পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যেই আত্মার পরিপূর্ণ পরিচয়। কেবল কয়েকটি গভীর মুহূর্ত্তে সেই রহস্ত-হৃন্দরের সাক্ষাৎ পাইলেই জীবন সার্থক হইতে পারে না।

"We must learn to live in a beauty, an

earnestness that shall have become part of ourselves"—(The Deeper Life.)

পরম প্রতীক্ষা ও ধ্যানই জীবনকে এই রহস্তলোকের সহিত অন্তরাত্মার যোগ স্থাপিত করিবার শক্তি দেয়।

আমরা বেখিলাম যে মেটারলিঙ্ক মানব জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাকে অপরিমিত রহস্তের পরমাখ্যা আলোকে দেখিয়াছেন ও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন^১; মানব জীবনকে তিনি এক অপূর্ণ সৌন্দর্য্য দান করিয়াছেন। 'দীনের সম্পদ' পুস্তকখানি এক কথার বলিতে গেলে, নৈরাশ্র, ভীতি ও বিধাদয়ক জীবনের একটি অপূর্ণ আনন্দোচ্ছ্বাসিত প্রভাসসদৃশ।

জন্মশ:

১ Cf. The Deeper Life.



কিছুই প্রেমের মত নয়

শ্রীবুদ্ধদেব বহু

তোমরা বাহাই বলে, কিছুই প্রেমের মত নয়;—

লাল চৌট, কালো চুল, তুমারের মত শাদা বাহ,

মগ্নর-মগ্ন জাহ্নু, মুষ্টি-ভরা ছোট ছুই স্তন,

শরীরের পাত্রে ভরি শরীরের উজ্জ্বলিত সুরা—

তারপর হাসিমুখে চলে-আসা, দূরে-ঠেলে-দে'য়া,

অন্যায়সে ভুলে-বাওয়া-লঘু মনে, শিথিল শরীরে

মিঠে-মিঠে অবসাদ; ক্রান্ত চোখে স্বপ্নহীন ঘুম,

রাত্রির তৃপ্তির কলে প্রভাতের সূস্থ জাগরণ—

ভালো? ভালোই তো? কিন্তু তার চেয়ে ভালো—আরো ভালো,

নব চেয়ে ভালো—কী? জানো না? পড়ে নি কখনো প্রেমে?

কখনো বাসো নি ভালো? প্রিয়ার চকিত স্পর্শে কভু

অমুভব করো নাই আকাশের সমস্ত বিজ্ঞাৎ?

আঙুলের লঘু স্পর্শে শত শৃঙ্গারের উদ্ভাদনা?

একটি অফুট কথা ঈশ্বরের ইঙ্গিতের মত

পৃথিবীর মুখ থেকে যবনিকা দেয় নি সরিয়ে?

জাখো নি হৃন্দর তারে ঈশ্বরের স্বর্গের মতন?

একটু লজ্জার রঙে দৃষ্টি তব হয় নি রঙীন—

নিজেরে কি জাখো নাই শাপভঞ্জে দেবশিশু-সম?

প্রথম চুপনে যবে করেছিলে প্রেমের স্বাক্ষর—

মনে আছে?—সারা রাত ঘুম নাই, ঘুম নাই চোখে,

একটি নামের সুরে অবিশ্রান্ত বাজিছে হৃদয়,

বাজিছে আকাশ ভরে' সেই নাম তারায়-তারায়।

সারা রাত ঘুম নাই, ঘুম নাই ছ' জনের চোখে,

স্পন্দমান অঙ্ককার তোমাদের আবশ্বে বিহ্বল,

তোমাদের প্রার্থনীয় আকাশ মুচ্ছিত হ'য়ে আছে,

পৃথিবী হারিয়ে গেছে, সময় ফুরিয়ে গেছে থেমে—
বিছাতের তীর-সম মহাশূন্যে চলেছে ছুটিয়া,
বেগের বাতাস লেগে যেতেছে নিবিয়া তারাগুলি।
...এই প্রেম ? প্রেমে এত প্রেম ? বাসনা অপরিণীত—
তৃষ্ণার নাহিকো তৃপ্তি—এ কী মৃত্যু ! হৃদয়, হৃদয় !
হে বিধাতা, চেয়ে জাখো, শরীরের সজীব সীমায়
অসীম তৃষ্ণার কান্না। এইবার মৃত্যু দাও তবে।
...কত ভালোবাসিয়াছে ? শরীরের অস্থির আগ্রহে,
হৃদয়ের আন্দোলনে, আত্মার তন্ত্রের আবেষ্টনে
যেই প্রেম—তার মত—তার মত আর-কিছু ? বলা !
তার মত—টোটে-টোটে টুকটাক মিঠে পাখী-পখা ?
তার মত—শরীরের সুরার উচ্ছ্বাস ?... তার মত—
রাত্রির তৃপ্তির পরে প্রভাতের সূস্থ জাগরণ ?
যা-ই বলা, আমি জানি কিছুই প্রেমের মত নয়,
কিছুই প্রেমের মত নয়। তুমি জানো—সে-ও জানে।
তবু কেন আপনার অপচয় ?—তোমরাই বলা।



দোল

স্বপনের কাচব্যাচ্ছদাস !...

শ্রীদিলীপকুমার রায়

স্বপন সব ঠিক ঠাক করে যখন ঘরে এসে ঘড়ির দিকে
চাইল দেখল হাতে টিক পয়ত্রাশিণি মিনিট সময় রয়েছে।
মনে বেশ একটা ক্ষুধার রিপোল। সে দেখেছে যখনই
খিদ্যা কেটে যায় এমন একটা হিলোল আগে... এমন আলো...
তার মনের খিদ্যাফুট ছায়াখিঁচকার ! মসিয়ে বেনারকে তারটা
করে দিয়ে প্রথম দিকটা একটা কিস্তর মেথ উড়ে এসেছিল,
কিন্তু হঠাৎ একথেকে-যে একটা দম্ভা তরল হাওয়া এসে
চারদিক বিস্তৃত উদ্ভাসিত করে তুলেছে !...

সে হঠাৎ সন্ধ্যাকে উত্তর লিখে তবু বার :

"অগ্নি গর্ভোৎসর্গে সরোরক্ষা !

'এতানি তে স্ববচনানি কর্ণাত্মানি মনসক রসায়নানি,'
বই কি।

"অবিস্ত্রিতা ব'লে তোমার পাটকেলটি যে তুলোর মতন
লাগে তা নয়।—কিখা গরবগুলি বিনয়বচন।

"কিন্তু তুমি আমাকে রাগিয়ে দিলে এ হুয়ে, সাবধান !
আর তার ফলও ফলস্ব'বাহু হাতে হাতে। কী—কনুবে ?
আমি আজ রাতে চাও ও ইয়াবেলার সঙ্গে পারিসই যাচ্ছি।
যাচ্ছেলাম—আজই রাতের একটা ইতালিয়ান জাহাজে—
কায়রো—কিন্তু তোমার চালাজে রোথ চেপে গেল—
বিশেষতর মনের অন্দর মহলে ফের উকি মারতে ছুটব
খড়ায় বাট মাইল বেগে—বারোটা পূর্ণিমা মিনিটে।

লিখে একটু ভেবে ভনিতা করে ইয়াবেলা ও চাওর
কথা লিখল হু হু করে সাড়ে চার পাতা। তার পর লিখল :
"অর্থাৎ ঢেঁকি ঘর্বে গেলো—আর কি। পালিয়ে প্রাণ
বাঁচাবো সাধ্য কি ? একদিক থেকে যার জেজে চুরি করি
সেই বন্ধু চোর, ও অপর দিকে এক তরুণী যার পুনঃ অজ
তরুণী আসে।

"ঠান। না। সত্যিই ঠিক করেছি 'সিঁহের গন্তের

মধ্যে ঢুকে তার দাড়ি ছেঁড়াই' হচ্ছে পছন্দ। যদি তুমি
অশ্রু 'আসন পাতি পথের ধারে' ব'লে থাকতে—তবে হয় ত
বেগে ছুটতে মনটা আপত্তি করত, কিন্তু তোমার এ
রোখাখো বৌটার পরে সে-পথও রইল না। এ-অশ্রুশের ফলে
আমি গ্যালাপে ছুটব। সাবধান।"

লিখে একটু ভাবল। একবার মনে হ'ল, নাঃ। ছিঁড়ে
ফেলে আর কি। কিন্তু কি ভেবে হেসে বলল : "ধাক না।"
লিখেই চলল :

"কেবল ভয় হয় যদি ভয় না পেয়ে ক্ষেপে যাও, তাহ'লে ?
যদি বিঘন রেগে যাও, তাহ'লে ? যদি হস্ত দস্ত হ'য়ে
এয়ারোপ্লেনে চেপে উড়েই আসো, তাহ'লে ?

"কিন্তু না, তাহ'লে সেই তো হবে আমার সব অসম-
সাহসিকতার চরমতম পুরস্কার।

কে না জানে মাছু—

ভয় দেখিয়েই চার ছুঁতে হায় কোথার প্রেমের হল
ভুল খোঁজাই ঐখ-শেখো নামে হবার চল।

তাই ত মনে মনে জপি—

আমার রাগের ছলে হানির মালা গাঁথবে সম্ভারণী,
আমার মেঘলা মুখের অমার আলা করাবে জ্বলন।

সে যে একচেয়ে এই জীবনটাকে
তুলবে মাতিং বাহারে
তাই তো আমি মেথ ভাকিয়ে ভুলসোজারি খাঁচি
ছিঁড়তে বাঁধ ভয় দেখিয়ে তাই তো তোকে ধাকি।

কেমন গো ?—সমসারাজ কি শুধুই কুসাসারাজ ?

"—তবে এ হচ্ছে গঙ্গাপুঞ্জা গঙ্গাজলে, কাব্যরাসীর সংসদে
নিয়ত কাশীবাসের ফলে একটু ছন্দের ছিঁটে ফৌটা আসবে
না ? ইয় কখনো ?"

তার হঠাৎ মনে হ'ল প্রফুল্লতার বেন একটু বাড়াবাড়ি
হচ্ছে, কিন্তু আজই না পোট করলে কালকের ডাকে যাবে
না। তাই লিখে চলল :

“কিন্তু আর আর সময় সেই। মোটার বেটী তৈরি থাকবে ঠিক ছটায়। এখন ছটা বাজতে দশ মিনিট। মার্সেলসে পৌছেই পারিস রওনা। পারিস থেকে ফের বড় চিঠি দেব। গত ছত্ৰি মেনে যে বড় চিঠি লেখা হয়ে ওঠে নি তার জন্যে আগামী ছ তিন মেনে ছট্টেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করব। এ চিঠি এখনই পোষ্ট করে দেব ও কালকের জাহাজেই চলেবে একল্লুতা মুখো।”

বলে একটু থামল, তারপর লিখল: “কিন্তু তুমি শেষের দিকে এমন নিম্ন অক্ষরালিঙ্গী চাও ধরলে কেন বলো তো? ভাবো কি—মনের উচ্ছ্বাস খুব টুকটেকে রক্তবর্ণ কথা না ব্যবহার করলেই পাণ্ডুর দেখায়? তোমার শেষ কবিতাটা আমাকে সত্যি এত মুগ্ধ করেছে—জানো?”

লিখতে লিখতে প্রচণ্ডরতা কেন্দ্র যেন একটু ফিকে হয়ে আসে।

“কিন্তু সত্যি, এমন সব গান গোয়েও না, লিখোও না। তুমি কি ভারতের পাঠো তোমার স্বান আর কেউ কখনো নিতে পারে? ঠাট্টা করে বল—বুধি। কিন্তু তোমার পুনর্জন্ম কি—নিহত ঠাট্টার চওে লেখা? হুঙ্কা হুঙ্কা শুনিবেই দিতাম—কিন্তু আর আর এক মিনিটও সময় নেই। তুমি আমার প্রাণবন্ত ভাষাবাসা নিও। ইতি অক্ষলশয় হৃদয়বর্তী।

রওনা!...

চিঠিটা ভাকে দিয়েই সে তাড়াতাড়ি ইসাবেলার ঘরের ছুরোরে আঘাত করতে বাবে—ঠিক সেই মুহূর্তেই সে বেরিয়ে এল। তার মুখে ঈষৎ উদ্বেগের চিহ্ন: “তোমাকে বুঝে বুঝে—”

শব্দ ঈষৎ জঙ্জিত শব্দের বলে: “একটা জঙ্জুর” চিঠি ভাকে দিয়ে একটু বেরিয়েছিল।

ইসাবেল হেসে বলে: “ও—তাকে বুঝি?”

শব্দ হাসিমুখে বলে: “হ্যাঁ। কিন্তু দেরি তো হয় নি। এই দেখ, (হাত বাড়ি দেবিয়ে) “ট্রিক জট”—কীটার কীটার।”

—কিন্তু কীটার কীটার ছটার সময় কি আমাদের হোটেল করিডোরে দাঁড়িয়ে কথা কওয়ার কথা, না—মোটর বোটের বাঁশি বাজার কথা।”

শব্দন হেসে বলল: “বাবা—অবু আর নয় না!”

আচ্ছা, মার্সেলসে আসিটার মধ্যে পৌছলেই তো হ’ল?”

—হঠাৎ সে চমকে ওঠে পেছনে একটা ছায়াপাত। না ভয় নেই—ভালোই।

—“কি?”

—“মিসিয়ে—সেই নীল চশমাকে এমন ধাক্কা মেরে দিয়েছি।”

শব্দন তার হাতে আরও পঞ্চাশ ফাঁর এক নেট ঝঞ্জে দিয়ে বলে: “বেশ বেশ। কিন্তু সে বিশ্বাস করেছে তো?”

—“হ্যাঁ মিসিয়ে।”

—“কি করে জানলেন?”

—“তার পাশে একটা লোক ছিল তাকে সে পটু শীজ ভাষায় বলল, মোটর বোটের আসনগুলো বেড়িয়ে ফেরবার সময় তার মোটরটা যেন হাজির থাকে। মিসিয়ে জানতেন না যে আমি লিসবনে গুজবের কাজ করছিছি একটা হোটেল—পটু শীজ বুধি।”

ভালোই মনে গুণের এমন আভা চক্চক করে ওঠে।

শব্দন এবার সত্যিই খুশি হয়ে ওঠে। বলে: “বেশ বেশ। কিন্তু আমাদের—মানে মার্সেলসে মোটা তোরপট্টা?”

—“এতক্ষণ ষ্টেশনে চলে গেছে মিসিয়ে—ভ্রমনি বাবে পারিসে আপনাদের বাড়ীর ডিকানার গিয়ে উঠবে আপনাদের—আপনি—কোনো ভাবনা, নেই। আমি নিজে সব জেগেণ এটে দিয়েছি। ওই দিন রিঙ্গীট।”

শব্দন তাকে খুশি হয়ে আরও সজ্জি করি। পুরবোধীর দিয়ে ইসাবেলকে নিয়ে বেরল। নিজের স্কটকেস ও অ্যাটচকেসে হুটো ও ইসাবেলার একটা ছোট্ট হুটকেস ও attache-case সমেত সটা মোটর বোটের গিয়ে উঠে বসল। বোট ছাড়ল।

ইসাবেলা ভোরের দিকে চেয়ে বলল “আ বাঁচা গেল—সে লোকটা বোই।”

একটা নীল বনেটের মোটর এসে লাগল, ঠিক সেই মুহূর্তে। নীল চশমাওয়ালা লোকটি জতপদে বেরিয়ে

মোটর বোটের দিকে দৌড়ে এসে হাত ঘন ঘন নেড়ে চানককে বলল: “রাড়াও।”

শব্দন তার হাতে পঞ্চাশ ফাঁর নেট ঝঞ্জে বলল: “এক সেকেন্ডও দাঁড়ালে চলবে না, আমাদের বড় তাড়াতাড়ি এক মিনিটও সময় নেই না। কেবল একটা কাজ করতে হবে। মার্সেলসের দিকে আগে চললে হবে না—মাইল পানেক ট্রিক উল্টো দিকে চলে—ঐ প্রকাণ্ড জাহাজটা ডিভিয়ে গবের দুটি এড়িয়ে তবে মার্সেলসের দিকে ফেরা।”

পাইলট সঙ্গসঙ্গে অভিযান করে বলল: “এ আর কথা কি মিসিয়ে? ওর চোখ এড়ানো তো ছেলেখেলা। ঐ যে দূরে তিন চারটে মোটর বোট কেনে চলেছে গবের, মধ্যে মিশে ওর চোখে আগে দাঁধা আগিয়ে দিয়ে তার পর জলদূত হয়ে গ্যাবো ও সব শেষে মার্সেলসের দিকে বোটের মুখ ফেরাব।”

—“কিন্তু সময়ে পৌছে দিতে পারবে তো?”

পাইলট সঙ্গসঙ্গে বলল: “আমি rōgate (ব্যঃ) খেলতাম মিসিয়ে। আর আমাদের এ—বোটটি স্পিডে নীসের সেরা বোট। নক্ষত্রবেগে চলবে—দেখবেন।”

নীল চশমাওয়ালা ভল্লোলক ফের তাকে বলল চোঁচিয়ে: “শোনো।”

পাইলট চোঁচিয়ে বলল: “একনি ফিরে আসছি, একটু অপেক্ষা করুন।”

সে চোঁচিয়ে বলল: “কতক্ষণ?”

—“এই এক ঘণ্টা শ’এক ঘণ্টা। এরা ফিরে ডিনার খাবেন, তাই সময় নেই।”

সে লোকটা ফিরে তার পঞ্চাশতী বন্ধকে কি বলল যেন।

শব্দনের বোট ছাড়ল—মার্সেলসের উল্টো দিকে।

আত্ম-আনিষ্কার!.....

পাইলট বোটটিকে খুব দূর সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ফেলল।

তারপর ফিরল সেই মস্ত জাহাজটিকে প্রাঙ্কিন করে তিন চারটে মোটর বোটের মধ্যে দিয়ে পঞ্চ কেটে নিয়ে।

শব্দন ও ইসাবেলা দুজনেই প্রায় একসঙ্গে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল—বোট মার্সেলসে অভিমুখী হয়েই।

এতক্ষণ—প্রায় সূর্য মিনিট—কেউই কথা বলে নি।

শব্দন এবার কেবিনের দু-জোড়া বিজলি বাতিই জ্বলে দেয়। ইসাবেলার মুখ হঠাৎ এত মোহনময় দেখায়—সে—নীলাভ আলোতে।

শব্দন হেসে বলল: “জানো ইসাবেল, তোমাকে কি রকম দেখাচ্ছে?”

ইসাবেলাও হাসল: “আবেশ-বিহ্বল।?”

—“না আশ্চর্য-উজ্জ্বল।”

ইসাবেলা এবার হাসল না, কোমল-কণ্ঠে বলল: “সত্যিই। আমার মনের ওপর একে যেন পাবন নেমে গেছে। উঃ, সকাল থেকে যে কী উৎকণ্ঠাই কেটেছে।”

শব্দন প্রথমটা তার দিকে চেয়ে শুধু মূগ্ধ হোসে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মনের কোনো কোণে কোণে একটা কোঁচ কাণে। সে যে তার সঙ্গে বিপদ বাড়তে পারে নিয়ে মার্সেলসে ছুটতে—এভাবে।

ইসাবেলা তার হাতের মধ্যে শব্দনের একটা হাত টেনে নিয়ে বলে: “তোমার ঝগ ভাই, আমি জীবন জুড়ব না।”

শব্দনের কোঁচ তেমনি সহজেই কেটে যায়। বিজাতের হাসিতে কেটে যায় সন্ধ্যার উগীরমান অন্ধকার। ইতিপূর্বে কবিতার সে আশ্চর্য হয়েছিল নগীর সহজবোধের অস্বাভাবিক প্রমাণে—তবু ফের আশ্চর্য। ইসাবেলা কেন্দ্র টপ করে ধরল তার মনের কথা। ওর হাতটি নিজের হৃদয়ের মধ্যে টেনে নিয়ে চুষ করে বসে থাকে। এত সহজে তার উচ্ছ্বাস আসে—বাইরে উচ্ছ্বাস বেশি চাপলে যা হয়—

কিন্তুটা হয়ে গেছে সম্পর্কভার। তাই বুধি এত সহজে তার মেজাজ বলে যায়? হবে...

দুজন খানিক বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। দূরে সেই জাহাজটির দীপাবলি এখনো “কিন্তুকি” করছে।... নীসের থাকে-থাকে-নামা পাহাড় ঐ এক টুকুরা বাঁচা টোরে খালোয় এক অপূর্ণ যোঁড়াপরা মুখ নিয়ে আকাশের দিকে উজ্জত অধর মেলে রয়েছে।... সেখানেও আর এক আলোছায়ার অভিন্ন।... এক ছাই রঙের মেঘের আড়ালে এক টুকুরা অনান্য পীতভ রঙ অক্ষমক হয়ে কী ভাবে বের পাশে হাত দিয়ে। তার কাছেই আর এক দল মেঘের

পায়ে পীতভা শাড়ী। ঐ চাঁদের গুণের দিয়ে একটা মেয়ের
তত্ত্ব এসে পড়ে...পীতভা হ'য়ে যায় নীলাবতী।।...

ঐ আবার...মনে সরে যায়...সঙ্গে সঙ্গে মেখলাবার দের
ক্লান্তি হাশি হেমে স্বপ্ন-চোখে তাদের নিকট-সান্নি নিশা-
নবের মাংস-বোঁড়াছড়ি হুক করে দেয়। কত কথাই
বলে তারা—কত যোনালি কটাকের মশলা নিশিয়ে,
হরিভাত ঝাঁল বুক টেনে, ধূম্যাত দিগির সোঁত দিখিয়ে।।...
স্বপনের মনে পড়ে কাশিই রাত্রে চাঁদের প্রিয় কবি-বিতাই-
পের একটি কবিতার জার্ণাণ অহুবার ও তাকে পড়ে
শোনাচ্ছিল—একটা টুকুরে সে ভুলতে পারেনি আজও—

“Der Mond beschwatz beichtfertig
Allerleigewolk”

কলকলি' বিবু হাসিয়া আনাগ

করে গো কেমন অত!

বত আসে তার মেখ-আলাপিনী

কথাও ছুটে কি তত!।...

ইসাবেলা হঠাৎ বলে: “কী হৃদয়!”

তার এত কথা—ও! স্বপনের পুসি যেন উছলে উঠে।

সে অক্ষুণ্ণের প্রতিধ্বনি করে: “সতি।।”
হঠাৎ তার মনের মধ্যে একটা নিশ্চিত শান্তি বিছিয়ে
যায় মাথার উপরে ঐ বর্ষাধীরের মতন। তারও মনের
মধ্যকার টুকুরে টুকুরে ছছছাড়া ডিঙাগুলি আলো-
তাবোল বকতে হুক করে দেয় ওদের হুরে হুরে নিশিয়ে।
অনিন্দী হরকরাতি, মিষ্টি ও উদাস অর্থনির আলো তাবোলে।
...মেটার বোঁট হু করে চলেতে থাকে। কম করে ত্রিশ
পরিধি মাইল হবে কটা,—না? থেকে থেকে একটু কাং
মতন হয়—কিন্তু আবার তখন সোজা হ'য়ে আসে। নীসকে
পেছনে ফেলে ওঠে তারা এগিয়ে চলে ওর মন ততই সহজ-
ছন্দী হ'য়ে ওঠে। ইসাবেল্লারও সে অহমান্য করে স্মরি
প্রীত হয়ে ওঠে বিবরকাণ্ডের 'পরে।

প্রায় পনের বিশ মিনিট এই ভাবে কাটে। স্বপনের
মন দিকভার ভরে যায়। ইসাবেলা বলে বিজাল বাতি
নিভিয়ে দিতে।...সত্যিই তো!—একথা কেন মনে হয় নি
এতকথ?...চাঁদের আলো এখন আরও কত হৃদয় দেখায়

কেবিনের মধ্যে।...বাইরের দিকে চেয়ে থাকে ওরা এক
দৃষ্টে।...কোন এক সময়ে ইসাবেলা স্বপনের কাঁধে মাথা
এলিয়ে দিয়েছে।...চাঁদের সোণালি ছাতি তার মুখখানির
গুণের চলে পড়েছে।...স্বপন এক একবার তার দিকে ফিরে
তাকায়। এর কম গাভা তার জীবনে ক'টা এসেছে।।...
ভাবে। ক'টাই বটে!।...

কয়েক মিনিট পরে হঠাৎ যেন ইসাবেলার নিঃশ্বাস
এসে তার গ্রীবায লাগে। সে একটু কেমন কেমন বোধ
করে। মুহূর্তের জল্পে। দুঃ—সে মনের মাথা সজোরে
নাড়ে।।...তার মনটা এমন কেন?

কিন্তু শত চেষ্টারও তার মনের সে শিথলতাকে তো কই
ধরে রাখতে পারেন না। সে যেমন আপনি ঘনিযে ছিল তেমনি
আপনিই নিশিয়ে যায়। ইসাবেলার নিঃশ্বাস আরও ছকঝকর
তার কাঁধে লাগে। তার চুলের পক্ষে কেমন যেন ফের
ক'রে ওঠে তার মনের মনে।...সে আরও দৃঢ় হয় মনে
মনে। বাইরের প্রকৃতির সৌন্দর্যেই নিজেকে ডুবিয়ে দিতে
প্রয়াসী হয়।

তখনও ইসাবেলার মাথা স্বপনের কাঁধে। স্বপনের
মন হয় যে বড় দূর দূর বায়বাহর স্বরছে বুঝি সে।...বীরের বীরের
ওর কটিবেদন করে বসে। ইসাবেলার দেহ এত সহজভাবে
মাড়ায় দেহ তাকে ভরসা পেয়ে সে লুকিয়ে ওর দিকে চায়।
একবার, দ্বাবার, হঠাৎ, তিনবারের পর স্বপনের চোখোচোখি
হয়। ইসাবেলাও তাকে আঁড়ে দেখছিল...বরা পড়ে যায়।

মুহূর্তে সব গিলেগালিট হ'য়ে যায়।
...বুকের মধ্যে কি-একটা ছর ছর করে ওঠে। সে জোর
ক'রে অস্ত্র দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু তাকিয়ে তো কই
আর থাকতে পারে না। বাইরের প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য
যেন মুহূর্তে লুপ্ত হয়ে পার্শ্ববর্তিনীর মুখে লুটিয়ে পড়েছে।
সে ফের আঁড়াজো চায়। ইসাবেলার ক' থেকে
ব্লাউস চিলে হ'য়ে ছুয়ে পড়েছে—একটু...সামান্য। কিন্তু
চাঁদের আলোর তাতেই গিল্লব বাধে। স্বপন ভালো
ক'রে ভাববারও অবকাশ পায় না। কেমন যেন ভাববার
জোড়ও পায় না।... মনের বিকল্প স্বর শোণ হ'য়ে আসে,
ইচ্ছাশক্তিও হ'য়ে আসে স্কিমিত।। হঠাৎ ইসাবেলা মাথা

একটু ভুলে স'রে আসে ওর দিকে। স্বপনের মাথাও বরা-
চানিতের মতন ওর দিকে চলে। ওদের গও প্রায় স্পর্শ
করে পরস্পরকে।...এবার স্বপন তার কটিবেদন ক'রে একটু
কাছে নেবে, আনে। চাঁদের আলো...চাঁদের আলো।
ইসাবেলার দৈব্য বিশ্রুপ রাউন্ডের মধ্যে যেন তার কণ্ঠ এমন
সুন্দর দেখায়। কী হৃদয়!...টিক টিকমিক টিকমিক
করছে যেন।

হঠাৎ স্বপন ফিরে ইসাবেলার ওষ্ঠাধরের 'পরে নত হয়।
মনে হয় সে-ও বুঝি...চায়। বোঁকের সঙ্গে কী করছে
ভেবে পায় না—অধর-সুন্দর হয়। ইসাবেলা তার কণ্ঠ
জড়িয়ে ধরে। স্বপন তাকে আরও একটু কাছে টেনে আনে।
এবার ইসাবেলাই তাকে চুম্বন করে—একটুখানি মাথা ভুলে।
অভাবনীয়।...স্বপনের প্রায় মনো মাগল বেঁচে ওঠে।...

ইসাবেলা এলিয়ে দেয় নিজেকে আরও একটু। হঠাৎ
স্বপনের ভাব হয়...আরও!...না...বদি ইসাবেলা কিছু ভাবে।
যদি একটুও আশ্রিত করে...তবে লজ্জার বে মাথাকাটা যাবে
তার? আশ্রিত।—পরিস্থার বেগে তে পর বিবেকের চিহ্নও
নেই আর...হতবুদ দেখা যায় শুধু একটি রঙিন উদগ্র
শূলিশ্রমণী বাসনা। সন্ধ্যা, আনা?...সব বুঝে গেছে। আছে
ফুঁপু একটা অত্যন্ত মনজানা কামনা...যে একান্ত অসম্ভব
হ'য়েই দেখা দিয়েছে। হায়রে—সে ভাবে—বেশল
যদি সঙ্গে একটা সন্ধ্যা-কানা ভগ্নও না ছাড়ার মতন পাশে
পাশে না থাকত। ভরসার অভাব যদি কিছুকণের জন্মও উবে
গেতে। যদি নিশ্চয় জানত—এগুলো গেলে প্রতিহত হ'তে
হবে না...

একটা অশ্পট অথচ নিশ্চিত চেতনা শুধু জাগে।—এ
টান বোঁ কিসের টান ভুল কববার কোনো পথই নেই বটে।
...অথচ তবু এক অশ্লীল মায়কতা তার বেহের রোমে রোমে
চারিয়ে যায়। লক্ষ তীক বিভ্রাৎকণা যার সঙ্গে জড়িয়ে—এক
তীর প্রতিহা...অথচ তাবের জাগার সঙ্গে ভগ্নপ্রোত হ'য়ে
ইয়েছে এক অল্পপন্ন ময়ূরুত কোমলতা...

বহির সঙ্গে মেশানো হৃদার প্রবাহ...সমুদ্রের তিগ
তারদের সঙ্গে নীল নিগুণ্ড। এক-একবার এক-একটা
সজাগ নিবেদ-বাণী গিয়েছে ওঠে...কিন্তু সে শুধু নিমেষের জল্পে।

ইসাবেলার হাত তার কণ্ঠবেদন করে বে এখনও!...
স্বপনের ভাবনা এলোমেলা হয়ে যায়।

সে ফিরে ইসাবেলাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে। তার
একটা চেতনা শুধু লোপ পায় না।—তার আর উচিত
অহুতিতের সমস্তা নেই, নেই কর্তব্যের শাসন, নেই বিবেকের
নিবেদ—আছে শুধু ভয়ের বাধা...বদি ইসাবেলা “না”
বলে।

বলবে কি সত্যিই?...না, স্বপনের রক্তের প্রতি অশ্রু বলে:
“ভয় কোনো না” কিন্তু তার কাপুক্ষ অহমিকা যে ভরসা
পায় না! বদি “না” বলে? আশ্রিত, কামনার এই
বে-আশ্র উদগ্রতার মধ্যেও অপমানিত হওয়া ভয়...প্রতিহত
হবার স্কৃতা...ও সে সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ সচেতনতা কি এতটুকুও
কাঁপু না হ'তে জানে না?

উচিত-অহুতিত, স্বনীতি-ছনীতি, সন্ধ্যা, বংশগৌরব,
বিবেক সব আশ্রিত হ'য়ে গেছে, আছে শুধু এক তীর
লজ্জাজড়িত আস—বদি ইসাবেলা তার অগ্রগারী কামনার
স্রোতকে হাটিয়ে দেয়—বদি এতটুকু স্কৃতার ছায়ায়
চোখের সামনে নিখিল যায় মুছে? অবশ্য এক-স্বপার
নাম যে আশ্রয়স্থান নয় তা সে স্পষ্টই দেখতে
পায়—এ যে শুধু বাইরের ঠাঁট বজার রাখবার প্রয়াস—
ফেরবার পর রাখার উৎকর্ষতা ও পরিস্কার বৃদ্ধিতে পারে...
কোন এত নিম্ন তার চিন্তে জাগে—যে, যে-খরস্রোতের মুখে
বড় বড় উচিত্য বৃত্তির বাধেও নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যায় তার
মানে একা বৃদ্ধিতে পারে এমন একটা স্কৃতি ভিনিয়—এই
ঠাঁট বজার রাখার জর্দন প্রয়াস? স্বপন তার এ তীর
অহুতিতকে কি কোনোদিন ভুলবে? অসম্ভব। সেদিনের
এ তো শুধু অহুতিই নয়—এ যে একটা উপলব্ধি—
তার স্বরূপের একটা উগ্র প্রতিবিম্ব তার চেতনার
পটভূমিকার। সে নিজেকে এতদিন বা ভেবেছে তার সঙ্গে
তার এ সহস্রাদীপ স্বরূপের মিল করতু? তার একমাত্র
ভয় যলকে বাবার ভয়? ইসাবেলা কী ভাবেই এই
ভয়? ছি।

স্বপনের মনে এসব চিন্তা...হুজুটা ও না...কামনা ও
স্কৃতা...অগ্রগতি ও চিন্তিয়ে আসা...ভিড় ক'রে আসে।

বরণদিগর সময়ের আরতমের কী বিপুল-প্রমাণ উল্টো-পাল্টা চিত্রার বান ডেকে কৃষ্ণকণ্ঠ বাধতে পারে তেবে বিম্বরও জাগে। সব ব্যাপারটা ঘটে যেতে বোধ হয় হুমিণিটু লাগে নি।...তার মনে সবে কোমর বাঁধে আর হি—এমন সময়ে যেন ইগাবেলা হঠাৎ ন'ড়ে ওঠে তার বাহরদ্বারের মধ্যে। তৎক্ষণাৎ সে ওকে বেন বিকিরিকা-ভাতের মতনই ছেড়ে দেয়। তার এত স্পষ্ট স্বরগ আছে এ জলাদীপ্ত কয়েক মিনিট বাপী ড্রামার প্রথম থেকে শেষ অঙ্কের বনিকাপতন অবধি।—তার চেতনার মধ্যে অতি-তীক্ষ্ণা হ'য়েছিল শুধু ছটি প্রণোদনা লুক্কাত ওড়। লুক্কাত—গেরে, ভয়—মেনের। এবং কী আশ্চর্য!—একটা বতই তীর হ'য়ে উঠেছিল অচ্যুতও তার সঙ্গে সমান কসমেই বেড়ে উঠেছিল। অবশ্য তার সঙ্গে একটা অপমানের লজ্জাও—কিন্তু এ লজ্জাও ছিল যেন তার চালচলি। "মূল কাঠামোটি ছিল আশ্চর্য—পছন্দ হ'য়ে চোখে সে মেথারী হারিয়ে যেন। হি। কোনো বিন কি সে কুলবে তার এ মানিকরা আশ্চ-অবিকার? জ্ঞানোদিনি কুলবে ইগাবেলাকে ছেড়ে দেবার পরই তার সে-দিনকার সেই তীর রক্ত আপেক—করতলগতকে ফসকে যেতে দেওয়ার দরপ সে লজ্জাপেশনীন অশ্রুশোচন। বিবেক? কর্তব্য, কাম, কামিকিকতার দাবী? হায় রে হায়। কতটুকু ওদের মূগা? ওরা এসেছিল বটে, কিন্তু কখন? যখন ভরাডুরি হ'য়ে গেছে—তখন। আশ্চর্যমেনের মাখন-তরশী যখন ডুবু-ডুবু তখন কি ওরা পেয়েো চৌকিবারের মতনই স'রে পাড়ায়, নি। ওরা কেমন? না জনকয়েক নিরীহ স্বপ্নবিশাসী ইন্টারন্যাশনালিষ্টের গুটিকয়েক বড় বড় কথার পতাকা-তর্জ্ঞন। হৃদয়ের গুরু, তার চলা যখন নামে ওদের সে-কত খেয়েছে কে? কবে? বেশ মনে পড়ে—পরে কি কি ঘটল: ইগাবেলা তার ছোট খোঁপাটি ত্রিক' ক'রে নিয়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস 'হাসি' মনোভাষী হ'য়ে হাঙ্গি রেখে একটু স'রে বসল। সে-হাসিও বৃষ্টি—বিশেষ ক'রে দীর্ঘনিশ্বাসটি—তার নুকে কী-রকম-বিধেছিল। তার মাথার মধ্যে অশ্রুশোচনার সঙ্গে সঙ্গে কি-একটা রোমও শিশি'র ক'রে উঠেছিল। হব না? তার ওরাধরে-তখনও ওও উচ্চ কামনার ছেঁওয়া লগে যে!

বিজ্ঞাতের প্রবাহ প্রতি ধমনীতে তখনও জমাট হ'য়ে যে! আর একবার কি—

কিন্তু আর কি হয়? প্রতি তরঙ্গেরই একটা উদান-পতন আছে—প্রতি অগমনীরই একটা নিষ্ফল তাল আছে—প্রতি পাওয়ারই একটা স্বকীয় মুহূর্ত আছে... মাহেজ লয়। পেতে হ'লে উঠি তখনই এই ছন্দটির সঙ্গে তালে তালে পাকলে ছুটতে হয়। তাল একটু কাটিতে দিয়েছে কি সমস্ত রূপিণীই হ'য়ে গেছে বেহেরা—বক্ষা। কোনো প্রোক্তকে তার নামার যুগে ধরতে যাওয়ার মতন বিভ্রম, আর নেই। না, যা গেছে সে কখনো আর ফেরে না।

মনে তার, ক্রমে ক্রমে ফোত নিবিড় হ'য়ে কালো হ'য়ে ওঠে।...

মূঢ়...মূঢ়...মূঢ়...মুগিয়ে বেনার সাথে তাকে বলেন কপুরুষ! আনা সাথে তাকে অজ্ঞা করতে আরম্ভ ক'রেছে।...সন্ধ্যা।—তার দ্বিতিকে সে ঠেলে দেয়। সন্ধ্যাকে তো সে জিতে নেয় নি, প'ড়ে পেয়েছে যে। সে এক্ষণে অব্যাহত। চাঙ টুকুই ব'সেছিল—বাধাবরা।...

ইগাবেলা আর একবার হঠাৎ তার দিকে চায়। ত্রিক' কি সেই মুহূর্তেই সেও তারার তার কাঠের, ওড়ের, উদাসের দিকে!...লজ্জায় তার কান গরম হ'য়ে ওঠে। ধরা প'ড়ে গেছে। সে যে এখানে কার জন্তে উঠে এটা ধরা প'ড়ে গেছে। কিন্তু ইগাবেলা আর উন্মুগ নয় এ-ও স্পষ্ট দেখতে পায়। কেন মুহূর্তের জন্তেও বিশ্বাস হ'য়ে প'ড়েছিল...? চাঙের মুহূর্তে তাকে প্রকটিক ক'রে দিল, না বিবেক! আচ্ছা, যদি সে-সময়ে আর একটু পৌরুষ তার যোগাতো তাহলে কী হ'ত...এরকম কত জরনাকরনাই না তার মনকে উত্তপা ক'রে তোলে।...হঠাৎ তার মনে ঠেলে ওঠে শুধু লজ্জা, ছায়াহীন, গুণ্ডনহীন, বিবসনা লজ্জা। ইগাবেলার চোখে তার স্বপ্ন প্রকাশ হ'য়ে পড়ল এই লজ্জা। চারিদিকে লজ্জার নিকম কালো উর্ধ্বাশা এ সাগরের কালোজলের সাথেই নেচে নেচে তাকে উপহাস করত থাকে।...

ইগাবেলা তার জানুয়ার কাঠের পরে কপাল রেখে চুপ ক'রে শুয়ে থাকে।...শ্বপন বাইরের দিকে চেয়ে। আর

তার দিকে একবারও তাকায় না। যদি তাকাতো গেসে দৃষ্টি বিনিময় হয়!...

আগখটা কেটে গেছে।... ইগাবেলা বৃষ্টি বুঝিয়ে প'ড়েছে। শ্বপনের মনে মানির পূর্ণমুগ জড়ো হেছে।...

আরও আধখটা।... এবার সে-মানি অবশ্যে পরিণত হ'য়েছে। কেমন একটা অসির্দেজ বিবাহ, সমস্ত চেতনার নিম্নাভিমুখি গতি।

কী? তার চরম স্বপ্নন হয় নি? কিন্তু তাতে সাধনা কোথায়? শুধু তো একটা মুহূর্তের ভুল বোঝার জন্তে, ওটা উন্মুগ বোঝের ছন্দের একটুখানি গরমিল হওয়ার জন্তেই সে বেঁচে গেল...শুধু যা থাকার ভয়ে তার গতিরোধ,—অপমানের অজুহাত।...

তারপরের ঘটনাগুলোও তার মনের পাখা বন্ধকে যেন কেটে কেটে ব'সে রয়েছে। পাখার না লুপ্ত হ'লে দাগ লুপ্ত হবে না। এক-একদিনের দ্বিতি এমনিই চির-মৃতন, চির-স্পষ্টই থাকে। শুধু কিসের তাকালেই সব মুটে ওঠে...যেন কাশ ঘটেছিল।...

বেশ মনে আছে—কী, ভাবে এক চিত্রার পরে অল্প চিন্তা ব'য়ে এসেছিল।...

ইগাবেলা তাকে মন্ম ভাবে? শুব মন্ম হয় ত ভাবে না—মুরোপীয়া মেয়েরা এ-সবকে খুব সীরাগা চোখে দেখে না যে শুনেছিল—অনেকবার। কিন্তু শু...তার চোখে তার যে গদবী ছিল হ'খটা আশে—জ'খটা পরে তার কতটুকু কাংসারবশে বজায় আছে? এর নাম যদি ভূমিকম্প না, তবে ভূমিকম্প কাকে বলে?

কিন্তু বন চেয়ে তাকে বিধেছিল বিবেক ব'লে তেমন কিছু নেই—অজ্ঞত: তার কাছে নেই—এই পরিণয় পেয়ে। তার আশ্রি অগত্যও যে ভয়...ও বুঠাই তাকে নানা স্বপ্নন থেকে বাঁচানো, এর সাধনা কোথায়! ছি...আর সে নিজেই আশ্রয়বাহী ব'লে-আহির ক'রে এসেছে সকলের সামনে?

মুহূর্তের উত্তেজনার চকিত কলোজ্জ্বলের সামনে আবারা সংসার, জগত সত্যতার আশ্রি, বংশগত আশ্র-স্বয়ম,

শিক্ষাগত কর্তব্যবোধ, বজুর বিশ্বাস রক্ষার দায়িত্ব—সব যে-বিসর্জন দিতে পারে...সে তেমন ক'রে বড়াই ক'রে বেড়ায় তার ভিতরকার দেখভ নিয়ে?

সামান্য স্বকণ্ঠ লুক্কতার কাছে বহু-আশা-সম্বিত মাখন যে হেলায় লুটিয়ে দিতে পারে, সে কোন্ লজ্জায় বৈদম্ব্য, সৌকুম্যতা প্রভৃতি দিয়ে লথা লথা বুলি—তার সন্দীপ দিক্ দিক্ ক'রে ওঠে!...

সে কালের প্রবাহ-সমুদ্রে সম্বিত হারিয়ে বসে আশ্ব-মানিতে।...

অপূরে মাসেলের অগণা দীপাবলি, স্বপন সেদিকে তাকায় ও না; মোটর বোট মন্থর হ'য়ে এসেছে, তার হ'শও নেই। হঠাৎ মাকে ওঠে কেনবের বিজলি বাতিজলে ওঠায়। দেখে ইগাবেলার নিমেষ' মুখ তার দিকে ঢেকে-হাসছে। তার মাথার হেই কালো কিনারাওগালা হাট। তার মোত রঙের রাউসের ওপর সেই সেগালী রঙের শালা। সেই আশেবার ইগাবেলই তো! স্বপন মুখ নীচ কক্কে।

ইগাবেলা হেসে বলে: "চলো মনামি, ছোট হুট-কেসটা আমিই নিতে পারব—তুমি শুধু আমার attache-কেসটা ধর। এ যে—"

চাঙ হোথাকের ওপর দাঁড়িয়ে—একটা আর্ক-ল্যাপ্পের নীচে।

ইগাবেলা লানিয়ে গিয়ে তাকে চুম্বন করে। চাঙ তাকে প্রতি-চুম্বন দেবে বাহ-পাশে আবদ্ধ ক'রে।

"সেহ, ইগাবে তোমার তরাককে দিয়ে যে কত নিশ্চিন্ত ছিলাম..." স্বপন চোখ নামিয়ে নেয়।

তিনজনে!...

ট্যাক্সিতে চড়ে তিনজনে চতাল হোটেল আলংকরের দিকে। ইগাবেলা মাঝে—ছপারে ওরা দুজন।

ইগাবেলা বলল: "প্যারিসের ট্রেব ক'টার?"

চাঙ বলল: "এখনো তিনখটা। কিন্তু প্যারিসে আমাদের বাধ্য হবে না।" স্বপন আশ্চর্য হ'য়ে বলল: "সে কি!"

চাঁৎ কুট্টিত হুয়ে বলল: “জানি স্বপন, তোমাকে একথা আমার জানানো উচিত ছিল, কিন্তু উপস্থিত ছুঁকটী বিশেষ কারণে পারিসে না যাওয়াই হির করতে হ’ল—তোমাকে জানানোর উপায় ছিল না। তার কারণেও সময়ে পেতে না।”

স্বপন বলল: “আমাকে জানানো না-জানানোর কথা বলছি না, কিন্তু তোমরা পারিসে যাবে না কেন জিজ্ঞাসা করছিলাম।”

চাঁৎ বলল: “ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই যে পারিসে এখন ইসার পক্ষে প্রীতিকর হুয়ে না, নিরাপদও না। তাছাড়া গুমা ও উয়েলা কালকের জারাজে লগুন রওনা হচ্ছে—ওদের ট্রাটে আমাদের থাকা সবকিছু দিয়ে স্থবির হুয়ে।”

স্বপন অব্যাহত হ’য়ে বার: “বলার ধরণটা তোমার ভারি মজার চাই। যেন সবই আমার জানা আছে।”

চাঁৎ কুট্টিত হুয়ে বলল: “মাপ কোরো স্বপন, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে ব্যাপারটা একটু খুলে বলার দরকার। চল বলছি সব।”

বলতে বলতে ট্যান্ডি হোটেল আংলোজের প্রকাণ্ড গেটের সামনেকার আলোকিত লাল কাঁকরের উপর দিয়ে লম্বা হুয়ে চুকল।

আলোচনা।...

চাঁৎ ও ইসাবেলার রুহৎ শরনক্ষেই ওরা স্বপনকে স্টানটেনে নিয়ে এল। চাঁৎ স্বপনের কাছে কোনো বর রিজার্ভ করে নি—বলি সে রাডের পাড়ীতেই পারিসে যায় কি অল্প কোথাও রওনা হয়?

স্বপন বেশোর্থ যাবে গর এক খটী ভেবে মন স্থির করতে পারেনি। বলল: “আমি কোনদিক পানে রওনা হব সে কথা থাক। তোমাদের ব্যাপারটাই তনি আগে।”

চাঁৎ একটু চুপ করে থাকল। তার মুখে উয়েলার পাতলা ছায়া—কিন্তু এত পাতলা যে খুব লক্ষ্য ক’রে না দেখলে ধরা যায় না। সে শান্ত হুয়েই বলতে লাগল: “ব্যাপারটা একটু খুলেই বলি তাহলে?” বলে ইসাবেলার বুকের দিকে তাকালো।

ইসাবেলা বুকুল, একটু অসহিষ্ণু হুয়ে বলল: “আমাকে অত কবকাহুয়ে মনে কেন কেন? আমি মুচ্ছা যাব না গো, যাব না।”

চাঁৎ বিধ্ব হেসে তার একখানি হাত নিম্নের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল: “সে আছে না ইসা—তবে আমি ভাবছিলাম আজ রাতে না বলে যদি কাল সকালে আলোচনা করা যায় খুব বেশি হয় কি? আজ কি তোমার বিশ্রাম দরকার নেই একটু? তোমাকে এত রাত্রি দেখাচ্ছে।”

ইসাবেলার মুখ কোমল হ’য়ে উঠল। সে বলল: “আমার ক্ষমা করো চাঁৎ। সত্যিই গর কয় খটী আমার যে অসহিষ্ণু ও উয়েগের মধ্যে কেটেছে।”

স্বপনের কানে বাজল। সে চোখ নিচু করে রইল।

চাঁৎ বলল: “তাই তো বলছিলাম ইসা—”

ইসাবেলা আবেদনের হুয়ে বলল: “না, আমি সব জুটুনিই শুভতে চাই, নইলে কি রাতে আমার ঘুম হবে মনে করো?”

স্বপন বলল: “তোমাকে কি কেউ অসহন করছেছিল?”

চাঁৎ বলল: “হাঁ—আর আমি তাকে এড়াবার কোনো উপায়ও করতে পারি নি। তারা ছুটেছিল মোটর সাইকেল—ভজন—মনে হ’ল স্প্যানিয়ার্ড।”

ইসাবেলা উদ্বিগ্ন হুয়ে বলল: “তারপর?”

চাঁৎ বলল: “ট্রিক ওমার বাড়ীতে চুকবার সময়ে দেখি তার গেটের সামনেকার একটি গাছের গুড়ির পেছনে একটি লোক।”

ইসাবেলা শিউরে উঠল: “নাগো! গুলি চুলি ছোড়ে নি তো?”

চাঁৎ বলল: “হয় তো ছুড়ত—যদি না ওমা ও উয়েলার গেটের কাছেই আমার কাছে অপেক্ষা করত। আমি তার ক’রে দিয়েছিলাম কিনা ট্রিক কখন পৌছল।”

ইসাবেলা আশ্চর্য হুয়ে বলল: “ভাগ্যাস।”

স্বপন বলল: “তারপর?”

চাঁৎ বলল: “তারপর সে বিস্তর আলোচনা, তর্কাতর্কি আমাদের ভিতরনে মিলে। সে অনেক কথা। সে সব বলার

কোনো মানেই নেই। তার ফলে যা স্থির করলাম—

অবজ্ঞা ইসাবেলা রাজি হ’লে তবে—তা এই যে ওদের মতেই আমাকে সার দিতে হ’ল অনেক ভেবে চিন্তে।”

স্বপন বলল: “কী মত?—যে তোমাদের পারিসে যাওয়া নিরাপদ হবে না এখন?”

চাঁৎ বলল: “শুভু তাই না। ইংলণ্ডে হঠাৎ রওনা হ’লে জেনেরাল সেরানোর লোকজনের খোঁজ পাওয়াও একটু শক্ত হবে।”

ইসাবেলা বলল: “তা, বটে।”

স্বপন বলল: “কিন্তু জেনেরাল সেরানোর গুণ কি লগুনেই নেই মনে করো?”

চাঁৎ বলল: “আছে, কিন্তু ওরা থবর রাখে যে আমার টাকার বোগাফ করতে পারিসে যাওয়া দরকার সব আগে। তাছাড়া পারিসে ট্রেন থেকে নামতে হবে তো? মার্শেল্‌সে আমরা কোথায় আছি কেউ জানে না—কিন্তু মার্শেল্‌স থেকে পারিসে যে যে ট্রেন পৌছয় ওরা সমস্ত নজরবন্দী ক’রে রাখবে।—সে সব ফাল্গুতো কথা থাক। মোট

কথাটা হচ্ছে এই যে লগুনে ওদের ইসট এন্ডের একটি ট্রাটে ওদের সঙ্গে ছ’ একমাস থাকা সব দিক দিয়েই স্থবির হবে—খরচের দিক দিয়েও।”

স্বপন একটুক্ষণ পরে বলল: “কিন্তু—টাকার দরকারের ক্ষেত্রে যদি—”

চাঁৎ হেসে বলল: “জানি বন্ধ, ধারের ক্ষেত্রে কথা নয়, ধার তুমিও দিতে পার, ম’সিয়ে বেনারও। কিন্তু ধারের সুবিধা এই যে শোধ দিতে হয়।” বলেই টপ ক’রে হুয় পর মনে নিয়ে বলল: “মনে কোরো, না ভাই তোমাকে আমি

পর মনে করি, বিধাস কোরো যদি ধারই করতাম ম’সিয়ে বেনারের কাছে হাত না পেতে তোমার কাছেই পাত তাম—বেশি অস্বস্তিতে। কিন্তু লগুনে ভিনচার মাস ওদের সঙ্গে থাকতে বিশেষ খরচ লাগবে না বলেই যে সেখানে থাকি তাও তো মনে। আসল কথা এই যে, লগুনের একটা মন্ত স্থবিরে—ভজনির রোমান্স ওখানে সেভাবে খটতে পারে না যেভাবে পারে কটিনেটে।”

স্বপন বলল: “মানে?”

চাঁৎ বলল: “মানেটা ট্রিক পরিষ্কার ক’রে বোঝানো

শক্ত। তবে কি জানো? চুখাঙ্ক লোকদের অনেক সময়ে থাকে বলে একটা। পরিমণ্ডল থাকবে জেনেরাল সেরানো—প্রমুখ মানুহ কটিনেটের পরিমণ্ডলে বসেটা সজ্জিত হ’তে পারেন তার বাইরে তেমনটাই না। ইংলণ্ডের অধঃহাওয়া ওঁ-পাঠের লোকের ট্রিক নয় না, এবং এটা ওরা সব চেয়ে বেশি জানে।”

বলে একটু হেসে বলল: “শোনো নি এক—একটা বাড়ীর এক এক রকম মেজাজ আছে? দুহুড়ে বাড়ী, রাস্তায়ে বাড়ী, আশ্চর্য্যাময় বাড়ী—সমৃদ্ধি? এ-ও তেমন।

কটিনেটে সেরানোদের মতন মাকড়সার জাল বিস্তার ক’রে ব’সে থাকেন—আর যুগুগের জুকালো রোমান্সের আহুৎশোর ফলে ব’সে-থাকা সহজ হয়। মাকড়সার জালের উপশাতি অসুখুজ ও বটে—কেননা ওদের গের চক্কাহুজাল একটু নিমাত বায়গায়ই কমে ভালো। আর কটিনেটের চেয়ে ইংলণ্ডে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার, বেপারোয়া ভাবের হাওয়া একটু বেশি। তবে হয়ত কথাগুলো একটু ধোঁরাটে শোনালে—”

স্বপন বলল: “না, বুকেছি। আর কথাটা ট্রিকই মনে হচ্ছে।”

ইসাবেলা বলল: “গ্রাস থেকে মার্শেল্‌সে এলে কী ক’রে? ওরা পিছু নেনি?”

চাঁৎ হেসে বলল: “হঠাৎ একটা স্থবির হ’য়ে গেল। উয়েলার এক বন্ধুর মোটর বোট আছে—তিনি টুক ক’রে নিয়ে এলেন। ওদের চোখে এমন খুশা দিচ্ছে—বলে চাঁৎ পরন তৃষ্ণির হাসি হাসল—চাপাহুয়ে। তার মুখে খানিক আগের উয়েগের বাপও নেই। ট্রিক মনে শিশুর চিঠাহীন খুশি।

স্বপন ও মুহূহুয়ে বলল: “এটা বোধ হয় ওরা আশা করেনি?”

চাঁৎ বলল: “না।”

ইসাবেলা বলল: “আমরা কি তবে কালই রওনা হ’ব নাকি লগুনে?”

চাঁৎ বলল: “হ্যাঁ—যদি অবজ্ঞা তোমার অপত্তি না থাকে।”

ইসাবেলা বলল: “আগতি? বরং লগুন এখনে চের

বেশি ভালো লাগবে। লগুন আমার কাছে প্রায় নুতন যে।
পারিস তো কতবার গিয়েছি।

চাংয়ের চোখ চুটি উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সে ইসাবেলার
হাতে একটু মিষ্টি চাপড় দিয়ে বলল: "Merci, ma
chérie" বলেই স্বপনের দিকে চেয়ে বলল: "কিন্তু এতক্ষণ
আমাদের কথাই হচ্ছে কেবল। তোমার কথা কেউ
ভাবছিই না।"

স্বপনের ভার্যাকান্ত মনে এতদূর যেন কেমন বিশ্বাস বাজল।
সে তবু ভোর করে হাসি টেনে এনে বলল: "আমার কথা
তোমার দরকার কি বলে?—আমার মুগের ওপর তো আর
কোনো দণ্ডমুগের কর্তা পুরস্কার ঘোষণা করেন নি।"

ইসাবেলা বলল: "কিন্তু তুমি কী করবে? পারিসে
এভাবে, না নৌয়ে বিয়ের বাবে?"

স্বপন হঠাৎ বলল: "আমি আজ রাত সাড়ে বারটার চড়ব
একটু জাহাজে।"

চাং ও ইসাবেলা সম্বন্ধে তার মুখের দিকে তাকালো।
স্বপন তাদের প্রাণোত্ত্বক দৃষ্টির উত্তর দিল শুধু একটু
হেসে।

ইসাবেলা বলল: "কোথায় যাব সে জাহাজ?"

চাং বলল: "অবশ্য যদি বলতে বাধ্য কিছু না
থাকে—"

স্বপন বলল: "না না বাধ্য কি? আমি কারণে
বেড়াতে যাবো হির করে বেসেছি হঠাৎ।"

ইসাবেলা আশ্চর্যবোধে বলল: "কই, এ কথা তো
বলো নি আমরা?"

চাং ঠাট্টার স্বরে বলল: "সব কথাই যে তোমাকে
বলতে হবে ওঁর—এর মানে কী? তুমিই বা ওঁকে নিজের
সবছর কী এমন ঘনিষ্ঠ কথা বলেছ তুমি।"

ইসাবেলা রুবে উঠে বলল: "সব সময়েই কি ঘনিষ্ঠ কথা
বলতে তবে ঘনিষ্ঠ কথা শোনার অধিকারী হ'তে হয় নাকি?"

চাং হাসল: "তা বটে।"

ইসাবেলা তার পানে চলে কটাক্ষ করে বলল: "কিন্তু
এদর বলছি—তর্কজ্ঞানে—academically—মনে ধোঁবে।
কারণ আসলে স্বপনকে যে ঘনিষ্ঠ কথা কিছু বলিনি তা নয়।

বিবাস না হয় ওকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখনা।" বলে
স্বপনের দিকে চেয়ে মুখ মুখ হাসতে লাগল।...

স্বপন তার দৃষ্টি এড়িয়ে চাংয়ের দিকে তাকিয়ে বলল:
"হ্যাঁ চাং, ঘনিষ্ঠতা আমাদের মধ্যে হ'য়েছে বই কি।
ইসাবেল আমাকে ওর জীবনের অনেক কথাই আজ বলেছে—
একলা পেয়ে। ওর মনটা আজ যে-উচ্চ পঙ্খায় বাঁধা ছিল!
উঃ!" বলে হাসার চেষ্টা পেল।

চাং হিড় হুরে বলল: "ওরে ছুট্টা! আমাকে লুকিয়ে
বুনি বনলক বন্ধুর অন্তরঙ্গ্য হ'য়ে ওঁটা হয়?"

এবার ইসাবেলা স্বপনের দিকে চেয়েই দ্বিধা লাগ হ'য়ে
উঠল। কিন্তু সে মুহূর্তের জল্পে। তার পরেই অত্যন্ত
লম্বা স্বরে বলল: "আমি বনলক বন্ধুর সঙ্গে মুহূর্তে প্রীতির
মান্যাবল্য করতে না পারলে কি তুমি আমি এ অবস্থার পড়ার
স্বযোগ পেতাম গো শিররিজ?"

এই সময়ে তাদের ভ্যালটে তিন পেয়াশা কফি এনে
হাজির।

স্বপন পেয়াশার চুমুক দিয়ে বলল: "লগুন তোমাদের
টিকনা জানিয়া কিছ। তোমাদের বড় ট্রাফটা পারিস
থেকে পাঠিয়ে দিতে হবে।"

চাং বলল: "হ্যাঁ, সে তো আমরা কাল ভোরেই
মাদ্রুগের গুদাম ঘর থেকে খালাস ক'রে নিতে পারি—
তুমি রিসিটা শুধু আমাকে বিদেই চলকে।"

স্বপন অপ্রতিভ হ'য়ে বলল: "ওঁহো—সে কথা
আমার খেয়াল হয় নি বটে।"

বলেই ব্যাগ থেকে রিসিটাটার বার ক'রে তার হাতে দিল।

চাং বলল: "তোমার জাহাজে কি আজ রাত্রেই
উঠতে হবে?"

স্বপন বলল: "হ্যাঁ।"

ইসাবেলা বলল: "কখন?"

স্বপন বলল: "সময় আছে সাড়ে বারটার পরেও
উঠতে দেবে প্রথম শ্রেণীর পাসেজারকে।"

কয়েক সেকেন্ড কেউ কথা বলে না।

ইসাবেলা তার কফির পেয়ালা নিশেধ করে বলল:
"আর আমাদের জাহাজ ছাড়বে কাল কখন? সকালবেলা?"

চাং বলল: "না, বিকেল চারটের। কিন্তু এখন
তোমার তত্বে গেলে কেমন হয়? যে রাস্তা দেখাচ্ছে।"

স্বপন উঠে দাড়াল: "আমি তাহ'লে চলি এখন।"

চাং বলল: "এখনো তো হাতে প্রায় ছয়টা সময় আছে
বললে—চল না একটু গরু করি দ্রুতনে মিলে। কতদিন
পরে আবার দেখা হবে।"

স্বপন প্রাণোত্ত্বক ভাবে ইসাবেলের দিকে তাকাতেই
চাং বলল: "ও এখন ঘুমুবে কাঠের মতন পাশ না থিরে।
ওকে জানো না তো।"

ইসা হাসল, বলল: "কিন্তু স্বপনই যে এখন ঘুমুতে চায়
না জানলে কী করে?"

স্বপন বলল: "আমি মোটেই রাস্তা নই—কেবল তাহ'লে
একটা ট্রাফি মজবু রাখতে বলতে হয় বারটা নাগার।"

চাং "আমি এক্ষণি সব ঠিক ক'রে আসছি" বলেই
জন্তবুয়ে সরিয়ে গেল।

স্বপনের বুকের রক্ত এমন অস্বস্তিকর তালে বইতে
পালে।... সে ইসাবেলার মুখের দিকে তাকাতে না পেয়ে
উঠে জানালার দিকে অগ্রসর হয়। ইসা তক্ষণি তার হাত
ধ'রে এনে তাদের কোনোর অস্টোনামিটে বসিয়ে অত্যন্ত
সহজস্বরে বলল: "তাহ'লে আজকেই বিদায়।"

সহজস্বরেও সংকোচ। স্বপন একটু হেসে বলল:
"আমাদের মতন ধর-ধড়িয়ে-পাওয়া বন্ধুকে পরের হাতে
সিঁপে বেগায়ে কি বিদায় বলে?"

ইসাবেলা একটু চুপ ক'রে যেতে তার দিকে হিরনেজে
চেয়ে বলল: "একবার উত্তর দিও, কিন্তু চিঠিতে—অবশ্য
বরি অস্বস্তি দাও।"

স্বপন স্পষ্ট হয়, বলল: "ইসাবেল, তোমার চিঠি যে
আমার কাছে কামা তা কি ভরসা দিয়ে বলতে হবে?"

ইসাবেলা দৃঢ়বাদ দিয়ে তার একটি হাত নিজের হাতের
মধ্যে টেনে নিয়ে বলল: "আরও একটি অনুরোধ আছে।
কিন্তু সে বিষয়ে একটু ভরসা সত্যিই চাই।"

• "কী?"

—"আমাকে কমা করতে পারবে কী?—মুখের কমা
নই—মনের?"

স্বপন বিপন্নমুখে বলল: "কমা? বাঃ। কিসের জল্পে?
যেন তুমি আমার কাছে কতই অপরাধ ক'রেছ।"

ইসাবেলা পানিক তার মুখের দিকে ক্ষেত্র তাকিয়ে থাকে।
পরে শুধু বলল: "করি নি?"

স্বপনের বুকের রক্ত আরও উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, বলল:
"বাঃ। কিসের জল্পে?"

—"তাও কি বলতে হবে?"
স্বপন রান হেসে বলল: "ইসাবেলা, সেজন্তে দোষ তো
তোমার নয়।"

ইসাবেলা একটু চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ বলল: "ভুল
বল ভুল। আমি নিজে নারী, জানি তো। এসব ক্ষেত্রে
পুরুষের সাধা কি এগোয়া যদি নারীর অসুখ ইসারা না থাকে।
স্বপন বিম্বিত হয় তার এ-টোনে। কিন্তু কী বলবে ভেবেই
পার না।

ইসাবেলা বলল: "তোমার বসিনি যে আমি
নিজেই কী জানি সবচেয়ে কম? অন্তত সেটা যে একটা জ
ছিল না তার প্রমাণ তো হাতে হাতে গেলে?"

স্বপন তবুও কথা কয় না।

মুহূর্তে ইসাবেলার কণ্ঠে বেজে ওঠে ছায়ারান অপরাহ্নের
স্বর। সে বলল: "আমি সত্যিই আশা। উজ্জ্বল স্বপন।
একদিন কি চারেরের মেঘদণ্ড পড়ে ওঠে?"

—"তুমি সব সোমটাই নিজের খাড়ে নিচ্ছ।"

—"না স্বপন। আমি জানি এ উগ্র আবহের টান কী
প্রবলভাবে টানে আমাদেরকে। কেউ এর হাত থেকে
নিষ্কৃতি পেতে পারে না। মানি—বন্ধুর মনই এর গতি...
যেমন অকারণ ওঠে তেমনি অকারণই মেঝায়। কিন্তু
যতক্ষণ যাবে ততক্ষণ তো সে দ্বন্দ্বার।"

স্বপন একটু অবহা হাসে, বলল: "কিন্তু কড় তো
একবারে অকারণ ওঠে না ইসাবেল। শুনি বাবু চাপ
একবারগা কন্ডে তবেই আর এক ব্যাগা থেকে হাওয়ার
পাহাড় ভেঙে পড়ে। আমার সময়ে সময়ে মনে হয়, নিজের
আমরা অন্তরে অন্তরে তেমন কোনো বাসনাভ্রুঙ্ক গুহা
রচি যাতে বাইরের এই সব মোহ, এই সব তোলাপাড় ভেঙে
পড়বার স্বযোগ পায়।"

—“কিছু পেতে চাইছিলেন কেন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?”

—“এখন পারো। ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয় অবিশ্যি। ওহো! আমাকে বলল লওনে কোন এক ‘এক্সেসিটিভ ক্লাবের’ কে এক পাগুরা সমস্ত ধার বুঝে তাকে অর্ডার দিয়েছে সনাতন সংস্কারকে ‘প্রথম প্রাশ্নেতনে টেনে নামানো’—এই বিষয়ে একটি ছবি চাই। পুরস্কার এত বেশি যে আমি একবার চেষ্টা করে দেব বৈবেছি। তাই একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা চাইলাম।’ অশা করি এতজ্ঞে কিছু মনে কর নি।”

শব্দন ঈর্ষা শুক হুরে বলল: “না মনে কিছু করি নি—তবে—মানে আমাকে এ ভাবে পরখ না করে যদি একটি কল্পনাকে রাশ ছেড়ে দিতে তাহলেও হয়ত ছবিতা পূর্ব নিরসন হ’ত না।”

চাঁও হেসে তার টেবিলের ওপর দৃষ্টি হাতটির ‘পরে তার করতল রেখে ঈর্ষা অমৃতত্ব হুরে বলল: “আমায় এতজ্ঞে কমা কোনো বদ্ধ। আমি স্বীকার করি এতে তোমার লাগতে পারে। কিন্তু কি জানো? কল্পনা অতি স্বকর জিনিষ হলেও তুমি যতবার ভাবি না থাকলে সে ভর করে কার ওপর বসে তো? রঙীন লাঠিমের মতনই হয়ে পাড়ায় নাকি—বানিকটা?”

শব্দনের ক্ষোভ কেটে গেল। সে হেসে বলল: “মানি পছন্ডি না মনু।”

—“নতুন মাটেই না। আমাদের ওপরে এরকম প্রত্যক্ষ-দর্শন শিল্পীরা প্রায়ই বেঁচে। তোমাকে একদিন বিখ্যাত জাপানি চিত্রী কুমিসাওয়ার নাম বলি নি?”

শব্দন হেসে বলল “না তো। কী করতেন তিনি? স্বন্দরী গাইশা মেয়ের কাঁদে-প্রিয়তম বন্ধকে ফেলে উজ্জ্বল বাওয়ার ছবি আঁকতেন?”

চাঁও দুব উভোগে কলল: “অতঃপর না।—তবে—না-ই বা বলি কী করে। তাঁর স্নোকে দেখিয়েছিলেন প্রচণ্ড ভয় নিয়ে ডাকাত বেজে ভয় পাওয়ার ছবি আঁকতে চেষ্টা।”

—“এ-ও কি ভালো করেছিলেন বলতে হবে?”

—“নতুন কেন?”

—“না:। কেন জিজ্ঞাসা করছ? মানুষের জীবন নিয়ে খেলা?”

—“আট কি খেলা?”

শব্দন একটি অপ্রতিভহুরে বলল: “না-ই হ’ল। কিন্তু তাঁর স্নো যদি ভয় ভয় পাওয়ার পরে হার্ট ফেলই করত?”

চাঁও ভাবিলোয় হুরে বলল: “কী এমন তাতে জগতের কতি হ’ত তুমি? Wife may come and wife may go but art goes on for ever.”

শব্দন একটি কুহ হুরে বলল: “ঠাট্টা করছ তুমি আটের ছলে।”

চাঁও বিম্বিত হুরে বলল: “আট নিয়ে আমি কখনো ঠাট্টা করি?”

—“শুধু wife নিয়ে কর বুলি?”

—“তাঁ করি—বহিও একেত্রে করি নি। আমার সত্যিই মনে হয় মাগাম কুমিসাওয়া ভয় পেয়ে মাগা গেলে হয়ত ‘অমর হ’তেন—কুমিসাওয়া এমন একটি ছবি আঁকতেন যত্না-শক্তিভার। অমৃত: আমাদের ঐতিহ্যের খাবিরে, আটের ভঞ্জে জীবন দেওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয়।”

—“সত্যিই কেউ দেয় দেখাতে পারো?” শব্দনের টোনে তর্কের স্বর বাজল।

—“হসাকাওয়ার নাম শোনো নি—বিনি একটি বিখ্যাত ছবি বাঁচাবার জগে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন?”

—“সত্যি, না শুভব?”

চাঁও হালে: “আটকে তুমি এখানে ভালোবাসতে পারো নি শব্দন থাক কোনো। কিন্তু এ-ভালোবাসা আমাদের তেঁমনি প্রাকৃতিক যেমন হয়ত তোমাদের চেয়েদের মধ্যে পূজাপার্বণকে ভালোবাসা। টাইকো-রাভের সেনাপতিরা যুদ্ধজয়ের ভঞ্জে সত্যিই জামিজমা বংশিশ না নিয়ে ভালো ছবি বংশিশ চাইতো। না, এ-ও শুভব বলে অবিশ্বাস করব?”

—“একথা বিশ্বাস হয়—কিন্তু আমি হসাকাওয়ারই আটের ভঞ্জে প্রাণ দেওয়ার কথা বলছিলাম।”

—“কিন্তু তিনি সত্যিই দিয়েছিলেন যে। তাঁর প্রসাদে হঠাৎ একবার আশুন লাগে। তার মধ্যে ছিল সেসনের

‘ধারমা’ নামে একটি ছবি। আশুন থেকে তাকে বাঁচাবার আর কোনো উপায় না দেখে তিনি ততোয়াল দিয়ে নিজের দেহ চিরে ছবিতা পুরে ফেলেন। আশুন নিতলে দেখা গেল হসাকাওয়ার দক্ষ দেহের মধ্যে ছবিতা অক্ষত আছে। বলবে কি কাভটা মন করেছিলেন?”

শব্দন উজ্জ্বল হুরে বলল: “এ আমার কাছে কিন্তু বড় বেশি বাড়াবাড়ি ঢেকে চাঁও, মাফ করো।

চাঁও শ্রোণেনের চুম্ব দিয়ে মিথ্যে হালে: “শব্দন, দরদের জয়গায় তর্ক চলে না:। কেবল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি: তোমাদের দেশে শুনেছি বিব্রহ বাঁচাতে গিয়ে ভক্ত প্রাণ দেয়। থাকেও কি দূর্বে কুসংসারী ব’লে?”

—“নিশ্চয়।”

—“আমি দূর্ব না কিন্তু। এ ধূলোর জীবনে শব্দন, প্রাণ কি এতই মহাব্য? না, পদে পদে তাকে আগলে থাকলে তাকে বাঁচানোই সার্থক হয়?”

—“তার মানে মানুষকে তুমি ভালোবাসো না।”

—“মানুষকে বাদি, কিন্তু মানুষকে ভাইয়ে রাখার প্রবৃত্তিকে নয়। তাইতো আমরা—চৈনিকরা—Hygeia-কে গ্রীকদের মতন দেবতার বৈদীতে বসাতে পারি না—

সানিটেশনের দামায়া ব্যক্তিই জীবনের দয় সৌম্যোধ্য বানিশকে জুড়িয়ে দিতে পারি না। আমরা বলি—রোগ হয় দে-ও না—কিন্তু জ্ঞাত্য জনসনের মতন হিপোশটিমাসের স্থান্য বা দীর্ঘায়ুতাকে যেন জীবনপথের পাশের না করি।”

শব্দন একটি শাঙ হুরে বলল: “এতে আমারও আগন্তি নেই। কিন্তু তাই বলে কি বস্বে জীবনের চেয়ে আট বড়?”

—“দেব জীবনের চেয়ে না। লাখে একজন মানুষ মিলতে পারে—যেমন ধর বৃষ্টি, লাওংসে, সোশি বা হুইইংসে—

লৈন বীদর জীবনের দাম সিনটেষ্ট হু মাঝকিনি বা কোরিদের ছাবর চেয়েও চেয়ে বেশি। কিন্তু ব্যতিক্রমের প্রাণ্য যে সৌরব, তা কি সাধারণ মানুষ দাবী করতে পারে কখনো? ধর না কেন ঐ লর্ড হসাকাওয়ারই দৃষ্টান্ত।

উনি যেতে থেকে যদি সেসনের ছবিতা পড়ে যেত তাহলে গুঁর অলস চা-খেয়ে বেঁচে থাকার জীবন দিয়ে কি সে ক্ষতির পূরণ হ’ত বলতে চাঁও?”

শব্দন একটি ভেবে বলে: “কিন্তু এ-প্রশ্ন কি স্বভাবই মনে ওঠে না চাঁও যে ছবির ‘জন্মেই মানুষ, না মানুষের জন্মে ছবি?”

চাঁও শ্রোণেনের বোতল থেকে আর একটি শ্রোণেন ঢেলে নিয়ে বলে: “এর উত্তর দিতে হলে প্যারাদব্বেই দিতে হবে। বলতে হবে মানুষকে মানুষ বলি তখনই যখন সে একটু-না-একটু ‘আমাহুয় হ’য়ে ওঠে।”

শব্দনের হঠাৎ দ্বয়ের কোন একটা তত্ত্বা বেজে ওঠে: ‘অকারণ প্রীত হ’য়ে বলে: “একথায় এদেশের স্বরাব্দ স্নোকে হাস্বে কিন্তু। এরা চায় শুধু হিউমানিটির ওয়ানান করতে।”

চাঁও হাসে। শ্রোণেনের গেলাসটি হাতে দোলাতে দোলাতে বলে: “লাওংসে ব’লে গেছেন একটি লাখ কথার এক কথা:

পরম পূর্ব ‘টাও’ যারে কহ,—তনি তার বখী স্বখেয়ে হালে?—
হ’ত সে কি ‘টাও’—তনি নাহি যদি হাসিত স্বকন কলোজ্ঞানে?”

আজ চাটের মুখ গুলে গেছে—অকম্বল। শব্দন কখনো তাকে নিজেকে কখনো বস্বে শুনেছে বটে—কিন্তু এতটা মন খোলা বেগরোয়া ভাবে কখনো না। তার মনটা বীরে বীরে প্রসন্ন হ’য়ে ওঠে। তার তর্কের পিচিটটা বীরে বীরে উবে যায়।

সে হেসে বলে: “এ-ধরনের কথায় আমাদের দেশের কোলিঙ্গ-পখীরাও সাড়া মেনে চান। কিন্তু এদেশে এরপের আটটিচিডছাড়া এরা শুধু একটা কথা বলে উড়িয়ে বের—
highbrow. এরা বলে দ্রুতচটা মানুষের কীটিনে কী করব যদি দেশেজোড়া রটে হাফাকার?”

* চাঁও অবজায় হাসি হেসে বকে: “রুরোপের শূদ্রস্বায়ীর কথা আর বোলো না—যাকে কুহু মিং ব’লে আমাদের এক

তিষ্ঠাশীল বিশ্বাস রুরোপ-অভিজ্ঞ চৈনিক হুই L’adoration de la plobe বলে বিদ্রূপ করেছেন।” বলে শ্রোণেনের গোলাসে চুম্ব দিয়ে বলে: “সেমানদের পরত হ’য়েছিল মানুষকে দাস করে—তাঁদের বংশধর পাশ্চাত্যের সমাধি হবে—

তাকে উপাধি করে। অথচ আমাদের আইডোলটর বুলো এমন যুরোপ—যে নিজে হচ্ছে Titanic idolator of vulgarity masquading as Humanity with a capital H."

চাঙের ওটপ্রান্তে তিক্ততার আমেজ। ওর মনের ছায়ার জন্মই যুগছে যে ও আচ্ছ!

স্বপনের মন সাড়া দেয়, আবার বেধও না। সে বলে: "কিন্তু চাং, মানুষকে কি শুণ্ড তার ভরকতক বড় মানুষ দিয়েই বিচার করবে? শুণ্ড কীভাবে দিয়ে? ভুলো না যে নগণ্যদের ব'নের উপরেই গোয়ার দাঁড়িয়ে থাকেন।"

চাঙের কণ্ঠে বৃহত্তর আবার সেই শিখ্র হ্রস্ব কুটে ওঠে, বলে: "তুমি আমাকে একটু ভুল বুঝেছ স্বপন। আমি জীবনকে কীভাবে দিয়ে বিচার করি না; তা যদি করতাম কোনোদিনই তাহলে আমি মাঝে মাঝে ইয়াংসেনকে তাঁর জগদ্বিখ্যাত স্বামীর সমকক্ষ বলতাম না কেনে শুনে যে তাঁর নেপথ্য ভাবনের মূল্যকে কোনো কীভাবে দিয়েই মাপা চলে না।"

—"নাগাম সানু ইয়াংসেন? তাকে তুমি জানো না কি?"

—"হী। আর মনে করি সানু ইয়াংসেনের শক্তি ছিলেন—এই অসম্ভবতা নারীটি। ইনি প্রথমে হ'ন তাঁর সেক্রেটারী ও পরে স্ত্রী—তাঁর বিপদের চরম মুহুর্তে—যখন তিনি দেশ থেকে নির্ধারিত। আজীবন এ মহীয়সী নারী স্বামীর আদরের আগুন নিজেদের শক্তির ইন্ধন দিয়েই সে-নিখায়ে অনির্ধারিত রেখে গিয়েছেন। কিন্তু, লোকের শিখার আলো-কেই দেখে স্বপন—সমিধুকে চৌধুর দেয় ক'জন?"

স্বপন চুপ করে রইল।
চাং বলতে লাগল: "এক্ষে হয় ত লোকের কোনোদিনই জানবে না—কিন্তু তাতে করে তাঁর মহত্বের মধ্যসা এতদূরও কমে না। তাঁকে একদিন একথা মুখের উপরই বলেছিলাম কেনেভাতো।"

—"কেনেভাতো?"

—"হী, স্বামীর সূতরা পরে এই অসামান্য নারী চীনদেশকে প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন বললেই হয়—স্বামীর আশ্রয়কে ছাড়তে চান না বলে। ভয় কাকে বলে,

মিথ্যা কাকে বলে, কপটতা কাকে বলে ইনি জানেন না। এখন তিনি লগুনে—যদি ও-অঞ্চলে আসতে,—আলাপ করিয়ে দিতাম। তবে মুখিল এই আলাপ করে এর মাহিমা বোঝা শক্ত।"

—"কেন?"

—"হীনি অনেকটা তোমাদের দেশের মেয়েদের মতনই। লজ্জাকে ইনি বিশ্বাস করেন—যুরোপের মেয়েরা থাকে বহুদিন জলাঞ্জলি দিয়েছে।"

স্বপন বিম্বিত হয়ে তার দিকে তাকায়।

চাং হাসে: "একটু আশ্চর্য হচ্ছ, না? আশ্চর্য হবার কথা বটে, কারণ আমি পাশ্চাত্য নারীর লজ্জাহীন স্বাবলম্বিতার ও-ভক্ত, আবার প্রাচ্য নারীর লজ্জাবতী স্ত্রীমন্ডল ও ভক্ত থাকে আমার বলি yuh sien."

স্বপন বলে: "হী ওকণ্ঠা ইয়াংসেনা মাঝে মাঝে বলে বটে।"

চাং হেসে বলে: "বলে যে না? ওকে আমি যে ঐ শুণ্ডটির অভাবের জন্তে প্রায়ই ক্ষোভা!—যেমন ম'সিয়ে বেনার তোমার ক্ষোভোত্তম আনার সম্পর্কে পুঙ্খানু পুঙ্খানু নির্ভীকতা ও insouciance-এর অভাব নিয়েও।"

স্বপন একটু অপ্রতিভ হয়েও হেসে বলে: "কিন্তু একথা তোমায় বল ক'বে?"

—"কে বলো তুমি?"

—"চিঠি লিখবেছন বৃদ্ধি?"

—"না টেলিফোনে বলছিলাম।"

—"টেলিফোনে? কখন?"

—"এই ষষ্ঠা তিনেক আগে। এখানে এসেই তাঁর সঙ্গে প্রায় পনের কুড়ি মিনিট কথাবার্তা কই—ইংলণ্ডে যাওয়া এখন উচিত কি না জিজ্ঞাসা করত। তিনি সেই স্রোতের আনার সম্বন্ধেও বেশ ছ'কথা বলে নিসেন।"

স্বপনের কর্ণধূলি উষ্ম হয়ে ওঠে। বলে: "আমাকে কিছু বলতে বললেন না কি?"

চাঙের চোঁটের প্রান্তে হাসি ফুটে ওঠে: "বুঝক কি অতই কাঁচা উকীল মনে কর তুমি? তিনি এমনভাবে কথা বললেন যাতে আনার মধ্যসা খোলা আনা বজায় থাকে—

অথচ তিনি নিজের জান্তনে আমি এসব তোমার কাছে তুলবই।"

—"কী বললেন?"

—"কী আর বলবেন বল? আমার নিঃসহায়তার ও সাহসের কথা। ইঙ্গিতে একটু ভাষা জানালেন—যদি তার কোনো শুভাঙ্গী বন্ধু থাকত হাতের কাছে।—এমন বন্ধু যে সর্বদা তার নিজের কথাই ভাবে না—অপরের কথাও একটু ভাবে।"

স্বপন চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। পরে বলল: "আর কী বললেন?"

চাং বলল: "শেখটা একটু সিনাকি জানি হেসে বললেন।—তবে এ হচ্ছে আদার তাও আমি জানি চাং। লগত যেমন উপাধানে গড়া তেমনই ভাবেই এটা যে 'সাড়া' দেবে। গাফিলি হয় তখনই—যখন মানুষের মনে কি হওয়া উচিত সেটার ছবি একটু বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নইলে চিহ্নদিন স্বপনের পেলব রেখাপায়ে ছেড়ে বাস্তবের স্নানহস্তাবলোপকেই মানুষ একান্ত করে জানত ও বেশ হিসেবী হয়ে স্ফূর্তি হয়ে দিনগত পাণ্ডুর করে কোনোমতপ্রকারে স্বপ্নমুখের তাসের-প্রাণাদ গড়তে গড়তেই যুগের শরীর মূলোতে সমর্থন করব।"

স্বপন ঈষৎ তিক্ত হেসে বলে: "আচ্ছা চাং, তোমার কি মনে হয় আমার প্রতি এই কটাক করে তিনি হৃদয়িত করলেন? আমার স্বক্তি আমি বইতে বাধ্য—এ কোন আদর্শের বর্ণনায় আছে লোনা আছে শুনি?"

চাং তার হাতের 'পরে হাত মূলোতে মূলোতে কোমল করে বলল: "তাঁকে ভুল বুঝো না ভাই। তিনি আমাকে ভালোবাসেন, তাকে যে-কোনো উপায়ে ছোট্ট বিচারে চান—বরফার হয় ত নৈতিকতা বিসর্জন দিয়েও—কারণ জানো তো—ও-বস্তুটি তিনি একদম মানেন না। তার গুণের দেখ, তোমাকেও তিনি অস্থিরের সঙ্গে দেখ করেন। মানুষ যেখান থেকে কবে একবারে নিঃস্বার্থ হয় সেটা? সে চায় বৈ কি সে তার নিজের স্বক্তি যোগ্যদাদ একটু একটু বইবে—সবকে মগো: মুখে হয়ত একথা স্বীকার করে না—কিন্তু দাবী বাধ্যতার মধ্যে অকথিত অক্ষত দাবী ত, কিছু কম জোলায় নয় তাই।"

স্বপন একটু নরম হয়ে বলে: "তিনি কি এ-দরপের কোনো ইঙ্গিত দিলেন না কি?"

চাং হেসে বলে: "পাগল! এ সব ক্ষেত্রে: মানুষ কি খুলে বলে কখনো কোনো কথা? তবু মনের গোপন প্রত্যাশার ভাব তো ভাই শুণ্ড স্বপের আদর্শের কথা তেবে কাটিয়ে ওঠা যায় না। কত রকমের দাবী পাওয়া, প্রবণতা, গোপন বাসনা যে আমাদের মনের মধ্যে জড়ি মেরে থাকে—জানোই তো। তারা কোনো হঠাৎ পোরাচ চাইবে না একটু? বাঃ।"

স্বপন চুপ করে রইল।

চাং বলল: "ভাইতো আমি ম'সিয়ে বেনারকে বুসি হয়ে বললাম যে এ সব শুনে তুমি নিজের আনন্দেই পারিস কিভাবে এবার। কিন্তু তখন তো জানুহাম না তুমি এর মনেই কারতো পাড়ি দিচ্ছ।"

স্বপনের মন একটু নরম হয়ে এসেছিল, কিন্তু চাঙের একধার তাকে একটু বাজল। বলল: "সানন্দেই পারিস কিভাবে ভালো কেন? আমার তো মনে হয় নী আমাকে আমার জন্তেই কেউ চায় এখানে। আমার খোঁজ পড়ে রকাকারে।"

চাং একটু ছুপের হুয়ে বলল: "একথা কেন বলছ ভাই? অস্তঃ: আমরা তো তোমাকে সত্যিই চাই জানো। তাকে কারতো যাওয়া না স্থির করে ফেলতে তোমার নিজের নিয়ন্ত্রণ করতাম—আমাদের সঙ্গে একবার লগেন যেতে। ওমাও বলছিলাম।"

স্বপন কোনো কথা বলল না।

চাং তার হাতের উপর একটা হাত রেখে বলল: "ভুল না, বাবে?"

স্বপন ভাবতে থাকে।

চাং মুক্ত হেসে বলে: "কিন্তু সত্যি কথা বলতে হ'লে বলতে হয় স্বপন যে তোমার কণ্ঠা একবারে মিথ্যাও নয়, এতে আমাদেরও স্বার্থ রয়েছে বৈ কি।"

—"স্বপন ঈষৎ স্তম্ভিত বোধ করে। "কী স্বার্থ?"
—"তোমার মতন বন্ধু ইয়া পাবে কোথায়? আর অল্প কারি হাতের বা তাকে রক্ষণাবেক্ষণের ভার এমন নিশ্চয় হয়ে স'পে দিতে পারব বল?"

স্বপনের বৃক্কের মধ্যে যে আত্মরানি দেখাচ্ছিল হঠাৎ ভুলে গঠে। এতখানি বিখাস! আর সে!—কিছুক্ষণ ধরে চাঙের আঁককেকার খোলাগুলি ব্যবহারে এই দিকার সে ক্রমশই বেশি করে অস্বস্তি করছিল। চাঙের মুখের দিকে লোকা তেরন ভাবে তাকাতো পারছিল না। প্রতি পন্থেই চাঙের সিঁদু বিখাসের সঙ্গে তুলনা করে নিজের মধ্যে একটা আত্মগোপনের ভাব অস্বস্তি করছিল।

—“কী, কথা কইছ না যে? যাও তো বলে—আমাদের পার্শ্বের ঘরটা তা হ'লে তোমার নামে রিজার্ভ করে আসি?”

—“না।”

তার “না”-র মধ্যে এমন একটা কক্ষস্থর আহত কাংক্ষ-পাণের নতুন কন্যকন্য করে গঠে। চাঙ তার মুখের দিকে তাকায় শুধু বিস্মিত হ'লে।

স্বপনও কোনো কথা বলে না। তার মনের আকাশকে ছি-ছিঁর ঘোঁরা উঠে যেন কোনো ক'রে দেয় হঠাৎ।

চাঙ তার হাতের 'পরে হাত রেখে বলে: “কিছু মনে করো না স্বপন, তোমাকে আজ যেন একটু কেমন কেমন দেখছি। আমার কোনো কথায় কি তুমি কোথাও আঘাত পেয়েছ? কিংবা স্বাপ্নেয় খাওয়া নিয়ে পীড়াপীড়ি করার দরপ?”

এ কেমন বিশ্রুত স্বপ্নের স্বপ্নের একটা উচ্চ পদীর নিভৃত তার বেজে গঠে, সে মুখ নীচু করে বলে: “চাং, আমি কোনো হিসেবেই অসাধারণ নই, না বন্ধু হিসেবে, না প্রেমিক হিসেবে, না—” বলতে বাঙ্ছিল “বিখাসের পার হিসেবে—” কিন্তু পারল না।

চাং বিস্মিত কোমল স্বপ্নের বলল: “কী হয়েছে বলোতো। তোমার সদাগ্রহের মুখ এমন মেঘলা! তো কখনো দেখিনি। তোমাকে যে ভাই চিরদিন খোলা হাওয়া ব'লেই চেয়ে এসেছি।”

স্বপন তার দুই এড়াতে মুখ একটু দিগিরে বলে:—

নিশ্চয় না। মাথার ওপরে পাতলা সবুজ ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে একতোড়া বিজলি বাতি এমন ক্রান্তভাবে তাদের মধ্যেকার টেবিলের 'পরে নিব্বা!—তার বৃক্কের মধ্যে কেমন করে গঠে।

ছলনের কেউই কথা বলে না।—অন্ধের একটা ভাষাজের গুহার বাঁশ বকণ স্বপ্নে গঠে বেজে।—ভাষাজের বাঁশ তাকে বরাবরই উদাস করে তুলত আজ ধলয়ের মধ্যে সে বহুক্ষণ-ধনিত বিদ্যাহসের জন্ম গঠে—একটা পথহারা নীচু। কাল কোথায় যাবে সে?—কেমন এমন ঘুরে বেড়াচ্ছে?—বিস্ময়ের পথ চেয়ে? পারিস থেকে নীশ, নীশ থেকে কারোরা। কোনো লক্ষ্যই যেন নেই এ জীবনের।—বাঁশ একটু খেমে আরও কোমল স্বপ্নে বাজতে থাকে।—স্বপনের বৃক্কের মধ্যে কোথায় যেন মোড়ল দিয়ে গঠে এবার।—অমনি একটা ঈমারে এগাও যাবে কাল —সে!—কোন একদিকে।—পথে-পাওয়া বন্ধ, এমন পথেই বৃক্ক ছেড়ে যায়?—শুধু এই বিখাস র'য়ে যায় যে জ্বলিয়ে, পাওয়ার মধ্যেও একটা আবিষ্কার এসে গেল— তার চোখে উপজায়মান জলকে সে বহুক্ষেপে রোদ করে।—

ত্রিক এই সময়ে চাং তার মুখের কাছে হুঁকে “এ কী?” বলেই তার ছটি হাত নিজের ছই হাতের মধ্যে টেনে নিল।

“কী হয়েছে ভাই? বলবে না?”—পুরুষের স্বর যে এত কোমল হয় তা স্বপন কখনো জানত না!—এমন-বন্ধুর বিখাসের—এমন দরদের প্রতিধ্বনি!—সে এ চিন্তাকে ঠেলে দিয়ে চুপ করেই বসে থাকে।—তার কানের কাছে ঘোরা-ঘুরি করতে থাকে কেবল ওর ছটি ছোট কথা: “তুমি যে ভাই খোলা হাওয়া!” হায় রে!—এ প্রীতির অবা-শ্কার অজলি তার কাছে এসে পড়ল এমনই বহুক্ষেপে বনন তাকে স্বীকার করার কোনো পথই নেই—বনন তার গম্ভীত আত্মস্থগন সহসা-আহত কিংদের 'মতই ধূলিকণা—পল্লী!—

সে হঠাৎ গায় কর্তে বলে বলে: “চাং আমাকে তুমি বড় বোলো না আর।”

চাং তার হাতগুটির 'পরে-নিবিড় বেগের চাপ দিয়ে বলে: “সে কি ভাই?”

—“হ্যাঁ, আমি তোমার বিখাসের অস্বাধ্যা—তোমার কাছ থেকে সব গোপন করে তোমার শ্রদ্ধা প্রীতি ভোগ কর'তে চেয়েছিলাম—মিথ্যা দেবতার মত।” ব'লেই স্তিমিত করে মোটর বোটের উপর বা বা ঘটেছিল সব একনিখায়ে বলে গেল।

চাঙের মুখের একটা পেশীও নড়ল না। প্রকৃৎপ্রবৃত্ত মূর্তির মতন দেখাশো তার মুখ। স্বপনের মনে কোথায় একটা নৈরাশ্র ঘনিয়ে আসে।—কেমন সে বলতে গেল!—

কেন দরদী ব'লে ভুল করল ওকে?—যদি ইমাবেশকে এজন্তে জুগ পেতে হয়?—আরও কত উল্টোপাল্টা চিন্তা।—

প্রায় পাঁচ মিনিট কেটে গেল নিশেষে। স্বপন বলল: “তাই আমি স্থির করেছি পারিলে আর কিরদই না। কেন মিথ্যা মিথ্যা তাকে বাধা দেব? তোমাকে বেদনা দিচ্ছেছি এই-ই আমার বখটে তিরস্কার।”

চাঙের পাথরের মত মুখ হীরে হীরে মাধুরের মত হয়ে উঠল। সে শাস্তকর্ত্ত তার দিকে চেয়ে বলল: “এতে আমি বেদনা পাইনি বললে মিথ্যা বলব।—এহু—এহু—আমি মিথ্যা খুব কমই বলি।” ব'লে ফের একটু ধামল। স্বপনের বৃক্কের মধ্যে কেমন যেন গুমট করে গঠে। চাং বলে: “কিন্তু এ-বাধা-পাওয়াটা একান্তভাবে আমার নিজেরই—এর সঙ্গে তোমাদের কোনো সম্বন্ধই নেই।

তবে একটা কথা জেনো। এর দরপ তোমাদের প্রতি আমার একটুই শ্রদ্ধা কন্মল না। যদি ক্ষেত্র ঐ অবস্থায়ই কখনো পড়ি তবে ফের তোমার তদারকই ইমাকে রেখে যাবো। এ-বিদ্যারসে আমার একথা তুমি অবিশ্বাস করোনা।”

স্বপন কী যে উত্তর দিল তা সে নিজেই জানে না।

বোধ হয় চাঙের কানেও সে-সব পৌঁছল না। সে বলল: “এ আমার চাং নর স্বপন। শোনো তোমাকে আমার জীবনের একটা মাত্র ঘটনা আজ বলি, যা আমি কখনো কাউকে বলিনি।”

ব'লে একটু খেমে কেমন-যেন আব'ছা হেসে বলল: “তোমার 'আত্ম-আবিষ্কার' কথাটি খুব সত্যি বই কি। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে কতরকমের জীব লুকিয়ে আছে—আর কতরকম যে তাদের স্মৃতি, মতিগতি, কত রকম প্রাণরথার ঘোরাকেই যে তারা বেঁচে থাকে।—

পাশের বিজ্ঞান যদি ডে ডে করে এগার বার বলে— চাঙের শেষ কথাগুলো ঢাকা পড়ে যায়।

— জন্মশ:



জীবন-তরঙ্গী

শ্রীহরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

জীবন-তরঙ্গী মোর

যাও যাও বাহি' গো।

আমার প্রাণের পাশে,

আমার মরম তলে

যেথা শত কোটি আশে

জীবন-প্রদীপ জ্বলে

সেথা দিবানিশি তব

সুরখানি গাহি গো

জীবন-তরঙ্গী মম

যাও যাও বাহি' গো।

জীবন-তরঙ্গী মোর

যাও যাও বাহি' গো।

কত ধূলা কত খেলা,

কত উষা সাঁঝবেলা

কত দিন কত রাত

কত হৃদয়ের সাখী

এলা গেল আপনার

উপকথা গাহি গো।

জীবন-তরঙ্গী মম

যাও যাও বাহি' গো

জীবন-তরঙ্গী খানি

যাও যাও বাহি' গো।

কত শত গোধূলির

গৃহে-ফেরা বাঁশরীর

গানে হিয়া ঢকল

চোখ ছুটি ছল ছল

কত হৃথে আকুলিত

কত রূপ চাহি' গো

জীবন-তরঙ্গী তাই

যাও যাও বাহি' গো।

জীবন-তরঙ্গী মম

যাও যাও বাহি' গো।

কত বসন্তের বায়

পুরান উদাস হায়

কত শত বিফলতা

‘রাখি’ যায় কত বাখা,

কত উপহাস-কথা

নিরাশায় ছারি' গো।

জীবন-তরঙ্গী তবু

যাও যাও বাহি' গো।

থামায়ো না ডুবায়োনা

যাও যাও বাহিয়া।

যত অশ্রু হাসি গান

মিছে কেন অবমান ?

হৃদয়-যমুনা কুলে

ফুল ফোটে ছলে ছলে

সেই যমুনার স্রোতে

রাখিবি কি ধরিয়—

জীবন-তরঙ্গী চির

যাও গাহি' বাহিয়া।

হৃদ-সঙ্কট

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়কে যে খোলা চিঠি লিখেছেন, প্রেসে পাঠাবার পূর্বেই লেখক সেটিকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য এবিষয়ে যদি আমার কিছু বক্তব্য থাকে তবে মূল রচনার সঙ্গেই আমাকে তা প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া। তাঁর এই সাধু অভিপ্রায়ের ভুলে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর রচনাটি সম্বন্ধে আমার কয়েকটি বক্তব্য সংক্ষেপে জ্ঞাপন করছি। অনিলবরণ আমার বাংলা ছন্দের আলোচনাত্মক লেখকে যে শূন্য হৃদয়কেই প্রত্যালোচনা করেছেন এবং প্রায় সমগ্রই যে আমার মুক্তি ও সিদ্ধান্তগুলিকে যথাযথ ভাবে অহুসরণ করেছেন তার বিশেষ পরিচয় পেয়ে আমি আনন্দিত হয়েছি। তা ছাড়া, তিনি আমার কথিত যৌগিক ছন্দের নিয়ম সম্বন্ধে যে কয়েকটি ব্যতিক্রমের উল্লেখ করেছেন তাতেও তাঁর এই হৃদয় বিচ্যেদেই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। যাহোক, আমার কথিত নিয়ম সম্বন্ধে তাঁর মনে যে-সব সংশয় বেধা দিয়েছে সে-বিষয়ে আমার যা বা মনে হয়েছে তাই সংক্ষেপে বোঝাতে চেষ্টা করছি।

অনিলবরণ কবিত্ব রবীন্দ্রনাথকেই ছন্দের তত্ত্ববিচারেও বাংলার গুরুত্বান্বিত বলে মনে করেন। কিন্তু দিলীপকুমার স্বরবৃত্ত (syllabic) ছন্দের প্রকৃতিবিচারে রবীন্দ্রনাথের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন এবং এবিষয়ে অনিলবরণ দিলীপকুমারেরই মতাবলম্বী, কেননা স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রকৃতি নির্ণয়ের আলোচনায় তিনি তাঁর “হৃদয় কবি-শ্রুতিরই” পরিচয় পেয়েছেন। এবিষয়ে আমিও অনিলবরণের দ্বায় দিলীপ-কুমারেরই সমর্থক। স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ সম্বন্ধে যথাসময় ও যথাযথভাবে আমি দ্বিষ্টত্ব আলোচনা করব। বর্তমান প্রসঙ্গে শুধু যৌগিক ছন্দের নিয়ম ও তাঁর ব্যতিক্রমগুলি সম্বন্ধেই কয়েকটি মাত্র কথা বলতে চাই।

অনিলবরণ সত্যই বলেছেন যে আমি বাংলা ছন্দের

বে-সমস্ত নিয়ম বার করছি সেগুলি first formulations মাত্র। আমার দাবীও তার চেয়ে বেশি নয়। একটি কথা মনে রাখা দরকার যে আমার ছন্দের আলোচনা এখনও শেষ হয়নি; আমার নিজেরই বা বক্তব্য আছে তার সমস্ত কথা এখনও আমার বলা হয়নি। স্মরণ্য আমার সমস্ত কথা বলা না হওয়া পর্যন্ত আমার আলোচনার মধ্যে যে অপূর্ণতা থাকবেই তা বলাই নিশ্চয়োক্ত। আর আমার সব কথা বলা হবার পরেও যে বাংলা ছন্দের সম্বন্ধে সঁচ কথা বলা শেষ হবে না সে বিষয়েও আমি সচেতন আছি। কারণ জাতীয় সাহিত্যের কোনো একটা দিকের আলোচনাও এক জীবনে নিশেষ করা সম্ভব নয়। ইংরেজি ছন্দ শাস্ত্রের আলোচনা যুদ্ধ হবার পর সাড়ে তিন শো বছরেও বেশি কেটে গেছে; কিন্তু এখনও কি ও বিষয়ে সমস্ত সমস্তার নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত হয়েছে? আজ যদি বাংলা ছন্দের first formulations হ'য়ে থাকে তবে তাতে যে অনেক অপূর্ণতা দিলেও তাতে বিভিন্ন কিছুই নেই।

বাংলা ভাষায় প্রাক-হস্ত স্বরবর্ণের (অর্থাৎ আমার পরিভাষায় যুগ্মস্বর) বৈকল্পিক ব্যবহারিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে মূলতঃ বা dictum-এর উল্লেখ করেছেন সে-বিষয়ে অনিলবরণ বর্ণনা করেন, “কিন্তু এই পুরের প্রয়োগ কি হইবে, স্বরবর্ণ কোথায় কতটা টানা চলিবে বা চলিবে না, সে-সম্বন্ধে তিনি কোন বাধা ধরা নিয়মের মধ্যে যথান নাহি।” আমি ত্রিক্ এই কথাই বলেছি বৈদ্যখের ‘রিচিটার’। আর অনিলবরণ একথাও ত্রিক্ই বলেছেন যে, ‘অমি ওই dictum-এর প্রয়োগবিধির প্রতি লক্ষ্য রেখেই বাংলা ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত (quantitative), স্বরবৃত্ত (syllabic) ও যৌগিক (‘অক্ষরবৃত্ত’ের চেয়ে ‘যৌগিক’ নামটাই আমি পছন্দ করি) এই তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ওই dictum-এর প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে কোনো কথাই বলেন

নি; তাই ছন্দের এই শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধে তাঁর কোনো স্পষ্ট মতামত জানা যায় নি। কিন্তু শুধু dictum দিয়ে তার প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে কিছু না বললে কিরূপ মূল্যক্লি হর তা একটু বিধানো দরকার।

রবীন্দ্রনাথের dictum-টির অর্থ হচ্ছে এই যে বাঙলা যুগ্মধ্বনিরক 'আমরা প্রয়োজন মত টেনে বাড়িয়ে তাকে দুই unit-এর মাত্রাও দিতে পারি, আবার প্রয়োজন মত তাকে ঠেসে কমিয়ে এক unit ব'লেও গণ্য করতে পারি। এই কথাকেই আমি অন্তর্ভাবে বলেছি। 'আমি বলি, যুগ্মধ্বনিকে আমরা কখনও উচ্চারণ করি 'বিস্ত্রিত' ভাবে, কখনও করি 'সংকীর্ণ'ভাবে; 'আর যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ বধন বিস্মৃতি তখন তার মূল্য দুই unit, এবং তার উচ্চারণ বধন বিস্মৃতি তখন তার মূল্য এক unit। এই মূল দৃষ্টান্তকে অবলম্বন করে আমি বাংলা ছন্দকে কী ভাবে 'বিস্ত্রিত' প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করি তাও এখানে বলা দরকার। (১) যে-ছন্দে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ অবস্থান নির্দিষ্টভাবে সর্বত্রই বিস্মৃতি (অর্থাৎ দ্বি-বাটিক) তত্বকেই আমি বলি 'মাত্রাসূত্র' (quantitative) ছন্দ। (২) যে-ছন্দে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ অবস্থান-বিশেষে সর্বত্রই 'স্বরসূত্র' (syllabic)। (৩) আর যে-ছন্দে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ অবস্থান-বিশেষে কোথাও বিস্মৃতি কোথাও সংস্মৃতি সে-ছন্দকে আমি বলেছি 'যৌগিক' ছন্দ, কেননা যুগ্মধ্বনির দ্রুতরকম উচ্চারণের বোগো এ ছন্দ পড়িত। এই যৌগিক ছন্দের যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ কোথায় বিস্মৃতি এবং কোথায় সংস্মৃতি, এই বিষয় নিয়েই আসল প্রশ্ন। আমি বলেছি এ ছন্দে শব্দের মধ্যস্থিত যুগ্মধ্বনি বিস্মৃতি এবং শব্দান্তরস্থিত যুগ্মধ্বনি সংস্মৃতি এবং ছন্দের সাধারণ নিয়ম। অনিলবরণও এই সাধারণ নিয়মটির সত্যতা অঙ্কুর করেন না। তিনি 'প্রসূত' বলেছেন এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম (exceptions) সম্বন্ধে। এবিষয়ে একটু পরেই আলোচনা করা যাবে। কিন্তু এই ব্যতিক্রমগুলিকে উপলক্ষ্য করে বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধেই তিনি একটু সত্য প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "কাব্যের এইরূপ বিভাগ (কিছু) মুস্তফ

হয়।" তাঁর কী মুস্তফ হয়েছে তা আমি টিক বুঝতে পারিনি। মাত্রাসূত্র সম্বন্ধে তাঁর বোধ কিসে কোনো বংশ নেই। 'যৌগিক' নামে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী করা যায় কিনা তাঁর সম্বন্ধে বোধ হয় সে বিষয়ে। সাধারণ (অর্থাৎ বাংলায় প্রাচীন) পদ্য-কাব্যী ছন্দের সাধারণ নিয়ম ও তার ব্যতিক্রমগুলি খাই হোক না কেন, এছন্দে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ 'কোথাও বিস্মৃতি, কোথাও সংস্মৃতি' এবিধের বোধ করা তাঁর কোনো সম্ভেদ নেই। কারণ রবীন্দ্রনাথও দেখিয়েছেন যে কাব্যীরাঙ্গারদের মহাভারতের ভণিতায় 'পূর্ণাবান' শব্দের 'বান'-কে আমরা টেনে অর্থাৎ বিস্মৃতিভাবে উচ্চারণ করি বলে, কিন্তু 'পূর্ণ'-কে আমরা ঠেসে অর্থাৎ সংস্মৃতি বা সংকীর্ণ ভাবে উচ্চারণ করি। সুতরাং এই সাধারণ বা প্রাচীন পদ্য-কাব্যী ছন্দ যে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর ছন্দ এবং এর প্রকৃতি যে 'যৌগিক', এবিধের সম্ভেদ থাকতে পারে ব'লে মনে হয় না।

এবার যৌগিক ছন্দের সাধারণ নিয়মটির ব্যতিক্রমগুলি সম্বন্ধে দুইরকম কথা বলুছি। সাধারণ নিয়ম অনুসারে যৌগিক ছন্দে শব্দান্তরস্থিত যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ সর্বত্রই এবং সর্বত্রই বিস্মৃতি অর্থাৎ দ্বি-বাটিক। এ নিয়মের কোথাও এবং কোনো সময়েই ব্যতিক্রম হয় না। আর পুরোঁক সাধারণ নিয়ম অনুসারেই এছন্দে শব্দমধ্যস্থিত যুগ্মধ্বনি 'প্রায়' সর্বত্রই সংস্মৃতি বা এক-বাটিক; এ নিয়মের ব্যতিক্রম যৌগিক ছন্দে আছে। কিন্তু এই ব্যতিক্রমগুলিও যথোচ্ছাচার নয়; এর মধ্যেও একটু গুঢ়তার কারণ আছে ব'লেই আমি মনে করি। প্রত্যর্থেই দুইরকমের টিক নিয়ম ভুল ব্যত পাবি। এই ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন (পরিচয়—১৩৮৮, মাঘ)—

চিনি ভেঙে ভেঙে বেগে গিরি ভেঙে দুর্গ,

কি যেন আমার ভাব সেই ঠাঁকুণ।

এটা যৌগিক (অর্থাৎ সাধারণ) পদ্য—শুধু 'ঠাঁকুণ' শব্দে মাত্রাসূত্রের কাঙ্ক্ষার চাপ unit-ধরা হয়েছে। কিন্তু 'চিনি' শব্দে যৌগিক ছন্দের রীতিতে দুই unit-ই ধরা হয়েছে। অর্থাৎ প্রচলিত লিপিপদ্ধতি অনুসারে এ শব্দটির রূপ হচ্ছে 'চিঃ'।

চিনি ভেঙে ভেঙে বেগে গিরি ভেঙে দুর্গ,

কি যেন ঠাঁকুণ মোর নাই কোনো ভাবে।

এটাও যৌগিক পদ্যর অর্থাৎ সাধারণ পদ্যর; শুধু 'চিনি' শব্দে মাত্রাসূত্রের কাঙ্ক্ষার ভিন্ন unit-ধরা হয়েছে। পদ্যান্তরে এখানে 'ঠাঁকুণ' শব্দে যৌগিক ছন্দের রীতিতে 'চিনি unit-ই ধরা হয়েছে। প্রচলিত লিপিপদ্ধতি অনুসারে এখানে এ শব্দটির রূপ হচ্ছে 'ঠাঁকুণ'। লক্ষ্য করুন বিষয় এখানে 'ঠাঁকুণ' শব্দের 'ঠাকু' সংস্মৃতি ও এক-বাটিক; কিন্তু 'দুর্গ'-বিস্মৃতি ও দ্বি-বাটিক। কেননা 'দুর্গ' শব্দান্তরস্থিত এবং 'ঠাকু' তা নয়। বোধ দোষা হয়—

চিনি ভেঙে ভেঙে বেগে গিরি ভেঙে দুর্গ,

কি যেন ঠাঁকুণ মোর নাই কোনো ভাবে।

তা'হলে আমি বলব এখানে প্রথম পংক্তিটা মাত্রিক পদ্যের পংক্তি; কিন্তু দ্বিতীয় পংক্তিটা যৌগিক পদ্যের পংক্তি। কেননা প্রথম পংক্তিতে যুগ্মধ্বনি অবস্থান-নির্দিষ্টভাবে সর্বত্রই বিস্মৃতি; কিন্তু দ্বিতীয় পংক্তিতে যুগ্মধ্বনি অবস্থান-বিশেষে কোথাও বিস্মৃতি, কোথাও সংস্মৃতি। যাহোক, এ ভাবে পদ্যের একটি পংক্তিকে মাত্রিক ও আরেকটি পংক্তিকে যৌগিক প্রকৃতি দেওয়া যায় কি না তা আমি বলতে পারিনি। কেননা এ রকম দৃষ্টান্ত আমি কোনো কবির রচনায়ই পাইনি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের dictum অনুসারে এ দৃষ্টান্তটিও নির্দোষ।

ফারসি সমাধানে দাঁষ্টের ঘা

নির্ভল নীরবে উর্দা গাধার।

এ রকম পদ্যর রচনা করা ছন্দ-হিসেবে নিদোষ কি? কিন্তু উক্ত dictum অনুসারে এটিও নির্দোষ। আমার নিজের বিশ্বাস এ রকম রচনা করা চলে না; 'অনুভূত' আজ গাধার কোনো কবি এ রকম রচনা করেন নি। আমি মনে করি এই পংক্তি-দ্বয়কে নিম্নলিখিত দুই রূপের একরূপে পরিবর্তিত করা আবশ্যিক।

ফারসি সমাধানে দাঁষ্টের ঘা

ফারসি নীরবে উর্দা গাধার।—যৌগিক পদ্যর

ফারসি সমাধানে—মাত্রিক পদ্য

নির্ভল নীরবে উর্দা গাধার।—মাত্রিক পদ্যর

গত যৌগিক 'বিচিত্রা' থেকে রবীন্দ্রনাথের রচিত ছুটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করলেই এ কথা বারখারি বোঝা যাবে।—

উৎসবের রাশিগণের মূখ অশ্রী ধরা

ভারকরা বন্দী ছেড়ে তৃতিকারে চার।

এটি যৌগিক পদ্যর; কেননা এখানে যুগ্মধ্বনি 'অবস্থান-বিশেষে কোথাও বিস্মৃতি, কোথাও সংস্মৃতি। কিন্তু—

সমাধানে উৎসবের বসন্ত ঘা

শের মরি বিরহের কুণ্ডলিয়ারে।

এটি হচ্ছে মাত্রিক পদ্যর; কেননা এখানে যুগ্মধ্বনি 'অবস্থান-নির্দিষ্টভাবে সর্বত্রই বিস্মৃতি।

সমাধানে অকস্মৎ বসন্ত ঘা

এই পংক্তি সম্বন্ধে কি বলা যাবে? এখানে 'অকস্মৎ' শব্দে কোথাও চার বাটী ধরা হয়েছে যৌগিক ছন্দের রীতিতে; অর্থাৎ এখানে যুগ্মধ্বনিকে ওৎ ঠেসে কমান হয়েছে। আবার 'বসন্ত' কপালিতও চার বাটী ধরা হয়েছে মাত্রাসূত্রের রীতিতে; অর্থাৎ এখানে যুগ্মধ্বনিকে বস, সং টেনে বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু বাংলা ছন্দে এ রকম কল কি? রবীন্দ্রনাথের মত চলে না, কেননা তাঁর মতে এই পংক্তিটতে ছন্দপতন ঘটেছে, অর্থাৎ তিনি বলেছেন এই পংক্তিটতে নিয়ম বেঁচেছে। কিন্তু কেন নিয়ম বেঁচেছে? আমার কথিত কোনো নিয়মই এই পংক্তিটতে বাড়ে নি, সে কথা আমি পূর্বেই বলেছি। বসন্ত' রবীন্দ্রনাথের নিজের কবিত মূল স্বর বা dictum-ই এখানে বেঁচেছে; কিন্তু তথাপি এখানে ছন্দ-রক্ষা হয়নি। dictum-টি হচ্ছে এই—"একটু কনি-বোধিত মামলা চলে না, বাংলা ভাষার স্বরস্বাদের মধ্যেই যথেষ্ট প্রশংসা আছে"; কিংবা "বাংলা ভাষার স্বরস্বাদের ধ্বনিমাত্রা বিকল্পে দীর্ঘ ও স্বল্প হ'লে থাকে, স্বল্পকেই হিসের মতো, টানলে বাড়ি, টান ছেড়ে দিলে কমে।" অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ নিজেরই দেখিয়েছেন যে, যৌগিক অর্থাৎ সাধারণ পদ্যের 'ঠাঁকুণ' শব্দকে প্রয়োজন মতো তিন unit-ও ধরা যায়, চার

unit-ও ধরা যায়। তাই বহিঃস্থ হইতে উদ্ভূত যৌগিক বা সাধারণ পর্যায়ে পংক্তিভিত্তিক 'বংসর' শব্দে চার unit ধরা যাবে না কেন? এখানেই তাঁর dictum-এর অস্পৃশ্যতা; অর্থাৎ প্রয়োগবিধির উল্লেখ না করে শুধু dictum-এর ভিত্তিতে ছন্দের বিচার করা চলে না।

আরেকটি শব্দের প্রয়োগের প্রসঙ্গ লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথের dictum-এর বিচার করা যাক। রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্ত নিয়ে দেখিয়েছেন যে যৌগিক পর্যায়ে 'চিহ্ন' কথাটিকে প্রয়োগের মতো ছই unit-ও ধরা যায়, তিন unit-ও ধরা যায়। কিন্তু যৌগিক অর্থাৎ সাধারণ পর্যায়ে 'নিম্ন' কথাটিকে 'চিহ্ন' শব্দের মতো বিচারে ছই বা তিন unit ব'লে গণ্য করা যায় কি? অর্থাৎ

চিহ্ন যেটাকে দেখে গৃহীত হয়

এই পংক্তিটির নজিরে—

নিম্নে পড়তে হবে অক্ষ যতন

এই পংক্তিটিকে নির্দেশ্য বলতে পারি কি? কিংবা,

শব্দ বলে আমার লেখ সেই হৃদয়

এই পংক্তিটির নজিরে

সুখানন্দ মহোৎসবে বংসর যায়

এই পংক্তিটিকে নির্দেশ্য বলুন না কেন? কবির dictum তো সর্বত্রই বহাল আছে। বাহ্যিক, প্রয়োগের বিধি নিশ্চিন্ত না হ'লে শুধু dictum-এ ছন্দের বিচার করা চলে না, এ কথা অনিবার্যরূপে নিজেই স্বীকার করেছেন। উপরে দৃষ্টান্তগুলি সন্দেহ নাশকারী বলিয়া বোধ হইবে, নিম্ন, বংসর প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে যৌগিক ছন্দে সম্প্রসারিত করা হইবে গণ্য করা হয় না; পক্ষান্তরে চিহ্ন, ঠাকুরান প্রভৃতি অসংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে যৌগিক ছন্দে সম্প্রসারিত করা হইবে থাকে। অগ্রগণ্যের বিচারই আমি প্রথম ও কথা বলেছি; তার পরে বৈশাখের বিজ্ঞান তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছি। এখানে পুনরুক্তি নিম্নপ্রোক্ত।

অনিমেষরূপ প্রাণ তুলেছেন, আমার কবিত সাধারণ নিম্ন অক্ষরাদি এখানে, রাজদণ্ড, মানদণ্ড, বিন্ধ্য-লজ্জা প্রভৃতি সমাসবদ্ধ শব্দকে এক শব্দ ব'লে গণ্য করে এক, রাজ, মান,

নিম্ন প্রভৃতি যুগ্মধ্বনিকে এক unit ব'লে গণ্য করা হয় না কেন? এ বিষয়েও বৈশাখের বিচারের বিস্তৃত আলোচনা করেছি। তথাপি এখানে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। আমি বলেছি যৌগিক ছন্দে সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে এক unit ধরা হইবে থাকে। কিন্তু সমাসবদ্ধ শব্দকে একটি অর্থ শব্দ ব'লে গণ্য করতেই হবে এমন কথা আমি বলিনি। ব্যাকরণের দিক থেকে সমাসবদ্ধ শব্দ অর্থও বটে; কিন্তু ছন্দের দিক থেকে সমাসবদ্ধ শব্দকে অর্থও ব'লে গণ্য করা আবশ্যিক নয়। কবি ইচ্ছা করলে সমাসবদ্ধ (বা বাংলা প্রত্যয়) শব্দকে বিচ্ছিন্ন বা বিধা বিচ্ছিন্ন ব'লেও গণ্য করতে পারেন। এ কথার প্রথম আভাস দিয়েছি 'বালা' ছন্দে রবীন্দ্রনাথের 'দান' নামে আমার পুস্তিকা (পৃ: ১৫-১৬) এবং বিস্তৃত আলোচনা করেছি বৈশাখের বিচারে। আমি 'দিক্-প্রান্ত' কথাটির দিক্-কে বিকল্পে এক বা ছই unit ধরা যায় একথা বলেছি এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এরূপ প্রয়োগই করেছেন। কিন্তু আমার এই উক্তিই 'অনিমেষরূপ' মত সন্দেহ পড়ে একবারে 'বলু মা, তারা, ঠাড়াই কোথা?' ব'লে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর একগুণ উৎকণ্ঠিত হবার বিশেষ কারণ নেই। কেননা, কোন্ স্থলে সমাসবদ্ধ শব্দকে বিকল্পে অর্থ বা বিচ্ছিন্ন ব'লে গ্রহণ করতে হবে তা এমন নয় যে তাকে কোনো নিয়মের অন্তর্গত করা যায় না এবং এমন বৈকল্পিক শব্দও বাংলায় অসংখ্য। দিক্-প্রান্ত, দিক্-জল প্রভৃতি শব্দে যেমন দিক্-কে বিকল্পে এক বা ছই বাগ্গি ব'লে গণ্য করা যায়, তেমনি মুখণ্ডি, হৃৎপার প্রভৃতি শব্দের মূহ, হৃৎ-কেও যৌগিক ছন্দে বিকল্পে ছই unit ব'লে গণ্য করা যায় ব'লে আমার বিশ্বাস। যদি তা না হইত তবে আধুনিক শক্তিমূল কবিরের রচনায় ওরকম বৈকল্পিক ব্যবহার দেখা যেত না। মাহিহতলা কিংবা বৃক্কব'র 'হৃৎপার' শব্দে চার unit দ'লে ভুল করেছেন ব'লে আমি মনে করি। বস্তুত, আমি এটা লক্ষ্য করেছি যে দিক্, মূহ, হৃৎ প্রভৃতি একশব্দ (monosyllabic) যুগ্মধ্বনিসূচক শব্দে যখন অর্থ শব্দের সঙ্গে সমাসবদ্ধ হয় অর্থাৎ বাগ্মন শব্দের সহ অসুখাদি অচ্ছেদ্য হ'লে না বাগ, সে সব ক্ষেত্রে অর্থ কবিরই এসব শব্দকে ছই unit ব'লেই গণ্য করেন (অক্ষ

সংখ্যার নজিরে কিনা জানিনে)। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সর্বদাই এসব শব্দকে এক unit ব'লেই গণ্য করাই সম্ভব মনে করেন। আর আমার বিশ্বাস ওসব শব্দকে এক unit ধরলেই যৌগিক ছন্দের ধর্মিণী দৃঢ় এবং স্তন্যতে ভালো হয়; ছই unit ধরলে যদিও ছন্দ-পতন হয় ব'লে মনে করিনে, কিন্তু তাতে যৌগিক ছন্দের ধর্মিণীতে শৈথিল্য আসে ব'লে মনে হয়। ঠিক এই কারণেই 'দিক্-প্রান্ত' কথাটিতেও তিন unit ধরাই রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়। অর্থাৎ বোধ করি শুধু কানের দ্বারা চালিত হ'লে এক রকম নিজের অজ্ঞাতসারেই স্থানে স্থানে 'দিক্-প্রান্ত' কথাটিতে চার unit ধরার প্রয়োজন এবং তার দ্বারাই প্রমাণ হয় যে 'দিক্' কথাটিতে ছই ধরলেও কানে বাধে না অর্থাৎ ছন্দ-পতন হয় না। হৃৎ, মূহ প্রভৃতি সন্দেহও এই কথা বাটে।

কিন্তু যুগ্মধ্বনিটা যদি একটি একাদিক স্বর বিশিষ্ট শব্দের অন্তর্ভুক্ত থাকে (যথা—তড়িৎ, বিভ্রাৎ, মহৎ ইত্যাদি) তাহলে যুগ্মধ্বনিকে ছই unit ব'লে গণ্য করলেই ভালো শোনা যাবে; এক unit ব'লে গণ্য করলে যে ছন্দ-পতন ঘটে তা মনে করিনে, কিন্তু তাতে ধর্মিণী একটি কর্কশ লাগে ব'লে মনে হয়। যেমন, 'তড়িৎ প্রভাব' শব্দটিতে ছই unit গণনা করলে 'স্বস্ত' আমার কানে একটি বাধে, কিন্তু তাতে ছন্দ-পতন হয় তা বলিনে। আরেকটা দৃষ্টান্ত-দিক্—

বাঁকি' বিশিষ্টধ্বনিসংখ্যার প্রত্যয়ে বিদ্যাব্যবহিত
মহানন্দ বিধা।

—(স্বাক্ষর) উৎসব, গৃহীত, রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'দিক্' কথাটি এক unit অর্থাৎ 'বিদ্যাদ' এ তিন unit ধরা হয়েছে। তাতে কিছু বোধ হয়েছে ব'লে মনে করিনে। পক্ষান্তরে অবশ্য বিশেষে 'দিক্' শব্দকে বাড়িয়ে অর্থাৎ 'দিক্-প্রান্ত' করে ছই এবং 'বিদ্যাদ' শব্দকে সংগঠিত করে কমিয়ে ছই করলেও ছন্দ নষ্ট হ'তো না। রবীন্দ্রনাথের রচনায়ই তার নিদর্শন আছে (বিচার—১৩৩৩, বৈশাখ উত্তরা)। তেমনি 'তড়িৎপ্রভাব' কিংবা 'বিদ্যাব্যবহিত' নজিরে যদি 'বিন্ধ্যলজ্জা' শব্দে বিকল্পে চার unit ধরা যায় 'আমি মনে করি। এক সময়ে রাজদণ্ড, মানদণ্ড, শব্দের জ্ঞ এবং ন-কে অকারান্ত করেই উচ্চারণ করা হ'তো; তখন এ শব্দ দুটিকে চার 'অক্ষর' (সিলেবল্) ই ছিল। কিন্তু

বিন্ধ্যলজ্জা এনেছিল তরুণ-পথের অক্ষর করে
রাজ-দিক্-মানদণ্ড

এ রকম নিপলে হয়তো প্রথম প্রথম কানে একটু বাধে থাকে; কিন্তু 'তড়িৎপ্রভাব' সন্দেহও তাই বাটে। 'আঙ্গল কথা' 'তড়িৎপ্রভাব' এবং 'বিন্ধ্যলজ্জা', উভয় এই বিকল্পে চার বা পাঁচ unit ধরা চলে; আর পাঁচ ধরলেই চারের চেয়ে একটু ভালো শোনার ব'লেই আমার মনে হয়। কিন্তু 'বিন্ধ্যলজ্জা' (অর্থাৎ বিন্ধ্যলজ্জা) শব্দে চার unit ধরার মধ্যেও কোনো inherent বাধা আছে ব'লে মনে করিনে; যদি তা থাকত তাহলে রবীন্দ্রনাথ 'তড়িৎপ্রভাব' শব্দেও চার বাইত ধরতে পারতেন না।

বাংলা যৌগিক ছন্দের উপর পূর্ণাঙ্গাঙ্গ ও সংস্কৃতির (association-এর) প্রভাব কতখানি সেটি একটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। এটি হচ্ছে বাংলার প্রাচীন ছন্দ, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রধান বাহন। স্বতরাং এ ছন্দের সঙ্গে যে বহু কালেও বহু আভাস ও সংস্কৃতি জড়িত হ'য়ে আছে তা বিচার নয়। এই সমস্ত আভাস ও সংস্কৃতির স্তর উন্মোচন না করলে এ ছন্দের বর্ণনা প্রকৃতিটি উদ্ভাষিত করা সম্ভবপর নয়। এখানে সে আলোচনা করা নিম্নপ্রয়োজন। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে ঐ আভাস ও সংস্কৃতির মূলে আমাদের গিণিপাণ্ডিত এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের যথেষ্ট প্রভাব আছে। নিজের কানের উপর নির্ভর করে বাংলার কবিতা হৃৎপার, দিক্-প্রান্ত, স্বর্ণিণী প্রভৃতি শব্দে চার unit-ও ধ'লে থাকেন। কিন্তু লজ্জাপাণ্ডিত, দিগ্ধ, সুধারী প্রভৃতি শব্দে কখনও চার unit ধরেন না। এর মূলে বাংলা গিণিপাণ্ডিত ও সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব রয়েছে ব'লেই আমি মনে করি। এক সময়ে রাজদণ্ড, মানদণ্ড, শব্দের জ্ঞ এবং ন-কে অকারান্ত করেই উচ্চারণ করা হ'তো; তখন এ শব্দ দুটিকে চার 'অক্ষর' (সিলেবল্) ই ছিল। কিন্তু

ক্রমে যখন ঐ অক্ষরটি লুপ্ত হ'য়ে ও এবং ন-এর সহস্র উচ্চারণ হ'তে লাগল তখনও পূর্ণ সংঘতির মূলে সহস্র জ্ঞ এবং ন-কে পরবর্তী বর্ণের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হ'লো না এবং সহস্র বর্ণের পূর্ণবর্তী স্বরকে টেনে দীর্ঘ ক'রে লুপ্ত অক্ষরের ক্ষতিপূরণ করা হ'লো। তাই ওসব ক্ষেত্রে বাই সিমেবলুনা থাকলেও এরা চার 'অক্ষর'-এর সম্বন্ধেই গণ্য হ'তে লাগল। এরকম সর্বত্রই। অর্থাৎ যেকোনো অক্ষর লুপ্ত হ'য়ে কোনো বর্ণের সহস্র উচ্চারণ হয়েছে সেখানেই ঐ সহস্র বর্ণের পূর্ণবর্তী স্বরবর্ণকে টেনে দীর্ঘ ক'রে লুপ্ত অক্ষরের ক্ষতিপূরণ করা হ'য়ে থাকে। এই কথাটি মনে রাখলেই আর অভিভাষ্য ভারি ক'রে কাণ্ডাণ্ড হাইকেন বসাবার প্রয়োজন হবে না।

অক্ষর লুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও হরকোছাতিত বর্ণকে একটি স্বতন্ত্র 'অক্ষর' ব'লে গণ্য করার এবং তৎপূর্ণবর্তী স্বরবর্ণকে টেনে দীর্ঘ ক'রে অক্ষরমোহের ক্ষতিপূরণ করার এই যে আভাস হ'লো তার সম্বন্ধিত বা association-এর প্রভাব অস্তিত্বও দেখা গেল। অর্থাৎ যেসব অসংস্কৃত শব্দে (যথা—টুটুনি, বুম্‌বুম্‌, বাব্বা, চুচু, বুম্‌গা ইত্যাদি) স্বাভাবিক সহস্র বর্ণ পরবর্তী বর্ণ যুক্ত হয় না সেই সহস্রবর্ণগুলিও (অক্ষর মোহের ইতিহাস না পাকা সত্ত্বেও) একেবারেই স্বতন্ত্র 'অক্ষর' ব'লে গণ্য হ'লো এবং তৎপূর্ণবর্তী বর্ণ দীর্ঘ লাভ ক'রে তার ক্ষতিপূরণ করল। এইটাই হচ্ছে টুটুনি, বাব্বা প্রভৃতি শব্দের সহস্র ন এবং ব-কে একেবারেই স্বতন্ত্র 'অক্ষর' ব'লে গণ্য করার হেতু। এই association-এরই প্রতিক্রিয়া ক্ষমপিত শব্দও দেখা দিয়েছে এবং সেক্ষেত্রেই দ্ব্যপাত, মৃগপিত, দিক্‌পাত প্রভৃতি যেসব সংস্কৃত শব্দে সহস্রবর্ণ পরবর্তী বর্ণ যুক্ত হয় না সেসব শব্দেও সহস্রবর্ণের পূর্ণবর্তী স্বর দীর্ঘত্ব অর্জন ক'রে সহস্রের ক্ষতিপূরণ ক'রে। 'দ্ব্যপাত' প্রভৃতি শব্দে চাকু-unit দ্বারা মূলে 'অন্তত্ব' কিন্তু পরিমাণে এই association-এর প্রভাব প্রকাশিত হ'লে আমি মনে করি। রাজপদ, মানবও; টুটুনি, বুম্‌বুম্‌, দ্ব্যপাত, মৃগপিত প্রভৃতি শব্দে এই association-এর প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হ'লে বিস্তারিত কয়েকটি আলোচনায় বুঝি ওৎফুৎকার।

অনিলবরণ লিখছেন, "বাধারা, একধার, রাজপদ, মানবও প্রভৃতিতে ও, রা, মা-কে টানিয়া পড়িতে চির-অভ্যস্ত, তাহারা অনায়াসে মৃগপাত, দ্ব্যপাত প্রভৃতিতেও ব, স্ব-কে টানিয়া পড়িলে; অতএব এখানে দ্ব্যপ-তন্ত্র হইবার আশঙ্কা নাই।" অনিলবরণের এই কথা মতো খানিকটা সত্য আছে সন্দেহ নাই; কারণ এখানেও যৌগিক ছন্দের উপর পূর্ণাভ্যাস ও association-এর প্রভাবের নিদর্শনই পাচ্ছি। কিন্তু এই unconscious আভাস ও association তো আমাদের কানকে টিক্‌ তার উত্তেজিতিকও নিয়ে যেতে পারে, এক্ষাতিও মনে রাখা দরকার। আরেকটু বুঝিয়ে বলছি। 'রাজপদ'ের রাজ-ব-কে বিশিষ্ট ভাবে উচ্চারণ করার অভ্যাসের ফলে আমরা 'দ্ব্যপাত'ের মূ-ব-কেও যেমন বিশিষ্ট ক'রে উচ্চারণ করতে অভ্যস্ত হইছি, তেমনি 'মৃগপিত' প্রভৃতি শব্দের মূ-কে সংক্ষিপ্ত করার অভ্যাসের ফলে (মৃগপিত-কে তিন unit দরলেই) প্রথম রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি শব্দের 'প্রাণ', 'মান'-কেও সংক্ষিপ্ত করার অভ্যাস 'অতি অনায়াসেই' হ'তে পারে। মৃগপিত, মার্গও প্রভৃতি শব্দে যদি তিন unit দ্বা বায় তাহ'লেই এরের analogy-তে প্রাণদও, মানবও প্রভৃতি শব্দেও তিন unit দ্বা শব্দ হবে না, অর্থাৎ কানকে ওভাবে অভ্যস্ত করা কঠিন হবে না।

প্রথম মার্গও-তাপে বিদগ্ধ ধরনি

এই লাইনটির ধ্বনি বাধের কান 'অভ্যস্ত' তাদের কানে কঠোর মালবও-বিধি করিল জ্ঞার।
এই লাইনটিও ধারণা এখানেই না। এরকম metrical liaison বা ছন্দ-সঙ্গি সম্পূর্ণ অভাবনীয় ব'লে এবং চেয়ের চিরন্তন অভ্যাসের ফলে তাতে প্রথম প্রথম 'আপত্তি' হইবে। কিন্তু শুধু ধ্বনি এবং কানের উপর নির্ভর করলে আমাদের কান 'অতি অনায়াসেই' এবং 'অচিরেই' প্রাণদও-কে ছদ্মপিত বা মার্গও থেকে পৃথক্ ব'লে অধীকার করতে ইচ্ছাশক্তি করবে না। প্রাণদও; মানবও প্রভৃতি শব্দের সহস্র বর্ণকে যদি পরবর্তী বর্ণের সঙ্গে যুক্ত ক'রে শিল্পিত্ব করার প্রথা থাকত তাহ'লে ওসব শব্দকে চার unit-এর মধ্যাপ দেওয়া হ'তো না ব'লেই আমি মনে করি। যুক্ত করা যে

হয়নি তার মূলে ধ্বনিগত কোনো হেতু ছিল না; কারণটি হচ্ছে সংস্কৃত ব্যাকরণগত association এবং সেই association আভ্যাস আমাদের যৌগিক ছন্দটিকে নিয়ন্ত্রিত করছে।

আমার মনে হয় অনিলবরণ রবীন্দ্রনাথকে একটি ভুল বুঝছেন। 'বৎসর' কথাটিকে টেনে বাড়ো করা চলে কিন্তু 'দ্ব্যপাত'-কে টেনে বাড়ো করা ভুল, একথা বলা রবীন্দ্রনাথের স্বকিপ্রায় নয়। তাঁর মতে যৌগিক ছন্দে 'বৎসর' এবং 'দ্ব্যপাত' উভয় শব্দকেই তিন unit ব'লে গণ্য করতে হবে; যৌগিক ছন্দেই 'দ্ব্যপাত'-কে চার unit গণনা করা হইবে ভুল মনে করেন। তেমনি 'বৎসর' শব্দকেও তিনি যৌগিক ছন্দে চার unit ব'লে গণনা করা ভুলই মনে করেন। অল্প ক্ষণে (অর্থাৎ মাত্রাভূত ছন্দে) তিনি 'বৎসর'-কে চার ব'লেই গণনা করেন; সে ক্ষেত্রে 'দ্ব্যপাত'-কেও টেনে বাড়ো ক'রে পাঁচ মাত্রা ব'লে গণনা করা হবে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে যৌগিক ছন্দে বৎসর ও দ্ব্যপাত উভয়ই তিন 'ব্যাটি' আর মাত্রাভূত ছন্দে এ শব্দ দুটি ব্যাতিমানে চার ও পাঁচ মাত্রা। তাঁর মতে কোনো ছন্দেই 'দ্ব্যপাত' শব্দে চার unit নয়। কিন্তু আমি মনে করি যৌগিক ছন্দে দিক্‌, দিন, রাজ, মান প্রভৃতির দ্বা-ব-কেও ছই unit ব'লে গণ্য করা চলে; কিন্তু সমাসবদ্ধ শব্দে দ্ব্য-কে এক ব্যাতিমানে গণ্য করলেই ভালো শোয়ার। "বাংলা ভাষার স্বভাবের মতোই যথেষ্ট প্রশ্ন আছে", রবীন্দ্রনাথের এই dictum-টি সম্বন্ধেই অনিলবরণ একটি ভুল বুঝছেন, কারণ এটি যে শুধু ভূত ভাষার-প্রতিই প্রযোজ্য তা নয়; রবীন্দ্রনাথ এটিকে চলতি এবং সাধু উভয় ভাষাভীতির প্রতিটি প্রযোজ্য মনে করেন। বস্তুত এই dictum-টির বাধ্যতা করা উপলক্ষে তিনি যে দৃষ্টান্ত রচনা করেছেন সেগুলি সাধুভাষা এবং সাধু অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দসহই (বৎসর, মৃগপিত ইত্যাদি) দৃষ্টান্ত (দিক্‌তা—১০০৮, পৌষ, পৃ: ৭১৩ জেরা)। ঐ dictum-টি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা এখানে অনাবশ্যক।

মু্যাহোক্‌, যৌগিক ছন্দে মু্যধ্বনি-প্রয়োগের মূল নীতি হচ্ছে এই—(১) শব্দান্তবর্তী মু্যধ্বনির উচ্চারণ, সর্বত্রই; বিশিষ্ট ও তার মূলা ছই unit; (২) শব্দ মধ্যবর্তী মু্যধ্বনির

উচ্চারণ, 'সাধারণত' সংশ্লিষ্ট ও তার মূলা এক unit (০) সমাসবদ্ধ শব্দকে কবি বিকল্পে অর্থও বা বিচ্ছিন্ন ব'লে গ্রহণ করতে পারেন, বিশেষতঃ যেকোনো সমাসার্থগত শব্দ-দ্বি-ত্ব স্ব বা বাজ্ঞ সক্তি এবং যুক্তবর্ণের দ্বারা অবিচ্ছেদ্য ভাবে গঠিত নয়। এই নিয়ম নিম্নলিখিত শব্দে আরেকটি সাধারণত্ব মনে রাখা দরকার যে, সংস্কৃত শব্দে কোনো বর্ণের অক্ষর লুপ্ত হ'য়ে সহস্র উচ্চারণ হ'লে ঐ বর্ণের আশ্রিত বর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ ক'রে লুপ্ত অক্ষরের ক্ষতি পূরণ করা হয়; অর্থাৎ অক্ষর লুপ্ত হবার ফলে যে মু্যধ্বনির উৎপত্তি হয় তার উচ্চারণ বিশিষ্ট বা স্বাভাবিক হ'য়ে থাকে, সংশ্লিষ্ট বা একমাত্রিক হয় না। যথা, রাজপদ, মানবও ইত্যাদি। কিন্তু আমরা দেখেছি যে এই সাধারণত্ব হ্রস্বটি সম্ভারত পালিত হ'লেও এটি যৌগিক ছন্দে পক্ষে অলম্বনীয় রূপে অভাবজনক নয়। এই হ্রস্বটি পালন নী করলেও যৌগিক ছন্দের প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে। অর্থাৎ মনেও, রাজও প্রভৃতি শব্দে তিন unit দরলেও যৌগিক ছন্দের নীতি নষ্ট হবে না ব'লে মনে করিয়ে। রবীন্দ্রনাথ একটি দৃষ্টান্ত রচনা করেছেন (পরিচয়-১০০৮, মাঘ) —

একটা মল ছুটা নয় একসারের বেশ
এখানে 'একটা' শব্দে দুই unit, কিন্তু 'একশো'-তে তিন unit। আমি যদি লিখি—

একশো মল ছুটা নয় একসারের বেশ
তাহ'লেও যৌগিক ছন্দের নীতি অব্যাহতই থাকবে, রেননা এখানে 'একশো'-কে একটি অর্থও শব্দগুণ গণনা করা হয়েছে। বাহ্যিক উপরে যৌগিক ছন্দের যে নিমিত্ত (সাধারণত্ব হ্রস্বটি নিয়ে চারটি) নিয়মের কথা বলুন তার মধ্যে বিভ্রান্তি নিরামিত। কিন্তু বাস্তবিক দেখা যায়। অনিলবরণ এই সব বাস্তবিকের আলোচনা করার উপর অভ্যস্ত বেশি জোর দিয়েছেন, কারণ তিনি মনে করেন অঙ্গসঙ্গান করলে কোর বাস্তবিক অনেকই নিমূল্যে পাবে। আমার কিন্তু মনে হয় বাস্তবিক বাস্তবিক বিপুল রবীন্দ্রনাথেরাও বেশি নিমূল্যে না। আর যেকোনো 'আপত্তি' বা বাস্তবিক ব'লে মনে হয় সেগুলিও ব্যাকরণের নিষাধনের মতো নিষ্ক বাস্তবিক নয়; সেগুলিও কোনো না কোনো সাধারণত্বের এলাকার মধ্যে

পড়ে। এই সব ব্যতিক্রম সম্বন্ধে অজ্ঞাত (বৈশাখের 'বিজিতা') বিস্তৃত আলোচনা করেছে। এখানে শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, ঐ সমস্ত ব্যতিক্রমের অধিকাংশই অ-সংস্কৃত বাংলা শব্দের মধ্যবর্তী হস্তস্ত বাক্যনকে পরবর্তী বর্ণে বন্ধ না করার অভ্যাস থেকেই উৎপন্ন। যেমন, বাবলা, টুনটুনি, মসজিদ, বাদশা, দরকার, কারবার, গোলামাল, তোলপাড় ইত্যাদি শব্দের মধ্যবর্তী হস্তস্ত বর্ণটিই এসব শব্দের unit-সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মায় যৌগিক ছন্দে। অজ্ঞাত ছন্দে অবশ্য এদের বর্ণার্থ মধ্যাংশ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই নেই। 'গোলামাল' শব্দটিকেই ধরা যাক। এ শব্দটিকে যে যৌগিক ছন্দে চার unit-এর মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে তা সফলই জানে, যথা—

ছন্দকের গোলামাল তোলপাড় গাড়া।

কিন্তু যদি এ শব্দটিকে তিন unit ব'লে গণ্য করে লেখা যায়—

ভাষা গোলামাল কবি ছুটল ভ্রমতা

তাহ'লেও যৌগিক ছন্দের নীতি নষ্ট হবে ব'লে মনে করিলে।

রবীন্দ্রনাথের "ছন্দের হস্তস্ত হস্তস্ত" এবং অনিলবরণের "ছন্দের হস্তস্ত" পড়ে মনে হয়, যৌগিক ছন্দের স্বরূপ নির্ণয় উপলক্ষে যে ছন্দের উপস্থিতি হয়েছে তাঁদের মতে শব্দ মধ্যবর্তী হস্তস্ত বাক্যনই যেন তার মূল্যে। কিন্তু তা নয়; যৌগিক ছন্দ শব্দ মধ্যবর্তী হস্তস্ত (অর্থাৎ অপ্রতিষ্ঠা) স্বরবর্ণও অপ্রতিষ্ঠ বাক্যনের চেয়ে কম সমতার স্থিতি করেনি। অর্থাৎ এছন্দে বাক্যনাত্মিক যুগ্মধ্বনির চেয়ে স্বরাত্মিক যুগ্মধ্বনির সমতাও কম নয়, বরং বেশি। অগ্রপ্রাচ্যের বিজিতায় আমি উক্ত সমতার কথাই উত্থাপন করেছিলাম। এখানে সে সমতার পুনরুত্থাপন করতে চাইনে। শুধু ছয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েই এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব। রবীন্দ্রনাথ-দেখিয়েছেন যে, যৌগিক ছন্দে 'চিনি' শব্দে 'চিন্' এই বাক্যনাত্মিক যুগ্মধ্বনিটি বিধেয় এক এবং দুই unit ব'লে গণ্য হ'তে পারে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে তাহ'লে 'হেঁল'ন', 'চাঁটেতে' 'শিউলি', 'কেউটে' প্রভৃতি শব্দের হেঁ, চাঁ, শিউ, কেউ, এই স্বরাত্মিক যুগ্মধ্বনিগুলিকেও কেন বিকল্পে এক এবং দুই

unit ধরা হবে না। আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে এই স্বরাত্মিক যুগ্মধ্বনিগুলি সর্বদাই দুই unit ব'লে গণ্য হয়; অথচ আদ্যবাদের প্রাচীন সাহিত্যে এগুলি এক unit-এর মধ্যাংশও পেয়েছে। যথা—

বরদেয় অমর হইল সকলে আর।

বরদেয় ছাড়ি' ওড়া আইনা দ্বারাচার।

—ভূতবাসের আত্মবরণ

এখানে 'হেঁ' এবং 'আই' এ-টি স্বরাত্মিক যুগ্মধ্বনি এক unit ব'লেই গণ্য হয়েছে। আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

কৃষ্ণ হইলা ইজগার্য শতী কার্যবাসে।

আপনি হইলা বন্দী আপন সময়ে।

—কুসংসার, বাদশ সর্গ, ফেরজ

এখানে প্রথম 'হেঁ' এক unit এবং দ্বিতীয় 'হেঁ' দুই unit। কিন্তু আঙ্গকাল হইল, চাঁটেতে, শিউলি, কেউটে প্রভৃতি প্রায় সমস্ত যুগ্মধ্বনিই দুই unit ব'লে গণ্য দুই। যে ভিন্নিষ্ঠা মূলে এক তাকে এভাবে সর্বত্র টেনে লীড় করে দুই করলে কি ধ্বনিতৈ শৈথিল্য দেখা দেয় না? অথচ মলা এই যে 'হেঁল' শব্দে তিন unit অথচ 'শৈল' শব্দে দুই unit। 'পইতা' শব্দে তিন unit, কিন্তু 'শৈতা'-তে দুই; অর্থাৎ এ শব্দটিকে বিকল্প চলে। কিন্তু আঙ্গকাল আর 'হেঁল' লেখা হয় না ব'লে এ শব্দটিকে বিকল্পও চলে না। চাঁটেতে, কেউটে প্রভৃতি শব্দে কখনও বিকল্প চলে না, কেননা বাংলায় আই'কার, এউ'কার নেই। সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্তী ঐকার এবং উ'কার যৌগিক ছন্দে সর্বত্রই এক unit। কেননা 'ওসব শব্দে ঐ এবং উ-কে জুই এবং অউ লেগার প্রথা কাই'; আমরা শূইল এবং গউবব লিখিনে। কিন্তু অ-সংস্কৃত শব্দে বিকল্প চলে, কেননা এফেরে উভয় রকম বানানই চলে। কিন্তু আমার বিশ্বাস যৌগিক ছন্দে শব্দ মধ্যবর্তী ঐ কিংবা ঠকে বিলিষ্ট করে দুই unit ব'লে গণ্য করলে ছন্দের ধ্বনিতৈ শৈথিল্য দেখা দেয়। যথা—

বোলেতা কহিল, এ যে কুম মজাঙ্ক;

এরিত্তর মধুর এত করে কাই।

মধুর বয়ে তারে—তুমি এসো হাই,

আরো কুম মজাঙ্ক করি, কুম হাই।

—হাট-কলসে, কবিতা, রবীন্দ্রনাথ

এখানে বাক্যনাত্মিক যুগ্মধ্বনি 'বোল্' এবং স্বরাত্মিক যুগ্মধ্বনি 'মজ্' এ, দুটিই শব্দমধ্যবর্তী অথচ দুটিই এখানে বিলিষ্ট ও বৈমাত্রিক হয়েছে। এরূপ যে করা যায় না তা নয়; কিন্তু আমার মনে হয় যৌগিক ছন্দে শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে এভাবে বিলিষ্ট করলে ছন্দের ধ্বনিতা কিছু শিথিল হয়।

মহাগর্বে বোল্‌তা কহে মোমাটির ডেকে

এই লাইনটির সঙ্গে উদ্ধৃত লাইন-কটি মিলিয়ে দেখলেই এ কথাটা তাৎপর্থা বোঝা যাবে। কিন্তু ছন্দের ধ্বনিকে কোথায় শিথিল করা প্রয়োজন এবং কোথায় দৃঢ় করা প্রয়োজন তা সম্পূর্ণরূপেই কবির উপর নির্ভর করে। (এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার চচ্চ বিজিতা—১৩৩৮, অগ্রহায়ণ ও মাঘ জ্যৈষ্ঠা)।

বাক্যক, সংস্কৃত অ-সামান্য শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি যৌগিক ছন্দে সর্বত্রই এক unit ব'লে গণ্য হ'য়ে থাকে, এই ধারণা প্রধান বক্তব্য এবং এ নিয়মের ব্যতিক্রমকেই আমি বর্ণার্থ ব্যতিক্রম ব'লে মনে করি। আর এই বর্ণার্থ ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের 'বিশুল কাব্য-সাহিত্যে খুব কমই পাওয়া যায় এবং এই ব্যতিক্রমগুলির সংখ্যা এত কম যে আমি এখনও এগুলির অন্তরে কোনো বিশেষ তত্ত্বের (principle-এর) সন্ধান খুঁজে পাইনি। এ বিষয়ে আমি প্রথম 'আভাস দিয়েছি' বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান' পুস্তিকায় (পৃ: ১৫৪) বৈশাখের বিজিতায় (পৃ: ৫১২-১৬) এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছে। এখানে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়েই ক্ষান্ত হব।—

যুগ্মধ্বনি বাক্য কাব্যতঃ গায়ার মাধারে

নিমার অঙ্গর বাঁগালায়।

—অতীতকাল, পূর্ববা, রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'যুগ্মধ্বনির' কথাটিতে মাত্রান্তরের কার্যদায় ছয় unit ধরা হয়েছে; অর্থাৎ এখানে ঐ কথাটি যৌগিক ছন্দে বাক্যক substitute। আমি এ পর্যন্তই বলতে পারি; কিন্তু কোন কোন 'স্থলে' এর রসম substitution' চলে আমি সে কথা বলতে পারিনে। আর যতদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের বিংরা অল্প কোনো প্রতিভাশালী কবির রচনায় এ রসম substitution-এর যথেষ্ট দৃষ্টান্ত না মিলবে ততদিন

পাওয়া এরূপ substitution-এর অন্তর্নিহিত তত্ত্বটিকে নিঃসন্দেহে আয়ত্ত করা সম্ভব নয় ব'লেই মনে করি। "If Tagore favours it, that ends the matter," ব্রীজবিন্দ্রের এই উক্তি অল্পদূরে আমি পূর্বেও ব্যতিক্রম-গুলিকে বর্ণার্থ বা আন্ত প্রয়োগ ব'লে গ্রহণ করতে রাজি আছি। শুধু তাই নয়; এই ব্যতিক্রমগুলিতে যে ভাবের প্রকল্প শক্তির সন্ধান এবং ভবিষ্যতের নূতন বিকাশের ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে, অনিলবরণের একথা মেনে নিতেও অসম্ভব নেই। আমার বক্তব্য এই যে, যতদিন পর্যন্ত এই সব ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত যথেষ্ট সংখ্যক না হবে এবং যতদিন পর্যন্ত দেবের ভিত্তিকার principle-টিকে formulate না করা যাবে, ততদিন পর্যন্তই এগুলি ব্যতিক্রম ব'লে বর্ণার্থ প্রয়োগ ব'লে গণ্য করা হবে অর্থাৎ ততদিন পর্যন্ত সাধারণ লেখকদের রচনায় এগুলিকে সাধু ব'লে গণ্য করা হবে না। কিন্তু যখন এই ব্যতিক্রমগুলিকে কোনো তত্ত্বের অঙ্গত্ব ব'লে ধরা যাবে তখনই আর এগুলিকে বর্ণার্থ ব্যতিক্রম ব'লে গণ্য করা হবে না। বর্ণার্থক, আমি যদি উক্ত দৃষ্টান্তটির অঙ্গসরণ করে লিখি—

যে শব্দার্থ আমি যুগ্মধ্বনি ধ্বনিতৈ

অর্থ তার পার কি স্থিরিত?

তাহ'লে "যে শব্দার্থ" অংশটিকে যৌগিক ছন্দে মাত্রিক substitute ব'লে স্বীকার করে এই লাইনটিকে নির্দোষ বলা হবে কি না, রবীন্দ্রনাথ এটিকে নির্ণুৎ ব'লে স্বীকার করবেন কি না, তাই আমার জিজ্ঞাস্য। যদি তিনি এটিকে নির্ণুৎ ব'লে স্বীকার করেন তাহ'লে এই ব্যতিক্রমগুলিকেও কোনো একটি সাধারণ তত্ত্বের অন্তর্গত করে formulate করা শক্ত হবে না।

অনিলবরণ অনেক বিচারের পর এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন যে, "ছন্দ সম্বন্ধে নিয়ম বানিধা দেওয়া সহজ নহে" এবং "কৃত্রিম নিয়ম বানিধা কবিরের এই স্বাধীনতাকে হরণ করিবার চেষ্টা কেন?" ছন্দের নিয়ম বা formula তৈরি করা যে সহজসাধ্য নহে, এটি একটি truism; ইহাও বৈধি বাবাই এ কথা স্বীকার করবেন। কিন্তু কাজটি সহজসাধ্য নয় ব'লেই এ কাজে আনন্দ আছে; আজ সে হুতই এ কাজের

প্রয়োজনীয়তাও। কতিন কাজের কতই বিশেষ সাধনার প্রয়োজন হয়। যে কাজ বিনা 'আর্যাসেই' সম্পন্ন হয়, তার মূল্য কি? 'অনিবরণ' 'কৃত্রিম' নিয়ম বলতে কি বুঝছেন তা জানিনে। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে 'আমি' ছন্দের যে সব নিয়ম formulate করতে চাই তা 'কৃত্রিম' নয়, কেন না কোনো মনগড়া নিয়ম জারি করাই আমার 'অভিপ্রায়' নয়। কবিদের অবলম্বিত ছন্দগুলির বিবেচনা করে ওপর ছন্দের অন্তর্ভুক্ত নিয়মকে আমি induction-এর সাহায্যে ধরতে চেষ্টা করছি এবং করছি। আর induction-এর সাহায্যে প্রাপ্ত নিয়মকে আর বাই বলা থাকে না কেন, কখনও 'কৃত্রিম' বলা যায় না; কেন না এ নিয়ম তো অভিজ্ঞান্দ নয় যে এগুলি পালন না করলেই কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হবে? আমার inductions 'অসম্পূর্ণ' হতে পারে কিংবা একবারেই ভ্রান্ত হতে পারে, কিন্তু 'কৃত্রিম' নয়। অল্প কেউ যদি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রকমের induction করেন এবং তা যদি 'অধিকতর সঙ্গত' হয় তবে তাঁর induction মেনে নিতে আমি কিছুমাত্রও বিধা করব না। কিন্তু induction করার প্রয়োজনীয়তা নেই এ কথা মানতে পারিনে; কারণ তাহলে কোনো দেশে কোনো ভাষারই ব্যাকরণ, ছন্দ এবং অলঙ্কার নিয়ে কখনও আলোচনাই হ'তো না। আর 'অনিবরণের' সব চেয়ে বড়ো ভুল হচ্ছে এই মনে করা যে, এই সব ছন্দের নিয়ম বাঁ'র করার মধ্যে "কবিদের স্বাধীনতা" হরণ করার চেষ্টা" রয়েছে, তাঁর এ কথা মনে করা একেবারেই ভুল। কারণ আমি তো নিয়ম 'বাঁ'র করতেই চাই, নিয়ম 'জারি' করতে নয়। তা ছাড়া, আমার ছন্দের আলোচনা বা ছন্দের নিয়ম কবিদের ভক্ত মোটেই নয়, অর্থাৎ তাঁরা ছন্দোবিৎ-এর নিয়ম মেনে ছন্দ রচনা করবেন এ কথা কখনও

কোনো ছন্দোবিৎ-এর 'অভিপ্রায়' হ'তে পারে না। কবিরা 'আপন মনে ছন্দ রচনা' করবেন; ছন্দোবিৎ এসে তার থেকে নিয়ম বাঁ'র করবেন নিজেই জিজ্ঞাসা তৃপ্তির অজ্ঞে, ভাষা-ভাবিকের আলোচনার জন্তে, প্রথম শিক্ষার্থীর শিক্ষার জন্তে, কিন্তু কবিদের guidance-এর জন্তে নয়। এ কথাটুকু স্বাক্ষর না করলে ছন্দোবিৎ-এর প্রতি অবিচার করা হবে। কবিরা যে ছন্দের আলোচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না, বিংবা সে আলোচনার যোগ দেবেন না, তাও নয়। কেন না, কোনো বিশেষ ধরনের নিয়ম বা induction ঠিক হ'তো কি না তা বলতে তাঁরা সম্পূর্ণ অধিকারী; বরং অল্প দশকনের চেয়ে তাঁরা বেশি অধিকারী, কেন না ছন্দ নিয়েই তাঁদের কারবার। যাহোক, এই সমস্ত ছন্দের নিয়ম বাঁ'র করার মধ্যে যে কবিদের স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা কিছুমাত্রও নেই, এ কথা আমি জোরের সঙ্গেই বলব। সুবিখ্যাত ইংরেজি ছন্দ-তাত্ত্বিক অধ্যাপক Saintsbury-র দ্বারা আমিও উদ্ধৃত পারি "These Rules are not imperative or compulsory precepts, but, observed inductions from the practice of Bengali facts. He that can break them with success, let him" (Historical Manual of English Prosody p. 30) শ্রীশ্রবিনন্দ-র উক্তিও ঠিক এই কথাইই সমর্থন পাই। ছন্দের নিয়ম imperative কিংবা compulsory নয় ব'লেই তো কবিজা যুগে যুগে নতুন নতুন ছন্দের উদ্ভাবন করছেন এবং ছন্দোবিংরাও নতুন নতুন নিয়ম 'আবিষ্কারে' ব্যাপ্ত আছেন। ঐ সব নিয়ম imperative হ'লেই 'কবিদের স্বাধীনতা-হরণ' ঘটিত অর্থাৎ নতুন ছন্দেও উদ্ভাবিত হ'তো না এবং নতুন নিয়মও formulated হ'তে পারত না।



অনন্ত-তৃষ্ণা ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রী প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়

স্মৃতির ইতিহাসের পূর্বে অনন্ত শূন্য জড়িয়া বিখ্যাত্য বিরাগ করিতেছিলেন। সেই শব্দহীন, বর্ণহীন বিরাট শূন্যতা তাঁহার প্রাণে লীলাবোধ জাগ্রত করিয়াছিল। 'এই লীলা-বোধই স্মৃতির মূল প্রেরণা। এই প্রেরণার বিখ্যাত্য মানবান্ধার, অর্থাৎ স্মৃতিতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাগ করিতেছেন। 'অথও পূর্ণতার মাঝে ভগবানের, স্বপ্নও ছিল না হুংগও ছিল না; বন্ধন ছিল না, মুক্তিও ছিল না। এ জাগরণ খণ্ডের স্মৃতিতে। কবি স্পষ্টই বলেছেন:

"যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে তো হয়নি কোনো দেখা

আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম
শুভে শুভে হুটান আলোর আনন্দ হৃদয়।

আমি এলেম, কাঁপল তোমার বুক,
আমি এলেম, এল তোমার ছন্দ,

আমি এলেম, তাই তুমি এলে,
আমার মুখ তেরে
আমার পরশ পেলে

"আপন পরশ পেলে।"

২৯, কলকাতা—

স্মৃতির সেই 'আমি' প্রজাত হইতে মানবান্ধা সেই পরম বিচ্ছেদের বিরহ-বাধা বৃকে লইয়া আজও জীবনের স্তরে স্তরে ফিরিতেছে। এই 'অনন্ত মিলন-তৃষ্ণার জীবন-বাণী' অতৃপ্তি জীবনের গতিশীলতার একমাত্র প্রেরণা। মানব-জীবনে এই অনন্ত-তৃষ্ণাই বিখ্যাত্যের আধার।

• জীবনের ব্যাপকপথে তৃষ্ণা ক্রিয়ণে গতির পর গতি টানিয়া মানবান্ধার গতি নিয়ন্ত্রিত করে তাহাই 'আমরা' রবীন্দ্রনাথের মাঝে দেখিতে প্রাঙ্গণ পাইব। এবং ক্রিয়ণে তৃষ্ণা রূপান্তরিত

হইয়া মানবান্ধাকে বাস্তব ইন্দ্রিয়ের স্তর হইতে অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক স্তরে লইয়া যায় তাহাও লক্ষ্য করিব।

মানবান্ধার স্রুষ্কার শৈশবে তৃষ্ণার লেশ পু'ড়িয়া পাওয়া যায় না। কেমন যেন একটা স্বপ্নীয় তৃপ্তির ঘোর মার কোলের শিশুটিকে বিভোর করিয়া রাখে। এখনও শিশু বন্ধনহীন ও মুক্ত। যে হাত বাড়ায় তারি কোলে ছুটিয়া যায়। জগৎজোড়া যেন সবই ওর মা। কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিনের নয়। ধীরে ধীরে শিশু জন্মাবতী মাকে পৃথক কেঁবে নেয়। তারপর মার বোনা, মার তুলা শিশুর বুক জড়িয়া বসে। জীবন আনন্দ বেদনার তরঙ্গ তুলিয়া লীলায়িত করিয়া উঠালে।

মার কোল ছাড়িয়া শিশু কৈশোরে যেদিন খেলার আসরে নামিল তৃষ্ণা সেদিন খেলায় ও খেলার সাথীদের মাঝে আসন পাতিল। ও নব নব রঙে কিশোর হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কৈশোরের তৃষ্ণার বেদনা আছে কিন্তু জালা নাই।

এ জালা জাগে যুগে অবস্থায়। তৃষ্ণার তাঁর মোহন-মুষ্টি যুগের প্রাণকে মাগল করিয়া জগতের দিকে টানিয়া লইয়া চলে। এই সময়ে যেমন একদিকে তৃষ্ণার সহস্রবর্ণী প্রেরণা মানবকে অন্তর করিয়া তোলে অতীন্দ্রিয় তেমনি বেদন ও মনে এক অপূর্ণ শক্তি সঞ্চার 'অনুভূতি' করে। তাহার প্রাণ যেন:

মহা উল্লাসে দুটিতে চায়
ভুখতের বিধা দুটিতে চায়
জ্ঞাত-কিরণে পালন হইয়া
জ্ঞাত-মাখারে লুপ্তি চায়।

জ্ঞাত-সমীচ—

এই সময় কোন বাধা, কোন বিপদ বা কষ্ট এই উদ্দাম প্রাণশক্তিকে তৃফার প্রবল প্রবাহ হইতে টানিয়া রাখিতে পারে না। যুবক নির্ভয়ে বলে :

মারিয়া যখন উঠেছে পয়ান
কিনের আঁধার কিনের পাশাণ
উপলি যখন উঠেছে বাসনা

কণতে তখন কিনের ডর।
প্রভাত সন্ধ্যা—

বড় আত্মবিকারের সময় এটি। এই সময় মানব বাহ্য চার তাহা প্রাণ দিয়া চার এবং উহা পাইবার ক্ষমতা সমগ্র পৃথিবীর মাথের সংগ্রামের ক্ষমতা প্রস্তুত হয়।

হীরা হীরা জীবনের পথে কাঁটা গাছ দেখা দেয়। বিক্ষলতা, প্রভাবনা, হিসা, কেবল একে একে উপস্থিত হয়। মকলুনি মরীচিকার মত বাসনার নয়নমুদ্রের ছবি শুল্ক নিশাইয়া যায়। তৃফার রঙিন কলঙ্ক, কণিকের তরে কুটিল, কণিক আনন্দ দিয়া শুকাইয়া যায়। কণপ্রভার কণিক আলো জীবনের অন্ধকারকে আত্মা গুহারতর করিয়া দিয়া যায়। কেমন যেন একটা শূন্যতা, এতটা বিধা ও সংযম মনের মধ্যে আগিয়া উঠে। কণিক আনন্দের লেশুণ আর সে নয় :

"তাই চারিদিকে চায়, মন কেঁদে যায়,
এ নড়ে, এ নড়ে, এ নড়ে গো।"

তৃফার রূপান্তর ঘটিতে থাকে। এই রূপান্তরের মাঝ দিয়া তৃফার বাস্তব রূপটি পরিষ্কৃত হইয়া উঠে ও মানব আত্মপুষ্টি লাভ করে। জীবনের এই তরে মানব বুদ্ধিতে পারে যে :

"বাহা চাই তাহা জুল করে চাই,
বাহা পাই, বাঁধা চাই না।"

পাশাণ—উৎসর্গ—

জীবনের এই প্রথম স্তরের তৃফার প্রতিক্রিয়ায় বাস্তব জগতের প্রতি যে বিক্ষুব্ধ আগিয়া উঠে উহাও তীর ভাবই ধারণ করে। এই বিক্ষুব্ধ অস্তরে পূর্ণ তৃফার যে রূপান্তর

ঘটিতে থাকে তাহা তো সহজ দৃষ্টিগোচর হয় না। দৃষ্টির অগোচরে নবতৃফার সৃষ্টি। মানব যখন তৃফা ও আকাঙ্ক্ষার ক্ষুদ্রতা ও ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়া ইহাদের নাশের ক্ষমতা বন্ধ-পরিকর হয়, তখনই যে পূর্ণতৃফা নবরূপে দ্বন্দ্ব অধিকার করিয়া বসিয়াছে তাহা কি মানব বুদ্ধিতে পারে ?

এই নবতৃফা এক নিতা, অনন্ত সৌন্দর্যময় আনন্দের অধোমুখ জাগ্রত হয়। ইহার গতি বহিমুখী নয় অন্তর্মুখী। আত্মার এই নৃতন পথে বাজার ইঙ্গিত করিয়াই কবি বসিতেছেন :

"কুল থেকে মোর গানের তরী
বিলম্ব গুলে,—

যেখানে ওই কোকিল ডাকে ছায়াতলে—
সেখানে নয়।

যেখানে ওই গানের বহু আসে জলে—
সেখানে নয়।

যেখানে নীল মগন-শীলা উঠেছে জলে
সেখানে মোর গানের তরী বিলম্ব গুলে।"

১২—গীতাঙ্গি—

অন্তর্দ্বারের অভ্যন্তর পথে তৃফার নৃতন বাঁধী বাঁধিয়া উঠে পৃথিবীর সৌন্দর্য ও আনন্দের এক নিতা রসময় মূর্তি মানবের চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া আকর্ষণ করিতে থাকে। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই কবি লিখিয়াছেন :

"কে গো তুমি বিদেশী !

সাপ খেলাশা বাঁধী তোমার
বাক্যলো হর কী বেশী ?

কত কালের আঁধার জেদে

বাহির হ'লে এলো যে রে
দ্বন্দ্ব-প্রভার নাগিনী,

নত মাধার গুটিয়ে আছে

ডাকো তারে পাচের কাছে

বাড়িয়ে তোমার রাশিনী।"

১১—গীতাঙ্গি—

জীবনের এই তরে এই অভ্যন্তর "বিশেষী" বাঁধী ও অধোমুখ দ্বন্দ্বকে বিভক্ত করিয়া রাখে। এই "বিশেষী" পরিত্যক্ত তৃফা যতই তীর হয় অপরিচয়ের আবরণের বাধা

ততই ক্রমশ হইয়া উঠে। বহির্জগতের বিক্ষলতা ও ভ্রমশ অস্তর্জগতেও সন্দ ছাড়ে না। মাঝে মাঝে তৃফার তীরতায় এই আবরণ কণিকের তরে সরে যায় ও ইন্দ্রিতের সাগাং-কার বা উপলব্ধি ঘটে। তখন মানবাত্মা বলে :

"আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিল
সেখানে তোমার পাইনি
বাহির পানে চোখ মেলেছি
দ্বন্দ্ব পানেই চাইনি।"

—১২, গীতাঙ্গি—

"এই যে তুমি" এই কথাটি, বলাব আদি বলে
কতরকমই চোখ ফেরানো

কত পানেই চলে।"

—১৩, গীতাঙ্গি—

এই সময় অতীত জীবনের ভ্রম ও অভ্যন্তর অর্থপূর্ণ হইয়া উঠে। সেই বাসনার মরীচিকা, তৃফার প্রভাবনা সব নব উপলব্ধির আলোকে অর্থপূর্ণ ও উজ্জ্বল হয়। তাই সে বলে :

"এত দিনে জানালেন
সে, কখন কীললেন
সে বাগার জল।

মল্ল এ জগৎ

মল্ল এ জগৎ

মল্ল এ জগৎ

মল্ল এ জগৎ

মল্ল এ জগৎ

মল্ল এ জগৎ

মল্ল এ জগৎ

মল্ল এ জগৎ

মল্ল এ জগৎ

মল্ল এ জগৎ

মল্ল এ জগৎ

মল্ল এ জগৎ

মল্ল এ জগৎ

মল্ল এ জগৎ

মল্ল এ জগৎ

মল্ল এ জগৎ

মল্ল এ জগৎ

মল্ল এ জগৎ

মল্ল এ জগৎ

এই শব্দ আলোর কমল-বনে
বাহির হ'লে বিহার করে
যে ছিল মোর মনে মনে।"

—১৪, গীতাঙ্গি—

সে গান আদি শোনাব বার কাছে
নুতন আলোর তীরে,
চিরদিন সে মাগে মাগে আছে
আমার ভুবন ঘিরে।
শরতে সে শিউলি বনের তলে
ফুলের পথে বাঁধা টেনে চলে,—

—১৫, বঙ্গাঙ্গি—

এই অবস্থার জীবনে ও ভুবনে যখন একই সত্যের সাগাংকার হয় তখন তৃফা সাগর হয়। এই জীবন-দেহ-তার নিলন তৃফা—শুধু যে মানবের বৃক্ক হাসি অস্তর চেটে তোলে তা নয়; প্রেমোপসর্গের পাণেও এ মায়াবী মেশা লাগে। তাই কবি বলিতেছেন :

"লক্ষ্য হ'লে, একলা আছি বলে
এই যে চেয়ে অক্ষ পড়ে গ'লে
গণো বন্ধ, মনো বেশি
শুধু কেবল আমার এক ?
এই মাগে যে তোমার অক্ষ সেলে।"

—১৬, গীতাঙ্গি—

অনন্ত তৃফা এই সত্যটি ভক্ত কবির নিকট পরিষ্কৃত করিয়াছে যে বাহি ভক্ত ভগবানের বিরহে—বালুল, ভগবানও ভক্তের বিরহে আত্মল। তাই দেখি আভিনার কল্লর ফুলগুলি দেখিয়া কবির মনে ভগবানের মধুর আচ্ছাদন ও পথ-চাওয়াই পাঠিতেছে :

"তুমি আমার আত্মাকে কুটিয়ে রাখো ফুল :
আমার আনোমানের পথনিধি হয় পৌরষে আত্মল।
'ভগো' ই তোমার ফুল।
ওরা আমার কল্লর গান মনে তুলে যে থাকে।
তারা তোমার মূর্খের ডাক নিয়ে যে আমার নাম ডাকে।

ওগো ঐ তোমার মূল।
বিন কেটে যাহ অঙ্গ মনে, ওদের মুখে তবু
একু তোমার মুখের সোহাগে বাণী রাখ না হে বন্ধু
ওগো ঐ তোমার মূল।

হাসিমুখে আমার যতন মৌরব হ'বে যাচে
তোমার অনেক মুখের গণ-চাওয়াট ওদের মুখে আছে।
ওগো ঐ তোমার মূল হ'

—১০০, দীপ্তিমায়

আমাদের ঐহিক জীবন মানবাত্মার অনন্ত-জীবনের পথ-
ইতিহাস। ইহাতে আমরা দেখিতে পাই এক অনন্ত-তৃষ্ণা,
এক অসীম অতৃপ্তি, মানবের প্রাণকে জন্মজন্মান্তরের পথ
দিয়া ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছে। কোথাও সে পথ ভুলিয়াছে,
কোথাও শোকে জঙ্করিত হইয়াছে, কোথাও হৃৎকের শব্দায়
সুমাধিয়া পড়িয়াছে, একমাত্র তৃষ্ণাই জীবন-নিষ্ক'রিত্বকে

শ্রোতবশীলা রাখিয়াছে। কারণ ভগবানের মিলন-তৃষ্ণাই
জীবের মুকে অতৃপ্তির আশ্রয়, অনন্ত তৃষ্ণার আগুন আলিয়া
রাখিয়াছে যাহা একমাত্র ওই চরম মিলনেই নিভিবে। তাই
ভক্ত কবি যৌ প্রেমাম্পদ ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া
বলিতেছেন :

"তোমার তুমি রাখবে পূর
ভাষবে তারে নানা স্বরে
আপনার বিবহ তোমার
আমার মিল কাহা।"

—১০১, দীপ্তিমায়

জানি না এই তৃষ্ণা না থাকিলে মানবাত্মার যাহা শেষ
হইত কিনা? জানি না এই তৃষ্ণা না থাকিলে ভগবানের
স্বস্তির নিগূঢ় উদ্দেশ্য পূর্ণ হইত কিনা? তাই মনে হয় তৃষ্ণা
সত্য সত্যই ভগবানের আশীর্বাদ ও তাঁর নীলার সহায়!
ইহার সাহায্যে মানব মুক্তির সন্ধান পাইতে পারে।

ভূদেব উইভিং ক্যান্ট্রী

সকল রকমের স্বদেশী বেশমে প্রস্তুত

বেনারসী সাড়ী ও জ্যাকেট

শুভানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ও প্রিয়জনের

উপহার উপযোগী

বাবার ভাসর, গরল, মটিকা, খন্দর, বেনারসী, তাঁতের সাড়ী, সিল্কের চাদর
প্রভৃতি আধুনিক রংয়ের ও ফ্যাসানের প্রস্তুত হয়।

মো-ক্রম —
খোদায়া
খোদার দিট।

কারখানা :—
বেনারস দিট।

কেশী ও গৌতম

শ্রীঅমৃতলাল শীল

পূণ্যভূমি ভারতে এক কালে পার্শ্বনাথ বামী নামে এক
তীর্থঙ্কর বিচরণ করিতেন। তিনি জিন্, অর্হৎ,
ও ধর্মপ্ৰসূতাপক ছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবের [৮১৭
পূঃ দ্ধঃ] ২১৮ বৎসর পরে বর্ধমান বামী [৪৩২ পূঃ দ্ধঃ]
নামক আর এক তীর্থঙ্কর, জিন্ ও অর্হৎ ভারত-
ভূমি পবিত্র করিয়াছিলেন। পার্শ্বনাথ বামীর যাবতলগী
মহামুনি শ্রমণশ্রেষ্ঠ কেশী অন্ন বয়সেই জ্ঞানী-বলিয়া
প্রসিদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ধদা বহু শিষ্য ও
বিদ্যার্থী বৈষ্ণব হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নগরে ভ্রমণ করিতেন।
একবার তিনি শিষ্য ও বিজ্ঞানী সহ শ্রাবস্তী নগরে প্রবেশ
করিলেন। শ্রাবস্তীবাসীরা তাঁহাকে নগরের এক উপবনে
বিশ্রাম করিবার সুযোগ বক্রিয়া দিল। ঘটনারমতে, সেই
সময়ে মহাবীর বামীর মতাবলগী ও প্রধান শিষ্য মহামুনি শ্রমণ
গৌতম, শিষ্য ও বিজ্ঞানীগণের সহিত শ্রাবস্তীতে
আসিলেন। নারবাগীরা তাঁহাকে অল্প এক উপবনে বিশ্রাম
করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। উভয় শ্রমণের বিজ্ঞানীদের
প্রায়ই পরস্পর লক্ষ্য হইত। এক দিবস বিজ্ঞানীরা বিচার
করিতে আরম্ভ করিল, যে যখন উভয় তীর্থঙ্করের উদ্দেশ্য
একই, অর্থাৎ জীবের ধর্মক্ষর করিয়া নিষ্কাল্লাভ, তখন দুই
সম্প্রদায়ের নিষ্কাল্লাভের প্রভেদ হয় কেন? অর্থাৎ পার্শ্বনাথ
বামী চারটি নিয়ম প্রতিপালন করিবার আজ্ঞা করিয়াছেন,
কিন্তু বর্ধমান বামী পঞ্চম নিয়ম বাড়াইয়াছেন ও পার্শ্বনাথ
বামী সাধুদের কৌপীন ও বহিঃপাশ ব্যবহার করিতে আজ্ঞা
করিয়াছেন, কিন্তু বর্ধমান বামী সম্পূর্ণ নয়মাস অবজ্ঞা
করিয়াছেন। বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রশ্ন উপাধিত হইল, যে
কোন ধর্ম শ্রেষ্ঠ ও আমাদের কি করা উচিত। বিজ্ঞানীরা
আপন আপন গুরুকে প্রশ্ন করিল। স্থির হইল, যে একদিন
শ্রমণ কেশী ও শ্রমণ গৌতম দুই জনে মিলিয়া যাহা উচিত
তাহাই স্থির করিয়া দিবেন।

শ্রমণ কেশী শ্রমণ গৌতমকে সমিধ্য আসিতে দেখিয়া
সন্ধানের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। সংবাদ পাইয়া
নগরের বিদ্বান ও গুরু, ভক্ত ও অভক্ত, বহু দর্শক উপবনে
আসিল। সকলে আসন গ্রহণ করিল, শ্রমণ কেশী বলিলেন
“মহাশয়! আমি আপনাকে দুই একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
করিব মনস্ত করিয়াছি, অহুগ্রহ পূর্বক আমার সংশয় ছেদন
করিয়া অহুগ্রহীত করুন।” অহুগ্রহীত পাইয়া শ্রমণ কেশী
জিজ্ঞাসা করিলেন, “পার্শ্বনাথ বামীর মতে সাধুকে চারটি
প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হয়, কিন্তু বর্ধমান বামীর মতে
পাঁচটি। যখন ধর্ম এক ও উদ্দেশ্য এক, তখন এ প্রভেদের
কারণ কি? আপনার মনে কি কোনও প্রকার সংশয় হয়
না?” গৌতম উত্তর করিলেন, “ধর্মের সত্যাসত্য মনুষ্য
মাজেই বুদ্ধি দ্বারা জানিতে পারে। পূর্বকালের সাধুরা
নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁহারা ধর্মের গৃহ রহস্ত কষ্টে
বুঝিতে পারিতেন। শেষ সময়ের [অর্থাৎ আধুনিক সময়ের,
বা এই কথোপকথনের সময়ের] সাধুরা চক্ষু লবণ ও মূল-
বুদ্ধি। মধ্যযুগের সাধুরা নিরীহ ও বুদ্ধিমান ছিলেন।
এইজন্য ধর্মের দুই রূপ হইয়াছে। পূর্ব সাধুরা অতি কষ্টে
ধর্মের ধর্মগ্রন্থ করিতে পারিতেন, শেষ সময়ের সাধুরা কষ্টে
ধর্মপালন করিতে পারেন, কিন্তু মধ্যযুগের সাধুরা অনায়াসে
বুঝিতে ও পালন করিতে পারিতেন।”
শ্রমণ গৌতমের কথা শুনিয়া বোধ হয়, তিনি মহাবীর
বামীর সময় হইতে আপনার সময় পঞ্চাশ সময়েক তিন ভাগে
বিভক্ত করিতেছেন। প্রথম যুগের সাধুরা নিরীহ ছিল
তাঁহারা ধর্মের রহস্ত বুঝিতে পারিত না, দ্বিতীয় যুগে সাধুরা
লোবাণ্ডা শিক্ষা করিয়া ঠিক ঠিক ধর্ম পালন করিল ও
তৃতীয় বা শেষ যুগে সাধুরা কষ্ট সহিষ্ণু ছিলেন না,
তাঁহারা কষ্টের নিয়মগুলি ভাগ করিতে পারিলেই যেন
সুখী হইলেন।

পার্শ্বাধারী আদেশ মত সাধুদের চারটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইত। (১) হিংসা করিব না, (২) মিথ্যা বলিব না, (৩) পরভ্রম্য চুরি করিব না ও (৪) স্বাবর বা অস্বাবর কোন দ্রব্য রাখিব না। বর্দ্ধমান স্বামী আর একটি নিয়ম বাড়াইলেন, অর্থাৎ কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করিব। অনেকের বিশ্বাস, যে পার্শ্বাধারী স্বামীর নিয়মে চতুর্থ নিয়ম ছিল না, তাহার স্থানে পঞ্চম নিয়ম ছিল, কিন্তু কঠোরভাবে পালিত হইত না। বর্দ্ধমান স্বামী চতুর্থ নিয়ম বাড়াইয়া বৎসর ত্যাগ করিয়াছিলেন ও পঞ্চম নিয়মে কঠোরতা বাড়াইয়া ছিলেন।

শ্রবণ কেশী বলিলেন, “আপনি আমার সংস্র ছেদ করিয়াছেন, এখন আমার আর একটি প্রশ্ন আছে। বৎসন ধর্মের উদ্দেশ্য এক, তখন পার্শ্বাধারী স্বামী কৌশীন ও বর্দ্ধমান ধারণ করিতে ও বর্দ্ধমান স্বামী বৎসন মার্কেই ত্যাগ করিতে কেন আজ্ঞা করিয়াছেন? এ প্রভেদের কারণ কি?”

শ্রবণ গৌতম উত্তর করিলেন, “ঐশ্বর্যেরা আপন অঙ্গীম বুঝি বলে জীবের স্তব কামনা করিয়া ধর্মের বিধি বিধি করিয়াছেন। বাহ্যতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুদের সহজে দূর হইতে চিনিতে পারা যায়, সেইজন্য তাঁহারা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বাহ্য চিহ্ন স্থির করিয়া দিয়াছেন। ঐশ্বর্যেরদের মতে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম দ্বারাষ্ট জীবের নির্লিপ্যতা হয়, সাংসারিক চিহ্ন দ্বারা কিছুই হয় না। [অর্থাৎ কৌশীন ও বর্দ্ধমান ধারণ বা নথ বাস সাংসারিক চিহ্নমাত্র। ধর্ম ও মোক্ষ বা নির্লিপ্যের সহিত ইহাদের কোনও সংস্র নাহি।] কেশী বলিলেন, “আপনি আমার সংস্র ছেদন করিয়াছেন, কিন্তু আমার আর একটি প্রশ্ন আছে। যে গৌতম! আমি আপনাকে সহস্র সহস্র শঙ্কসম্বন্ধিত কিন্তু ভ্রমশূন্য ও নিরীকার দেখিতেছি। আপনি ঐ শঙ্কসম্বন্ধিত করিয়াছেন, কিন্তু আমার আর একটি প্রশ্ন আছে। যে গৌতম! আমি আপনাকে সহস্র সহস্র শঙ্কসম্বন্ধিত করিয়াছি, তখন সে যে বলে গান পাঁচ শঙ্ক অর্থাৎ সর্বসত্ত্ব শঙ্ক শঙ্ক পরাজিত করিলাম। বৎসন বৎস শঙ্ক পরাজিত করিলাম, তখন আর আমার শঙ্ক রহিল না, আমি বিদ্বী হইয়া বিরাগ করিতে লাগিলাম।” কেশী বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার প্রশ্নমাত্র কে? গৌতম উত্তর করিলেন, “আমার আজ্ঞাই আমার প্রশ্ন ও সর্বাঙ্গপেক্ষা প্রবল শঙ্ক। তাহাকে জয় করিতে চারটি কবচ অর্থাৎ জ্ঞান, মোহ, মদ, মাৎসর্য পরাজিত হইল। এইরূপ পঞ্চ শঙ্ক পরাজিত হইলেই অস্ত পঞ্চ শঙ্ক,

অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয় পরাজিত হইল। ইহার পর আর আমার কোন শঙ্কই রহিল না; আমি নিভীক হইয়া বিচরণ করিতেছি।” কেশী বলিলেন, “হে গৌতম, আমার আর একটি প্রশ্ন আছে। এই জগতে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবই দেখিতে পাই, কিন্তু তুমি ত মুক্ত। তুমি এই শৃঙ্খল বিরূপে কাটিয়া ফেলিয়াছ? গৌতম বলিলেন, “আমি ধর্মপথে থাকিয়া এক একটি শৃঙ্খল কাটিয়াছি, এইরূপে আমি আমার সকল শৃঙ্খল কাটিয়া মুক্ত হইয়াছি।” কেশী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি শৃঙ্খল কাটাকে বলিতেছ? গৌতম বলিলেন, “শৃঙ্খল নানাপ্রকার আছে, তন্মধ্যে আসক্তি-প্রণয়, মায়া, মনো ইত্যাদিই সর্বাঙ্গপেক্ষা দৃঢ় শৃঙ্খল। আমি তাহাদের বৎ ও বৎ করিয়া সাধ্যমত সংস্থাপন অবলম্বন করিয়াছি।” কেশী বলিলেন, “হে গৌতম! আমার আর একটি প্রশ্ন আছে। হৃদয়ের গভীরতম অংশে এক বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহাতে মহা বিরাগ ফল ধরে, তুমি সে বৃক্ষ কিরূপে উৎপাটন করিয়াছ?” গৌতম বলিলেন, “আমি তাহার শাখা প্রশাখা ও এক একটি শিকড় বাতীয়া তুলিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছি, আর আমি তাহাকে ভয় কর না।” কেশী জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে তব্বর নাম কি?” গৌতম উত্তর করিলেন, “ঐ ভয়বহ তব্বর নাম জীবনে আসক্তি, তাহাতে বিঘ্নের ফল ধরিয়া থাকে। আমি ঐ তব্বর সমূলে উৎপাটন করিয়া এখন বেশ সুস্থ আছি।” কেশী বলিলেন, “হে গৌতম, আমার আর একটি প্রশ্ন আছে। ভীষণ অগ্নি মংগার পুড়াইয়া ছার-খার করিতেছে, তুমি যে অগ্নি কিরূপে নির্মাপিত করিলে?” গৌতম বলিলেন, “আমি মর্দা জলদ হইতে উৎপন্ন নদীর পবিত্র বারি আমার শরীরে ছড়াইয়া দিই, তাহাৎই সে অগ্নি নির্মাপিত হয়।” কেশী জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে অগ্নির অর্থ কি?” গৌতম বলিলেন, “মহুষের রিদ্দি অগ্নি, জ্ঞান, পবিত্র জীবন ও প্রাণশক্তিই পবিত্র মলিন। জানি বিন্দু দ্বারা ঐ পবিত্র মলিন প্রক্ষালন করিলে আমার শরীর আরও উত্তাপ হইতে রক্ষা পায়, শরীর শীতল হয়।

কেশী বলিলেন, “হে জ্ঞান বৃক্ষ গৌতম, তুমি আমার সকল সংস্রগুলি ছেদন করিয়া আমার ও আমার সহিত এই প্রোহম ওলার ও ভবিষ্যত কালের কোটি কোটি জ্ঞানলিপাহ পঠকের মহা উপকার করিলে, সেজন্য জগৎ তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিল।” ইহার পর মহামুনি গৌতম আপনার শিষ্য ও বিদ্বাংগের লইয়া আপনার আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

শহর

ত্রিষূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

রৌদ্রসুরায় রিমঝিম করে সারা শহর,
তন্ত্রাজড়িত চম্পার বনে, হলুকা হাওয়া!
কার্শি হ’তে আকাশে পাখীর আসা ও যাওয়া—
ভোরের শহরে শোনা যায় জলকলধর!

বিস্তারের রোদ খরতর হ’লে বারান্দায়,
শাণিতে যেন ঝিলমিল করে ইন্দ্রধনু!
ঘাসের শিশিরে কেঁপে কেঁপে ওঠে করুণ অণু!
পিচের রাস্তা নৌকার মতো উজান বায়!

ভোর-বেলা যেন দূর-সমুদ্রে উঠেছে ডেউ,
ফেন-উর্ধ্বাধি শিহরি মিলায় সূর্য্য-করে;
অথবা কোথায় কোন সাহুদেখে স্বর্ণবা ধরে?
—মেশিনের রাশি শুনেছে, পিছনে রবে কি কেউ?

গভীর শব্দ থেকে থেকে বাজে পৃথিবী হ’তে—
পিচের-রাস্তা ভেদ করে ওঠে প্রথম সাম!
ফুরবার পথে গান গাহে জন-বাহন ট্রাম—
প্রাচীর-পক্ষে হাসে নানাবলী, পথের স্রোতে!

শাণিত রোড়ে স্তিমিত হ’লে যে মুক শহর!—
মহাশৈশবী রক্ত-দেবতা কিম্বায়ে পড়ে;
কি সে বেনদায় খনে খনে তার টনক নড়ে—
যুড়ি ছুটি পাখি, প্রার্থনা করে ব্যাখা-কাতর!

মহাদিবার মন্তর, স্নান দ্বিপ্রহর!—
কি যে অমুভব, সারাদেহে আনে চেতনামায়!
তেপান্তরের মাঠের ওপারে—কি বিশ্বাস!
—রৌদ্র-পাথারের প্রবাল-দীপের ছলিছে ঘর।

স্নান হ’য়ে আসে অপরাহ্নের বিরহী ভানু—
‘লু-বায়ুর সনে কণ্ঠ মিশায় অ’ধির স্বড়,
নীড়-প্রত্যাশী পাখীদের মুখে হাহাধর!
ওঘরি-গন্ধে কাঁচিছে কোথায় শেল-জাহ্ন!

আকাশে বিদেছে প্রথম তারার গোপন শর—
তার সনে বৃষ্টি মিতালি করিছে গ্যাসের দীপ!
আরশি-সমুখে বধু পরে কাঁচপাকার টিপ—
সাক্ষা-শহরে শোনা যায় জলকলধর!

জীবন-শ্রোত

—গল্প—

শ্রীদীনেশব্রজনাথ দাশ

গল্পটা স্বরথের মুখে শোনা।

কলকাতাতেই থাকি। কিন্তু ১৯০৮ সন থেকে ১৯১৪ সন পর্যায় এ কটা বছর স্বরথের বড় একটা দেখাই পাই নি। ১৯১৪ সন স্বরণীর বছর—যুদ্ধ বেধেছে, তার ডেউ কলকাতার ওপর এসেও শোচ্ছে। চারদিকে সাজ-সাজ রব। কলকাতার বাজার গরম। যে-যেমন ক'রে পারে এই তুচ্ছ ছ' পয়সা করে নেবার ফিকিরে আছে। কাগজে পড়ি পট্টনই থাকছে কত রকম। শেষকালে একদিন শুনি বাঙালী পট্টনের চলেছে যুদ্ধে। ঘরের কোণে বেগ' মনে ভাবি হার রে সেকাল। বয়স যদি আজ থাকতো না হয় বাঙালী পট্টনের সঙ্গে যুদ্ধ চলে' যেতাম। এ জন্মে ত আর যুদ্ধ করা হবে না। এই ত যার মন্ত স্বযোগ। ভাবি আর কাগজে বাঙালী হেরেদের নামের নিষ্ঠি দেখি। একদিন দেখি স্বরথকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম। 'তাই ত! শেষকালে স্বরথও চলে' যুদ্ধে। নিজের বয়সের ওপর সোমা ধরে' গেল।

স্বরথকুমার চট্টোপাধ্যায় হচ্ছে আমার একটা যুবক বন্ধু। তার বয়স তখন পঁচিশ, আমার বয়স পঁয়তাল্লিশ। কি তার কিছু বেশী। স্বরথের বয়সী বন্ধু আমার অনেকই ছিল। তাদের আমিও যেমন ভালবাসতাম তাগো তেমনই আশাও, বন্ধু বেশ' ভাল হতো।

কাগজে নাম দেখার কিছুদিন পরে মৈনিকের শ্রাকি গোলাক পরে' স্বরথ আমার বাড়ী এসে উপস্থিত। এতকাল পরে এই প্রথম তার বর্ণন শোলাম। কথাবার্ত্তা রাখবারে একটা কাগজের বাউন্স আমার দিকে এগিয়ে দিলে বললো: 'আমার সমস্ত সম্পত্তি আপনার কাছে রাখছি রেখে বাজি গোলা-দা। যদি না কিরি তা হলে এগুলো আপনার কাছেই রাখবো বর্তমান সুবিধা হয়। তারপর না হয় আশুদে পড়িয়ে ফেলবো।

গলার ঘর একটু ভারি ঠেঁকো।

হেসে বললাম, কোনও ভয় নেই—পাছত ধনের কোনও দিন অপব্যবহার করব না। কিন্তু ভনতে পারি কি এ-গুলো কি?

স্বরথ ক্রমশঃ বের করে' চুট করে' একবার তার চোখের কোণ ছুটো মুছে নিল। হাসতে চেষ্টা করে' বললো: 'এ-গুলো মালিনীর চিঠি—এ ক'বছরের রোজগার। বৃন্দাম তার বাখার ভরা মন; কাহিনী শোনার কৌতুহল দেখতে আর সাহসে ফুলো না।

স্বরথ বললো:

এতদিন আপনাদের সঙ্গে দেখা-শোনা করতে পারি নি এই নিয়ে মেতেছিলাম বলে। আপনাকে তাই বলতে এসেছি। আগেকার লোকেরা চন্দ্র-তারার সাক্ষী করে' তাদের মনের কথা বলে শক্তি পেতো কিন্তু আজকাল আর ততো প্রাণ ভরে না। একজন কারুক না বলতে পারলে এরা ছুট-ছুট করে' তা বাবু—কাপ্পা থেকে করুক, খটী ছুটি নিয়ে এসেছি—আবার রাত সাড়ে আটটার মধ্যেই হাফির দিতে হবে। ব্যাপারটা বলে' যাই। হ্যাঁ ভালো কথা—আমি বেঁচে থাকলে এসব কথা কারুক বলবার দরকার নেই, এমন কি মালিনীকেও নয়। যদি নেহাৎ ওখানেই মরে' যদি তা হলে আপনার বা' ইচ্ছা করতে পারেন। এবং বলি। মালিনীকে কেনে ত?

বললাম, চিনি। তারপর বেরসিকের মত বলে' ফেললাম, রাতে বাহলে এখানেই কেঁদে যাবে। হেতুর একটু বলে' আমি ফিরে এসে বলতেই স্বরথ আরম্ভ করলো:

মালিনীকে বলছি আপনার গরম অনেক করেছি। যে আপনার বাড়ী অবধি দেখেছে। এমন কি খটনা যদি আর দিলে' পড়িয়ে না যেতো তা হলে হয় ত আমাদের সাধ্যা করবার জন্ত আপনার কাছেই আসতাম।

আমি বাখা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, মালিনীর কি বিষয় হয়েছে? তার বাখা পাটনা থেকে এসেছেন ক'দিন?

স্বরথ বললো:

বিষয় এখনও হয় নি। তবে হতে' আর কতক্ষণ? আপনি তাহলে আগেই চিন্তনও করেন? ওর বাখা এখানে এসেছেন বোধ হয় উনিশশো-সাতো।

বৃন্দাম। কিন্তু তুমি গিয়ে জুটলো কি করে' ওদের সঙ্গে?

স্বরথ হেসে বললো, সেও এক গল্প তবে তা আর এখন বলব না। মোটের ওপর মালিনীর মার যুব পছন্দ হয়েছিল আমাদের কাছে। আমার 'বুদ্ধ'র অভিনয় দেখে। তারপর থেকেই বাঙালা—আস। কিন্তু এতকাল পরে মালিনী আমাদের জুল বৃন্দামে। এতদিন ধরে' আমাদের দেখে-শুনে ওর তা উচিত হয় নি।

আমি হেসে বললাম, জুল বোকার কোনও কালাকাল নেই স্বরথ। জুল বোকে লোকে শেষের দিকটাই। ও ঠাড়া যদি কেটে যেতো তাহলে, সংসার চোখের জলের দ্বারা এতদিনে মলুকুনি হয়ে যেতো। এই ত তোমার ইন্দি আর আমি, আমাদেরও বিষয় হয়েছে আর পঁচিশ বছর হয়ে কিন্তু আগেকার চাইতে উনি আজকালই আমাদের জুল যুবতে আরম্ভ করেছেন বেশী। যখন আর কোনও রং থাকে না তখন জুল বোকার মধ্যেই যত রং। এই একটু রাগা-গামি হোল, বেশ দূরে দূরে ইইলাম জ'জনে করুণ, তারপর আস্তে আস্তে কখন যে আমার মিল হয়ে যায় টেরই পাইনা কেউ।

আমার কথা শুনে হয় স্বরথের ভালো লাগল না। বললো: গোপালদা, পঁচিশ বছর পরে জুল বৃন্দাম মন আর শরীর এমন করে' ভেঙে যায় না।

জিজ্ঞাসা করলাম, যুদ্ধ বাজ কি তাহলে তারই ওপর গাজ করে?

স্বরথ হাসলো। বললো: সত্যি কথা বলতে কি ঝই যাচ্ছি। কি এও জানি আমি যুদ্ধ মরুণে মালিনীর এখন আর কিছু যায় আসে না। আশ্চর্য্য কিন্তু! সাত-শাটটা বছর আমাদের অন্তঃত দিনে চার পাঁচ খটী না

দেখলে বার চলতো না সে কেনে করে' আজ এমন হোল? এই ত সেদিনও আমাদের কাছে দেখলো, এই গোথাকেই, সিনেমার সামনে—মুখের ওপর তার কোনও চিন্তাই দেখান না। আমরাই বরং কেমন যেন' হয়ে গিয়েছিলাম। সঙ্গীরা বলে' উঠলো, 'বদলার' গিয়ে এর চাইতে অনেক ভালো মুখ দেখতে পারি। আমি তখন তার ছিলাম মালিনীর কথা। মালিনীর মনে কি হয়েছিল জানি না কিন্তু আমি যে সে-দিন কি ছবি দেখেছিলাম তা একটুও আজ আর মনে নেই। ভাবলাম, এতদিনের এত বনির পরিচয়—কিনা হয়েছিল আমাদের মধ্যে—আর আজ এত কাছে তবু এত দূরে আমরা? কি করে' যে পারে ওরা এমন নিকটিকার ভাবে বলে যেতে। এইটেই আমার বড় দ্রোহ গোপালদা, ওরা এমন কেন হবে? আমাদের ওরা নির্দম বলে কিন্তু ওরা যখন নিষ্ঠুর হয় তখন এই নির্দম পুরুষের মনকেও কাঁচের মত শুঁড়ে করে' ফেলতে পারে।

সত্তর্পণে জিজ্ঞাসা করলাম, কি নিয়ে তোমাদের মধ্যে গোপালদা হোল?

স্বরথ তার কোটের গলার ছুট ছুটি বলে দিয়ে, একবার ঘাড়টা বেঁকিয়ে নিল। আমার সামনে আগে কখনও চুপট করে'তোনা, সেদিন গেটক থেকে চুপট করে' বের হলো, একটা গাই দামা, কিছু মনে করবেন না।— গোপালদা আমার দিক থেকে কিছু হয় নি। এমন-এ পড়ছিলাম, বুঝ চেষ্টা করছিলাম এম-এটা পাশ করাই আরও কিছু উভতির পথ করব, যোগাড় বয় করে' সব ঠিক করে' এনেছিলাম কিন্তু ঐ পথটা। মালিনী যে দিন বললো, আর তুমি এসো না—সে—দিনও ভাবিনি আগের দিন যে ও আমাকে জড়িয়ে ধরে—কিছু মনে করবেন না! গোপালদা—বুকের ওপর মাথা রেখে পড়ে রইল সেদিনই তার শেষ। বাগো খটী পরে সব বাতিল হয়ে যাবে। আগেকার বা' কিছু তার কোনও মূল্য থাকবে না; হার কোনও প্রতিজ্ঞা সত্য হবে না; তার বয়সও কথার নিজের আর কোনও কাজে লাগবে না। এ যদি আমি করতাম, হোমেরা বৃত্তে—পড়।

স্বরথ উদ্বেজিত। ধীরে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন এমন কথা বললো তার কোনও কারণ বলেছিল?

বলেছিল। বলেছিল যে সে সব শুনেছিল। ওদের গলির পান্থী সাহেবের পালিতা মেয়ে' ভায়লেট নাকি আমাকে ভালবাসে আর আমিও তাকে চাই।

"তুনেছে কার কাছে তা কিছু বলেছে ?

তাও বলেছে। আমি সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ও যে উত্তর দিয়েছিল তাই আমার ভাগা।

বললো, নরেশ বলেছে। বলছি—নরেশ হচ্ছে এক প্রহসাস্যের ছেলে। বাবা বিশেষ ফেরত—ছেলেও বিশেষ

বাবো ব্যক্তি শিখতে। আজ মনে হচ্ছে নরেশটার কি ছোট মন।

ওই আমার কাছে সেখ-সেখ ভাল মালখার মত বলতো—'তোমাদের ছ'জনের বন্ধ বলে' আমাকে কেনো।

মালিনীর গুপের তার বাবা-মা যে রকম আমাচার করেন আমার মনে হয় ওর সে বাবী ছেড়ে চলে আসাই ভাল।

আর তা' যদি সত্যি কখনও হয়, স্বরূপ জেনো, আমাদের বাড়ীর দরজা তোমাদের জুট খোলা।' নরেশ অবশিষ্ট

কথাবার্তা ইংরেজীতেই বোঝা বলতো। কি যে বিবাস্য করেছিলাম—ওকে। এমন কি, ওর যখন একবার অসুস্থ হয়,

দিল, দিল কতক বিধানায় পড়েছিল, মালিনী প্রায়ই ওকে দেখতে যেতো। আমি তখন ভাবতাম, আহা! বাপ, যে বন্ধ

আমাদের জুট এতখানি ভাবে তার অসুস্থ মালিনী বাবে না ত কে পারে? এক আদর্শ মন মালিনী আমাকে

বলেত দেখ, নরেশ যেন কি বলতে গারিঙ্গ, এমন 'নোবল' গাছে আমার মেথো ওমাগার হানি হয় সেইজন্মে টোটার

ডগায় এনেও চূপ করে থাকে। তখন মনে হোত নরেশ সত্যিই 'নোবল'।

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম :

এখন কি তাহলে নরেশই মালিনীকে চান্নাচ্ছে ?

হুহু মাথা নীচ করে' ছিল, হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলে বললো :

নরেশ চান্নাচ্ছে নয়, শুনেছি মালিনীই তার কথাও চলে।

তা গোক, এটা হচ্ছে এখনকার কথা। এমন কে কি করে সে বিষয়ে চিন্তা করার কথা। অধিকার নেই। কিন্তু

আমি ভাবি আসক্তোয় না। আমাকে ত একবার মালিনী জিজ্ঞাসা করতে পারতো যে ব্যাপারটা কি ?

বললাম, এ দুর্ভাগ্যি মাহুবেই হয়।

যে বাধা দিয়ে বলে উঠলো :

না গোপালদা, এ যুক্তি আমি মানবো না। মালিনী আমাকে না জানতো সে এক কথা ছিল। কিন্তু আমিও

দিনের পর দিন ওর মুখে এক কথাই শুনেছি যে,—আমি ওর জীবনকে সার্থক করেছি, আমার মত এমন দরবার,

এমন মহৎ মাহুত হতে পারে এ নাকি মালিনী কমানোও অন্তত পারে না। সে আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি কি

তার কাছে মিথো কথা বলতাম? আর যদি বলতাম তাই তখনও না হয় তার বশার কিছু ছিল। কিছু জানি না,

হঠাৎ শুনি আমাকে সে আর চায় না। কিন্তু একবারও কি তার মনে হোল না—এক বছরে যে পৃথিবীর গুপের দিয়ে

এতগুলি স্মৃতির পরিবর্তন হয়ে গেছে তা আমি গ্রাহ্য করি নি। হুহু বা অসুস্থ অবস্থায় তার কাছে ছুটে গিয়েছি ত

তাকে শুনী করতে। অস্বীকার করব না আপনাদে কাছে, এক-এক দিন এমন পরিস্থিতি মনে হোত যে আর শরীর

চাউত না কোথাও এক পা নড়ি; তবু গিয়েছি। হুহু করে' বাতাস ছুটেছে, পলে এক হাঁটু জল, ছাগল-গরু পর্যন্ত সে

ধ্বংসোৎসে শোকের বারম্বার—তলায় আশ্রয় নিয়েছে, আমি চলেছি তারই মধ্যে মালিনীর কাছে। শীতের দিনে যখন

দোরের বাড়ী থেকে রাতে দিরতাম, দেখতাম মরার ছোকাগনের উল্লসার নীচে ফুটপাথে ওর কুসুরগুলো

কুণ্ডলি পাখিয়ে পড়ে' আছে—আর আমি সেই শীতে মনের মধ্যে শত কল্পনা আর আমার টোটার গুপের মালিনীর বিরাট

অভিন্নমনের উচ্চ-স্পর্শটুকু নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে গথ চলতাম। সমাজ, আত্মীয়তা আমোদ উৎসাহ, ছাপ ছিটকা

সব বিয়াক করে' দিয়েছিলাম এ জীবন থেকে এ কথা বড়ো—নিজের বর্ণে' কিছু আর রাখি নি তবু মালিনী কি

একবার ভাবতে পারল না বিবাস্য যদি দিতেই হয় এমন করে আঘাত না করেও তা' গায়া যায়? যুগে যুগে ছিল যট

কিছু বিবাস্য করণ, মরতে আমায় ইচ্ছা নাই। আপনায় কিছু লুকোব না—আজও আশা হয় যদি বেঁচে ফিরে আসতে

পারি তা হলে হয়ত এসে দেখবো একদিন অকস্মাৎ আমার চোখের সামনে যে সন্ধ্যা নেমে এসেছিল, রাত্রির পর যবে

একটি উজ্জ্বল প্রভাত আমার আমার দুয়ারে এসে পড়েছে। এসে দেখবো মালিনী তার জুল বুকে—আবার সে

আমাকে আগের মতন করেই চায়। একি একেবারে অসম্ভব আপনায় মনে হয়? —কি আর বলবো তাকে?

ওর মনের বাধায় আমাকেও আচ্ছন্ন করে' ফেলেছিল। তবু বললাম, বা' কিছু সম্ভব হয় তাতো সবই একদিন

অসম্ভবের মধ্যে থাকে। আমি আগে জানুলে একবার মালিনীর কাছে যেতাম।

আপনি কি করে' যেতেন? চেয়েন না তো ওদের। বললাম, ওকে ভালো করে' চিনি না কিন্তু ওর বাবা—

মা আমাকে বেশ হয় আঙও চিনতে পারবেন। —আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমাকে, ওর বাবা-মার মত কি

কিছু বুঝছিলে?

স্বরূপ জোর দিয়ে বললো :

দুখতে ওটাও আমার কাছে। ওর বাবা মা? আপনি আমার এই কথাটা শুণু একবার ভবে দেখুন যে, একটা

পরের ছেলে, বড় ভালো ছেলেই হোক সে, দিন নেই রাত নেই বড় নেই বাপল নেই এই যে তাদের বাড়ীতে সাত-

সাতটা বছর করে' আগছে আর তাদের মেয়েটির সঙ্গে অব্যবে

মেলোমেলো করে' এতে কি উদ্দেশ্য বাবা দেওতা উচিত ছিলো না? মালিনীর মার বাবাহরে বরং এই মনে হোত

যে, ওরা চান যে আমরা ভাল করে' পরস্পরকে চিনি অথবা মাদা

কথায় বলতে গেলে এই হয় যে আমরা পরস্পরকে ভালবাসি। আমার মাই মালিনীর মাকে কম ঠাট্টা

করেনেই এই নিয়ে। বলতেন, আমার ছেলেটিকে ত তোমারই নিয়ে নিলে দেখছি। উত্তরে তিনি বলতেন,

নিলামই বা, আপনায় ত আরও দ্রুত আছে। মালিনী স্বরূপকে বড় ভালবাসে।

একটা কথা স্বরূপকে না জিজ্ঞাসা করে' পারলাম না। —আচ্ছা স্বরূপ, বলতে পার, নরেশের বাবার কি খুব টাকা

পয়সা?

স্বরূপ আমার একটা চুকুট ধরলো। হু-উ করে' দোঁরা ডেড়ে বললো, খুব কিছু না তবে আছে কিছু। একখানা মোটরও আছে ওদের। নরেশের বাবা ভূম্যে

নাকি তাদের বিয়ের সময় গরনগার ছাঁড়া নগদ পাঁচ হাজার করে' দিয়েছেন এই ত শুনেছি। তবে সস্তা মিথ্যা

ভাবানু জানেন। কিন্তু আপনি পরগার কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন? আমাদের ছ'জনের মধ্যে সে কথাও পরিবার

হয়ে যায় নি? মালিনীকে ত আমি সব বলেছি। আমাদের বাড়ীর অবস্থার কথা, আমার আশা ভরসা চেষ্টার

কথা কিছুই ত লুকোই নি ওর কাছে। হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো, ঐটেই জুল

করছে ভায়া। আমার কথায় স্বরূপের সরল দ্বারের নিষ্ঠার জ্যোতি যেন

তার চোখে-মুখে ঝিলিক দিয়ে উঠলো। সে আমার মুখের ওপর বললো, আপনি কি বলতে চান

তার কাছে আমি কিছু গোপন করে' রাখতে পারি? আমার অবস্থার কথা তার কাছে খুলে বলায় যদি আচ্ছ

আমি কিছু হারিয়ে থাকি তবে সে যাক। কথাটা ঘুরিয়ে দিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, এখন বল

'ভায়লেট' বলে' সে মেয়েটির ব্যাপারটা কি? তার সঙ্গে কি তোমার আলাপ ছিল?

স্বরূপ আগের কথা যেন সব ভুলে গেল। হেসে ফেলে বলতে লাগলো—সেও এক গল্প। ভায়লেটের সঙ্গে

আলাপ হয়েছিল বৈকি? আপনি বোধহয় জানেন না, আমি বছর পাঁচ ছয় 'শিরিট' নিয়ে বড় নাড়াচাড়া করেছি।

তখন বোধহয় আমি কার্ট-আর্টস পড়ি। সেই থেকেই একটা 'শিরিট-সার্কল' আমাকে ঘিরে থাকতো। অনেক

আম্মাই যেন তখন খুব তুমো—পরিচয়ের মত হয়ে গিয়েছিল। তুমি কি 'শিরিট'ে বিশ্বাস কর?

স্বরূপ খুব গভীরভাবে বললো—বিশ্বাস করি কিন্তু কেন করি তা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না হয় তা।

জিজ্ঞাসা করলাম—ভায়লেট কি বাঙালীর মেয়ে?

স্বরূপ একটু অব্যাহত হয়ে পড়েছিল, বলল, বাঙালীর মেয়ে নয়। বলেছি ত আপনাকে এটা একটা গল্পেরই মত।

বলি শুধু—রাতে যখন মালিনীদেব বাড়ী থেকে রোজ ফিরতাম তখন একদিন রাতে হঠাৎ ওদের গলির পিঙ্কার

ফটকে একটি ইরেজর মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি।

প্রথমটা ভেবেছিলাম মানুষই বোধ হয়। আর শুনেওছিলাম যে পাদরী-সাহেবের একটি পাতিতা মেয়ে ছিল। মেয়েটি আমাকে খুব দীনীতভাবে ডাকলো।

আমরি মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো—তুমি গেলে তার কাছে?

স্বরথ বলল, কেন যাওয়া না?

ভয় করল না?

ভয় একেবারে করে নি তা নয়—কিন্তু সকলকেই ভয় করবার মত কোনো কারণ নেই।

ভারপর?

স্বরথ আবার শুরু করল, আমি কাছে গিয়ে ঠাড়াতেই মেয়েটি খুব বিনয়ের সঙ্গে বললো, আমাকে কমা করো। আমার নিজের একটা উপহারের বস্ত্র তোমাকে এ রকমে এত কষ্ট দিচ্ছি।—তার মুখ ও শরীর ছেয়ে যে একটি পাভালা নীল আলো ছড়িয়ে পড়েছিলো। তাতে দেখলাম, মেয়েটি বহুদূর উনিশের হবে এবং সুন্দরী। আমিও তাকে বললাম যে, তুমি বোধহয় কোনও অবেদী আত্মা?

কৌতূহলের বশে জিজ্ঞাসা করলাম—আত্মা কি কথা বলতে পারে?

স্বরথ বলল—পারে—সকলে নয় এবং সকলের সঙ্গেও নয়। তারপর বলি।

আমি স্বরথকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ওরা ত মানুষের অনিষ্টও করতে পারে? না গেলে কি করত?

স্বরথ মূঢ় হেসে বললো—কি আর করত? কোনও চরিত্র লোকের আত্মা হলে হয় ত একটু বেগ দিত। তা ছাড়া মানুষের প্রাণের মতই আত্মার জ্ঞাতের কতগুলো নিয়ম, কতগুলো শিষ্টাচার আছে; যেগুলো রক্ষা করে না চলে মুক্ত আত্মাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় না। মেয়েটি ওপর একেবারে এই হয়েছিল যে, 'ঐ অবেদী আত্মা আমার ওপর তার প্রভাব বিস্তার করবার অবকাশ পেয়েছিল। তখন তার প্রভাব সাধারণ না করি তাহলে পিপিট-রোগের রীতি' হিসেবে আমার অস্ত্রায় হয়।

স্বরথ হঠাৎ নিজের খড়্গী বের করে দেখে বললো—সাতটা বেজে গেল। আমার ছুটির আত্মা আর আত্মাই

খটী। মধ্যরাত্রে যেতে লাগবে আত্মা খটী। মাকেও আত্মা একবার দেখতে যাওয়া ভেবেছিলাম তা আর হয়ে উঠবে না বোধ হয়।

তোমার মা এখন কোথায় থাকেন?—জিজ্ঞাসা করলাম।

স্বরথ হেসে বলল, কেন, আমার বাড়িতে? ছেলে বার এমন হতভাগা তিনি আর যখন কোথায়? বাঙালী অসহায় বিধবার ভায়ের বাড়ী ছাড়া আর গতি কি?

বললাম—তাই যদি রোগী তা হলে এমন কল কল কেন? ভায়ের বাড়িতে থাকতে কি তাঁর খুব ভাল লাগছে তোমার মনে হয়?

স্বরথ যেন একটু দমে' গেল। কষ্টের তার কান্না। বললো—মা'র সঙ্গে আমি যে কত বড় অপরাধ করেছি তা আমার প্রতি মূহুর্তেই মনে হয়। কিন্তু বাড়িতে থাকাও যে আমার দায় হতো। আত্মা-স্বজন যুগ্ম পরিবার অনুযায়ী কালকে ভাল লাগতো না। মা সবই বুঝতেন। আমার ভাবগতিক দেখে তিনি নিজেই একদিন আমাকে বলেছিলেন, আমি না হয় কিছুদিন আমার মেজলার বাড়ী গিয়ে থাকি তুমিও কিছুদিন কোথাও একটু পুরে' আর। তাই বাসখা করলাম। মাকে পাঠালম আমার বাড়ীতে—

আর তুমি চললে যুগ্ম বেড়াতে? বাধা দিয়ে বললাম।

হ্যাঁ তাই, স্বরথ বলল।—ভারলাম এ জীবনটা দিয়ে যদি বাঙালীর ছেলের, নাম রাখতে পারি। নিজেকে নিয়ে

স্বরথের মুখের ভাব দেখে মনে হোল তার মন যেন কোন্‌ গভীরে তলিয়ে গেছে। তাকে জাগিয়ে দেবার জন্য খেই ধরিয়ে দিয়ে বললাম—ভারপর সেই মেয়েটির কাছে ত গেলে?...

আচ্চন্না! যেন জেগে উঠে স্বরথ বলল—তাই ত, ঐটুই শেষ না করলে আপনি সব ঘটনা বুঝবেন না।—ভারপর মেয়েটি বললো, অনেকদিন চেষ্টা করে আমার দিকে তোমার দৃষ্টি ফেরাতে পারিনি দিষ্টার চ্যাটাঙ্গি। তার মুখে আমার নাম পড়া শুনে বিশ্বাস হোল যে, না, সত্যি সে আমাকে অনেক দিন থেকে ধরবার চেষ্টা করছে। হয় ত বা কতদিন আমার পেছা নিয়েছে। মেয়েটি বললো অস্বাভাবিক ওর মুখ।

ও যাকে ভালবাসতো সেই গুকে গলা টিপে মেরে রেখে যায়।

আমাকে মা বলেছিল, তাই আমাকে বলি। ওর আশেপাশের সব গর বহুতে গেলে আর সময়ে কলোবে না।—আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি চাও তুমি আমাকে দিয়ে?—তাঁরোপেট বললো—মুক্তি।—নানা তরুর আত্মার কথাই আমি জানুতাম। ওর কথার হাবভাবে বুঝতে পারলাম ওর আত্মা মাধার আত্মাগুলির মতই এখনও পৃথিবীর বাসনা কামনার বাধনে পড়ে' আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে দিয়ে' তোমার মুক্তি হবে কেনম করে? ভায়োলেট সলজ্জ চাহনিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললো, আমি যে আর্থারকে ভালবাসতাম ততো' আমার জীবনের গুণম দিকেই বাধা পেয়েছিল। যৌবন ত' তখন আমার সব ঝুঁড়ির মত উঁকি দিয়েছে। গীর্জায় এত লোক আসত, এত সব ধর্মকথা শুনি' কিন্তু তখন মনে হোত আর্থারকে পাওয়া আরো'র মতই আমার পরম শান্তি। আর্থারের অনেক দোষ ছিল আমি জানুতাম কিন্তু মনে হোত পৃথিবীর সকল মানুষেরই ত এমন কত কি দোষ থাকে—শুনেছি। আর্থারকে প্রথম যৌবনের সমস্ত উদ্দামতা দিয়ে ভাল বাসুতাম। তারই কাছে আমার সব কিছু সঁপে বেঁধে' বলেই একটা শুভদিনের অপেক্ষায় বসেছিলাম। কিন্তু আর্থারের তা সহল না। বুঝেই ত পারছি দিষ্টার চ্যাটাঙ্গি, বালিকা-দ্বন্দ্ব তখন আমার, তার ওপর একজন পুরুষের অস্থিরতা আশ্রয় পেয়েছিল—কত ভয় ছিল মনে মনে। কি হত কি হয় তা কিছুই ভাল করে' জানুতাম না। শুধু মেয়েদের কাছে শুনে শুনে নারী-জীবনী-বস্তুতে একটা আবহা ধারণা হয়েছিল মার। সেই তরু' আত্মা, সেই উদ্দাম কামনা নিয়েই আমাকে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। সে কামনা যে এখনও আমার দ্বন্দ্ব জুড়ে আত্মনের মত জলছে। আমার শান্তি কোথায়? দিষ্টার চ্যাটাঙ্গি—একজনকে সব বিলিয়ে দিয়ে, জুবে যেতে না পারলে আমার কি আর মুক্তি আছে?

আমি বিস্মিত হ'য়ে স্বরথকে জিজ্ঞাসা করলাম, মানুষকে 'কি তাহলে মৃত্যুর পরও পৃথিবীর সমস্ত কামনা নিয়েই পুরে মরতে হয়?

স্বরথ হেসে বলল, আপনি আমাকে যে ভাবে ভিজেস

করছেন তাতে মনে হয় যেন আমি জীবদেহ ও তার মৃত্যুর পরের কথা সব কিছুই জানি। কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে, আমার নিজের এ বিষয়ে বাস্তবিকই কোনও বিজ্ঞ নেই। কিন্তু বহু আত্মার সংস্পর্শে থেকে, নানা রকম আলোচনার মধ্যে বা' জানুতে পেরেছি তাতে মনে হয় মানুষের কোনও আশা কোনও মাদকেই খুব বড় করে ধরে' থাকা উচিত নয়। তাই বোধ হয় লোকের বলে' বুড়া বয়সে মানুষের ধর্ম কর্ম করা উচিত। অর্থাৎ সাধারণতঃ বুড়া হলেই মানুষ যে মরবার দিকে চলেছে এই আমাদের ধারণা, কাজেই মৃত্যুর আগের দিকটার পৃথিবীর মায়া থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার একটা চেষ্টা করা ভালো। ওরা বোধ হয় মনে জানুতেন যে তাহলে মানুষকে পৃথিবীর কামনা নিয়ে আর দেহমুক্তির পরও কষ্ট পেতে হবে না। আমি ত ধার্মিক, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, প্রভৃতি এদের অনেক ধর্মগ্রন্থ মানবাত্মার সঙ্গে কথা বলে দেখেছি। তাদের কথাও মনে হয় মানবাত্মা দেহমুক্ত হয়েও কিছুকাল জীবদেহের প্রায় সমস্ত সংস্কার ও স্বভাব নিয়েই অবেদী ভাবে বিচরণ করে।

—তা হলে তাদের মুক্তির উপায়?

স্বরথ বললো, যে সর্বকাম হয়ে মুক্তি চায় তার মুক্তি আছে বৈ কি? তা নইলে ত আমরা মানবাত্মার সাধ মেটাতে মেটাতেই অস্থির হয়ে পড়তাম।

—তার মানে?

—তার মানে হচ্ছে, ভদের ত হাত পা মুখ হোট থাকে না, যা কিছু সংস্কার ভোগ একটা জীবন্ত মানুষকে অবলম্বন করেই ভদের তা করতে হয়।

—ভায়োলেট তা হলে তোমার ভিতর দিয়েই তার বাসনার চরিত্রাণ করতে চেয়েছিল?

স্বরথ বললো, ঠিক ধরেছেন, তাই। কিন্তু কাজও তা পারেন নি। আমি তার ভয়েও ঘনিষ্ঠতা এতদূর পালিয়ে যাচ্ছি।—কিন্তুকাল কেটে গেলে ভায়োলেটকে একদিন বলেছিলাম,—তুমি আমাকে মুক্তি চাও, আমাকে দিয়ে তোমার কোনও সাধা' হবে না। আমার কথা শুনে ভায়োলেট যেন মরিয়া হয়ে উঠলো। সে কী গদার কথা

তখন তার। আমি তখন আর মালিনীদের বাড়ী যেতাম না, ভ্যাগেলেটই রাখে আমার বাড়ীতে আমার শেবার ঘরে এসে দেখা করত।

—এই যে স্নোকে বলে পরীতে পায় এও ত তাহলে তাই দেখছি!

স্বরণ আমার কথায় হেসে উঠলো। বলল, গোপাল দা, পরীতে যদি পেয়েছি বসন্তো তাহলে কি আর রক্ষে ছিল? বয়স আমারই বা আর কত? শিরায় শিরায় গরম রক্ত, সর্কানশে বনোয়ার তখন চোখের পাতা ভারী, বমুন ত এই রূপসী সুন্দরী যদি একবার আমাকে কাঁপু করতে পারতো তাহলে কি আর অজ্ঞ আশ্রমার সঙ্গে এখানে বসে? কথা বলতে পারতাম?

—কি করত? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

স্বরণ হেসে বলল, যে সব কথা বাবু গোপাল দা—মাহুরের মত সব। তারপর বলি শুধর। ভ্যাগেলেট আমার কথা শুনে আমাকে জড়িয়ে ধরে? বললো—

জড়িয়ে ধরলো? মাহুরের মত?

স্বরণ বললো, হ্যাঁ মাহুরের মত। যার কাছে ওরা আসতে পারে তাদের ওরা পূর্ণও দিতে পারে। কাহ্নতিভরা চোখে আমাকে বলতে লাগলো, “আমি জানি তুমি আমাদের গলির মালিনীকে ভালবাস। কিন্তু সে তোমার হবে না।” নরেশ বলে? ছেলেটি তার পিছনে পেলেছে, আর বোধ হয় মালিনীর কাছে বলেছে যে তুমি আমায় সঙ্গে গ্রেম করছ। নরেশ আমার উপকারই আমার সঙ্গে গ্রেম করছ।

করছে তা নইলে হয় ত এতখানিও তোমার কাছে থাকতে পারতাম না। আর্থার আমাকে ভালবাসতো। কিন্তু আমি তার সব ইচ্ছা পূরণ করতে পারি নি। কি করে পারতো? কুমারী-স্বয়ের কত ভর তোমরা তাইবো না। এ হোল আমার বড় অপরাধ। আর্থার তার বাসনা পূর্যতে পারলো না বলে? হিবে পণ্ডর মত আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলে চলে? গেল। চ্যাটাইল, তুমি কি তোমার দয়া হয় না আমার ওপর? আমি কি কম সুন্দর? আমার বয়স ত এই সবে আমাকে কি উদ্ভাস? এই দেখ আমার টেটী এমনও রক্তে লাগ।

গোপালদা, সে দিনকার সে রাজির কথা মনে-হবে? আজও আমার প্রাণ কেঁপে ওঠে।—তখন আমি মালিনীর প্রেমে বিভ্রান্ত, তার প্রত্যাখ্যানের পরও নিজেকে সংব কর? দুপুরো এই ছিল সমস্ত সময়ের একাধ কামনা। ভ্যাগেলেটকে তাই দুখ করতাম। নিজ মরণ হয়ে নারীর ওপর, মালিনীর ওপর প্রতিশোধ নেব এই ভাবতাম।

ভ্যাগেলেটকে কিরিয়ে দিলাম। অতৃপ্ত কামনা নিয়ে ভ্যাগেলেট ছটফট করতে করতে চলে? গেল। কিন্তু সে আমাকে সহজে ছাড়বে না। মুক্ত গিয়ে যদি রেহাই পাই।

স্বরণ এই কথা বলামাত্র কে যেন গুর গলা চেপে ধরলো। স্বরণ অতিক্রমে দাঁড়িয়ে উঠে চাঁচকল করে বলল, ভ্যাগেলেট সাবধান। ছেড়ে দাও আমাকে, নইলে আমি তোমার সর্কানশ করে? ছাড়বো। এ কথায় কে যেন তার গলা চেড়ে দিলে। স্বরণ দরজার দিকে চেয়ে বললো, আমাকে মেরে ফেলেও আমাকে তুমি পাবে না কেনে রেখো ভ্যাগেলেট। তারপর স্বরণ তার বা-হাতের আঙুলের উপর ডান হাতের আঙুল “ক্রেশর” মত করে রেখে বললো, ভ্যাগেলেট, আমি জানি তোমার কত কষ্ট, কত অক্লান্ত-তুমি, কিন্তু তুমিও ত জান আমার মনের অবস্থা। এই তোমাদের “ক্রেশ” এর দিকে চেয়ে মনে শান্তি আনতে চেষ্টা কর। নিজের গলা তুলে যাও। সমস্ত ঘটনটা আমার চোখের সামনে একটা প্রহেলিয়ার মত মনে ছিল।

হঠাৎ মর্হৎদেী কাতর ক্রন্দনে স্বরণ মেকের উপর লুটিয়ে পড়ল। কঠোর স্বর অস্পষ্ট, যেন অনেকদূর থেকে স্বরণ বলতে লাগলো, ভ্যাগেলেট, আমাকে চিরকালের মত তোমার সঙ্গে করে? নিজে বলতে কিন্তু তোমারও শান্তি হবে না, আমারও হবে না।

আলো নিয়ে সুধের কাছে ধরে? দেখলাম, নিষ্পন্দ বেরে, নিষ্পান রক্ত।

ডাক্তার জিয়ায়ে দেখালাম। ডাক্তারী বললেন, হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার মৃত্যু ঘটেছে। পুলিশের হাঙ্গামা বেতে একটি কম হোল। স্বরণের মায়ের সে খবরা-কাতর রক্তবাক সৌমা-মুগ্ধ এমনও আমার চোখের সামনে ভাগে। যাবার বেশায় আমার দিকে চেয়ে একটি নম্রায় করে? বললেন, আপনাকেও খুব ভালবাসতো। আমি তাঁর হাতে স্বরণের চিরির বাঁটলটা তুলে দিলাম। তিনি বললেন, আপনাকে বৃত্তি বলেছে সব?

আমি বললাম, বলতে বলতেই এই দশা।

তারপর এতদূর-দূর কেটে গেছে। শুনেছি নরেশ মালিনীকে বিয়ে করেছে। তাই আজ গলটা নিখ-ছি যদি মালিনীর চোখে পড়ে আর বোঝে কত বড় দুঃসে-নামালিনীর চোখে পড়ে? আমি আজ ব্রহ্মী কৃষ্ণ তথকে করেছিল। হয় ত মালিনী আজ ব্রহ্মী কৃষ্ণ তথকে যে বেহ দিত নরেশ তা কৃষ্ণও দিত পারে? জানি না। একমাত্র মালিনীই এর উত্তর দিতে পারে।

অপরাজিত*

শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু

‘পথের পাঁচালী’ যে বাংলা-সাহিত্যের একখানা নামকরা বই সে-সম্পর্কে মতভেদ খুব সামান্যই আছে। যে-সব সামান্য-কট-বিবৃতি আছে তার উপর জোর না দিয়া বইখানির বৈশেষ্য ও অপূর্ণতা আমাদেরগকে আনন্দ দেয় সেই কথা যথ্য করাই ভালো।

যাত ও অখাত নানা পাঠকগোষ্ঠিতে এবং বাংলা-দেশের প্রায় সমস্ত সাময়িক পত্রে বিতৃষ্টি-বাবুর এই বইখানি লইয়া যে আমাদের নানাভাবে নাড়াচাড়া করিয়াছি তাহার অত্যন্ত স্পষ্ট কারণ কি এই নয় যে বইখানি কতগুলি কারণে নিজের বৈশিষ্ট্যসৌন্দর্যে সহজেই উপভাস-সভায় মাথা তুলিয়া গড়াইতে পারিবেই? বইখানি তার স্বজাতীয় আর দশখানা বইয়ের মতো নয় বলিয়াই আজ দশজনকে মিলিয়া দশ রকমের অভিন্নত ব্যক্ত করিতেছি এবং উদাসীনতার ছিদ্রপথ দিয়া উৎকোকে বিশ্বস্তর তলদেশে ঠেলিয়া দিতে পারিতেছি না।

‘পথের পাঁচালী’ আমাদের ব্যক্তিগত মেজাজ বা ক্রটির হোলো-ওজন করিয়া অগচ্ছদ করিতে পারি, এমন কি মরজাও হরতো-কুঁড়ি বাইতে পারে, কিন্তু উপেক্ষা করা কেবাবারই অসম্ভব।

বইখানা পড়িয়া সকলের আগে এই কথাটাই মনে হয় লেখক পাঠকের—এবং তার চেয়েও বড়ো নিজেকে—ফাঁকি দিতে এতদূর-ওড়া করেন মাই। অভিজ্ঞতার মধ্যে যে-স্বাধিকতার জন্ম তাই দিয়া লেখক অপুর জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা-কথিয়া দিতে চাহিয়াছেন। যেমন-যেমন করিয়া সত্য-রকমের কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বই যথ্য করিবার দায় এবং পাঠকের মনে হঠাৎ চমক সাগাইবার প্রয়োজন হইতে নিজকে বাঁচাইতে লেখক যত্নের ক্রটি করেন নাই। অতি আধুনিকদের মধ্যে কেউ কেউ ভালো লেখেন, বড় ভালো লেখেন, কিন্তু তাঁহাদের চিত্তা ও সৃষ্টিশক্তি যথ্য হইয়া আছে সে-কথা ‘পথের পাঁচালী’ পড়িয়া আবার নূতন

মহতের এবং বৃহত্তের কোনো আভাস পাইনা; দিনের পর দিন অপরিসীম বৈধ্য সহকারে নিপুণ আঁটিয়ে চৈতন্য লইয়া তাঁহাদের কাছকেও আঁটের তাকমহল গড়িবার দিকে শক্তি প্রেরণ করিতে দেখি না। যাঁহা তাঁহারা গড়িতেছেন তাহা সুন্দর নয় একথা বলি না, কিন্তু তাহা যেন আঁটের গুণতে ছোটো ছোটো কুটীর, তাহা যেন যমুনাতীরবর্তিনী সেই সৌখ-স্বস্তির মতো কালের আকাশে অকৃত পক্ষীয় মাথা উড়াইয়া গড়াইতে ভরসা পায় না। পাঁচখানা ছোটো গরকে, রেশমের হতো নয়, মারকেলের দড়ি দিয়া জুড়িয়া উপভাস খাড়া করা, কিম্বা একখানা উপভাসকে চক চক হোশ-খণ্ড দিয়া নির্মদভাবে কাটিয়া পাঁচটি ছোটো গরখণ্ডে বিভক্ত করার মধ্যে চতুর সাংসারিক জ্ঞানেরই পরিচয় পাই, শূন্য-স্ব শিল্প জ্ঞানের নয়। ইহার মধ্যে বিকৃত্ত্বিগুণ যখন তাঁহার বহুদিনের ভগত্যা, বিপুল বৈধ্য এবং বৃহত্তের কল্পনা লইয়া আমাদের সমুখে গড়াইলেন তখন আমরা অজ্ঞ সব কথা তুলিয়া একটা নূতন কিছু পাইবার আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলাম এবং শ্রদ্ধায় আলু হইয়া একেবারে এডওয়ার্ড টমসনের পদপ্রান্তে দিয়া ছিটকাইয়া পড়িলাম।

বাংলা-উপভাসে এই এপিক্ সৃষ্টির প্রয়াণ স্বভাবতই মনে করাইয়া দেয়—‘ওঁ’—‘ক্রীতাক’ কিবা, ‘করপাইট-গাঙ্গা’ কিবা, মট্রামের ‘প্যামিন্স ফার্ম’ কে? আর মনে করাইয়া দেয় সমস্ত শিক্তি বাঙালীর সেই অমলমল আশাকে যা ‘হিন্দুপুর’ কণিকের জন্ম ঐকিমিকি করিয়া উঠিল এবং ‘বোগাযোগে’র অন্ধকারের মধ্যে অকস্মাৎ বিলুপ্ত হইয়া গেল।

বাংলাদেশে বাস করিয়াও যে বাংলার আকাশ-বাতাস, গাছ-পালা পথঘাটের সঙ্গে আমাদের পরিচয় কত ফিকা হইয়া আছে সে-কথা ‘পথের পাঁচালী’ পড়িয়া আবার নূতন

করিয়া উলান্ধি করিলাম। মাথার উপরেই যে প্রোজেক্স নীলাকাশ আমাদের সঙ্গে বাকি বিনিময় করিবার জন্ত প্রতিদিন কাগ হইয়া থাকে তাহাকে আমরা সহজেই উপেক্ষা করিয়া চলি; গ্রামের প্রান্তেই যে-নদীটুকু আগনার মনে বহিরা চক্ষিতেছে তাহাকে অনাযীততার পরগণ্ডা শুধু করিয়া ফেলিতে হইতাবোধ করি না এবং ঘরের পাশেই যে-গাছটা বহুদিন ধরিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে তাহার নামটা পণ্ডিত জানিবীর জ্ঞান মনের মধ্যে কোন ব্যগ্রতাই জন্মে না। তাই অটুটক অপুর প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় এবং গল্পীশ্রীর প্রতি গভীর অধ্যয়ন দেখিয়া সজ্জিত হইয়া নিজকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—আমরা আধুনিক বাঙালীরা কি তবে বাংলা দেশে প্রবাসী?

এইখানে শেষ করিতে পারিলেই যুগি হইতাম, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে অপুর মনোবৃত্তির জন্ত তাহার ব্যয়গুণি অপেক্ষা করিল না, এবং যে-পথের পাঁচালী আমরা আধারিকার আরম্ভে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিলাম সে-পথ অহসীন এবং তাহা নিশ্চিন্দিত, নানাশাপাট অতিক্রম করিয়া, বড় বন-বাড়ি অতঃপাশে খালবিল পাণ্ড-পর্ষত ডিঙাইয়া, সহরের অনেক কদম্ব গলি-খুঁকি পার হইয়া সাত সমুদ্র তের-নদী পাড়ি দিয়া আপাততঃ দ্বিভি-দ্বীপে আসিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছে এবং এত ঘুরিয়া ঘুরিয়া কলীকৌণী বাঙালী পাঠক আমরাও ক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আত তাই ক্রান্তমনে পেছনে তাকাইয়া দেখি ‘গণের পাঁচালী’ পড়িয়া যে-আনন্দ উল্লস এবং যে-আশা দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছিল সে আশা-আনন্দ ‘অপরাজিত’ের কটিন আট-দীর্ঘতর বেগুণে গাথাইয়া তিমিত হইয়া আসিয়াছে। ‘গণের পাঁচালী’ আমাদের মনে বিস্তরে উল্লেক করে, আনন্দ দেয়, কেন না বিহিতভূমির কবি-চিত্ত প্রকৃতির সৌন্দর্য, গল্পী শ্রীর পরম রমণীয় বৃত্তিমাটি ও চর্যা-অপুর শিশু মনের সঙ্গে একাত্মতা অমূল্য করিয়া অসীম উপভোগ্য ভাষায় ছবির পর ছবি আঁকিয়া দিয়াছে। সে-ছবি দেখিয়া আমাদের মন ঘুরিতে ভরিয়া ওঠে—না উঠিয়া পারে না। নিশ্চিন্দপুরের প্রত্যেকটি গাছকে যেন আমরা চিনি, তাহার

যেন কি এক ভাষায় আমাদের সঙ্গে কথা কয়; ‘অপু-গর্গার ছোটো-খাটো ছুঁমি, অপুর বাঁশঝড়টার পাশে দাঁড়াইয়া-‘কোম-ওগু গুণ্ডাটার সেই বৃদ্ধ মারটার দিকে উলান-দুটিতে তাকাইয়া থাক, নীরব মধ্যাহ্নে যুগুর কাতর জন্মন, নীলোজ্জ্বল আকাশের তলা দিয়া পানীঘরের ডিঙিয়া যাওয়া—গল্পীভাবনের অশ্রু অশ্রু-গুটিমাটি দিবা সব কিছু মিলাইয় কবি আমাদের জন্ত যে-দীনহীন মাঠাঙ্গণে রক্তা করিয়াছেন সেখানে প্রশ্রয় করিলে অতি সহজেই আনন্দ পাই। বালক অণুকে আমরা কণে কণে আঁড়ালে আঁড়ালে দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু অণুই সেখানে সব নয় কণের আশ্রয়ে শূন্যস্থানে দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই, কিন্তু তবু সেখানে শূন্যস্থানই ‘সব নয়—সেখানে প্রত্যেকটি গাছ আগনার ব্যক্তির দীপ্তিতে ভাস্কর। এ-নৈম আঁড়ালে মনে করিব করনা ও অঙ্গন-শক্তির বিবাহ লাভ সহজে ঘটিতে পারিয়াছে। কিন্তু যখন পারিপাশ্বিকের পরিবর্তন ঘটায়, যখন অণু কলিকাতার রূহন্তর জগতে আসিয়া এসা উপস্থিত হইল তখন সেখানকার তাহার সহজাত কবিত্বশক্তি ও অতিবিশিষ্টতার ক্ষেত্র আর আগের মতো পাইলেন না।

মুহুরি এই যে অণু কালের উজ্জান প্রোতে খুঁটি গাড়িয়া দাঁড়াইয়া রয়েছে ও মনে চিরকাল আট বছরের খোঁকাটি রহিতে পারিল না কিন্তু যে-অধুপাতে তাহার বহন বাওয়ে যে-অধুপাতে তার মন ব্যতিতে যা না। অণুর আশ্রয়স্থানেও বিহিতবাবু যেন তাহাকে বাড়ে ধরিয়া গালে চড় মারিয়া বারবার মনে করাইয়া দিচ্ছিলেন—সেখ অণু, তুই কিন্তু সেই চিরকালের ‘অপু। ‘অপরাজিত’ নাম শুনিয়াই আমরা একজগৎ আশ্রয়ে হইতেই প্রকৃত হইতে পারি যে আকাশ মাথায় ভাঙিয়া পড়িলেও কিছা খয়ের তলা হইতে ধরণী সরিয়া গেলেও অণু কাবু হইবার ছেলে নয়, কেন না সে যে আমাদের সেই অণু। যে অপরদীর্ঘ জন্ম-কষ্টের মধ্যে দিয়া অণু পড়াশুনা করিয়াছে, ইঙ্গুল এবং কয়েক তাহা সত্যই প্রশংসনীয়,—প্রাণ ঘুলিয়া বলিতে ইচ্ছা করে—সাবাস ছেলে! আরো বড় ছেলে! যে আস্তে ধরি পাইয়াছে এবং আমাদেরও আরো একবার ‘সাবাস’ বলিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তাহার ছায়ে

কোণাও আমাদের চিত্ত অভিভূত হয় না। বাহিরের জগতে অণুর অগ্রগতির সমুদ্রে প্রতিপদে বাধা উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি, সেও বালকবীরের মতো সংগ্রাম করিয়াছে, কিন্তু সে সংগ্রাম তাহার অন্তরকে যেন স্পর্শ করে না; হুতরাং আমাদেরও তাহা মনের উপর দাগ না রাখিয়া আসিয়া যায়। এজনি যেমন করাত দিয়া লাইনের উপরকার তুলার কাটরা এজনি রাখা করিয়া চলে, অণুও তেমনি তাহার দুইহাতে অপরাজিতের তরবারি লইয়া নিশ্চিন্দ মনে সমস্ত অগদ-বিপদের মস্তক ছেদন করিয়া চলিয়াছে। সে যেন গারে গুরু পরিমাণে তেল মাখিয়া রাখিয়াছে—বাধা কিছু আসিয়া গারে লাগিতেছে সবই যেন পিছ লাইয়া পড়িয়া বাইতেছে।

মৃত্যু ব্যাপারটাকে বার বার আধারিকার মধ্যে টানিয়া আনিয়া বিহিতবাবু ও-জিনিষটাকে অত্যন্ত সহজ করিয়া তুলিয়াছেন। তাহার চতুর্দশের ভূপে যত বাণ ছিল মৃত্যুবাদনটিকেই প্রকৃতির বার বার টানিয়া বাহির করিয়াছেন কেননা চতুর্দশবয়সপারে, ঈদুর প্রয়োগই বোধকরি সব চাইতে সহজ। অণু বাহ্যকই জড়হিতে চায় সেই ‘অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়—অণুর নিঃশ্বাস বোধ করি ভালো না। চর্যা, মা, অপুর বড় অভুল, অপর্ণা, লীলা কেহই শেষ পধ্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবার আশ্বিন্যাত্মক জীবন-নিশ্বাসের কাছে পালন না। অতঃপুত্রতার জন্ত বড়ি আনিতে বহিয়া সেদিন কাজ মেটের চার্পা না পড়িয়া কেন যে অজ্ঞ বকই ছেলে মরিয়া গেল তাহাই ভাবিয়া আশ্বিন্য লাগে। একই অপুর প্রিয়, বাহারা মরিল মৃত্যুর দ্বারা অণুকে কটিন আশ্বাত দিয়াই গেল সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাদের মধ্যে দুই একজন—অন্তত লীলা—বাঁচিয়া থাকিবে অণুকে কটিনতর আশ্বাত দিতে পারিত। অণুও বাঁচিবার প্রায়স্তেই যদি শরম ঘরে ঢুকিয়া বিল লাগাইয়া দিত তবে সে সমস্ত গোল গোড়াতেই ঢুকিয়া যায়। মৃত্যুশোকে যে কোনো নাই, তাহার মধ্যে সংগ্রাম করিবার যে কিছু নাই, একথা বলি না,—কিন্তু অপুর জীবনে কোনো মৃত্যুই গভীর রেখাপাত করিতে পারিল না, যে-প্রিয়জনের মৌলিকতার ঘটিলে অশ্রু-করণ অশ্রু অশ্রুশ্রী সঙ্গরাক্ত যক্ষণায় রক্তাক্ত সহস্র ক্ষতবিক্ষত হইতে থাকে,

অণুর না বা দ্বী বা লীলা তাহার কেহই যেন তেমন প্রিয়জন নহে। যে আবেশ-মন লইয়া শিশু-অণু বৃদ্ধের প্রারম্ভের দিকে চাহিয়া থাকিত সেই মন লইয়াই সে পরিণত বয়সেও এই মৃত্যুপথযাত্রীদের স্বত্বজন চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। গভীর বেদনাকে যে গভীর বেদনার মতো করিয়া অমূল্য করিতে না পারিল তার কাছে জর-পরাজিতের মূল্য বিশেষ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। কবি-বোটাটি বিহিত বাবুর বন-জন্মের অভিজ্ঞতার চেয়ে পরিণত মাহুরের মনোবৃত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা যদি বেশী থাকিত তবে ‘অপরাজিত’ের কতকগুলি অনাবশ্যক details-এর গুংগম ভার হইতে আমরা রেহাই পাইতাম। লীলার গাড়িতে চাপিয়াছি, আর প্রত্যেক ঠেগনে যদি এজিনিয়ার আসিয়া কি করিয়া এজিনি চলে দেখাইতে চায়, কি করিয়া বাঁধার গভীর অরণ্য হইতে কাঠ কাটায়া শিল্পার বানাইয়া বসানো হইয়াছে বুঝাইতে চায়, যদি রেইল কিনিতে ও মাটি কাটিতে কত পরচ পড়িয়াছে কণ্টপক জানাইতে চায় দিলে নিঃসন্দেহে রেশপার হইয়া ওঠে এবং লীলা যে কোনো-কালে পৌছিব যে ভরসাই ছাড়িয়া দিতে হয়। ‘অপরাজিত’ নদীর মতো একটানা পাঠকের মনকে শেষের দিকে টানিয়া লইতে পারে না—গমের প্রোত স্থানে-স্থানে দুই তীর ছাপাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে বলিয়া পাঠকের মনতরী অত্যন্ত মৃদুপাতে অগ্রসর হইতে থাকে আর অনাবশ্যক ঘনিষ্ঠা গুণ ভুইয়াতে চৈতন্য চৈতন্যে রাস্তা আশিয়া পড়ে। যুব বেশী বলিলেই ভালো বলা হয় না একথা আমরা সকলেই জানি। এংকার পাঠকের ভাবিবার জন্ত এতটুকুও অবশিষ্ট রাখেন নাই। অণুকে দিয়া কতকিছু এংকার করাইলেন, কতকিছু বলাইলেন, কিন্তু তাহাকে দিয়া ভাবাইলেন গুণ কম। ‘অণু’ আইডিয়ালিজমকে প্রকা করিয়া কিন্তু দশ বছর বয়সের ‘আইডিয়ালিজমের সঙ্গে বিশ বছরের আইডিয়ালিজমের পার্থক্য বেশ প্রাচল স্পষ্টরূপে হইবে ইহাই আমরা এই শক্তিশালী লেখকের কাছে আশা করিয়াছিলাম।

লীলাকে আমরা বিহিত-কবীর উপেক্ষিত, নামে

অভিহিত করিতে পারি। গ্রন্থকার অপর দিকে এতবেশী মনোযোগ দিয়া ফেলিয়াছেন যে আর সব নর-নারীর সঙ্গে সম্বন্ধের ব্যোমে অপেক্ষে দুটাইবার অবকাশ পান নাই। অথচ লীলাকে আত্মহত্যা হইতে রক্ষা করিয়া লীলা-অপর সম্বন্ধের অশীম সম্ভাব্যতার দিকে নজর দিলে কী না হইতে পারিত! 'অপু' যে পুঙ্খ, তার যে কোনো যৌননিমিত্ত থাকিতে পারে, অস্বস্ত থাকি উচিত, সে-কথা বিহুতিবাসু আত্মসে জানাইতেও যেন লজ্জা পাইয়াছেন। 'ভাগ্যিস' কাবলের জন্ম হইয়াছিল, নতুবা 'অনেক' কথাই আমাদের মনে হইতে পারিত। কাবলের জন্মকথাটা চোখ-মুখ বুলিয়া এক নিমিষে বলিয়া গ্রন্থকার সেই যে দোড় দিলেন, আর ফিরিবার নাম নাই—'অগ্নি-ইন্দ্র', বন-জঙ্গলের পূর্ণগাছাণী গান সহস্রবার একই-ভাবে আমাদের নিকট গাহিয়া গাহিয়া আনাদিগকে ভুলাইতে চাহিয়াছেন কিন্তু পারেন নাই। নৃত্যার পূর্ণদিন গ্রন্থকার মুহূর্তকালের জন্ত লীলার দেহের কাছাকাছি অপেক্ষে বসাইয়া পরসেক হইতে সেই হতভাগিনীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

প্রকৃতকৈ জীবন্ত করিয়া আমাদের চোখে ধরিবার এত নিঃসংকল্প ক্ষমতা বিহুতিবাসুর আছে, বর্ণনা করিবার শক্তি

তাহার এত অসাধারণ যে, যেখানে-সেখানে সে-শক্তি প্রয়োগ করিবার লোভ তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে দেখিয়া খুবই চমক হয়। কিন্তু বর্ণনাবোমা প্রকৃতির পুষ্টিরও একটা শীমা আছে, এবং সেই কারণে একই ভাবে পুনরাবৃত্তি বাধা হইয়া তাহাকে করিতে হইয়াছে, এবং কোনো কোনো জায়গায় একই ভাষায়। 'অপু' বধনি কোনো গ্রামগণে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে তখনই শৌভা মাটির গন্ধ কিংবা নামহীন কোনো পাখীর ডাকে সে বিরক্তের মতো ঘননিবিড় কোণ-ঝাড়ের দিকে তাকাইয়া থাকিবে, এ একেবারে জানা কথা, এবং তারপর বহুপট্টাব্যাপী প্রকৃতি-স্ববের জন্ত আমরা না পড়িয়াও আগে হইতেই প্রস্তুত থাকিতে পারি।

আমলুকা বিহুতিবাসুর চিত্রিত করির কিন্তু তাহার লেখনী আটকের নয়। অভিজ্ঞতা তাহার বহু-বাপক, করনশক্তি প্রবল, উপকরণ প্রচুর, ভাষাট সুন্দর; কিন্তু ও' কি যেন একটা নাই। তাহার কথাও আছে স্বরও আছে, কিন্তু যে-ফুলের বোম্বে উভয়ে মিলিয়া একটা পরিপূর্ণ গান হইয়া উঠিতে পারে সেই ফুলদের সত্যই তাহার মতো বোধ করিতেছি।

—আগামীবারে সমাপ্ত

বিসর্জনী

কীহুদীন্দ্রনার্থ দত্ত

মিলনার বসন্ত-প্রদোষে
তোমার চরণতলে তৃণাসনে ব'সে,
গাঢ়শব্দে পুলকিয়া নবানুর পাঁচনের বন,
আনি নাহি কবে :
“মহেশ্বরের দীপ্ত সিংহাসন
চাহিনা, চাহিনা, যদি অন্তরের অন্তঃপুরে তব
পরিচয় স্থানটুকু দাও, প্রিয়ে, মোরে” ॥

উৎকণ্ঠিত বিদায়ের উদ্দমন লগনে

ফণে ফণে

ছড়িয়ে শিথিল হন্তে পুষ্পিত প্রান্তরে

উন্মূলিত ক্রকাসের দল,

নিলাজে ভাবালু অশ্রু মুছি অবিরল,

আনি কহিবোনা কভু : “জীবনসঙ্গিনী,

বিরহাশ্রদ্ধায় তব নরকেরে আজি আমি চিনি,

প্রলয়ের পাই পূর্ণাভাস।

আজি হতে আমার আকাশ

হতবুদ্ধি পিপাসার আবেগিক আত্মপ্রবন্ধনে

স্বপন-বপনে

দুঃস্বপ্নের মরুভূমি রেখে দিবে চিত্তার্পিত করে

পলাতক শূন্য দিগন্তরে” ॥

কতবার কত মধুমােস

কখনো প্রকৃত দুঃখে, কখনো বা কৃত্রিম হতাশে,

কভু ব্যর্থ কথার মাতনে,

সে-অতিরঞ্জনে

ফুটায়ছি তপ্ত রাগ অবলুপ্ত প্রেমসীর কানে
মধুপ-গুঞ্জন-মত্ত নাধবী-বিতানে।

সে-নাটোর মোহন পরশে

আজি আর জাগাবোনা ও-নীলিম-ধ্বস দরশে

প্রেমাক্ষর মুক্ত মরীচিকা ॥

আজি কবে,

নির্দোহ বিদায়-লগ্নে নিঃসঙ্কেচে আজি আমি কবে :

“হে মোর ফণিকা,

অরুণ স্মরণ তব চাহিবোনা করিতে শাস্ত।

আগন্তুক শ্রাবণের আকস্মিক উল্লাসের মতো

তীব্র প্রবর্তনা তব সাঙ্গ হোক শাস্ত্র-অঙ্ককারে ;

অবেগ বিশ্বয় তারে

ক'রে দিক অনির্বচনীয়” ॥

হে সখী, পবিত্র হ'লে আমারে ভুলিও,

ইচ্ছা হ'লে দিও

নির্দগ্ধ সন্ধ্যায় তব মূহুর্তের নিক্রিয় মমতা ;

আর যদি পারো, শুধু মনে রেখে এইটুকু কথা :

অপনা ভ্রবোর ভারে যবে মোর তরী

নিঃশ্রোত জীবনপথে হয়েছিলো উদ্বাগ, অচল,

তুমি কৃপা করি,

এনেছিলে উজাড়িয়া আজন্মের সামান্য সখল,

সে-জঞ্জাল কিনে নিয়ে যেতে ;

স্মিত হেসে, বিদগ্ধিনী, নিদাম সঙ্কেতে

তুমিই দেখায়েছিলে নিকরদেশে আশ্রয়ের তীর

শাস্তি-সুনিবিড় ॥

সপ্তসিদ্ধ-পরাপারে মধুরিত নারিকেল-বনে "

ফাস্তনের আড়ম্বরশূন্য জাগরণে

যেই চিরন্তন

একদা আমার রক্তে অলক্ষিত নৃপূরের ধ্বনি

জাগাইয়াছিলো আচম্বিতে ;

প্রমোদের বিনীত নিশীথে

যাহার আত্মানলিপি উদ্ভাসিয়া বাসর-প্রকার,

আনিয়াছে আলিঙ্গনে দুর্জয় বাবধি ;

বারংবার

যে-নির্বাক অমূল্য দরদী

দারুণ দুর্ধোগ ভেদি, ছরাশার অলদচিশিখা

মেঘরক্তে দেখায়েছে যোরে ;

মোর জন্মজন্মান্তরে সেই অনানিকা

আয়ত আঁখির তব নীলাশু সায়েরে

আপনার প্রতিবিম্ব ফেলিয়াছে চপল খেলায় ।

আজিকার অকপট গোদুলি-খেলায়,

আমাদের জীবনের উষর সঙ্গমে,

নমিলাম, প্রিয়তমে,

নমিলাম গর্বনত শিরে

কোমল হৃদয়ে তব অচিনের পদচিহ্নটিরে ।

আগামী আশ্বিন সংখ্যা "উত্তরা" ২০শে ভাদ্র ও
কার্তিক সংখ্যা "উত্তরা" ১০ই আশ্বিন বাহির হইবে।
বিজ্ঞাপন দাতাদের অনুরোধ তাঁরা দুই মাসের
বিজ্ঞাপনের নতুন অথবা পরিবর্তিত কপি ১০ই
ভাদ্রের মধ্যে আমাদের আফিসে পাঠাইয়া দিবেন।

রসচক্র

—শ্রীমরোজকুমার রায়চৌধুরী

—বারোয়ারী উপন্যাস—

১০

কিন্তু এমন করিয়াও বেশী দিন চলিল না। পাড়াগায়ে
কোনো কথাই শেষ পর্যন্ত গোপন থাকে না। বিকৃত্তর
জমি কেনার সঙ্কল্পের কথাও থানা সময়ে শিবরতনের কর্ণগোচর
হইল। এমন কি, জমি কেনা শেষ পর্যন্ত কেন বন্ধ রাখিল
সে কথা শুনিয়া তাঁহার আর লজ্জার অবশিষ্ট ছিল না।

জ্ঞান গায়ের গহনা বিক্রি করিয়া জমি কিনিবার শক্তি
বিকৃত্তর ছিল না। শেষ পর্যন্ত নানা চতুষ্টয় তাহাকে
পিছু হেতে হইয়াছিল। কিন্তু শিবরতন বসিয়া-বসিয়া ভাবিতে
লাগিলেন, এই বাড়িতে তাঁহার অপোচের একটি হুঁচ
কিনিবার শক্তি কাহারও ছিল না। আর আল—

পূর্ণাঙ্কে জানিতে পারিলে শিবরতন ন-বোমার টাকাটা
লইতেন কি, লইতেন না নিশ্চয় করিয়া বলা শক্ত। হইতে
লইতেই হইত। সে হুঁচকয়ে তাহা ছাড়া আর কোনো
উপায় ছিল না। কিন্তু তাঁহার হুঁচকিয়া সেজ্ঞ নয়। টাকার
'পত্র' কোনোদিনই তাঁহার দরদ ছিল না। থাকিলে তাঁহার
লোহার মিল্কু আল টাকার তত্ত্ব হইয়া বাইত,—জীবনে
এত টাকাই তিনি উপাচ্ছন করিয়াছেন। এবং এখনও
ওই এক হাজার টাকা ন-বোমার হাতে ফেলিয়া দেওয়া খুব
শক্ত নয়। কিন্তু এই তুচ্ছ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া ভ্রাতা ও
ভ্রাতৃবধূর মধ্যে যে বিচ্ছেদ ঘনাইয়া উঠিতেছে তাহার
প্রতিকার কি? এ টাকাটা দিয়া দিলেও সংসারের সেই
পুণ্যতন হাওয়া আর ফিরিয়া আসিবে না।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। একটি চাকর
আলো আনিয়া মেঝের উপর রাখিল। এবং পিছনে-পিছনে
গিরিবালা বা-হাতে একটি আলন আর ডান হাতে কোশা-
বুলী এবং কাঁদের উপর একখানা মটকার কাপড় লইয়া
উপস্থিত হইল।

—আপনার আত্মিকের জায়গা ক'রে দোব বাবা?

শিবরতন মাড়া দিতে গেলেন, কিন্তু তাঁহার শর যেন
বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শুধু গলাটা একবার ঘড়, ঘড়, করিয়া
উঠিল।

আত্মিক শেষ করিয়া শিবরতন ডাকিলেন,—তাঁরা, তাঁরা।
সেই আত্মিকের শুনিয়া আত্মিকের জায়গা পরিষ্কার করিতে
করিতে গিরিবালা চমকিয়া একবার তাঁহার মুখের পানে
চাহিল। কিন্তু সেই বলালোকে তাঁহার মুখ ভালো করিয়া
দেখা গেল না।

গিরিবালা জায়গা পরিষ্কার করিয়া ব্যাবসায় গেল,
এবং তখনই একটি রেকারীতে জলখাবার সামগ্রী আনিয়া
পিতার আগনের হুঁচকিয়া নামাইয়া দিল। শিবরতনের বুকিতে
দেখা হইল না যে, দরজার আড়ালে ন-বোমা পাড়াইয়া
আছেন।

জলখাবারের থালাটা কাছে টানিয়া আনিয়া শিবরতন
একটু কি ভাবিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন,—ন-বোমা
কি চল গেলেন, গিরি?

গিরিবালা দরজার গোড়ায় পাড়াইয়া দিল। বলিল,—
না, এই যে এখানে দাঁড়িয়ে।

শিবরতন আবার নিশাঙ্গে কি যেন ভাবিলেন। তারপর
বলিতে লাগিলেন,—

একদিন ছিল মা, যখন শম্ভুও ছোট, বিকৃত্তও ছোট।
তখন আমি এই পেরেকের 'অতি সামান্য মাইনেতেই চাকরী
করি। সেই মাইনেতেও তবের তুচ্ছনকে যে কি কটে পড়িছে,
সে জানতেন না, আর আমি আমি। কিন্তু এত কঠোর
মধ্যেও তখন আমি যখন দেখতাম, ওরা একদিন বড় হবে,
মাহুয়-হবে,—সেদিন আর কোনো জানবাই থাকবে না।
আজকে ওরা বড়ও হয়েছে, মাহুয়ও হয়েছে, কিন্তু—

একটু কাশিয়া শিবরতন গলাটা পরিষ্কার করিয়া
লইলেন।—

ত্রিক এমন একটা সংসারের কল্পনাই করেছিলাম, না। তোমারই মতো এমন একটা মায়ের জন্মে আমি দিন রাত্তির সাধনা করি। না ছাড়া আমার একটা দিন চলে না। কিন্তু বা যেদিন স্বপ্নে গেলেন, সেদিন কষ্ট আমার যতই হোক, ভাবনা হয়নি এতটুকু।

গিরিবালো ভাড়াভাড়ি বলিল,—ন-খুড়ীনা কাঁচছে, বাবা। সে কথাই কান না দিয়া শিবরতন আপন মনেই হাসিয়া বলিলেন,—কিন্তু ভেবে-ভেবেই যার এতগুলো দিন গেল, তার বাকী দিনগুলোর ভাবনা বুঝি বিধাতাপুণ্ড্রও খোঁচাতে পারেন না। না পারেন, হুস্তিছা আমার সঙ্গে গেছে। কিন্তু আমার সংসারে আমার নিজের কাছেই কেমন যেন দিন-দিন ছোট্ট হয়ে যাচ্ছিল না। কারো ওপর বেন ভরসা করতে পারছি নে,—কারো ওপর বেন জোর খুঁজে পাচ্ছি নে। সেইটেই হচ্ছে অসহ।

শিবরতন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন। বলিলেন,—স্বথ বো একবারে পাই নি তাও নয়। কিন্তু সে আমার 'সইলো না না। এই ক'দিন আমি কেবলি ভেবেছি, কেবলি ভেবেছি। আজ নিশ্চিত করে স্থির করেছি, পৃথক হওয়া ছাড়া উপায় নেই। তারপরে ক'দিন বাঁচবে জানিনে। তবু পৃথক হতেই হবে। সেই কথা কাল বিকৃতিক গিখে দিচ্ছি।

শিবরতন উঠিয়া পাড়াইলেন, জলখাবার স্পর্শ করিতেও ভুলিয়া গেলেন।

অসহ্য গিরিবালো আতঁনার করিয়া উঠিল,—বাবা, ন-খুড়ীনা কেমন করছে!

এবং তারার কথা শেব হইতে না হইতেই জন্ম সশকে গড়িয়া গেল। সে শব্দ শিবরতন তনিত পাইলেন। তিনি শূন্য গড়গড়টটা অকারণে টানিতে টানিতে বলিলেন,—বোম্ব ফিট, গিরি, কাউকে ডেকে দে।

কিন্তু সে স্বর তাঁহার নিজের কান পঞ্চাশ পৌছিল কি না সন্দেহ।

শনিবার আসিতে কয়েকদিন দেরী ছিল। বিকৃতির আশির কথা শনিবারে। এই কয়দিন শিবরতন আর

বাড়ীর দিকে যান নাই। এবং জন্মাও কিটু হইতে উঠিয়া সেই যে শয্যা গ্রহণ করিয়াছিল, আর ওঠে নাই।

শব্দরতন বাড়ী হইতেই কোটে যাওয়া-আসা করে। দাধার মুখের ভাব দেখিয়া সে-ও আড়ালে-আড়ালেই ফিরিতেছে। পৃথক হওয়ার সঙ্কল্পের কথা দাধার মুখে তনিয়া অবধি সে যেন অস্পষ্ট ভাগিতছে। সংসারের কিছুই সে জানে না,—কোনোদিন জানিবার চেষ্টাও করে নাই। বাহা কিছু সোজগার করে মাসের শেষে দাধার হাতে ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হয়।

দাধার মুখের উপর ইহার প্রতিবার করিবার সাহস সংগ্রহ করিতে না পারিয়া কয়দিন কথাটা সে নিজের মনে-মনেই নাড়াচাড়া করিল। অবশেষে একদিন বড় বো-এর কাছে কাঁদিয়া গেল।

—এমন অনাস্থি কল্পনা তিনি কেন করছেন, তাও জানিনে বৌদি। কিন্তু বিকৃতি যদি কোন দোষ কটাই থাকে, তার শাস্তি কি আমাকে নিতে হবে? আমি সংসারের কি জানি বেলো তো?

বড় বো ইহার বিস্ম-বিসর্গও জানিত না। তবে কিছু যে একটা হইয়াছে, ছোট বো-এর অস্থখ যে দেখে নয় এমন অস্থখান সে মনে-মনেই করিতেছিল। কিন্তু তারার মুখে যে এত বড়-একটা কথার থাকিতে পারে, ইহাদের ভাণ্ড-ভাণ্ডে যে কোনোদিন পৃথক হইতে পারে এমন কথা সে কোনোদিন কল্পনাও করে নাই।

প্রথমটা সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তারপরে টিপাখোর মতো ষাড় কাং করিয়া দাধার মনোবোধের সঙ্গে শব্দর মুখের প্রত্যেকটি কথা আর একবার ভালো করিয়া তনিয়া লইল। মনে-মনে সে যেন খুশী হইল।

শব্দ উঠিয়া পাড়াইয়া বলিল,—ভূমি ছাড়া এ বিপদে আর কেউ উদ্ধার করতে পারবে না, বৌদি। তুমি একটু চেষ্টা কর।

বড় বো অরম্নস্বের মতো বলিল,—বেধি তো। বাহিরে আসিতেই শব্দ দেখিল দরবার পাশেই মেজ-বো পাড়াইয়া। শব্দ অজ্ঞতিকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া বাইতেছিল, মেজ বো ডাকিল,—শোনো।

শব্দ কিরিয়া তাহার নিজের ঘরের মধ্যে গেল।

মেজ বো-এর মুখ-চোখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

বলিল,—আমাকে পাঁচটা টাকা দেবে?

মেজ বো কোনোদিন তাহার কাছে টাকা চায় নাই। এ বাড়িতে স্বামীর কাছে টাকা চাওয়ারও নিয়ম নাই, স্বামীর কাছে হাতে টাকা দেওয়ারও নিয়ম নাই। এ বাড়ীর বো-রা প্রয়োজনের জিনিস আগে শাশুড়ীর কাছে হইতে পাইত, এখন বড় বো-এর মারফত পায়।

শব্দ বিস্মিতভাবে বলিল,—টাকা!

হাসিতে মেজ বো-এর সমস্ত দেহ তিলোত্তিত হইয়া উঠিল। মাথা নাড়িয়া বলিল,—হ্যাঁ, গো, হ্যাঁ, টাকাই। ঠাহরের ভোগ দিতে হবে যে।

শব্দর বিষয় আরও বাড়িয়া গেল,—তার মানে?

মেজ বো তাহার আরও কাছে সরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে মাথা হুলাইয়া বলিল,—আমি শুনেছি গো, তোমাদের সব কথাই শুনেছি। আর লুকাতে হবে না।

শব্দ বিষয়ভাবে হাসিয়া বলিল,—জাই শুনেছ! দাদা শুধু বিকৃতিকেই পৃথক করে দিচ্ছেন না,—আমাকেও।

হাত জোড় করিয়া মেজ বো বলিল,—আজ্ঞে, তাও শুনেছি।

শব্দ অত্যন্ত পঙ্খীরভাবে বলিল,—মেরেমাধব; ভাবছ ভায়া মজাই হবে। কিন্তু মজা যে কি সে আমি জানি। ন'টার সময় বেরিয়ে বাই, ফিরতে সন্ধ্যা সাড়টা। জুদ-ইঁড়া ঘাওনা আমাদের কাছে, সে যে কোথায় আছে কিছুই জানিনে। আমার সম্পত্তি কে দেখা শুনেও করে শুনি?

সেই বো চট্টয়া বলিল,—হাকা! পুখিবা শুদ্ধ লোকের বিষয়-সম্পত্তি দাধাই দেখা শুনা করে কিনা? ভায়ে-ভায়ে কেউ তো কখনো পৃথক হয় নি।

অন্ত সময় হইলে শব্দ একথার চট্টয়া কুক্কুৎকাং বাধাইল। আশ্চর্যের বিষয় আজ একটু কথাও বলিল না। শুধু মেজ বো-এর পানে একটুকু রক্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া আছে আস্তে বাহিরে চলিয়া গেল।

ভালো কথা বলিতে আসিয়া এমন হেনস্তা মেজ বো অনেক সহিয়াছে। আপন মনেই সে ঘরের মধ্যে বিড়-বিড় করিতে লাগিল।

রাতে আহারদ্রির পর শিবরতন বাহিরের ঘরে নিজের আয়োজন করিতেছিলেন। গড়গড়ার নলটি তখনও হাতে ধরাই ছিল; মুদ্রিত চোখে একটা তাকিয়া আশ্রয় করিয়া চুপ করিয়া শুইয়াছিলেন। এমন সময় বড় বো আস্তে আস্তে আসিয়া পাড়াইল।

—যুগলে না কি? শিবরতনের যুগ তখনও আসে নাই। কিন্তু সাড়া দিতে সাহস করিলেন না। বড় বো শিবরের কাছে বসিয়া শিবরতনের লগট স্পর্শ করিল। উত্তাপ ছিল না। বড় বো লগটের চুলগুলি সমস্ত ছ'পাশে সরাইয়া দিয়া বলিল,—আমাকে আর ছাং দিও না। ওঠো, ওপরের ঘরে শোবে চল।

বহুকাল আগে শিবরতনের একবার অস্থখ করিয়াছিল,—কঠিন অস্থখই। তখন ছ'জনেই বহুস জ্ঞ। তখন এ বাড়িতে দিনের বেলায় স্বামী-সম্পর্কের প্রথা ছিল না।

শিবরতন সমস্ত দিন বোগেশাশ্রয় শুইয়া-শুইয়া ছটকট করিতেন। সহস্র কাজের মধ্যে বড় বো-এর কানে তাহা পৌছিত। তবু একবার কাছে বসিয়া শুকনো করিবার সাহস 'তাঁহার ছিল না। কিন্তু রাতে এমনি সময়েই সমস্ত-কাজি তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিত। যুগ্মহিতে বলিলেও কিছুতে ঘুমািত না।

সেই বহুকালের বিদ্যুৎ কথা শিবরতনের আবার মনে পড়িয়া গেল। সম্ভে করণশর্মে তাঁহার মনে হইল, এমন শ্রান্তি তিনি বহুকাল বোধ করেন নাই।

শিবরতন আস্তে আস্তে চোখ মেলিয়া চাহিলেন, এবং ছেলেবেশার মতো তেমনি করিয়া বলিলেন,—রাত অনেক হ'ল বড় বো, শুতে যাও।

বড় বো উঠিয়া কোনো লক্ষণ দেখাইল না। বলিল,

—যুম কি আমার চোখে রেখেছে? নিজের চেহেরার পানে একবার তাকিয়ে দেখ তো, কি চেহারা হয়েছে।

বড় বোঁ-এর গলার খর বন্ধ হইয়া আসিল। বলিল,— কিছু এমন ক'রে আমার দৃশ্য-মারার দরকার কি? একবারেই মেরে ফেল না?

বড় বোঁ আঁচলি চোখ মুছিল।

শিবরতন কোনো কামি কহিতে পারিলেন না। শুধু তাহার একখানি হাতের উপর হাত বুলাইতে লাগিলেন।

বড় বোঁ বলিতে লাগিল,—সাগরানিন পাঁচ কুত্তের ব্যাঘ্রার খাটা,—একবার তোমার পানে চেয়ে দেখবার অবসর পাইনে। কেন এত খাটবে? কিসের জন্তে? আমার ওই একমুগুর মেরে, আমি আসছে মাসেই তার বিয়ে দিয়ে কাশী চলে যাব।

শিবরতন হৃদয় করিয়া উল্লিখা বলিলেন। বড় বোঁ-এর একখানি হাত ধরিয়া বলিলেন,—যাবে বড় বোঁ, কাশী? সতিয়া আমি আর পারছি নে।

—যাবেই তো। কিন্তু ওদের লাঞ্ছনাও দেখে যাব। বেদিন থেকে শুনেছি পুথক ছব, সেদিন থেকে তেমনার ন'কোনা ন'ব্যা নিয়েছেন,—কুটোটা ভেঙে ছ'খানা করছেন না। মেজ বোঁ বেড়াচ্ছেন আড়ালে-আড়ালে। কিছু কি বুঝি না?

শিবরতনের কাশীবাদের উৎসাহ চলিয়া গেল। তিনি আবার বিছানার শুইয়া পড়িলেন। নলটা একবার মুখে দিলেন, কিন্তু বোঁয়া না পাইয়া তাহাও নামাইয়া রাখিলেন। বড় বোঁ চোখ ঘুরাইয়া হাসিয়া বলিলেন,—আবার মেজমুগু এসেছিলেন কাঁধেরী গাইতে। কচি থোকা, কিছু তো জানেন না। ছোট্টকুরপাকে আসতে লিখে দিয়েছে তো? বাবা! পেটে-পেটে কত বুদ্ধি থেলে!

শিবরতন আর পারিলেন না। অত্যন্ত স্নানভাবে বলিলেন,—শরীরাটা বড়ই ব্যাগ্রপ করছে, বড় বোঁ! তুমি বরং আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যাও।

বড় বোঁ কিছু অত সহজে তাহাকে নিস্তিত্তি দিল না। আরও অনেকখণ্ড বকিয়া-বকিয়া যখন দেখিল শিবরতন সত্যই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন তখন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আলোটা নিভাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

১১

শনিবারে বিকৃতি আসিয়া যখন বাড়ী পৌছিল, তখন রাত্রি এগারোট। ঠেগনে তাহাকে আনিবার জন্ত যথারীতি একজন চাকর গিয়াছিল। অত রাতে পাড়ারীয়ে যুব কম লোকই জাগিয়া থাকে। বিকৃতির হুনিরা হইল এই যে, পথে কাহারও সঙ্গে দেখা হইল না। তাহার মনে হইল, এই পুথক হওয়ার ব্যাপার লইয়া গ্রামে রীতিমত খোঁট চলিতেছে। কখনায় সে পথ দেখিবে পাইল, নমু ভট্টাচার্য, কুটিল হাসিয়া তরুণী নাড়িয়া বলিতেছে, আর ছ'ছ'ছ', তারপরে—

“পুথক হওয়ার কুফল নিশ্চয়ই অনেক আছে, কিন্তু,—বিকৃতির শাস্তিও বনিয়া দিরাছেন,—ব্যক্তিগতভাবে বিকৃতির ইহাতে ভালোই হইবে। পাড়ারীয়ে চিরদিন যুগ করা তাহার পক্ষে পোষাইবে না। তাহার উপর শিবরতনের খরচের হাতটা অত্যন্ত বেশী। এমন করিলে সংসার টিকিবে কি করিয়া!

বাহিরের বৈঠকখানায় মিটমিট করিয়া একটা আলো জলিতেছিল। বিকৃতির ‘আশঙ্কা’ হইল, শিবরতন হয়তো ওঘরে শুইয়া আছেন। সে অতি সতর্কপণে পাশ কাটাইয়া সদর দরজা দিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

কিন্তু বিপদ তো বিকৃতির একটা নয়। আগেরবার ঢাকা লইয়া জরার সঙ্গে একটা লজ্জাবীর কলহ হইয়া গিয়াছে। সেখান হইতে যে কিরণ সঞ্ছদনা পাওয়া যাইবে তাহাও অনিশ্চিত। মুগ কাশিয়া বিকৃতি তাহার শরম কবের খার চৌলিল।

হৃদয়েই খাবার ঢাকা ছিল। তাহারই পাশে মেজের বসিয়া জ্যা একখানি বই পড়িতেছিল। সে তাড়াতাড়ি মাথা কাগড় টানিয়া হাসিতে-হাসিতে উল্লিখা দাঁড়াইল।

হাসি দেখিয়া বিকৃতি অনেকটা ভয় পাইল। চাঞ্চল্য আলস্যের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বিকৃতি ধপ করিয়া খাটের উপর বসিয়া বলিল,—উঃ! কি গরম।

জ্যা বিকৃতির পাঞ্জাবীর বোতামগুলি খুলিয়া দিয়া পাখা কুরিতে বসিল।

জিজ্ঞাসা করিল,—ওখানকার খবর ভালো।

বিকৃতি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, ভালোই।

—তুমি রাজের গাড়ীতে এসে যে! সবাই ভেবেছেন, তুমি আজ আর এলে না। এ গাড়ীটায় তুমি তো বড় আস না।

বিকৃতি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তাহ'লে বিষ্টকে ঠেগনে পাঠালে কে? জ্যা মাথা নীচু করিয়া বাতাস কুরিতে লাগিল, উত্তর দিল না।

বিকৃতি তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,— তুমি পাঠিয়েছে?

এবারে জ্যা হাসিয়া বলিল,—আমার কেমন মনে হ'ল তুমি নিশ্চয় আসবে। বাড়ীর কেউ জানেই না যে, বিষ্ট, গেছে।

সাত রাত্রি দুজনে অনেক কথাই হইল। বিকৃতি আশঙ্কা হইয়া গেল, তাহার গভবরের দুর্ভাগ্যবাহারের উল্লেখমাত্র জ্যা করিল না,—না করিল পুথক হওয়ার প্রসঙ্গের অবতারণা। সকালে ‘বিকৃতি’র যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন বিকৃতির মন একবারে হালকা হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু সে বেশীক্ষণের জন্ত নয়।

তখনও বিকৃতির চা ওয়া হয় নাই, এমন সময় বিষ্ট আসিয়া সংবাদ দিল, বড় বাবু ডাকিতেছেন।

বিকৃতি বৈঠক খানায় আসিয়া দেখিল, শিবরতন ঘরের ময়খানো বসিয়া একটা তাকিয়া ঠোঁট দিয়া মুস্তিস্তম্ভে নির্মল্যকরভাবে তামকুট দেখন করিতেছিলেন। শমু এক কোণে হুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া ঘুমাইতেছিল কি জাগিয়াই ছিল বোকা গেল না। আর পাড়ার কয়েকজন বিষ্ট ভ্রমকে একপালা কাগজপত্র লইয়া ত্রুণ্ড বিষ্টক দ্বারস্থ করিয়া গিয়াছে।

বিকৃতি কেহ বসিতে বলিল না। শিবরতন একবার শুধু চোখ মেলিয়া চাহিয়া আবার চোখ বন্ধ করিলেন। শুধু পাড়ার ভরলোকেরা তাহারই গৃহে ত্রাহসে সঞ্ছদনা জানাইয়া বলিলেন,—এই যে বিকৃতিবাবু, বোসো, রোসো। কলকাতার খবর ভালো?

তাও অত্যন্ত কীলখবর। বলরাম সান্দারের স্বদেশী সংবাদে কৌতুহল বড় বেশী। বিকৃতি আসিলেই তাহাকে ধরিয়া বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু শিবরতনও শমু-রতনের করণ-বিবাদ সূত্বেভাবে ঘরের ছাড়া এমনই বিষয় হইয়া উল্লিখাছিল যে, বলরাম সে কৌতুহল দমন করিয়া ফেলিলেন।

ভরলোকেরা প্রথম-প্রথম মাঝে-মাঝে ছুই একটা প্রশ্ন করিতেছিলেন। কিন্তু কাহারও কোনো সাড়া না পাইয়া শেষটা নিজেরা মাথা ভামো বুঝিলেন তেমনি একটা ব্যবস্থা করিয়া তিন ভাইকে পড়িয়া শুনাইয়া দিলেন।

অবশেষে তিনখানা বটননামা তৈরী হইল। বলরাম তিন ভাইয়ের কাছে তিনখানা বটননামা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—কথায় বলে ‘ভাই ভাই, ঠাই ঠাই।’ গ্রন্থ করা মিথ্যা বাস্তবিক, ভায়ে-ভায়ে পুথক একদিন হ'তেই হয়। না কি বল রাখা?

রাখাল ইহাদের মধ্যে হঠকনিষ্ঠ,—বিকৃতির বন্ধ। সে কথা কহিল না, শুধু ঘাড় নাড়িয়া ঘায় দিল।

বনমালী গোসাঁই কথাটা মুগিয়া লইয়া বলিলেন,—এই যে আমাদের—

গোসাঁই বাড়ীর কথাটা সবাই জানিত। হাতের কাছে এত বড় একটা দুষ্টা পাইয়া সকলে সম্মত হইল,—হ্যাঁ, এই তো এদের—

এক কথায় এত বড় সমস্তার সমাধান করিয়া গোসাঁই হাঁকিলেন,—কোথায় যে বিষ্ট, তাহাঁক দিয়ে যা।

শিবরতন বটননামাটা পড়িয়াও দেখিলেন না, নিশ্চয়ই ই কহিয়া দিলেন,—দেখা দেখি আর ছুই ভাইও।

—কুমার:

প্রভাতকুমার

সুপ্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক প্রভাতকুমার সুপৌৰাধায়েয় মৃত্যুতে কথাসাহিত্য জগতের একটি বিপ্লবের পতন হইল। রবীন্দ্রনাথ এদেশে ছোট গল্প রচনার প্রবর্তন করেন— রবীন্দ্রনাথ কবি—তাঁহার চিত্রা, ভাব, রচনাভঙ্গি ও ভাষা সমস্তই কবিত্বময়। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলিকে কাব্যসাহিত্য-ভাণ্ডারের সামগ্রী বলা যাইতে পারে। বাউ-গল্প অর্থাৎ বাহার মধ্যে গল্পবার কৌশলই পরিপূর্ণরূপে পরিষ্কৃত—তাহা প্রভাতকুমারের লেখনী হইতেই নির্গলিত হইয়াছে। প্রভাতকুমারের ছোট গল্পগুলিতে কাব্যার্শের অভাব আছে—কিন্তু ঘটনাক্রমের সমাবেশে কৌতুকরস ও কথাবিবৃতির কৌশলের ক্ষেত্রে এইগুলি বহুসাহিত্যে অনুলীনীয়। সাহিত্যাংশে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের সমকক্ষ বাঙ্গালী-সাহিত্যে নাই—তবু সেইগুলির পাশে প্রভাতবাবুর ছোট গল্পগুলি মান হইয়া যায় নাই। বহুদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালার কথাসাহিত্যে প্রভাতবাবুর গল্পের অমুকরণ চলিয়াছে।

উপল্লাস-রচনারও প্রভাতবাবু খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপল্লাসগুলি সাহিত্যাংশে খুব উৎকৃষ্ট না হইলেও স্ববর্ণা—একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। প্রভাতবাবুর রচনার ভাষা মার্জিত ও তচসিদ্ধ, অনলঙ্কৃত হইলেও সরস—কৌতুকবান্ধনীয় স্বচ্ছ।

মানসী পত্রিকার সম্পাদনাতোও প্রভাতকুমার যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন।

বিপিনচন্দ্র

সুপ্রসিদ্ধ বামুণী-সাহিত্যিক বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের পরলোকগমনে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের নানা শাখার যথেষ্ট ক্ষতি হইল। বিপিনচন্দ্রের রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রের অবদান, ওজস্বিনী-বাগ্মিতা, সংবাদপত্র পরিচালনা, অগাধ পাণ্ডিত্য ইত্যাদির কথা বার মিয়া কেবল সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার একনিষ্ঠ সাধনার কথাগুলিতেই বলিতে হয়—তাঁহার মৃত্যুকে বাঙ্গালার সাহিত্যগণদের একটি জ্যোতিষ্কের তিরোপাত হইল। বিপিনচন্দ্র নাটক, গল্প, উপল্লাস বা কবিতা রচনা করেন নাই। সত্য—কিন্তু অদ্বন্দ্ব্যতাবীর অধিককাল ধরিয়া বাঙ্গালী-দেশের বিভিন্ন সামাজিক পক্ষে দর্শন, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি,

ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বাঙ্গালী ও ইংরাজীতে অগণ্য সারগর্ভ ভাবধন প্রবন্ধ রচনা করিয়া আসিয়াছেন। সেই সকল প্রবন্ধের অধিকাংশই মাসিকপত্রের পৃষ্ঠার আজ অজ্ঞাতবাগ করিতেছে। কিন্তু সেগুলি বার্থ হয় নাই—সেগুলি বাঙ্গালীর শিক্ষিত-সমাজের জাতীয় জীবন-গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। বিপিনবাবুর চিত্রা, অল্পকৃতি ও অভিজ্ঞতা আমাদের জাতীয় জীবনের অপূর্ণত্ব হইয়া গিয়াছে। তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ বাহ্যে, তাহা আজ চিত্রানলে ভস্মীভূত হয় নাই—তাহা আমাদের মধ্যে থাকিয়াই গিয়াছে। তবু বলি আজ যদি তাঁহার রচনাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়—তাহা হইলে ভবিষ্যৎবংশীভরণ যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। বিপিনচন্দ্র ছিলেন—বঙ্গদেশের শিখা এবং বঙ্গদেশের মতই তিনিও ছিলেন লৌকিশিক্ষক।

স্বর্ণকুমারী

মহর্ষি বেবেজনাথের বিজয়ী কন্যা স্বর্ণকুমারীর মৃত্যুতে বাঙ্গালী-সাহিত্য সংসারের একটি লক্ষ্মীর তিরোধান হইল। স্বর্ণকুমারী বাঙ্গালী মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সাহিত্যসেবাকে জীবনের কৃত্তবস্ত্রণ অবলম্বন করেন। স্বর্নীয় প্রেমলতা রচয়িত্রী কৃত্তবস্ত্রণী ছাড়া অন্য কোন মহিলা তাঁহার আগে উপল্লাস রচনা করেন নাই। স্বর্ণকুমারী বঙ্গদেশের লেখিকা। তাঁহার দীপনির্বাণ, কাহাকে, ছিন্নমূল ইত্যাদি উপল্লাস এক সময়ে গৃহে গৃহে সমাদৃত হইত। কবিতা, গীতি ও প্রবন্ধ রচনায় স্বর্ণকুমারী যথেষ্ট প্রতিভালাভ করিয়াছিলেন। বহুদিন ধরিয়া ইনি সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মাণিক পত্র ভারতীয় সম্পাদিকা ছিলেন। নরীজাতির ন্যায্য-বুদ্ধি ও শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতির জন্য ইনি বহুপ্রয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন। তাহাদের বাস্তবপথে ইনি অক্ষয়ের আড়ালে দীপনির্বাণকে বহু রূপে বাঁচাইয়া আসে আগে চলিয়াছিলেন। গৌর-মহিলাদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম অবরোধের বননিকা ছিন্ন করিয়া মুক্তরাগপথে বাহির হ'ন। দলিতপনিকাতারাদীপ ইহাকে গাত সাহিত্য-সম্মিলনের সভানেকীপথে বরণ করিয়া এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জগত্তারিণী স্মৃতি-পদক উপহার দিয়া তাঁহার জীবনব্যাপী সাহিত্য-সাধনাকে সম্মানিত করিয়াছেন।



স্বর্ণকুমারী

বিপিনচন্দ্র পাল

স্বর্ণকুমারী

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
গবেষণা কেন্দ্র
৯৮/এম, ট্যামার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৫০০০৯



সপ্তম বর্ষ

আশ্বিন, ১৩৩৯

চতুর্থ সংখ্যা

আত্মম-বালিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আশ্রমের হে বালিকা,
আশ্রিনের শেকালিকা

ফাস্তনের শালের মঞ্জরী
শিশুকাল হতে তব
দেহে মনে নব নব

যে মাধুর্য্য দিয়েছিল ভরি,
মাঘের বিদায়-ক্ষণে
মুকুলিত আশ্রবনে

বসন্তের যে নব দৃতিকা,
আখাটের রাশি রাশি
শুভ্র মালতীর হাসি,
প্রাণের যে সিক্ত যুথিকা,

ছিল ঘিরে রাত্রিদিন
তোমারে বিচ্ছেদহীন

প্রাণের যে শান্তি উদার—
প্রত্যুষের জাগরণে
পেয়েছ বিশ্রিত মনে

যে আশ্রাদ আলোক স্থখর,

আধাচের পুঞ্জমেঘে
যখন উঠিত জেগে

আকাশের নিবিড় ক্রন্দন
মধুরিত বীতিকায়
সম্পূর্ণ-বীতিকায়

দেখেছিলে যে প্রাণ-স্পন্দন,
বৈশাখের দিনশেষে
গোধূলিতে রুজবশে

কালবৈশাখীর উন্নততা—
সে ঝড়ের কলোলাসে
বিছাতের অট্টহাসে
শুনছিলে যে মুক্তি-বারতা,—

পটুয়ের মহোৎসবে
অনাহত বীণারবে
লোকে লোকে আলোকের গান

তোমার হৃদয়-ধারে
আনিয়াছে বারে বারে
নব জীবনের যে আস্থান,—

নব বরষের রবি
যে উজ্জল পুণ্যছবি
এঁকেছিল নির্মল গগনে,

চির-নূতনের জয়
বেজেছিল শ্রুতময়
বেজেছিল অন্তর অঙ্গনে—

কত গান কত খেলা
কত না বন্ধুর সেলা
এ ভাতে সন্ধ্যা আরাধনা,

বিহঙ্গ-সঙ্গে
গাছের তলায় প্রাতে
তোমাদের দিনের সাধনা,—

তারি স্মৃতি শুভক্ষেণে
সমস্ত জীবনে মনে
পূর্ণ করি নিয়ে যাও চলে,
চিত্ত কর ভরপুর
নিত্য তারা দিক্ সুর
জনতার কঠোর কল্লোলে।

নবীন সংসারখানি
রচিত হবে যে জানি
মাধুরীতে নিশায়ে কল্যাণ,
প্রেম দিয়ে প্রাণ দিয়ে
কাজ দিয়ে-শান দিয়ে
ধৈর্য্য দিয়ে, দিয়ে তব ধান,—

সে তব রচনা মাঝে
সব ভাবনায় কাজে
তারা যেন উঠে রূপ ধরি,
তারা যেন দেয় আনি
তোমার বাণীতে বাণী
তোমার প্রাণেতে প্রাণ ভরি।

সুখী হও সুখী রহ
পূর্ণ করো অহরহ
শুভকর্মে জীবনের ডালা,
পুণ্যসূত্রে দিনগুলি
প্রতিদিন গোঁথে তুলি
রচি লহ নৈবেদ্যের মালা ॥—

সমুদ্রের পার হতে
পূর্ব পবনের স্রোতে
ছন্দে তরঙ্গীখানি ডরে
এ প্রভাতে আজি তোমারি
পূর্বতার দিন স্মরি
আশীর্বাদ পাঠাইছু তোরে।

করবার শক্তি না থাকায়, সে চাকরী ছেড়ে কোথায় গিয়েছে কেউ জানে না। তার সম্বন্ধে আমার স্মৃতিপটে এক জাঘাঘাৎ একটা স্মৃতিচিহ্ন বাক্যের ছিল।

কাল তখন প্রায় বেলা ঠোঁট। সমস্তদিন বৃষ্টি ঝেঁপেছিল। আমি কলেজ থেকে ফিরে নেই বাসায় এসেছি, অমনি চাকর বাল্ল, কে এক জন আমার ডাকছে—ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে এসে দেখি, এক অজুত-বেশী মাহুৎ ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে, একটু ভিতরে হুকু করে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। স্মৃতি দেখে আমি কতকটা ভীত, কতকটা গুপ্তিত। কিন্তু সে স্মৃতির কিছুমাত্র সঙ্কেত নেই, তাকে চিনতে পারলেই আমি যেন আশ্বস্ত ও আনন্দিত হয়ে তাকে সম্মুখে অকারণে কনব, এইভাবে সে আমাকে বললে—“চিনতে পারছেন না?”

চিনতে পেরে শিউরে উঠলাম। শরীর শীর্ণ—সে উজ্জল শ্রাবণবর্ণ এমন কালি হয়ে উঠেছে। চোখে সেই চশমা এখনও আছে। এই প্রথম তার পাগল-স্মৃতি বেরখান। ‘হয় হ’ল—ভাবনা হ’ল। বাড়িতে স্থান নেই; একটি আত্মীয়-সম্পর্কী আসতে আমার পড়ার ও বসার ঘরটিকেই শোবার ঘর করতে হয়েছে; তার উপর—সেই বিকেল ছই ছেলের অতিশয় সঙ্গিহীন হওয়ার মনটা বড় উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে—একটা ছেলে আখ্যার হয়ে পড়ে রয়েছে। এ অবস্থায় এমন একটা মাহুৎ অতিথি হয়ে একটু বিরক্ত হতে হয়; সম্বোধনে বেশী ভয় পালে পাগল। বললাম “আহুন—কি মনে করে?”—“এই চাকার এলাম, তাই আপনার সম্বন্ধে দেখা করতে এসেছি—আপনার এখানে এসেই উঠলাম।” আশ্চর্য-প্রশ্ন—“তাইত, কিন্তু যখন বড় অর, কোথায় রাফি আপনাকে?” অতি সহজ কথো, মান-প্রসন্ন মুখে আমাকে বললে—“একটা সারির আশ্রয়ও কি হবে না?” সম্বোধন লোকটার বাহিরের আকৃতি যেমনই হোক, ভিতরের মাহুতটা সেই একই, কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নি—কেমন অপ্রতিভ হয়ে গেলাম। আশেপাশের সেই পরিষেয়, দিলে তার সঙ্গে ঠিক যে সম্বন্ধ ছিল তার সেট সম্বন্ধ অব্যাহত রাখা যায় না। কিন্তু তবু তার এই চেষ্টা! এ বাক্যের নাকো উদ্দেশ্য নেই—মঙ্গল ও সন্যাস-পাণ্ডিত্য হবার এই নাকি একমাত্র উপায়; তা ছাড়া মাথা গুঁজবার জায়গা নেই, শবের গলগ্রহ হয়ে বেশি দিন থাকবার প্রতীক

অতিশয় মলিন একটা থবদের কতুয়া; একটা প্রায় নতুন ছাতা, তার হাতলে বাঁধা একটা এলুমিনামের বাঁটার মত ছোট্ট হাড়ি ও একজোড়া বহু-পুরাতন ছিন্ন জলসিক চটি; কোমরে একটা দড়ির সঙ্গে গিঠের ছোট্ট ছোট ও বড় পুঁটিলি বাঁধা; মাথার চুল খুব ছোট্ট করে ছাটা, ছোট ছোট্ট বোঁচাখোঁচা ছাড়া; আর চোখে সেই চশমা। কিন্তু সেই কঠ, সেই কথাবলার ভঙ্গি, এবং শীর্ণ মুখে সেই সরল বুদ্ধির আভাস। কেবল স্নান, অস্বাভাবিক ও একটা নিরতিশয় নিশ্চয় ওদারীস্বের ছাড়া বেন তার উপর পড়েছে। আমার কাছে সে যে অত্যন্ত আশা করেছিল সেটা তার সেই পূর্ণ-জীবন ও পূর্ণ পরিচয়ের আশা; কিন্তু যে জুড়ানো সে পেলে, তাকে তার বর্তমান জীবন ও বর্তমান পরিচয়ের অতি স্বাভাবিক পাবনা মনে করেই সে যেন নিম্নে আত্মসংবরণ করে, কিছুমাত্র বিশ্বস্ত বা ক্রুদ্ধ না হয়ে একজন অপরিচিত ভিক্ষুক পথিকের মত নিজের বাচঞায় নিজেই সজ্জিত হয়ে, অতি দ্রুত বিদ্যুত কণ্ঠে বললে “অন্তত একটা সারির আশ্রয় হবে না?”

যে এনে বসলাম। বললে, “আজ বেলা ১২টার পৌছেছি। আপনার টিকানা জিজ্ঞাসা করে” একবার এসে ঘুরে গিয়েছি। ভাবলাম, আপনার মেয়েটিকে ডেকে বলতে আসব—তার নামটা ভুলে গিয়েছি—কী তাকে বলি? দেখছি যে? কত বড়টু হয়েছিল?” “আমি জিজ্ঞাসা করলাম “এখন কোথা থেকে আসছেন?”—“প্রায় ১০/১২ মাইল আগের এক ষ্টেশনে কাল রাডটা ছিলাম; দিনে পথ চলি, সেখানে স্নান করে, খাওয়া-পাওয়া; প্রায় কোনো না কোনোখানে ভাত খেতে পাই—রাতে আর খাবার দরকার হয় না।” জিজ্ঞাসা করে জানলাম, মথুরা থেকে এই যাত্রা—বেঙ্গুরী, নাইনিতাল আলমোড়া প্রভৃতি থেকে ব্রহ্ম করে সমস্ত পশ্চিমাঞ্চল পায়ে হেঁটে তারপর এই বাংলা দেশে পৌছেছি। এ যাত্রার নাকো উদ্দেশ্য নেই—মঙ্গল ও সন্যাস-পাণ্ডিত্য হবার এই নাকি একমাত্র উপায়; তা ছাড়া মাথা গুঁজবার জায়গা নেই, শবের গলগ্রহ হয়ে বেশি দিন থাকবার প্রতীক

নেই, তা’তে মনের অস্থির (মাথার অস্থির) আরও বাড়বে। তাই, দিনের পর দিন এই অশান্ত পথ-চলা—কোথাও শাউবার যে স্থান নেই। এমন কেউ আত্মীয় নেই, যার কাছে আশ্রয়স্থান বজায় রেখে এই চির-বৈরাগ্য অবস্থায় থাকা যায়। চাকরী যে কিছুতেই হ’ল না! কলকাতার এক ঘোঁটেলে পাঁচাত্তা-নাইনের চাকরী কিছুদিন করেছিলাম। না আছেন, বড় এক ভাই, ছোট এক ভাই আছে। পাঁচ মাস আছে। স্ত্রী থাকে তার মার কাছে, তার মামার বাড়ীতে। কিন্তু এই পাগল তাদের কারো কাছে থাকার চেয়ে এমনি পথে পথে অপরিচিত আনাছীরের দ্বারে এক বেতার জুজ অতিথি হয়ে, যত দিন পায়ে এই জীবন বহন করে” চলছে। দুইদিন কোন দুই বেলাও কোথাও থাকা, মাহুৎকে পীড়িত করা—এই রকম একটা বিখ্যাসে সে কোনো-একটি বিশ্রাম করতে পারে না, ক্রমাগত পথ অতিবাহন করছে। পায়ে শক্তি থাক বা না থাক, শরীর অসহ্য হোক, তবু সে চলেছে। একবেলা আবার কোথাও, কখনও বা ছোট্ট না—আশ্রয় কোনোখানেই—প্রায় জোটে না, তার জুজ কিছুমাত্র গ্রহণ নেই; গভীর রাত্রে, পথের ধারে, গাছতলায়—বা বর্ষার দিনে, কোনো একটা বায়েদারী ছাউনির তলায়—যে নিশ্চিত নিদ্রা উপভোগ করে। একবার দেশা বা বৃথ—নিজ-নৃতন পথে গভী সহর—পাহাড়, নদী বেধা, এবং মানব-সহন্য নির্জনতার উপভোগ। কিন্তু এই নিরন্তর পথ-চলার পরিশ্রম আর বেশি দিন সে সহ করতে পারবে না—এখনই বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আমি যদি বলি, তবে ছই চারদিন, বিশ্রাম করতে গেলে বোধ হয় সে বাড়ে। কিন্তু সে তা! কখনও নিজে বলবে না—বাহু হয় সে বাড়ে। কিন্তু সে এই একটুখানি একদিনের অতিথির দাবী ছাড়া, আর কিছু করবার প্রবৃত্তি বা সাহস তার নেই। আমিও অনেক কারণে তাকে সে অল্পতোষ করতে পারলাম না—না পেরে আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি, আজ এখনও।

পাগল বেশী কথা কহতে পারেন না, তার কষ্ট হয়।

Concentration-এর ক্ষমতা তার একবারেই নেই; কিন্তু সহজ জ্ঞান পুরা মাত্রায় আছে, মস্তিষ্কের weakness ছাড়া আর কোনও লক্ষণ দেখানো না। কিন্তু তার মনের

গভীর তলদেশে একটা fixed idea আছে—সেটা আর দূর ধারণা, সে সম্বন্ধে সে কোনও তর্ক করতে নাযায়। যদিও জগতের কারো প্রতি তার কোনো অভিমান বা অভিযোগের লেশমাত্র নেই, তবু যেন মাহুৎয়ের সম্পর্কে সে একবারে খণ্ডসত্ত্ব বর্জন কহতে চায়। অনেক বোঝা, অনেক প্রশ্নের দ্বারাও আমি তার সেই মানসিক অবস্থার মূল কারণ আবিষ্কার করতে পারলাম না। দেখলাম বুদ্ধি বা বিচার follow করবার ক্ষমতা আছে—argument করলেও করতে পারে, কিন্তু তা’ করবার উৎসাহ বা প্রবৃত্তি নেই। মাহুৎয়ের সম্বন্ধে যেন, ভগবান সম্বন্ধেও তেমনি তার কোনও বিশেষ কৌতুহল নেই। কথাপ্রসঙ্গে মাঝে মাঝে তার চুচরাট কথা আমার কানে পেসেছিল। একবার বলে—“আমি সবারিক মরমভাবে বিশ্বাস করতাম—সকলের সম্বন্ধে আমার যে ধারণা ছিল সেই ধারণাই সত্য বলে” মনে করতাম—পরে যেনেছি সেটা আমারই ভুল, আমারই দোষ।” “পুরে বেড়াচ্ছি—চোখি—একটাও আমার ধারণা-মত মাহুৎ চোখে পড়ে।” “আপনাকে খুব প্রাণ-খোলা শোক বলে” জানতাম, তাই বড় আহলাদ করে” আপনার সম্বন্ধে দেখা করে” যেতে এলাম।” কিন্তু সে নিশ্চয়ই হতাশ হয়েছে। সে মাহুৎ-সম্বন্ধে সরল চিন্তার—মুহূর্ত্ত ধারণা গোষণ করে, তার একদিন হঠাৎ যখন তার চোখের সামনের সেই পর্দা উঠে গেল, সেই দিনই সে পাগল হয়ে গেছে? একটা খুব বড় রকম দাগ সে নিশ্চয় পেরেছে, তাইতে তার মাহুৎগি ছিঁড়ে গিয়েছে। মস্তিষ্ক-বিকৃতি তার বংশগত—সে কথা সে-ই আমাকে বলেছে। কিন্তু নিজেকে সে পাগলস্বপ্ন করে না। সে জীবন-বৃত্তে প্রারম্ভিত হয়েছে, এবং কোথাও মাহুৎয়ের যেহ সাহায্য পায়ে নি—এইটাই তার বর্তমান অবস্থার কারণ বলে” তার বিশ্বাস। সব কথা খুব বিশেষ করে” তবেও আমার য় সম্বন্ধে ঘুচল না—মাহুৎয়ের ব্যবহারেই—খুব নিকট প্রাণীয়ত (যেমন স্ত্রীর) কোনও একটা অপ্রত্যাশিত স্মৃতি সহসা স্মরণে পেরে—তার মাথা ধারার হায়ে, না, তার মাথা ধারণা হওয়ার পর আত্মীয়-স্বজনদের coldness তাকে এমন করে” গৃহত্যাগী করেছে? হয় ত, “বংশগত

সত্যকই হয়েছে?—না, বরং এই কথাই আরও যুগ্মার্থে যে, দলবদ্ধ পাগলানী থেকে একটা মাহুষ ব্যক্তিগত ভাবে পাগল হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। আবার, যে মিথ্যার মানুষকে আমরা 'রস' বলি, তার নেশার মশগুল থাকতে পারাকেই আমরা supreme বোধশক্তি বা 'রসিকতা' বলে উল্লেখ করি—সেই মিথ্যাকে যদি কেউ হঠাৎ ধরে ফেলে, এই রূপাঙ্কল স্তব্ধির মধ্যে যদি একটা অন্ধকার শূন্যের বিদ্যুতিকা হঠাৎ কারো চক্ষে ধরা পড়ে, তবেই সে পাগল হয়ে যায় বটে; কিন্তু সেই পাগল হওয়ার কারণ মিথ্যার মোহ নয়, সত্যেরই প্রচণ্ড আঘাত, যা' মাহুষের দুর্বল মস্তিষ্ক সহ্য করতে পারে না—এ কথা কি স্বীকার করো তুমি?

ওথাপি এ পাগলকে দেখে মনে হ'ল—যে উম্মারকে আমরা দেখের বা মস্তিষ্কবলে পীড়া বলি, এ ঠিক তা' নয়, এটা যেন মনের ততটা নয়—বতটা প্রাণের। এই জ্বলই সাধারণ পাগলকে দেখে আমাদের যে ভাব হয়, একে দেখে তার চেয়ে ঢের বেশী আঘাত পাই। আমাদের মনে হ'ল—ওর মধ্যে কোনও ব্যক্তিবিশেষের মোহ নয়, সকল মানবেরই একটা অসহ্য সহন্যের দুর্গতির অবস্থা ধরা পড়েছে। এ রকম পাগলকে শুধু lunatic বলে একটা সাধারণ শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। কারণ এদের একটা-সকল-বোধ আছে, এদের অংশ রয়েছে—এরা একেবারে সেক্সচুয়াল হয়নি, তা যদি হ'ত তা হলে পাগল পশু মত পালন হ'লে যেত। অতএব এদের মধ্যে আমাদেরই 'মন' বা 'আত্মা' বা 'Ego'—যদি ব'ল—প্রায় একটা অবস্থান্তর মাত্র আমরা লক্ষ্য করি; এবং তার থেকেই আমরা আমাদেরই একটা সম্ভব অবস্থার পরিচয় পাই। এ জন্তে এদের প্রতি, শুধু pity নয়—একটা spiritual sympathy-র উল্লেখ হয়। এ ব্যক্তি যে এত কষ্ট সহ্য করছে—এখনকি আত্মহত্যা করবে না—তার কারণ কি? অন্তর্ভুক্ত এদের পালন তা' করবেনা। যার সহজ অবস্থার আত্মহত্যা করে তাদের সহজে উদ্ধারের মত এই যে, তাদের temporary insanity হয়। সেখানে insanity-র অর্থ ঠিক উম্মার নয়—একটা abnormal অবস্থা মাত্র। সে অবস্থা আর কিছু নয়,—

মাহুষের অংশ-সংস্থার Egoism হঠাৎ বড় তীব্র হয়ে ওঠে—খুব বড় একটা দ্রুত বা বিপদের reaction-এ তার আত্মাচ্ছিন্ন bursting point-এ ওঠে, তাই সে আত্মহত্যা চেষ্টা করে' সেই অতিরিক্ত আত্মসচেতনতা থেকে নিপুড়ি স্বেচ্ছা চায়। যারা সে অবস্থার পাগল হয়, তাদের অংশ-সংস্থার অভ্যুত্থান হয়ে পড়ে, bursting point-এ পৌঁছায় না; তারা যেন স্তম্ভিত হয়ে যায়—মর্মান্বিত হতে টান না পড়ে, সেটা শিথিল হয়ে যায়; সংসারের যে মুক্তি তারা দেখে, তাতে তাদের 'অংশ' উজ্জ্বল না হ'য়ে, ভীতি-বিবল হ'য়ে পড়ে। তাদের চোখে সংসারের সহ্য্য বরন শুধুই জটিল-সূত্রিত হ'য়ে ওঠে না—তারা যেন এই তুলটা নটীর অভিনয়-নৈপুণ্য ভেদ করে' তার নানা হাবভাবের অন্তরালে একটা প্রান্তর-কবিতা উন্মোচিত, একটা বিরাট শূন্য গলবের অন্ধকার দেখতে পায়—তাই দেখে তাদের অংশ মুক্তি হ'য়ে পড়ে, তারা আর মাহুষের সঙ্গে মাহুষের মত, আশা ভরসা যেহে প্রেমের পেশার যোগ দিতে পারেনা। আবার, তাদের এই বৈরাগ্য সামান্য নয়—যে কথা আগেই বলেছি; কারণ তাঁদের সেই self বা ego মুক্তি, নিজস্ব হ'য়ে পড়ে বলে'—সংসার ত্যাগ করে' ভগবানের নামে অংশ-প্রকৃতির চেষ্টাও তারা করে না। এই যে স্তম্ভিত 'অংশ'—এরই পরিচয় পেলাম এই পাগলের মধ্যে। এর অবস্থা দেখে আমরা নিজেরই একটা পুরাতো কল্পনা সত্য বলে মনে হচ্ছে। মাহুষের প্রাণের খবর পা' কিছু—passion, emotion, sentiment—যে বাসনা কামনা বা তৃষ্ণার ফল, তার মূলে আছে মাহুষের মনের 'development'-অনুযায়ী—একটা সৌন্দর্যভোগ বা 'উপভোগের' মনো। এই মনো সত্যের কোনও সন্দেহ নেই—বরং ঠিক উটো, অর্থাৎ মিথ্যার কুহেলিকা-ই একে রঙিন করে তোলে। এর সংঘর্ষ সত্য-মিথ্যার বিচার বা তর্ক যারা তোলে তারাই বেরসিক। সংসারে বাচতে হ'লে রসিক হ'তে হবে—বাস্তব জীবন-রস-রসিক অথবা কল্পনার-রসিক; সাধারণ মাহুষ প্রথম শ্রেণীর, শিল্পীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর। এই মিথ্যার অঙ্গন চোখে না থাকলে মাহুষ বাচতে পারেনা। প্রেমিক রসিক বলবে—এই অমল্য এই রসই সত্য—তা' সে যার থেকেই পাই না

কেন। এই রস যে বস্তু নিঃড়িষ্টা আমরা আদায় করি, তা' সত্য কি মিথ্যা, সে বিচার যে করে সে মূর্খ; কারণ রস বা আনন্দই সত্য, তাকে পেলেই হ'ল—কোথা থেকে পাই সে সন্ধানের প্রয়োজন কি? বিভাল কাঠের বিভাল হ'লেও কতি কি?—ইতর দরজত পারলেই হ'ল। কিন্তু হঠাৎ যদি আত্মার নিশীথ-নায়ে কারো ঘুম ভেঙে যায় এবং সে যদি হঠাৎ প্রকৃতির নেশা-গৃহে তার অমমৃত অবস্থার স্বপ্ন হঠাৎ দেখে ফেলে—সেই ভীষণ সত্যের লেশনার আভাস যদি কোনো রকমে পেয়ে বসে—তবে আর রক্ষা নেই, সে উম্মার হয়ে যাবে। এই পাগলের ভাই হয়েছে। সে বলেছিল—'যে সরল ধারণা ও বিশ্বাসের-বশে সংসারের সঙ্গে নিজের একটা সত্যকার সম্পর্ক পাতিয়ে তারি ফোঁসে এতকি নিঃশঙ্কচিত্তে কাটাচ্ছিলাম—পরে হঠাৎ দেখলাম সেটা আমার ভুল'। সে মাহুষের বোধ বিশেষ না—তার ভাবটা, সে যেন নিজেই দেখি; এ সংসারে তার স্থান নেই, সে এখানে বাস করার অক্ষমপুত্র। এ কি ভীষণ attitude! সমস্ত জগৎ একদিকে যে আর একদিকে সে এক! জগতের দিকটাকে সে বিশ্বাস করতে পারে না, কিন্তু তার প্রতি কোনো দৃষ্টি বা বিশ্বাস নাই; কারণ সে যে-সংসারের সাক্ষ্য পেয়েছে সেটা তারি সত্য, আর কারো উপরে মেটাকে সে চাপাতে চায় না। তবু সংসার-সদৃশ, মাহুষ-সদৃশ, তার সেই পূর্ণকার ধারণা যে যেন এখনও সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারেনি—সেই ধারণার আলোয় এখনও তাকে দিশ্শান্ত করছে—যিগু, সে যে আলোয়ই তা' সে জানে। অতএব দেখা যাবে—এই যে মাহুষটা এত সহজ পাগল হয়ে গেল, আর তুমি আমি তা' হইনে—এর কারণ কি? এর কারণ এই যে, জগতের এই প্রকট মিথ্যাকে পরিপাক করার বা রসগত উপভোগ করার শক্তি, সাধারণ মাহুষের রক্তে বা গায়েও কতক পরিমাণে আছে। এই মিথ্যার মোহ—এই যন্ত্রণাকৌল সত্য মনে করে তারই আবেশে প্রাণটাকে চালা করে' রাখবার প্রবৃত্তি—যার যত বেশী সে তত sane—তাকেই সহজ স্বাস্থ্য বা sanity বলে। এর থেকে যে বঞ্চিত হয়েছে—যার রক্তে বা ধারায় সে এই মিথ্যাকে হজম

করবার শক্তি কমে যায়, এই ঘৃণী-নাচে যে স্থির থাকতে পারে না—সেই পাগল হয়ে যায়। যে প্রেম-মত্ততা, বা সত্যকার সরল ব্যবহার যে আশা করছিল তা' সে পায় নি, তার বিশ্বাস-ভঙ্গ হয়েছে; আমাদের তা' হয় নি, আমরা বিশ্বাস করি যে, আমরা আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে সেই প্রেম-মত্ততার আদান-প্রদান করে থাকি—তার কারণ, আমরা ইচ্ছা করছি—এই সব agreeable hypocrisy of life বাচিয়ে রাখতে চাই—কতকটা কানো এবং কতকটা অন্ধ হবার যে ক্ষমতা, অর্থাৎ শুক অস্তিত্তেও রসস্বাদন করার রসিকতা আমাদের আছে; তাই আমরা টিকে গেলাম; আর এ গোটা পাগল হয়ে গেল। Sanity ও Insanity-র তত্ত্ব কত নাও।

কিন্তু আমি যে এতক্ষণ এই তত্ত্বোপদেশ করলাম—এ শুধু 'আগল' বাপাটকে একটু ভুলে থাকবার জন্তে। আমি সেই মাহুষটাকে দেখছি—তার ভীষণ নিয়তি, তার কল্পনাটী তরবস্থা আমাদের বড়ই বিচলিত করেছে। আমি যে সেই মাহুষটাকে পাগল বলেই ভয় করছি, তাকে মাহুষ-হিসেবে প্রেম করতে পারি নি; যে-বস্তু অতিশয় ক্লান্ত অবসন্ন হ'য়ে আমরা দৃষ্টিতে হেসেছি, এবং—তার মনে বাই থাক—তার দেহ যে একটু দূরার ভিখারী হয়েছিল; সে যে অন্ততঃ কয়েকটা দিন তার জীবনের কোথাটা মাঝিরে একটু বিশ্রাম করতে চেয়েছিল—কিন্তু সে দাবী সে করেনি, সে সাহসই তার হয় নি—অথচ আমি তাকে এত শীঘ্র বিশ্বাস দিতে অসম্মত হলাম না, এতে আমি বড় দ্রুত গেলি, সে যে আলোয়ই তা' সে জানে। অতএব দেখা যাবে—এই যে মাহুষটা এত সহজ পাগল হয়ে গেল, আর তুমি আমি তা' হইনে—এর কারণ কি? এর কারণ এই যে, জগতের এই প্রকট মিথ্যাকে পরিপাক করার বা রসগত উপভোগ করার শক্তি, সাধারণ মাহুষের রক্তে বা গায়েও কতক পরিমাণে আছে। এই মিথ্যার মোহ—এই যন্ত্রণাকৌল সত্য মনে করে তারই আবেশে প্রাণটাকে চালা করে' রাখবার প্রবৃত্তি—যার যত বেশী সে তত sane—তাকেই সহজ স্বাস্থ্য বা sanity বলে। এর থেকে যে বঞ্চিত হয়েছে—যার রক্তে বা ধারায় সে এই মিথ্যাকে হজম

না পেলেও কোনও অভিযোগ যার নেই—যাঁর মুখে স্বপ্ন-সঙ্গরপকারীর মত একটা vacant expression—একটি উদ্বাস প্রকাশ বিবাহ-মিলন নীরত—সেই পাগলকে দেখে পথান্ত, তার অস্বাভা চিত্তা করে’ আমি আজও বড় অশান্তি ভোগ করছি—সব বেন বিখার হয়ে গেছে, আমার বুকের উপর একটা ছায়াধূপ চেপে রয়েছে; আমি বেন আর গৃহিণীকে বাস করিয়ে—হাজ-অশ্বীন এক মন্দাকিনীর প্রেক্ষাপটের উজ্জী হয়েছি। আমার গরমের মধ্যে কোথাও বেন একটা কঙ্কাল লুকিয়ে রয়েছে—একটু অস্বস্তির হবার যো নেই, সকল কাজ সকল ভাবনার মধ্যে ভেগে রয়েছে। এক শান্তি আছি! এই অবস্থাতেও আমার মত পূর্ণ বস্তুর নিকটে ‘কোনও কিছু বাচ্য’ করার যে কি সম্ভব তার দেবশাসন! তা ভুলতে পারছি নে। যান করবার মধ্যে আমার পু’টুনি খেকে একটা তেলের (সর্ঘের তেল) শিশি বার করে’ বন্নাবশিষ্ট ফেল অতি সপ্তর্পণে হাতের উপর একটুখানি মের’ চালাচ্ছে দেখে আমি বললাম—‘শিশিটা ভর্তি করে নিন না’। সে বললে ‘হাঁ, কখাটা মল নয়, তা’ হলে আমিও কটা শিশি নিব যাবে; কিন্তু গুব বোশি দেবেন না—কচুে নষ্ট হবে’। শিশিটা বখন ভর্তি করে ফিলাম—বল্লে—‘এ বে’ অনেক দিরেছেন, আর বেশ হয় বরকারই হবে না, এতটই জ্ঞানার পথ শেষ হবে না’। ‘পথ শেষ হবে’ কথাটা অতি সহজ ভাবেই বল্লে, ওর ভিতরে যে বাস্যার’ প্রকাশ পেলে, সেটিকে বেন তার ঘোলাই নেই—আবার বুঝা’ এক ছাঁং করে’ উঠল।

যাক্, তার কথা আর বলব না। এ বেন আমারই monomania-র লক্ষণ। আমার ভিতরে যে প্রবল পাগল আছে তাকে বেন এই প্রকট পাগল কতকটা জাগিয়ে দিয়ে গেছে। জীবনের যে বিকটকে আমি ঝাঁকুয়ে রাখতে চেয়েছি তারি এক সূক্ষ্মমান প্রতিবাধী আমার সামনে দেখা দিয়ে গেছে। পান—প্রাচীন মিসরবাসীর উৎসব-শাশার নৃত্যগীত পান—ভোজনের কীকে কে একজন সামনে দিয়ে একটা ‘মনি’ ফিরে’ গেল। কিন্তু তবু আমি জানি, এবং এখনও আমার বিশ্বাস—জীবনের বা জগতের মিথ্যাটাই সুন্দর, মিথ্যাটাই পরম সত্যবৎ। যার প্রাণ সেই মিথ্যাকে দারপ করতে পারে, যার দৃষ্টিকে কোনও বিভীষিকাই বিভ্রান্ত করতে পারে না, যার হৃদয় সকল

অগ্নিগর্ভস্তের মধ্যে সামঞ্জস্যকে আবিষ্কার করে—সেই জয়ী, সে প্রকৃতির মনোমোহন মিথ্যা-চাতুরীকে পরাক্ষ করে’, যুগ্মজগৎ মিথ্যাকে ধ্বন করে’, সত্যাস্বাদের অসুত আধ্বন করে। উৎকর্ষ কনি-শক্তির প্রমাণ এইখানে। যাদের Ego সর্বপ্রাণী ভাঙাই কবি; যাদের Ego সর্বভাষী ভাঙাই পাগল। এই ছই extreme-ই সত্য—মানুষের শক্তির তারতম্য অস্বাভাবে এই ছই extreme-এর মধ্যে অনেক মধ্য attitude আছে। সাধারণ মনুষ্য সেই মধ্যস্থিতে বাস করে। কিন্তু অপর extreme, যাকে সর্বভাষী Ego বলেছি, সেই নাস্তিক পাগলের স্থান এ সংসারে নেই। তাকেও সত্য বলেছি বটে, কিন্তু সে-সত্যের আলাসেই যখন মুক্তি হয়ে পড়ি, তখন তার সফল কোনও বিচার করবার অধিকার আমার নাহি। কিন্তু ‘extremes meet’—একথাও মনে রাখতে হবে।

আমি যে পাগলের কথা এতখণ্ড ধরে’ লিখলাম—সে সম্ভার ভাগ্য করেছে, তার কারণ, তার যে সত্য-উপলব্ধি সেটা ভাব নয়; সংসারকে সে যেন-চক্ষে দেখেছে তার পর আর তার ‘রসিক’ হওয়া চলে না। আগেই বলেছি—হয় ‘রসিক’ হও, নয় তু’ এই রকম সর্বভাষী নাস্তিক পাগল হও—এ ছাড়া আর তৃতীয় পথ নেই, যদি থাকে ত’ সে ভগবান। এইবার সাহিত্যের কথা ধরা যাক। সাহিত্যের Idealism ও Realism, এই দুই-এরই মূল্য আছে। রসবোধ—এইখানে আসল সাহিত্য-বস্তুর পরিচয়। বাস্তবকে রসোপযোগী করে সাহিত্যে নিতে না পাগলে সাহিত্য বা কাব্য হয় না, তা’ সে Realistic-ই হোক আর Idealistic-ই হোক। উৎকর্ষ Realist যে, তাহলেও এই রসের সৃষ্টি করতে হবে, অর্থাৎ জীবন ও জগৎ-সম্বন্ধ তার বোঝা চাই, তা সে মনের বেশাই হোক, আর আত্মিক বা বাজার বেশাই হোক। যার সে বোঝা নেই সে কবি বা সাহিত্যিক—নহি। কিন্তু আমাদের দেশের একদল বলেন, সাহিত্যে এই বেশাই হচ্ছে ভজানী, সাঁবা চোপের নিরাবরণ সত্যকেই সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে—অর্থাৎ সোনার বাট গড়তে হবে পাথর দিয়ে।

এটা যে বেরসিকের অজ্ঞোশ, তা’ এদের সাহিত্য-সৃষ্টির নবনা দেখলেই বুঝতে পারা যায়। যদি ‘রস’কে অধীকার করবে চাও, আর তা’ যদি একটা sincere attitude হয়, তবে ছই পাগলের মত সাহিত্যকেও অধীকার করতে হবে; জোর করে’ সাহিত্যকে ঝাঁকুড়ে পড়ে’ থাকলে রসিকতার পরিচয় বেওয়া ত হবেই না—তই পাগলের যে সত্যনিষ্ঠা, তা’ও প্রমাণ হবে না। কারণ সাহিত্য-সৃষ্টি করতে হ’লে উৎকর্ষ রসবোধ চাই। উৎকর্ষ রসবোধ মানে Idealism-ই নয়; রসবোধ জিনিষটা একই faculty-Realism ও Idealism তার দুইটা ভিন্ন মার। এই রসবোধের একটা লক্ষণ হচ্ছে এই যে, জীবনকে যে ভাবেই দেখ তাকে একটা সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য থাকবে; সে জগৎ Real হোক বা Ideal হোক, তার কল্পনার একটা wholeness ও steadiness থাকা চাই, নইলে তা’ পাগলের প্রলাপ হয়, অথবা ইতরের ঠাটবিটুনি হয়—সাহিত্য হয় না। Idealist ব’কে কল্পনার পূর্ব’ করে দেখে, তাহেই তার ‘রস’ বা বোশা জাগে; Realist খও অসম্পূর্ণকেই তার বচ-কিছু ধূলা-রাশি ময়লা সমেত এমন একটা pattern-এ গাতিয়ে তোলে যে তাইহেই রসোদ্রেক হয়—যে যে-ভাবেই জগৎকে দেখুক, তার দেখার একটা শক্তি আছে—এই যে দৃষ্টিশক্তি হেটেই, আশল—এই দৃষ্টিই সেই রসিকতার কারণ, যাকে আমি sanity বলেছি। যদি কোনও কল্পনা দেখা যাবে যে, লেখকের এই দৃষ্টিই নেই—সে কল্পনার চোখেই হোক, আর সাক্ষ্য পরিচয়ে চোখেই বাস্তবিকভাবে অথবা অজ্ঞানভাবে সৃষ্টি করছে—তবে থাকে ভূমি কোন শ্রেণীতে ফেলবে? যে তার নিজের উৎকর্ষসাধনের জেজ মরবেই ছাপসুও বা ছাপদেবে নয়ও বলিয়ে, অর্থাৎ অতিষ্ঠ অস্বাভাবিক চরিত্র থাকা কর’ গল্প লেখে—আমি জগৎ-সম্বন্ধে যে ছইটা মত সত্যের attitude-এর কথা বলেছি—তার তা’ হলে কৈনাটই নয়; তার মানে—সে পাগলও নয়, সহজও নয়;

তবে সে কি? সাহিত্যিক হিসাবে সে কিছুই নয়—সে একটা উগ্ধর মাত্র। সুপ্রতি কোনও এক মাগিকে আমি একটা গল্প পড়লাম—তার লেখক অতি জাদুকরিক কথাসিদ্ধি-মগলে একটু প্রহিষ্টা লাভ করেছেন; কিন্তু তিনি তাঁর এই ছোট গল্পটিকে একটা নারী চরিত্র ও জীবনোপলব্ধি যে রকম অস্বাভাবিক করে তুলেছেন—তা’তে তাঁর দৃষ্টি বা সৃষ্টিশক্তির পরিচয় ত নেই-ই, আছে একটা hectic fever-এর দাঁতবিটুনি। এসব লেখকেরা মনে করে এরি নাম সাহিত্যের Realism! যদি যেনেই নেওয়া যায় যে এ কাহিনী বা এ চরিত্র ‘সত্য’, তা’ হলেই বা কি?—এরা সাহিত্য রচনা করছে, না socialism-এর propaganda করছে? এই প্রশ্নদেব শৈশবজ্ঞানদের ‘নারীমের’ গল্পটা ‘স্বরণ’ কর। বীভৎস-যদি Realism হয়, তবে সে Realism-এর চরম ভাঙে আছে। কিন্তু লেখকের এনি রসবোধ যে, তার কোনখানটা অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। কল্পনার এই Sanity-ই রসবোধ। ‘নারীমের’ সেই নিষ্ঠুর Realism রসবৎ হয়ে উঠেছে—অতি ভীষণ tragedy-ও যে কারণে আমাদের প্রাণে রস-সঞ্চার করে, সেখানেও সেই কারণে এই ‘বীভৎস’ আর বীভৎস নেই—সেটা ‘রস’ হয়ে উঠেছে। ‘কায় কি? কারণ—‘নারীমের’ লেখক কবি—propagandist নয়; Real-এর ‘অতি কটিন, অতি তীক্ষ্ণ ইঙ্গিত-স্বকর তার কবিত্বধরকে বিজ্ঞ করে রাখার উৎসাহিত করছে; তার বচ-কিছু ভীষণতা ও বীভৎসতা তার রসবোধকে অভিসৃষ্ট করতে পারে নি। গল্প-বঙ্গটি যখন লেখকের সৃষ্টি-কল্পনাকে স্পর্শ করেছিল—সেই মুহূর্তেই লেখকের attitude ঠিক হয়ে গিয়েছিল; সে attitude রসিকের, দাঁতবিটুনির attitude নয়।’ একটা উগ্ধা দেবো। রসের ‘রসুই’ করতে যে জানে, তার হাতে কচুর ডাঁটাও রসনাস্থিত্তিক হয়—যে তা’ জানে না সে ও-জিনিষকে এমন করে’ তুলবে, যে খেতে গেলেই পাগল গা ফুল উঠবে। এবারের চিত্রি ভিত্তি রসকের বড় হয়ে গেল—ভূমি ভেগে যায়ে বোধ হয়? চিত্রি পেতে বেরী হ’লে বুক ভূমি ভেগে কৈনাটই নয়; তার মানে—সে পাগলও নয়, সহজও নয়; গড়বার মতলব করছে। আমার যোগোপনিদাও। ইতি—

‘মেঘ-কজ্জল দিবসে—’

জ্যোতিষ্মতী দেবী

জ্যোতিষ্মতী কি আবার—কি শ্রাবণ তা কে জানে;—

কিন্তু কি বিষ্টি! সকলেই তাই বলছে।

এমনতর বৃষ্টি না কি পাঁচ, সাত বছরের মধ্যে হয় নি।

বীণার শাস্ত্রী বলেন, শনিবারে নেমেছে, দেবতা

এবারে সাতদিন বর্ষাবে। শনি মঙ্গলে কথাই আছে

‘ডাক’র;—

ছোট ছেলেরা কে ছিল সামনে, একজন বলে, ‘ঠাকুনা

ডাক কে?’

‘অপর একজন বলে, ‘ডাক কে জানিস নে? ডাকপাখী

—ডুক্কে ডাকে!’

‘বাঃ—ডাক পাখী কি কথা কয়?—ডাকের কথা যে

বলেন।—’

পিতামহী ব্যত ছিলেন কি একটা কাজে—ডাকু আবার

কে? ‘ডাক’ ডাক নামেই খ্যাত, বলেন, ‘সে সেকালের

কথা!’

সিঁড়ি দিয়ে নাঘলি সেজ ছেলে—বলেন, ‘না কি রাখতে

বিদ্ধ? খিচুড়ী তো?’

না বলেন ‘আজ্ঞা’,—তারপর আঁতুরার দিকে চেয়ে

বলেন, ‘কিন্তু কি বিষ্টির ছিটি বাবা! পৃথিবী যেন ভেসে যাবে;

দেখে যে তরঙ্গ রায়ে নেমেছে ছাঁদিন কি কেউ একটা বার

হৃদিসেবের মুখ দেখেছে। আর রাখতেই না কি কিই

রোজ রোজ—খিচুড়ী থাকে সব কি দিয়ে? মাছ কিছ ছাই

মনের মনে পাওয়া বাচ্ছে।—কত যে বেগা হ’ল কি মাগী এই

এলো! ঠাকুরের এখনো দেখা নেই! কখন কি হবে তার

টিকও নেই হুবি উঠবে না বলে কি আর বেলা হবে না

দেখে!’—বার আপন মনে কথা কওয়া চলছিল কাকে উদ্দেশ

ক’রে হোকা যায় না—বারা আসচে, বাচ্ছে তারা কেউ বা

হাসছিল, কেউ বা এদনিই চলে বাচ্ছিল। কলহলা থেকে

বীণা ধান করে সিঁড়িতে উঠছিল। শাস্ত্রীর আপনমনের

বহুনিতে সে একটু হাসলে। ওকে দেখে তিনি বলেন,

‘দেখতো কাঁধা-কাপড়চোপড়ই বা কোথায় মেলে দেবে সব—

সবই তো জলে ভাসছে!’ বহু মুহূর্তেই বলে, ‘এখন

ফেলে রাখি একটু ধরলে দেখতো তখন।’

গুপরে সিঁড়ির পাশের ঘরে মেজদেবের গড়াশোনা করেন।

তাঁর কুঁকি এবারে পক্ষম বার্ষিক শ্রেণী। কিন্তু সে পাঠা-

পুস্তকে রত নয়। হাতে তার রবীন্দ্রনাথের কাব্যের নতুন কি

একটা ছিল। সব দরজা জানালা খোলা। ঘরে বৃষ্টির

অবধ প্রসাদ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে আসছে। সে অন্ন

মনে বাইরের দিকে চেয়েছিল।

বাইরেটা অস্বস্তি কলিকাতার। ‘সেখানে বন নেই, অরণ্য

নেই, দিগন্তে খাপসা তরু শ্রেণী নেই; মাঠের কোলে সবুজ

ক্ষেত নেই;—কলো কালো ছাত্ত, সবুজ জানালা, গুপ্তধি,

আর ছাত্তের নদীয়ার জলের ভেড় শব্দে আঁতুরা গলি

রাভা ভাগিয়ে চলেছে। কাব্য-লোকের মিলের মধ্যে শুধু

একটুখানি একফালি আকাশ মাথার ওপরে আছে।

তার পাশের ঘরখানিতে ছোট নন্দ তার কটি ছেলে

নিরে ব্যস্ত।

সে ঘর সব বন্ধ। ছোটের ভয়, ঠাণ্ডার ভয়—জন্মের

ভয়, সে ঘরে মেঘের আঁবর নেই।

তার পাশে বীণার শোবার ঘর। সে ঘরে গিয়ে

নিজের ভিজে কাপড় কাঁথার তুণ ফেলে কাপড়চোপড়

বদলে বেরলো। সিঁড়ির পথে দেবরের সঙ্গে দেখা।

বোনের ঘরের বন্ধ দরজা খুলে সে বলছিল, ‘বাবা, কি তুই!’

—এবে দম বন্ধ হবার খোঁজ!—

বোন ব্যত হয়ে বলে, ‘না, না, তুমি বন্ধ কর মেজদা,

যে ঠাণ্ডা—খোকার ঠাণ্ডা লাগবে,—

ডাককে দেখে দেবর বলে, ‘দেখছে রকম বৌদি!—কি

স্বন্দর বর্ষা আর ওগা সব দরজা জানালা বন্ধ করে বসে আছে।

—তুমি পড়ছে সেই বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বর্ণী?—’

বহু বলে, ‘হ্যাঁ, কিন্তু ‘ঐ আসে ঐ অতি’টা আমার আরো

ভালো লাগে, না?’—

‘সত্যি। আমার নিজের কাজ আর কিছু ভাল

লাগল না’—বহুর স্বামী অর্থাৎ বাড়ীর বড় ছেলে ওপরে

উঠ ছিলেন, দেবর ভাজের কাবালাচোনার আভাস পেয়ে

একটু হাসলেন, তারপর চলে গেলেন।

নীচে ততক্ষণ শাস্ত্রীর খিচুড়ীর সামঞ্জস্য রেখে তরকারী

কোটা এবং মাছের ব্যবহার অল্প প্রাকান্ত স্বগত চিন্তা

সাধিল।

শোনা গেল, বাড়ীর কর্তা ছোটদের বলাছেন, ‘ওরে

বিষ্টিতে ভিজিয়ে। আর গায়ে জামা দেনা?’—ইংগা,

কি রাখতে দিলে আজ বাদশার দিনে?’

‘বাবু! তো আজ চারদিন। কি দৌর বল না?’—

গৃহিণী বলেন।

‘কি মাছ আনিলে? ইলিশ পাও তো আনাও’না?’—

‘আজ্ঞা। এখন দেখ বাবু! ক’দিন থাকে, কত

কি ব্যবস্থা করতে হয়। যে মুখ অন্ধকার করে আছে।’

—বলে তিনিও মুখ অন্ধকার করেই ভাড়ার ঘরে চুকলেন।

‘না হল রান্নার গোছ। না হল মালা পুজো কিছু,—আর

পেরিনের দেওয়া আমসমুদগুণের কিছু পণ্যও থাকবে না।

দেবতার কি পীড়ন বল ত! সাড়ে তিন টাকার আম!’—

ওপর থেকে মেজ ছেলে আর বীণা নাবল।

দেবর একটু হেসে ডাককে বলে, ‘মার কি ভাবনা বলত!

এমন চমককার বর্ষা—বুড়ো’ক’লে যুঁহি এদনি হয়। আমাবের,

যেন শুধু থাবারেরই কাবনা।—’

ডাক শুধু একটু হাসলে।

সারাদিন ঘরে বর্ষা কখনো থেমে কখনো ছোঁরে নেমে

আগিল।

অনেক রাতে বহু-সারাদিন ঘরে নানা উপায়ে শুকানো

কাঁধা নেকড়া কিছু নদনের ঘরে দিয়ে, কিছু ‘নিরে নিজের

ঘরে এলো।

শুকানো ঘরে পা দিয়ে যেন প্রাণটা ঝাঁক।

স্বামী, খেটেগুটে এসেছিলেন। বোধহয় তাঁর তক্তা

এসেছিল।

পা টিপে টিপে এসে ছেলেকে একপাশে শুইয়ে

পাশে আপনি শুয়ে পড়ল। সব জানলাই বন্ধ, দূর কোণের

একটা জানলার এক পালা খোলা। ফিসফিস করে

একভাবে বৃষ্টি পড়ছে সন্ধ্যা থেকে। মাঝে মাঝে গুরু-গুরু

মেঘের ডাক ছাড়া সব নিঃশব্দ।

সকালবেলায় দেবরের কথা মনে পড়ল। ঘুম চোখের

সামনে রবীন্দ্রনাথের কাব্য, মেঘের বেদনা, স্বপ্নি স্বপ্নের

প্রিয়জন, অস্বস্তি বর্ষা, তরুণ মন হরত মনের ছায়ে

ছ একবার উকি বুক কি দিয়েছিল।

কিন্তু.....;

কিন্তু কাণও যদি এদনি দ্বারা বৃষ্টি হয় থোকা যে

কিসে শোবে। ঘুম চোখের পাতা জড়িয়ে এলো।

অনেক দিন পরে।

বর্ষা তার মাঝে প্রতিবছর এসেছে। অকাল-বর্ষাও

কমদিন হয় নি। চিরদিনের মতনই শ্রাবণের আকাশ

বিধের বিরোধে বেদনার মৌন বিষমতা-ভরা চোখে ধরিত্রীর

দিকে চেয়েছে।

শাস্ত্রী এখন আর বেঁচে নেই—

যন্ত্রর আছেন।

স্বামী নেই।

মেজদেবর, সেজদেবর তাদের সব বোয়োগা আছে।

নিজের ছেলে মেয়ে ছাতিন্টি।

তেনমনি বর্ষা নেমেছে। ‘আকাশ অন্ধকার, পৃথিবী বিষম

গভীর, তাঁর চোখের জলে ভুবনভরা যেন।

‘ছেলেগা বলে, ‘জ্যোতিষ্মতী খিচুড়ী করতে দাও,—’কেউ বা

সঙ্গে সঙ্গে বলে, ‘আমাদের একটু কাঁটাশ-খিচুড়ী চিড়ে হেঁদেদাও’

ভিদের বর্ষা, ইলিশ মাছের ফরমাগও আসে। ঘর বা’

মনে আসে।

ফরমাগের অল্প নেই, বৃষ্টিরও শেষ নেই, জ্যোতিষ্মতীর

রাষ্ট্রীয়র ভাড়ারের কাজেরও সংখ্যা নেই।

তাদের মায়েরা ওর মা'রা—কাপড় কাঁধা বিছানা নিয়ে
বাসে।

সবাই বলে, কি বিত্তি যে! বাপের!—

বাইরের আকাশের মতন মনের ভেতরও কোন্‌ বিজ্ঞাং
চিড় খেয়ে তার অন্ধকারে স্বপ্ন কোণগুলোতে ঢমকে আলো
দিয়ে চায়। বধু অন্ধমনে আভিনার জলের স্রোতের দিকে
একবার চায়।

‘ওপরে মেজভা’, ‘সেজভা’ খালি এখানে ওখানে হড়ি বাঁধে,
নেকড়ার ফালি বাঁধে, আর কাঁধা চাষের কাপড় মেলে দেয়।
আর সকল খয়ের জানালা দরজা বন্ধ করে। এমন কি
মেজদেবরের ওপর বন্ধ।—মেঘের মুখ দেখতে পাওয়া ভার।
শাউখী নেই, বৃষ্টি নীচ তরকারী কোটে, ভাতার দেয়।

মাছের নতুনতর বাবসা করে, বিচুড়ীর যোগাড় দেয়।

সুমুখে তার র'ক ভিজ। আভিনায় জলের স্রোত বয়ে
যায়—উত্তরোল কয়লায়। কানে তার বম বম স্বর বর
স্বর বাজে। ছেলেরের খাবার পরিবেশন করতে
এলে সে অন্ধ মনে আভিনায় চায়, আভিনার মাথার ওপরের
আকাশেও একবার হাত ঘোঁষে পড়ে। ধূসর রংয়ের আকাশ
যেন ও খোঁচাটা আজ আর বুলবে না।

সকাল ছপু'র বিকাল কখন এলো কখন গেলো, জানা
গেল না।

পাঠনিরত খসুহকে বধু জিজ্ঞাসা করতে যায়, ‘বাবা রাজে
কি বাবেম?’

বিশেষ ফরমাস বাবলার দিনে এখন প্রায় আর তিনি
করেন না। ‘কিছু না না, শুধু একটু ছপ পাঠিয়ে দিও।’
অন্ধকারে মিলে গিয়ে রাত্রি এলো। সংসারের কাজ
এক এক করে গঠে। ওপরের ঘরের জানালা দরজা সব
বন্ধ। সেই পুরাতন ঘুঘুবাণি। বিজ্ঞানীয় ছেলে-মেয়েরা
নিকিত্ত মনে ঘুমায়। নিজের পাশের জানালাটা খুলে বাঁধা
সেখানকার মেয়েকে শুয়ে পড়ে, সেকালের কপুত্রাভি নেই,
শুধু শুধু অসীম শ্রান্তিতে মন দন্ডা থাকে।

বাইরের অপরিমিত অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না,
কাছেও না, দূরেও না। কথায় বলে, কালের মাহুঘ দেখা
যায় না।

ওর মনে হয়,—নিজের মনও দেখা যায় না যেন,
সেও যেন ঐ ঘন নিবিড় অন্ধকারের মাঝে কোথায় অজহিত
হয়ে গেছে আর তার সেই খালি জায়গাটা জুড়ে বাইরের
ঐ ত্রিাট অন্ধকারেরই খানিকটা বিরাজ করছে।
আন্তে আন্তে বয়স, স্থান, কাল সব মিশিয়ে যায়
সেইটোতে।

জানানার বাইরে ইলুশেণ্ডি নিরবচ্ছিন্ন পড়তে থাকে;
তার যেন সন্ধ্যা থেকে অন্ধকারের সঙ্গে চুপি চুপি কথা
কওয়ার শেষ নেই। কত বর্ষা অতিক্রম করে কবেরার
বর্ষা মনে পড়ে, শ্রাবণ কি ভাত্র কি আঘাট তা' মনে পড়ে
না, মনে হয় শুধু এদনি খারাই নিরবচ্ছিন্ন ক'নি খরে বিত্তি
পড়ছিল। ‘সেই জলে-জলময়, সেই কাঁধা-কাপড়, সেই
বিচুড়ী, ইলুশেণ্ডি ডিতে ইলিশ মাছের ফরমাস।

আর! আর কিছুই মনে নেই—

শুধু ঐ জানালাগুলো বন্ধ থাকৃত, তাই বোধ হয় বাইরের
ঐ অন্ধকারটা এদনি উড়ে এসে বুকের মাঝে জুড়ে বসতে
পেত না।

কোরে একবার মেঘ ডাকে, আকাশ ভরে বিজ্ঞাং ঢমকে
কত কি সব দিগ্বিজি লেখা মিখে দিয়ে যায়।

ইলুশেণ্ডি থেমে গিয়ে কন্‌কন্‌ স্বর খর করে বুট্টি নামে।
জামে'রা উঠে ‘আসে, দাণ্যানের আশুতকনা কাপড়চোপড়
সব ভিজ়ে যাবে। কাপড় তুলে আলো নিবিয়ে যাবার সময়
বলে, ‘দিদি জানালাটা বাও, ‘অমনি করে জানানার মাথা দিয়ে
সুতো না, তার হয়ে উঠবে মাথা।’—

পাশের ঘরে মাসীমা—শান্তদীর ছোট বোন থাকেন।
তিনি জুখী জুখী বসেন একবার। ভাবেন বুঝি রাত পোহাতে
দেবী নেই। বাওরানো দাওরানো পুজা-অফ্রিক মাশা
সব করে তিনি শোন, তারও ঘুম হয় না বলেন।

বাঁধা ভাবে, ও'র কি মনে হয়, কি ভাবেন!—ঊর্ধ্বের কি
কিছু মনে হ'ব কখনো?

—আলো-নেবা পৃথিবীর সকল দ্বারার বন্ধ করে সবাই
আবার ঘুমায়—সেই শুধু জেগে প ও ভাবে, সবাই হয়ত ঘুম
না, তার মনই হয়ত জেগেও আছে কত জন।

কিন্তু এরা জামে'রা ঘুমায়।—কি করে সব ঘুমায়? আ

হয়ত তারা জানে না... কি করেছে বা জানবে...? সে কি
জানত কোনোদিনও?... ..

বিজ্ঞাং আবার ঢমকে আলো করে যায়—

ওর মনে হয়, ঐ শ্রাবণের বুকের ভেতরই আশ্রন আছে।

কবি বলেছেন, ‘আশ্রন আছে—’

কবি যা' বলেছেন, তা' তে বলা হয়েছে, কিন্তু যা'
বলেন নি তার কথা কে জানে?—বেকরা বলা হ'ল না,
বলেনি হয়ত কেউই, বাকি রয়ে গেল, বাকি থাকবে চির-
দিন ধরে,—তার ভেতরে কি আছে? সে কথা কে বলতে
পারবে?—স্বরে স্বরে মনে জাগে

বিজ্ঞাপতি করে কৈ সে গোহাট্টাই হার দিন রাত্তা—

কিন্তু ঐ দিন রাত্তা যখন গুলে গুলে গোঙানো হয়,—
তার ভাষা?—বিজ্ঞাপতি বলেন নি তো!

ভোর হয়ে এলো।

বিত্তি তখনো থাকে নি, নিশাথে কোরে পড়ছে। যেন শেষ
কথা গুলো তাড়াহাতি সৌর দেবে, স্পষ্ট আলো হবার আগে।
তজ্জাজ্জরতা কেটে গেলো।—বধু গঠে।

তখনো কেউ গঠে নি।

একলা নিস্তব্ধ নিরানন্দমুখ আকাশ আভিনার দিকে
ঢেয়ে থাকে।—সব চুচুচাপ।

কি এসে কড়া নাড়ে,—‘মাগো ভিজ়ে ভিজ়ে ও'ম গেলো,
মাগরাস্ত্রির দ্বারার থেকে জল-পড়েছে, শুধু তোমাদের রুট
হবে তাই এলান’—

রাতের মনের সমস্ত মোহের মোহর স্পষ্ট আলোর মাঝে
মিশিয়ে গেলো।

বেশা হ'ল।—

ঠাকুরঘরের জানালাটা খোলা ছিল; কাপড়ধানা
একবারে পৌঁড়িয়ে আছে।—

শান্তদীর মতন বাঁধারও মনে হয়, আপন মনে বলে, ‘কাজ
কাপড়ধানা পরার তাও দেবতা বাদ সাধেন।’—

দেবররা, ছেলেরা গঠে, মেজ দেবর বলেন, ‘আঃ আর

তো পুরা যায় না যেন,—কি র'পতে দিচ্ছ আজ
বড় বৌ?’

ছোটদেবর বলে ‘কালকে বাজারে ইলিশ, পুঁব
সস্তা ছিল, যা' ইলুশেণ্ডি আরম্ভ হয়েছে। চুটো
‘আনিয়া।’

খোকা বলে, ‘না কাঁকা বড় কাঁটা, আজ কাটলেট চিড়ী
মাছের,—’

যুহ হাতে সেজদেবর বলেন, ‘হঁ, সবাই মতামত দেয়
দেখছি,—তা কারো যা হয়—কিন্তু বিচুড়ীই দাও বৌদি।—
সেজ বৌ সেজ বৌ ছোট বৌ একরাশ কাঁধা কাপড়

নিয়ে উঠানের কলতলার এসে ধাড়া। অগ্রসরমুখে তারা
আকাশের দিকে চায়, মেঘেরা আকাশ ভরে তেমনি মধুর
গভীর গতিতে চলাফেরা করছিল।—বাঁধাও চাও—ইলুশে-
ণ্ডি তেমনই পড়ছিল, কিন্তু তাদের চুপিচুপি কথা আর
শোনা যাচ্ছিল না।—

দাদশাশুড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, ‘বৌমা, ক'নুকে ঢাল
আর ক'নুকে ডাল দাঁব?—’

সর্বত্র পাইবেন

বিশেষ অগ্রহণার জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র
লিখুন:—পোস্ট বক্স ৭৮২৪, কলিকাতা।

গান

নজরুল ইসলাম

আলাবরা—লাউলী

আমি যেদিন রইবনা গো

লুইব চির-বিদায়।

চিরতরে স্মৃতি আমার

জানি মু'ছে যাবে হায়।

আশিতে তার ছায়া পড়ে

রয় যবে সে স্তম্ভে,

সে যবে যায় দূরে চলে

অমনি ছবি মিলায়।

এই ধরপীর খেলা-ঘরে

মনে রাখি কে করে,

তুলে সাগর চাঁদ-সোহাগে

মরু মরে পিপাসায়।

রবি যাবে ওঠে নভে

চাঁদ কে মনে রাখে, - - -

একল ভাঙে ওকল গড়ে

মানুষের মন নদীর প্রায়।

মোর সমাধির বুক প্রিয়

উঠবে তোমার বাসর-ঘর,

হায় অসহায় ভিখারী মন

কীদে তবু সেই বাপায়।

সোপিয়া মিশ্র—লাউলী

দিতে এলে ফুল হে প্রিয়

কে আজি সমাধিতে মোর।

এত দিনে কি আমারে

পড়িল মনে মনোচোর।

জীবনে যারে চাহনি

তাহারে ঘুমাইতে দাও,

মরণ-পারে ভেঙেনা

ভেঙেনা তাহার ঘুম-ঘোর।

দিতে এসে ফুল কৈদোনা,

প্রিয়, মোর সমাধি-পাশে!

অরিল যে ফুল অনাদরে হায়

নয়ন-জলে বাঁচিবেনা সে!

সমাধি-পাশে নহে গো

তোমার সমান কঠোর।

কত আশা সাধ মিশে যায় মার্জির সনে,

মুকুলে ঝরে কত ফুল সীতের দহনে!

কেন অসময় আসিলে,

কিরে যাও, মোড় আঁখি-লোর।

ভাবলোকে মেটারলিঙ্ক

৩

‘বীনের সম্পদ’ের সঙ্গে সঙ্গেই মেটারলিঙ্কের ‘এন্ড্রাভেন ও সৌলোস্ট’ নাটকখানি প্রকাশিত হয়। একজন সমালোচক বলিয়াছেন যে এই নাটকের নারক-নারিকারা যে মেটারলিঙ্কের ‘বীনের সম্পদ’ পুস্তকের অনুরাগী তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ তাহাদের বার্তালাপের মাঝ দিয়া কেবলই উক্ত পুস্তকের ভাবরাশি ছুটিয়া বাহির হইতেছে। সত্যই মেটারলিঙ্ক তাহার অপূর্ণ প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়া তাহার প্রাণের যে অপূর্ণ সৌন্দর্য ও রসাহুতির পরিচয় দিয়াছেন, এই নাটকে সেই রহস্ত ও সৌন্দর্যকেই জীবনের মাঝে রূপ দিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

স্ট্রট হিসাবে দেখিতে গেলে আমরা মেটারলিঙ্কের পূর্ণনিষিদ্ধ ভূখানি নাটকের সহিত ইহার একটি মোটাগুটি রকমের সাদৃশ্য দেখিতে পাই, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। ‘পীলিয়াস ও মেলিভাণ্ডা’ - নাটকে দেখিয়াছি নারিক মেলিভাণ্ডাকে গোলোড ও ভালবাসে এবং পীলিয়াসও ভালবাসে। পীলিয়াসের ভালবাসাই মেলিভাণ্ডার অন্তরাখ্যাকে লক্ষ করিয়া জাগ্রত করিয়াছে, দেখানাই তাহাদের পরস্পরের গভীর প্রাণের সত্য পরিচয়। গোলোডের অপরিণত মন যে ভালবাসা বুলিতেই পারে না; হৃৎকান্দ স্রবণ এবং সজ্ঞাতের সৃষ্টি হইল। নিঃশ্রুতির নিষ্ঠুর বিধান—প্রেমের পরম পাণ্ডার পথে মুক্তার চরম বিচ্ছেদ আসিয়া পড়াইল। ‘মালানী ও প্যালোমিডিস’-এও এই তিন লইয়াই গুণ্যত। এখানে ছুটি নারী একজনকে ভালবাসিয়া একটি সমস্তা সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে এ ক্ষেত্রে এন্ড্রাভেন আপনার কামনাকে বিসর্জন করিয়া মালানী ও প্যালোমিডিসের প্রেমকে সার্থক করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। কিন্তু এন্ড্রাভেনের সমস্তা ‘মালানী ও প্যালোমিডিস’র মত হইলও সমস্তাটি এখানে আরও জটিল। সৌলোস্ট ও তাহার শাবী মিলীয়াণ্ডার (Moleander)-এর মধ্যে ভালবাসা কম

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

গভীর নহে; এ ভালবাসা বাহিরের আকর্ষিক ঘটনাবশে সজ্জিত সামাজিক ভালবাসা নহে। এখানে উভয়ের ভালবাসার মধ্য দিয়া অন্তরের গভীর পরিচয় সম্ভাবনা উঁকি মারিতেছে। আর সৌলোস্টের বিধবা ভ্রাতৃবধূ এন্ড্রাভেনও মিলীয়াণ্ডারকে ভালবাসে; এ ভালবাসার মধ্যে উভয়ের পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সৌলোস্ট সমগ্র অন্তরাখ্যা দিয়া ভালবাসিয়াছে সত্য, কিন্তু মিলীয়াণ্ডারের নিকট সে আশ্রয়কে উন্মুক্ত করিয়া অন্তরে অন্তরে ধরা দেয় নাই। মিলীয়াণ্ডার আসিয়া তাহারকে পরমাশ্রয় পরিচয়ের আলোকে আবিষ্কার করুক, সে নিজ অন্তরের অতুল সৌন্দর্যকে উল্কাটিত করিবে না, মিলীয়াণ্ডার আসিয়া তাহার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া তাহারকে প্রকাশ করুক, এইটাই ছিল তাহার মর্মের গোপন প্রার্থনাময় কামনা। সৌলোস্ট নিজেও জানিত না, চেতনার নিকট একথা প্রকট ছিল না যে সে এই পরিচয়ের আশায় একতলা হইতে বসিয়া আছে। কেমন একরকম আত্মবিশ্বস্ত হুখেই দিন কাটিয়া যাইতেছিল। মিলীয়াণ্ডারেরও দিন বেশ কাটিতেছিল, শুধু তাহার মাঝে মাঝে মনে হইত যেন পেশীসেটকে সে ধরিতে পারিতেছে না। যেন তাহারা একজন আর একজনের নিকট হইতে ‘অনন্ত বোজন দূরে দাঁড়াইয়া আছে, যেন পেশীসেটের অন্তরতম সৌন্দর্যের মহিমা কিছুতেই তাহার নিকট ধরা দিতেছে না। এমন সময় তাহার ‘যুগল’ এন্ড্রাভেন তাহার সচেতন ভালবাসা, সচেতন চিন্ত লইয়া মিলীয়াণ্ডারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। মিলীয়াণ্ডারের মনে হইতে লাগিল যেন সে কত যুগযুগান্তর জড়নিষ্ঠার পর আপনাকে আবার কিরিয়া পাইল। পরস্পরের দিকে চাহিয়া পরস্পরের এ এক গভীর পরিচয় বোধ জাগিয়া উঠিল, তাহাদের ব্যক্তিরে বাবধান কাটিয়া গিয়া যেন তাহারা একবারেই এক হইয়া গেল। সৌলোস্টের সৌন্দর্য মিলীয়াণ্ডারের চিত্ত হইতে যেন

মুখিয়া যাইতে লাগিল, স্বাধার সেনীসেটের অন্তরতম সৌন্দর্য মিলিয়াগার কখনও কখনও পায় নাই। কিন্তু মীনস্বায়ার পরপরদের মধ্যে একটি হৃদয় প্রতিযোগিতা চলিয়া থাকে। এ প্রতিযোগিতা ঈর্ষার বিকৃতি নহে; ইহার প্রভাবে গভীর নহিনাময় সৌন্দর্যের সান্নিধ্য স্বল্প মানবস্বায়ার গভীরতম সৌন্দর্য আভ্রত হইয়া উঠে কারণ মানবস্বায়ার ই হৃদয়, সৌন্দর্য আশ্বাস প্রাপ্ত এ এরাভেনের সচেতন সৌন্দর্যের সমুদ্রে ঈড়হিয়া সেনীসেটের গোপন গভীর সৌন্দর্য বস্তুগতমে পুঙ্খননের মত বর্ণে ও গন্ধে একবারে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ছুট প্রতিযোগী সৌন্দর্যের মাঝখানে মিলিয়াগার আপনাকে দেখিতে পাইল।

এরাভেনের এই সমতার সঙ্গে পীলিয়াসের সমতার সাদৃশ্য থাকিলেও প্রভেদ রহিয়াছে। সেখানে ছুট পুঙ্খনের মধ্যে একটি নারী আর এখানে ছুট নারীর গভীর ভাববাসার মধ্যে একজন পুঙ্খ ঈড়হিয়া। গোলাভ গভীর অস্থকত রাজ্যের সন্ধানই রাখে না, স্তরায় সেলিতাওয়ার পক্ষে সেখানে কোন গভীর বিচ্ছেদ বাধাই নাই; এখানে কিন্তু তিনটি চরিত্রই গভীরতর জীবনলোকে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। এ গোলাভ পীলিয়াসকেও যেমন দেখিতে পায় নাই, নিজকেও সে যেমন জানে না; কিন্তু সেনীসেট অন্ধ নহে, নিম্নিত নহে; সে নারী। এতকাল যদিও সে আপনার অন্তরে সৌন্দর্যলোকে চলাফেরা করিতেছিল—(যেমন অধিকাংশ মানবস্বায়ী প্রতিমিত করিতেছে)—আজ এক নিমেষের সৌন্দর্যের আহ্বানে সে আপনার অন্তরলোকে জাগিয়া উঠিয়াছে। সেনীসেটের বেদনা সাধারণ জীবনের সলিন ঈর্ষাকাতর বেদনা নহে, এ বেদনা মানবস্বায়ার সহিত রহস্যময় অদৃষ্টের সংঘাতে উদ্ভূত। এ ট্রাজেডির মূলগত ভুলসান্নি সাধারণ মানব-চরিত্রের নৈতিক দুর্লভতা হইতে নহে, এ ট্রাজেডির কারণ নিয়তির নিগূঢ় নিরর্থকের মধ্যেই নিহিত। মানবস্বায়ার এই গভীর অন্তরলোকে পাওয়া না-পাওয়ার তত্ত্বনির্ধারণ কে করিবে?

মিলিয়াগারের পরম আনন্দ ও পরিচয় এরাভেনের পক্ষেরই বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। সেনীসেটের ভাববাসা

যে মিলিয়াগার ঠিক বিশ্বত হইয়াছে তাহা নয়; মিলিয়াগার যেন আজ এরাভেনের ভাববাসায় বন্দীমান হইয়া সেনীসেটকে আশ্রয় গভীরভাবে ভাববাসিতে পারিতেছে; ভাববাসা গভীর কিন্তু এ ভাববাসার শক্তি মিলিয়াগার পাইল এরাভেনের নিকট, সেনীসেটের নিকট হইতে নহে। এরাভেনই কেন মিলিয়াগারের 'খুশল' হইতে পারিল, সেনীসেট কেন পারিল না, ইহা বলিবার শক্তি কাহারও নাই। দোষ ত কাহার নাই—নিমিত্তর বিধান ইহা। সেনীসেটের জীবনের ট্রাজেডি ও বেদনাও এইখানেই।

কিন্তু এই ট্রাজেডির মধ্য দিয়া সেনীসেট আজ কত হৃদয় হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। এ সৌন্দর্যের গভীরতার সন্ধান এরাভেনও পায় নাই। জগৎপথের সঙ্গে সঙ্গে যখন সেনীসেট তাহার নির্যিককে প্রত্যক্ষ করিল, তখন ইহাও বুঝিল যে আজ তাহার নিজের বেদনা বতই হৃদয় ও মর্মান্তিক হোক না, মিলিয়াগার এবং এরাভেনের মিলনকে অব্যাহত রাখিতেই হইবে। সে তাহার নৈকট্য দিয়া যেমন তাহারে অব্যাহত মিলন পথে বাধা হইয়া থাকিতে চাহে না, তেমনি ধীরে চলিয়া গিয়া, তাহার বিদায় দিয়াও তাহারের মিলনকে একটি চুপ্চের দৃষ্টি দিয়া কটুত্ব করিয়া রাখিতে চাহে না। সেনীসেট মিলিয়াগার ও এরাভেন উভয়কেই ভাববাসিয়াছে, উভয়ের ভাববাসিগত ও ভাববাসিয়াছে, তাই এ ভাববাসিগতকে সে আজ প্রাপণ, করিয়া রাখা করিতে দৃঢ়পক্ষ। এ ভাববাসি বড় গভীর। উভয়ের সৌন্দর্যের বিকে চলিয়া আসিয়া মিলিয়াগারের অন্তরতম অক্ষ উপলব্ধি উঠিতে চায়। সেনীসেট আজ পরমহস্যর ত্যাগের মধ্য দিয়া আপন অন্তরের গভীরতম সৌন্দর্যকে বিকশিত করিয়া ভুলিতে চায়; এ চাওয়ার পশ্চাতে কোন বিচার বিবেচনার কথা নাই, এই পরমভাগ্য সেনীসেটের অন্তরতম আশ্বাস স্বভাবগত সধে কর্ম—এখানে তাই সেনীসেটকে আমরা এরাভেনের মত সচেতন দেখিতে পাই না; সেনীসেট নিজে যে কত হৃদয় তাহা সে নিজে জানে না। সে এত হৃদয় বলিয়াই এই ভাগ্যটিকে সে সকলের দৃষ্টির অন্তরালে চিপোয়ান রাখিতে চায়; কারণ এ ভাগ্য আপনার পরিচয় দিতে গেলেই যথ হইয়া যাইবে। এরাভেনও আপনার সমস্ত অর্থ বিসর্জন

দিয়া সেনীসেটকে স্বধা করিতে চায়। এরাভেন জানে, যে-প্রথম একটি মাত্র প্রাণিকেও ছাড় দেয়, তাহা কখনও আনন্দের অধিকারী হইতে পারে না। কিন্তু সেনীসেট কিছুতেই এ ভাগ্য হইতে দিতে পারে না, দিবে না, ইহাই তাহার পথ। তাই যদিও সে যেহেতু আত্মহত্যা করিল, তবু শেষ পর্যন্ত, মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত ওই একটি কথাই সে আপনার সমস্ত শক্তি দিয়া প্রচার করিয়া গেল যে সে স্বাধারতা করে নাই শুধু আলোক-মিনার (light-house) হইতে সূত্রিয়া নাবাগত 'সবুজ পানী' ধরিতে গিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। সে যে তাহারের হৃদয়ের ভ্রষ্ট এমন করিয়া নিজকে অন্ধকার মৃত্যুর অন্তল গহবরে নিক্ষেপ করিল একথা জানিলেও যে তাহারের প্রেমমিলনে এই 'মহাবাহিনী'র দৃষ্টি একটি অলম্ব্য প্রাচীরের মত নিত্যকাল বাধা হইয়া থাকিবে,—তাহা হইতে দিবে না বলিয়াই আপাত নিখায়ে দিয়া সে আপনার অন্তরের পরম সত্য ও সৌন্দর্যকে সে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিয়া চলিয়া গেল।

এই ত গেল নাটকের সমতার কথা। তাবের পরিণতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে 'এরাভেন' 'দীনের সম্পদের' ভাবেরই একখানি ছবি দায়। সচেতন অন্তরের সৌন্দর্য হইতে আত্মজোলা সৌন্দর্য যে অধিকতর শক্তিশালী, এমন কি অদৃষ্টজী এ তবের আলোচনা তিনি, 'দীনের সম্পদ' করিয়াছেন অদৃষ্ট শক্তি যে মানবজীবন লইয়া এক বিচিত্র মৌল্য করিতেছে, এই রহস্যময় শক্তি মানবের গভীরতর হৃদয় অঙ্গুল অথবা প্রতিদুল, তাহা যে কিন্নরাজ বলা যায় না, ইহা মেটোরলিকের ধারণা দেখিতে পাইতেছি। এই ভ্রষ্ট এরাভেন বসিতে বাধা হইল:

"আমি যখন এসেছিলাম তখন আমি বিশ্বাস করতাম যে সবই সম্ভব হবে, জগৎটা অপরিমিত বস্তু নয়।……কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের কল্পনা বড় হৃদয়ই হোক, জীবন আমাদের অতি সমস্ত খাপ খেতে চায় না। (অন্ধ ও দুঃখ ২)।

অদৃষ্ট-সংক্ষেপ মেটোরলিকের এই বিশ্বাস তাহার 'ভয়ঙ্কর' (১৯০০) নাটকেও দেখিতে পাই। কিন্তু ভাববাসার অন্তরে

যে মৃত্যুকেও উপেক্ষা করিবার মত অসীম শক্তি ও প্রবলতা রহিয়াছে এই কথাটি মেটোরলিকের নিকট যেন আরও সত্য এবং স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মেটোরলিক বলিতেছেন, মৃত্যু অনিবার্য এবং অতি নিরাপন্ন বটে কিন্তু প্রেমের পথে মৃত্যুর ভীষণতাও মানবস্বায়ার গতিমোহ করিতে পারে না।

এই নাটকখানি সম্বন্ধে কে, বিবেচন মাহাশয়ের মন্তব্য মেটোরলিকের ঊর্ধ্ব টিক বলিয়াই আমার মনে হয়। তিনি বলেন "‘হায়ে’ বসিয়া" পরম সৌন্দর্য-সংঘেও সমগ্রভাবে নাটকখানি ভাল হয় নাই। চতুর্থ অঙ্কটি একবারের নির্যেধ নির্যুত বলিতে পারা যায়†। এই নাটকে, দীনের সম্পদে প্রচারিত বাণীর একবারে ছড়াছড়ি হওয়ায়, মত প্রচারে চরিত্রকে যেন শিল্পীর চিত্র বাস্তব হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে চরিত্র স্বস্তির দিক দিয়া নাটকখানির অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। এরাভেন চরিত্রের মধ্যে সচেতন অদৃষ্ট দেখাইতে গিয়া তাহাকে অনেকটা পুঙ্খের মত এবং বস্তুতন্ত্রি করিয়া ফেলিয়াছেন; এরাভেন যেন সব জিনিসের একটা অতীন্দ্রিয় ব্যাঘা বিবার জগত লইয়া উদ্ভূত হইয়া আছে। তাহাতে এরাভেনের অন্তরজীবনের সৌন্দর্য তদনম হুটুতে পায় না। মিলিয়াগারকে তাই বাধা হইয়া বহুশল এরাভেনের ছাত্রের মত হইয়া তাহার বস্তুতা ভনিত হইয়াছে; তাহাতে তাহারও চরিত্রের ও ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্য নষ্ট হইয়াছে। মিলিয়াগার যেন নাটকের একটা উপলক্ষ্য মাত্র। সে যেন একটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব নহে। কিন্তু সেনীসেটের চিত্র অতি অপরূপ ভাবেই শিল্পী ছুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাহার অন্তরের জাগরণ, তাহার বেদনা, বিকাশ, পরিণতি বিষয়গত হইতে তাহার করণ বিদায় এ সমস্তই অজুতপূর্ণ নৈপুণ্যের সহিত শিল্পী আশ্বাসের সমুদ্রে আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। এ নাটকের আর একটি অপরূপত্ব হইতেছে এরাভেনের মত নারীচরিত্রের পক্ষে সেনীসেটের অভিপ্রায় না বুঝিতে পারা। জটিল পটভূমিকা বাদ দিলে, দেখিতে পাই যে নাটকীয় atmosphere-টিকে ছুটাইয়া তুলিতে মেটোরলিক অধিকতর শক্তির পরিচয়

* Cf. Inner Beauty, (Tr. Hu.)

† Invisible Goodness (Tr. Hu. p. 161)

† "In spite of great beauties, the play as a whole is disappointing. The fourth act indeed is perfect"—J. Ethell.

দিয়াছেন। মেটারলিকের আবিষ্কৃত নিগূঢ়, বাজনাঙ্ক কথোপকথন ভঙ্গীর অপরূপ বিশেষত্বও ইহাতে অতি সুন্দর ছুটিয়া উঠিয়াছে।

যদিও এই সময়কার নাটকে আমরা মেটারলিকের জীবনে এক অপূর্ণ পরিবর্তনের আভাস পাই, যদিও 'দীনের সম্পদে' স্পষ্টতঃ এক নবীন আশা ও আনন্দের আবির্ভাব দেখিতে পাই, তবু এই বয়সেই প্রকাশিত Douze Chansons (দ্বাদশ সঙ্গীত)—পরে Quinze Chansons (পঞ্চদশ সঙ্গীত)—পুস্তিকায় আমরা কিন্তু তাঁহার এই নবজীবনের কোন চিহ্ন দেখিতে পাই না। এ যেন সেই ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত Serres Chaudes-এর ধারা বাদিয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়, ইহার করেকটি কবিতা খুবই সুন্দর—একটি কবিতার অল্পবাদ নিয়ে দেওয়া হইল :

Thirty years I've sought, my sister

For his hiding place,

Thirty years I've walked my sister,

But have found no trace...

Thirty years I've walked, my sister,

And my feet are worn.

He was all about, my sisters,

Yet he was unborn...

Sad the hour grows, my sisters,

Bare my feet again,

For the evening dies, my sisters,

And my soul's in pain...

You are now sixteen, my sisters,

Time it is for you,

Take my staff away, my sisters,

Go and seek him too...

1896.

গুঁজিহু তা'রে ব্রিশব্বর, বোনো শোনা, শোনা

গোপনতঃ—তা'হারি সমানে,

অনিহু আমি ব্রিশব্বর, বোনো শোনা, শোনা

তা'হার লেখা না পেহু কোনোখানে।

অনিহু আমি ব্রিশব্বর, বোনো শোনা, শোনা

চরণ হ'লো যথিত ভ্রমভারে;

আমারে বোঝিলা সে যিহি, বোনো শোনা, শোনা

তথাপি ভুলে' র'ল রজন-পারে...

ঘনায় আসে বিহার বেলা, বোনো দেখ চাহি'

আবার করি নয় ছুঁচরণ,

সন্ধ্যা হ'লো মন-মুখী, বোনো দেখো চাহি—

প্রাণ মম, বেকান-নিমগ্ন।

তোমরা আদি মোহনীগণা হে মোর ভগিনীরা

মাধুরীম সমর ধ'ব হেরি।

ধরা গো হাতে পথের মাঝি, হে মোর ভগিনীরা—

বোঝার বেলা এয়ার তোমাদেরি।

অনুবাবক : শ্রীহরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

—ক্রমশঃ



কথা-সাহিত্যের উপাদান

শ্রী আশুতোষ সান্যাল

আজকাল অনেক পাঠক এবং সমালোচকের মুখে শুনতে পাওয়া যায় যে, আমাদের গল্প উপভাস অর্থাৎ কথা-সাহিত্যের কথা-বস্তু বা উপকরণ না কি অধিকাংশই পুরাতন, মানুশী। গল্প ও উপভাসের উপকরণ না কি আমাদের ছুরিয়ে গিয়েছে, তাই আমরা নিজদের জীবনের বই অর্থাৎ জানা কথা ছেড়ে অভিজ্ঞতার বাইরের কথাকেও উপাদানরূপে গ্রহণ করছি।

সমালোচক এবং পাঠক একথা বললেও, লেখকরা কিন্তু বড়ই মুন্সিমে পড়েন—পাঠকদের গল্প পড়বার সালসলকে তৃপ্তি দান করবার চিন্তায়—নিতা নুতন উপকরণের খোঁজে!

পাঠকদের এই গল্প পড়বার প্রবৃত্তি এবং লেখকদের এই গল্প সরবরাহ করার প্রয়াস আজ নুতন নয়। সভ্যত্ব হতে আজ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করলেই দেখা যায়,—সকল যুগেই সকল দেশের মানুষের মানসিক আহার হচ্ছে—গল্প। ভারতবর্ষ তা এ বিষয়ে একেবারে অতুলনীয়। তার দেশজের পুঁথি হ'তে এক-কালের নথী পণ্ডিত উন্মুক্ত রেখলে স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায় যে, তার অতীত এবং বর্তমান একে-বাইরেই গল্প প্রাণ। সেকাল হ'তে একাল পর্যন্ত এত গল্প আমাদের দেশে লেখা হয়েছে, যার তুলনা অন্য কারও সঙ্গে করা যায় না। যুগ-যুগ ধ'রে আমাদের ধর্মের, আমাদের কব্জের বাহনই হয়েছে—মুখ্যতঃ এই গল্প! এই যে গল্পের সরবরাহ যুগ যুগ ধ'রে গল্প-লেখকরা যোগান দিয়ে আসছেন, তার অসংখ্য উপাদান তাঁরা কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন? জীবন-গ্রন্থের কথাবস্তু যেখানেই ছুরিয়ে গিয়েছে, সেখানেই তাঁরা উপকরণ সংগ্রহ করেছেন—কাগজের গ্রন্থ হ'তে। কাগিমালা, ভবভূতি, হ'তে আরম্ভ ক'রে বহিঃচন্দ্র, রবীন্দ্র-নাথ, শরৎচন্দ্র, কেইদেই তা থেকে বাদ যান নাই। তাঁদের গল্প ও উপভাস শুধু তাঁদেরই মনপড়া নয়, তাঁদেরও অনেক উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়েছে—সেই পুরাতন—তাঁদের পূর্বপুরুষ গল্প লেখকদের কথামালা থেকে। কাজেই এই

সকল প্রমাণের ভোরে, জোর গলাতেই—বলতে পারা যায়, সাহিত্য-জগতে চুরি বা পুরাতন বলে কোনও জিনিস নেই। পরের জিনিস আশ্রয়্যাস ক'রে চালাতে পারলেই তা নিজের হয়ে দাঁড়ায় এবং পুরাতন হয়েও তা শোক-চক্ষের সমুপে দাঁড়ায় একেবারে নুতনরূপে এবং নুতন ভঙ্গীমায়। তবে এই আশ্রয়্যাস ক্রিয়াটাই—প্রতিভাগোপেক। প্রতিভার যেখানে অজব হয়, সেখানেই চোরদাসে ধরা পড়তে হয়, কিন্তু সাহিত্য-জগতে আবার এই চুরি বিজ্ঞাটা ধরা পড়লেও যে একটি বড় বিজ্ঞা তাও কি রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোট গল্পের এক নাথকর মুখ দিয়ে বলেন নি?

পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট করাই হচ্ছে কথা-সাহিত্যের প্রধান ধর্ম, এই কারণেই—তার স্বাধীনতা এত বেশী যে তার কোন সীমা আছে ব'লে আপাতদৃষ্টিতে বোধ হয় না। উপভাসকে একাধারে কাব্য, নাটক, জীবন-চিত্র, মনো-বিজ্ঞান, ভ্রমণ বর্ণনা সবই ক'রে তোলা যায়। এইখানেই কথা-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এবং এই জটিল তার এত আদর। ভাবনের জটিলতা যত বাড়ছে, নুতন নুতন জ্ঞান এবং সমজ্ঞা যত আবিষ্কৃত হচ্ছে—কথা-সাহিত্যও ততই আপনার স্থান এগিয়ে নিয়ে চলেছে। আগে চলবার এই দ্রুতগতি তার বাহন বলেই সে আজ এতখানি প্রভীতি লাভে সক্ষম হয়েছে। পথ পুরাতন কি নুতন, সে পথের শেষ ধ'য়ে এসেছে কি না তা দেখে-সে কোনদিনই পথ চলে নি, কোনদিন চলবে বলেও ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। সে পথ চলার বৈচিত্র্যকেই 'স্বল্পলখন' ক'রে চলেছে এবং এই একটি মাত্র কারণেই সে কোনদিন উপকরণের অভাবে বাধা প্রাপ্ত হয় নি।

স্বল্পলখন স্বাধীনতা বলতে খেজাচারিতা বুঝলে চলবে না, কাব্যে যেমন ছন্দের বন্ধন আছে (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'কাব্যের কথা বাঁধা পড়ে' যথা 'ছন্দের বাঁধনে'), নাটকে

যেমন কর্মপ্রবাহের অব্যাহতির বন্ধন আছে, কথা-সাহিত্যও তেমন চাকতার শৃঙ্খলার, সামঞ্জস্যের এবং কঠোর বন্ধন নিশ্চয় আছে। সমালোচকের প্রকৃত কাণ্ড হচ্ছে—জগতের শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যের বিশেষণ করে সেই বিধিনিয়মগুলি বের করে লেখকদের দেখিয়ে দেওয়া। তা না করে সমালোচক যদি নৃতন-পুরাতন নিয়ে মাথা ঘামাতে বসেন এবং পাঠক যদি রস ছেড়ে—খোঁসার বিচার করতে বসেন, তা হ'লে লেখকও নৃতনের ঘোরে 'একটা নৃতন কিছু করার' নেণার আমের সঙ্গে 'আমড়ার কশম' বেঁধে বসলে আশ্চর্য হবার কি আছে?

শিল্পী নৃতন-পুরাতন গ্রাহ্য করে না, সে খোঁজে সৌন্দর্য—তা নৃতনেই থাকুক আর পুরাতনেই থাকুক। একজন একথা না গুনেন একমুহুরে থেকেই 'ব'লে, আর কেউ যে তা অস্ত্র হয়ে গাইবে না এমন কোন বিধিনিষেধ কোন শাস্ত্রেই নেই। মাহুনের সমুখ তার নিজের হাতে গড়া জগৎ ছাড়াও প্রকৃতির হাতে গড়া আর একটা জগৎ পড়তে রয়েছে। সে জগৎ থেকেও মনের খোরাক সংগ্রহ করবার অধিকার সকলেরই আছে এবং সেই অনন্ত বৈচিত্র্যময় অস্থির সৌন্দর্যের রাজ্য হ'তে যুগ যুগ ধরে কত শিল্পীই না উপকরণ সংগ্রহ করে আসছেন তার হিঁসাবই হয় না। পূর্ব পুরুষের সমস্ত উপকরণ নিষেধ করে গিয়েছেন 'ব'লে, শিল্পীর আত্মপ্রকাশ-প্রসূতি কখনও নিষেধ হ'তে পারে না। কাউকে কথা-সাহিত্যের কথা-বস্তু বা উপকরণ, পুরাতন মামুলী হ'বার আশঙ্কার, অথবা নিষেধ হবার অজুহাতে যদি লেখকরা কলম উঠে করে নৃতনের সমানে 'কাণামাটির মতন করেন, তা হ'লে তাঁদের কলমের 'কালি' তা শুকিয়ে যাবেই—উপকরণ যোগ্যক আভাবে লেখকদের অপেক্ষ পাঠক এবং সমালোচকদেরই থাকতে হ'বে অন্যথায় বেশী শুকিয়ে।

কথা-সাহিত্যের উপকরণ-সম্বন্ধে ইতিপূর্বে অনেক মজারী—অনেক যুক্তিপূর্ণ কথাই বলেছেন, তাঁদের সেই যুক্তি-গুলি কতকটা এখানে পুনরুল্লস করা মাত্র অর্থাৎ পুরাতনকেই নৃতন করে লগা হ'ল।

পূর্বেই বলেছি কথা-সাহিত্যিকদিগের সকল কথাই বলবার অধিকার আছে। তা সে রাজস্বার কি রূপকর্মার

কথাই হোক আর কৃষ্ণ বেড়ালের কথাই হোক। আমাদের আশ্চর্যকরিতাও বোধ হয় এই বিচার করেই—লেখকদের ইচ্ছাশুদ্ধির 'কথা' বলবার অধিকার দিয়েছিলেন—কথা-সাহিত্যকে অনেকগুলি শ্রেণিতে বিভক্ত করে। আখ্যায়িকা, কথা, বচনকা, পরিকথা এবং কথাদিকারগুণে কথা-সাহিত্যকে বিভক্ত দেখতে পাওয়া যায়।

যুক্তি তর্ক হস্তত সকল রচনার মধ্যেই অনেক থাকতে পারে কিন্তু শুধু যুক্তির দ্বারা অথবা অল্পভূক্তির আনন্দই সব চেয়ে বড় আনন্দ। কারণ প্রেরণা সর্বদাই এবং সর্বত্রই বাইরের অভিব্যক্তির অপেক্ষা উচ্চতর এবং বৃহত্তর বস্তু। যে সাহিত্যগর্ভিক অবস্থার ভেতর এবং যে উপাদান নিয়ে কথা-সাহিত্য রচিত হয় বাইরের অভিব্যক্তি তার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে বটে, কিন্তু অস্থির প্রেরণা দেশ কাল বা উপাদানের সর্বাধিকার শাসন মানে না। শিল্পী তার অন্তরের প্রেরণা-বশেই সৌন্দর্য সৃষ্টি করে যায়; উপাদান তার অবলম্বন মাত্র, তার বিচার করতে বসে সে সৌন্দর্য সৃষ্টিকে ক্ষয় করতে আশীর্বাদী রাজী নয়। কারণ, প্রকৃত প্রতিভা সর্বত্র সর্বকালেই বাইরের নিয়মাবলীর উর্দ্ধে এবং সে বিশ্বের উপাদান থেকেই আশ্রয় চরিতার্থতা সম্পাদন করে। রচয়িতা যে প্রেরণা ও আনন্দ নিয়ে তাঁর রচনার রস-সৃষ্টি করেন, পাঠক ও সমালোচক যদি তাঁর রচনা রস-সৃষ্টি তর্ক-বাইরে দাঁড়িয়ে, তা থেকে একটু আনন্দ-লাভ করতে পারেন, তা হলেই রচনা সার্থক এবং সেই মুহূর্তটাই রচয়িতার নিষ্ঠা অনুশী। রাজ্যের দরের সঙ্গে সে মূল্যের কোনই সম্বন্ধ থাকে না, কারণ—বাঁজারের সোনার দর কমে বাড়ে। কথা-সাহিত্যের মূলমন্ত্র বলতে আমরা যিনি—গম!

যিনি এই গম গুছিয়ে বলতে পারেন, চাকতা-রক্ষা করে যিনি সেই গমের ভিতর দিয়ে রসশক্তি করতে পারেন তাঁহাই রচনা সার্থক।

শিল্পীর চোখে উপাদানের অভাব নেই। জনিয়ার হাদি-কামার পাছাড় কেটে কত শিল্পী কত সুস্থি গড়তে, গড়তে, গড়তে ছবির মতনই তাঁরা মনের আদ্যনার ওপর প্রতিবিম্ব ফেলে আবার অন্ধকারের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে থাকে। একটা থাকে—একটা আসছে। পুরাতন থাকে, নৃতন আসছে। নৃতন

পুরাতনের গাধার পড়ে, আপনাকে হারিয়ে ফেলছে, আবার নৃতন পথ ধরে নৃতন ভদ্রিয়ার, নৃতনের রূপে ফিরে আসছে। যে আসছে সে হাসি আনন্দ উৎসাহের উৎসব নিয়ে আসছে, আবার যখন থাকে তখন অশ-কামা নিরানন্দের উজ্জ্বল সিকবিকিহারা পথিকের মতন কোথায় চলে থাকে। রাজপথের শোভাযাত্রার মতন নীরবতার বুক চিরে সমাবেশের উৎস সোণ ব'ধিয়ে দিয়ে দুঃখ-দুঃখের চলে যায়। উৎসব নয়, মন ছাড়াও জগৎ পথের উৎসব ভরে যায়—আবার ধীরে ধীরে শোভাযাত্রার মতনই কোথায় অপসারিত হয়। আশা-বাওয়া—আর বাওয়া আশা, এই জনিয়ার ইতিহাস, এই হচ্ছে বৈদ্যনিম ঘটনা। এই ঘটনার সমষ্টি নিয়েই জীবন এবং এই জীবনই—গম। কবির শ্রেণ্য, শিল্পীর রেখা, নাটকের কাণ্ড এই গমের হুর কত রোগ-রাগিণীতে ঝড়ার দিয়ে উঠেছে, উঠছে, উঠবে। ভীষ্ম, রাধা, ছদ্মপান, কী অজ্ঞানের যীর্ণ-আখার যে প্রচণ্ড হুর একদিন পাণ্ড-সারথীর পাকজন্তে হুড়ার করে উঠেছিল, আজ তা পুরাণ—কল্পলোকের কল্পকাণ্ড। যে বিভিন্ন হুর অন্যথায় রাজপ্রাসাদ হতে উঠে মহাসাগরের পরপারের সোনার লজ্জা ধ্বংস করেছিল, তাও বাল্মীকীর কাব্যকাণ্ড। মাহুনের মণিকোঠার তা স্বর্ণপ্রদীপের আলোর মতন কিরণ বিতরণ করলেও—তা পুরাণ।

মাহার বেলা দিয়ে যেরো সমস্যারের গরির ভেতর কত পশু-পক্ষী ছবিনের জন্ত এলে, মাহুনের মনের ওপর যে রেখাচিত্র করে যায়, তাও মনের অন্তরালে গিয়ে যায়। মিলিয়ে যায় যতে কিছু তারাও রেখে যায় কত বৈধ মাগা মন, স্বপ্ন গুণে হাসি কামার গমের রেখা।

জন্মের ভেতর বেড়াতে গিয়ে ছুটো চন্দনা পাখীর ছানা হুঁসেরে কাছ থেকে চার আনা দিয়ে বাড়ীর কর্তা—কিনে এনেছিলেন। তখনও তাঁদের ভাল করে পাখা বের হয় নি, তখনও তাঁদের খাইয়ে না'দিলে খেতে পারত না। বাড়ীর কর্তা তাঁদের নিজেই ছেলের মতন করেই লালন পালন করবার দার নিলেন, বেন কত জন্মের ঝগড়াশা! মাসের পর মাস বেরে

লাগল, তাঁদের পালনকর্ম অঙ্গ সবুজের আভার করে উঠল, মুখের অঙ্গপট বুলি স্পষ্ট হয়ে উঠল, এটা-ওটা সেটা নিমিষার্থে খেতে শিবল। কর্তা আদর করে একজনের নাম দিলেন 'গদা' অপরদের যমুনা। গায়ের বিজীর বা শিল্পের জ্ঞান তাঁদের ছিল না, ইচ্ছামত সারা বাড়ী তারা বেড়িয়ে বেড়াত'। নয় ত দাঁড়ের ওপর বসে ছোটছোটের মতন মা-না বলে চোঁত। এতদিন করেই তারা বাড়ীর আর পাঁচজন ছেলো-মেয়ের মতন আদর পেয়ে বেড়ে উঠেই হল।

যমুনা ছিল ছুটো, মাহুনের যত্নে তার মন উঠল না, একদিন সে বাইরের জাত-ভাইদের তার কন্য তুলে চলে গেল উঠে—উড়ে গেল। বাড়ীতক্ত শোকের মন ভার হল, ছেলেরা সারা পাড়া তোলপাড় করে খুঁজে এল, কিন্তু যে বাব বলে চলে যায়, তাকে কি আর খুঁজে পাওয়া যায়? যমুনা গেল—এক বছরের আদর বড় মুহূর্তে ভুলে চলে গেল। বাড়ীর শোক হয়ত তদিন তার অভাব অস্থির করল, হরত' বা কর্তার চোখ দিয়ে ছ'খোটা জলও পড়েছিল, কিন্তু সে জলের লগা—হতেও যতকণ, মুছেও ততকণ!

যমুনা গেল—গদা থাকল, কিন্তু যমুনার অপরাধে সে পেল শান্তি। সেই দিন থেকেই তার শিল্পের ব্যবস্থা হল। জন্মাবদি যে স্বাধীন, তাকে শিল্পেরা পুংসে সে থাকতে চাইবে কেন? বাচার গায়ে মাগা ঠুকে ঠুকে সেরজ্ঞাতিক করে ফেলল। আহার নিদ্রা ভুলে যুক্তির আশ্রয় নেশাখোরের মতন গাঁও ঘরল—কাণ্ডগানের গাধার সে কাটবেই। তার রক্তাক্ত অস্থি দেশে, তাকে বাচার ভেতর বন্ধী করে রাখবার দায়িত্ব বৈশিষ্ট্য টিকল না। কর্তা তাকে মৃতক করে দিলেন, কিন্তু বাতে সে আর উড়তে না পারে, তার জন্ত পাখা কেটে দেওয়া হল। মনের ভাল! যুক্তির জন্ত শক্তি হারিয়ে গদা শান্ত হল। আবার সে রকমারী বুলিতে বাড়ী মুখাতি করতে লাগল। বাড়ীর মফল শোকের আদরের সে একমাত্র প্রাণী, কাজেই তার দিন বেনে আনন্দই কাটতে লাগল। পাখা কাটার ক্ষতি সে বিবেচনার মধ্যেই আনন না, সে বোধ হয় মনে মনে বিচার করে দেখেছিল, বনে বনে মোঁহে রুটিতে কই পাওয়ার চেয়ে এবেশ আছে। দীর্ঘস্থলী, বেন কত জন্মের ঝগড়াশা! মাসের পর মাস বেরে

কতীকে না বলে, ছেলেরের নাম ধরে গভীর স্বরে ডাকে, খার, খার, চোয়াল, কথা বলে, শিশু-সেই—দিন কেটে যায়।

কিন্তু মনে চিরদিন সমান যায় না, তারও গেল না, তার ভোগদশলের তাগীরা জটিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাড়ী ঢুকতেই বাড়ীর কতীর কানে গেল—‘মিউ’ ‘মিউ’! কি ব্যাপার রে বাপু! বাড়ীর থোকা মায়াময় ছুটে এসে সগর্ভে বললে, একটা পুছি—নন্দীর পর পেনে ছিল, কুলিয়ে এনেছি, পুত ভাল পুছি—তাল না লেগেছি—ফুলমণি!

বেশ কথা! ক ঘন্টার মধ্যে কোথাকার কে—কোথায় এসে কারো দখল করে বসেছে এবং এরই মধ্যে তার নামকরণ পথান্ত করে তাকে পরিবারভুক্ত করে নেওয়া হয়ে গিয়েছে।

কতী বললেন, কি আগদ, আবার বেড়াগ জোটাণি কোথা থেকে,—ফলে দিয়ে আসিস কাল সকাল বেশার।

মায়াময় স্বর হল, বেশ একটু কলন্বরেই বলল, ওল না নেই কিনা, তাই কেঁদে কেঁদে বোকাছিল, ফলে বিলে মলে বাবে যে।

না-হারা শব্দ, ফলে দিলে মরে বাবে—এ কথাটাও থোকা অস্থান্য করে জেনেছিল। কাজেই মায়াময়ের মারার ভোর ছিঁড়ে তাকে সহ্যা ফলে দেবার প্রস্তাব কর্তা আর বিতীরাবার করতে পারলেন না। কতীর কাছে থোকা গিয়ে নালিশ করল। কতী এসে কতীকে বললেন, থোকা কুড়িয়ে এনেছে—পাক না—কি আর তোমার করছে-ও।

না, আবার আর কি করছে—পাক। বলে কতী থাকবার অস্থতি দিতে বাধ্য হলেন। ফুলমণি থেকে গেল। নন্দীর পড়ে হযত না পেয়ে মরে যেত, অসুস্থের শবও রেখার চেয়ে দিবা আরামে হেপের মধ্যে থোকার কানো কুতুহী পাকিয়ে শুয়ে, নির্ভরনার ভেড়ার ভেড়ার করে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগল।

নাহ, দু খেয়ে দিনের পর দিন খাদ্য বেড়ে উঠতে লাগল। যেন কত কালের আত্মীয়।

ফুলমণির আগমনে বাড়ীর আর কেউ কোন আগতি না করলেও, গদা কিন্তু কিছুতেই তার আগমন অহমোমন করতে পারল না। ভাগিয়ার হিসাবে তার খুব না এনে-গেলেও, অস্ত হিসাবে সে যে তার মিত্র নয়—শত্রু, সে কথাটা কেউ তাকে না বললেও, সে তা বেশ বুঝতে পেরেছিল। প্রথম দিন কতক ফুলমণিকে দেখলেই সে রাগে, হিংসার খুব চোঁচাতে লাগল এবং একদিন রাগে গেরে ফুলমণির কনটা কামড়ে রক্তাক্ত করে দিল। ফুলমণি কিন্তু নড়ল না, সে যেন কতকালের আগনার জনের মতন লোকের পায়ে পায়ে ঘুরে, গায়ে যা ঘণে আত্মীয়তা জানিয়ে তার থাকবার ব্যবস্থাটা বেশ কারোদী করে নিতে লাগল।

কথায় বলে ‘স্বভাব যায় না মলে’। একে বাঘের মাসী তার ওপর চুরি বিষায় চৌকিদার। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গেই—নাছটা ডমটা লোক-চক্ষুর অন্তরালে সে বিবি সরতে লাগল। হুবিধা পেলে চড়াই, ইতরেরও খাড়া মটকে তার ব্যাঘবিজ্ঞার পরিচয় দিত। শাশন-হিংসাবে চড়াটা চাণড়টা মাঝে মাঝে খেলো—পেটে খেলে পিটে সহ’ নীতি অলম্বন করে তা গ্রহের মধ্যেই আনত না।

গদার দিকেও সে আড়চোখে চাইতে ছাড়ত না, তবে তার কোমরের দাঁখটা তখনও কানের ওপর কলজ রেখার শোভা পাচ্ছিল বলেই থোক অথবা মন্ত বড় কথা বলে আর বড়ীর মতন বাকা রান্ডা টোট-টোট খোয়ের মতন তার প্রাণে আড়কের হস্ত করার অস্তই থোক, চাওগার বেশী পাওগার দিকে বড় একটা পুঁসেই না। কিন্তু—থোলাপাণী মুগ-খাপ করে যখন তখন কাঁপিয়ে নীচে গড়ে, কাজেই বাড়ীর লোকে বিশ্বাস করে গদাকে আর পূর্ব স্বাধীনতা দিতে পারল না। গদারার বন্ধী হল। এবার অলস্ত খাওয়ার জেলখানার মত, অন্তরীণের আটক আসামীর মত বোলাই থাকল—তবে গভীর ভেতর—বন্ধ দরজা ঘরের মধ্যে।

গদার স্বপ্নের ঢাকা ফুলমণি এসে ঘুরিয়ে দিয়ে নিজে রাঙা বাড়ীর শি-নরকার সেপাইয়ের মতন সারা অঙ্গ কুলিয়ে পাচারকার কে বেড়াতে লাগল।

গদা নিয়মমত জল ছেলো মর দুধ সবই পার কিছু অন্ধকার খরে বন্ধীর মত থেকে সে অস্থির হয়ে উঠল। গাগলের মতন অহোরাহর চিন্তার পরে বাড়ী মাথায় করতে লাগল। বন্ধীর চিন্তার কারারকীর কানে কোনকালেই মনুষ্য করে না, অথবা চিন্তাকে শান্তিহস্তের অপরূপে গদা যখন গালাগালি এবং চড়াটা চাণড়টাও খেয়ে বুকতে লাগল, চিন্তার কানে কানে ফল নেই, বরং উলটো বিপত্তি—ওখন সে একেবারে গুহ হয়ে উঠল। কথা কওয়া শিশু-বেওয়া, যা সে অভিব্যক্তির মাধ্যম শিখেছিল, তা কারাগারের বিরুদ্ধে সত্যগ্রহ করে ছেড়ে দিল। বাড়ীর কর্তাকে সে একটু বেশী ভালবাসত’ তাই তার গদার অহংগা পেলে কখনও কখনও সাড়া দিত, কিন্তু নানাবিধ অশ্লীলা ভাষায় তার কাজে অভিযোগ করত। কতীর মেজাজ ভাল থাকলে একে অধট্ট আরও করতেন—নইলে সেটা এ পর্যন্ত!—

গদাকে কোণঠাসা করে ফুলমণি মনে করেছিল তারই একাধিতা বৃষ্টি চিরদিন চলবে, কিন্তু একা ভোগ করব বলে যে মনের ভেতর ভোগ-বাসনার ক্ষীর-সরোবর তৈরী করে, ভাগ্যবিধাতা তারই ভাগিয়ার জোটাণি মর্যাদা।

—ফুলমণিও ভাগিয়ার জটিল—ভোলাল। ছোট মায়াময় বিলাহী কুকুরের ছানা! কুকু-কেউ-কেউ করে নানা বাড়ী না গুঁজে বেড়ায়! কিন্তু না, কোথায় পাবে? না হো সাধবে বাড়ী! কাজেই গদার ওপ জার মায়াময় আর চেয়ে—গর্ভাধারিণীর কথা সে ভুলতে চেষ্টা করল। ফুলমণিও সে তার খোকার সানী মনে করে, ফুল অস্টা নাড়িয়ে তার কাজে ছুটে ছুটে যেত। বালক সে, বর্ষদমজার কথা তখনও তার মনে রেখাপাত করত, তার উপর কটা ভাইবোনকে—ছেড়ে এসে, ফুলমণিকে দিয়েই সে সেই অর্চনটা দূর করবার চেষ্টা করত। কিন্তু—হিংসটে হায়ে মাসী—ফুলমণি তাকে আমানত’ দিতই না, উপরন্তু তারে অগদ বলাই মনে করে, মাঝে মাঝে ছ চারটে খাবারও দিয়ে দিত। ভোলাল মার খেত, যখন বড় আঘাত পেত তখন ডেউ ডেউ করে হেড়ে-যেত, কিন্তু পেয়ে উঠে যেন বাঘের মাসীর সঙ্গে—সর্গাঙ্গ হুগিরে মনুষ্যকানের মত মেলকলও বেকিয়ে একখানি খা

উকুর করে সাগের কপার মতন ক্যাংক্যাং শব্দ করে যে মৃতিতে ফুলমণি গাঁড়াত তা দেখে ভোলাল কে! লোড় গিরে গাণিয়ে যেত। ফুলমণির অচ্যাতার শব্দ করেই ভোলালের বিন কাটাতে হত বটে, কিন্তু—‘সাগের মাথার যেন ভেঁকে গ্রহর’! একে কুকুর তাই গায়ে সাগর-পারের রক্ত ছিল, মার খেয়ে, মূৰ ফুটে কিছু বলতে না পারলেও, মনে মনে সে পুরে রাখছিল—সব কথা।

দেখতে দেখতে কামাস পেটে গেল, কুকুর বেমন মালুম হয়ে উঠল, অমন ফুলমণি হল তার বিনপুটী। একে ত’ পূর্বেকার গ্রহরের কথা তার মনে গাঁপাই ছিল, তার উপর আরও এক দফা অজ্ঞানের আওন আকিয়ে বিয়েছিল—বাড়ীর লোকের পক্ষপাতিত্ব। গ্রাহরের সময় ভিদের পাতের আশেপাশে ফুলমণি লোহ’নেড়ে ‘মিউ’ ‘মিউ’ করে মোহাগ জানিয়ে ঘুরে বেড়াই, মাছ গুয়ের ভাগ পালে, আদর মোহাগ উপভোগ করবে, আর সে কিনা একেবারে অন্তঃস? আহার বা আদর পাওয়া দূরে থাক, পাতের জিম্মীমানার গেলে—‘দূর’—‘দূর’! কেন হবে বাপু! সে এমন কি অপরাধ করেছে যে সে হল অস্পৃশ্য—আর ফুলমণি কি-এমন পুণ্যবলে গোঁপাই ঠাকুর। ফুলমণি বরং চুরি করে মাছ হুখ খার, আর সে পাতের উচ্ছিন্ন ছামুড়ের বেশী প্রভাশা করে না, পক্ষপাতিত্ব দেখেও মূখ ভেঁকে থাকে উপরন্তু সারারাত—সে কানখাড়া করে বিনিজ-চক্রে বাড়ী পাহারা দেয়, আর ফুলমণি গোঁপাই ঠাকুর—কোমল শখ্যার শুয়ে বিবি আরামে নাক ডাকায়! বাঃ-বেরিচাঃ!

পশু-বৃত্তিতে ভোলাল এর সঠিক কারণ ঠিক ঠাউরে উঠতে না পেরে, ফুলমণির বিরুদ্ধে সে একেবারে মরিয়া হয়ে গাঁড়াল। রাগে পেলে—সে আর তাকে ছেড়ে কথা কইত না, বেশ একটু কানড় দিয়ে জানিয়ে দিত—সে সাত মনুষ্যের তের নষ্টার পরে ‘শ্রীমজাত’—সে এখানে ফুলমণির স্বপ্ন দেখতে আসে নি। নষ্টামিত ফুলমণিও কম নয়, কাছা পেলে—ত’ এক খাবা সেও বসিয়ে দিয়ে, একেবারে গাছের ডালের উপর উঠে, ভোলালকে জেঁচি কাটত—‘মিউ’—আবার যখন

বেরকদার পড়ত—তখন বাড়ীর লোকের কাছে চাঁৎকার করে নালিশ করত—মাও। বাড়ীর লোক ভোষণকে ছ'এক বা দ্বিগে ফুলমণিকে উদ্ধার করত। ভোষণ বার কতক লাগ নেড়ে বাগারটাকে হেসেই উড়িয়ে দিত।

একালম্বী হয়েও তিনটি গোণী একেবারে স্বতঃ ভাবে জীবন কাটাতে লাগল। সংসারের একদিকে গঙ্গার ট্যাঁ ট্যাঁ, ফুলমণির মিউ মিউ—আর ভোষণের বেউ বেউ, বাড়ীর যেমন একটা কোলাহলের সৃষ্টি করতে লাগল, অপর দিকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর লোকের আদর বেড়ে ওঠাটা পড়তে লাগল তেমনি। আগেকার মতন শিশুর আদর আর তাদের ভাগ্যে ভোটে না, তবে ওই মধ্যে যে বড়ই আদর আদার করে নিতে পারত। বীরে বীরে কালের গতি—তিনজকেই ঘরের দেওয়ালে-খাঁটা ছবির মতনই—করে ফুলল, বড় একটা কেউ আর তাদের পানচোর না, বাড়ীর আর পাঁচ জনের মতন তারাও খায় দায় থাকে।

এমনি ভাবেই দিন চলেতে লাগল। হঠাৎ একদিন দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে—বিস্ময়াগস্ত নাটকের শুরু হয়ে গেল। দরজা খোলা পেয়ে গঙ্গা মুক্তির আশায় নীচের ক'ণিগে পড়ল, চক্কের পলক ফেলবার আগেই ফুলমণি তার গলা কান্ধে ধরল। বাড়ীশুভ লোক দুটে এসে, ফুলমণিকে ধরে তার মুখ থেকে গলাকে উদ্ধার করল বটে, কিন্তু যে মুক্তির আশায় জীবন পণ করে ক'ণিগে পড়েছিল,—সে কি আর ফেরে? ছদ্মিমা থেকে চিরদিনের জন্ত মুক্তি নিয়ে গঙ্গা—জীব-জীবনের একটা ইবতরঙ্গীর পাশে চলে গেল। বাড়ীর লোকের মুখে 'হায়' 'হায়' শব্দ উঠল। বাড়ীর কতী রাগে চুপে আত্মহারা হয়ে ফুলমণিকে পুন একচেটি নাহলেন,

তারপর গলাকে হত্যা করার অপরাধে ফুলমণিকে বোরার ভিতর বন্ধ করে তাকে একেবারে নদীর অপর পারে কোন এক অজানা আদ্যমানে চির-নির্ধারিত করতে পাঠিয়ে দিলেন।

গঙ্গার শূন্য দাঁড় এবং 'আহারের সময় পাতের আশে-পাশে ফুলমণির স্তব্ধের অভাব বাড়ীর ছোট বড় সকলের মনেই একটা অস্বস্তির সাদা ভাগরু কেরে তুলে—ক'দিনের জন্তই বা সেই অহভব! সময়ের জোয়ারে নৃতনের রূপে কত গঙ্গা, কত ফুলমণির দায়ার রেখা টানে আসছে, আবার পুরাতনের মূর্তে ধ'রে তারা—ভাটার টানে ভেসে যাচ্ছে—সংসার নাট্যশালায় অন্ধকার ধবনিবার অন্তরালে।

সংসারের সংলব্ধ কোণালের মধ্যে গঙ্গার ট্যাঁ ট্যাঁ আর ফুলমণির 'মিউ' 'মিউ' ডাকও জমে বিশ্বস্তির অন্তঃকলনে তলিয়ে গেল। থাকুল কেবল একা ভোষণ! কিছ প্রতিদ্বন্দ্বী হারা হয়ে সেও যেন কেমন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। স্বাধীন জাত সে, স্বপ্নের নেশার ভিতর সে জীবনের যে 'মুক্তি' যে সম্বলতা এতদিন উপার্জন করে এসেছিল, একলা তিন-জনের প্রাণা সমস্ত উপলব্ধতা দ্বিগে কহতে পেয়েও সে মনে শান্তি পেল না। সেও আর বহুনের ভেতর থাকতে চাইল না। বাড়ীর লোক তার গঙ্গার শূন্য গুলে দিয়ে তাকে মুক্ত ক'রে দিল। খোলা পেয়ে ভোষণ অহোরাত্র গাভীর পাড়ায় দ্বন্দ্ব ক'রে বেড়াতে লাগল, কখন আসে কখন যায়—কেউ আর বড় একটা তার হিসাবও রাখত না। তারপর একদিন সেও আর কিহ্ন না। [বৃহল না বটে—কিন্তু রেখে গেল একটা গয়ের রেখা!]

নিপ্লনের বাতী

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

[জাপান-সম্বন্ধে দ্বারা বহুভাবে কয়েকটি গ্রন্থে বিবরণই ইচ্ছা ছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে প্রবাসী পত্রিকার ছাউ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। বাক্য কারণে অল্প সংকল্পনি শেষ করে উঠতে পারি নি—পুনরায় পূর্ণরূপে অকলম কুর বাতী গ্রন্থে ক'টি সমগ্রের মান্বে উপস্থিত করছি। জাপানকে ইতিহাসিকের চোখে দেখেছি—ভারতীয় ভাষায়ের সঙ্গে জাপানের যোগাযোগের উপর পাইককে দুটি আর্দ্রণ করবার ইচ্ছা। বর্তমান জাপানের জীবন চিত্র অঙ্কন করতে পারি নি—সে চেষ্টাও করি নি।]

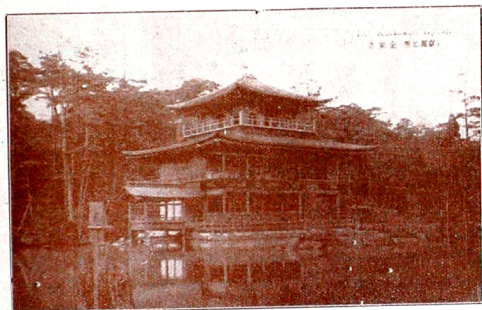
কালস্রোতের অদ্রুত নিয়মে অনেক দেশ তার অধিবাসীর দেওয়া ন'মে বাইরে পরিচিত নয়। তাই ভারতবর্ষ চীনদেশে 'ইন্ডু' ও জাপানে 'ইন্দো' আর চীন চীনাদের 'নিকট' 'চীন' নামে অভিহিত না হ'লেও বহির্জগতে এই নামেই পরিচিত। জাপানের জাপানী আখ্যা 'নিপ্লন' বা নিহোন্ কিন্তু বাইরের জগতে চীনেরা তা'কে যে নাম দিয়েছে সে সেই নামেই বিদিত। নিপ্লন শব্দের চীন উচ্চারণ 'জু-পেন'। জু-পেন ইউরোপীয় উচ্চারণে 'জাপান' এই রূপ নিয়েছে। নিপ্লন, নিহান, বা জু-পেন নামের সম্ভবত অর্থ প্রথম-স্থান, তাই জাপানকে বলা হয় 'উদীয়মান স্থানের দেশ'—তার প্রধান কারণ জাপানের পূর্বে অল্প দেশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জাপানদের কোন জ্ঞান ছিল না।

উপনিবেশগুলি বাদ দিলে বর্তমান জাপান বস্তুতে চারটি দ্বীপের সমষ্টি—উত্তরে হোক্কাইদো, দক্ষিণ ও পূর্বে কিয়োটো, শিকোকু ও মাঝখানে নিপ্লন। বস্তুতঃ এই নিপ্লনই হচ্ছে সত্যকার জাপান। জাপানের ইতিহাস, সভ্যতা, সভ্যতার জন্ম বিবরণ সমস্তই এই নিপ্লনের সঙ্গে জড়িত। নিপ্লনের আবার কেন্দ্রস্থানীয় প্রবেশ হল ইয়ামাতো,—ইয়ামাতো নিপ্লনের পূর্বেদক্ষিণ কোণে—নারা ও কিয়োতোর (Kyoto) গারিরিকে অবস্থিত দেশ।

নিপ্লন, কিয়োটো ও শিকোকু—এই তিন দ্বীপের মাঝখান দিয়ে সমুদ্রের একটি শাখা চীন সমুদ্র ও প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত করেছে। ইহাকে Inland Sea বা দ্বীপান্তরী সমুদ্র বলা হয়। এইটাই হ'ল জাপানের প্রবেশ পথ। এই সমুদ্রের প্রবেশ স্থান অপ্রশস্ত—উদাহারী বহু জরূপসমাবেশে

সুপ্রস্তুত। একদিকে জাপানের প্রধান বন্দর শিমোনোশিকি। শিমোনোশিকি জাপানের জলবাহিনীর কেন্দ্রস্থল (naval base), তাই এখানে সমুদ্রশাখার উত্তর তটদেশে কিনারা থেকে ওপর পর্যন্ত কামানশ্রেণী দ্বারা সজ্জিত। এই শিমোনোশিকি থেকেই জাপান সমস্ত চীন সমুদ্রের ওপর তার সর্ক দৃষ্টি বিস্তার করেছে—কোরিয়া ও অজান্ত উপনিবেশের ওপর প্রভুত্ব রক্ষা করবার জন্ত যে সামরিক সজ্জার প্রয়োজন তার বন্দোবস্তও এইখানেই রয়েছে। শিমোনোশিকি বোজক পার হয়ে দ্বীপান্তরী সমুদ্রে প্রবেশ করতে হয়। জাপানী কাগরী (pilot) বাতীত এই সমুদ্রে জাহাজ চালিত করতে পারে না। তাই শিমোনোশিকিতে প্রতি বিদেশী জাহাজকেই একজন জাপানী কাগরীর ব্যবস্থা করতে হয়।

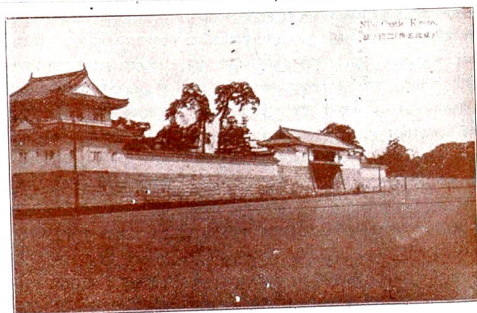
জাপানের এই দ্বীপান্তরী সমুদ্রের মোড়ার অল্প কোথাও তুলনা নেই। ইউরোপীয় বাতীর চোখে এ হচ্ছে 'ইটালীর ব্রহ্মসমুদ্র, বাটিক সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ ও নরওয়ের উপকূলভাগের সমন্বত শোভা।' বস্তুতঃ এই শোভা জাপানের প্রধান বাতীর চিত্তকে অদ্রুত আনন্দরূপে অভিধিক করে। এই সমুদ্র কোথাও বিশ পলিখি মাইলের বেশী প্রশস্ত নয়। কোন কোন স্থানে এত অল্প প্রশস্ত যে জাহানি জাহাজ কোনরূপে পানাপানি অগ্রসর হ'তে পারে। চটিকেই উপকূলভাগে নরনগোচর হয়। যেখানে সমুদ্র প্রশস্ত, সেখানে আবার অনেক ক্ষুদ্র দ্বীপও সমুদ্র মাধ্যমী পর্তুগড়ার সমাবেশে সমুদ্রের শোভা আরও সন্মানস্বকর হয়েছে। উপকূলভাগ কোথাও সমন্বত নয়—অল্প অল্প পর্তুগড়ার পরিবেষ্টিত—আর তার সাহায্যে থেকে ওপর পর্যন্ত স্তরে



কিন্‌কাবু-জি (কিয়োটো)
বা শ্রবর্মমর মন্দির।
জেন বা হ্যানী জাপানী
বৌদ্ধ মতাবলম্বীর একটি
প্রধান মন্দির—জাপানাকাল
১৮৬৭ খ্রি: অব:

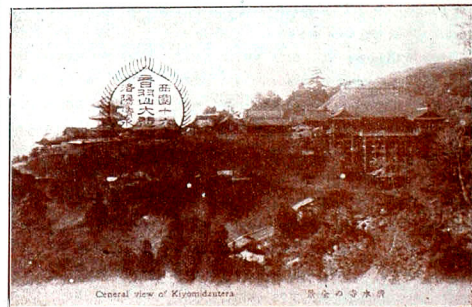


মাকি—ইয়ামা গার্ড
(কিয়োটো)
বগবোধের প্রথমে যখন চৈত্রী ফুল
ফোটে তখন বহু জাপানীরা
এখানে ভা' বেগুতে আসে।



নিগো জাদার (কিয়োটো)
শোগুন বা জাপানের
প্রধান মন্ত্রীসের আবাসস্থল।
জাপানাকাল—১৮৬৭ খ্রি: অব:

কিয়ো-মিজু-বোরা
(কিয়োটো)
কোমোডোরো বা অধ্যক্ষকিত্তবোধের
মন্দির—জাপানী-বৌদ্ধদের একটি
প্রধান স্থান।



General view of Kiyomidzadera

清水の寺の概観

রূপে পাইনের বন, কোথাও বা পাইন বনের ফোড়ে শতকেন্দ্র-সমূহ—বর্ষায় সেখানে সবুজ ধানের চেউ খেলে যায়। কোথাও বা সমুদ্রের কিনারা পথান্ত নানা ফলের সজ্জিত বাগিচা প্রকাণ্ডে আরও স্থলর করে তুলেছে। আর তীর স্রোতের কল্যাণনিতে যে প্রকৃতি অহরহ মুখর।

এই দীপাধর্যতী সমুদ্র জাপানী দীৱবদের প্রিয় স্থান। প্রাচীন জাপানী নৌকার বর্তমান কালের ময় সন্নিবিষ্ট করে তারা এই সমুদ্রে সতত বাতায়ত করে। কুবকও শত-সম্ভার নিয়ে—এ জাতীয় নৌকার অনাগরে পারাপার করে। জাপানীরা সাধারণতঃ খুব সাহসী নাবিক। তাই তা'রা এই সমুদ্রশাণার তীর যোতে ক্ষুদ্র দীপসমূহ ও সমুদ্রমাধ্যস্তী পর্যটকৃদ্ধা এড়িয়ে অবলীলাক্রমে পারাপার করতে পারে।

জাপানী চরিত্রে অস্বচ্ছন্দ, প্রাথমিকীয় গুণ আছে যা 'অস্বচ্ছন্দ'। জাপান যে স্বাধীন তা'তে আমরা অনেক সময় বিশ্বয় প্রকাশ করি—এবং সেই বিশ্বয় প্রকাশ করে আত্মরাখাও করে থাকি। কিন্তু জাপানীরা যে স্বাধীনতা অটুট রেখে নিজদের একটা বড় জাতিতে পরিণত করেছে তা'র পেছনে রয়েছে তাদের চরিত্রবল। যে কুবলই খা প্রায় অর্দ্ধ এশিয়াকে কবায়ত করতে পেরেছিলেন তিনিও জাপানের নিকট হার মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। জাপান-কয়ে প্রেরিত তাঁর নৌবাহিনী বার বার লাজন ভোগ করে ফিরে এসেছিল, এবং সেই নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রাপ্যত করে জাপানীরা যে বাধ্য প্রাণন করেছিল তা'র তুলনা হু'ল।

সমুদ্র পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র দীপে বাসের ভক্ত ও চরিত্রের অস্বচ্ছন্দ ভগ্নের ভক্ত জাপানীরা অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভ্রমসাহসী ও আত্মনির্ভরশীল। দেশ ক্ষুদ্র ও জন সংখ্যা দেশের পরিমাণের অল্পপাতে বেশী 'সেই তা'রা অত্যন্ত স্বাধবাসী। বাইরের থেকে, বিশেষতঃ চীনদেশ থেকে, তা'রা সম্ভারার অনেক বারা পেয়েছে—বা ফেঙ্কাং তু' নিয়েছে। —সে সম্ভার তাই কোনদিন তা'দের 'পাড়ে' চেষ্টা বসেন ও তা'দের জাতীয় জীবনের ক্ষয়িক্সে ব্যাহত করে নি। প্রয়োজনানুসারে সে সম্ভারতার ধারাও নিজদের সম্ভারতার অঙ্গীভূত করে নিয়েছে। ভারতীয় সম্ভারতার ধারাও জাপান প্রাথমিক চীন ও কোরিয়া থেকেই

পেয়েছিল—কিন্তু সে ধারাও জাতীয় জীবনের অঙ্গীভূত করে নিয়ে জাপানীরা নিজেদের সম্ভারতাকে পরিপুষ্ট করেছিল। ইউরোপীয় সম্ভারতা যখন জাপানের দরজায় পৌঁছায় তখনই জাপানী তা' গ্রহণ করে নি। সে সম্ভারতা প্রাথমিক্যে কিনা যে বিচার করেছে জাপানী তা' প্রয়োজনমত গ্রহণ করেছে—অঙ্কর মত তা'রা তা' গ্রহণ করে নি। ইউরোপের যে দেশের যে বৈশিষ্ট্য সেই দেশ থেকেই তা' নিয়েছে—কোন জাতি বিশেষ থেকে সমস্ত ইউরোপীয় ময় গ্রহণ করে নি।

তাই গত শতাব্দীর শেষ ভাগে জাপান যখন ইউরোপীয় সম্ভারতার বিশেষ বিশেষ ধারা গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করল তখন সে নানাদেশের লোক নিযুক্ত করে শিল্পার কাজ শুরু করল। দণ্ড-বিদ্যুৎ সংস্থার ও জাপানী সৈন্যকে যুদ্ধ-প্রাণালী শিল্পা 'দিবার নিমিত্ত ফরাঙ্গী নিযুক্ত হ'ল, রেলপথ, টেলিগ্রাফ ও লাইট হাউস নিৰ্মাণের কাজ ইত্যাদি, ডাক-বিভাগ, কৃষি-বিভাগ, উপনিবেশ স্থাপন ও প্রাথমিক শিল্পার ব্যবহার ভক্ত আমেরিকান, পাশ্চাত্য শিল্পকলা শিল্পার নিমিত্ত ইটালীর ভায়র ও চিত্রকর এবং প্রাদেশিক শাসন-সংস্থার ও জাপানী চিকিৎসক ও চৈন্যাদায়ক নৃচন প্রণালীতে শিক্ষিত করবার ভক্ত জর্মান বিদ্যোক্তেরা নিযুক্ত হ'ল। ইউরোপীয় সম্ভারতার ধারা কতকটা গ্রহণ করবার পর জাপান নানা দেশে নিজের লোক পাঠিয়ে শিক্ষিত করে আনল ও সমগ্র এশিয়ার মধ্যে নিজের প্রেই আসন গড়ে তুলল।

সেইভক্ত আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে জাপানের উন্নতির মূল্য রয়েছে জাপানীর চরিত্রবল। পাশ্চাত্যকে অস্বচ্ছন্দ করবার সুধার বশবর্তী হয়ে জাপানী তাদের স্বী' নির্মাণ করে চলেছে—আর তা'র পেছনে কোন দৃষ্টি ভিত্তি নেই—একথা মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত হ'বে। তাই জাপানের উপকূলে পৌঁছে যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায় সেখানেই জাপানী জাতির রচনা-কল্পিত পরিণত করা যায়।

জাপানের দুটি প্রধান বন্দর 'কোবে' ও 'ওসাকা' দীপাধর্যতী সমুদ্রের তীরেই অবস্থিত। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে 'কোবে' ছিল একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে জাপানের বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত করার সম্বন্ধে কোবে জনশ্রুতি একটি বড় শহর ও বন্দরে পরিণত হ'ল।

বর্তমানে কোবেতে প্রায় চার লক্ষ লোকের বাস। কোবে জাপানী বাণিজ্যের একটি বড় কেন্দ্র। খুব আধুনিক শহর বলেই জাপানের প্রাচীন ইতিহাসে কোবে'র কোন স্থান নেই—উল্লেখযোগ্য কোন বিশেষ প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শনও এখানে নেই। ওসাকা কোবে'র চেয়েও বড় শহর ও বন্দর। এখানে প্রায় বারো লক্ষ লোকের বাস। ওসাকা কোবে থেকে অল্পক্ষণকৃত প্রাচীন। এখানকার সব চেয়ে বিখ্যাত বৌদ্ধ-মন্দির—তেম্মোজি (Tennoji)। তেম্মোজির মন্দির স্থাপিত হয় প্রথম ৬০০ খৃষ্টাব্দে। বহুবার এই মন্দির অগ্নিতে দগ্ধ হয় ও বহুবার এ'র সংস্কার করা হয়।

ওসাকা থেকে কিয়োটো যেতে রেলপথে প্রায় এক ঘণ্টা লাগে। কিয়োটো জাপানের সব চেয়ে প্রাচীন নগর। ১৭৪ থেকে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কিয়োটোই জাপানের রাজধানী ছিল। জাপানের সব চেয়ে প্রাচীন রাজধানী অবশ্য নারা। ৭১০ থেকে ৭৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নারা

জাপানের রাজধানী ছিল—পরে নারা পরিত্যক্ত হয় ও কিয়োটো নারার স্থান অধিকার করে।

কিয়োটোর প্রাচীন নাম হেইয়ান-জো। হেইয়ান শব্দের অর্থ হচ্ছে 'শান্তি'। কিয়োটোর ইতিহাসে ৮০০ থেকে ১১৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৪০০ বৎসরই হ'চ্ছে শ্রমণীয় যুগ। জাপানী সাহিত্য, শিল্প ও কলাবিদ্যার একেই classical যুগ বলা হয়। জাপানের সম্ভারতার ইতিহাসে কিয়োটোর স্থান নির্ধারণ করবার পূর্বে বর্তমান কিয়োটোর কিছু পরিণত দেওয়া অবশ্যক।

যু' প্রাচীন স্থান বলে আধুনিক শহর হিসাবে কিয়োটো নগর—এমন কথা মনে করবার কোন কারণ নেই। জাপানের সকল প্রধান স্থান থেকে রেলপথেই কিয়োটো পৌঁছান যায়। ঊষ্ম, বৈজ্ঞানিক অশো, কলের জল, প্রকৃতি আধুনিকতার সমস্ত নিদর্শনই কিয়োটোতে আছে। এখানে বিশেষীর ভক্ত যেমন জাপানী সরাই আছে তেমনই ইউরোপীয় প্রথাও চলিত (with modern comforts) কতকগুলি হোটেলও আছে।

আপনাদের পছন্দ ও ডিজাইন অনুযায়ী সকল রকমের স্বদেশী রেশমে প্রস্তুত

শুভাহুতানের প্রয়োজনীয় ও প্রিয়জনদের

উপহার উপযোগী

বেনারসী সাদী ও জ্যাকেট

একবার আমরাই প্রস্তুত করা থাকি

এবং আধুনিক রংয়ের ও নানা ফ্যাশনের

তসর, গরদ, মটকা, খদ্দর ও সিল্কের চাদর

প্রকৃতি আমাদের কারখানায় প্রস্তুত হয়।

ভূদেব উইভিং ক্যান্ট্রী

সো-রুম :
পোল্লিয়া
বেনারস মিটি।

কারখানা :
"অসিয়ার"
বেনারস মিটি।

পূনার
নূর
ডিজাইন।

কাটাপনের
অন্ত পর
দিপুর।

বাড়িতে সে-সময় পরিতোষ ছিল না, ছেলোটাই জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল : বাবা এখনো ফেরে নি।

অতএব, রণজিৎ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করাই থির করলে। সাতটি বছর সময়ের সমুদ্রে সাতটি বুধ্বুধ হ'তে পারে, কিন্তু মাহুদের জীবন-কাব্যে তা' সাতটি স্থবীর্ণ অধ্যায়। রণজিৎ মনে মনে ভেবে দেখলে, এই সাত বছরে পৃথিবীর আকাশে কত গ্রহ-তারার মত হঠাৎ, তার খবর জ্যোতিঃশাস্ত্রে হয় তো লেখা হয় নি; মাহুদের জীবনের পথ থেকে কত পদচিহ্ন মিলিয়ে গেল, তারই বোঝা বাকি থেকেছে? পরিতোষ তার বালাবন্ধ, তাকে সে হয় তো আজো চিনতে পারবে, কিন্তু তার স্ত্রী ও সন্তানের কাছে রণজিৎ আগছক ছাড়া আর কে?

অতএব, রাস্তার কিছুক্ষণ পাগড়ারি করা দাঙ্—পরিতোষ বাড়ী না-কোয়া পর্যন্ত।

বাড়ীটি ছোটখাট, উচু ফ্লোরের ওপর থান কয়েক একতলা ঘর। পুথিবিকের ছ'খানা কোঠা, পশ্চিমের ঘর ছ'খানার খাপরার ছাউনি। কোঠা ঘরের কোণে-কোণে একছালি দামান, চট টাঙিয়ে রাস্তার দিক থেকে আব্রু রক্ষা করা হয়েছে। বাড়ীখানির সীমানা নির্দেশ করতে পুরাণো উঁটের পাঁচিল। ভেতরের সজীর্ণ মেটে উঠানের একপাশে একটা ইঁদারা। তারি ধারে থরার রঙের একটি ছাগলা বাঁধ। পরিতোষ তা' হ'লে দিবা সংসারী বনে' গেছে—বেশ শুভ্রহোনা! এতদিনে পরিতোষের ভূঁড়ির স্তর-নেমেছে নিশ্চয়ই!

বিরনের পরমাণু এখনো ফুরিয়ে নি, কিন্তু পশ্চিমের এই ছোট শহরে এরি মধ্যে সন্ধ্যা নেমেছে। সন্ধ্যা ঠিক বলা চলে না,—দুপুর একটি অস্পষ্টতা শুধু। আশ-পাশের খাপরার ঘরগুলো থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠে' আবেগওগাৎক আবিষ্কৃত হয়ে তুলেছে। রণজিৎ ভাবলে, অশুভ্য, কলকাতা

নয়, তবু এই শহরের পাণ্ডুর আকাশে এইটুকু বর্ষাট্টা নেই! অগ্রশত রাস্তার এরি মধ্যে হিন্দুস্থানিদের ভটসাল কমে' এয়েছে। রাস্তার বাকি সরকারী ইঁদারা থেকে একটি পশ্চিমা-মৌ জল তুলছিল, আর-মাঝে মাঝে রাস্তার বিকে তাকিয়ে ডাকছিল, এ জানকিরা, জানকিরা রে—

আবছা সন্ধ্যার ওই ডাকটুকু যেন শুকুতার জ্বল্‌লন। গৃহস্থ-লোকেরা এই শুকুতাকে বল্‌বে,—শান্তি। কিন্তু রণজিৎ মনে মনে বললে—নিজীবতা। যে-জীবনে কলরব ফেনিয়ে ওঠে না, সে-জীবনের মৃত্যু হয়েছে ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে!

জীবন-সম্বন্ধে রণজিৎয়ের ব্যাখ্যা এই—।

সন্ধ্যার এই পাণ্ডুর আশ্রয়ে ওর মন আসে বিমিত্তে, পাথরের মতো ভারী এই শুকুতা ওর কর্তব্যবশে! তবু, অজ্ঞ ব'লে একটুখানি জিরিয়ে নেওয়া দরকার—দীর্ঘ পথসংসারের পর কিছুক্ষণের বিশ্রাম।

অপেক্ষা অবিরত বৈশীক করতে হ'ল না। আশঘট্যীয় মনোহী পরিতোষ কিরল। আবছা অন্ধকারে একটি প্রশ্ন শোনা গেল : কে? রণজিৎ না?

পরিতোষ! কয়েক সেকেন্ডের জন্তে পরিতোষ বিমুগ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে বৈল। তারপর বিশ্বয়ে আনন্দে একবারে চাঁৎকার করে' উঠল : রণজিৎ, তুই! এতকাল পরে! আকাশ থেকে পড়লি নাকি?

মেটেই না। দস্তর মতো বেগ-কোপানীকে ভাঙা দিয়ে এসেছি।

বাইরে কেন?

এবার রণজিৎ হাসলে : ট্রেসপাগ-চান্সের ভয়ে।

পরিতোষ 'ওকে জড়িয়ে ধ'রে ভেতরের নিয়ে গেল।

কোঠা ঘর ছ'খানির একটিতে বৈঠকখানা বস, বা ড্রমিং রুম

ত্রিপ্রণব রায়

বল,—পরিতোষের এটি নিজস্ব। ছোট ঘরখানি পরিচ্ছন্ন। মাঝখানে হালকা একখানা বেতের টেবিল পড়ছে, ছ'পাশে ছ'খানা বেতের চেয়ার। একদায়ে নীচু একখানা চারপাই—সাধা বন্ধরের চারদিক বিছানো। স্বয়ংঘের বারান্দার মাটির টবে কয়েকটি রজনীগন্ধার চারা। (ফুলের সখ পরিতোষের এখনো বাধ নি।)

টেবিলের ওপর তেলের শাশ্প অজ্বলি। দীর্ঘ সাত বছর বাদে পুরাণো ছই বন্ধ আবার মুখোমুখি ছই চেয়ারে বসলো। রণজিৎ দেখলে, পরিতোষকে গৃহবাসী বললে সত্যিই মানায়। ভূঁড়ির স্তর না-নায়েলও দেহে ওর দেহ-বাছসা ঘটেছে বৈ কি। মাধ্যম কারবারী-জনহুলভ অনতি-প্রশস্ত একটা টাক, ছই চোখে নিশ্চিততা ও প্রগাঢ় আলস্ত এবং পরিপূর্ণ মুখে পরিতৃপ্তি।

পরিতোষ দেখলে, রণজিৎ আগের চেয়ে আরেকটু রোগা হয়েছেন,—দীর্ঘতায় একটু বেড়েছে বলসই হয়তো রোগা দেখতে। রোদে-পোড়া গায়ের রঙ হয়েছে আরেকটু তামাটে এবং নাকটা আরো খানিক তীক্ষ্ণ। এ' ছাড়া ওর চেয়ারার সংস্কারে আর কোনো পরিবর্তন হয় নি। চুল তেমনি রুক্ষ, চোখ হ'লেটা হেলনি প্রথর।

এতদিন কোথা' ছিলি রণজি?

তার চেয়ে কোথা' ছিলুম না, তাইই জিগ্যাস ক'বু।

—কানী, এলাহাবাদ, কল্‌কাতা, রাজপুতানা, পেশোয়ার—পানু, পানু,—পরিতোষ বাবা বলে—মাথা ঘুরে উঠেছে! তোর বাউণ্ডলে শবাব আজো বাধ নি দেখি! খানোকা এক ঘুরে বেড়াই কেন বল্‌ তো? জীবনটা কি ই, আই, আর—এর গুস্তো না? ইজিন-ড্রাইভার হ'য়েই তোর জন্মালো উচিত ছিল।—

হা-হা ক'রে পরিতোষ হেসে উঠল। ভোগ্যারের জল-ক্ষারির মতো হাসি।

রণজিৎ বললে, তাই বটে। তবে আমার জীবনের ধারে প্রাটফর্ম' বাধা আর হ'য়ে উঠল না। আমার জন্ম-লগ্নে বোধ করি একটা ঘূর্ণী-বজ্র উঠেছিল, তার' তড়ায় এখনো ঘুরে' বেড়াচ্ছি। তুই কিয় টাক' ও ভূঁড়ি-সম্মত দিবা সংসারী ব'লে গোচি! বিয়ে করেচিস ক'দিন?

বছর পাঁচেক। চাকরি আর বৌ একসঙ্গে পেলাম। বাই বলিস্ ভাই, ঘর আর ঘরগীকে বার দিলে আমাদের দশ টিক কাটা ভূঁড়ির মতো।

পুণ্যম নরক থেকে জাগ করতে এসেছেন ক'জন?

ছ'জন।

পরিতোষ সহসা ব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। চট-যেরা স্থানটিকে উদ্দেশ্য ক'রে বললে, জগো, শুনিচ, রণজিৎ এসেছে—

চা-টা কই দিলে না এখনো? ওরে অ'লেটুয়ার মা—

পরিতোষের চাঞ্চল্য দেখে রণজিৎ হেসে ফেললো।

বললে, বোসো বন্ধ, বোসো। তোমার নিরুদ্বেগ ভূঁড়িকে খানোকা উত্তিম্ব কোতো না। থরের কর্তব্য ঘরগী ভালো বুঝবেন'না—

একটু পরেই বড় খোঁকা খাবারের রেকাবি হাতে ক'রে যবে এস, তারি পেছনে পেছনে ছ'কাপ চা নিয়ে পরিতোষের বৌ। স্বহ লোহারো চেহারা, জামবর্ণি, বিন্ধ্যকান্তি ত্রিভাবতী। বাংলাদেশের মাটি বা অপরাহ্নের আকাশের সবে-ওর তুলনা করা যেতে পারে। শাটীর চওড়া লাল পাঁড়টি ললাটের ওপর অবধি টানা, হাতের ছ'পাছি চুড়ীতে শ্যাম্পের আশোর বিকিমিক।

পরিতোষ বললে, এ আমার ছেলেবেলার বন্ধ রণজি।

আর'ই না?

চারের কাপজটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে পরিতোষের বৌ ছোট্ট একটি নমস্কার জানালে। রণজিৎ অস্ত্রিবাদনের ভকীতে খাভ ভেজে বললে, বুঝিচি।

বিশ্বস্তির চেয়ে বিশ্বয়কর স্বভি। নৈলে মাহুদের জীবনে এত আকাঙ্ক্ষিকের আবির্ভাব কেন? পথ-জটিল এই পৃথিবীর জনতায় অকস্মাত্‌ য়ে হারিয়ে যায়, তার' সঙ্গে ফের লেখাও হয় ভেতমনি অকস্মাত্‌।

*পরিতোষ তখন বল্‌লে, ছেলেবেলার রণজিৎ বোঝিয়ের পাঁচিল টপ্‌কে একবার পালিয়েছিল—রাপুস থেকে বোঝাই। পাশোনা-শবাব রণজিৎ আজো পেগো না, যর ওর আজো বাঁধে নি।—ওকি, চললে যে ক'খা? আসে, রণজিৎ যে আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট! লজ্জা-টজ্জা আমি গছন্দ করি নে—বুঝলে—

অনেক রাতে ও শিশু,

*** আর হুপের বাগানের পর বাবার হৃদয়ে কাল থেকে আমার গাভী থেকে বেরেনা বন্ধ। অস্বাভাবিক—আমি বেশির মুক্তি চাই। কিন্তু শাসন ও শক্তি বীরের মধ্যে এমনি করে? আচ্ছাচ্ছাচ্ছা হ'তে আমি পারব না। ঘর থেকে এবার আমি সত্যি বাইরে পা' বেব। এবার আকাশের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় হোক। উঁকু ফড়, তবুতো বুক জ্বরে' নিখোশ নিয়ে বাঁচব। সজি গা, হোমোবো 'প্রতিষ্ঠান'-এর কাছে আনাথ টেনে নাও। তুমি একবার এসো। ***

কিন্তু রণজিতের আসা আর হয় নি।—

'নে-ডে' উপলক্ষে এক শ্রমজীবী-সভার বক্তৃতা দেওয়ার আহ্বায়েও রণজিত প্রেরণা হয়। তা' ছাড়া ওর ঘর থানা-হাঙ্গাম করে' ময়োর শাল আতঙ্কিতিক শ্রমিক-সংস্থের থানকরেক গুপ্ত-চিহ্নিত নাকি পাগড়া গিঁথেছিল।

বিচারে রণজিতের সেড বছর সশ্রম কারাদণ্ড হ'য়ে গেল।

তারপর, দীর্ঘ সাত বছরের জেদে পৃথিবীর জনতার আমাদের নায়ক-নায়িকাকে আবার আমরা হারানু—।

জানুশ দিয়ে 'তাকালেই চোখে পড়ে ঘুরের বেরণ-সাইন, বিচ্ছিন্ন কয়েকটি মাগগাভী আর কয়েক টুকরো অক্ষর-ফেট। বিচ্ছিন্ন সহরের গুরুটাই বা-একটু ফাঁকা, নীল আর সবুজের ইসারা।' বৈশে একিকে ঘন বসতি আর নিরুপেষে নিখিল জীবন-যাত্রার সেই একতালি ছন্দ।

শূন্যে শূন্যে রণজিত জানুশ দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল। ঘরে এল কৃষ্ণা। বস্তুতাত্মক আগে পরিতোষ 'মাইকা-ফ্যাক্টরীতে বেরিয়েছে। তারপর গৃহস্থালীর পাট সারতে কলুর আঁরা কিছুক্ষণ যায়। রাত্রা-বারা ও নিজেই করে। সেতার বা বাসন মাকে, আর ঘরের কাজে যোগাড় দেয়। হুপের আগে নিরিবিলি অবসর কৃষ্ণার বড়-একটা মেলে না।

ঘরে এসে কৃষ্ণা হেসে বসলে, রেশ-সাইন দেখে মন আবার উড়ু-উড়ু করতে বৃষ্টি।

কৃষ্ণার সাড়া পেয়ে রণজিত উঠে বসল। বসলে, জানোই তো, ডিরকলে বাউতুলে পোক, ফাঁকা আকাশ দেখেই ডানা চকল হয়ে গুটে। বাঁচাটাকে আঙো বলাচ করতে পারলুম না—।

বাঁচটার একবারে বনে' পড়ে কৃষ্ণা বসলে, আচ্ছা রজি-না যুগলে তো অনেক—নতুন কত-কি দেখেছে; কই তার গর শোনালে না?

নতুন? নতুন কিছুই তো চোখে পড়ে নি! রেখলুং, মায়েরে হুথ আঙো ঘুল না; ছোট ঘরের মধ্যে সে নিকটক নির্দাসন দিয়ে রেখেছে, মুক্তি তার আঙো হ'ল না।

—পৃথিবী একটুও বদলায় নি কৃষ্ণা।—তবে বাঁ, তুমি কিছ আপাশোড়া বদলেচ, একবারে পুরোপুরি গিনিমামি! নাকে নথ পরো নি কেন? পরিতোষের রুচি বৃষ্টি এখনো আবৃত্তিক?

অজ একটু হেসে কৃষ্ণা সজ্জিত মুখে বসলে, ঠাটা হড়ে বৃষ্টি?

ঠাটা!—সোজা হয়ে বসে' রণজিত বসলে, গৃহদুর্ধপাশন, পতিভক্তি, সম্ভানশালন—এতগুলি সদগুণের অবিকারিণী হয়েচ দেখে, তেঁরার সাধুবার আনন্ডিক রক্ষা। কা'র মাগি আজ বিশ্বাস করে যে, একদিন হুপের-রোসে বেথুন-কসেজের স্রুপে ধাঁড়িয়ে তুমি অমন কোলস্কারিটা করেছিলে; মায়েরে বৃহত্তর মুক্তির জেদে একদিন 'গৃহদুর্ধপ-প্রতিষ্ঠান'ের স্বয়ং দেখেছিলে; আকাশের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় করবে বনে' একদিন বাপের বিরুদ্ধে—

এবার কৃষ্ণা হাসলে না। শান্তকণ্ঠে বসলে, ঠাটা তুমি ক'রবে তা' জানি; কিন্তু আজকের এই জীবনের জেদে আমার এতটুকু কোঁচ নেই, ছুগু নেই। পরের বীধন-খোলায় ভেবে পরের জেদে বীধন স্বীকার করাটাই বড় কথা,—মুক্তি মানে মুক্ততা নয়। তুমি আশ্রয় হাছ বাটে, কিন্তু এ নিয়ে আজ আর তোমার কত কণ্ঠে বেব না?—বল্লে গেছি ব'লেই আমি বেঁচে গেছি রজি-না—

বল্লে বস্তুতে কৃষ্ণার স্বর গাঢ় হয়ে এল।

ধান-আহার সেরেই কৃষ্ণা এগেছিল। আখ-অবগুণের নীচে ভিজা কালো ছেলের মাথখানে শিঁড়রের রেখা, মন্থন কপালে ছোট একটা টিপ। চোখে মুখে নিবিড় ও নিশ্চিত আত্মতৃপ্তির প্রসন্নতা। কৃষ্ণার জীবনে আজ উজ্জ্বলস নেই; গ্রাম্য নদীর মতো স্থির সংঘত একটি মহরতা এগেছে,—তাই তীর-বদনের মধ্যে সে পরিপূর্ণ।

রণজিতের মনে ছিল, তার সম্ভ্রান্তিত আশ্রয় আজ পুত্র হয়ে গেছে; আকাশ-বিস্তারি ভবিষ্যৎ হ'ল পুশিমাং! এত বড়কতি ও সইবে কেমন করে? অকস্মাৎ অত্যন্ত অস্থির-কণ্ঠে রণজিত বলতে লাগল, এ তোমার সূত্ৰা কৃষ্ণা—এই নির্দিষ্ট ছোট ঘরের মধ্যে একটি একটি করে' দিন-রাত্রির কাটানো—এ তোমার আত্মহত্যা!—

হুথ হেসে কৃষ্ণা বসলে, ও-সব তুমি বুঝবে না রজি-না। তুমি আঙো ঠিক তেমনইই আছ কিনা,—একটুও বদলাও নি! আচ্ছা, তোমার বয়স কত হ'ল বস'তো? আমার চেয়ে তুমি আট বছরের বড়, না?

মনে মনে হিসাব করে' কৃষ্ণা ফের বসলে, ছত্রিশ। এত-গুলো বছর তো শুধু ঘুরেই কাটালে! ঘর-মসার তুমি কোনোকালে করবে না জামি,—কিন্তু কিছুদিন নিরিবিলি জিরাবার ইচ্ছে কি কখনো হয় না তোমার? হয় ঐ কি। কত হোটোলে, সরাইখানায়—তা' বল্ছি নে। কাজের তাড়া আর ছুটোছুটি থামিয়ে, জীবনটাকে ছুটি দিতে ইচ্ছে করে না?

ছাত্র কথা ভাববার অবকাশই এতদিন পাইনি। আমার আছে জনতা-পণ। গতি ভাঙে বু'লেই তো বেঁচে আছি, নৈশে, স্থির হ'লেই স্থাবর।

তর্ক তোমার সঙ্গে আজ করবই না,—যাক্ গে, ছেলেকে আমার দ্বন্দ্ব পাওয়ার সময় হ'ল।

বলে' কৃষ্ণা উঠল। সেটুয়ার মা ছাগল-দুধ গরম করে' এনেছিল। পাশের ঘর থেকে ছোট থোকাকে এনে কৃষ্ণা মেকের ওপর বসল দুধ খাওয়াতে। ছই চোখে সুকোমল মেয়ে নিয়ে বলতে লাগল, বড় থোকার নাম রেখেছি প্রভায়, আর এর—প্রভায়ে। আমার ছেলেরা হয়তো বড় হ'লে দেশের 'লীডার' হবে,—জাতির নেতা। কিন্তু একখানি করে'

ঘর বেনে পার—সকালেসা। আলো জেলে বেথানে জিরাতে পারবে। 'আর বেনে পার থাকে, বার মুখোমুখি বসে'—কই, তুমি শুনচ না রজি-না?

দূরে শাখা-সাইনের একখানা ট্রেন এইমাত্র 'পাস' করে' গেছে, সর্পিলা ধুরেখাটুকু মিলিয়ে বাহনি এখনো। পাশা-পাশি ছুটি বুনা পাখী আকাশে পাখার পাল তুলে' ভেসে চলেছে। জানুশ দিয়ে রণজিত এই-সব দেখছিল, মুখ না-ফিরিয়ে অসমন্বয়ের মতো জবাব দিলে, হ' শুনিছ।

ছাই শুনচ। কি ভাবচ বল' দিকি? এবার মুখ ফিরিয়ে রণজিত বসলে, ভাবচি, আমাকে এসব কথা শুনিবে লাভ কি? আমাকে দলে ভিড়তে পারবে না কৃষ্ণা।

হেসে কৃষ্ণা বসলে, ও, মনেই থাকে না যে তুমি স্মিগী মাহুথ, আমাদের স্তম্ভ অধম গৃহী নও। কিন্তু ছেড়ে তোমার এত সহজে দিকিনে, কিছুদিন আমাদের এখানে থেকে যেতে হবে, বুঝলে?

দ্বন্দ্ব থাওয়ান হ'য়ে গিয়েছিল। ছেলেকে কেসে করে' কৃষ্ণা উঠে চলে' গেল। বেরা পড়ে' আন্টে, অনেক কাজ এখন বাকী। সেটুয়ার মা উঠেনে ঝাঁকি দিচ্ছে। বাইরের পানে তাকিয়ে রণজিত ভাবতে লাগল; কয়েকটি দিনের বিশ্রাম! তারপর আবার বিচিত্র জনতা, বিস্তৃ পথ, ক্রুদ্র সৌর—

একদল মেঘ নেপথ্য থেকে নিভন্ত অমমনে আকাশের নাটমকে ঢুক' পড়েছে। হুপের থেকেই ওরা আসার মাং করে' রেখেছিল, সন্ধ্যার পর ওদের উৎসাহ অনেকটা কমে এসেছে।—

ঘরের মধ্যে ছোটগাট একটি মজলিশ গড়ে' উঠেছে। বাইরে এখনো বৃষ্টির খিরখির আর বাতাসের স্নেহগ। এই অকাল-বর্ষায় ঘরের মধ্যে জৈব-সন্ধ্যার একটি নিবিড়তা ঘনিয়ে এসেছে।

টেবিলটি ঘিরে' বেতের চেয়ারে থরিতোষ। স্বমুখ

নিঃশব্দিত চারের কাপ,—মোট একটা বর্ষা চুকট খরিয়েছে।
পাশে মেকের ওপর বসে' কৃষ্ণা; শিখিল আলোকে একটা গাল
দিয়েছে চেয়ারের গায়ে হেলিয়ে। এই মেঘ-স্তিমিত সন্ধ্যার
ওরা পরস্পরের চমৎকার একটি সান্নিধ্য অম্লভব করছে।

ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত রণজিৎ পাটচারি'র করে
বেড়াচ্ছিল। বললে, কলকাতার থাকতে এমন রঙির রাজ্যে
পোতা-বাস্—এ করে' এন্সল্যান্ডে যুঁহে আস্চুম। এদিকে
চৌরঙ্গীর আলো, আর ওদিকে অন্ধকার মাঠ। অম্লভ
লাগত! এখানে একটা পাহাড়ী নদী আছে না
পরিভোব? চল, নদীর ধারে খানিকটা বেড়িয়ে আসা যাক।
পরিভোব নিশ্চিত আরামে চুকট টানছিল। বললে,
ক্ষেপেছিস? নদী এখান থেকে পাকা বেড় ক্রেশের পথ।
এই বর্ষায় আর অন্ধকারে কেউ বাইরে পা দেবে?

রণজিৎ বললে, তিন ক্রোশ হ'লেই আক্ষতি কি? পথ
তো চলবার জন্মেই হয়েছে। আর অন্ধকার? আজকের
রাতি অন্ধকার না-হ'লে কি মানাত? সবাই তাকমল দেখে
জোৎস্না-রাত্রি; আমি দেখেছিলুম অমাবস্যা।

খামোকা বেড় ক্রেশ পথ ভেঙে এমন সন্ধ্যাটা মাটি
করে' লাভ কি? ঘর থাকতে বাই-ভেঙার সব কেন
তোরা? তা'র চেয়ে বর্ষার কবিতা পড়ি, পোন!

পরিভোব 'চরনিকা' খান টেনে নিলে।
কৃষ্ণা বললে, তার চেয়ে গল্প করি এ, রঞ্জি-দা।

তার চেয়ে চল', তিনজনই নদীর ধারে বেড়িয়ে আসি।
পশ্চিমের এই শহরে থেকেও কাল মাঠ আর খোলা
হাওয়ার বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে না। এই ঘরের মধ্যে
তোনার কি পেনে বস' তো?

কৃষ্ণা বললে, শান্তি আর তৃপ্তি।

চুকটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে পরিভোব হেসে বললে,
আরো সোজা করে' বলি: কৃষ্ণা আর কৃষ্ণা পেয়েছি।—
এতবড় ছনিয়ার পথ তো আছেই ভাই, তা' ব'লে এমন
বর্ষার সন্ধ্যা ঘরে বসে' কবিতা পড়ব না?

কিন্তু রণজিৎ আর বর সইতে না। অন্ধকারে ও
যেন সেই প্রমত্তবানো পাহাড়ী নদীর কলরোল শুনতে
পাচ্ছে!

পড়' তোমরা কবিতা, আমি ততক্ষণ নদীর সঙ্গে একটু
আলাপ করে' আসি—

পেছন থেকে পরিভোব হেঁকে বললে, নিষ্টি এখানে
পড়তে যে! বর্ষাভিতা—

রণজিৎ তখন রাস্তার পা দিয়েছে। সমস্ত স্তম্ভ শহরটি
এখন পাখীর মতো বৃথ যুগ্ম পড়ে আছে। অন্ধকার সড়ক
ধরে রণজিৎ চলল—। বেতের চেয়ারে বসে' তাল্পের আলোয়
পরিভোব হযতো এখন কবিতা পড়ছে। পারের কাছে বসে'
কৃষ্ণা—একটি গাল তেমনি আলম্রময় ভদ্রিমায় পরিভোবের
জাহ্নতে হেলিয়ে। কিন্তু রণজিৎের তা'কে কি আসে যায়?
তুচ্ছ গৃহবিলাসকে কোনোদিন ও প্রশ্রয় দেবে না।

রণজিৎ এগিয়ে চলল—।

*** সেই কৃষ্ণা! গৃহবন্দনকে একদিন ও জীবনে
স্বীকার করবে না ব'লেছিল; কিন্তু আজ একখানা ঘরের
মধ্যে বৃহৎ পৃথিবীকে কত ছোট করে' ফেলছে! অথচ
আজকের জীবন নিয়ে ওর গর্গরবোনের আর সীমা নেই।
কৃষ্ণা এক সময় সমগ্র মানবজাতির আত্মীয়তা কামনা
করেছিল, আজ একের বাহুবন্দনে বহুকে ও ভুলে' গেছে!
—অবিশ্রিত তাতে রণজিৎের, আক্ষেপের কোনোই কারণ
নেই। কলক ওরা ব্রহ্মণে ঘরের কোণে বসে' ও হস্ত;
রণজিৎ এই কালো আকাশে পাখা মেলে দিয়েছে। এ গুণ
অহংকার! সারারাত্রি আজ ও অন্ধকার নদীতীরে কাটিয়ে
দিয়ে গিয়ে—

কিন্তু মাইলখানেক ও পার হয় নি, রণজিৎ তখন
উটোপাথর ধরেছে।

অনেক রাত্রে যখন ছিন্নমেঘ-আকাশে ভাঙা চাঁদের
ইসারা জগেগে,—তামটে আলোয় সমস্ত শহরটি আঁছা
ছবির মতো দেখাচ্ছে, তখন রুদ্ধতার একটি ঘরের ভেতর
থেকে কোনো বাচ্ছিল:

‘ওকি, এই হৃদয়ে শাড়ীটা পরেচ কেন? ওই নীল-টা
পারো। দেহুচ না আজকের রাত কেনম ঠাণ্ডা! খোঁপা
থুলে দাও কৃষ্ণা, গিটমর এলোচুল ছড়িয়ে পড়ুক—!’

‘ইস, আমার অত কবিত্ব আগে নি!’
‘সরে’ এস, খোঁপাটা আমিই থুলে দিই।’

(চুপচাপ)

‘আলোটা নিবিয়ে দাও না, ঘরে চাঁদের আলো
আহুক—!’

‘আর একটু জলু' বাতিটা, সেই কবিতাটা পড়ি কেনম?’
সেই—

‘হুটি শ্রাণীর মজলশই আর
সবার চেয়ে ভালো—’

‘তা'র চেয়ে ছুঁজনে পাশাপাশি বসে' থাকতে বেশ
লাগে। আলো নিবিয়ে দিই, জানলা দিয়ে থোকাদের
বৃহৎ মুখে চাঁদের আলো পড়ুক—তোমার মুখেও।’

(বিকল্পক নিঃশব্দতা)

‘আজকে খালি মনে হচ্ছে, এত পরিপূর্ণতার মাঝে' মরেও
সুখ! তোমায় পেলাম, কাকাদের পেলাম, মনের মতো
একটি সংসার—জীবনে আর কি চাইবার আছে? এখন
বসি এমনি করে' তোমার কাঁধে মাথা রেখে মরে যাই, তবে
একটুও ভয় হবে না—!’

‘আমার চোখে জল এনা-দেখলে বুঝি গুণী হয়ে না
কৃষ্ণা?’

‘গতি, আজ ভারি কীদন্ত ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু। এমন
রাত্রে তুমি আজ আমার পাশে; অগত পৃথিবীতে আরো
কত লোক তো রয়েছে,—মাঠা জীবনে যা'রা মনের দোষের
পেল না, যা'রা—’

ভানলার নীচ থেকে কোরের মতো চুপিচুপি যে সরে'
গেল, সে ব্রহ্মজিৎ। এতক্ষণ সে নিশাঙ্কে ওখানে গাড়িয়েছিল।
ওর চোখে আজ ঘুম আসছে না। মেটে উঠোন-টুকুতে একা
পাহাড়ির স্কট এসেছিল।

মনের কোথায় যেন কীটা বিদেছে,—একটি অগোচর
অবশি! নিজের মনের সঙ্গে রণজিৎের বছরার মৃণোমি
পরিচয় ঘটছে, তবু এই অকারণ অশান্তির কোনো ব্যাখ্যা
আজ করতে পারবে না। কি যে চায়, তা' ও নিজেই জানে
না! যশ? অর্থ? ও-সব রণজিৎের স্পৃহা নেই। আদর্শ!
ই্যা, সব-চেয়ে বড় আদর্শের সন্ধান জীবনে সে 'পেয়েছে।

আকাশের মতো উদার, স্বর্গের মতো জ্যোতির্ময়। এই
আদর্শের মধ্যে ওর সমস্ত ভবিষ্যৎ অম্লভজিত। আর কি
চাইবার আছে জীবনে? মাহুনের আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব?
পৃথিবীর সমস্ত মানব-পরিবারের সঙ্গে ওর আত্মীয়তার যোগ
রয়েছে,—ও যে সমগ্র মানবজাতির বন্ধু! বহু নর-নারীর
হৃদয়ে সে ‘আনন্দ অম্লভব করছে, তা'দের অক্ষর সঙ্গে
নিশাঙ্কে ওর-ও যোগের জল। নগরীর মতো বিচিত্র, দিগন্তের
মতো রহস্যময় ওর জীবন।

তবে?—

এই গভীর রাত্রে চুপিচুপি জীবনের হিসেবের খাতার
পাতা ওলটতে ওলটতে রণজিৎের আজ বিশ্বাসের শেষ
শৈল না। কই, একটিও জন্মের অঙ্ক তো দেখা হয়নি?
এই দীর্ঘ ছত্রিশটা বছর ধরে সে কি তা'হ'লে কিছুই পায়
নি? রণজিৎ ঝরেছিল সমুদ্রে অবগাহন করতে, কিছ
ভলার তা'র এতবড় বাধুত্ব,—এতখানি পিপাসা!

রণজিৎের মনে হ'ল, তা'র আকর্ষিতিক উঠেছে।
মনে মনে সে চাঁৎকার করে' বলতে লাগল: জীবনের
আদর্শকে অপমান কোনো না রণজিৎ। এ তোমার হৃদয়লতা!
বিশ্বাসের আলম্রম্রম্র,—তোমার থাক' কঠিন স্বকরমম বাস্তব,
কল্যাণিত জীবনমগ্গাশ, ভবিষ্যৎ সুকির কামনা। ***

কপাটা পরিভোব প্রথমে উড়িয়ে নিতে চেয়েছিল; কিন্তু
রণজিৎ স্পষ্ট করে' আবার বললে, দিন আর কাটে না,
বসে' বসে' বাত ধরে' থাকে! কের কাছে লাগতে হবে।
পরিভোব বললে, কাজ? বেশ তো, চ' একদিন আমার
ফ্যাটীকীতে—

চাকরি! চাকরি করবার সময় কই আমার! সমস্ত
মাহুত্বকে নিয়ে আমার কারবার, সীকলের হাতে হাত নিলিয়ে
কাজ করতে হবে।—এখনকার ভেরা এবারে ওঠাতে হ'ল
পরিভোব!

পরিভোব চুপ করে' কি ভাবলে। তারপর বিশ্বমুখে
বললে, বুঝি রজি, তাকে আমার ভালো করে' ধর
করতে পারলুম না, তাই—

দূর পাগল। বাড়িগুলো লোক, বা' পেপুম এখানে সে-ই চের।

কুম্ভা এসে বললে, পশ্চিমের জানলাটা এবার থেকে বন্ধ করে রাখতে হবে দেখছি। রেল-লাইন দেখে-দেখে তোমার স্বভাব আবার ধারণা হয়ে বাড়ে রক্তিম-না—।

রঞ্জিত শুধু শুকনো একটু হাসলে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে গেল-ই। এখানে থাকার তার আর চলে না। বিবর্তী জীবন তাকে আবার ডাক দিচ্ছিল, সমস্ত দেখে সে আবার উৎসাহের উত্তাপ অল্পতব কর্ণক।

যাবার সময় কুম্ভাকে ডেকে কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু বলবার কী-ই বা আছে? "ছোট গেলে আবার আসা যাবে" এমন আশি—এমন ছ'চারিটা মামুলি কথা।

সন্ধ্যা নাপার টেন। রঞ্জিত যখন বেরল, তখনো আলো রয়েছে। বড় জংশন ষ্টেশন নয়, শাখা-লাইনের ছোট একটা ষ্টেশন। সময়-সময় ষ্টেশন-মাটিরকেও টিকেট বেচে দেয়। রঞ্জিতকে ভিজ্জা করলেন, কোথায় যাবেন?

বিমূঢ় করেটি মুহূর্তের মধ্যে রঞ্জিত কোনো জবাবই বুঝে পেল না। তাই তো! এবার কোথায় যাওয়া যায়? কিন্তু অগত্যা করবার অবসর ষ্টেশন-মাটিরের নেই, ততক্ষণ তিনি পার্শ্ব-অরের দিকে ছুটেন।

টিকেট-ঘরের স্বস্থ থেকে চলে এসে, রঞ্জিত প্লাটফর্মের একধারে লোহার একটা বেঞ্চিতে বসল।—কথাটা এতক্ষণ তার মনেই পড়েনি! কোথায় সে যাবে এখন? এতবড় জগতে অনেক নর-নারীর সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় হয়েছে, বহু-লোকের ভীড়ে ভীড়ে সে ঘুরে বেড়িয়েছে; কিন্তু জনতার মাঝ থেকে কে তাকে চিনল, কে তাকে ডাকল? আজ সে একা!

জীবনে সে অনেক-কিছুই করল। কত দেশ-বিদেশ ঘুরল, জন-সাধারণের সঙ্গে মিশে কুড়াল আর কোণাল ধরল, মানব-জাতির উন্নতির চিন্তা করল, ভবিষ্যৎ-যুগের হস্তিয়ার আর মৈত্রীর স্বপ্ন দেখল। কিন্তু তারপর? তারপর দিন তার কাটবে কেমন করে! * * *

যথাসময়ে টেন এল। ছ'চারিটি বাড়ী ওঠা-নামা করার পর, টেনে আবার ছেড়ে দিল। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। অস্পষ্ট অন্ধকারে রেল-লাইনের ওপারে ছোট ছোট কয়েকটি সীঁওতাল-বস্ত্র এখনো দেখা যায়,—মিউমিটে কয়েকটি বাড়ি। দূর থেকে মাঝল আর বাঁশীর আওয়াজ কেঁপে কেঁপে আসে। সমস্ত পৃথিবী যেন বিশ্রাম করছে!

টেন চেনা গেল, অন্ধকারে রঞ্জিত তবু সে-ই লোহার বেঞ্চিতে হোনা দিয়ে একা বসে। এই বৃহৎ পৃথিবীতে কোথায় তার ঘর? কোথায় যাবে সে?

দোলা

চাঙ!

শ্রীদীলীপকুমার রায়

ভ্রাম্পনের রাতে চুমুক দিয়ে চাঙ, বলতে লাগল :—

"ইসা তোমাকে বলে থাকবে আমি বণিক পিতার ধনীপুত্র ছিলাম এক সময়ে; তার ওপর ক্যান্টন থেকে ধর্মশ্রীপ পেয়ে বিশেষ করে যুরোপীয় চিত্রকলায় টেকনিক ও পদ্ধতি শিখতে এদেশে আসি—বলে নি?"

—"হলোলে!"

"আমি প্রথমে আসি লণ্ডনে। সেখান থেকে প্যারিসে। প্যারিসে নাস ছয়ের মিসিয়ে বেনারের কাছে যুরোপীয় পরিশ্রান্তকৃত সম্বন্ধে কিছু শিখে ইচ্ছে হয় একটু বেড়াতে। মিসিয়ে বেনারও বলেন নানা দেশের ছবি-টবি দেখা মন্দ নয়। আমি চলে আসি স্পেনে।"

—"কিন্তু এত দেশ থাকতে আঘাটা স্পেনে কেন?"

চাঙ, হেসে বলল: "ছেলেবেলা থেকে ঘাটের চেয়ে আঘাটার পরেই আমার একটু বেশি লোভ। সেই জন্মেই বোধ হয় স্পেন-সম্বন্ধে ছেলেবেলা থেকে কেরম একটা কৌতুহল আমার মনের মধ্যে জাগ্রত ছিল। শুনেছিলাম স্পেনে মীড়িভাল যুগকে এখনো জীয়ে রাখা হয়েছে। ভারি ঔৎসাহ্য বোধ হ'ত। ঔৎসাহ্যের একটা কাণে—যুরোপের মধ্যযুগের প্রতি কি জানি কী একটা প্রবীণতার চিন্তা আমার—বোধ হয় আমার চৈনিকরা একটু মীড়িভাল বলে। এ আধুনিকতার ঘাটে আমরা কিরকম ঠোঁটের খাঙ্কি জানো তো? সাদে কি যুরোপের আমরা inscrutable বলে বিখ্যাত?"

স্বপ্ন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল: "আমি আঘাটা বলতে ওকথা—"

চাঙ, হেসে বাধা দিয়ে বলল: "জানি হে জানি। ও আমি একটা ঠাট্টা করলাম। ব্যাক শোনো।"

"মিসিয়ে বেনারেরও এতে সায় ছিল। তিনি প্রাইই বলতেন—সব আগে মাসিয়ে গিয়ে একটু ডেস্কাঙ্ক-"

secular গন্ধ ও মুরিয়ার picaresque আমের যোগাড় করে এসেছে। পাছে ইতালির ধার্মিক আবহাওয়ার আমার মনের উপকূল ভগবত্তির মায়াধর ফুটে ওঠে এজন্তে তাঁর জরাজীর্ণের সীমা ছিল না। জানো তো?"

স্বপ্নন হেসে বলল: "হাড়ে হাড়ে।"

চাঙ, ভ্রাম্পনের খেলাসে চুমুক দিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়ল। থেকে থেকে সে এমনি হঠাৎই গম্ভীর হয়ে পড়ত। তারপর বলতে লাগল: "স্পেনে এসে আমি আগে খুব বেড়ালাম একটোটা। সেভিল, গ্রানাদা, কাতালোন্কা, কাস্তিল, সান সেবাস্তিয়ান চক্র দিয়ে মাসিয়ে পৌঁছে মহাসমারোহে উঠি—মিসিয়ে বেনারেরই এক ভূতপূর্ব ছাত্র দন কবিয়ার অতিথি হয়ে—মানে পেয়ে গেসট হয়ে। মিসিয়ে বেনারেরই চিঠি ছিল।"

"দন কবিয়ার ছিলেন মাসিয়ের বিখ্যাত প্রানো মাজিয়ানের কিস্তিরেটর।—কিন্তু আমার বর্ণনায় হাঙ্কন তাঁর স্ত্রী—Dona Maria Rubio."

এক অনির্দিষ্ট প্রত্যাশার স্বপনের বক চকল হয়ে ওঠে; যেমন অস্বাভাবিক কত সময়েই ঘটে বিদেশে প্রিয়বন্ধুর কাহিনী শ্রুত্ব তন্ত্বত,—মানে হয় যেন নিজেরই কাহিনী।

চাঙ, বলতে লাগল: "এঁর বয়স তখন—মানে, বছর দেড়ের আগে—প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। আমার চেয়ে তিনি ছিলেন ঠিক তের বছরের বড়। যৌবনের রক্তজ্বালা অন্তর্যমান—কিন্তু গোলাপী খোর তখনও দেখের দিগন্ত-রেখার কিছুমুক করছে। এরকম আসন্নগৌরা অথচ যৌবনচকলা নারী বোধহয় এদেশে যেমন মনোহর বর্ণে দেখা দেয় প্রাতো তেমন দেখনা, তোমার মনে হয় না?"

—"হয়। আমি এরকম কয়েকটি নারী দেখেছি।

তাদের বেখেলে নয়ন তত সুন্দর তত হয় না, কিষ্...কোথায় যে—ব'লেই সে খেলে গেল।

চাঙ হেসে পাশপূরণ করল : “তাদের শেষ নৌবনের রক্তগার অন্ত্যমান স্বর্বারমুতাসির থেকে ও আমাদের মনকে রক্তিয়ে তোলেন—তার দিশা মেলে না ; এই না ?—অবিকল। অবিকল একথাই তাঁর সখকে ও আমার মনে হ'ত হয়ত। কিন্তু হয় নি কেন জানো—প্রথমটায় ?” স্বপন ঐতরক হ'য়ে চেয়ে রইল তার পানে, কিন্তু কিছু বলল না।

চাঙ একটু আবছা হাসল, পরে দীরে দীরে বলল : “মনে হয় নি কারণ তাঁর মধ্যে ছিল একটা অসামান্য পতিনিষ্ঠা।”

—“পতিনিষ্ঠা ?”

—“হাঁ। আর সে একটা দেখবার জিনিষ ছিল, সত্যি। আমাদের দেশেও মেয়েরা যুবক পণ্ডিতপ্রাণা হ'তে পারে। কিন্তু দনা মারিয়ার পাত্তিরক্তার সঙ্গে তার তুলনা হয় না।”

—“কেন ?”

—“কারণ তাঁর কাছে পাত্তিরতা শুভ্রত ছিল না—ছিল স্বপ্ন। সাদনালক আলো ও স্বয়ংপ্রভা আলোয় এ ছয়ের মধ্যে কেবল সেই ? এ-ও সেই রকম ?”

—“কথাটা ব'লেছ ভালো।”

স্বপনের কথাটা যেন চাঙের কানেই গেল না, সে ব'লে চলল : “আর একরকম পাত্তিরতা আছে—যেমন ভোম্বাদের হিন্দু সতীরা। কিন্তু কেন জানি না—সে-ধরনের প'ড়ে পাওয়া বাধ্য-বাধ্য প্রীর সতীথে আমার কোনো দিনই চিক্ শ্রদ্ধা হয় নি ; বরিও সব আশ্বত্যাগের মধ্যেই যে প্রশংসার কিছু—না-কিছু খুঁজলে সেমে একথা স্বীকার করি না। সে থাক্। যেটা বলতে চেষ্টাই সেটা এই যে দনা মারিয়ার অনায়ালক পত্নিগ্রেম আমাকে মুক্ত ক'রেছিল এই ভজ্ঞে যে শৈশবিক ত্রিনি হিন্দু সতীর মত পাত্তিরক্তার প্রতীক হিসেবেই উপাসনা করেন নি—সহজ প্রেমে সেহ মন দিয়েই বরণ করে নিয়েছিলেন—যেমন আমাদের জীবনশেষে চিত্তাটা করে চিত্র-লক্ষণী। সমস্ত জীবন শুধু তিনি উৎসর্গ না, আনন্দের আশ্বাসে নিজেকে নিবেদন ক'রে বিতেছিলেন—তাঁর

স্বামীর পানে। সকলেই তাঁকে দেখে এই কথাই বলত। আর বাস্তবিক না ব'লে উপায়ও ছিল না।”

স্বপন আবিষ্ট হ'য়ে শুনতে থাকে। চাঙ ব'লে চলল :

“আমার খরেকটি ছবি তাঁর বড় ভালো লেগে যায়।”

—“তিনি কি ভোম্বাদের ছবির কিছু বুঝতেন ?”

—“হাঁ। অতঃ আমাদের ছবির পিউরিটি তিনি ও

তাঁর স্বামী ব'লে ভালো বুঝতেন তত ভালো এবেশে কাউকে কখনো বুঝতে দেখি নি। তাদের শুধু যে একটা বাস্তবিক অস্বচ্ছ ছিল তাই নয়—তাঁরা একটু চক্কো ক'রেছিলেন। এমন কি দন করিয়া একবার লখা ছুটি নিয়ে সস্ত্রীক চীনে ছ'মাস ও ঝাপানে চারমাস কাটিয়ে আসেন—শুধু চীন-ভাষানদের ছবি-সখকে শিখতে।”

—“বটে ?”

—“হাঁ। আর স্বামী ছী ভ্রমণেই বড় ভালোবাসতেন।

চাঙ বলতে লাগল : “তাঁরইলৈই বুঝতে পারছ যে প্রথম থেকেই আমার সঙ্গে বণিতার গোড়ার বাখাটা—মানে অপরিস্রবের বাখা—তাঁদের তরফ থেকে একদম ছিল না। কিন্তু বণিতা ক'বার পক্ষে এর চেয়েও বড় ছবিমে হ'য়ে গেল এই কারণে যে চীন-ভাষানদের ছবি ও আর্ট-সখকে তাঁরা বিশেষজ্ঞ না হোনি—অজ্ঞ ছিলেন।”

—“ভ্রমণেই ?”

—“হাঁ। অবশ্য দন করিয়াই ছিলেন এ বিষয়ে স্ত্রীত দীক্ষাও কিছু ভ্রম দায় স্বামী হ'ন হ'বে শিশ্যী তাঁর সহকেই দীক্ষার ফলভার ক'রে থাকেন—সব দেশেই, নয় কি ?”

স্বপন একটু হাসল শুধু। চাঙ ফের গভীর হ'য়ে বলতে লাগল : “এর ঠাটাই নয় সবটা। দনা মারিয়া করিয়া স্বামীর দীক্ষাওমে সত্যিই তৈরিক আর্ট-সখকে বানসিকতা ‘অস্বচ্ছ’ অজ্ঞন করতে পেরেছিলেন। দন হ'য়েছিল এই যে তাঁর সঙ্গে আমাদের আর্ট-সখকে আলোচনা করতে হ'লে ওর বর্ণপরিচয় থেকে শুরু করতে হ'ত না। এ-চিত্রবর্ণের সুগে এটা বড় কম লাভ নয় কী বলো—আর্টের দিক থেকে ?”

স্বপন হেসে বলল : “কিন্তু এ-লাভটা আর্টের দিক থেকেই বেশি হ'য়েছিল, না তোমার দিক থেকে, সত্যি বলো তো ?”

চাঙ তার পরিহাস পায়ে মাখলো না, চিত্তিত হ'য়ে বলল : “আমার দিক থেকে যে থিয়েরে খুব বেশি লাভ হ'য়েছিল একথা আমি বলতে পারি না। কারণ আমার সময়ে সময়ে এখানে মনে হয়, হয় তো মারিয়া আমাদের আর্ট-সখকে কিছু না জানলেই সব দিক দিয়ে ভালো হ'ত হয়ত।”

স্বপন একটু বিস্মিত হ'য়ে বলল : “কেন ?”

—“এই—ভজ্ঞে যে আমাদের আর্ট-সখকে এত বলা কওয়ার না থাকলে আমাদের এত ভাব হ'ত না করনই।”

—“তা কি ব'লা যায় জোর ক'রে ? বাঃ।”

—“যার। কেন না মারিয়া এমন কিছু উচ্চ শিক্ষিতা

মেয়ে ছিলেন না যার সঙ্গে আলাপে লাভান হওয়া যেত।”

—“এ তুমি তারি কাঁচা কণা বললে চাঃ মাক করো। মেয়েদের সঙ্গে আলাপে আমরা যে প্রাণ লাভবান হই সেটা কি তাঁদের উচ্চশিক্ষিতা হওয়ার দরুন, না মেয়ে হওয়ার দরুন ?”

চাঙ ঈষৎ চমকে উঠল যেন, বলল : “কথাটা তুমি মন করনি স্বপন, এবং একথা আমি পুরোপুরি স্বীকারও করি না। কিন্তু আমার ইতিহাসটা একটু বলি এখানে তাহ'লে। নইলে বুঝবে না চিক্—আমার কথা কেন একটু স্বতন্ত্র ছিল এক্ষেত্রে।”

ব'লে একটু মুক্ত হ'য়ে চাঙ বলতে লাগল : “আমি যখন যুরোপে আমি তখন প্রতিষ্ঠা ক'রে আমি যে বিশেষে শুধু—আর্টই হয়ে আমার একমাত্র উপায় দেবী—কোনো অজ্ঞাভায়েই অজ্ঞ জ্ঞান দেবীকে ওর বৌরীতে বসায়ে না। কিন্তু সন্তান ক'রেছিলাম যে কোনো নারীকে আমার মনের অন্তর মংলরে চাবি মুহুর্তের ভজ্ঞেও দেব না। অন্তর-বহনের চাবি দেওয়া তো হ'রের কথা—স্বপন ক'রেছিলাম তাঁকে স্ত্রীত সদর বেড়িয়ে ছুঁবার ছাড়পত্রও দেবো না।”

—“বাঃ। এমন তাঁয়ের প্রতিষ্ঠা কেন ?”

—“সে—অনেক কথা। সে সব বলতে গেলে আজ সমস্ত রাত্রেও যুক্তবে না। শুধু এইটুকু জেনে রাখো যে

যোকাহোমানে আমার জীবনের সবচেয়ে গ্লিয়তম বন্ধকে হারাই একটি ভরলম্বিত ঝাপানী মেয়ের ভজ্ঞে—যে আমাদের দুজনকে নিয়েই খেলাত। তিনি আশ্চর্য্যতায় করেন আমারই প্রতি স্বীকার। তাতে আমার মনে এত আশাত লাগে যে আমি অস্বপ্নে পড়ি।”

স্বপনের ঔৎসুক্যের তাপমান বয়ের পারা হু হু করে উগরে উঠে যায়। সে চুপ ক'রে থাকে। তার মনটা একটু হাল্কা মনে হাছিল চাঙের কাছে সব বলার পর থেকে। চাঙ ব'লে চলে : “সেই থেকে ছির করি—বয়োভোতা না হ'লে কোন মেয়ের সঙ্গে মিশ'লই না। শুধু তাই না—সঙ্গে সঙ্গে আরও এই স্বীকার করি যে যোকাভোতা হ'লেও আর্ট ছাড়া অজ্ঞ কোনো বিথয়ে কথাই কইব না কোনো পরিচিতার সাথে। মানে—চাঙের চোঁটে একটা আঁখি, হাঙ্গি ফুটে ওঠে : “শুধু বয়সের দ্বারা ভরসাও নিশ্চিত থাকি না—এও খোঁজ নিতে হবে যে জ্ঞাতকুলসীলার তুষ্টির সব বাণওনিই ভোঁতা তো ? বুঝলে না ?”

স্বপন ঘাড় নাড়ল। চাঙ বলতে লাগল :

“মারিয়া প্রথম পরীক্ষার উত্তীর্ণ হ'লেন, কারণ তিনি ছিলেন আমার এক দিগির বয়সী ; এবং দ্বিতীয় পরীক্ষারও পাশ করলেন—কেন না শুধু যে আর্ট-সখকে তাঁর সঙ্গে আলাপ করা সম্ভব ছিল তাই নয়, বিশেষ ক'রে চীন ভাষান সখকেও তাঁর ঔৎসুক্যের অবধি ছিল না। সত্যি তাঁকে যে আমি শুধু দিগির চোখে দেখতাম তাই না—তাঁর সঙ্গে অজ্ঞতঃ পনের আনা কথা হ'ত নির্বাচিক প্রসঙ্গ নিয়ে : হয় পিকিনেস কুয়েংখোংকৌ খিখিখিখিখি, না হয় নানকিদের পোপেলে টেন ওগার ; হয় শাংহাইয়ের পাগোডা, না হয় কাটিনেস কুয়েংনিটো ; হয় হাং-রাংঝেখের কি শি-ভাই-পে, না হয় হাং-রাংঝেখের কি খি-উং-পো ; হয় থোক্তুর ‘মমখামা জীস’ না হয় জুজুর ‘মোরমাম’ ; হয় বাটাও রাপেলের স্ট্রানমতা, না হয় লাককাডিয়াসের জাপান-উজ্জ্বল—এককথার, একক নিয়ামি কথাবার্তা আর কি।”

চাঙ একটু থামল। তার চোঁটেই কোণার পুরুষিত হাঙ্গি ফুটে ওঠে যেন। সে বলতে লাগল : “কিন্তু হ'লে হবে কি ? তুমি সেদিন তোমাকে নল-মমস্বীরা গলে

বলছিলো না—কসির ছিন্ন খোজার কথা? তবুই আমার দনা মারিয়া করিয়ের কথা মনে হয়েছিল। এত সাবধানে থেকেও কেমন করে যে কী হয়।”

চাং বলতে লাগল: “আমার মধ্যে এসবদেহ প্রধান উদ্ভব হয় মারিয়ার চোখের এক একটা দৃষ্টি হঠাৎ আত্মকা নকর পড়ে বাওয়ার ফলে। জাগ্রত মুহুর্তে প্র কবে দিতাম এমন চিন্তা। কিন্তু যখন তাকে নানাভাবে দেখে দাত। মনটা কোথায় যেন একটু একটু করে বিবশ হ’তে লাগল। আমি বৃহতে পারতাম সে কথাবার্তার একটু মোড় ফেরাতে যেন চেষ্টা পাচ্ছে অথচ কোনো ধরা-ছোঁয়া-বায় এমন প্রমাণও পেতাম না। মনকে তিরস্কার করে বললাম—এমন পরিত্রাচিত, পতিগন্তপ্রাণা যেনের সম্বন্ধে—ছি! একটু একটু করে অবৈধায়মান চিন্তের রাশ আরও টেনে ধরতাম। কথাবার্তার মধ্যে চৈনিক সৌভজ্য দিয়ে সব অন্তরঙ্গতার ক্যাক প্রাপ্ত চেষ্টার বুদ্ধিতে সিদ্ধান্ত।”

চাংয়ের সেই আবছা হাসি হাসল: “কিন্তু নিয়তি যে কখন কী খেলা খেলে। একদিন Puerta del Sol-এ মারিয়ার সঙ্গে আমি রাত্তা পার হ’তে বেতে একটা ট্যাক্সির নীচে চাপা পড়তে পড়তে বেতে বাই। এই সম্বরটা আমি বোধ হয় বোধ করেই বেশি খাটতাম—মারিয়ার প্রবর্তমান চিন্তাকে টেকাতে। ইচ্ছাশক্তির জোরে এভাবে মনের-একিকার ছিন্নগুলি বুদ্ধিতে দিতাম বটে—কিন্তু কেমন যেন একটু ক্লান্ত লাগত। তাইজা বলেছি যুগোশে আমার ত্রিক একটু আগেই আমার সেই বজ্জীর আত্মহত্যার দরশন অল্পে পড়ি। প্রায় ব্রেকফিটার মতন হয়। যুগোশে পৌঁছিয়েও নায়ে নায়ে মাথা ঘুরত। ডাক্তার বেশি পরিশ্রম করতে বাধ্য করেছিল বছর থাকেন। এই সময়ে আমি সে-কথাকে অবহেলা করে বেশি খাটা ব্রহ্ম ক’রে দিলাম। না খাটলে ক্রৈ সব চিন্তা আমাকে বেশি পেয়ে বসত যে। বাকী কী বলছিলাম যেন?”

—“ট্যাক্সি চাপা পড়তে পড়তে বেতে বাওয়ার কথা।”

“ওহী। মারিয়াই এরকমর আমাকে বাঁচা। ট্যাক্সিটা আসছিল মোড় বেঁকে, আমি যখন হর্ষ নুলাম—মাথার মধ্যে কেমন ক’রে উঠল—তারপর আর মনে নেই।” পরে

শুনলাম মারিয়া আমার হাত ধরে হেঁচকা টানে ও আমি মাটিতে পড়ে বাই। সে সময়ে মোটরের বনেট না মাড়গার্ট লেগে তার হাতেও খুব লাগে, কিন্তু আমি বেতে বাই। কেবল হঠাৎ পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লাগে।

“যখন জান হ’ল—মনে হ’ল কিসের একটা দোশানি। কিন্তু চেমনা তখন যোশাটে। মাথার মধ্যে জীবন বহনা। চুপ করে হইলাম। থানিক বাদে সবার ঘিরে ঘিরে নিয়ে এলা—বৃহতে পারলাম আমি একটা ট্যাক্সিতে। ক’ম্বিনেতে মাথার বজ্জ লাগছিল। কিন্তু কথা বলতে পারছিলাম না। হঠাৎ মনে হ’ল আমার মুখের খুব কাছে কার যেন উচ্চ নিশ্বাস। তার পরেই ওঠে উচ্চ স্পন্দ অনেকক’রপ’র। আমি হঠাৎ চোখ খুললাম। মারিয়া তৎক্ষণাৎ সোচ্চা হ’য়ে বসল। আমার যে এত হঠাৎ জান আসলে তা বোধ হয় সে ভাবে নি।

চাং বলতে লাগল: “ইচ্ছাশক্তির পরে আমার একটু বস্তুর আছে এ হুত ভূমি লক্ষ্য করে থাকবে। আমি তারই জোরে সোচ্চা হ’য়ে বসলাম ও মারিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ ভাবেই কথা কইলাম। সে একটু আশ্বা হ’ল। অগ্রভিত্তও, তবে আমি তাকে বৃহতে গিলাম না যে আমি জানতে পেরেছি। সে-ও মুখে কিছু বলল না। আমার সেমিরের অভিনয় সে যে ধরতে পেরেছিল একথা সে আশাকে বলেছিল বহুদিন পরে—আমার জীবনের এক সম্বরটী তার। কিং সে কথা ধাপাখানো।

চাং বলতে লাগল: “কিন্তু সেদিন থেকে আমরা অজ্ঞাতসারে পরস্পরের একটু কাছে এসে পড়লাম বই কি। মজা দেখে—বেশি ক’রে খাটিছিলাম ওইই এভাবে—অথচ বেশি খাটার জেয়েই মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে এসে পড়লাম ওর আরও কাছে। একথা আজও ভাবি আর মনে মনে হাসি। কতরমমই না মল্লব আঁতে মালুয়ে।”

বলে চাং একটু হাসল। কিন্তু পরক্ষণেই ফের আচড়তে গম্বীর হয়ে উঠল। বলতে লাগল: “আমাকে সাত concussion of the brain-এর রোগ বেঁচে গেছি। মাথার তীর বহরার সময়ে মারিয়া করণি অজ্ঞাত সোখা

করল। প্রায় সাতারাত শিরের জেগে বসে থাকত বললেই হয়। মাথা টিপে দিত, হাতে করে বাইয়ে দিত আরও কত কী। কারণ আমার প্রায়মণ্ডলী কেমন যেন আমার বেলন হ’য়ে গিয়েছিল।

“কিন্তু এ ছদ্মবেশ একটা বড় রকম পরিবর্তন হ’য়ে গেল: কথাবার্তার দৃবধ রাখা আর সম্বধ হ’ল না; পাকচক্রে পড়ে কথাবার্তা একটু নরম দিকেই মোড় নিল, তাকে টেকানোর না রইল উপায়, না তাগিদ। নৈবািকিকতার নীলাঙ্গ থেকে নাকতে হ’ল যরোয়া কৌশলতার হরিরাঞ্চলে।” বলে সে একটু থাল।

বপন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল: “তারপর?”

“তারপর থেকেই ব্রহ্ম হ’ল আমাদের ব্রহ্ম। আমরা মুখে আগের মতনই সহজ অনাবিল মিঠে বাহ্যসরে প্রায় পেতাম—কিন্তু মন নাগাল পেতে চাইত যেন আরও কিছু। অস্ত্র ট্যাক্সির প্রসঙ্গটা জ্ঞানেই এড়িয়ে চলতাম। সে কি ভাবত সেই জানে, আমি ভাব তাম ও বুদ্ধি তার স্মিকের চরিত্রতা বই আর কিছুই না।

“কিন্তু শক্তিমত্তার মতন চরিত্রতাও সজ্ঞানক। আমারও মনের মূল্যসে একটু একটু করে আলুগা হ’য়ে আসতে লাগল। জন্মগত মনে হ’তে সেই ট্যাক্সির কথা। তার মনের সেই একান্ত সাধিতা—সেই উচ্চ স্পন্দ। প্রথম প্রথম এবং চিত্তকে আসবামার তড়িতে বিভ্রাম—কিন্তু রায়ে নারাকম কথা আমার সেবামেও সাধু বাদ।—কিন্তু

সে সব তুমি করনা ক’রেই নিয়ো, কারণ সব বদ্বার সময় নেই।” মাথামনের শোশো হ্রুত্ব দিয়ে চাং শান্ত কর্তে বলতে লাগল: “পড়িয়ে বেটা পড়াফো সে বড় বিচিত্র। জ্ঞানেই ফরনের একটু কাছে এসে পড়েছি, সে-ও জানে আমার প্রতি তার টান ট্রিক শিলী ছোট ভাইয়ের প্রতি টান নয়—আমিও জানি—বৃহতেই পারছ?—অথচ জ্ঞানেই চলি গা টিপে টিপে। সদা-সমগণ বুদ্ধি কেবল ভাবতে থাকে কেমন করে বাইরে হাবনির একটা ঠাঁট বজায় রাখা যাবে। প্রতি পা বাড়াবার মুখে পেছনের পায়ে দেহঁতার হ্রুত্ব আর কি—বহি অস্ত্র উজ্জত চরণ নীচে মাটিও না গা—কে তালো।”

বপন চ্যুকে ওঠে যেন।

—“কী?”

—“কিন্তু না। তারপর?”

—“তারপরের আঘাট হ’য়ে উঠল আরও বিচিত্র।

প্রতিধের সে কত কী ছোট ছোট ঘটনা,—বাইয়ের লোকের কাছে তুচ্ছ অবস্থ—কিন্তু আমাদের কাছে রাফায়েলের মাদোনার দৃষ্টির চেয়েও গভীর। কত আত্মপ্রত্যাপ, ছল ক’রে কাছে আসা, ভয় পেয়ে দূরে স’য়ে যাওয়া, কত অছিলার একজনর আর একজনকে বলতে চাওয়া যে একটু এগিয়ে এলেই বা—অথচ মুখ কুটে বলবার ভরসা না-পাওয়া—সে এক গিবনের ইতিহাস লেখা যায় যে—মাত্র সে তিন মাসের শোলা নিয়ে। এসব ভূমি বৃহৎ। —কী? কিছু জিজ্ঞাসা করতে বাধ্যসে?”

—“একটা কথা কেবল: তোমার পালাবার ইচ্ছে একেবারে শোপ শেল কি এইর পের?”

—“প্রথম প্রথম পায় নি। কিন্তু ছোট ছোট সাক্ষিগের প্রশ্ন নিতে নিতে যে-ই একটু বড় বড় প্রশ্নয়ের বা উৎসাহের শোচ জ্ঞানো, যে-ই মনে হ’ল সে-দাবীরও মধ্যালা নিলতে পারে যত ত—সে-ই যেন এদেরের Revolving stage-এর মত মুহুর্তে ঘটিল পটনিবর্তন। যখনো একটু আগের মুহুর্তে ছিল নিদ্রুত ধৃ প্ৰান্তর—সেখানে পরের মুহুর্তে হেগে উঠল শামল রক্তবন। আর তার হিরোলে—বৃহতেই পারছ?—বলে একটু থেনে বলল: “গভিা বপন, হঠাৎ দেখলাম যে পালাবার জোরও পাচ্ছি না। তাছাড়া শামলাবার পথে যে একটা সত্যিকার বড় বাধাও ছিল। এ নিশ্চয়ই জানো যে শুধু হুর্ভাগ্যই যে ‘single spy’-এর মতন একা আসেন না তাই নয়—জীবনের প্রতি সং সঙ্করের পরিপন্থী-বাধারও আসেন ‘battalion’ বেঁধে? ট্রিক এই সময়েই কি আমি সান কার্ণাম্বোর আকাডেমিতে মূল্যোপর বিখ্যাত সেন্ট ব্রাসিয়ের ছবিত্রির একটা কপি করছিলাম—যেমন নিয়ে যাযো বলে। এ পানিকটা হেঁদেবর কাজও বই কি;—স্বতরাং শুধু একটা কানে পড়বার ভয়ে—একান্ত ব্যক্তিগত কারণে কাকি ফেলে দৌড় দেব—একথা ভাবতেও বাসত। দেখছ তেঁা সাধু বলবের

বিশকে কী রকম তার বেঁধে অস্ত্রার পাছাড় প্রমাণ হ'য়ে ওঠে?"

শ্বপন মুখ হাসল, কিছ এ কথার উত্তর দিল না, বলল: "কিছ শেবারী ঠাণ্ডাল কী? পালালে, না পালানোর সঙ্গর বিশর্জন দিলে?"

— "পালানোর স্বপ্ন মিলল কই তখন? এখন মিলল, মনে—পরে, তখন না পালালেই ছিল ভাল।"

— "কি রকম?"

— "বলি। আমার এ বাবৎ ধারণা ছিল যে ইচ্ছাশক্তি প্রবল হওয়ার বৃদ্ধি কেবল সুবিধাই আছে, কিছ এইবার নতুন ক'রে টের পেলাম যে ওর অন্তরীক্ষেও আছে যথেষ্ট। ক্রমাগত ইচ্ছাশক্তির কাছে হাট পায়তে পাততে শেবারীর শু শু যে মন আত্মসম্মান হারিয়ে বসে তাই নয়, প্রস্তুতিও হ'য়ে ওঠে অত্যধিক-রাস্তানা-ঘোড়ার-মতন অতিষ্ঠ।" তবু এ-ও সওয়া যায় কিছ সওয়া বাব না, এখন রাহুবাও প্রস্তুতির চাপে ইচ্ছাশক্তি দেয়। — আমার বিধম অনিরা হুক হ'ল।

"টিক এই সময়ে মারিয়া গিয়েছিল তিন চার দিনের অন্ত্রে সেভিলে—তার এক ভাইয়ের খুব অল্পে। আমি একটু জোরও পেলাম। দন কবিরোও ভাবিত হ'য়ে বললেন, সান সেবারিয়ানে সব্বের হাওয়া খেতে বেতে—অন্তত: দিন পনের অন্ত্রে। আমি রাজি হ'লাম। গোলাম, কিছ মারিয়া ফিরে আসার আগেই।"

শ্বপন বলল: "তাহলে পালাতে পেরেছিলে বলা—শেবারীর?"

চাঁং ঈন্স হাসল, বলল: "পেরেছিলাম বটে, কিছ কেমন পালানো জানো? চাকার প্রতি অশ্র উপর দিকে উঠবার সময়ে যেমন ভাবে—মাটি থেকে পালাচ্ছে।"

— "টিক বুঝলাম না।"

— "বুঝলে সান সেবারিয়ানে কার সঙ্গে আশ্রয় দেখা হ'ল তখনই?"

— "কার?"

— "ইসাবেলার। আমি সান সেবারিয়ানে যে-সববারে পৌছলাম ও পৌছল তার পরের রবিবারেই—এবং ওর স্থানও হ'ল টিক সেবারি গানের ঘরে। এবার বুঝছ?"

— "তবে যে ইসাবেল বলল ও তোমাকে মারিদেই দেখে প্রাণে?"

— "ও আমাকে প্রাণে দেখে মারিদেই বটে, কিছ আমি ওকে প্রাণে দেখি আমার ঘর থেকে সমুদ্রে যান করে উঠে আসতে। দেখেই মুগ্ধ হ'য়ে যাই। এবং সেই দিনই মারিদে চম্পট দেই।"

— "কেন?"

— "বাং, মাদ্রগকে যদি হুজুগ ও মরগের মধ্যে বেছে নিতে বলা যায় তবে কি সে শেবারী বেছে নেয়? মারিয়ার হাতে আমার অস্ত্রত: মৃত্যু ভয় তো ছিল না।"

— "কিছ ইসাবেলার হাতেই যে ছিল একথা ধ'রে নিচ্ছ কেন?"

— "ইসাবেলাকে নৌকার কাছে পাওয়ার পরেও কি একথা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে বড়?"

শ্বপনের কর্ণধ্বনি বয়ে রক্ত উঠল এক বলক। কিছ সে সামলে নিয়ে মুখে হাসি টেনে বলল: "কিছ ঐ-রকম অবস্থার তুমিও তাকে পেতে একথা ধ'রে নিচ্ছ কেন?"

— "বলি নি—সে একা এগিয়েছিল সান সেবারিয়ানে?"

— "আর হোটেলের আমার পাশেই এ'ড়ে ছিল তার ঘর?"

— "কিছ যদি সে ঘর না মিশত তোমার সঙ্গে?"

চাঁং এবার শুধু হাসল—উত্তর দিল না।

শ্বপন তার দিকে চেয়ে বলল: "হাসলে যে?"

চার্ভের অধর প্রান্তে হাসির রেখা আরও ফুটে উঠল, বলল: "ওটা ঈন্সও গার্সের হাসি ব'লেই ধরতে পারো।"

— "যা?"

চাঁং মুহূর্তে গভীর হ'য়ে পড়ল, বলল: "আমার মনের মধ্যে কেমন একটা ধারণা আছে শ্বপন যে কোন মেয়ের সঙ্গে মিশতে যেয়ে না পেরে হ'তে আসতে আমি পারিই না।"

তবে বোধ হয় আজ অবধি এদিক দিয়ে কখনো বা খাইনি ব'লেই এরকম একটা মিথ্যা দর্প মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে—বাক্য তোমাদের দর্পধারী বাস্তব বজ্রে একদিন গুঁড়ো করে দেবেন।" বলতে বলতে তার চোঁটার উপর ফের ঈন্স হাসির আঁকা ফুটে উঠল, সে বলল: "কিছ বহদিন মাদ্রগ যা না খায়—ততদিন নিজেকে তাকে ভেঁদল ক'রে চেনে না ভাই—

দুর্গকে অসত্যভিত্তি ব'লেও জানে না। নয়? মাদ্রগ তার অভিজ্ঞতাতে ছাপিয়ে উঠতে পারে কি—নিশ্চয়ত: এসব amour-propre-এর ক্ষেত্রে?—কিছ এসব গবেষণা বাক—তোমারও রাত হ'য়ে যাচ্ছে। এ-অধ্যায়ের শেষের দিকে আমি এবার।"

ব'লে জ্ঞাপনের গেলো যে চুপ দিয়ে বলতে লাগল: "ইসাকে সান সেবারিয়ানে বেধে বন্ডাজ আমার মনের একটা অংশ উঠল উদ্ভূত হয়ে—যেমন উদ্ভূত বোধ হয় আমি কখনো কোনো নারীকে দেখে হইনি আজ অবধি।—কিছ আর একটা স্বর বলতে লাগল: 'পাশাও পাশাও'।"

"ফের ধ্বন্দ্বের মধ্যে গড়বার আগ্রহও ছিল না। তাছাড়া ইসাবেলাকে দেখেই কেমন যেন একটু জোর পেয়ে গেলাম—শু শু চোঁদের দেখা দেখেই। মনে হ'ল মারিয়ার ভয় আর সেই। টাইগার আলোর তারা গেছে নিচে। এ সাতদিনে শরীরও একটু সেরেছিল। তাছাড়া শেট ফ্রান্সিসের ছবিটাও হ'য়ে গিয়েছিল অস্পর্শ: সে আমাকে ভাকছিল নিরঙ্কর।"

চাঁং বলতে লাগল: "কি? লাম তো। কিছ ফিরে এসেই আবার এক নতুন সমস্যা।" দেখলাম মারিয়া বৈকে দাঁড়িয়েছে। অবজ্ঞা মুখে খুব ভয় বাবহার করল, কিছ দেখানো মন সবচেয়ে বেশি স্পর্শকাতর সেখানেই দিল আঘাত—বাবহার করতে লাগল বড় দুঃখ-দুঃখ। বুঝলাম ও সেভিলে চ'লে যাওয়ার স্থযোগে আমি যে ওর কোমল উর্জালকে কেটে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা পেয়েছি তা ও টের পেয়েছে। অতঃ পর যাব বা অভিমান মুখে প্রকাশ করা অসম্ভব। ও শুধু নীরব ভাবায় প্রকাশ করা চলে—দরদ দিয়ে বুকে নেওয়া।—বাক্যে ছেঁছা। যার কিছ দখল যায় না তার ছবি জাঁকা যায় না—যায় শুধু ইঙ্গিত দেওয়া।"

— "তোমাদের মধ্যে খুব একটা বাবধান হল বুঝি?"

— "বাবধান টিক না। কিছ—কী ব'লে বোঝাই?—

যেটা ঘটল আমার দিক দিয়ে অভাবনীত। বলি শোনো।"

চাঁং বলতে লাগল: "মারিয়ার আমার কাছে আসাই ছেড়ে দিল। আগে যদি ও খামীর মধ্যে থাকত আর্কট-ডুবে—এমন থেকে দিতে শুরু করল ডুব-গ'টার।" ওর দৃষ্টি,

হাসি, ভাবভঙ্গী সবই যেন নীরব ত্রুটিপূর্ণিত যোগ্য করে ত্বর করল—আমি তোমার নাগালের বাইরে—আমি হজ্জি ঐকান্তিক—ও তাঁর একান্ত প্রভুটি হচ্ছেন দেবতা। তবু এ-ও আমি সইতে পারতাম—কারণ আমি বিশ্বাস করি প্রতিভা-পুঙ্খকের অধিকার আছে প্রতিভা গড়বার। কিছ যেটা সবচেয়ে আমার লাগল সেটা এই যে ও নানা আত্মাবে নিষ্করণে আমাকে ক্রমাগত স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল যে আমি হজ্জি বিদেশী।"

শ্বপন উত্তরক নেড়ে বলল: "তারপর?"

— "এর যা ফল ফলল তাকে বলছিলাম না 'অভাবনীত'? কিছ আবার অভাবনীতও পুরোপুরি নয়। মারিয়ার প্রতি কোথায় আমার একটা ঈর্ষার টান ছিল, ও সবে বাওয়ার সেটা বৃহত্ত পারলাম।"

— "ঈর্ষার টান মনে?"

— "ও যে ওর খামীর সম্পত্তি এটা মনে মনে আমাকে কোথায় বিধত বনে। এসব টান এক ঈর্ষার আলোতেই ধরা পড়ে—তাই একে আমি ব'লে থাকি ঈর্ষার টান। ব্যতনিক ওকে আরন্তারীত মনে হয়নি ততদিনও ঈর্ষা নয়ভাবে প্রকাশ পায় নি। কিছ বেই ও একটু হাতের বাইরে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করল—আমার মনের মধ্যে অসলে উঠল ঈর্ষা—ও তার কল একে অত্যন্ত কুড়ী বাসনা।"

শ্বপনের বৃক্কের মধ্যে ধ্বংসও ক্রম চলে।

চাঁং বলতে লাগল: "আমার বেশ মনে আছে আমার এ আত্ম-অধিকারে আমার প্রথম সেই কোঁটা। আমি এই? আমি এই?—গরুর রমণীমনোহারী চাঁং হচ্ছে আসলে আর পাঁচজনদেরই মতন রমণীমোহন? আর বজ্রর হীর প্রতি এই হীন ভাব?—সে সব বলতেও যুগা হয়। তাই এ আঘাতটা আমি বাব দিয়ে যাব। তুমি এগাব কখনো ক'রে নিতো। হী শুধু একটা কথা বলা দরকার: আমার প্রস্তুতিতে একটা হিংস্রতাও খুব প্রবল—যার দরুন নিষ্করণও আমি প্রবলভাবে সাড়া দেই। ও আমাকে বেই আঘাত করল সেই আমিও স্থযোগ খুঁজতে শুরু ক'রে দিলাম কেমন ক'রে ওকে এই দিক দিয়েই সে-আঘাত স্রব্দে-আসলে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। শুধু সেইজন্মেই ওদের অতীতি বিলীন করে।"

অন্ত কোনো বাসার গেলে তো যথোগ্য পাব না।—তাছাড়া যথ্যা পাবারও একটা ভীত নেশা আছে।—দূরে গেলে তো তত যত্নবাণ্ড পেতাম না। তাই ওদের ওখানেই রইলাম।”

স্বপন একটু আশ্চর্য্য হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালো, কিন্তু কোনো প্রশ্ন করল না। চাং ব'লে চলল : “ওকে আর্ঘ্যত করবার একটা স্ত্রোত্রবাণ্ড এল অবশেষে। ঠিক এই সময়ে আমার বাবা মারা গেলেন ও আমাদের সম্পত্তি হ'ল বাজোপাশ : আমি হ'য়ে পড়লাম একেবারে নিঃশেষ।”

“মারিয়ার মন পেতুলানুর মতন এক দমকে নিষ্ঠুরতা থেকে এল দরদের উপাধুনীর। বস্তু তাদের ওখানে জন্মিনী থাকতে। অল্প সময়ে হ'লে থাকতাম। কিন্তু শুধু ওকে আর্ঘ্যত দিতেই মারিয়ার এক অত্যন্ত দীন পরীতে আশ্রয় নিলাম—একটি ছোট্ট গ্যারেটে।

“বহুদূরে মারিয়ার আগেকার সেই মিষ্টি, কোমল, যেহুম্মী মুক্তি দীপ্ত হ'য়ে উঠল। যে একদিন আমার গ্যারেটে এসে বসে বসে ক'রে কেঁদেই ফেলল—আমার দুর্দশা দেখে। আর সত্যিই সে সময়ে আমার বৈশ্বনাথ চরম হ'য়েছিল। সে গল্প হয়ত একদিন বলব—বলি ফের বেথা হয়। মাস দুই সময়ে সময়ে অনাহারে কেটেছে। সে সব অল্পস্রুটিটি বাক দিয়ে নাই। শুধু এইটুকু জানে রেখে যে মারিয়া প্রায়ই আসত ও মাঝে মাঝেই কান্নাকাতি করত।”

—“তোমার মন তাতে গলত না একটুও?”

—“না। আমার নিষ্ঠুর হবার ক্ষমতাও যে অসামান্য—

ইহা তোমার বলে নি?”

—“কই না তো।”

—“আমার অসামান্য করণশক্তিও আমি নিরোগ করি নিষ্ঠুরতার নানা পদ্ধতি-উদ্ভাবনে—এ আমি অনেকবারই ক'রেছি।—যখনই নিষ্ঠুর হবার রোখ চেপেছে। তারপরে অল্পতাপও আসে অবশ্রু—কিন্তু নিষ্ঠুর হবার ভূত স্বপন আমার মাথায় চাপে তখন কোনমতেই নিরীহ বা ক্ষমাশীল হ'তে পারি না।” বলতে বলতে তার গুণ্ডপ্রান্তে ঝাঁক হাসি ফুটে ওঠে : “আমার মাঝে মাঝে সত্যিই মনে হ'য়েছে স্বপন যে আমাদের অশোণে অ-কাহা নানান জলজালাত ভূত প্রেত দৈত্য দানাদ লুকিয়ে আছে যারা একটু ডাকলেই ফটের মেকিফিলিসের মতন পরমানন্দে সাড়া দেয়, এবং ঘাড় মটকে রক্ত না থাকে—বাড়ে চেপে সহজেই দানব ক'রে তোলে। অস্বস্ত : আমাদের দেশে এরকম নিষ্ঠুরতার ভূত চাপতে আমি অনেকবার দেখেছি—অত্যন্ত কোমলগ্রন্থি, মহাদীশয় মানুষের স্বরুও। কিন্তু যারটা বাজতে আর দেরি নেই বৌশি এরাও এসব দার্শনিক মহাব্য রেখে শেব অকট ব'লে সমাপ্তি টানি।”

ক্রমণ :

পসারিণী

ঐশ্বরীচন্দ্র কর

সারিয়ে জিনিব বেতের ধামার মাটির ভাঁড়ে, গাছের ছায়ায় পথের ধারে ঠায় বসে রয় একাধি পসারিণী।

একা একা পথ চলাতে

রোদের তাতে

কপাল বেয়ে ঘাম করে আর এলিয়ে গড়ে দেহ

সেখায় এসে হাঁপায় ব'সে কেহ

পসারিণী রেয় এগিয়ে জল,

মুড়ি, মুড়কা,—বা কিছু সঞ্চ।

ধরা গলায় বলে ডেকে

“ছাপো, তুমি কোথায় যাবে, আসছো কোথা থেকে?”

পথিক বলে : “ভালোমানুষের বি,

বলবো তোমায় কি,—

সাতবজ্রের মেয়েটাকে দিবেছিলাম বিয়ে,

মায়ের পরাগ ট'কছে না তাই এবার তারে

আনতে হবে গিয়ে।

বেয়েছি দেই ভোরে

গাছের আগেই ফিরতে হবে ঘরে।

এক পরসার বাতাস দাও, টাটকা মুক্তি আছে?

এতকণ্ঠে তবু একটু ঠাণ্ডা হ'লান

মলমল কামর কাছে।”

জলখাবারের পর

পানের খিলি নেয় বাড়িয়ে কর

তারপরে সে নিজের পথে আবার করে বেলা।

পসারিণী রয় বসে একেলা।

এমনি করে বসে পথিক করছে আনাগোনা,

ফুসায় মুড়ি ফুসায় পানের দোনা,

অচেনা হয় চেনা।

পরসার গুণে বিনের শেষে ফুসায় সেনা-দেনা।

কলিকাতার

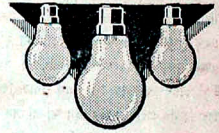
ইলেকট্রিক-বাতির 'বাল্ব'

তৈয়ারীর কারখানা

অদেশী জিনিষের এই প্রথম,

বিরিট আয়েজান!

আরম্ভ হইয়াছে



সম্পূর্ণ আধুনিক কল-কারখানায় নতুন নিয়মে ইলেকট্রিক বাল্ব প্রস্তুত হইতেছে। স্বদেশ ভারতীয় বৈজ্ঞানিক মিঃ ইউ, এন্স, বানার্জি বি, এন্স, সি (এডিনবরা), সমগ্র ইউরোপ ও ইংলণ্ডের বিখ্যাত কারখানা হইতে সুশিক্ষিত ইহারা সম্পত্তি এই কারখানার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বাণীগণের এই কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। যন্ত্র-পাতির সরঞ্জাম বিদেশ হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। আগামী অক্টোবর মাস হইতে বাল্ব-তৈয়ারীর কাজ স্বয়ং হইবে এবং নভেম্বর মাসেই বাজারের সর্বত্র এই বাল্ব পাওয়া যাইবে। বহু সম্ভ্রান্ত ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার এবং ব্যবসায়ীদের লইয়া ডিরেক্টর-সংঘ (Board of Directors) গঠিত হইয়াছে।

কম্পী—ইউ, এন্স, বানার্জি

(বি, এন্স, সি (এডিনবরা) বি, আই, ই, ই, (লন্ডন)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এম, কে, রয়,

এম, ই, ই, এন্স, আই, ই, ই,

দি বেঙ্গল ইলেকট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কস লিঃ

হেড অফিস : ১৪ ব্রাইব, ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অপরাজিত

—পূর্ব-প্রকাশিতের পর—

শ্রীমত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু

উপভাসের চরিত্র-সৃষ্টির নিয়ম-কানুন ও সার্বকথা লইয়া তর্কের ঝোড়ো-খুলি উড়াইবার ইচ্ছা নাই। কিন্তু তবু এই প্রসঙ্গে দুই-একটি কথা না বলিলে মূল কথাটা স্পষ্ট নাও ঠেকিতে পারে।

বিভূতিবাহু বাহা গড়িতে চাহিয়াছেন তখন না বৃষ্টিয়া বা না চাহিয়া অল্প কিছু দাবী যেন না করি, এ সর্বকথাও কেউ-কেউ উচ্চারণ করিয়াছেন। এক স্থান, বিভূতিবাহু, যেখানে শিব গড়িবার প্রয়াস পাইয়াছেন আমরা যেন সেখানে অল্প কিছু সেবিবার ইচ্ছা প্রকাশ না করি। ‘অর্থাৎ, গ্রন্থকার অপেক্ষে একটি বিশেষ আশ্রয়ের ছাড়ে তাঁহার কল্পনা ও অভিজ্ঞতার মাল-মশলা বিরাটিক যেমনটাই আমাদের সমুখে বাড়া করিতে চাহিয়াছেন ত্রিক তেমনটি পারিয়াছেন কি না ইহাই প্রশ্নও প্রশ্নম বিচার্য বিষয়। যদি পারিয়া থাকেন তবে তাঁহার সৃষ্ট সার্বক হইয়াছে, তিনি আমাদের নমস্; যদি না পারিয়া থাকেন তবে তাঁর চেহীর্বার হইয়াছে, তখন তিনি আমাদের বিচারসাপেক্ষ। গল্প সাহিত্য-বিচারে আসল জিনিষ নাকি এই দেখা-যে বিশেষ কোনো চরিত্র একটি বিশেষ ব্যক্তির ও অন্তর আত্মাধারা লইয়া ভালো করিয়া ফুটিয়া উঠিল কি না; এ-প্রশ্ন করা নাকি একেবারেই অ-সাহিত্যিক-যে অসুখ চরিত্র এমনটি না হইয়া এমনটি হইল কেন!

একথা যদি মনিয়া দাঁতেরই হয় তবে এ-কথাও মনিয়া দাঁতেরই হইবে যে এ-নিয়ম বড় কঠিন, এবং এই কঠিনতার পটীকায় সেই লেখকের উত্তীর্ণ হইতে পারেন যিনি আটটি, পুরোপুরি আটটি—মনে ও প্রাণে, চিন্তায় ও কল্পনায়, প্রকাশে ও ব্যঙ্গনায়। বিভূতিবাহু যে এই শ্রেণীর আটটিয়ের পঞ্চায়ে পড়েন সে-কথা অস্বত্ব করিতে পারিলে সত্যি-নাসত্য খুব গুনি হইতে পারিতাম।

অম্বার ওয়াইল্ডকে যদি উত্তরমেক বলা যায় তবে বিভূতিবাহুকে দক্ষিণমেক বলা যায়। তাহাতে পারে—একবারে ম’কে বলে poles asunder. ওয়াইল্ড, একদিন Art for Art’s sake-এর মাজিক দিয়া ইয়োহামেরিকাকে মনুষ্যত্ব করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সে মাজিকের ‘আম’ সাহিত্যের সৌভাগ্যক্রমে বেশিদিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। ‘সত্য সাহিত্য-জগতের অপর একপ্রান্তে বিভূতিভূষণ আজ আবার একটা নূতন গোঁড়ামির ধুমকেতুর মতো বাংলার সাহিত্য-আকাশে উদীয়মান হইয়াছেন, বাহুর নাম Life for Life’s sake। অ্যারিষ্টটলের golden mean-এর মতো আমরা ‘বাগানী পাঠক আর্ট ও জীবনের আটটিয়ক সমন্বয়ের পথ’ অম্বসরণ করিতেই ভালবাসি।

বীজ-গণিতের ফরনিউলার মতো চরিত্র-সৃষ্টির যদি বিশেষ-বিশেষ ছাঁচ গড়া থাকিত তবে অনেক সুবিধা হইত সন্দেহ নাই। তবে সেই ছাঁচের মধ্যে চলিয়া চোখ বুজিয়া কন মেহনতের মনো-বুসিতে চরিত্র-সৃষ্টি করা চলিত, এবং পুরোঁজ মাপকাঠি দিয়া বাচাই করা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার হইত। কিন্তু পাঠকের দুইটিয়া এই কবিতা বা উপভাস বা গল্প পড়িতে পড়িতে ভালো-লাগা মন-লাগা নামক পড়িতে পড়িতে ভালো-লাগা মন-লাগা নামক উৎপাতগুলি মনের মধ্যে আসিয়া ভিড় করে, এবং ক্রি-জানি-কেমন-করিয়া সাহিত্য-বিচারের সেই নৈব্যক্তিক অন্তর্ মাপকাঠিটার ভিত্তিগলে বাইরা আঘাত করিতে থাকে।

তনিত্তে পাই ‘অপরাজিত’ নাকি বিভূতিভূষণের আত্ম-চরিত্রের গভীর রক্ত-ছোপানো। কথাটা যদি সত্য হয় তবে আট-হিসাবে ‘অপরাজিত’ের বার্থভার সন্ধান ইতিহাসের এই সুকৃষ্টিই মনেই পাওয়া যাইবে।

জীবনের ঘটনা যেমন-যেমন ঘটাইছে পর পর বর্ণনাযুক্তভাবে

টিক সেই রকম সাধাইতে পারিলে সহজ ফোঁটাগামিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, কঠিন-সুস্থ শিল্পসৃষ্টি জ্ঞানের নয়। যে প্রকৃত প্রতিভাবান আটটি সে তাহার ‘আট-সৃষ্টির প্রয়োজনমতো বাহা ঘটাই নাই এমন অনেক কিছু খোঁজ করিলে, বাহা ঘটাইয়াছে এমন অনেক কিছু বিবেচ্য করিলে। উপভাসকে আমাদের মানবচিন্তার ছবি-হিসাবে দেখিতেই ভালো লাগে। সে-ছবি আঁকিতে নানানকন্ডের রং এবং সুর ও মোটা নানারকমের তুলির প্রয়োজন হয়। রং-এর বায়ু শুলিয়া যখন ছবি আঁকিতে বসিবে তখন যদি আত্ম-বাহুর আভিধাণা বাহুর মজুত আছে বলিয়াই রং-এর উপর বড় চড়াইতে থাকি তবে কল বাহা পাড়ায় তাগাতে চোখ আহত হয়, মনে অগ্রসরতা ঘনাইয়া ওঠে। ইমোশনের প্রাণসো বিভূতিভূষণ মোটা রকমের একটা তুলি হাতে লইয়া গোটাই ছই তিনি রং খুব অসমত উৎসাহে বার বার ব্যবহার করিয়াছেন—বাহুর যে আত্মা রং থাকিতে পারে, ‘আপো-পাশে যে সুর-সুর তুলি পড়িয়া আছে সে-দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ পান নাই। পরিচয়ের রং, মজুর রং, এবং প্রকৃতির রং-এর প্রতি বিভূতিভূষণের অপোমন পক্ষপাত্ত্ব আছে। যে-পটুতিকার উপর কবি-‘আটটি’ তাঁর প্রিয় রঙলি ব্যবহার করিয়াছেন সে অতি প্রকৃত, সুরম, ‘আপো-পাশে, সে আত্মদিককে বিন্ধিত করে, খুব বড়ো একটা কিছু পাইবার সোজা বাড়াইয়া দেখ, কিন্তু, গোটাক করে কায়দার অতিরিক্ত ব্যবহারে গোটাকতক রং-এর এমন উন্মুক্ত চক্কা পড়িয়া গিয়াছে যে ক্যানভাসের অনেকটা ভারগা খালি-পড়িয়া আছে। চোখে বড়ো লাগে।

রবীন্দ্রনাথের ‘জীবন-স্মৃতি’ এই প্রসঙ্গে স্মৃতিগথে আসিয়া পড়িতেছে। ‘আত্মজীবন কাহিনী-হিসাবে বইখানির বিশেষ কোনো মূল্য নাই, তদ্বিষয়ের বাগানী লাড় ভিগ্গেছে বইখানি বিশেষ কোনো সোনাফা করিলে না। কিন্তু তবু বইখানি অমূল্য—ইহার জোড়া মেগা ভার। সাহিত্য-হিসাবে আট-হিসাবে ‘জীবন-স্মৃতি’র স্থান কোথাও এ-প্রসঙ্গের উত্তর কোনো সাহিত্য-মণিকেরই অজানা নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘জীবনের ছবি আঁকিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁর স্থায়ী জীবনের

ছোটো-বড়ো অনেক কাহিনী আট-সৃষ্টির তাগিদে নিষ্ঠুর সংঘর্ষের সহিত বাধ দিয়া গিয়াছেন,—বইয়ের গোড়োতেই তাঁর উল্লেখ আছে। ভাব এবং আবেগের এই অসংঘর্ষ বিভূতিভূষণের জন্ম বর্ধনমানে করতালি আহরণ করিয়া আনিয়াছে বটে, কিন্তু এই করতালির স্বায়িক-সংঘর্ষে ব্রহ্ম তদ্বিষয়ের জন্ম ও আসরা নিশ্চিত হইতে পারিতেছিল না।

অপুটিক অমূল্য হইয়াই উঠিতে পারিয়াছে কি না, অর্থাৎ ‘অপু’র অমূল্য হওয়ার মধ্যে কোনো অসদৃশ্য আছে কিনা যে-কথা একটু আলোচনা করা দরকার। ভালো-লাগা মন লাগার প্রশ্ন এখানে মূলত্বীয় থাকে।

মূল্য মূল্য অপরাজিত জীবন-রঙের কি অমূল্য মহিমাতেই আমার আত্মকাল কলম! (পৃঃ ৩১৯)

বৃষ্টিতেই এই জীবনরঙকে আমাদের সমুখে উন্মোচিত করিবার জন্ম বিভূতিবাহু যত্নের ক্রটি করেন নাই। ‘অপু’র জীবনের ধারাকে অমূল্য রাখিবার জন্মই কাঙ্ক্ষক তাঁহার প্রয়োজন,—অপূর্ণ এই বিরাট জীবন-রঙভাগ্যের কাঙ্ক্ষকে ‘ভাগ্যইয়া দিয়া সরিয়া পড়িল, সে নেহাতই গৌণ। অপূর্ণ পাড়ি দিয়াছে সমস্ত সৌরভগণ অতিক্রম করিয়া একটা অচেনা অসীমের অভিসারে। ছাঁচ হাজার বছর আগে নৃপাধ্যক্ষ গোপালগোবিন্দ বনে নদীর তীরে রোজ-রুজ-রুজ-রুজের দরিত্রদের সে জন্মিয়াছিল, সেই কথা সে ভাবে; আবার মধ্যযুগে রাইন-নদীর ধারে কর্তৃ, ওক, নারি ও বীচ-মনের ছাত্রায় বনেদী-ঘরের প্রাচীন প্রাণসো হইতো সে জন্মিয়াছিল সে-কথাও সে কল্পনায় দেখিতে পার; হাজার বছর পরে সে হইতো আবার পৃথিবীতে কিরিয়া আসিলে, এ-স্বপ্নও সে দেখে।

‘জীবনের ও জন্মভূমির বিশেষ বাহুর রক্ত ও আনন্দিত আহার সে কি অপরাজিত জীবন! (পৃঃ ৩১১)

‘অতঃপূর্ব মূহৎ এবং বৃহৎ পরিকল্পনা সন্দেহ নাই। ‘অপু’র মনোবাহুর অশেষ অভিসারের কল্পনা লইয়া যে আমাদের এই শত-যুগ-জর্জরিত পৃথিবীতে মহানন্দে মিন কাটাওয়া দিতে পারে সে নিত্যকৃত ভাগ্যবান। অনন্তজীবনের কল্পনায় বাহার কাছে ‘পৃথিবীর জীবনকৃত’ ক্ষুদ্র ভাগ্যসামান্য সে-যে ক্ষুদ্র মাহুদের দুঃখের গভীর তদ্রূপে স্পষ্টাভিত্তি পায়ে না

তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। তাহার কার্যনিক একাকারতার মৃত্যুশ্রী ব্যতীত না-বোম, অপর্য্য, লীলা সবাইকে যে ভাসিয়া নিষ্কিঞ্চ হইয়া বাইতেই হইবে। অশু নিমেষের কথা ভাবিয়া দেখিতেছে :

‘কৈ, এত বিকল্প ঘটনার ভিতর দিয়াও তাহার মনের আনন্দ কেন নষ্ট হয় নাই? নষ্ট হয় তো নাইই, কেন তাহা দিনে দিনে এমন অজুত ধরণের উজ্জ্বলিত প্রাচুর্য্য বাড়িয়া চলিয়াছে...। এই জগতের শিখন আর একটা যেন ধ্বংস আছে। সে ধ্বংসটার সঙ্গে যোগ-সেতু তখন স্থাপিত হয় তার মাঝে—বির যখন যায় যায়। তার পরে অসিন-বা—অসিন—সর্বশেষে বীণা। তবুও অশুর পায়ারার সারা জীবন ঘরীয়া পাড়ি দিয়া আসিয়া আজ যেন মরুপথে সে সেপের তাকীয়েবেরা অস্পষ্ট নকশে আসে। (পৃঃ ৫৫০-৫৫১)

‘দ্বিতীয় অশুর পায়ারার’—কথাগুলি শুনিতে ভালো, কিন্তু অশুর জীবনের সঙ্গে মিশাইয়া-পড়িলে নিতান্তই অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। যে মাহুদ এই পরিতৃপ্ততার জগৎটার পেছনে অশুর একটা ‘অশুত্ব’ জগৎ দেখিবার জুজ উল্লুখ হইয়া আছে তার কাছে সামান্য মাহুদের মৃত্যু এমন একটা কিছু সাংঘাতিক ঘটনা নয়। না বা অপর্য্য বা লীলার মৃত্যুর পর অশু বহি অশু কেলিয়াই থাকে তবে তাহা জমিয়া দ্বিতীয় পায়ারার হইয়া ওঠে নাই—তাহা গ্রন্থকারের হাতে-কলমে চোখে পড়ে-কি-পড়না-গোছের একটি ছোট্টো বাল নাম হইতে পারে, এবং উহা কখন যে অশুর আত্মজীবনের উত্তর দরজায়িত শুক বিশাল হইয়া গিয়াছে কেবল বুদ্ধিতেই পারিল না। তাহার মনে আনন্দ ‘দিনে দিনে অজুত ধরণের উজ্জ্বলিত প্রাচুর্য্য বাড়িয়া চলিয়াছে’ তাহার ক্ষেত্রে অশুর পায়ারার বিধির এক-শা সত্ত্বের দিকটা কবিত্তে ইচ্ছা করে না। এত বিকল্প ঘটনার ভিতর দিয়াও অশুর মনের আনন্দ কেন নষ্ট হয় নাই এবং কেন তাহা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে অশুর এই প্রশ্নের উত্তর আমরা—দিতে পারি। ভবপূর জীবন-বাগন ও আত্মিক জীবনের পথে অপর্য্য-লীলার দল প্রত্যেককেই যে এক একটি বাধা। যিন্দে একটি মাহুদের ধাম-কোলা পরিতৃপ্ত করিবার জুজ দ্বার্য্য মৃত্যু আসিয়া সে-বাধা বার বার দূর করিয়া দিয়াছে। অপর্য্য-লীলা-সর্বজগৎ মরিয়াছে মৃত্যুর অমোঘ আচ্ছাদনে, তাহারা না

অপর একটি মাহুদের প্রশ্নোত্তরের তাগিদে। তাহারা না মরিলে অশু যে বাঁচেনা। নিশ্চিন্দপূর ফিরিয়া অপর্য্য প্রশ্নকে যে-চিঠি লিখিয়াছিল তাহা একটু ভালো করিয়া পড়িলেই অশুর চরিত্রতা ও স্বাধীনতা বরা পড়িয়া যায়। যে-আশ্রয় জীবন বাগ্নি করিত অশু ছুটুক উঠুক করিয়া তাহা সচেতনভাবে নির্ভিক করিয়া আচ্ছাদিয়া ধরিবার মতো মনের জোর তার নাই।

আবার এক বালাসদ্বিনী এখানে (নিশ্চিন্দপূর) আসেন। তার কাছেই কবে (কালকে) যেনে যায়। ‘এর সম্ভাবনা না পেলে যিগেলে বালা কখনও ঘটে উঠত না, শোকারে যেখানে-সেখানে ফেলে দের পায়ের না হো? (পৃঃ ৫৫০)।

‘অত্যন্তিক কথা। যে-মাহুদ চরিত্র, তাহার জীবন-বাগ্নির কোনো মনুষ্য হাবিহিত বুদ্ধিসহ মানি নাই, যে তাহার অকীটের জুজ অশুরের একটা কিছু করিবার সাধনা পায় না সে তাহার তথাকথিত আদর্শগানের জুজ অপরাজিত জীবন-রহস্যের উত্তরাধিকারীকে বালাসদ্বিনীর কাছে গচ্ছিত রাখিবে এবং আবার তাহাকে বাগ্নির বোমা পিছু ডাকিতে পারিত তাহারিগকে মৃত্যুগণ দ্বার দিয়া আকর্ষণ করিবার সম্ভাবনার বাহিরে পৌছাইয়া দিলে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। যে-কারণে কাজলকে যেখানে-সেখানে ফেলিয়া অশুর বিপক্ষে পাগল ঘটিয়া উঠিত না, টিক সেই কারণেই জীবিত সর্বজগৎ আত্মা লীলাকে ‘ফেলিয়াও যাওয়া হইত না। তাই, যে-হস্তভাগিনীদের দেখা-শোনা করিতে কোনো বালাসদ্বিনীই রাজি হইবে না, তাহারের জুজ মৃত্যু তার সত্য-কল্প মনুষ্যকর প্রসারিত করিয়া। বাহিরের ডাকে গৌতমের অশুর বেবিন কাঁদিয়া উঠিয়াছিল সে-দিন শিশু-পুত্র বা ওঝিনী গোপার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিবার তার সময় ছিল না। বৃহত্তর জীবনের আদর্শের আহ্বানে অন্তঃকরণে বন্য সাড়া লাগে তখন সাংসার গুচ্ছাইবার সময় থাকে না। অশুর জীবনে বড়ো ও উঁচু কিছুই নাই বলিনা, কিয় বিকৃতিবাবু যত বড়ো বা নত উঁচু বাইয়া আদর্শগকেই বৃদ্ধাভিত্র চেষ্টা করিয়াছেন টিক ততমানি হয় না। অশুর ইচ্ছাশক্তি চরিত্র, চিন্তাশক্তি শিথিল, ভাবনাগুলি এলোমেলো; সে একটা অদৃশ্য অদৃশ্যজির হাতে নিজে যে ছাড়িয়া

বিরাছে সে-কথাও তার জানা নাই। অশু যে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতে পারিয়াছে,—বাহিরে জুজ তাহার পরের শেষ নাই,—সে শুধু বিকৃতিবাবু যর ভাবিয়া দিয়াছেন বলিয়া, বহু-ছাড়িবার অদমা তাহার নয়।

অশু প্রশ্নকে কবিতা লিখিতেছে :

জীবন যুব বড় একটা রোমান্স—বেরে থেকে একে ভোগে করাই রোমান্স—অতি তুচ্ছতম, হীনতম, একশের জীবনও রোমান্স। এ বিদ্যারী এতদিন আমার ছিল না—বাহুয়ু লাভলাভিক করে’ বড়োদেই ছিল জীবন সার্থক খেল (?)—তা না, বৈশ্বদ্যু তাই—কলসাকার খেলটি কিন্তু তুচ্ছ জীবন-নির্ঘেই যেমনসকার বড় বড় লোক দিন কাটায়। (পৃঃ ৫৫০-৫৫১)

‘বেরে থেকে জীবন ভোগে করাই যদি রোমান্স’ হয় তবে সে-বাচিবার অধিকার কি অশু-ছাড়া আর কারোরা থাকিতে নাই? ‘একশের তুচ্ছতম’ জীবনও যদি রোমান্স হইতে পারে তবে কলসাকার বড় বড় লোকের উপর অশুর কপ্পাই বা কেন? ‘তুচ্ছ জীবন’ লইয়াই তাহারা অশুর জীবনের রোমান্স অহুত্ব করিতেছে না এ-কথা অশু কী করিয়া জানিল? ‘নেমস্তর থেকে ভালো ছাঁদা বাঁধিয়া আনিতে পারিলে’ অশুর মার যে-আনন্দ হইত টিক সেই আনন্দই যদি বড়লোকের মেয়েরা নতুন মোটর কিনিয়া পায় (পৃঃ ৫৫১) তাহাতেই বা ক্ষতি কি? ‘আনন্দের’ পরিমাণ যদি মানাই হয় তবে বড়লোকের মেয়ের আনন্দ আনন্দ-হিসাবেই বা নিম্নরূপ কিমে?

‘সে (অশু) এই মনুষ্যজগতি নারীকেই সারা জীবন বেবিয়া আসিয়াছে—এই সেহমতী প্রেমমতী কলসাকারী নারীকে—(পৃঃ ৫৫২) অশুর মতো ভালো ছেলের পক্ষে এ অতি উত্তম কথা। প্রেমমতী বলিতে বিকৃতিবাবু কি বুঝিয়াছেন বুঝিয়াছেন না। নারী যে মনুষ্য-রূপকে তিনি ফুটাইতে গিয়াছেন তাহার প্রতি আশ্রয়ও শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু যারো অনেক বেশি শ্রদ্ধা আছে নারীর সেই-রূপের প্রতি নিঃশেষ নারী তার সত্যকতার প্রেমের সৌন্দর্য্য পূর্ণ বিকশিত হইয়া পূর্ণকর জীবনকে শুধু আনন্দ নয়, পরম স্বাধীনতা ও নারী পরিতৃপ্ততার পথে আগাইয়া দিতে পারে। প্রেমের সে

চিন্তা-লোভন ও নয়ন-মোহন ছবিকে আমরা এই হয়ত পূর্ণাঙ্গাণী বইয়ের মধ্যে কোথাও পাই নাই। কেবল লীলা-অশুর সখ্যকর মধ্যে সেই ছল-ভ সামগ্রী অস্পষ্ট আভাস ও ভালা-ভালা ইঙ্গিত যেন পাই-পাই করিতেছিল; অক্ষমতাই হোক বাহার প্রশ্নোত্তরের তাগিদই হোক লেখক তাহাকে ভালোভাবেই হত্যা করিয়া ফেলিতে পারিয়াছেন। নয়ননারী এই প্রেম-সখ্যকর মধ্যে-যে মঙ্গল নাই, সেহ নাই বা কলসাকার নাই—এইভাবে একেবারেই অশুচ্ছেদ। তবু, নারীর যে ‘অমঙ্গল-রূপের প্রতি বিকৃতিবাবু কটাক করিয়াছেন, অশু বাহা আমাদের কাছে নারীর শ্রেষ্ঠ রূপ, সে-সখ্যকর আমাদের কোনো নাশিন্দই থাকিতনা যদি না গ্রন্থকার সে-দিকে আমাদের আশাকে না পৌছাইয়া তুলিতেন। অশু-লীলার বাসোর খেলা-সাবী-সম্পর্কে বুদ্ধিতে পারি—হনী ও বড়িরের মিলন খেলা-প্রাণধনের ভেদাকারীর সমস্তলক্ষ্যের সহজেই হৃদয় ও শোভন বহুদূর উঠিতে পারিয়াছে। কিন্তু চিত্রদর্শিত্ব অশুর বাসোর বহুদূরকে বিস্তারিত লীলার যৌবনের স্তরে টানিয়া আনার মধ্যে কোনোই অর্থ থাকেনা যদি না তা’ একটি নিবিড় প্রেমের সার্থক না হইয়া ওঠে, কেননা নয়ননারীর প্রেমও শিশুর আনন্দের মতো অভিজ্ঞাতার বা-ঈর্ষ্যের সমান করিয়া ফেরেনা।

অশু বেরিন ভাবনাপূরে যাঁরা শুনিব লীলার একটি বড়লোক এঞ্জিনিয়ারের সাথে বিবাহ হইয়া গেছে সে-দিন তাহার মুখ ‘বিরল’ হইয়া গেল এবং তাড়াআড়ি বাহিরে চলিয়া আসিল। জগৎটা তাহার কাছে ‘নির্জন, সঙ্গীহী, বিবাদ ও বৈচিত্র্যহীন টেকিল’। মরুভাষে ‘অন্ধকারের মধ্যে সে উদ্ভাসিত’র মত অনেককণ যুগিয়া ডোলাইল। লীলার বিবাহ হইয়াছে, খুবই আনন্দের কথা, ভাল কথা। ভালই তো! (পৃঃ ৫৪৪)। My lady protesteth too much। যে ‘মঙ্গলজগতি’ নারীকেই আশা-আশাধারীর মতো বেবিয়াছে বিপত্তিগত অবস্থায় তাহাকে বিবাহিত হইয়া হইতে দেখিলে যদি জীবন হঠাৎ ‘বিবাদ’ হইয়া যায় তবে কথাটা বড়ো ভালো বলিয়া ঠেকেনা; কেননা যেন একটা অমঙ্গল-ঘোলের গন্ধ আসিলে নাকে লাগে। চাঁদপানীর ইঙ্গুলে পড়াইবার সময় অশু লীলার একটি

চিঠি পাইয়াছিল। সে চিঠি পাইয়া 'কোথায় গেল অপুর চাকুরী ঘাইবার দুঃখ—কোথায় গেল গোটা ছুটি বৎসরের পাখা-ভালের মত নির্জনতা—নারী-দ্বয়ের অপরূপ রসায়নের প্রলেপ তাহার সকল মনে সকল অঙ্গে কি যে অনিন্দ ছড়াইয়া দিল! শীলা যে আছে!..... (ডটগলি এছকরের) সব সমুদ্র তাহার জল ভাবে—দুঃখ করে, জীবনে অপুর আর কি চায়?.... (ডটগলি এছকরের) সাক্ষাতের আবশ্রুক নাই, জগজগতের ব্যাপিয়া এই পশুটুকু অক্ষয় হইয়া বিরাজ করুক।' (পৃঃ ৩৬৭) যে-নারী বিবাহের পরেও বাসোব সমীর কথা 'সব সময় ভাবে, দুঃখ করে' তার মধ্যেও ত্রি-ট্রিক 'মঙ্গলকলিণী' নারীকে যেন দেখিতে পাই না। আর, বাহার কথা ভাবিয়া অপুর আর কিছুই চায়না, শুধু জগজগতের ব্যাপিয়া এই পশুটুকু বিরাজ করুক কামনা করে, তাহার সমুদ্রের পর বাসায় কিরিবার সমস্ত অপুর শুধু তাহাতে পারিল—'হায় রে পাগ, হায় পুণ্য।' এ-কথা 'পষ্ট' করিয়া বলিতে হইবে যে অভিযোগ আমাদের এই নয় শীলার চিত্তিকে অপুর মনে মনে আরব করে,—অভিযোগ এই যে সে আরো বেশি করিয়া আরব করে না কেন। আমরা শীলা-অপুর সম্বন্ধের মধ্যে প্রেমের সার্বকথা বা ব্যর্থতা দেখিতে চাহিয়াছিলাম। এই চাওয়ার জন্ত গ্রন্থকারই বার বার তাহার পার্শ্বকে প্রলুপ্ত করিয়াছেন।

পটেবরীকে অপুর বের করে। সে যেদিন মাথের কনকন্দ শীতে রাত দুপুরে স্বাধীন হইতে নির্দয়রূপে প্রদত্ত হইয়া অপুর-মাথারের জানালার পাশে আসিয়া ছাড়াইল এবং ক্রীড়িতে ক্রীড়িতে বলিতে লাগিল, 'আমি আর সেখানে যাবনা' (পৃঃ ৩৬১), অপুর তখন উত্তর করিল, 'আজ্ঞা, জল চল, হোমায় বাকীতে দিয়ে আসি.....এত ব্যস্তের কি এ-ভাবে বেরকতে আছে!.....ছিঃ—একি ছেলেমানুষি!' অপুর মতো ছেলে-মানুষের পক্ষেই একটি নারী-জীবনের এই নিদারুণ ট্রাজেডিকে—যে ট্রাজেডিক রকমীরা একটি স্ত্রীলোককে শীতের গভীর রাতে ঘরছাড়া করিয়া অনিষ্টে পরে—সামান্য ছোট একটি 'ফিঃ' বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে। আর এই পটেবরীকে উপলব্ধ করিয়াই যখন তার

ইঙ্গুরের চাকুরি গেল সে 'জার্লিন' হইলনা বলিয়া 'রাগে ও ক্ষোভে' (পৃঃ ৩৬৩) অনারাগে বাসকের মতো ক্রীড়িতে পারিল, নিজের মনে মনে নাশিল করিতেও সে যথার্থ করিল না।

আসল কথা, অপুর একেবারে অপরিশ্রুত, একেবারে ছেলেমানুষ। বহির্জন বছর বয়সেও সে ছেলে-মানুষ। পরিণত বয়সেও নিত্যন্ত কাঁচা অপরিশ্রুত মন লইয়া সে যে-সমস্ত কাণ্ডকাণ্ড করিতেছে তাহাতে তাহাকে childish বলিতে পারি, child like নয়। পূজার ছুটিতে গেল বছর বাড়ী বেড়াইতে, সেখানে সবাই মিলিয়া তাহাকে একটি বড় গছাইয়া দিল, সেও গুসি হইয়া আসিল। চন্দ্রপানীর্ষ হইতর জীবন-বাগনে সে হঠাৎ পড়ি হইয়া গেল। চাকুরীটা না গেলে আর কত দিন এ জীবন চলিত কে জানে। এমনি আত্মা অনেক উদারবন দিয়া প্রাণক সাহস হইয়া গড়ে যে অপুর চিরকাল একটি অনির্দিষ্ট instinct ধারা চলিত হইয়াছে, যেমন শিশুরা পা গুহায় হইয়া। তার মনের সেই পৌরুষ, সেই অকৃত্রিম দুর্জয় চমকহাসন নাই বাহার ধারা সে নিজের জীবনকে গড়িতে বা ভাঙিতে পারে। সে যেন একটা কাঠের বল-ধাক্কা দু'ও গড়াইতে থাকিবে, ধাক্কার শক্তি নিঃশেষ হইলে ধাক্কা থাইবে।

এবং এই প্রাদেহই আসিয়া গড়ে ভালো-লাগা মন-লাগার কথা। এই মনোরহীনতা আমাদের ভালো লাগেনা। স্নানকে মাঝে ছই এক জায়গায় যে অপুর ভালো হইয়া গেলে নাই সে কথা সত্য নয়, কিন্তু সব-কিছু মিলিয়া সব খোঁজে মনে হই অপুর শব্দর-হাস্যকৌশল ও গুরুত্ব একটা অস্বস্তি থিড়ু। হয়তো কথা উঠিতে পারে ত্রিক এমনিটিই বিভূতিভূষণ পাড় করাইতে চাহিয়াছিলেন। তার উত্তরে বলিতে ইচ্ছা করে: যে-বালিক সৎসারের দারিদ্র্য সহ্য করিতে না পারিয়া পাঠাফের নির্জনতার সমস্ত জীবন তপস্যা করিয়া কাটাইল সে আমাদের মনকে টানে; কিন্তু সেই ব্যক্তি আমাদেরকে আরো বেশি করিয়া টানে যে কপিলাসর নৃপতির মতো মাথেরে নিবিড় বরণা এবং নিজের বিপুল শ্রমখোর ভাঁর সহ্য করিতে না পারিয়া খেজার সজনে ধুবক উৎপাটিত করিয়া ঘরের আশ্রয় ছাড়িয়া যাইতে পারে।



বেশখাছিয়া স্পোর্টিং-ক্রানের হাবলুকে চিনি না এ-কথা বলিলে আর যে কেউ কখনো করুক কিছু আমরা করিব না।

কারণ একটি ছাড়া আর একটি যে কোনো ক্রমেই চলিতে পারে না এ কথাও অঙ্কলের পাঁচ বছরের ছেলোট গাধা জানে!

চোখ আছে বলিয়া দেখিতে পাই এ কথা যেমন সত্য, হাবলু আছে বলিয়াই লোকে স্পোর্টিং-ক্রানের খেলা দেখিয়া ক্ষ হয় একথাও ত্রিক ভেতননি নিচুল।

খেলার জিতিয়া আসিলে হাবলু ক্রানে বসিয়া সেকালের রাব-জাবাদের ধরণে পা নাচাইতে নাচাইতে—চায়ে চুমুক কিয়া চুকটে টান দিয়া হাসিতে হাসিতে বলে, দিয়ে এলাম টুক—জুগোলা। আর কোনদিন স্পোর্টিং-ক্রানের এ সুখো হবে না।

যেদিন হারিয়া আসে সেদিনও তাহাকে গুব বিমর্ষ যে রোগ্য তা নয়!—কিন্তু হঠাৎ তার এক দূর সম্পর্কের ভাইয়ের স্ত্রী-শোক মনে জাগিয়া ওঠে। চুকটে-টাইবেল টুকিতে টুকিতে বল, থাকুত ভাইটা—কেননা ব্যাটারি গোল দিয়ে যায় এবার দেখে নিতুন!

তার কোন এক ভাই খেলার নাকি একেবারে অধিভায় হইয়া উঠিয়াছিল, যে বছর তার মোহনবাগানের হইয়া গেলিবার কথা সেই বছরই একদিনের অরে কি করিয়া সমস্ত খেলাঘড়-দলকে রাস্তায় বসাইয়া হঠাৎ সে পটল ভুজিয়া

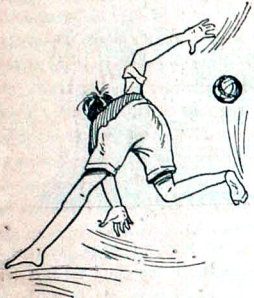
ফেলে,—সেকথা ক্রানের সবাই গুব কম পক্ষে তাহার সুখে হাজিরবার ভবিষ্যৎ। কিন্তু বলিবার কথা এই যে জিতিয়া আসিলে এই স্ত-ভাইয়ের জন্ত তার কিছুমান মাথা-বাখা দেখা যাইত না!

জিতিয়া আসিলে হাবলু গাঁটের কড়ি ভাঙিয়া মলের সবাইকে ঘ্রিকি খোঁষের গরম সিঁড়িটা খাওয়াইত কিন্তু হারিলে আর রক্ষা ছিল না। কে কোথায় কোন 'পয়েন্ট' 'মিস' করিয়াছে তাহা যেন সে একেবারে ভাইরীতে শিখিয়া নিয়া আসিত। সেই সঙ্গে এ কথাটাও বলা প্রয়োজন যে হাবলুর জন্ত তাহার দল কোনদিন গোল খাইয়াছে,—এ কথা তাহার শরুতেও রটাইতে পারিবে না। কারণ খেলার মাঠে বল হাবলুরের পা পশ্চ করিবারও সৌভাগ্যলাভ পেরে না!—হাবলু স্পোর্টিং-ক্রানের সেক্রেটারী। কিন্তু হইলে

কি হইবে—ফুটবল খেলার সমস্ত কায়া-কালন তাহার একেবারে কদম্ব। কী ভাবে দেহটাকে বাকিয়া বা-পা-টাকে পেছন দিকে হটাইয়া দিয়া হঠাৎ কর্তার হইতে 'হুট' করিলে গোল অনিবার্য এ প্যাঁচ তাহার দলের প্রত্যেককে যে কতবার শিখাইয়াছে তাহা একমাত্র ভুলভোগী সে-ই ভালো করিয়া জানে। থাকিত তাহার ভাইটা বাজিয়া তাহা হইলে শিখাইয়াও হুখ ছিল।

গত পাঁচ বছর ধরিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষার 'উপস্থিত' হওয়াই তাহার একমাত্র পেশা ছিল। 'শেষটার তাহার পিতা

একদিন কাছে ডাকিয়া তাহাকে সে দায় হইতে নিবৃত্তি দিয়াছেন। কিন্তু গোপনে যে-কয়ট কথা বলিয়াছেন, তাহা



কী ভাবে বেইটাকে বাকিয়া.....

কাহারো সন্নিহার সৌভাগ্য হয় নাই। তবে ছুটলোকে রটাওয়া বেড়ায় যে কথাগুলি নাকি মোটেই মুখরোচক নয়!

ক্রমে আসিয়া হাবুল সকলের সামনে বুক ঝুঁকিয়া বলিল, বাবা 'কিনিয়াসের' করব বোঝেন। ডেকে যান, খেলাতেই তুমি 'সাইন' করতে পারবে, ঐ একটা 'সাইন' নিজেই থাকা ভালো।

কয়েকট কথা ছেলে নাকি এই কথা সন্নিয়া মুখে রমাল চাপা দিয়া হাসিয়াছিল। হাবুল তাহা দেখিতে পাওয়া কহিল, আন রবীন্দ্রনাথও ঠিক এই রকম 'জেনারেল লাইনের' মাথার বুটের তৌকর ঘেরে 'আপনার' গুণ আপনাই তৈরী করে নিয়ে ছিলেন? আর তাতে সব চাইতে বড় সহায়ত্ব কীর কারণ থেকে পেয়েছিলেন?—যহুং মংখি দেবেন্দ্রনাথ।

ইহার পর আর কেহ তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহস পায় নাই।

হাবুলের পিতা কন্সট্রাক্টরী করিতেন, কাজেই এই নম্বর ভগ্যতে যে কিনিয়াসের সব চাইতে প্রয়োজন বেশী, তাহা বেশ মোটা রকমেই ছিল। অল্প বয়সেই সখ করিয়া ছেলের বিবাহ দিয়াছিলেন, তখন হঠাত ভাবেন নাই—খেলার ভিতর দিয়েই এমন কতরা তিনি একদিন পুত্রহত হইয়া পড়িবেন।

'কিনিয়াস' হাবুল আজ মোহনবাগানের খেলা দেখিতে বাইবে। 'অস্ত্রের' দেখা এবং হাবুলের দেখার মধ্যে যে বড় তফাৎ তাহা শোটিং-ক্রমের ছেলেরা যেমন জানিত এমনটি আর কেউ নয়।

কথা ছিল সবাই এসম্প্রদানের সেই গোল খরটায় গিয়া জমায়েৎ হইবে, তারপর এক সঙ্গে টিকিট কিনিয়া ভিতরে ঢোকা হইবে।

গোল ঘরে সকলে এক সঙ্গে জমা হইল এবং খেলার মাই পঞ্চাঙ্গও সবাই এক সঙ্গে গেল কিন্তু টিকিট কিনিতে গিয়া তত্ত্ব কড়ইয়ের ভিতর গরম বাগিতে ভাঙা খয়ের মত কে-যে কোথায় ছুটকাইয়া পড়িল তার আর কোনো পাতাই পাতয়া গেলো না।

কিছুক্ষণের জন্ত হাবুলের মনে হইল তাহার পা-ছুটি যেন হঠাৎ মাটি ছাড়িয়া উড়ে উঠিয়াছে এবং কি রকম যেন একটা জোয়ারের টানে সে মাঠের ভিতরই ছুটিয়া চলিয়াছে।

চরণ মুগল বহন ভূমি স্পর্শ করিল—হাবুল দেখিল সামনেই ছুটি লোকের মাথ খানে ছোট একখালি মাথয়া রহিয়াছে।

সে যেমন ওখানে বসিতে বাইবে হঠাৎ ছই দিক হইতে এক জোড়া ভুঁড়ি অগ্রসর হইয়া যারগাটাকে ভরাট করিয়া ফেলিল।

গেলেন হইতে একটা গলা শোনা গেল, সেই সকল আটটা থেকে বসে তাম্ পিটুছি মশাই, ঐ আমাদের পা টান করবার মাথয়া। এখানে সুবিধে হবে না।

হাবুল চোখ দুইটি উপর হইতে একটা সখ গলার ডার স্নিততে পাইল, ও মশাই ওপরে উঠে আসুন, মাথয়া আছে।

মাথা তুলিতেই বাহার সহিত চোখোচোখি হইল তাহাকে সে কীভাবে কোমরিন দেখিয়াছে বলিয়া মনে পড়িল না।

ভয়লোক ভুল করিল না ত! কিন্তু না তাহাকেই ত! আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। বেলগাছিয়া শোটিং-ক্রমের একেটরা সে! সে না চিরকু কিন্তু সবাই তাহাকে যে ক্রি-রকম পাতির করে তা' তাহার অজান ছিল না।

উৎফুল্ল হইয়া কোনো রকমে দুই এক খাপ উঠিতেই ভয়লোক একরকম টানিয়াই তাহাকে উপরে তুলিয়া লইয়া পাশে বসাইয়া দিল।

প্রকাণ্ড একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া হাবুল সবে পকেট হইতে রমালটা বাহির করিয়া কপালের খাম মুছিতে বাইবে এমন সময় ভয়লোকটি অগ্রাহ-সহকারে বলিলেন, এইবার মিন মশাই—!

হাবুল অবাক হইল,—মিন! কিন্তু কি বিবে সে! এই উপকারের জন্ত ভয়লোক টাকা পরয়া দিশুই চাহেন নাই। বিশেষ অপ্রসন্ন হইয়াই প্রশ্ন করিল, কি দেখো বসুন ত?



—মাংস মশাই নাকি!

ভয়লোক এক গাল হাসিয়া বলিলেন, নাকি মশাই নাকি! ঐটির অভাবে একবারে মায়া ঘাঞ্জিলুম মশাই। শীকারী বেড়ালের গৌণ, দেখলেই চেনা যায়—! আপনার নাকে লেগে রয়েছে বেগুই ত' ডাবলুম।

ভয়লোক নিজের বসিকতায় নিজেই হাসিতে লাগিল।

তাহার নাকে নাকি! কিন্তু হাবুল ত' কখনো নাকি বাহবার করে না। নাকে হাত বিড়তে দেখিল, খানিকটা মাটি লাগিয়া রহিয়াছে। টিকিট কিনিতে গিয়া আছাড় খাইবার চিহ্ন!

ভয়ে ভয়েই বলিল, নাকি ত' আমি নিই-না মশাই। ভয়লোক যেন একবারে নন্দন-কাননের সুখ-স্বপ্ন হইতে সাধারণ মনস্তম্ভিতে নিকপ্ত হইলেন। তারপর হঠাৎ বায়ের মত লাফাইয়া উঠিয়া কহিলেন, নেই! তবে এখানে এয়েছেন কি করতে? বলিয়াই পিছনে এক থাকা!

হাবুল গড়াইতে গড়াইতে একেবারে সোজা নীচে পড়িয়া গেল।

মাথা উঠাইয়া উপরের দিকে চাইতেই দেখিতে পাইল—দক্ষিণে, বামে উপরে, নীচে—আশে পাশে শুধু রাশি রাশি নরমুণ!

মনে হইল কেন্দ্র এক আদিকালের কাপালিকের গুপ্ত-কক্ষে 'আসিয়া' পড়িয়াছে সে!

দূর ছাই—এখন হইতে বেলা দেখা তার-পোয়াইবে না। কোনো রকমে নিজেকে টানিয়া তুলিয়া মাঠের বাহিরে আসিতেই বাগেশের সঙ্গে চোখোচোখি হইয়া গেল।

গণেশ রাবেরই ছেলে। কহিল, তাকে খুঁজি ছিলুম—গাছের ওপর উঠে চমৎকার খেলা দেখা বাবে।

হাবুল কহিল, আমি যে গাছে চড়তে জানিনে কিন্তু তাই বলে খেলা না দেখেও কোনো মতে যেতে পারবো না। তুই এর একটা উপায় কর, আমার মাথা কি-মি-কম্বো। গণেশ তাহাকে টানিয়া লইয়া বাইতে বাইতে কহিল, সে ভয় নই তোমার,—সোজা মই বেয়ে উঠে যাও।

গিয়া দেখা গেল—গাছে উঠিবার চমৎকার ব্যবস্থা। ইতিমধ্যে বহলোক কিকিদ্ধার জাতি-গোষ্ঠীকল্প অনেকগুলি শাখা-প্রশাখাই বখল করিয়া বন্দিয়া আছেন।

উঠিয়াছেন বটে কিন্তু অমনি নয়। গাছে উঠিতেও রীতিমত মাশুল দিবার ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে।

কোনো রকমে গাছে উঠিয়া বেলা দেখিতে নগদ দুই পয়সা বায় করিতে হইবে। যদি গাছের উপর ভালো করিয়া বাঁধ বান্ধিয়া আসনের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হয় ত' চার

পরমা। আর যিনি মইয়ের সাহায্যে বৃক্ষারোহণ করিবেন তাঁহাকে ট্যাক হইতে পশাইতে হইবে নগদ দুই গড়া। কিন্তু গাছে তুলিয়াই মই কাড়িয়া লইবার ব্যবস্থা। নামিবার সময় কোনো বন্দোবস্ত তাহার্য্য করিবে না।

হাবুল-রা মইয়ের সাহায্যে গাছেও উঠিল আবার দুইটি বাঁশও জোপাড় করিল।

টিক তাহাদের গাশের একটি নারিকেল গাছে জন-কয়েক ইঞ্চলের ছেলে মোটা-মোটা বাঁশ বাঁধিয়া দিয়া বোলা বাইতেছে। বাঁশগুলির সঙ্গে গাম্ভা দিয়া 'টিফিন ক্যারিয়ার' বাঁধা। মাকে মাকে তাহার ভিতর হইতে কচুরী ও আলুর দম তুলিয়া লইয়া মুখে পুরিতেছে।

খেলা শুরু হইতেই কয়েকটি ছোঁকা গাছের মগ-ভালের ওপর জাতীয় পতাকা উড়াইয়া চাঁৎকার করিয়া উঠিল :—

“শ্রি চিয়ার” কন্ মোহনবাগান—

হাবুলও সেই সঙ্গে ভাল দিতে গিয়া গাছ হইতে পড়িয়া যাঁতেছিল, আশ্চর্য্য গাশের তাহাকে ধপ করিয়া দখিয়া ফেলে! একে ত' এইচ, এল, আই-এর সঙ্গে খেলা, তাহার উপর পায়ের বুড়া আঙ্গুল মচ কাইয়া হুমার নামিতে পারে নাই।

যদিও গোষ্ঠী একই একস কিন্তু 'সট-টপ' লইয়া কতগণ মুখের ?

খেলা পুরাশমেই চলিতেছিল, মোহনবাগানের একটি 'চাল' কক্ষাটতেই হাবুলের কাশের উপরকার পাঞ্জাবীর ধানিকটা পুড়িয়া একটা গম্বুজের আঙনের টুকরা তাহার দেহে স্পর্শ করিল।

চুম্বিয়া উপরের নিকে তাকাইতেই দেখিতে পাইল এক বৃদ্ধ নিজেকে গাম্ভা দিয়া গাছের সঙ্গে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া হঁকো টানিতে টানিতে প্রাণপণে চাঁৎকার করিতেছে—

‘চিয়ার আপু, মোহনবাগান’!

হাবুল যথাসাধ্য বর্ধকে সংযত করিয়া কহিল, ও মশাই আন্তে, আশনার হঁকোর আঙনে আশরা ত' মাথা বাই।

তারপর উপরো-উপর শতশতাই যখন দুইটি গোলা মোহন-বাগানের ‘গোল-কিপারকে’ টাকি দিয়া ‘পোষ্টের’ ভিতর

চুম্বিয়া গেল তখন বোধকরি নিভাঙ্ক লক্ষ্যই গাছের একটা ডাল জন দশ বার দশক লইয়া একবারে ভাঙিয়া পড়িল।



চিয়ার আপু, মোহনবাগান

‘শেব মুন্ডা’ আর একটা!

হাবুলের মনে হইল, পৃথিবীতে ভূমি নাই, আমি নাই এমন কি বেলগাছিয়া পোটি-রাব পথ্যত নাই—সবু আঁছে মোহনবাগানের ‘গোলকিপার’ আর হাবুলের আঁছে এই তিনটি গোঁড় বাঁহবার নিদার লজ্জা!

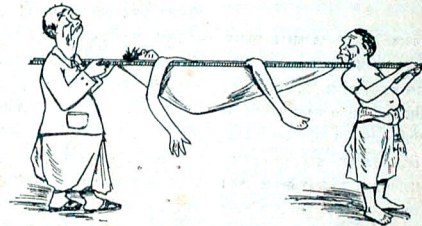
এই নিদার লজ্জার হাত হইতে সে নিরুত্তি পাইবে কি করিয়া? মনে হইল সমস্ত বিশ্ব-মেনে তাহার দিকে চাওয়া দাত বাহির করিয়া হাসিতেছে। পায়ের তলা হইতে মাটি সন্নিগা গেল, গোটা আকাশে কে যেন কালি লেপিয়া দিল। হাবুল উদ্ভাও হইয়া উঠিল!

কি-ভাবে সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল তাহা তাহার মনে নাই। কিন্তু ফিরিয়াই এই কথাই তার মনে হইল এ গ্রাম তাহার আর কোনো মতেই রাধা চলিবে না! সকালবেলা সে মুখ দেখাধৈরী কী করিয়া।

দীরে দীরে পা টিপিয়া-টিপিয়া সে দিদিমার ঘরে প্রবেশ করিল। দিদিমা একটু করিয়া আঁখি খাইতেন, কোঁটা-টি শিরদেই ধাক্কা।

‘আঙ-গাছু কিছু বিবেচনা না করিয়া সে হঠাৎ কোঁটা-টি হাতে তুলিয়া লইল। বড় এক চোলা আঁখি মুখে পুরিয়া তড়াৎতাড়ি আসিয়া নিজের বিছানার দেহে এলাইয়া দিল।

না আসিয়া থাইতে ভাকিলেন, সে ক্ষুধা নাই বলিয়া হাত এড়াইল।



তপুনি দরবার করিয়া.....

গভীর রাতি—মাথাটা যেন কেমন ভার! মনে হইতে লাগিল সমস্ত কালো আকাশটা যেন মুখের কাছে মুখ আনিয়া তাহাকে একদৃষ্টে দেখিতেছে। থম্‌থমে প্রকৃতি অসহ!

সে অহমানে স্রীর দেহটা ধরিয়া নাড়া দিয়া তীত-জড়িত-কণ্ঠে কহিল, ‘ওগো অসহ’? টিক ইহারই আগের দিন যুনের ঘোরে হাবুল ‘চিয়ার আপু গোষ্ঠী’ বলিয়া এক ‘হুট’ করিয়াছিল। কমলার কোমর বাখাটার কারণ উহাই।

আঙও অচম্ভা ডাক তনুয়া তড়াৎতাড়ি বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, ওগো, পাড়াও আমি একটু সরে বসি—তারপর ভূমি যত খুসি গোষ্ঠীকে ‘চিয়ার আপু’ কর।

হাবুল তড়াৎতাড়ি কমলার হাত ছইখানা মুঠার মধ্যে ধরিয়া কীদ-কীদ হইয়া কহিল, ওগো আমায় বাঁচাও—আঁখি খেয়েছি আমি—

তনুয়া কমলা শুরু হইয়া গেল, তারপর হঠাৎ বৃক্ষাটা চাঁৎকার করিয়া উঠিয়া বলিল, কেন এমন সর্জনশয়ের কাজ করলে? বিহতকণ্ঠে হাবুল বলিল, মোহনবাগান খেরেছে যে!—কিন্তু আমি তোমা ছেড়ে মরতে চাইনে।

কমলার চাঁৎকারে বাড়ীর কেউ দানী আর গোলক চাকর হইতে ব্রহ্ম করিয়া খবর করা পথ্যত ছুটিয়া আসিলেন।

না মাটিতে পড়িয়া হাথ হাথ করিতে লাগিলেন।

—কেন আমি আঁখি খাওয়া অভ্যাস করেছিলাম—

বলিয়া দিদিমা মেঝেতে মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন।

হাবুলের পিতা বিতঞ্চ লোক, তপুনি দরবার করিয়া

ছেলেদের লইয়া বেলগাছিয়া হাঁসপূর্তালে চলিয়া আসিলেন।

‘হাউস সারজেন্ট’ হাবুলকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, এ-ত আঁখি খাওয়ার ‘কেস’ নয় মশাই—!

হাবুলকে অনেক জেরা করিয়া জানা গেল দিদিমা আঁখি এবং চাবনগ্রাশ দুইই যেন করিয়া থাকেন এবং হাবুল ভুলভ্রমে চাবনগ্রাশ-ই একটু বেশী মাত্রায় খাইয়া ফেলিয়াছে! ডাকের বাবু যথায়োধ্য গ্রন্থ গিয়া পিতার সঙ্গে হাবুলকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

পরদিন হাবুলের বদন ঘুম ভাঙিল—তখন বেশা হ্রস্ব। খাওয়া-দাওয়ার পর পানে টোট-টোট রাঙা করিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া কমলা আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

হাবুল চোখ বুলিয়া নিঃশ্বাসের মতো পড়িয়াছিল। কপালে হাত রাখিয়া কমলা জিজ্ঞাসা করিল, এখন কেমন আছে?

হাবুল চোখ মেলিতে—ছই জনে চোখোচোখি হইবামাত্র কমলা ‘আঁচলে মুখ ঢাকিয়া ফিক’ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

হাবুল অবাক হইয়া কহিল, ভূমি হাসছ কমলা, কিন্তু যদি চাবনগ্রাশ না খেয়ে গতি-গতিই আঁখি খেতুম ত এমনি করে হাতে শাঁ পা পরে, পানে মুখ রাঙা করে আমার সামনে এসে হাসতে পারতে না।

কমলা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া জোর করিয়া তাহাকে গুঁহাইয়া দিয়া কপালে ও মাথায় ত্রিভঙ্গা বুলাইয়া দিল।

গিরিবরেন্দ্র

গ্রীষ্মনা দেখেই বৃষতে পারিছেন যে আমার বাবার জীবনের আর এক অব্যাহার আরম্ভ হয়েছে। এবার আরব সাগরের উপকূল থেকে পলন্দার তীরে উৎকৃষ্ট জাহাজ। বোম্বাইয়ে থাকতে থাকতে এলোরা ও অক্সা দেখবার পর বড় ইচ্ছা হয়েছিল রামগিরি ভ্রমণ করে কালিয়ারের বেঘ বে-পথ দিয়ে অলকার দিকে উড়েছিল—সেই পথে বাবার। মন্ত্রী ও ছোট্ট ছিল কাব্যরসিক, বালাবদ্ধ ক্রীড়াশক্ত সে। বিদ্যাপানবল্য বিশীর্ণ রোবার বহু-বিভক্ত করা থেকে আচ্ছন্ন করে বৈজ্ঞানিক বস্তু বিদ্ভূত যোতটি পঞ্চাঙ্গ সমস্ত পদাটনটা এখনও একটা অস্পষ্ট মনুষ্য স্বপ্নের মত মনে জাগছে। বাঙালী দেশে ফিরে মাস কয়েক যেতে না যেতেই অন্ধরের পথিক প্রাণীতা ত্যাগির দিতে লাগল,—তলি তুলে বেরিয়ে পড়, বনের যেনে টান আছে, পথেরও ত ভেদনই একটা দাবী আছে। অস্বীকার করতে পারান না, তাই বখন সাগরের আসবার কথা হল রাণী হয়ে গেলোম।

রাঙানার দিল্লী হওয়ার এখন বাঙালী দেশটা দিল্লী পঞ্চাঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছে। গাড়ী গামলেই লগা কোচা, টেরী কাটা, গাঙ্গারী গায়ে হামিল্‌ব বাঙালী চেহারা চোখে পড়ে। কিন্তু দিল্লী ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠে বেশ বৃষতে পারা যায় বাঙালেশ ছেড়ে এসেছি। লগা জাহাজ রঙের দাড়ী, প্রকাণ্ড পাখাড় ও গালভরা উর্দু বুলিতে আর ভরম থাকে না যে এ সম্পূর্ণ অশ্রিতরিত রক্তে চলছে। রাউন্ড কাঠির স্থানে পাওরা বায় পোতাও কাকোতা, দো-গোয়ালা, গ্রেসন-দু-। ভেতরের আলোর জানালা দিয়ে চেয়ে দেখলে আর খাল বিল, দিল্লী বন ভঙ্গল চোখে পড়ে না। কেবল ধূ-ধু করছে মাঠ, শুক বাহিরীন ধূসর। মাঝে মাঝে এক একটা জাঁকাল স্ফর যেন এই মরু-প্রদেশের সমস্ত সজীবতা হরণ করে জমে উঠেছে,—ভোজাভাজির মত চোবের সান্নায়ে ভেসে এসে নিমেষে দখ

প্রান্তরের বৃকে কোথায় মিলিয়ে যায়। কেবল চলন্ত ট্রেনখানা এই বিরাট শুষ্কতার মাঝখানে দিয়ে ধ্রুনির একটা ক্ষীণবেগে একে চলেছে। প্রাপটা বড় উদাস হয়ে ওঠে—ভাবি যে এই দেশই অস্বাভাবিকতার আদিক্রম। বাঙালদেশে ছুটা ক্ষতুই বঙ্গর বঙ্গর আনালের বহু শোনা দিয়ে এমনই ভূমিরে যোগেছে যে সেই নিয়মিত জ্বলন্ত আবহনের বাইরে এসেই সমস্ত চিন্তা বৈজ্ঞানিক বেগে ওঠে। বাঙালদেশের পরিচালন-রমণির নিদান-প্রদায়ের সুখ বাতাসটুকু এখানে চল্লি ও বর্ষার 'সেই ঘন সমারোহের আশায় এখানে বুখাই অপেক্ষা করতে হয়। এখানের অন্ধকার বৃষ্টির তুফান-শীতল শীতের দিনে বাঙালদেশের সোনালি রোদে-কেন্দ্রা কবোক্ষ শীতের দিনগুলির দ্বিত বড়ই মদুর মনে হয়। তাই বলছিলাম যে পাঞ্জাবে এসে সভ্য-সভ্যই মনে হয় বিদেশে এসেছি।

আরও একটা কারণ এদেশে এসে একটু মন্থন ঠেকে। ভারতের বাইরের মুসলমান প্রধান দেশগুলির সঙ্গে আখান-প্রদানে তাদের ভায়া, তাদের ভাব, তাদের রকু এখানে অনেক পরিমাণে প্রবেশ করেছে ও লক্ষ্যে দিল্লী বা বাঙালার মুসলমান-প্রভাব যেমন মার্জিত মোশায়েম হয়ে গেছে এখানে তা হতে পার নি। পার্শ্বতাজতির রক্ততা ও আদ্যাদানের পাঁজারী, দারসীর ক্ষুভা বেশ স্পষ্টই ধরা যায়। বাস্তবিক ফারসী ও দারসীকতা উর্দু, যে এত নিষ্ঠে ভদ্‌ভা তা এখানে এসে মনে হয় না, আর পাঁজারীর রূপ শব্দ মন্থনে মনেই হয় না যে সে-ও দেবভাণা—সংস্কৃতকন্যাক। এখানের মত থেকে লোককল, আচার-বাবহার, ভাষা-সৌভ্য সমস্তই বাঙালীর কাছে কর্কশ। বোম্ব হয় নির্দিষ্ট অব্যাহত শাখিতে কিছুকাল ধরে প্রসূক না হয়ে উঠলে কোন জাতির স্বাভাবিক এই রক্ততারা দূর হয় না। এ বিষয়ে পার্থক্যটা জাধীন ও অজ্ঞানে সব চেয়ে সহজেই প্রকাশ পায়। উক্তের জাতিতে এক, একই ভাষা বলে, একই

সাহিত্য, একই সঙ্গীত সেবা করে। কিন্তু বাগিনের রক্ষ ভ্রমতাহীন বাবহারের সঙ্গে ডিয়েনাবাসীর মার্জিত মন ভ্রম বাবহার তুলনা করলেই বোকা বায়বহ শতাব্দীর আভিজাত্যের ঐতিহ্য তার পিছনে আছে। পাঞ্জাবে সেরূপ কোন বাবহারী বা নবাবী আমলের প্রভাব না থাকার রূচি মার্জিত ও বাবহারী কোমল হয়ে ওঠবার হুযোগ পায় নি। একমাত্র মহারাজ রণজিৎ সিং একটা সামরিক সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। সে সাম্রাজ্য কিছুদিন সম্মান প্রতিপত্তি ঐখ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকলে হয়ত তার ছায়ার তলে বিভিন্ন উপাদানে গঠিত পাঞ্জাব একটা বিশেষ পরিশীলন তৈরী করে তুলতে পারত। কিন্তু তা হ'ল না, হুদিনে তা লোপ পেলে ও বিভিন্ন স্বার্থের সংঘর্ষে পাঞ্জাব যেমন আদিন কর্কশ রক্ত উগ্র ছিল তাই হয়ে গেল।

বাস্তবিক এখানে শিখ জাতটিকে দেখলে বড় নিরাশ হতে হয়। এদের সংখ্যা এত অল্প, অর্থবল এতই কম, শিক্ষাবিস্তার এদের ভেতর এত অল্পই হয়েছে যে পাঞ্জাবে জাতি-সংঘর্ষের মধ্যে এরা নিজেদের জাহির করে তুলতে পারছেন না। এদের মধ্যে থেকে আদিক সংখ্যাগৌলৈক হ'ত সেজ্ঞ ইরাজ সন্ন্যাস ক'তকটা এদের খাতির করত। এখন পাঞ্জাবী মুসলমানই বেশী সৈজ্ঞ হয়; অন্তঃপ্রাণ প্রতিপত্তিরও জন্ম কমে এসেছে। বাকী আছে এদের অল্পত ইচ্ছা জ্ঞান, সময় সময় মনে হয় বৃষ্টি প্রাচীন রাজপুতের এমনই ছিল। কিন্তু ইরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যেন এদের মেরুপও তেড়ে যাচ্ছে। এখন ছোট বড় করে ইরাজীকরণে চুলছাটো, ইরাজী পোশাকপরিধা শিখ ছাত্র অনেক দেখা যাচ্ছে। শোনো যাচ্ছে না কি বড় চুল রাখলে বাঘের মাথা ধরে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখালেই গুরুদ্বারে তাদের চুল-ছাটবার অস্বমতি দেওয়া হয়। এই সব ইরাজী-জানা শিখ-ছাত্রেরা গ্রন্থসাহেবকে পূজা ত করেই না, পাঠও করে না, বারোই না ও বোকাবার প্রয়োজনও মনে করে না। আর শিখদের মধ্যেও ইরাজী-শিক্ষার প্রসার জন্মেই বাড়ছে।

বাস্তবিক ইরাজী-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইরাজী-পোশাক পরিচ্ছদ, আদব কাযদা, হাবভাবটা পাঞ্জাবে বহুটা দেখা যায়

ততটা আর কোথাও দেখি নি। মহারাষ্ট্রে বিলাতবৈদেশ বড় বড় পণ্ডিতকে খাটি মারগটাই দেখে এসেছি। ইরাজী-শিক্ষিতদের মধ্যে ত এখানে অনেকই দুটি পারজানা পরে পথে বেহেস্তে লজ্জিত হয়। আমার মনে হয় যে, যে-সব জাত একটা নিজেদের স্বতন্ত্র সভ্যতা গড়ে তুলতে পারে নি বা সে স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ সচেতন হুদিত ভাদের পক্ষে একটা প্রবল বিদেশী সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা মানেই আত্মঘাত্যের পথ প্রশস্ত করা। এই সংঘর্ষের সময় নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে হলে একটা প্রবল আত্মপ্রত্যয় থাকার দরকার ও তা থাকে যদি নিজেদের পরিশীলন ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় থাকে ও তাতে বিশ্বাস থাকে। এখানে মুসলমানেরা কিছু ফারসী-চর্চা করেন। কিন্তু তাতে ভারতের ঐতিহ্য বা পরিশীলনের উপর প্রভা কিছু বাড়ছে না। হিন্দুরা ত সংস্কৃত-চর্চা প্রায় করতই না। সম্ভ্রান্তি অধো-মাচ্ছার চেটায় ও কয়েকজন সনাতন ধর্মাবলম্বীর উৎসাহে সংস্কৃত-চর্চা আরম্ভ হয়েছে মাত্র। কিন্তু এই ছুই সভ্যতার মিলনের চেষ্টা, বা ছোটোই আলোচনা করা ত কোথাও দেখা যায় না। অথচ আধুনিক ভারতকে ভাল করে বুঝতে গেলে সংস্কৃত ও পারসিক এই দুই সভ্যতাই ভাল করে জানা ও বোকা দরকার। আর শত বৎসর একেবারে বসবাস আচার-বাবহার করে আসা বাঙালী হিন্দুরা যে ফারসী ভাষাটিকে ও ফারসী জীবন-বাহারটিকে কতটা আপনাদের মধ্যে গ্রহণ করেছি তা ভেবে দেখলে আর ফারসী এড়িয়ে চলার কল্পনাও ওঠে না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের রোমে রোমে ফারসী প্রবেশ করেছে, ইরাজী তার ভূমায় আমদের পূর্ণও করে নি। সংস্কৃত ফারসী এখন কারোই 'বাণী' দেওয়া যায় না। এখানে এসে তাই সাধারণ পুস্তক পুথিখানা ঘুরা কেড়ে নিয়েছি।

আগনি নিচয় ব'লবেন সাদী আর কিরদিন ধূয়া আছম লিখলে ক্ষতি ছিল না, যদি ইতিমধ্যে 'উত্তরা'র ওল্প কিছু লিখতে না। বলতেন না যদি জানতেন যে হুদিন পরে আমার কোয়েটা (Quotta) ও চানানের (Chaman) পক্ষে বৈজির পড়তে হবে। কানাহারে অল্পরুজ্জ্ব ইতিমধ্যে যুব বড় ও ভারী হয়ে বড়েছে ও চানানের হাটে এসে পৌছুল

বলে। সাহিত্য চিরকালের সামগ্রী কিন্তু এ বৎসরের কান্দাহারের আন্দোলন আর পূর্ব বৎসর থাকবে না। আর আদিম-বা আধুনিক বঙ্গের বংশোদ্ভূতগণের পেরিয়ে মিতিনায় (Myibkina) মাশেভীনের ব্যাপানে পাকা ফলের সন্ধান নেই বহুই না এমন কথা কি কোন বৈষম্য লক্ষ্য করে বলাতে পারে? অতএব আজ একগুচ্ছ কান্দাহারের আন্দোলন ও সাদী সঙ্গ সাহিত্যের চেয়ে অনেক বেশী সত্য।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, এই রকম অভিশপ্ত আশ্রয় মত দেশের বৈদগ্ধ্যবৃত্তি অবলম্বন করলে সভ্যতার সাহিত্য-সৃষ্টি হয় না। কক্ষপটী তারকার মত ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে যে-সাহিত্য রচনা করা চলে তা মানুষের মনের অগভীর বৃত্তিগুলিকে ঈষৎ আন্দোলিত করে, একটু কৃত্রিম আনন্দ দেয় মাত্র। এ সাহিত্যের জীবন প্রদীন মাত্র। বিশ্বমানবের গভীরতম অন্তরের নিহুততম কোণে যে রসপিপাসু আত্ম প্রতিদিন জীবনের তুচ্ছ সুখ-সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে কণা কণা মধু আহঁস করে নীচের তার মধুকোষ পূর্ণ করে তুলছে, তার উপাসনাই না প্রকৃত সাহিত্য-সৃষ্টি। তার আশা আকাঙ্ক্ষা, ভয় ভয়েষণ, দগ্ধ আশ্রয়ের সঙ্গে আপনাকে সম্পূর্ণ নিমিয়ে দিয়ে সাহিত্যিক যে সাহিত্য সৃষ্টি করেন তা 'অমর', তাই প্রকৃত সাহিত্য। সে সাহিত্যের প্রকৃতি যেমনই হ'ক না কেন, চুল, তাল, গভীর, উজ্জ্বল,—তাতে বড় কিছু আসে যায় না। প্রকৃত সাহিত্যের মধ্যে ঈকি নেই, মেকি নেই। সাহিত্যিকের বিজ্ঞা কাহির করে সহজে প্রেরণা পাঠকের বিশ্বাস জাগিয়ে তুলে করতালি পাবার প্রকৌশল নেই, বিনামায়ায় ছুপসা উপায়ের চেষ্টা নেই। তাই প্রকৃত সাহিত্য কখন উৎসারিত, স্বচ্ছ, সরল, লীলাসর, প্রাণের স্পন্দনে ঢলল। এ সাহিত্য-সৃষ্টির জন্ম সাধনার প্রয়োজন আছে, নিঃসংশয় বিপুল কবসরের প্রয়োজন আছে। জীবনের অভিজ্ঞতার, ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ দুয়ের নিবিড়তম অঙ্কুরিত ধ্বনি মনোমগ্নতার সাধনার সংস্কারভাজ হয়ে যায় তখনই সে মানুষের স্বয়ং-গঠনের চিত্র আঁকতে পারে, প্রাণের তরঙ্গিত এমনিভাবে আত্মপল ছেঁয়েতে পারে যেতে সে ক্ষণির রেশ আর সন্ধ্যার না। অবমানিত প্রত্যাখ্যাত শত্ৰুজা

যখন 'অশঙ্ক', অস্ত্রধা হিংস্র আগুনোপ পেশুকনি' (অনাথ, নিরস্ত্র ছাত্রের মতই সকলকে বেধ) বলে রাজা-দুঃস্বপ্নকে কংসনা করেছিলেন তখন সেই একটি 'অনাথ' কথার অধিকতরকার আজীবন শিক্ষার, আধাঘণ্টার উচ্চ আদর্শের, গভীর মনোবের ও প্রগতি অবজ্ঞার এমনই একটি স্বর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে যেন ধ্বংসের চেয়ে আর কোন ভংগনা-বাহাই শত্ৰুস্তার মতই গভীর। কালিদাস আপন জীবন আধাশতাব্দির শত্রুজীবনের শোভার সঙ্গে তার বিপুল গভীরতা, হংসহ তেজ ও আদর্শের উচ্চতা বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন মনে করুন যাতে শত্ৰুস্তার মুখে এই একটি ভংগনা বসাতে পেরেছিলেন।

তাই বলাহিলা সাহিত্যসৃষ্টি একটি গভীর সাধনার ফল। একথা শুধু আমাদের বাঙালাদেশেই আমরা ভুলতে বসেছি। যে ইউরোপের সাহিত্য আজ আমাদের জপমালা হয়ে উঠেছে সেখানে একথা দিনে দিনে গভীরভাবে উপলব্ধি হচ্ছে। বোম্বেতাই-একি, তোলমাই বা বল্‌জাক্ যখন তাঁদের অমর উপজাতিগুলি লিখেছিলেন তখন কি তদ্রূপ হয়েই লিখেছিলেন ও কতকি থেকে তার উপাধান সঙ্গহ করতে হয়েছিল তা তাঁদের অদুনা প্রকাশিত পত্রাবলী ও বিনিলিপ থেকে কতকটা বোঝা যায়। আমরাই শুধু বিনিলিপে সমগ্রতম অর্থোপার্জন করে সন্ধ্যায় আদায়ের সঙ্গে একটু লেখনী-কণ্ডন-বৃত্তি চরিতার্থ করে ভাবি, সাহিত্য চর্চা করছি। আমাদের সাধারণ বাঙালীর জীবন যেমন নানাদিক সজীব হয়ে এসেছে, অবিচারে সেই জীবনী-শক্তি-চূর্ণণিক আহ্বোধের জন্ম অগতঃ করবার প্রস্তুতি তেমনই জন্মে উদ্ভাব হয়ে উঠছে।

আমাদের সাহিত্যচর্চাও জন্মে এই অগতঃ প্রস্তুতির প্রকাশস্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অতি আধুনিক বাঙালী-সাহিত্যে এটা একবারে প্রকট হয়ে উঠেছে। সমস্ত জাতির এই ভাবে তিলে তিলে আপন চোয় মরগের দিকের প্রগ্রহণ হওয়াটা আত্মপ্রত্যাহার ইমানতার মাত্র। ভারতের মধ্যে বাঙালী তার সমস্ত নেতৃত্ব হারিয়ে বসেছে, সকল প্রদেশেই অস্বস্তিত বিতাড়িত, নিঃশেষ দেশের বিদগ্ধগন্ধির বিদেশীর পদচোপে মগ্ধপুণ্ড ও পদে পদে অবমানিত। এমন শুধু গৌরব

করবার আছে আমাদের সাহিত্য, তাকেও আমরা ক্রমে ক্রমে আমাদের ইদানে পরিণত করছি, একটা বিশালিতার পথচারে এনে ফেলেছি, তাগ বেলা পাশা বেলায় চেয়ে বড় বেশী কিছু নেই। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নামে আমরা গৌরব করে বেড়াই, কিন্তু তাঁর বিপুল সাধনার কথা একবারও ভাবি না বা সাধাচলার সে পথ অবলম্বন করার চেষ্টাও করি না। আমাদের দারিত্র্য এই সাধনার প্রসিদ্ধক বলে শুনে থাকি। কিন্তু জগতে ধীরবড় বড় কাব করে গিয়েছেন তাঁরা ত অর্থেলাভে করেন নি। সৌন্দর্য্যসৃষ্টির আনন্দ ছাড়া অর্থের মোহ কি কখনও কোন শিল্পস্রষ্টার প্রেরণা হতে পারে? অর্থেলাভের জন্য কোন শিল্পের প্রেরণা হলেই শিল্পের সাধনার চেয়ে হাটার মনোরঞ্জনই শিল্পীর কান্না হয়ে উঠে। আর বাঙালী-সাহিত্যে হয়েও উঠেছে তাই। এখন কোন্ রকম পদে বেকল পত্রিকাখানা পুজার বাজারে কাটবে ভাল, কতটুকু স্মরণীয় না থাকলে উপজাতিগণ পাঠকের সুপ্রসঙ্গিক হবে না সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই সাহিত্য-রচনা হচ্ছে। এ যেমন কোন পিচোটারে নট-নটীদেবের চোয়ার মানান-নাই নাটকের নাটক-নাটিকা সৃষ্টি করা, যাতে মিস্ বিদ্যাদ্বারী টোকা টোকা 'ও বোম্বে! মহাশয়ের নাকিস্রের কণ্ঠাটিকি ঋণ খেয়ে যায়। বাঙালী-সাহিত্য যদি বাচতে চায় ত সাহিত্যিকদের এই দুর্ভাগ্যটা লাগিয়ে উঠতে হবে। নচেৎ জাতীয় অমঙ্গলতনের কোন্ মরুপ্রান্তরে তার ধারা হারিয়ে যাবে তা বৃহত্তরও পরা বাবে না। আমরা এখনকার মতই লেখনী-কণ্ডন করতে করতে ভাবব সাহিত্য-সৃষ্টি করছি, আর পৃথিবী কখন যে কোন্ নতুন-সাহিত্যে আত্মদানে আমাদের সভ্য থেকে সরে যাবে সুখেরও পারব না।

জান-সাধনার বাঙালী চিরকালই একাগ্র হয়ে আত্ম-নিবেদন করে দিয়েছে। এখানে যেমন বাঙালীর সাধনার কট নেই, সকলতাও তেমনই হয়েছে, কোন সমাজেই শিল্পিত বাঙালীর culture দেখে এড়াই না বা সন্ধান পায় না এমন হয় না। আজ প্রয়োজন হয়েছে যাতে এই

সকল আত্মত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, আদর্শবাদের সাহিত্যের সামগ্রী হয়ে ওঠে—কেবল বিভ্রান্ততনের বা অকিস্-আলস্তের মধ্যেই আত্মসংগ্ৰহ আর চলবে না। এ সমস্তকে সাহিত্যের সামগ্রী করতে গেলে চাই জীবনের মধ্যে তাদের গ্রহণ করা, প্রচুর অবসর ও গভীর উপলব্ধির সাধনায় সংস্কারভাজ করে তোলা যাতে সমস্ত প্রাণ সেই জ্ঞানে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সমস্ত অস্তিত্ব সেই স্থরে মূগ্ন হয়ে থাকে। বাঙালী-সাহিত্যের দুর্ভাগ্য যে তার সৈবকগণ প্রায় সকলে জীবিকার চেষ্টার সম্পূর্ণ অ-সাহিত্যিক কায়ে জীবনের অধিকাংশ সময় ও শক্তি ব্যয় করতে বাধ্য হন। অবশ্য লোকসমাজে নিম্নলি, লোক-চরিত্রের অভিজ্ঞতা ও বাহ্যিক জ্ঞান নিশ্চয়ই বাড়ে, কিন্তু সত্যের চেয়ে শক্তির অগতঃ অধিক হয় না একথা বুঝা যায় না। জীবন-গোষ্ঠায় ক্রমশই এমনই দুর্ভাগ্য হয়ে উঠছে যে কণ্ঠস্থলে সমস্ত শক্তি নিয়োগ না করলে কল্লভা হওয়ার আশা রূপ। ফলে পৃথিবীর সাহিত্যসেবী অল্প কাহার অবসরে সাহিত্যের জন্ম বড়টা শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে পারতেন এমন আর তা পারেন না। বঙ্গি, মবী, রঙ্গাল, দামোদর, বিজ্ঞানসাগর সকলেই ডেপুটিগিরি করেও সাহিত্যসেবা করে গিয়েছেন, কিন্তু আজকাল কয়জন ডেপুটি মাস্ট্রিট্রেট সাহিত্য-সেবা করবার অবসর পান? ফলে সাহিত্যটা এমন সঙ্গল লোকের বেশার বস্ত্র হয়ে পড়েছে ধীরে ধীরেই পৃথিবীকালে সাহিত্যসেবার গণের প্রাণে পথ্য করতে পারতেন না। বাঙালী-সাহিত্যের এই দুর্ভাগ্য সুদূরত্ব যদি একাগ্রচিত্ত উৎসাহীকৃতপ্রাণ পুজারী না পাঠে বায় তা হলে ভবিষ্যতের আশা খুব উজ্জ্বল বলে মনে হয় না।

হৃদিনের মধ্যে বা অস্তিত্ব পথ্যত লোকের ভুলে যাবে এমন সকল রচনা দিয়ে মাসিকপত্রের পৃষ্ঠা পূর্ণ করার সাহিত্যসেবা বলে না। ইতিমধ্যে এরকম কবিতা গল্প উপজ্ঞান গবেষণার আব্রজনা অনেক জন্মে গেছে। আমি যদি সেই স্বপ্নটা না বাড়াই ত আমার নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন।

জলধর-সম্বন্ধনা

কলিকাতার বিশিষ্ট সাহিত্য-মণ্ডিতান 'রবি বাসক'র উচ্চোৎপত্ত ১১ই তারিখের রামসোহন লায়েরী হলে বাংলার প্রবীণতম ও প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ডাঃ শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের সপর্দনা হইয়া গিয়াছে। ৭০ বৎসর বয়স্করূপে হওয়া উপলক্ষে তাঁহার জীবনযাত্রী সাহিত্য-মানবকে স্মরণীয় আত্ম নিবেদন করিতে বাংলার প্রায় সমস্ত সাহিত্যিকেরা সম্মিলিত হইয়াছিলেন। অপরাজেয় কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র এই সম্বন্ধনাতে পৌরহিত্য করিয়াছেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রের সিদ্ধান্তকর শ্রীযুক্ত জলধর সেনের মতো নিরুদ্ভাবিত, অস্বাভাবিক এবং উদার স্বভাব মানুষ বিরল। মননে বৈরাগ্য একদিন তাঁহাকে পূর্বের বাহির করিয়াছে, তুমার শীর্ষ কিম্বদন্তীরে রাখিয়াছে বাংলাদেশে আবার তাঁহাকে ঘরে ঘিরিয়া পাইয়াছে। বাংলা-নাট্যের প্রতি তাঁহার একটি অবিরল চিত্তের বাহা তিনি সমস্ত বাঙালীর স্তম্ভরূপের একজন আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অপরকে সেন কেবলমাত্র বাংলাদেশের বাঙালীদের আপনাত মনে—তিনি প্রবাসী বাঙালীদের আবেগের স্রোতস্র। প্রবাসে তাঁর গুণগুণ ভক্তের সংখ্যাও বিরল নয়। আজ এই অবসরে প্রবাসী বাঙালীদের পক্ষ হইতে আমরা এই শুভ অহুতানটির প্রতি আমাদের আত্মিক সংযোগ জানাইতেছি।



শ্রীযুক্ত জলধর সেন

জন্ম—১৩রা চৈত্র ১২৮৭

শ্রীযুক্ত জলধর সেন

যে স্বদেশ উত্তম, পুংল প্রাণশক্তি ও ভবনমীম সত্ত্ব সত্ত্ব করিয়া শ্রীযুক্ত জলধর সেন একদিন প্রথম যৌবনে ভ্রমবিপদা

পর্যন্তপূর্ণ আবেগ করিয়াছিলেন, আজিকার তাঁহার এই মারিটিক বার্ষিকের দিনেও তাহার একতিল হ্রাস হয় নাই। কালের ক্রমেণা বিধান কেহ পণ্ডন করিতে পারে না বলিয়াই বাহিরে আজি তিনি জরাজীর্ণ, কিন্তু অন্তরে তাঁহার আজো

যেই প্রসাহসী যৌবনের দৃশ্য বলিষ্ঠতা, সেই 'আকাশবিন্দী'র পরমতৃপ্তার উত্তম মনোভা, সেই কল্পকল্পিত পথভাষ্যের প্রদর্শনার উৎসাহ। সমস্ত জীবনটাই তাঁহার কাছে বাধাবন্ধুর কটকটপূর্ণ, তবু তিনি সেই সেদিনকার বীর বৈরাগীর বেশে সমস্ত পথ দুঃস্বপ্নবিক্ষেপে অতিক্রম করিয়া আনিয়াছেন—সমসাময়িক বাঙালীজীবনে তাঁহার এই চিত্তের বশ্যলিখিত, কর্তব্যাব্যাপনের এই অবিরলিত তেজ, জীবনকে গ্রহণ করিবার এই উদার উদ্বুদ্ধ ভঙ্গি অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে, বর্জননের অগত ও উত্তরকালের ভাবী সাহিত্যিকদের স্মৃতির তপস্যাৎ গভীর প্রেরণা আনিয়া দিবে, অস্বস্ত অতীত প্রবর্তার আদর্শের সন্ধানে চিরকাল উদ্বুদ্ধ, সমুদ্র-সন্ধানী করিয়া থাকিবে। যে বয়সে লোকে সমস্ত ক্রিয়া-কলাপ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সুসংসারের নির্জনতায় নিজেস্ব আশ্রয় ও দেবপ্রানায় সাধারণত ক্ষয় করে, সেই বয়সেও তাঁহার কর্মক্ষমতার, তাঁহার প্রাণমুগ্ধতার, তাঁহার নব নব প্রকাশ-প্রেরণার অটুট শৈথিল্য দেখিলাম না। যে অনন্ত-পরায়ণ বিপুল উৎসাহে তিনি আজো পঞ্চাশ বাঙালী-দেশের একখানি বিরাটকার মাসিকপত্র দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতেছেন সেই যৌবনাগতি উৎসাহ ও কর্মশক্তি, সেই অবিরলিত সাহিত্যাহরণ ও কর্তব্যপরায়ণতা বাঙালী-দেশের পক্ষে এক মহান দুলভ দৃষ্টান্ত। এই সাহিত্যই তাঁহার আশ্রয়, তাঁহার অংশলয়, তাঁহার আরাধনা, হয় তো বা তাঁহার পরকালের পথে। আজো তিনি দিনের পর দিন বার্ষিক্যোচ্চ নিশিলায় দৃষ্টতে ঐ বিরাটকার মাসিক-পত্রিকার প্রবন্ধ দেখেন—দেখিয়াছি, আজো তাঁহার কস্মাৎলিখিত লেখনী তেমনই মানিত ও সরল, তেমনই অক্লান্ত ও অক্ষয় রহিয়াছে। কর্ণের তপস্যা তাঁহার মতো সাধক বাঙালী-সাহিত্যে কোথাকি না দেখে। তাঁহার এই জগৎবিখ্যো যৌবনবিধানের ইতিহাস বাঙালী-দেশে অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে।

মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠার, লাইব্রেরির রাশীকৃত পুস্তকের পৃষ্ঠা, আমরা যহ সাহিত্যিকের বৈদ্যকিক পরিসর পাইতেছি, কিন্তু শ্রীযুক্ত জলধর সেন সাহিত্যিক হইয়াও আমাদের কাছে এক উজ্জল প্রসঙ্গ পরিপূর্ণ ব্যক্তিভবন আনির্ভাব। তিনি

হ্রস্ববিপদা সাহিত্যিক নির্জনতায় বাস করেন না, তিনি একবারে আমাদের আশ্রয় অন্তরঙ্গ, স্বয়ং প্রতিক্রিয়াশীল। প্রসাধনগণে সাহিত্য ও জীবনকে একত্রে প্রাণ অঙ্গভূত করিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। বয়সের ব্যবধান নাই, পদ-মধ্যধার দৃশ্য নাই, প্রেক্ষাভিমানের বিদ্যামধ্যধার বোধ নাই—তিনি আমাদের সমস্ত উৎসাহে, সমস্ত অভিব্যক্তি, সমস্ত উৎসাহবিহীন সমস্ত সহায়কত্বের ক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছেন। প্রথম যৌবনে যে বৈরাগ্যবোধ তাঁহার জীবনে একটি বেদনার লাগণা আনিয়া দিয়াছিল, সেই প্রকাশের বেদনা তাঁহার চরিত্রের একটি করুণা কোমল, একটি স্বৈর-শীতল গটকুম্ভিকা রচনা করিয়া রাখিয়াছে। আজ আমাদের সাহিত্য নানা কল্পিত প্রতিযোগিতা, কল্পিত ধর্ম, কল্পনাময় নিগূঢ় রূপভাব চলিয়াছে, কিন্তু সকল কল্প-কোলাহলের উর্ধ্বে তাঁহার চরিত্রের এই উদার প্রসন্নতা আজিও অজ্ঞান, কোনও মানি তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই, সেই ব্রহ্মবিহারী যুবক-পরিচিতির মতোই তিনি নিলিখিত, শৈলপুঞ্জের মতোই তিনি সহিষ্ণু। এই অস্বাভাবিক, নিরহঙ্কার, বীতভাষ্যস্বহ জলধর সেন আধুনিক জীবনে এক অকৃতপূর্ণ বিষয়। সাহিত্যিক অথচ তাঁহার শব্দ নাই, সম্পাদক অথচ তাঁহার প্রতিকূলতাকারী নাই, মেহেরূপ অথচ কোথাও তাঁহার মূর্ছ ও বিরক্ত প্রতিক্রিয়া নাই—এই অস্বাভাবিক এই অস্বাভাবিক চরিত্রের কী মহত্ব, অজ্ঞের কী হ্রদনা, সাহিত্যের প্রতি কী গভীর ও সর্বসম্বন্ধমুক্ত দূরদর্শী দৃষ্টি স্থিতি হইতেছে, তাহা অহঙ্কার করিয়া আমরা অভিজ্ঞ হইয়া পড়ি। সাহিত্যে তিনি যে বিশাল ও বিস্তারিত সামাজ-গঠনের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন তাহাই তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের পরমতম ঐশ্বর্য।

আমি জানি সকলেই এই একটি কথা বলিবেন, চিত্তের এই শুচিতার, প্রীতির এই সজ্জ অকার্পণ্য, ব্যক্তিভবন এই নিরহঙ্কার উজ্জ্বলতা কেহ সহজে তাঁহার সমকক্ষতা করিতে পারিবেন না, তিনি সাধকামা, আত্মশাসকী জলধর হইয়াও মৃত্যিকার তিনি বন্ধু, দুঃখী তিনি সাধনা, অজ্ঞের তিনি স্বকর্মবিষয়ক মুক্তিভাট, নির্নিপেদে তাঁহার ব্যক্তিগত, অজ্ঞে তাঁহার যেরং নিখল ধারাবাহিকতা, শীতল শ্রাম

ছায়াবিধ—কিন্তু আজিকার সাহিত্যে যে ছদ্ম, নবীনতা প্রভরভেদী মুগ্ধস্বপ্নের মতো অবন্য প্রকাশপ্রাপ্যো আবির্ভূত হইয়াছে, বরষা প্রাচীন হইয়াও তাহার প্রথম আত্মায়িক রসনা করিয়াছিলেন ত্রীকূল জলধর সেন। প্রথম এই নবীনতার উদ্ভোর অস্তরালে যে গুরুত্ব তেজ ও ব্যত্যয়, স্বকীয়তা প্রাণশক্তি ও রসসম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা তিনি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন ও তাহাকে সানন্দে আয়ত্ত করিতে, তাহাকে আসন ছাড়িয়া গিতে, তাহাকে সংস্কৃত করিতে তিনি সৎস্বরের বশে, প্রাচীনতার মোহে, অনৌবাধার অকৃত্য রুখনো কোনোদিন কুণ্ঠিত হন নাই। পরিবর্তিতকালের সঙ্গে তাঁহার বলিত মনোভঙ্গির এই সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তিনি চিরযুগে এবং স্বল্পপরিচয় মনের এই বোঝাই সংসারে চিরজীবী। বাংলা-সাহিত্যে যে বিশ্বস্তর ভবিষ্যতের হৃদয় দেখা যাইতেছে তাঁহার ইতিহাসের প্রথম পরিচ্ছেদে পুরোধারূপে জলধর সেনের নাম অক্ষর হইয়া থাকিবে।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

নব গঙ্গা

হিমালয় হ'তে গঙ্গার ধারা নেমেছে সে কতকাল—
ছল ছল ছল ছুটিছে উজল বারি—
আজো কুলে কুলে হাসি ও কাহা—শতবাহু বিস্তারি'
গ্রাম-ছায়া হ'তে গঙ্গার পড়ে কত শত গাঙ খাল।

মাতের কামনা সবুজ শবে—
গঙ্গা চলেছে ছ'বারে সপ্তাহে সাপের সন্ধ্যারি।
এপারে ওপারে চেউ ওঠাল।

কত বসু নিতি যত ঘরে যায়, রাতে কুলে দীপ জ্বলে,
জ্যোৎস্না-ময় বনগারে চাঁদ স্থির গঙ্গার ভালে।

আর, এক নবগঙ্গা দেখিছ—গিয়াছিছ দূর গ্রাম,
দূরতম গ্রাম কাঁদিত তুমায় সেপা কোন গাঙ নাই
সেদিন সেখানে গিয়াছিছ আমি ভাই।
সেখা মাছের মনে মনে দেখি গঙ্গারই রূপমায়া
অগত্বে যে চলে প্রাণ-সমারোহ, ভীক মনে তারি ছায়া
গাঙ নাই, তবু গঙ্গারে দেখিলাম।

গিরি হিমালয় এ নব গঙ্গা পাঠায়ে বিরাছে ফের
গঙ্গারই যে দেশ ছিল পড়ে, সেখানেও গতি এর।
গঙ্গা-বিধীন দূরের গ্রামেরা পড়িয়া কুফলভুর—
বাকহারা তারা গিরি হিমালয় পানে
কতকাল ধরে' কাঁচুতি পাঠাত কে তার হিসাব জানে—
এত ক্রন্দন, তবু শিরে গিরি বধির শুক ছুড়।
এতকাল বৃষ্টি পান্য গুলেছে, দূর গ্রামে দেখে তাই
গিরি পাঠায়েছে নব গঙ্গারে সব ঘরে সব ঠাই
কুটরে কুটরে রসখারা হুয়দুর।
আমি দেখিয়ারি, ভীক গ্রামবসু গৃহকাজ সব সারি'
রোজ রাতে চুপে প্রাণী আলিয়া গিয়ে এ' গঙ্গাবারি।

একটি মাছেরে ঘিরিয়া তোমরা আজিক রক উৎসব
আমি দেখিহেছি—সত্য কথাই কহি—
হিমালয় হ'তে এক গাঙ যায় সারা বাংলায় বহি'
আমার দৃষ্টি হেরিহেছে অভিনব!
তোমরা বন্ধ, এসেছ একটি মাছেরে ভালবাসি'
মোর চোখে এক জলধর চলে হিমালয় হ'তে ভাসি'
তারি জলধারা সিকিয়া যায় সব।
হিমালয় দিল গঙ্গা পাঠায়ে দিরা মাছের নাম
মাছেরে খেড়ে আমি ভাই, সেই হিমালয়ে নমিলাম।

শ্রীমোনাজ বসু

পুস্তক-পরিচয়

বাখো জব-জননত, চিনিত মারিগে যার,
তারি কটে দাও তব হার।
ভিখাখি! কেনো এইবার!

রাগার কুমারের অশ্বের ক্ষুরের শব্দ আর হেঁদাধনি বৃষ্টি
স্নতে পাওয়া গেল!

দার্পনিকতা যে নেই তা' নয় তবে তা' প্রবল অহুতির
অহুত্বপনে উৎসারিত হয়ে' উঠেছে। কয়েকটি গায়খার
অপজ্ঞ স্বপ্ন-শোক উদ্ভাসিত করে' সত্যকার কাব্য-সৃষ্টি
সার্থক হয়েছে:

ছায়ায় তব কুণ্ডলনে,
শাখে শাখে আলিঙ্গন, পরে পরে নিবিড় গুলনে;
চন্দ্রে কীরে তব ভাষা, অদ্বৈত, মধুর, গভীর।
তবু ছায়া—যন হারা!—হৃদয়হত স্বপ্ন বাগীন্দা,
সেখা নাহি কোলাস উঠে,
অভিনব বরাধের স্বর্ধম সিঁচ পলকপটে,

সমারোহ নবীন তক্তির
সকল নবীন খোলা, খোলা গান আনন্দ-ক্ষুর
সেখা হুটারতে

আমারে তামিগা নহ মৃদু কারি' আপন সজীতে।

'তীর্থ-পথে' কাব্যের এই-টিই অন্তরগত পয়ম প্রার্থনার
স্বর!

রবীন্দ্রনাথের যে-নূতন ধরণের সনেটটিকে নিয়ে বহু কবি
এবং কাব্য-রসিক আলোচনা করেছেন, হেমচন্দ্র অহুত্বপ
একটি সনেটে আশ্চর্য রূপসৃষ্টি করেছেন:

দে-স্তারা মধুর সপনে হুত্বা বোলা,
এখন কুনালো কোঁচ নিশাভের বাগী
শায় মনে.....

এ সন্ধ্যার অন্তরের চলিত সুস্মিত
মফিত অক্ষর আঁখি তারেরে গুলিতে।

'তীর্থ-পথে'

নবা বাঙালর শক্তিমান কবিরের মধ্যে হেমচন্দ্র বাগচী
একজন। তাঁর কাব্যে বিষয়-বস্তুর মধ্যে যে ভাবনা চলে,
তা'র অভিসার মহৎ জীবনের দিকে। ভাষা—প্রশান্ত গভীর,
এবং নিপুণ শব্দ-চয়নের স্বর-স্বভার পাঠকের মনকে এক
অপূর্ণ অহুত্বতে আন্দোলিত করে' থাকে। একটি সম্ভল
কোমল অঙ্গন-সেখার মধ্যে বেনে তরঙ্গ ফেনিল, প্রবল এবং
সুখধার গতিবেগ স্নতে পাওয়া যায়। কোলাহলময়
বর্তমান বাস্তব জীবন-লীলার দিনে এই হুয়টিকে আবিষ্কার
করা একান্ত 'সুদূর' কাব্য-পাঠকের ওপর নির্ভর করে।
এই যে উভার জীবন-বাণের পরম তুমার হুর, এরই ধ্বনি
কিন্তু মাছের মনে শাখত ছাপ রেখে যায়—হেমচন্দ্র বাগচীর
'বীর কিম্বদন্তি' প্রতিষ্ঠা তা'র লক্ষ্য দেখে।

হেমচন্দ্র বাগচীর এই নূতনতম কাব্য-গ্রন্থে একটি সুহৎ
পৃথিবী-সম্ভাবনার প্রতীক্সা আছে। এবং সেই জগতের অধি-
নায়ক যে-মানব-মন, তার পৌরব এবং বীণা এই কাব্যে
একটি মহিমার আভাস দিচ্ছে। তবাকবিত্ত স্রাকামির
বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন সংগ্রামের দ্বারা একটি কঠিন-কোমল পুরুষের
অদ্বিত পৃথিবীকে তিনি আস্থান করেছেন:

"নারীরে লভে না নারী"— মহাকলী সিংহ সে কোথায়,—
—যেমনস গর্জন গুহার।

বর্তমান জীবনের কলুষ-ক্রিম, কটকাকীর্ণ পথ-বাড়ার
পরনক্ষণে কবির দীপ্তচোখে প্রভূত্ব-মালের অরুণ-জ্যোতি
বিজুড়িত হচ্ছে। হানে স্থানে, রঙে, রেখায় এবং অস্তরের
আনন্দ-বেদনায় যে-হৃদয় অক্ষরজিত হয়ে ওঠে, তা'র অপূর্ণতা
পাঠকে মুগ্ধ করবেই। কাব্যের থাকে attitude বলা
যায়/তীর্থ-পথে'তে তা'র তুলনা নেই।

ভিখাখি কেনো এইবার,
একে সে রাগার কুমার!

গমী-জননীরা ছাত্র-নিষ্ক্রেমের অক্ষয় পরিচয়গুণ করে' বাঁধা পরবাসী পথিক পুরে চলে' গেছে, মুক জননী মুক্তিকা তাদের হৃদয়ে ছেঁগে আছে! এ রকম আশ্চর্য-মুহুর কবিতা সম্ভা-
চোখে পড়ে না।—

কবি বলছেন— এই গল্পটি—

ক্যা নারি আসে,

জানবেবা নাটিকে গমীর সন্ধ্যাবে।

আজি দুই পরশমে পড়িচ্ছে মনে,

একদম অলিবে কোন পুথের শাস্তবে—

তুলসীর মকতবে। পাঠী এল গেছে—

গুপ্তমেনে, শান্ত গমি গমি চিরমে।

গুরু মোর মুকতি রয়েছে আশ্রমে।

যারা বৃন্দ চলে' গেছে তাদেরি মাগিরা।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কবিকে বলতে ইচ্ছে হয়:

পরবাসী ফিরে এসে যবে,

অনুকূল সমীরণে ঘরে।

বাসে বাসে শুভদিন,

ফিরে গেলো অর্ধদীন

চোরে আসে সরে তোলা করে

ফিরে এসে যবে।

অভিযায় বাঁধা আশ্রয়না

আঁধার বহু চোরে সেলিন না।—সবাসী

অস্বাভাব্য-নিপিতে সত্যই লিখিত হয়েছে:

বর্তমান কালের মানবের যাবদায় জীবনের উর্দ্ধে যে কল্প সাধনা
মিতাকালের বিকে প্রসারিত—‘তীর্থগণে’ তাহা হুগে ও হুগে অনন্ত-
মাধবায় হইয়া উঠিয়াছে।

‘তীর্থগণের’ কবি মাছুয়ে কথোদন করে’ বলেছেন:—

কুহন ফুটেছে আশ, হেরি যি—মধু কই হায়,—

নিপাদায় আকর্ষিত ওকার।

বদায় বহিছে মাণ, কোথা পুর? আশ্রয়নি আর

পরে পুরে কবিরে বোকার।

আলোক-তরঙ্গী আসে—রাগি ধায়, বাণা মনে ভোগ—

তান তাই আশ্রয় কোরোণ।

আর সব স্নেহ-সুখ কথায়:

গাছা! পুস্তক সন্ধ্যা পাকে।

তীর্থগণের কবির—প্রাণের পূর্ণ হোক।

[তীর্থগণে—দীর্ঘমন্ত্র বাগী। প্রকাশক—শ্রীমন্ত লাইট্রী
কলিকাতা। দাম একটাকা। প্রায় একশত পৃষ্ঠা। ৩০টি কবিতা।
ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার।]

‘ছোট গল্প’ সাম্প্রতিক। প্রতি সংখ্যা এক
আনা। বার্ষিক ৩০। সম্পাদক—শ্রীমন্ত লাইট্রী
২২: লায়ল স্ট্রেট হাইতে প্রকাশিত।

বাংলাদেশে এখন কথা-সাহিত্যের যুগ। গল্প-সাহিত্য
পাঠের পিপাসা আজকাল তীব্রতর হইয়া ক্রমশ পাঠক-
সাধারণের উন্নত কৃতিকে আশ্রয় করিয়াছে। প্রতি সংখ্যে
একটি কবিতা চমৎকার ছোটগল্প পরিবেশনের ভার গ্রহণ
করিয়াছেন, রসজ্ঞ সাহিত্যিক শ্রীমন্ত লাইট্রী সাহা
মহাশয়।

বর্তমানকালে গল্প লিখিয়া বাঁধার বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন
করিয়াছেন, তাহাদের প্রায় প্রত্যেকেই এই নিম্নলিখিত
লিখিয়াছেন এবং লিখিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত। গল্পের পরে
সম্পাদকের ‘সাময়িকী’ ও ‘অসাময়িকী’ নামে যে-লেখ্যটি
এটি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা ‘বোকার উপর
শাকের ঝাঁট’ ত’ নহেই, বরং অনেক চিত্রাশ্রিত পাঠক-মনের
আনন্দ-রসায়ন। কয়েকজন সত্যাকার শিল্পীর হাতে পড়িয়া
এই সাম্প্রতিক গল্প-পত্রিকা, পরিষ্কার মোটা কাগজে, নিঃপুং
মুদ্রণ-গৌরবের অধিকারী হইয়া উঠিয়াছে। প্রসিদ্ধ শিল্পী
বীরেন্দ্রনাথ কলিতার যেনে যে-পরিচয়না তুলিকা রূপান্তরিত
হইয়াছে তাহা তুলনাহীন। এ পর্যন্ত বহুগুলি সংখ্যা বাহির
হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটি গল্পই চমৎকার—আমাদের বিশেষ

তালো লাগিয়াছে ছাত্র, কায়, যুগান্তর, জগৎগা, নাইট
ডিউটি, শর্দূল-সংবাদ, বুট-দেবতা এবং নিমেষ গুপ্ত। আশা
করি আমরা শিকিত বাঙালী সমাজে ইহার বহুল প্রচার
হইবে।

‘নন্দিনী’

গত বৎসর শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ
‘শরৎচন্দ্র’-শীর্ষক গ্রন্থে লিখিয়াছেন:

‘শরৎচন্দ্র রসময়ক পট উঠিতে যিরে বাঙালী সমাজের যে আশ্রয়
দৃষ্ট উন্মোচিত করছেন, সেইখানে আধুনিক লোকদের অংশে
সহজ হ’ল। তাদের আনাখোনাও চলছে।’

শরৎচন্দ্রের পরে বাংলা কথা-সাহিত্যের যে-বিশেষ রূপ
এবং ভঙ্গি পাঠকের কাছে বর্তমানে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে,
মানব-জীবনের ধারা যে বিচিত্র এবং নতুনতর সম্ভাবনার পথে
প্রবাহিত হইতেছে, শৈলজানন সেই নব্য-সাহিত্যের অগ্র-
পথিক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী। বাংলার কথা-শিল্পে তিনি
ইতিমধ্যেই প্রচুর প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ
এবং শরৎচন্দ্রের অল্পমণ ভাষা-সৌভাগ্য, তাঁহার লেখনী-পার্শে
রূপান্তরিত হইয়া এক অপূর্ণ বর্ণিত্বের মাধুর্যে সমৃদ্ধ
হইয়াছে। সংস্কৃত, পরিমিত এবং মার্জিত-মধুর শব্দ-বিশ্বাসে
তাঁহার ভাষা একটি অননুসঙ্গারণ ছন্দ-শাসিতা অর্জন
করিয়াছে।

করণা-কৃতির নিরঙ্কর, বসিষ্ঠ সরল, সঁওতাল-নর-নারীর
এবং বীরকুমার গ্রাম-জীবনের দৃশ্যদেয়-অঙ্কর, স্বাধীন-কল্পিত
অথচ সম-বেদনার অভিব্যক্তি, অবহেলিত যে মানব-সমাজ—
তাঁহার আশা, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ ও বেদনার ছবি সর্বপ্রথম
তিনিই পাঠকের চক্ষুর সম্মুখে উন্মোচিত করিলেন।

মনে হয়, যে-জীবনের সহিত তাঁহার প্রতিদিনের নিবিড়
পরিচয়, ক্রমশ উপলব্ধির মধ্যে দ্বা দিয়াছে, তাহাই তাঁহার
স্বই Type-চরিত্রগুলি অশ্লীলরূপে পরিচিত এবং এত
জীবন্ত যে তাহাদের কথা বলিবার সেই বিশেষ ভঙ্গিতেই
তাহারা আমাদের ধ্রুবের নিভৃততম অংশে অতি সহজেই
স্থান করিয়া লইয়াছে।

শৈলজাননের রচনা-ধারা বর্তমানে যেই নিম্নলিখিতগুলি
জীবন বহির্ভূত আরো বিচিত্র গমী-জীবনের দিকে অগ্রগতির
হইয়াছে। কিন্তু বিভ্রাত্যলোচিত জীবনের বেদনা অনেকা
স্থানীয়, শতদীন, ধূসর প্রান্তরের পারে, একটি মাটির ঘরে,
যে মাটির প্রাণী, অধকার-রজনীতে কণোত-পাত্তর ছায়া

বিস্তার করিতেছে তাহার কবণগমীর বেদনা বোধের ধারাই
তিনি তাঁহার গমে প্রাণ-সংলগ্ন করিয়াছেন।

‘নন্দিনী’ তাঁহার সেই গমী-সমাজের সহজ এবং স্বাধীন
মানব-জীবনের ছবি। দৃষ্টান্তের অভিব্যক্তি, ভাষা-বিশ্বাসের
অপূর্ণ নৈপুণ্য এবং অভিজ্ঞতার চরম সার্থকতার এই করণ-
কাহিনী রসোচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে।

নারী-জীবনের ছোট বিশেষ দিক (কথা ও জননী) এই
বইটিতে আশ্চর্য সুশক্ততার সহিত পরিচুত করা হইয়াছে।
‘নন্দিনী’তে আদরলি কথা মল্লিকার সমস্ত জীবন-ব্যাপী
দ্রুত-বয়সী এবং ‘জননী’তে শক্তির বাবু নারী-জীবনের মধ্যে
কথা অপূর্ণর জগৎ যে গভীর অন্তর্দর্শন অবশেষে আনন্দপ্রসূত
অবশান লাভ করিল, তাহা প্রত্যেক পাঠকের মনকে
গভীরভাবে স্পর্শ করিবে।

একদিকে অর্ধশৈলী গ্রাম্য বুদ্ধ রসিকাল, ‘বাস্তব’
hero, কামাই বোপী, গমী-বিদ্যা কামিনী, এবং একদিকে
আদরলি কথা মল্লিকার জননী সৌদামিনীর অপূর্ণ মানব-
দ্বন্দ্ব, অপরদিকে বিপ্লবীক দেহ-প্রবণ ছোট পিতা
কেশবচন্দ্র, দ্রুত কথা শক্তী এবং তাহার সমস্ত জীবনের
দৃশ্য-দর্শন এবং চিত্তা, কথা অপূর্ণর মধ্যে কি ভাবে
সার্থকতা লাভ করিল, তাহার অশ্লীল-সজল, করণ ইতিহাস,
নন্দিনীতে রূপে ও রসে স্পন্দমান হইয়া উঠিয়াছে।

শৈলজাননের অতীত, নারী-বেশ এবং যুব-বয়সের মতো
এইখানিও বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি অক্ষর স্থান
অধিকার করিবে, সন্দেহ নাই।

[নন্দিনী—শৈলজানন যুগোপাখ্যায়। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
এও সপ, কলিকাতা। দাম: দেড়টাকা। ছাপা ও বাঁধাই সম্পূর্ণ
আধুনিক।]

শ্রীমন্তলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞান তরুণ বাঙালীর
আমর্চয় সাফল্য

আমাদের গার্লগার্লের সহিত সানন্দে আমরা একটু সন্ধ্যাবারী এবং
সুন্দর হস্ত বাঙালীর পরিচয় করাইবার সৌভাগ্য অর্জন করিবে।



ঈশ্বর বাঙালী

হিন্দু উন্নয়ন সংস্থা, বারপুত্র, ইন্ডিয়ান কলেজ

এশিয়ার সহিত উন্নয়ন হইয়া থাকার জ্ঞান-বিদ্যা। আরো সুস্থি-পাঠ্য
প্রিন্ট ইংরেজি ব্যাকরণ করেন। সেখানে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এন্ড্রিউ
ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চতম সন্থানের সহিত
বি.এস. সি ডিগ্রী গ্রহণ করেন। পরে তিনি মুক্তকণ্ঠের বহুবিধ
ইলেকট্রিক যন্ত্রের কারখানা-সমূহে কাজ করিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা
ও নৈপুণ্য অর্জন করেন। অল্পেই জ্ঞানেন বিশেষ শিক্ষালাভ করিবার
পক্ষে সেখানে কত বাধা! কিন্তু তাহা সবেক উন্নয়ন বাবু তাহার অসীম
একাগ্রতা ও মনোহার বলে জাশ্বিনীর বিদ্যা কাথখানার এবং তার
বৎসর ধরিয়া সমগ্র ইউরোপে এই ইলেকট্রিক বাতির বাস্তবের নির্দেশ-
কৌশল নির্বাহ ভাবে আচরণ করেন। তিনি ইউরোপে পরিভ্রমণের সময়
তাহার ক্ষমতা পরীক্ষার জন্য যার্মিনের একটি রসায়নগারে বাস্তব
প্রদত্ত করেন এবং বেশে পরিচয় যে সব বাস্তব প্রদত্ত করেন তাহা
যে কত পরিষ্কার এবং নির্বাহ হইয়াছিল তত রবীন্দ্র জগদীশ অস্বপ্নের ভা-
বেদন সাধা। প্রকৃতি বিজ্ঞান মনোবির উচ্চ প্রশংসা হইতেই অস্বপ্ন করা
মাইবে।

ঈশ্বর বাবু বৎসর ইউরোপে শিক্ষালাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া স্বদেশে
প্রিন্ট বাণীপথে একটি কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। ইহাদের কোম্পানীর
নাম বি বেক্স ইলেকট্রিক ল্যাম্প ওয়াক্স লিমিটেড। ইহাদের অধি-
শ্রমক শ্রমিক ক্রীট, বলিভার।

যেহা, পরিচয়, তরুণ বাঙালীর এই প্রচেষ্টা। অস্বপ্ন হইক, ইহা
আমরা কামনা করি।

চন্দন-সাবান

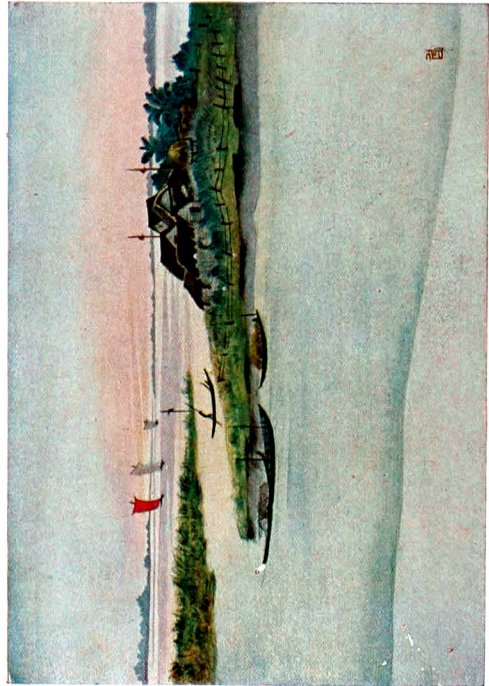
সভ্যতার আদিযুগ হইতে আজ
পর্যন্ত চন্দন, সকল শুভ-কার্যের
ও পরিব্রতের অঙ্গ। অতি পুরাতন
হইলেও ইহা চিরনূতন। চন্দনের
অবিকল গন্ধ ও রং আমাদের
সাবানে প্রতিফলিত

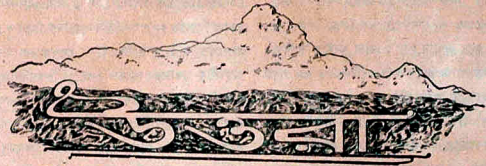
—আমাদের সাবান—

ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়।

কলিকাতা সোপ ওয়াক্স
কলিকাতা।

“চন্দন চাঁদা দ্বারে দ্বারে
চন্দনমালা ছলিতে বায়ে।”





সপ্তম বর্ষ

কার্তিক, ১৩৩৯

পঞ্চম সংখ্যা

উত্তরা

শ্রী অতুলচন্দ্র গুপ্ত

ইংরেজের উত্তরাপন বিজয়ের রাত্তা রিয়ে কিছু বাঙ্গালী
উত্তর ভারতময় ছড়িয়ে পড়েছিল। উদ্দেশ্য—জীবিকা-সংগ্রহ,
সেই সব নতুন উপায়ে ইংরেজের রাজ্য-শাসন বা ভারতবর্ষে
আনদানী করেছে। এই নবাগত উপায়ে বিজ্ঞা ও কৌশল
যতাবতই প্রথম বিজিত বাঙ্গালী উত্তর ভারতবর্ষের অল্প সব
জাতির পূর্বে আয়ত্ত করেছে। এবং সেই সুযোগে,
ইংরেজের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আত্মসম্মতিক্রমে, 'বাঙ্গালার
বাহিরে বাঙ্গালী' সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।
তার পর অনেকদিন কেটে গেছে; সে প্রথম অবস্থা আজ
আর নেই। ইংরেজ-শাসনের ইস্পাতের স্তম্ভের সমস্ত
ভারতবর্ষ বাঁধা পড়েছে, এবং ভারতবর্ষের সকল জাতি এই
শাসনের কারখানায় মজুতিগিরির বিজ্ঞা শিখা করেছে। এ
বাণীপরে বাঙ্গালীর আর কোনও বিশেষত্ব নেই; বরং ভারত-
বর্ষের অল্প হু একটি জাতি এ বিজ্ঞার ও কৌশলে বাঙ্গালীকে
ছাড়িয়ে আছে।

ইংরেজের ভারতবর্ষ বিজয় ও শাসনের প্রথম ছই অঙ্ক
শেষ হয়ে এখন আরম্ভ হয়েছে তৃতীয় অঙ্ক। ইংরেজের
একজের সাম্রাজ্য পূর্ণপ্রাপ্ত থেকে হুক ক'রে সমস্ত মহাদেশ
জুড়ে বসেছে; যে রাষ্ট্রের ব্যবস্থা ইংরেজের কামা তার
উপযোগী শাসন-ব্যবস্থা ভারতবর্ষময় প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এবং এ
কালের ধরণ-ধারণ বৃদ্ধিতে, ও হুহুম-মামিক একে চালিয়ে
নেবার দক্ষতা লাভে ভারতবাসীর আর কিছু বাকী নেই।
কিন্তু প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য মাহুয যে সব উপায় প্রয়োগ করে
তার ফল অনেক সময় লক্ষ্যকে ছাড়িয়ে যায়। ইংরেজ
শাসন-কর্তারা নিজেদের কাজের হুহুদার জুই ভারতবর্ষকে
এক শাসন-মণ্ডলের অনীনে এনেছিলেন। তাঁদের কাছে
ভারতবর্ষ হচ্ছে এক administrative unit। ভারত-
বর্ষের অল্প কোন unity তাঁদের লক্ষ্যও ছিল না, কামাও
ছিল না। কিন্তু বিদেশী শাসন দড়ির এই বাইরের বান্দন
ভারতবর্ষের প্রদেশ ও জাতিগুলির নাজীম বোগ ঘটতে

আরম্ভ করেছে। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অফিস' হতে মহারাজের বিখ্যাত আজ্ঞার কথা না, কাজের কথা। মানুষে মানুষে বোণের অঙ্গ পাটগণিতের নিয়ম মানে না; ছুয়ে ছুয়ে চরে না হ'য়ে এখানে পাঁচ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।

ইংরেজের রাজ-শাসন ভারতবর্ষের জাতিগুলির মনে সমস্ত ভারতবর্ষের একেবারে যে আকাজ্ঞা এনেছে, সে হ'চ্ছে রাষ্ট্রীয় ঐক্য, 'কংগ্রেস' দ্বারা প্রতীক। অর্থাৎ বাইরের চোখে ইংরেজ যে ঐক্য এনেছে, অস্থিরের চোখে ও প্রয়োজনে সেই ঐক্যকে লাভ করা। প্রাচীন ভারতবর্ষে এই মহাদেশের খুব বড় অংশের রাষ্ট্রীয় ঐক্য কখনও কখনও ঘটেছে; কিন্তু প্রতিবারই সে ঐক্য হ'য়েছে অস্থিরস্থায়ী। বহু বৎসরও ছোট্ট রাজ্যে বিভক্ত অবস্থাই প্রাচীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় মানচিত্রের স্বাভাবিক চেহারা। কিন্তু এই রাষ্ট্রীয় ভেদ ও নানাত্বকে উপেক্ষা করে প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজ ও সংস্কৃতির যে ঐক্য ও যোগ ছিল আধুনিক ভারতবর্ষের তা নেই। এক সংস্কৃত ভাষা সব প্রদেশের শিক্ষিত ও বিদগ্ধ সমাজের ভাষা, চিন্তা ও সাহিত্যের ভাষা হওয়াতে প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজ ছিল এক সমাজ। কবি, দার্শনিক ও শাস্ত্রকার তাঁদের কাব্য, দর্শন ও শাস্ত্র-রচনা করতেন এই ভারতব্যাপী শিক্ষিত সমাজের জন্য, তাঁদের জ্ঞান-প্রদর্শনের জন্য নয়। উচ্চবর্ণের রাজসভার যে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'র অভিনয় হ'য়েছিল, ছাপাখানা না থাকলেও সে নাটক যে অঙ্গবিনেই ভারতবর্ষের সব প্রদেশের বিদগ্ধবর্গের হাতে পৌঁছেছিল তাতে সন্দেহ নেই। 'মিতাক্ষর'র মত আইনের পুঁথি দাক্ষিণাত্যের এক রাজ্যে লেখা হ'য়ে দাক্ষিণাত্যের ও আধারবর্তীর প্রায় সব ভাষায় নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে বৈদ্যবিনে দেয় নি। শব্দরাচাচ্যের দর্শন ভারতবর্ষের প্রচার হ'তে তাঁর ভাষাগুলি রচনার পর কতদিন লেগেছিল?

বর্তমান ভারতবর্ষের ইংরেজী শিক্ষিত লোক এর রকম এক শিক্ষিত সমাজ নয়। কারণ ইংরেজী ভাষা আমাদের কাছে প্রধানতঃ ইংরেজের শাসন-কালে মজুরিগিরি চালানোর ভাষা, এবং আত্মশিক্ষারূপে ইউরোপের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় লাভের ভাষা। 'ভাষা ভারতবাসীর প্রকাশ ও সৃষ্টির ভাষা নয়। সেইজন্য ভারতবর্ষের এক প্রদেশের

ভাষা, চিন্তা ও সাহিত্যের ধারার অঙ্গ প্রবেশে ছড়িয়ে পড়ার নেনে ও স্বাভাবিক প্রকাশী হয়ে। রবীন্দ্রনাথের মত মহাকবি ভারত-বিখ্যাত হন যখন তিনি হন বিশ্ব-বিখ্যাত। অল্প অল্প প্রবেশের কবিতা ও শক্তিশালী লেখকদের রচনার সঙ্গে বাঙ্গালীর কবিতা ও গদ্যের নেই। বিশ্ব-বিখ্যাত মন এমন বাঙ্গালী লেখকের সঙ্গে ও 'অল্প ভারতবাসীর পরিচয় অতি সামান্য। নানাজাতির কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের কথা যে সমস্ত ভারতবর্ষ জানে তার কারণ বিজ্ঞানের দেশ নেই। পৃথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞানিক মিলে এক বৈজ্ঞানিক সমাজ।

এ অবস্থা স্বাভাবিক নয়; এর বদল ঘটান প্রয়োজন। ভারতবর্ষের ঐক্য যদি শুধু রাষ্ট্রীয় ঐক্যই শেষ হয়ে তবে সেটা হবে একটা মস্ত লোকশাসনের ব্যাপার। এ ঐক্যকে গভীর ও বিচিত্র ক'রে তুলতে হ'লে ভারতবর্ষের শিক্ষিত লোকদের আবার এক সমাজের লোক করতে হবে। ভাষার ঐক্য দিয়ে এ কাজ আর সম্ভব নয়। বিভিন্ন প্রদেশের আধুনিক সাহিত্য প্রাদেশিক ভাষাতেই গড়ে উঠেছে ও উঠবে। ইংরেজীর বদলে যে ভাষা ভারত-মহারাষ্ট্রের রাজ-ভাষা হবে তা বাদের মাতৃভাষা নয়, অর্থাৎ অস্বিকার্য ভারতবাসীর পক্ষে, হবে ইংরেজীর মতই কাজ চালাবার ভাষা, ভাষা ও চিন্তার ভাষা নয়। সুতরাং ভারতবর্ষের এক শিক্ষিত-সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে আজ প্রয়োজন বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যগুলির মধ্যে যোগস্থাপন করা। তাদের মধ্যে এমন সব রাজপথ তৈরী করা যা দিয়ে এক সাহিত্যের ভাষা, চিন্তা ও সৃষ্টি অথ সাহিত্যে অনারসে প্রবেশ করতে পারে। এর জন্য চাই প্রত্যেক প্রদেশের শিক্ষিত-সমাজের মধ্যে এমন সব লোক অল্প প্রবেশের ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে বাদের নিকট পরিচয় আছে, এবং যে পরিচয় যারা তাঁদের মাতৃভাষাভাষীদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন।

এই নূতন রাজ্যের সন্ধানে বাঙ্গালী আবার ভারতবর্ষের পথ-প্রদর্শক হ'তে পারে। আমাদের সাহিত্য ভারতবর্ষের অল্প সব সাহিত্যের চেয়ে সমৃদ্ধ। এবং বাঙ্গালীর সাহিত্যের মধ্যমারোধ ভারতবর্ষের অল্প সব জাতির চেয়ে বেশী। অস্বাভাবিক প্রদেশের ও ভাষার সাহিত্যগুলির সঙ্গে বাঙ্গালী সাহিত্যের পরিচয় করবার দিন, এবং বাঙ্গালী সাহিত্যের

অ-বাঙ্গালী ভারতবাসীর কাছে পরিচয় করাবার সময় এসেছে। বাঙ্গালীর বাইরে যে প্রবাসী-বাঙ্গালী সম্প্রদায়—এ দূর ভ্রমের সব চেয়ে বেশী। তাঁদের মধ্যে ঐরা লেখক মাতৃভাষার সাহিত্যের সঙ্গে প্রবাসভূমির সাহিত্যের সংযোগ স্থাপনের কাজ তাঁদের হাতেই আরম্ভ হবার আশা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক নয়।

'উত্তরা'র মত মাসিক-পত্রিকা এই কাজে হাত দিয়ে নিজেই সার্থক করে তুলতে পারে। উত্তরা-পথের চিন্তা ও সাহিত্যগুলির সঙ্গে বাঙ্গালীর পরিচয় স্থাপন করে সে

বাঙ্গালী-সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট স্থান অর্জন করতে পারে। ভারতবর্ষের জাতিগুলির মধ্যে যোগ যখন কেবল রাষ্ট্রিক ও ধন-তান্ত্রিক যোগ থাকবে না, যখন সে যোগ হবে জীবনের আদর্শ, ভাব ও চিন্তার যোগ তখন আসবে ভারতবর্ষের প্রকৃত ঐক্য। কারণ কেবল তখনই ভারতবর্ষের জাতিগুলি পরস্পরকে যথার্থ ক'রে চিনবে, এবং পরস্পরকে সম্মান করতে শিখবে। এই নিকট পরিচয়ে অনেক সন্দেহ ও ভয়ের নিরসন হবে সহজ, এবং বহু রাষ্ট্রীয় সমস্যার সীমাসংকেত তা সরল করে তুলবে। ভারতবর্ষের মহারাষ্ট্রের আদর্শ সেদিন পরিণত হবে এক মহাজাতির আদর্শে। এই আদর্শের দিকে প্রথম পদক্ষেপ করে 'উত্তরা' আপনাকে দৃষ্ট করুক।



আকাশ ও প্রেম

ঐশ্বর্যম্বেদ্য মিথ

ছাদে যেও নাক, সেখানে আকাশ অনেক বড়,
—সীমানাহীন।
তারাদের চোখে এত জিজ্ঞাসা,—স্বপন সব
হবে বিলীন।

তার চেয়ে এস বসি তুজনাতে জানালা-পাশে ;
ওধারের ছোট গলিটিরে দেখি ;—গ্যাসের আলো
পড়েছে কেমন ফুটপাথটির ধারের ঘাসে ;
শুনি নগরের মৃদু গুঞ্জন ;—লাগিরে ভালো।

তারপরে চাই তোমার নয়নে, তুমিও চেয়ো ;
—ঘরের বাতিটি জ্বালা হয় নাই, আখো-আধার।
যা দেখিব তারো বেশী যেন সেখা কি রয়েছে এ,
মনে হবে যেন চোখের সাগর,—সেও অপার।

যদি খুঁসি হয়, কাছে সরে এসো ; বাড়িয়ে হাত
হাতটি ধরিও, আর মাথাটিরে হেলায়ে দিও।
সুবাসিত চুল,—সেই হবে মোর গহন রাত,
কপালের টিপে পাব প্রিয়তম তারকাটিও।

সীমানাহীন ধাঁধা ধু—ধু করে সখি, উপরে নীচে ;
রচ নীরজ গাঢ় চেতনার কণিক নীড়।
স্বপ্ন-নাশন মহাকাশ হোথা নিঃশ্বাসিছে,
এইক্ষণ-সুখ-প্রত্যয় তাই হোক নিবিড়।

নিকট পৃথিবী ঘিরে থাক্ ; আর যা কিছু চেনা,
তাই দিয়ে রাখি শূন্য আকাশ আড়াল করি।
মুহুর্তগুলি মন্থন করি উঠে যে ফেনা,
তাহারি নেশায়, সব সংশয় যেন পাসরি।

ছাদে যেও নাক, সেখানে আকাশ অনেক বড়,
সীমা-বিহীন।
তারাদের চোখে এত জিজ্ঞাসা,—স্বপন সব
হবে বিলীন।

অবিজ্ঞা কেন ?

শ্রীললিতাকান্ত গুপ্ত

সৃষ্টির মধ্যে অমঙ্গল কেন, অবিজ্ঞা কেন ? পাপ এল কোথা হতে ? শয়তানের জন্ম দিল কে ? ভগবানই যদি আছেন—তবে অ-ভগবানের আবির্ভাব কেন, অপ্রতীত প্রভাব কেন ? যে সত্তা সর্বজ্ঞানময় সর্বশক্তিময় সর্বআনন্দময়—জাগ্রতের জগতে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে লোপ পেলে কি রকমে ?

অ-ভগবান ও ভগবান—ভগবানের ছায়া, ইতর রূপ, বিপরীত দিক—বামা মূর্তি। ভগবান অনন্ত—তীহাতে আছে অনন্ত সম্ভাবনা। ভগবান—পাপ অমঙ্গল ও এই অনন্ত সম্ভাবনা—মধ্যে একটি।

বাস্তব জগৎ আর সকল ধারা ছেড়ে দিয়ে এই ধারাটি আশ্রয় করে ফুটে উঠেছে তার বিশেষ হেতু, উদ্দেশ্য, সার্থকতা আছে।

চরম বৈপরীত্যের প্রয়োজন, এক প্রান্তের “না”-কে অন্ড্র প্রান্তের “হা”-তে পরিণত করার জন্য—এই সত্য প্রমাণ করবার জন্য যে ভগবান এমনি এক অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু—যে তাকে অস্বীকার করে কারে চলে ও শেষে তারই মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়।

চরম নেতি যেখানে ঠিক সেখানে পরম ইতি।

যেখানে দেখা যায় ভগবান নেই, অ-ভগবানকেই যেখানে গড়ে তোলা হয়েছে, সেখানেও ভগবান।

শুধু তাই নয়, যেখানে ভগবানের—একান্ত অভাব বলে বোধ হয়, সেখানেই হবে ভগবানের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা।

মৃদার মধ্যেই চিদার সাক্ষাৎ পরম প্রকাশ।

জড় আত্মার একান্ত বিপরীত—আপাতদৃষ্টিতে ; আত্মাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, ধ্বংস করেই যেন জড়ের আবির্ভাব। আত্মার নাস্তিই যেন জন্মট হয়ে জড়ের পরিণতি।

আত্মা হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে যে সত্তা স্বাধীন ও স্বতন্ত্রী হয়েছে আপনার পথে, আপনার ভাবে সার্থকতা-লাভের প্রয়াসে চলেছে, সেই ক্রমে এসে পৌঁছেতে ঘনীভূত অজ্ঞান এট জড়ের সীমানা। ব্যষ্টির স্বৈরাচারের মূল্যই অবিজ্ঞা অমঙ্গল—তারই অজ্ঞান নাম পাপ শয়তান।

কিন্তু আত্মা হতে যতই আমরা অষ্ট হয়ে পড়ি না কেন, আত্মাকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়েই আমরা চলি। তবে যত দূর চলে যাই আত্মা তত আত্ম-গোপন করে চলে।

জড় আত্মার নাস্তিই নয়, তাহার আত্মবিস্মৃত স্বয়ং ঘনীভূত রূপ।

স্বাধীনতা, স্বাভাবিকতা, ব্যষ্টির নানাধ যত উগ্র হয়ে উঠবে—পরিণামে এই সত্য তত জীবন্ত জাগ্রত হয়ে দেখা দেবে যে নেহ নানাস্থি কিঞ্চন।

পৃথক পৃথক স্বতন্ত্র-দেহধারী যা কিছু দেখ তা এক অখণ্ড, অভিন্ন—শুধু চৈতন্যের, অস্থরের অন্তর-তমে একাকারের মধ্যে নয় কিন্তু এই এখানে এই স্থল বস্তুর দেহেরই বৈচিত্র্যময় আয়তন।

দেহের নানাধ একটা পরম একাকৈ নানাভঙ্গীতে মূর্ত জাগ্রত করে ধরেছে।

দেহের উত্তর আত্মাকে শরীরী করবার জ্ঞান। জড়ের গুপ্ত প্রেরণা চৈতন্যকে ইন্দ্রিয়-গোচর করে ধরা অ-ভগবানের লীলার রহস্য ভগবানকে মর্ত্যবাসী করবার প্রয়াস।

দানপত্র

—গল্প—

ত্রিকৈদারনাথ বন্দোপাধ্যায়

কান্নিতে থাকতে তুমি কয়েকবার আমাকে বলেছিলে “আপনার কাছে আমি এমন একটা কিছু চাই যা আমার ঘরে থাকবে এবং যা আপনার মৃত্তি আমার মধ্যে নিত্য গণিয়ে রাখবে।” আমি তখন না ভেবে-চিন্তেই বলে ফেলেছিলাম—“বশ—নিও”। কিন্তু সেওঁয়া হয়নি। কেনো যে হঠাৎ তারও বিশেষ কোনো কারণ নেই। ওটা যোগ হয় মানুষের প্রকৃতি। শোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, যিনি আপনাই দয়া করে, বিন দিন এগিয়ে আসেন তাঁকে লোক টেলে রাখতেই চায়। প্রায়ই তাই স্মৃতি-পাই ‘আহা—অনুর্ক উইল করে যেতে পারেনি।’ কিন্তু পঁচালি বছরে পারেনিই বা কেনো—সমস্যা তখন হয়েছিল কি? বাচ্—

কথটা আল মনে হয়ে ছুঁতাবার পড়ে গেলুম। সেবার মত তো কিছু নেই,—সমরও যে নেই। রাঙ্গুণী বললেন, “আজ এ ভাব যে? ভাবনার ভাগ তো কোনো দিনই নিতে দেখিনি। ভাবতে হবেনা, ওঠো—এখনো সাত আনা পয়সা আছে।” বললুম “তা নহ, তা নহ—স্বপ্নেশ আমার কাছে এমন একটা কিছু চায় যা তাকে আমাদের কথা কোনো দিন ভুলতে দেবেনা।”—তখন বললেন, “কেন তো, দরকারও তো রয়েছে, একথানা হাওনেট তাকে দিয়ে, কিছু বেশী করে কর্জ নাওনা। সেটা যে বন্ধ করাই রাখবে—দিতে হয়—মারে মারে কাপালখানা বলল কিং—টাঁকাটা আর দেওয়া নহ। মনে রাখবার এর চেয়ে ভালো কিছুতো মনে পড়েনা। আজ্ঞা শোমোবিকি—তার কলাবিদ্যায় কেঁ’বু আছেনা? তাহলে তোমার সেই পেয়েয়ে বেয়লা ধানিই তাকে দাওনা। আহা গবের এই বয়স—খুব গুণিও হবে।

আমি সত্যই তাঁর এই উদারতা মনেই বিস্মিত হয়েছি। হবারই কথা। মুড়ো-কাঁটাগুলি পঁচাত্ত ফেলতে থাকে কখনো বেনিনি, বললেই শুনেছি “রাখলেই কাজে লাগে গো—কাজে লাগে।” ১৭০ টাকা দিয়ে কেনা বিলিটি Bass খানা, অন্য-

যাসে নির্ধনভাবে দিতে বললে কোন প্রাণে? আঁয়া:—ছেলেটার মুখ পর্যন্ত চাইলেনা! বললুম—“অমন হুজোবরি ‘বাসু’—ছেলেটার জন্ম—”

বাধা দিয়ে বললেন—“তোমার মন এতো ছোটো হয়ে যাচ্ছে কেনো বলা দিকি? ওতে যে আমার কতটা লাগে, তুমি তা যদি বুঝতে! শোককে দিতে হয় তো যা উৎকৃষ্ট তাই দেওয়াই তো উচিত। ছেলের জন্তে ভাবছো—ছি; বাঁচুকই আগে। ওকি ভাণা নিয়ে আসেনি—সেটা কেবল তুমিই এনেছিলে?—ও জিনিসের গুণর তোমার যখন এত নাগ, আমি ওইটেই তোমাকে দিয়ে হুজোবর দেওয়াবোই,—তোমার হাত একটু খুলুক—

তখন আমিতো নির্দাক,—সম্ভ্রান্ত মাথা হেঁট। উ—কেতর কেতরে কি উদারই হয়ে পড়েছেন, একদম দরিদ্রা বলে গেছেন—কিছু জানতে সেননি। আমিই অজ্ঞাতে যোমায় পৌছে গিছি!

এখন সেই Bass-টিই তোমাকে দেওয়া হির করলুম। সেই সঙ্গে সেটির পুর্ল ইতিহাসও দিতে হচ্ছে। কারণ সে যে কি বস্তু এবং কিভাবে আমি তা পেয়েছিলাম তা তোমার জানা দরকার। নচেৎ তুমি তার কদর বুঝবে না। যেমন গীতাপাঠ সমাপ্ত করে, তার মাহাত্ম্য পাঠ না করলে, গীতা-পাঠের ফল হয় না, এটি সন্দেহও আমার দাব্য তাই।

খুব সংক্ষেপেই জানাই। সেকালে অভয়দাসের বাজার দলে হুদিয়াবু ছিলেন ডাকঘাইটে বেরশা বাজিয়ে। তাঁর বাজনা শুনে পঁচাত্ত আমার ওই বাজনাটা শেখবার ভারী ইচ্ছা হয়,—দেশা জন্মায়। কিন্তু ভুল্লশোকের ছেলের, তখনকার দিনে তা সহজ ছিলনা—বুজিয়ে সে পাণ করতে হত। পরে চাকরি-হয়ে জবলপুরে গিয়ে পড়ি। সময় না হলে

কিছু হয়না,—সাহেব বিশেষত চললেন—তাঁর জিনিষপত্র নিশেমে চড়িয়ে। তার মধ্যে ছিল একখানি পেয়েয়ে bass। সাহেব আমার ইচ্ছা জানতে পেরে দয়া করে আধাশামে ১৭০০ টাকার সেখানি আমাকে present করলেন। বাদুশীর্ভাবনা বস্তু,—আমি রক্তার্থ হলাম। একটি কিনিবোম্ম শুয়ে গাড়ি চড়ে তিনি বাসার এলেন এবং বার-বাড়িতেই হান পেলেন, পতী, (তখনো রাঙ্গুণী ধাঁড়ানি) ছেলেরপুলের ঘর, কি জানি কখন কি অপরায় হয়ে, ও-সব না স্মরণতীর হাতে যন্ত্রস্তা, ইত্যাদি।

বাইরের ঘরে বন্ধুবান্ধবেরা নিত্য আসতেন, তাগ খেলতেন,—আমি ভ-তিনিদন বাজনা প্রায়কিটু আরম্ভ করতই, তাঁরা কমতে আরম্ভ করলেন। সুনসুম, আমি ছিছি টান্লেই তাঁরা তম্বার হয়ে পড়েন—খোলায় তুল হয়।

বেশ,—দেখেনা—বাইর থেকে খানি পড়ে থাকে, ইউকিয়া সব গুণর ভাল্য থাকেন। তাই আমার করদুম। তিন দিন পরেই দেখি যে বাড়ীতে তালাবন্ধ। বাণীর কি? সংবাদ নিয়ে জালনসুম—দেখেনাবাবুর স্ত্রী সজান সম্ভবা তাই—পুলিস-লাইন খোঁসে, খোলায় ঘর নিচ্ছেন যাতে বৈঠকখানা নেই, হোথালাও নেই।

কাজেই বাড়ীতে আবার মিসতে হল,—ভেতরেই একটু হান দখল করদুম। একটা সুহর পুঁথোছিলুম, সেটা হঠাৎ ক্ষেপে গেল,—‘বাস’খানা হাতে দেখলে—আমাকেই বামড়াতে আসে। ছিছি টান্লেই গোঁ-গোঁ করে—স্বর দেয়। বাড়ীর পাশেই একঘর গয়লা থাকতো,—বাড়ীতে অঙ্গে কাঁপে, বলে—গাইওলো দুই ঘিচ্চনা,—বাঁট শুকিয়ে আসে। তারপর থেকেই ‘বাসের’ কান টিপতে গেলেই পট পট তাঁত ভেঙে। (বহনিন পরে—তখনই—তাঁতে না ময়লা ঘরে গৃহিণী তাই খামা যসে সেগুলি নিত্য পরিষ্কার করে) রাখতেই।

রোজ রোজ কেনাও বায়মাধ্য। রবি মাল রাখে,—বলায় মোকানবারের সঙ্গে একদিন বেশ বগড়া হয়ে গেল। মূর্খ বললে,—“বাবু-সাহেব, এ মাংসবয়ের পা-টেণা নহ, এ গুধর-বিয়া;—দিনকতক বাইজিরের পা টিপুন গিয়ে। তাদের হাওরা না গেলে, ও-সব হুজ কলা পাইবে না।” বেটা

বলে কি?—বাইজি পাই কোণা। বাড়িতে তো স্বরের মধ্যে রীপকের চর্চাই পাই।

১৭০০ টাকা দিয়ে সম্ভার ‘বাসু’ কিনে বড়ই বিরত হয়ে পড়লুম,—এ প্রসঙ্গে সম্ভারের নেই দেখছি। উপায় চিন্তা করছি, এমন সমর কোতোচাল সাহেব, দুজন কনট্রোল সবে করে এসে উপস্থিত। তাঁর সঙ্গে—সোলাম-করা সম্পর্ক ছিল। বোধ হয় বাজনা শোনবার সখ আছে তাই এসেছেন। কোথাও খুঁটনি হলে মায়ে মায়ে তাঁদের হরিপদাবাবুর বাড়ী এসে—তাঁর হরিভক্ত রিক্সাবারট পতীকার্থে নিয়ে যেতে দেখছি, এবং চরম টোটাগুলি শান্ত ও গুমস্ত অবস্থায় লুপেলে আছে কিনা, সাহেবে সে সংবাদও, তাঁরা নিতে কোনোদিন ভুলতেন না। তাতে জানি, তিনি যেমন সজ্ঞন তেমনি নিশ্চক লোক;—নচেৎ বিশেষত কে-করা এতটা পৌঁছে রাখে?

তিনি হাসত! হাসতে বললেন,—বাবুজি,—আপকলা ‘ও-ঠো’ নিকালু দিচ্চিয়ে।

তখন আমি অবাক! আমার কাছে ‘ও-ঠো’ আবার কি? আমার তিন পুরষ ‘ও-ঠো’ কখনো দ্যাখেনি। নিম্নর এটা হরিপদাবাবুর বাড়ী বলে ভুল করেছেন। আমিও হাতে হাতে বললুম,—‘সে-ঠো’ এ বাড়িতে তো থাকেনা কোতো-চাল সাহেব,—আমি তো রিক্সাবার রাখিনা, আমার জোজ আছে,—ওতে কাজ কি?

এইবার তিনি বেশ গম্ভীর ভাবেই বললেন,—‘ও-ঠো’ নেহি রাখতে—উসুকা দালা তো রাখতে! বাবুজি, হয়ে কাটনমেন্ট হায়,—হিঁয়া আপ বাগ। গুজবু, মচায়া,—সব্ কাইই বেকানো—(‘কুজি’) হো গিয়া। আপকলা পেরিগাপা তিন চারটেই বকুরি, পেরু (বাঘ) আয়া সমরকে খাড়া খাড়া কাপতে-কাপতে মরু গিয়া। কালু হেলথ অফিসার (Health officer) সাহেবকো গোড়ী গোঁরু বিগড়ু গিয়াথ,—সাংবার বসির যে বজু গোয়ী (কাগের কোরে বেকে গোছেন।)—লাইয়ে, দিচ্চিয়ে.....

তখনো বুকিনি। যখন বললেন,—আপকা ওই সুনী ‘গোলা’-ঠো (বেরাখানা) নিকালিয়ে,—সাইয়ে। উসুকা ‘কুজিডিনে’ রাখেনে হোগা, কিফরু নেহি (চিন্তা নেই), মালু আখিকা রহেহা.....

এ সব কি কথা,—বলে কি? বাসু আর রিক্তবাস একই বস্তু নাকি,—এ সব কি বুদ্ধি! আগুয়াক জ্বলছেই আছে বটে, তবে সমস্তবাসের কাছে একটি স্থর একটি অস্থর। কিন্তু কোন কাহিনীই কাজ বিশেষ না,—‘বাস’ থানা রিক্ত-বাসেই ধড়িয়ে গেল!

এনে বিতাই হল। পত্নী হার হার করে উঠলেন—চোখের জলও ফেললেন। অনেক বুদ্ধিয়ে থামলুম,—সে কি ধামে? বলে সম্ভার পর হু’ও কাটিতো ভালো,—তাও কারুর সইল না!

বন্ধু-বান্ধবের দয়া করে সকলেই এসে পৌঁছেছিলেন,—সম্বন্ধের চক্রে প্রতিবাদের ভাব,—সবাই অস্থর কি না।—বলে, একি জ্বল—লোকে নিজে চর্চাও করতে পারবে না,—এ বড় বেজায় কথা!—তুমি ব্যাধির ঘোষের কাছে একবার হাও তাই। এ চেপে গেলে, ভাল গরুটো কেউ খুলে নে’ মাঝে,—বললেই হ’ল—তিন ইকির বেশি শিং,—ডেজারস্ কিনিব! তার পর জর,—আশ্চর্য কি। ইত্যাদি। চাকরটা পর্যায় feel করতে লাগলো। বলে,—‘হাসু’ স্থর ছাড়লে, কোথা যে কাজ হয়ে যেতো—চড় চড়, এগিয়ে পড়তো,—পায়েই লাগতো না মশাই!—ক্ষুধি আসতো, প্রাণটা তাতেই পড়ে’ থাকতো। সরি সিকার উঠের সত তদ্বর হয়ে থাকতুম’।

আর শুনেতে পারছিলাম না। বড় মন্থরা হয়ে আপিসে গেলুম। কাঙ্ক্ষ-কর্ষ করতে পারলুম না;—পত্নীর চোখের জল, বন্ধব বন্ধদের সমবেদনা, চাকরটার আপশেষ, সর্বোপরি সেই স্থর-অস্থরীর বিরহ, আমাকে বড়ই কাতর করে’ রাখলো।—শোকতপ্ত বাড়ীতে ফিরতে যা আর উঠিছিল না।

সন্ধ্যার অন্ধকারে ফিরলুম। পত্নীর কি অবস্থাই লে দেখেবা? রামকলিটে শুনে কি ভাগই বাসতো!

বাসার আতো গোলাগ কিসের? প্রাণটা ছ’ং করে’ উঠলো,—হঠাৎকিটা চাপালো নাকি? অর্থাৎ,—মোক্শোম্ সেগেছে কি না!

গিয়ে দেখি,—বন্ধু-বান্ধবেরা সব—ছেলেপুলে নিয়ে হাফির। ব্যাপার কি? ঠাঠর রক্য করে। ঠুর যে বাড়ী

মোলায়েম্ দাত....চকলভাবে বাড়ী ঢুকে, উঠানে পা দিয়েই দেখি,—পুরুষমানাই উপস্থিত, তুলসী-ভলার সমাবেশ,—হরির লুট উজ্জ্বল, গুণ্ড চলেছে!

চুট এগিয়ে এসে পত্নী হুমধুর অভিমোহ-কণ্ঠে বললেন,—‘হাজ আতো দেবী করতে হয়? শীগগির কাপড় ছেড়ে এসো,—আমি ভেবে মরছিলাম....’

উঃ বাচলুম ঠিক!—আমি....কবে আটকান ছাড়া নেব নেব গেল।

বললুম,—তা—এসব....
হাসিমাতা চোপে সহজ স্বরে বললেন—একটা মানসিক ছিল,—তাই। নাও—দাড়িও না আর, কাপড় ছেড়ে প্রণাম করবে এসো।

তগপা।

বাচ্ তুলে তো? আর চিন্তা নেই,—কমলকৃষ্ণি আছেই। এখন ও বসন্ত তোমাকেই দিলুম,—গিয়ে এনে বা আনিবে নিও। তারের হোপাজতে ‘সেক্ কইভিয়ে’ নিরুজ্জ্বল আছে। পাচশো টাকা বা ছ’হুন্স রায় বাহাদুর—জামিন থাকলেই পাবে। আমাদের দ্বিত দিন রাতে ও জাগিয়ে রাখবে। আশা করি, অজো নিশ্চয়ই ভালো আছ,—পরে কেমন থাকো জানবার জন্যে উদ্ভ্রাণী থাকবে।

—Direction—

মা মল্লচণ্ডীকে স্মরণ করে, ছড়ি টেনে, ইতি—

শুভাকাজী—

ত্রিবেদনারথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ—

হাঁ, আর এক কথা। পূজো আসব, তার পূর্বেই আনিবে নিও। একটু এমালির সঙ্গে বাবহার করলে, এই চর্চনে পূজোর খরচ বেঁচে বাবে,—বাসুদের মত পশ্চিমের হাওয়া খেতে পাবে, হাজারিবাগ, নারানি, খুলো বা ছোটো।

দামামশাই

উপহাস

—গল্প—

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

নাম কাশ্মালীচরণ।

তা কাশ্মালীচরণই বটে! যেমন ঢাঙ্গা যেমন রোগা, পাকানো পাকানো দড়ির মত হাত-পা; দেখিলে মনে হয় যেন পেট ভরিয়া রাখিতে পায় না। কিন্তু পেট ভরিয়া রাখিতে না পাইবার মত ছরবাস তাহার নয়।

বাড়ী ভাড়া লইতে গিয়াই তাহার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। কম ভাড়ায় ভাল একখানি বাড়ীর সন্ধান করিতেছিলাম। খুঁজিতে খুঁজিতে হারবাণ’ হইয়া গিয়া শেষে একদিন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলাম, বাড়ী ঠিক না করিয়া আজ আর বাসায় ফিরিব না।

আমার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না, ছোট একটি গলির ধারে পরিদ্বার-পরিচ্ছন্ন ছোট একখানি দোতলা বাড়ীর দরজার দেখিলাম—‘টু-লেট’ টাঙানো। সদর দরজার কড়া নাড়িতেই ভিতর হইতে জবাব আসিল,—‘কড়া খার’ টালন, টালনেই থলে বাবে।’

কড়া ধরিয়া টানিলাম। টানিবারমাত্র ওগালে গুট করিয়া আঁহাঙ্ক হইল। তাহার পর তেঁজিতেই দেখি, দরজা খুলিয়া গেছে। হুমধুরের ঘর হইতে তিনি ‘আমার’ ‘আমর’ বলিয়া আহ্বান করিলেন তিনিই কাশ্মালীচরণ।

ঘরের মধ্যে বসিয়া তিনি তখন অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে একপাটি চিত্র জুতার নীচে পেরেক ঝুকিতেছিলেন।—‘বাড়ী ভাড়া।’

‘বহন’ বলিয়া হাতুড়ি-সমত সেই বন্ধলের মত দীর্ঘ হাতখানি বাড়ীভাড়া একখানি চোয়ার দেখাইয়া দিলেন।

চোয়ারখানি কাঠের, কিন্তু তাহার আগাগোড়া কাপড় দিয়া এমন করিয়া ঢাকিয়া, কয়েকটা তাহার আগাগোড়া কাপড় তোলাই। জামা দিয়া মাথায় যেমন করিয়া তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢাকিয়া রাখে, কাশ্মালীচরণও তেমনি একটি জামা

মোলাই করিয়া তাহার এই চোয়ারখানি ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। ঘরখানি ছোট, কিন্তু তাহার প্রত্যেকটি দেওয়াল এবং মেঝের কোথাও আর তিলধারণের স্থান নাই। ঘরের একটি দেওয়াল বে’গিয়া একটি তক্তপোষ পাতা, তাহার উপর সদা ধপ্পপে বিছানা; দেওয়ালে টাঙানো অসংখ্য ছবি; তাহার মধ্যে কাশী-তুর্গী সন্ন্যাস-সন্ন্যাসীর ছবি ত’ আছেই, তাহা ছাড়া বিলাতী মানিক পত্রিকা হইতে কাটা উল্লস নারীমূর্তি, বিদেশী কালেক্টরের ছবি এবং বায়োকেপের অভিলেখীদের নানান ভাবভঙ্গীর প্রতিবর্তিত সংখ্যাই বেশি। দেওয়ালের গায়ে দীর্ঘ মাঝিবার একটি ত্রাশ, পেরেকের উপর কয়েকটি চায়ের কাপ, তারের শিকার আখ্যানি পাউরুট বুলিতেছে, ঘরের এককোণে একটি হেঁচ, হেঁচের উপর হাল্লার বাসন,—অভাব কিছুই নাই।

একাগ্রমনে এই সব দেখিতেছিলাম, কাশ্মালীচরণ তাহার পেরেক ঠোকা শেষ করিয়া জুতাছুটি বাড়িয়া মুছিয়া ঘরের এককোণে নামাইয়া রাখিয়া আমার কাছে আসিয়া বসিলেন। বলিলেন, ‘এই সব দেখছেন? দেখুন। সব আমার নিজের তৈরী। কোনও শাল্যকে একটি পরসা দিই না, বৃন্দলেন?’

এই বলিয়া কোণা হইতে একটা আখ-খাওয়া পোড়া বিড়ি বাহির করিয়া তিনি দিয়াশালাই আসিলেন এবং দিয়াশালাই-এর কাটিট উঠিয়া গিয়া দরজার বাহিরে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া বলিতে লাগিলেন, ‘আমার জীবনী লিখলে একটা বই হয় মশাই, আমি বে-বে লোক নই। রবিন্সন ক্রুসোর মত জানেন?’

বলিলাম, ‘জানি।’
কাশ্মালীচরণ চোঁ করিয়া একবার বিড়িটা টানিয়া লইয়া কোঁৎ করিয়া দোঁগাটা গিলিয়া ফেলিয়া বলিলেন, ‘বাংলাদেশের আমিই রবিন্সন ক্রুসো।’

মনে-মনেই বলিলাম, 'তা হবে ; আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

কিন্তু বাহার ভুল আসিয়াছি তাহার এখনও কিছুই
হইল না বলিয়া দ্বিতরে-দ্বিতরে অশ্রু বিবোধ করিতেছিল।
বলিলাম, 'বাউখানি কি আপনার?'

কাজলীচরণ ঘাড নাড়িলেন। বলিলেন, 'হাঁ, আনারই।
রাজ-মিস্ত্রীদের সঙ্গে নিজের হাতে ইট গোপেছি মশাই!

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কত ভাড়া?'

‘ভাড়া ?’ বলিয়া তিনি একবার ‘তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে’ আমার
অপান-মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, তাহার পর কি ভাবিয়া
বলিলেন, ‘বলছি। আগে বাড়ীটা দেখুন। হ্যাঁ, আগে
বলুন ত’ মশাই, আপনার লোক ক’জন ?’

বলিল, 'আমি, আমার স্বী অর একটি চাকর।'
কালীচাঁচকণের মুখ বেঁধিয়া মনে হইল তিনি অত্যন্ত
খুসী হইয়াছেন। বলিলেন, 'হাঁ তাহলে ঠিকই হবে
এইরকম নিকটস্থি সোই আমি চাই দশাই।' এর আগে
এক ব্যাটাকে ভাড়া দিতেছিলাম তার একপাল ছেলে
ছেলে ত' নয়, এক-একটি শরতন। দাগাধাণি ছিল
আমার বাবী-বর-বোর জেও ফেলবার গোণ্ডা বসেছি
দশাই।

দোতলার তিনখানি মাত্র ঘর। আমার পক্ষে উঠে
থাকে। স্থির হইল, ওই ঘর তিনখানি তিনি আমার পাই
টাকার ভাড়া দিবেন। উপরেই ছোট একখানি বায়ান্না আছে
সেখানেই আমার রান্না হইবে। আর नीচের ওই স্বয়ং
ঘরখানিতে এখন যেমন বাপ করিতেছেন তেমনি ব
করিবেন কাঞ্চালীচরণ নিজে এবং তাঁহার এক পনেরো
শোনা বছরের অবিকারিত কন্যা। সুদারে গমনে
বোটে। বহুতর অবিকারিত কন্যা। সুদারে গমনে

দিন দুই পরেই বাড়ীখানি দখল করিলান। জিনিস
গোছ-গাছ করিতে বলিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল
ফিরিয়া আসিতেই শুনি কান্দালীচরণ চাঁৎকার করিতেছে

কেন চাঁচকার করিতেছেন বৃত্তে বিশেষ বিলম্ব হইল না।
সেখিলাম, রোগা ছিপ্ছিপে খন্দারী একটি মেয়ে হেঁটমুখে
তাঁহার কাছে দাঁড়ায়া আছে, আর কাপালীচরণ বোধ
করি তাহার কাছেই যৎপরানন্ত তিরস্কার করিতেছেন।
অম্বাননে ব্রিলাম—এইটাই তাহার সেই একমাত্র কস্তা।
অপরূপ মাত্র সে চায়ের একটি কাপ, কলতলায় দুইটে
গিয়া ভরিয়া ফেলিয়াছে।

মেয়েটির সুখখানি নান। দেখিয়া দয়া হইল। বলিলান,
‘চায়ের একটা কাপ’ ত। যাকগে। তার সঙ্গে আর—’
কাপালীচরণের সুখখানি নিমেষেই কেমন যেন অন্তরকম
হইয়া গেল।—‘কি বললেন? একটা কাপ? হাঁ, একটা
কাপ। দাম—হু’ আনা। এই হু’ আনা পরমা কোথেকে
আসে বলুন ত?’

ব্রহ্মাণ্ড, লোকটা অসম্ভব রূপণ। উহার সঙ্গে আ
বাক-বিতণ্ডায় প্রয়োজন নাই। শি'দ্ধি ধরিয়া উপরে উঠি
বাইতেছিলান, পিছনে কাপালীসমূহের ডাক শোনা গেল—
'চললেন যে মশাই? শুভ্র! পয়সাকড়িকে এত হেনসবুজ
করলেন না, ব্যুলেন? জবাব্যতে অহুতাপ করতে হ
তা'হলে—এই আমি বলে' রাখুন। ছুটে কাচা-না
হেই কিনা, গায়ে হ'ল' বিয়ে' বেড়াচ্ছে। পাঠকতা থ
জেনা বিয়ের গায়েসের বাড়ির মধ্যে ক' বসেছেন মজা।

দৈন্য হাসিরা উত্তর উঠিয়া গোলাম। ভাবিলা
 তাঁহাকে ক্লপণ ভাবা সতাই আমার অস্বর হইয়াছে
 ক্লপণ। হৃদয় তাঁহাকে দাখা হইয়াই করিত না। মা
 মাসে এই বাজীভাঙের পেরিষ্টাট টাকা মার্স মস
 'দু'ভাঙের বাগো-পার, মেয়ের সাং-শোকা, কড়ীর টাঙ্গ,
 অবশিষ্ট কতই-বা আর কতক? নিজের অসময়ের গল্প কি-ই
 রাখিবেন, আর মেয়ের বিবাহই-বা বিবনে কেমন করি
 বেছেই বেছেই মেয়েটর মেয়েটর এখনও বিবাহ হয় না
 কাঁদাশ্লিষ্টদের কথায় রাগ কাগ উঠিত নয়। বে
 সতাই গরীব।

সকালে উঠিয়া তিনি নিজেই বাজার করিয়া আনে।
ছোট্ট একটি তোলা উমান ধরাইয়া নেমেটি রামা কমে
এক পায়ে বাঁহয় তাই। ভাতের সঙ্গে ছাকড়ায় ডাল

করিতে দেখে, 'আলু' সিদ্ধ হয়, খুব যদি বেশি হয় ত' দুজনের
হস্ত দুইটি হাঁসের ডিম সিদ্ধ করিয়া লয়। কিন্তু প্রায়
প্রত্যহই দেখা যায়, মেয়েটি তাহার বাগের খালায় সম্বাই
ধরিয়া দিয়া, নিজে শেষে নোচের একটা অক্ষকায় ঘরের মধ্যে
লুকাইয়া লুকাইয়া শুভ্র ভাতগুলি গিলিয়া গিলিয়া খায়।

আমার স্ত্রী সেদিন বাগারটা হস্তক্ষেপ দেখিয়া আশিষ্যছে,
কিন্তু মেয়েটি পাছে লজ্জিত হয় বলিয়া কিছু বলিতে
পারে নাই।

তাহার পর প্রায়ই দেখি, রান্না শেষ করিয়াই ছোট
একটি থালায় তরকারি সাজাইয়া একবাটি ডাল লইয়া
গৃহিণী নীচে নামিয়া গিয়া চুপি-চুপি ডাকে, 'কৃষ্ণা !'

মেয়েটির নাম বৃষ্টি রুম্মা। বেশ নাম। কিন্তু নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য তাহার কোথাও নাই। গায়ের রং এত পরিকার যে, রুম্মা তাহাকে বলা চলে না। তবু আমাদের রুম্মাই তাহাকে বলিতে হইবে।

কৃষা কোনোদিন 'না' বলে না। হাত পাতিয় থালাটি গ্রহণ করে এবং সলজ্জ একটুখানি বড় মিষ্টি মধুর হাসি হাসিয়া বোধকরি তাহার কৃতজ্ঞতা জানায়।

সেদিন বাড়ী হইতে বাহির হইতেছি, কান্দালীচরণ ডাকিলেন, 'বলি ও মশাই, শুভ্রন !'

ফিরিয়া দাড়াইতেই একমুখ হাসিয়া বলিলেন, 'বলি
রোজ রোজ এত কেন করেন বলন ত?'

‘कि करि?’

‘এই এত এত তরি-তরকারি মাছ ডাল স্বী আপনার
রোজই আগার জঙ্গে পাটিয়ে দেন। তা এক-আধদিন
হয় সেই ভালো, রোজ কেন?’

‘ততে আর কি হয়েছে !’ বলিয়া চলিয়া যাতেছিলাম,
কাদান্ধীরণ আবার বলিলেন, ‘শুধন, শুধন, এত তাড়াহাড়ি
কেন ?—তা বোনাকে বলবেন, তোকরা রান্না !’ এত ভালো
নাগে যে একটা টুকরোও কোনদিন আমি ফেলে রাখি না—
সব খেয়ে ফেলি !’

তাড়াহুড়ি আমার বাহিরে যাইবার প্রয়োজন ছিল।
বলিলাম, 'বেশ করেন।' বলিয়া যেই আমি পা বাড়াইয়াছি,
অমনি পিছন দিক হইতে জানাঘ এক টান পড়িল—'আরে

শুধু না, আর-একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে। 'আসল কথাটাই এখনও বলা হয়নি।'

আবার দাঁড়াইতে হইল।—‘কি কথা বলুন !’
কান্দালীচরণ বলিলেন, ‘ভাড়াটা তা’হল কবে-নাগদি
পাব বলুন দেখি। রসিদ আমি লিখে রেখেছি।’

‘মাস শেষ হইতে তখনও ছ’দিন বাকি। বলিলাম,
‘মাসটা আগে শেষ হ’তে দিন। পয়সা তারিখেই পাবেন।’

‘বেশ বেশ, পয়সা যেন পাই। আগে থেকে বলে রাখলুম...এই আর-কি!’ এই বলিয়া কান্দালীচরণ হাসিতে লাগিলেন।

পয়সা তারিখে টাকার জোগাড় করিয়া উঠিতে পারি
নাই। সেদিন তুমরা। সেইদিনই টাকা পাইবার কথা
আছে। ভাবিতেছি, পাইবামাত্র কাপালীচরণের টাকা
আগে মিটাইব। টাকা না পাইলে বেচারার কষ্টই হবে।

সকালে আমার এক আত্মীয় আমার সঙ্গে দেখা
করিতে আসিয়াছেন। নীচে হইতে আমার নাম ধরিয়া
ডাকিবামাত্র গলার আওয়াজ চিনিলাম। বলিলাম, 'আমুন!
সিঁড়ি ধরে' ওপরে উঠে, 'আমুন।'

তীহারই কজ্ঞ অপেক্ষা করিতেছে। শুনিলাম, কাঙ্গালী-চরণ তীহারে 'ডাকিতেছেন, 'বলি ও মশাই, শুধুন!... ওগুরে যাচ্ছেন? আমার ত্যাগের টাকার কথাটা বাবুকে একবার বলছেন ত! পয়সা তারিখে দেবার কথা ছিল, আজ তেমনি হয়ে গেল। অজ্ঞা লোকের পাল্লায় পড়েছি মশাই।'

লজ্জায় মরিয়া গেলাম। আত্মীয়ের স্তম্ভে এই লইয়া
বগড়া করাও চলে না, অথচ এই অপমান সহ করিয়া মুখ
বজ্রিয়া চপ করিচ্ছা থাকিতেও ঝট হইতে লাগিল।

অতীতের বিদায় করিয়া কাল্পীসরণের কাছে গিয়া
দাড়াইলাম। ভবিষ্যৎহিলাম, গুব ধানিকটা তিরস্কার করিয়া
এবাড়ীতে যে আমার আর থাকা চলিবে না সেই কথাটাই
ভাল করিয়া শুনাইয়া দিয়া আসিবে। কিন্তু দেখিলাম,
করাজীর্ণ শতছিন্ন একধানি খাটো বৃত্তি গরিয়া আর

একখানি কাপড় হিনি হুত-হুতা দিয়া সেলাই করিতেছেন।
দেখিমাঝে রাগটা আমার অনেকখানি কমিয়া গেল। তবু
বলিলাম, ‘দেখুন, ভাড়ার তাগাদা আপনি আমার কাছেই
করবেন, কিন্তু আমার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব যে এ
দেখিতে আসবে তার কাছেরই যদি ভাড়ার কথাটা বলেন ত’
আমার অপমান হয়। তা ছাড়া আমার মত লোকের পান্নার
পড়ে যদি আপনার কষ্ট হয় ত’ বলুন, আমি চলে যাই।’

হেঁটমুখে কাশালীচরণ সবই শুনিলেন। মুখের অবস্থা
দেখিয়া মনে হইল এমন করিয়া বলার তাই তাঁহার বলিতে
হয় নাই তাহা তিনি এককণ্ঠে বুঝিয়াছেন। লজ্জায় বোধকরি
তিনি আর মুখ তুলিতে পারিবেন না। তেমনি হেঁটমুখেই
বলিলেন, ‘আজ্ঞা, আর বলব না।’

বলিলাম, ‘টাকাটা ঠিক সময়ে না গেলে আপনার কষ্ট
হয় বৃদ্ধি, কিম্বা—’

কথাটা আমাকে তিনি আর শেষ করিতে দিলেন না।
এইবার তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। বলিলেন, ‘যেমনে ত’
মশাই। তা আপনি না বুঝলে কে আর বুঝবে বলুন,
আপনি এককন্ঠে শিকিত, বিধান—’

খাঁক। ‘আর প্রশংসার কাজ নাই। মাহতক সবট
করিবার গুণ ময় কাশালীচরণ জানেন দেখিতেছি। ‘আজই
আপনার ভাড়ার টাকা বোঝার চেষ্টা করব।’ বলিয়া উপরে
উঠিয়া বাইতেছিলাম, দেখিলাম, ‘দি’জি-পাশে স্নানমুখে
কুফা দাঁড়াইয়া আছে। পিতার অভয় আচরণের ভয়
সেও বোধহয় অহতপ। জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘রাগা করছ
কুফা?’

বাড় নাড়িয়া কুফা বলিল, ‘না। আমারের আজ
নেমস্তর।’

জিজ্ঞাসা করিতে দিয়া তাহার পরিষেব বস্ত্রটির দিকে
নজর পড়িল। এত ছেঁড়া যে তাহাতে লজ্জা নিবারণ
করা শক্ত। তাহাই অতিকষ্টে কোনোরকমে বুঝাইয়া
ফিরাইয়া পরিয়াছে দেখিলাম। তাড়াহাড়ি উপরে উঠিয়া
শয্যা স্ট্রীকে বলিলাম, ‘মেয়েটা কাপড় পরে’ রম্ভেছে বেগলাশ
সহজিবে একবারের কাপড়খাঁ। জিজ্ঞেস কর ত’ এর কাপড়
কি নেই? তাহলে তোমার সেই মত কাপড়-ছোড়াটা—’

কথাটা শেষ করিবার প্রয়োজন হইল না। স্ত্রী তৎক্ষণাৎ
সিঁড়ির মাথার দাঁড়াইয়া ডাকিল, ‘কুফা!’
মুহুর্তে জবাব আসিল।—‘আমার ডাকছেন বৌদি।’
‘হ্যাঁ ডাকছি। শোনো।’
‘দি’জি বাহিয়া কুফা তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।
‘কাজকর্ম কিছু করছিলে নাকি?’
বুলিলাম চট করিয়া কাগড়ের কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে
স্ত্রীর একটুখানি ব্যতিতেছে।

কুফা বলিল, ‘সোজা দিয়ে কাপড় সেদ্ধ করতে দিয়েছি।’
‘ও, তাই বুলি এই ছেঁড়া কাপড়টা পরেছ?’
‘হ্যাঁ।’

আমার গৃহিণী তাহাকে আরও কি-যেন বলিতে থাইতে-
ছিল, এমন সময় নীচে হইতে কাশালীচরণ ডাকিলেন,
‘কুফা—’

‘যাই।’
মুখ ভাঙেয়াই কাশালীচরণ বলিলেন, ‘যা-ই। যেই
একটু ঝাঁক পেয়েছে আর অমনি গুপের গিয়ে উঠেছে
হতভাগা যেন। কাপড়গুলো কাচাই বা কখন, আর
সুকাবোই বা কখন আর আমি ইন্সট্রিই বা করব কখন?
সেমে আর, চট করে’ নেমে আয় বলছি।’

কুফা তাড়াহাড়ি নীচে নামিয়া গেল। কাশালীচরণ
জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ভোলা রম্ভেছে গুপের?’

‘কই তাহ’ দেখি নি বাবা।’
ভোলা আমার চাকরের নাম।

কাশালীচরণ বলিতে লাগিলেন, ‘এই যে এই সিঁড়ির
নীচেটা এত করে’ দুয়ে-মুখে পরিষ্কার করলাম, ফট করে’
ওই কোথাকার কোন এক গুপ্তপুস্ত্র জুতো পায়ে দিয়ে মশ-
মশ করে’ গুপের উঠে গেলেন, বাস, খুলো-কাদায় আবার
সব একাকার হয়ে গেল। বলি—এসব চরণ-খুলো কি
আমাকেই পরিষ্কার করতে হবে নাকি?’

কথাটা কাহাকে বলা হইল বুলিলাম। লোকটাকে
দয়া করা বুঝা। নিজে কিছু না বলিয়া বাহিলাম, ‘আজকে
ভোলা, তাহাকে দিরাই জবাব দেওয়াইব। আমার বাড়ীতে
লোকজন জুতো পরিয়াই আসিবে এবং যতবার আসিবে

যতবার আমার চাকর গিয়া জল ঢালিয়া ক’টা দিয়া বুলা
পরিষ্কার করিয়া দিবে—সে আবার কি রকম কথা! কিন্তু
ভোলাকে বলিবার জন্ম অপেক্ষা করিতে হইল না। ঠিক
সেই সময়েই ভোলা আসিতেছিল বাজার কাছের। দরজার
কাছেই তাহার সহিত কাশালীচরণের মুখোমুখি দেখা।
তাহাকে দেখিমাঝে কাশালীচরণ বলিয়া উঠিলেন, ‘বলি
কি হে লম্বাখুস্তুর, খবর কাক-কণ্ড হইলো পড়ে’ আর
তুই বাটা দিয়াছেছিল কোথায়?’

সম্মুখাশ! ভোলা হস্ত’ মারিয়াই বসিবে। কথাটা
হঠতে সে বুঝিতে পারে নাই। বলিল, ‘কাকে বলছেন?’
‘বলছি তোমাকেই। বলছি—সকালে উঠে রোজ এই
পায়েজুটা হল চেপে পরিষ্কার করতে হবে।’

‘করেছি ত!’
‘সে ত’ একবার। নাম মন্তর এক বালুটি জল ঢেলে—

বাস, হয়ে গেল? তারপর—এই যে তোমাদের কে এক
বাঁহু এসে জুতো পায়ে দিয়ে খুলো-কাদার মছব করে’ দিয়ে
গেলেন। বলি—এগুলো পরিষ্কার করবে কে? আমি
করব?’

ভোলা বলিল, ‘না বাবু, আপনি কেন করবেন, আমিই
করব। কিন্তু যতবার লোকজন আসবে ততবাইই জল ঢেলে
ঢেলে পরিষ্কার করতে হবে নাকি?’

কাশালীচরণ বলিলেন, ‘আলুবাং করতে হবে। এতটুকু
দরলা আমার বাড়ীতে থাকতে পাবে না তা আমি এই বলে
রাখছি তোকে। থাকে যদি ত’ জুতো পেটা করে’ অংশবাং
দুই করে’ বেতো বাড়ী থেকে। নোংরা-টোংরা আমি
ভালবাসি। সে তোমার বাবু জানে।’

ভোলা বলিল, ‘আমি ত’ আপনার বাড়ীতে কাজ করি
বাবুনে, জুতো পেটা করে’ দূর করে’ গেলেন। যতবার
আসবেন ততবার জল ঢালতে আমি পারব না। ঢালতে
হয় আপনি নিজে চালুন।’

কথা শুনিয়া মনে হইল ভোলা সীতমত রাগিয়াছে।
রাগিবারই কথা। কথাটা বলিয়াই সম্ভবতঃ ‘সে
উপরে উঠিয়া আসিতেছিল, কাশালীচরণ চাঁৎকার
করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ‘কি বলি হে হায়াসলাখা পাজি

ছোটলোক কোথাকার! আমি নিজে জল ঢালব? বলি
ও মশাই,’ তখনহে আপনার চাকরের কথা? এমনও
বলছি—জল দিয়ে পরিষ্কার করব ত’ কর, নইলে—’

রাগে আর শেষ কথাটা মুখ দিয়া তাহার বাহির
হইল না।

‘পারব না।’ বলিয়া ভোলা উপরে উঠিয়া আসিল।
কাশালীচরণ সেইখান হইতেই চাঁৎকার করিতে
লাগিলেন, ‘বলি ও মশাই, চুপ করে’ রম্ভেছেন যে। শাল
ছোটলোক চাকর আমার অপমান করে’ গেল, আর আপনি
শুনছেন বসে বসে? নেবে আশ্রম মশাই, এর একটা
হেস্তবস্ত কর’ দিয়ে যান। বলি—ও মশাই, কই এখনও
যে এলেন না?’

মহা মুস্থিলে পড়িলাম। আগাগোড়া সবই শুনিয়াছি।
ভোলাকেও কিছু বলা চলে না, অথচ ভোলার দিক্ হইয়া
তাহাকে কিছু বলিলেও তিনি অপমান বোধ করিবেন।
ডাকাডাকির চোটে বাহির হইয়া আসিতে হইল। আমাকে
দেখিমাঝে তিনি বলিয়া উঠিলেন, ‘শুনলেন তু’ লম্বাখুস্তুর
আপনার চাকরের জবাব? ওকে তাড়িয়ে দিন মশাই,
ওকে তাড়িয়ে দিন, জুতো মেরে একুনি বিদেয় করে’ দিন
বাড়ী থেকে।’

নীচে তাহার কাছে নামিয়া গেলাম। বলিলাম, ‘ভাল
করে’ বললেই একবার কেন, দশবার জল ঢেলে পরিষ্কার
করে’ দিত। আপনি প্রথমই যে ওকে চটিয়ে দিলেন।’
‘বটে! চাকরেরও পায়ে তিত দিতে হবে? তবে
তখন মশাই, আমি তাহা সঁজা লোক। আমার
ভেতরটাও যেমন পরিষ্কার, বাইরেটাও তেমনি। নোংরা
আমি ভালবাসি।’

বেশি ঘটাঘাটা না করিয়া রাগটা ভোলাকে পরিষ্কার
করিয়া দিতে বলিলাম। এবং তাহাঁকে আরও বলিয়া দিলাম
যে, মাঝে মাঝে বাড়ীওয়ালা যদি কিছু কাজকর্ম করিতে
বলে ত’ সে যেন তাহা করিয়া দেয়।

বলিয়া কি বিপদ যে করিলাম তাহা পরে বুঝিয়াছি।
পরদিন সকাল হইতে ভোলা আর নিঃশাস ফেলিবার অবসর
পায় না। আমার সংসারের খাঁচাটা কাজকর্ম তাহাকে ত’

করিতেই হয়, তাহার উপর অতি প্রত্যুদে কাদালীচরণের
ডাক শোনা যায়—‘ভোলা !’

ভোলা তাঁহার কাছে গিয়া দাঁড়াইলে বলেন, 'ভল দিয়ে
দুয়েছিস্ হাতাটা ?'
ভোলা বলে, 'দুয়েছি ।'

ଜୋନା ସଜେ, 'ଧୁସ୍ରେଛି ।'

কাঞ্চালীচরণ বলেন, 'বেশ, বেশ, এমনি করে' কথা শুনে হু হু বাবা, কথা না শুনে ভাবি রাগ ধরে।—নে, ওই গড় গড়াটা বেশ করে' হয়ে মুছে নতুন করে' ওতে জল ধরে' নিয়ে যায়। এনে একবার তামাকটা খাইয়ে দে বাবা।'

গড়গড়ায় ভুল খরিয়্যাতানাক সজ্জি কলিকায় আগুন
 বিয়া ভোলা ভাবে এই জুইই হয়ত তিনি ডাকিয়াছিলেন,
 তাই সে চলিয়া আসিতে চায়, কিন্তু কাব্বালীচরণ অত সহজে
 ছাড়িবার পাত্র নহি। ডাকেন, 'চলে বাহিন্স কোথায় বাবা,
 দরটা দেখছিল না কিরকম নেংবা হয়ে আছে, দে বাবা
 ক'টাটা এনে একছাত পরিষ্কার করে'।

কিন্তু ঘর পরিষ্কার করিয়াও সে নিরুত্তি পায় না, কাশ্মালীচরণ বলেন, 'এইবার কুঞ্জায় জলটা ভরে' দে বাবা, মেয়েটা রাগ করছে, ওর হাত-জোড়া।'

কুণ্ডায় জল ধরিয়া দিয়াও নিস্তার নাই। কালি-পড়া
শঠিনতা ঘরের কোণ হইতে তুলিয়া আনিয়া কাশ্মালীচণ
বলেন, 'এ, এটা কি হয়েছে দেখেছি। ভোগানার
পল্‌চোটা উল্কে দিয়ে জার পাটা করে' 'ভায়নি মেয়েটা।
ইন্। কি হয়েছে বল দেখি! যে ত' বাবা কাঁচটা একবার
পরিকার করে'।

ভোলা কাঁচ পরিষ্কার করিয়া দিয়া 'আসি' বলিয়া একরকম লকাটয়াই সেখানে চইতে পলাইয়া আসে।

কালের সময় ভোলাকে আর পাওরা যায় না। যখনই ডাকি, বেশি, ভোলায় পরিবর্তে কাঞ্চালীচরণ জবাব দিতেছেন 'আরে থামুন না মশাই, সারা দিব্যারাত্রিই ত' সে আগনাগাজ্য করবে, আমি এই ঘরটা একবার পরিষ্কার করিয়ে নিচ্ছি, বাস—এই হয়ে গেলে বসে!'।

কিন্তু সেদিন এক ভারি নজর কাণ্ড বাটরা গেল।

কুঁজোর জল ধরিতে গিয়া—মাটির কুঁজো, তোলা ভাঙ্গিয়া
'ফেলিল। আর বায়ু কোথা! কাছালীচরণ বলিতে

লাগিলেন,—‘দিদি ত’ ভেঁষে! বাস! আমি আমি
হারামজাদা দেবে একদিন আমার সন্মানশ করে! নগদ
চোদ্দটি পয়সা দাম, ও-রকম ঝুঁজো আর পাওয়া বাবে না।
আজ বখন বাজার যাবি তখন অমনি দেখে একটা কিনে
‘আমিস’।

ভোলা ঝুঁজে কিনিয়া আমিল। কিন্তু কাদালীচরণ
 পয়সা আর দেন না। চকুলজ্জার মাথা খাইয়া ভোলা বলিল,
 'ঝুঁজার দামটা তাহ'লে—দশ পয়সা নিয়েছে।'

কাদালীচরণ তাঁহার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।
উপরের দিকে তাকাইয়া হাঁকিলেন, 'বলি ও নশাই,
শুনছেন ?'

বলিলান, 'কি বলছেন, বলুন!'

বলিলেন, 'এই বাটার মাইনে থেকে কুঞ্জের দান—
দশটা— পয়সা কেটে নেবেন ত! আমি এখন আর দান
দিলাম না, বুঝলেন? আপনার বাজারের পয়সা থেকেই
নিচ্ছে।'

কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম—‘কি
বলছেন ঠিক বুঝতে পারিলাম না।’

কাজলীচরণ ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন—‘আপনার এই চাকর বাটারেছেলো কাল আমার অমন সুন্দর চোদপয়স দানের কুঁজটা বিসেজে ফুটবে। আজ তার পরিবর্তে পয়সা দিয়ে একটা কিনে এনেছে। এনে আবার বাটার আমার কাছে পয়সা চায়! তাই বলছিবে, ওকে মাইনে বশন দেবেন তখন এই মশটা পয়সা কেটে নেবেন। আমি বুঝাই গোলাম ভালবাসিনে, তারি সাচ্চা বাহুৎ। বুঝছেন?’

বলিলাম, 'পেরেছি।' ডাকিলাম, 'ভোলা !'

ভোলা আমার কাছে আসিয়া পিড়াইল। বলিলাম
'গুর কাজ তোকে করতে বলে অন্তায় করেছিলাম ভোলা
কাল থেকে আর—'

ভোলা নগিল, 'আমি কবাজেই ত।'

ভোলা আর তাহার কাজ করে না। শুনিলাম সেদিন
তাঁহার ঘরের ওপর স্পষ্ট জবাব দিয়াছে, 'না মশাই, আপনি

কাদাচীলরণের সে রাগটা আসিয়া পড়িল আমার উপর।

[illegible]

আমি চুপ করিয়াই থাকিলাম। যত হুবিমাই হোক—
যে ঘরে আসি-বাতাসের প্রবেশ পথ নাই, ঢুকিলেই যেখানে
ভাঁপ সা গন্ধ পাওয়া যায়, সে-ঘরে রান্না করা আমাদের
পোষিষ্ট হবে না।

কিন্তু কান্দানীচরণ সেদিন কি যে ভাবিলেন কে জানে, অন্যায় হঠাৎ বলিয়া বসিলেন, 'দেখুন, ওপরে আপনারাও বসুন।' কথা আর চলবে না। নীচের এই ঘরটাকেই রাখিবে ছেলে।

কাঞ্চীচরণ বলিলেন, 'প্রথমে অট্ট। বুঝতে পারিনি
মশাই, তাই আপনাকে ওপরে রাঁদিবার 'পারমিশান' দিয়ে
দেলেছি। কিন্তু এখন দেখছি কয়লার গোয় আমার
ওপরের ঘরের রং-টং বোঝাই গেল।'

কম্প্রাণীভবন বলিঘা উঠিলেন, 'চূণ কি রকম মশাই,
ইদানিং রকম? ওতে শুধু চূণ নেই, আরও অনেক কিছু

কম্প্রাণীভবন বলিঘা উঠিলেন, 'চূণ কি রকম মশাই,
ইদানিং রকম? ওতে শুধু চূণ নেই, আরও অনেক কিছু

মেশান্তে হয়েছে, আমি নিজের হাতে নিশিগেছি মশাই, নিজে সাগিগেছি দেওয়ালে। দেওয়ালের দিকে খানিকক্ষণ একদুটো চেয়ে থাকবেন, দেখবেন—মনে হবে যেন আকাশের পানি চেয়ে আছেন। বাকু, কয়লার ধোঁয়ায় সে রং আমার নষ্ট হতে দেবেন না। আপনাতা এই নীচের ঘরে রাখিবেন কাশ থেকে।

বলিলাম, 'তা যদি হয়, তাহ'লে এ-বাড়ী আমার ছেড়ে দিতে হবে।' **কাদ্দালীচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ছেড়ে দিয়ে যাবেন কোথায়?'**

‘কলকাতা শব্দে বাড়ীর অর্থাৎ?’
 কাশানুচরণ বলিলেন, ‘বাড়ীর অর্থ নেই, কিন্তু
 এরকম বাড়ী আপনি পাবেন না তা ‘আমি হাঁক মেয়ে’ বলে
 বিবেচনা করি। তাছাড়া সম্ভবতঃ মশাই! ‘পরিচয় টাকা’
 বিচ্ছেদ ওপরের তিনখানা ঘরের জঙ্গে, ‘আর নীচের গুই
 ঘরখানার জঙ্গে যেখান পাটো টাকা, বাস—চলি টাকা।’
 চলি টাকাই এমন সুন্দর বাড়ী—‘ডাউন সিটি’

যাই হোক, আরও পাঁচ টাকা ভাড়া বাড়িয়া আমাদের
নীচের ওই অন্ধকার ঘরে রাত্রি করাইবার জন্য কান্দানীচরণ
হয়ত জীবন আবার হুর্পহ করিয়া তুলিতেন, কিন্তু সেদিন
রাতে হঠাৎ এক অঘটন ঘটয়া গেল।

রাতি তখন প্রায় একটা বাজিছে। আহাঙ্গারি পর
আদার শমন করিয়াছি : নিচে ইহতে কাশনারীদগণও
কেনও সাড়াশব্দ নাই। কেবোদিন তেল পুজিবার কয়ে
আলো তাহাদের বৈশিষ্ট্য জলে না। সন্ধার পরেই
আহাঙ্গারি শেব করিয়া তাহারা আলো নিবাইয়া দেয়।
সেদিন ঠিক সেই সময় কৃষ্ণা আমাদের দরজা, আসিয়া
ডাকিল, 'বোদি !'

বৌদি তাগের আগিয়াই শ্বিলি। তৎক্ষণাৎ মরজ
খসিয়া কুম্ভার কাছে গিয়া বেংমংদা লইয়া আসিল, স্ত্রিয়া
আমিও একটুখানি বিচলিত হইয়া উঠিলাম। কাদালীচরণের
বৃক ধড়ফড় করিতেছে, সর্ষাপে প্রচুর ঘাম হইতেছে, ভয়
পাইয়া কুম্ভা তাই আমাকে খবর দিতে আসিয়াছে। কুম্ভার
পিছু-পিছু নীচে নামিয়া গেলাম। দেখিলাম, সত্যই তাই

কাল্পানীচরণের গলায় আওয়াজ অত্যন্ত কীর্ণ। বলিলেন, 'আপনার কাছে হোমিওপ্যাথী ওষুধ আছে, না? দিন ত আমাকে একটুখানি। দেখি—সারে কি না?'

ঔষধ বিলাম। এমি তাহারই কলে সারিল কি না জানি না, সকলে দেখিলাম, বিয়া সহজ মাছের মত কাল্পানীচরণ খুঁটিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতেছেন, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেমন আছে? সেরে গেছে ত?'

কাল্পানীচরণ বলিলেন, 'কোথায় মশাই! হোমিওপ্যাথী ওষুধে আমার রোগ সারে! শুভন তবে। এই বাড়ীখানা এক ভরসোক ভাড়া চাইলেন, সস্তার টাকায়—ওপর নীচে সমস্ত ঘর। আমার স্ত্রী তখন বেচে। বিলাম বাড়ীখানা ভাড়ার দিলে, আর আমরা নিজেরা উঠে সেলাম এই কাছাকাছি একটা গলির মধ্যে একখানা বাড়ীতে। কলকাতার তখন যুগ কল্যাণ হচ্ছে। হঠাৎ একদিন রাত্রিরবেলা স্ত্রীর কল্যাণ হ'লো, খটখটানেক পরে আমার হলো আমার ছেলের। ছেলেটি ছিল কৃষ্ণার চেয়ে বছর-দুই-এর বড়। সকাল-বেলা একজন হোমিওপ্যাথী ডাক্তার ডাকলাম। এত এত ওষুধ দিলেন, এত চেষ্টা করলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুতেই কিছু হ'লো না—উল্টো-উল্টি খটখটানেকের মধ্যে দুজনই গেল মরে'। এই ত আপনার হোমিওপ্যাথী ওষুধ মশাই!'

কৃষ্ণা কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। এবার আর সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল, 'দশটাকা ভাড়া দিয়ে যে-রকম বাবো বাড়ীতে আমরা উঠি গিয়েছিলাম, সে-বাড়া থেকে আমরা দু'জনও যে ফিরে আসতে পেরেছি বাবা এই দখেই। আর তাছাড়া আমাদের বয়সদাবা আবার ডাক্তার! বই পড়ে' পড়ে' বাড়ীতেই ডাক্তারী শিখেছে। ওই অবতড় রোগীর ভার তুমি দিলে তারই হাতে কেলে। কেন বয়সী-দাবা ত? তোমাকে সস্তা ডাক্তার আনতে বসেছিল বাবা। তুমি বললে, টাকা কোথায় পাব। তা তুমি একটু চেষ্টা করলে, না আমার মরতো না!'

বলিতে বলিতে মেয়েটার ঠোঁট দুইট খু-খু করিয়া ঝুপিয়া উঠিল এবং চোখ-চুইটি হলে ভরিয়াল স্ত্রীতেই সে অঙ্গভঙ্গি মূখ ফিরাইল।

কাল্পানীচরণ-প্রত্যেক এক ধমক বিয়া উঠিলেন, 'বা গা, তুই কি জানিস! তুই চুপ কর! মুখ-বার-আছে হাতের বড় ডাক্তার, ডাকলেও তাকে—রক্ষা করা যায় না,—না কি বলেন মশাই!'

বিলায় তিনি আমার মুখের পানে তাকাইলেন। কোনও জবাব না দিয়াই আমি, আমার কাছে চলিয়া বাইতেছিলাম, কাল্পানীচরণ হাঁকিয়া বলিলেন, 'বলি ও মশাই, চলে যাচ্ছে যে? আমি বা বলেছিলাম তার কি হ'লো? হ্যাং, ভারি ত' পাচটা টাকা! পইত্রিশ-দিয়েছেন, না হয় বলেন চলিশ। নীচে রান্নার হুবিধে কত!'

বিলাম, 'আজ্ঞা এরপর ভেবে দেখব।'

'না না ভেবে দেখব নয়, ও করে' ফেলুন। টাকার কথা ভেবে আর পিছিয়ে যাবেন না। টাকা জিনিস—আপনারও যতক্ষণ আবার যেতেও ততক্ষণ। আমি ত' মশাই, নিজের মুখ-হুবিধের চেয়ে টাকা জিনিসটাকে বড় করে' কখনও দেখতে পারলাম না। এই দেখুন, আপনার মাঠে মাঠে পইত্রিশটি করে টাকা দিচ্ছেন; বাস, হাতে আসতে না আসতে দুই-কড়াই! টাকা জিনিসটে আমার হাতে কখনও রইলো না, ও ব্যাটার জাত কারও হাতেই থাকে না। বুলেন, নীচে রান্নার ব্যবস্থাটাই করে' ফেলুন!'

কৃষ্ণার বরষ হইয়াছে, সর্বস্বার্থে জাষ্কার পাত্রীর্ণ যৌনশ্রী। এইবার বিবাহ বেওয়া তাহার এলাজ প্রয়োজন। আমার স্ত্রীর সঙ্গে সেদিন সেই কথাই হইতেছিল। স্ত্রী

বলিল, 'ওর বাবাকে একদিন বোলো। মেয়েটাকে সত্যিই আর এমন করে' রাখা উচিত নয়।'

বলিব বলিব ভাবিতেছিলাম, এমন দিনে দেখিলাম, একজন ঘটক একদিন জন-দুই ভরসোককে ডাকিয়া আনিয়াছেন।

কাল্পানীচরণ ডাকিলেন, 'বলি ও মশাই, একবার নীচে নেমে আসতে ত!'

নীচে বাইতেই তিনি আমার একটুখানি আঙুলে ডাকিয়া লইয়া গিয়া চুপি-চুপি বলিলেন, 'বন-সন ঘে-রকম অসুখ

বিহ্বল হচ্ছে মশাই, কি-জানি বিশ্বাস নেই যদি কোনোদিন হট করে'...তাই ভাবছি, মেয়েটার বিয়েটা এইবার সেরে' ফেলি। দুজন ভরসোক এসেছেন তাকে দেখতে, আপনি একটুখানি আনুন, হ চারটে কথাবার্তা বলুন ওদের সঙ্গে, আর আমার অবস্থার কথাটাও অন্তর্নিহিত।'

বাক্য, এতদিন পরে স্মৃতি তাহার হইয়াছে। দেখিলাম, ধাওয়া আসিয়াছেন, তাহারদের মধ্যে একজন বরের কাকা আর একজন বাবা। ছেলেটি বি-এ পাশ করিয়া এম-এ পড়িতেছে, অবস্থা খুব বে ভালো তাঁ নয়, কলিকাতা শহরে একখানি বাড়ী আছে, তাছাড়া ছেলেটির দাদা নাকি ওকালতি পাশ করিয়া সম্প্রতি উকিল হইয়াছেন। পসার এখনও জমাতে পারেন নাই, তবে ভগবানের ইচ্ছায় রহিত্যন্তে যদি কোনোদিন জমে ত' তখন আর তাহাদের জামিতে হইবে না।

মম কি! ছেলেটি যদি দেখিতে অনিতে ভাল হয় ত' কৃষ্ণার বিবাহ এইখানেই দেওয়া উচিত।

কৃষ্ণাকে তাহার দিবেলেন। দেখিয়া অশঙ্কন করিবার কিছুই নাই। চমৎকার মেয়ে!

কিন্তু গোলামাল বাবিল টাকার ব্যাপারে। বরের বাবা বলেন, 'মেয়ে আমার খুব পছন্দ হয়েছে, ছেলের সঙ্গে মানিয়ে ও ভাল, কিন্তু ছেলের বিয়ে—বাড়ী থেকে টাকা খরচ করে' ত' আর দিতে পারি না মশাই। নয়দ টাকা আপনাকে কিছু দিতে হবে বই-কি!'

কাল্পানীচরণ আমার মুখের পানে নিতান্ত অসহায়ের মত একবার তাকাইলেন—তাকাইবার অর্থাৎ বৃত্তিতে মিল হইল না। বলিলাম, 'কত-টাকা চান?'

বরদ্বী বলিলেন, 'অয়ের মার' যা পসার আছে শুনছি তাই দিলেই না-হয় পরমাটা আর গাণ্ডবে না, কিন্তু টাকা—তা অসম্ভব শ-পাচেক দিতে হবে নয়দ। তার কমে মশাই ছেলের বিয়ে দিতে আমি পারব না।'

কাল্পানীচরণ রান একটুখানি হাসিলেন। বলিলেন, 'সে কখনো কি আমার আছে দাণ? বড় জোর শ'খানেক টাকা আমি ধার-ধোর করে' যেখান থেকে হোক—ওয়ের

দায় বখন বাড়ের ওপর, এই আপনার দুই হাতে ধরে বলাছি ভাই আমার উদ্ধার করুন।'

কিন্তু কাল্পানীচরণ দুই হাত বাড়াইয়া বরকর্তার হাত দুইট বাগিয়া ধরিলেন।

বরকর্তা লোকটি ভাল। কাল্পানীচরণের অস্থায় দেখিয়া তাহার মন্য হল। কিংবদন্ত চুপ করিয়া কি যেন ভাবিয়া বলিলেন, 'আজ্ঞা, আপনি এত করে' বলছেন বখন, তখন তিন শ' টাকা দেবেন। বো ভাতে আমি নিজেও না-হয় কিছু খরচ করব।'

মাত্র তিনশ' টাকা খরচ করিয়া কাল্পানীচরণ যদি তাহার মেয়ের জন্য এমন বর পান ত' মন্দ কি! বলিলাম, 'আজ্ঞা বেশ, কবে আমরা ছেলেটি তাহ'লে দেখতে যাব বলুন!'

ছেলের বাবা বর্ণি:সন, 'যেদিন বুলি। এই ত' ভাণীপুরে বাড়ী—বেশ দূর ত' নয়।'

স্থির হইল, আগামী রবিবার কাল্পানীচরণকে সঙ্গে লইয়া আমি নিজেই ছেলেটিকে দেখিয়া আসিব।

কৃষ্ণাকে বলিলাম, 'কিরে! মুখখানি অমন শুকনো করে' পাড়িয়ে রয়েছি কেন বিদি, তোর বর দেখতে যাব। বিয়ে-থা হ'লে আমাদের ভুলে যাবেন ত!'

কৃষ্ণা তাহার সেই চোখ দুইটি তুলিয়া সেই তেমনি করিয়াই একবার হাসিল। বড় স্বন্দর সে হাসি! অত্যন্ত করুণ, জীবৎ একবার সে হাসি যে দেখিয়াছে সে আর তাহাকে জীবন্তে ডুলিবে না।

রবিবার বৈকালে ভবানীপুরে বাইবার কথা। কিন্তু সকালে কাল্পানীচরণ আমার কাছে ডাকিয়া চুপি-চুপি বলিলেন, 'বাক্য, আর সেখানে যেতে কাজ নেই মশাই!'

বলিলাম, 'কেন?'

কাল্পানীচরণ বলিলেন, 'না। তিনশ' টাকা নয়দ দেওয়া আমার দ্বারা সম্ভব হবে না মশাই। কোথায় পাব? বড় জোর একশ', নাহয় দেড়শ' পর্যন্ত দিতে পারি।'

আমার নিজের টাকা থাকিলে হইত! তখন নিজের দিতাম, কিন্তু সেদিক দিয়া হুড়গ্যা আমারও কন নয়। বড় দুখ হইল। বলিলাম, 'তাহ'লে আর কি হবে বলুন! কিন্তু

মেয়েও ত' বড় হয়েছে, বিয়েরও ত' একটা চেষ্টা করা দরকার।'

কাদানীচরণ বলিলেন, 'দেখি।'

তাহার পর দশ পনেরো দিনের মধ্যে ঘটক-ঠাহর বোধ হয় আরও পাঁচজন বরকর্তাকে আনিয়া হাজির করিল। কিন্তু সকলেরই সেই এক প্রস্তাব। টাকা! এদিকে কাদানীচরণেরও সেই এক কথা।—একশ' কি বড়ছোর সেজন' দাদা, তার বেশি আমি পাব কোথায়.....গরীব মানুষ.....ইত্যাদি।

চোরা হয়ত সেজন' টাকা অতি কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছে। তাহাকেই বা দেখি দি-ই কেনন করিয়া।

শেষে কোথাও বখন কিছুই আর হয়না, কাদানীচরণ নিজেই একদিন সন্ধ্যার সময় হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিয়া ডাকিলেন, 'ওমশাই, শুভ্রন, শুভ্রন! হুসংবার!'

কি হুসংবার জানিবার ভক্ত নীচে আসিয়াই তুলিমান এতদিন পরে কুম্ভার বিবাহের সমস্ত বন্দোবস্ত তিনি নিজেই স্থির করিয়া আসিয়াছেন। বলিলেন, 'আরে মশাই, প্রচুর হারা কি কোনো কাৰ্য কখনও হয়? ওকি ঘটকের কল!'।

এই বলিয়া কিংকর্ণ গাথিয়া তিনি আবার বলিলেন, 'চলুন একদিন—'

বলিয়াই কি ভাবিয়া কথাটা পাল্টাইয়া লইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—'বড় লোকের ছেলের বাই দৌবার সাধি কি আমার মেয়ে মশাই, আমরা নিজেরা যেমন তেমনি নাকামাথি ঘরে ঘরের বিয়ে দেওয়াই ভাল—আপনি কি বলেন? বা কখনে হুগুগু! এত মাগেই সেয়ে ফেলি। শুভ্রত শ্রীং।'

বলিমান, 'চলুন তাহা'লে একদিন গ্রেবে আসি।' কাদানীচরণ বলিলেন, 'কিছু দেখতে হবে না মশাই। কিছু দেখতে হবে না। অত্যা' ভাল কি না তাই লোকে দেখতে যায়, কিন্তু এ একেবারে জানা কথা। অবস্থা ভাল

না।' বাইনের ইঙ্গুরের পণ্ডিত, কোনো রকমে দিন চলোঁ বাবে—বাম্!। মেয়েটা খেতে পরতে পারে। আর কি চাই? ইহার উপর আর কথা চলোঁ না।' নিজের কুম্ভার বিবাহ

নিজে স্থির করিয়াছেন, ভাল মন্দ তিনিই বুঝিবেন। এই বাড়ীতেই বিবাহ, অথচ এখানে ভাণ্ডার একান্ত অভাব। সে-সময়ে কি করিতে হইবে জিজ্ঞাস্য করায় কাদানীচরণ বলিলেন, 'কি আর করব? কিছুই করব না।'

বলিমান, 'বরখা'য়ের খাবার ভাণ্ডার তা' একটা করতে হবে। ছোবর ওপর হোথুগা দিয়ে—সবাই যেমন করে—' কাদানীচরণ দ্বং হাসিলেন। বলিলেন, 'পাগল হয়েছে? সে কি আর আমি টিকনা করেই এসেছি। বরখা' আসবের চার জন। হোথুগা কি ভক্ত? বেশি বরখা'জী খেতে দেবার অবস্থা কোথায়? আপনার ওপরের একখানা বর ছেড়ে দেবেন, বাবা—তাহা'লেই হবে।'

একখানা কেন, কুম্ভার বিবাহের ভক্ত আমি কয়েক দিনের ভক্ত এ বাড়ী ছাড়িয়া যেখানে হোক চলিয়া যাইতেও রাজি। কিন্তু কিছুই করিতে হইল না। বরপক্ষ মেয়েও দেখিতে আসিলেন না, কল্গপক্ষ বর দেখিতেও গেলেন না। বিবাহের আগের দিন কুম্ভার গায়ে-হলুদের সমস্ত ব্যবস্থা আমার স্ত্রীই করিয়া গিল।

পরদিন সন্ধ্যা বর আসিল—বরের সঙ্গে মাত্র চারজন বরখা'। বর দেখিয়া প্রথমে তাহাকে কুম্ভার বর বলিয়া চিনিতে পারি নাই, ভাবিয়াছিলাম—সেও একজন বরখা'জীই হইবে-বা। কিন্তু শেষে যখন তাহার দ্রুতি-চারণ এবং কপালে চকনের ফোটা দেখিলাম, তখন একেবারে অবাক হইয়া গেলাম। এই কুম্ভার বর! গায়ের বং কালো, চকু দুইটি কোটর-প্রবর্তি, দীর্ঘ কল্গলাসার, বরদ বোধকরি কাদানীচরণের চেয়ে দু'চার বছরের বড়ো-।

আমার দ্বী-ছি-ছি করিতে লাগিল। আমি তা' কুম্ভার মুখের পানে তাকাইতে পারিলাম না। শুধু বিম্বিকার রহিলেন দেখিলাম—কাদানীচরণ।

কাদানীচরণকে একবার আড়ালে, পাইয়া চুপি-চুপি বলিমান, 'একি কল্গলে আপনি—ছিং—' কাদানীচরণ আমার মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন,

'কেন? কি আর এমন হয়েছে তুনি? অত্যা' বকল, আমায়, স্ত্রী-বিবাহে হয়েছে, আমিই যদি বিবাহ করতাম, তাহ'লে—' পুঙ্খ মাহুযক! আমার বরেন, পুঙ্খ মাহুযের আবার চেহারা! মুখ বুদ্ধিগা সেখান হইছে সরিয়া গেলার। এখন আর ভাণ্ডার করিয়াই বা লাভ কি।

বাই হোক নিজেই বিবাহ চুকিয়া গেল। কুম্ভার অদৃষ্ট। আট-বর জন লোকের আহারের ব্যবস্থা আমার স্ত্রী নিজেই করিয়াছিলেন। বরখা'জী কয়েক জনকে খাইতে বসাইয়া আমি পরিবেশ করিতেছি, কাদানীচরণের উপবাসী শরীর, দূরে পাড়াইয়া তিনি তাহারের বাগা দেখিতেছেন। খাওয়া বখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, ঘরের ভিতর সন্দেহ আনিতে গিয়া দেখি—সন্দেহ নাই। সন্দেহ অন্যাইবার কথা কাদানীচরণকে সন্ধ্যার পুঙ্খই বলা হইয়াছে, জিজ্ঞাস্য করিলাম, 'সন্দেহ কি এখনও অনানে ঘনি?'

কাদানীচরণ খাড়া দাড়িয়া বলিলেন, 'না।' 'সে কি মশাই? ভোলাকে দিয়ে একুনি আনাতে পাঠান।' কাদানীচরণ কৌতুহ হইতে অতি কষ্টে একটা টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

পাণ্ডাটো বরখা'জীদের দুটী এড়াল না। তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন, 'একশ' টাকা তা' নাদা নিয়েছেন মশাই, তাও মিটি আনতে ভুলে গেলেন। আমরা লোক তা' মোটে চারজন।'

আর একজন বলিয়া উঠিলেন, 'একশ' কি রকম, শেষ পক্ষা' দেওয়া টাকার বরখা' হ'লো-যে! সেদিন একশ' এনেছেন, আর আজ দিতে হবে পঞ্চাশ।'

একশ' যেন কোনদিন হইতে পারে তাহা জানিমান না। কথটা শুনিয়া একেবারে শুভিত হইয়া গেলাম। টাকা দিয়া কল্গকে ওই বুড়ার হাতে বিক্রি করা হইয়াছে! কাদানীচরণের সঙ্গে ইহার চেয়ে দু'খালো আর কি হইতে পারে!

বিবাহের সময় দেখিলাম, কুম্ভার মুখে যেন আর রক্ত নাই; হির, দীর, নিকিয়ার—রাহা বলিতেছে—তাহাই করিতেছে; যেন কোথাও কিছুই হয় নাই এমন ভাব।

পরদিন স্বামীর সঙ্গে সে খুশুর-বাড়ী চলিয়া গেল। খুশুর-বাড়ী বাইবার সময় মেয়েরা কাগাকা' কর, এতদিনের প্রিয় পিতামহ ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট হয়, কিন্তু কল্গকে দেখিলাম, সেখানে তাহার একটোটা জলও আসিলা না, কেনন যেন কোকার মত ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া একবার তাহার খাবার মুখের পানে তাকাইয়া—হেঁটবুখে গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

গাড়ী ছাড়িয়া গিল। আমার স্ত্রী বাসাব্দার রেলিং দেখিয়া তাহার চশমা বাওয়া দেখিতেছিল, উপরে উঠিয়া গিয়া বেশিলাম, জানালায় কাছে পাড়াইয়া সে তাহার চোবের জল মুছিতেছে। আমাকে কেনও কথা জিজ্ঞাস্য করা সে প্রয়োজন বোধ করিল না। আমি ঘরে ঢুকিতেই সে ঘিরে-ঘিরে বাহির হইয়া গেল। সমস্ত বাড়ীখানা—কেনন, যেন একটা বিঘর গাঠা'য়ে খু-খু করিতে লাগিল।

কল্গা চলিয়া বাইবার পর হইতে কাদানীচরণ আমার এখানেই বাইতেছিলেন। প্রস্তাব করিয়াছিলেন, নিজেই রান্না করিয়া খাইবেন, কিন্তু আমিই তাহাকে বাধা দিলাম। তা'বিশাম, এখন তা' আর কল্গার বর নাই, মসের শেষে বাড়ীর ভাড়া হইতে কিছু টাকা ইহার ভক্ত কাটিয়া লইলই চলিল।

কিন্তু সোমের যেনো ভাড়া দিতে গিয়া একেবারে বেত্ব বনিয়া গেলাম। টাকা তা' তিনি পাওয়ার ভক্ত দিলেনই না, উল্টা জিজ্ঞাস্য করিয়া বলিলেন, 'এসার তা' হাল্কা মেয়েছে মশাই, এবার আমার সেই কথটা—'

কথটা'র অর্থ বুঝিতে পারি নাই। জিজ্ঞাস্য করিলাম, 'কি কথা?'

তিনি বলিলেন, 'মনে নাই? আপনাদের সেই নীচে রাধার কথা!'

বলিমান, 'সে তা' বলেই দিয়েছি—নীচে রান্না করা আমার হবে না।'

কাদানীচরণ বলিলেন, 'আপনি কিন্তু ভাল বুঝেন না মশাই। পাটো টাকার ভক্তে এরকম রূপগতা করা যেন না। এতে আপনাদর স্ত্রীর কষ্ট হচ্ছে—আমি বুঝিতে পারছি যে।'

কাদানীচরণ আমার স্ত্রীর এত কষ্ট বুঝিলেন কিন্তু তাহার

কষ্ট আমার স্ত্রী কিছুতেই বুলিল না। বলিল, 'না না তাকে ভাত রেখে খাওয়াতে আমি পারব না।' এতদিন তিনি, কিন্তু যেদিন থেকে তুমি বলেছ, 'দেখ' চাক নিয়ে ইচ্ছার মত মেয়েকে ও ওই বুকের হাতে তুলে দিয়েছে সেদিন থেকে ওর ওপর ভক্তি আমার চটে গেছে।' লোকটা চামারের একশব্দ।

সুতরাং কাশ্মীরীচরণকে আত্মকাল নিজেই রাখা করিয়া বাইতে হয়। ঠোঁট আলিয়া কি যে রাখা করেন তিনিই জানেন। সাবান দিয়া ধুপ-ধুপ করিয়া কাপড় কানেক, ইতরিকি করেন, ঘর ঝুঁটি বেন এবং প্রতিদিন বৈকালে নিজের হাতে কাচা, জামা-কাপড় পরিয়া একটি ছড়ি হাতে কইরা বেড়াইতে বাহির হন। সে-সময় আমার সঙ্গে যদি কোনোদিন বৈরাগ্য দেখা হইয়া যায় ত' নিজে কাপড়-জামা বোখায়া বলেন, 'দেখুন মহাশয়, আমার নিজের হাতে কাচা, আর ওই ত' আপনার গায়ে রয়েছে খোপা-বাড়ীর কাচা, — কত তফাৎ দেখুন।' আমি বা কেচে ধেয়ে, পেরকম কাচতে খোপার বাবাও গারবে না।

কাশ্মীরীচরণ ওই আনন্দেই থাকেন। কক্ষার কথা কোনোদিন এতটাকে ভুলিয়াও বলিতে শুনি না।

আমরা যামী-শ্রীতে বরং নায়েক-নায়েক বলাবলি করি— 'আহা মেয়েটির আচ্ছা অদৃষ্ট বা-খোঁহ। এমন অনেক গরীবের মেয়েরও ত' দেখছি যারা মনের মত যামী পায়।' কিন্তু এ মেয়েটির কি হাতের বস ঘেঁষি? 'শুভরাত্রী ত' ভবানীপুরে, বুড়ার কাছে ঠিকানা নিয়ে চল না একদিন কালীঘাট যাবার নাম করে' কক্ষাকে দেখে আসি।

বাইতে ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু যাওয়া কোনোদিন হইয়া ওঠেনা।

বিবাহের পর সেই যে কক্ষা এখন হইতে যামীর ঘর করিতে গিয়াছে, তাহার পর আজ এরা পাঁচ ছ'সাল হইতে চলিল, একটি দিনের জন্তও সে আর এখানে আসে নাই। বুড়া যামী বাইরে ইঙ্গুলে পড়িত। সকালে পাইয়া তাঁহাকে ইঙ্গুলে বাইরে হঠ, কক্ষা ভাত রাখে, যামীকে

খাওয়াইয়া ফুল পাঠাইয়া দেয়, তাহার পর সাতানিন হয় ত' একলা ঘরে বসিয়া বসিয়া কাঁদে। পতিতমশাই-এর প্রথম-পক্ষের স্ত্রীর একটি মেয়ে আছে শুনিয়াছি। 'মেয়েটি বয়সে কক্ষার চেয়েও বড়। তাহার ছ'দিনট কেলেমেয়ে।' সেই হয়ত' বাণের জর রান্না-বাগ্না সবই করিয়া দিত, আত্মকাল হয় ত' সং-মার হাতে সমস্যারের বাবসীর কাজকর্ম ছাড়িয়া দিয়াছে। হয়ত' সে সুযোগ-সুবিধা পাইলেই কক্ষার সঙ্গে যগড়া করে। কক্ষার হয়ত' জন্ম-কঠোর আর অবিদ্যে নাই।

মনে-মনেই এই সব কথা ভাবি আর সেই নিরীহ শান্ত মেয়েটির কথা মনে পড়ে। কাশ্মীরীচরণের মেয়ে বলিয়া তাহাকে মনে হয় না। মনে হয় সে যেন আমার নিজের বোন। নিতান্ত অনায়াসে অপরিতা ওই মেয়েটির জন্ত কষ্ট হয়।

অদৃষ্ট তাহার মন তাহা জানি' কিন্তু এত মন্দ দেখকা কোনোদিন ভাবিতেও পারি নাই। বুড়া যামী যে তাহার বৈদিনি বাঁচিয়ে না, ইচ্ছার বিবাহ হওয়া না হওয়া দুই-ই সমান হইয়া যাইবে, সে আশঙ্কা যে মনে-মনে করিতাম না তাহা নয়, তবে হঠাৎ যে এমন একটি অশ্রুত ঘটন' তাহা ছিল আমাদের ধারণার অতীত।

সেদিন বৈকালে ভবানীপুর হইতে একটি ছোকরা একরকম ছুটিতে ছুটিতে কাশ্মীরীচরণের কাছে আসিয়া উপস্থিত। কাশ্মীরীচরণ গড়গড়ান তনাক টানিতেছিলেন তার আশি দেওয়া যেন বাহির হইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়াই দরজা আমি পাড়াইয়াছিলাম।

ছোকরটি বলিল, 'শিগ' গির আছেন।' 'যাওয়ার কি জানিবার জ্ঞান' তাহার কাছে 'আমি' পাড়াইয়াছি। বাঘা শুনিয়াসে তাহাতে আমার আশাদ-মন্তক শিহরিয়া উঠিল, বৃক্কের ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল। শুনিলাম, ইঙ্গুলের ছুটির পর কক্ষার যামী বাড়ী ফিরিতেছিলেন, রাত্তা পার হইতে গিয়া হঠাৎ একটা-মেটির চাপা পড়িয়াছিল। বাঁচেন কিনা সম্ভেহ।

পা ছুটিা তখন আমার ঘর খুঁ কক্ষা কাঁপিতেছে। কাশ্মীরীচরণের হাত হইতে গড়গড়ান কল-মাটিতে পড়িয়া গেছে। 'বলিলাম, 'চলুন।'

কাশ্মীরীচরণও কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া পাড়াইলেন। 'কোথায় আছেন?' 'ছেলেটি বলিল; 'হাসপাতালে।'

হাসপাতালে এখন আমরা যিগা পৌছিলাম তখন সব শেষ হইয়া গেছে। আশাদমন্তক কাঁচা হক্কো ছোপানো একটা কাপড় দিয়া ঢাকা কক্ষার যামীর মৃতদেহ। পাশেই একটি মেয়ে মাথার চুল পুলিয়া, বৃক্ক চাপুড়াইয়া, মাথা ঝুঁকিয়া চাঁৎকার করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া লোক জড়ো করিয়াছে। এইটাই বোধ হয় পতিত-মশাই-এর ও-পক্ষের মেয়ে। আর সেই অন্তঃশ্রী লোকের মাথখানে যামীর মৃতদেহের পার্শ্বে একবারে কাঁঠ হইয়া, নতনেজে বসিয়া আছে আমাদের কক্ষা। বৃক্ক কাঁচা, কাঁচা ছুটি শুষ্ক কানায়-কানায় জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। আমাদের পানে একবার মুখ তুলিয়া তাকাইয়াই তৎক্ষণাৎ সে আবার চোখ ছুটি নাশাইয়া গেল। দেখিলাম, টুং টুং করিয়া অক্ষর খোঁটা তাহার কাপড়ের উপর গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

মৃতদেহের সংস্কার করিয়া কক্ষাকে বিধবার বেশ পরাইয়া, মাগার কিরিলাম পগনিম সকালে। কাশ্মীরীচরণ প্রত্যহ আনানো করিতে লাগিলেন। কক্ষার যামীর শ্রদ্ধাভি চুচ্চিকা গেল। ভাবিয়াছিলাম, কক্ষা এইবার হঠাৎ আবার তাহার বাবার কাছেই 'আমি' বাস করিবে, আবার সেই আগেকার মত সুখে-জুখে দিন জাভারের চলিয়া যাইবে। কিন্তু সেদিন আমি কাশ্মীরীচরণের সঙ্গেই ছিলাম; কাশ্মীরীচরণ বলিলেন, 'লু' কক্ষা, তোকে আমি সঙ্গে করাই নিয়ে যাই।' 'তিনিলাম, 'প্পর' কক্ষাকো যাও নাড়িয়া কক্ষা জবাব দিল, 'না।' 'যাবি না?' 'না।'

কাশ্মীরীচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তাহ'লে কি এটাই মনেই থাকিবে তে'বোহি?' 'কক্ষা বলিল, 'হাঁ।'—এটাই মনেই থাকবে।

এই বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি মুখ কিরাইয়া সেপান হইতে চলিয়া গেল।

কাশ্মীরীচরণ নিতান্ত নিরুপায়ের মত আমার দিকে একবার তাকাইলেন। অর্থাৎ—আপনি একবার অগ্ররোধ করুন মহাশয়।

কিন্তু কক্ষার মুখের পানে তখন আমার আর তাকাইবার ক্ষমতা নাই। মেয়েটা যদি-বাগ করিয়াই কাশ্মীরীচরণের সমস্ত সংবেদ পরিচাল্য করিয়া থাকে ত' তাহাকেই-বা কি বলিবার আছে। তাহার বাহা ইচ্ছা তাহাই সে করুক।

আমি সরিয়া পাড়াইলাম। বাড়ী ফিরিবার সময় সারা রাত্তা ধরিয়া কাশ্মীরীচরণ একটু কথাও বলিল না। যে কাশ্মীরীচরণ এত বেশি কথা কক্ষা, তাহাকেই দেখিলাম, নীরবে মুখ-বুজিয়া কি যেন ভাবিতেছে। নিজের কৃতকর্মের জন্ত এতদিন পরে এ-শোচনা জাগিয়াছে কিনা তাই-বা কে বলিতে পারে।

আমার স্ত্রীর সঙ্গে সেদিন কথা হইতেছিল।—'কক্ষা বোধহয় রাগ করে' এলো না। তুমি কি বল?'

স্ত্রী বলিল, 'বেশ করেছে। আমার যদি ও-রকম বাবা হতো ত' আমি তার মূখ দেখতাম না।'

আমি বলিলাম, 'আহা বাবার কি দোষ! সেও ত' গরীব। পরগা-কড়ি থাকলে হয়ত' মেয়েটাকে সে এমন কঠোর ভাবে দিত না।'

স্ত্রী চুপ করিয়া রহিল। 'কি ভাবছ?' 'ভাবছি, বিয়ে ওর না দিলেই হতো।'

'তাই বা কেমন করে' হয় বল। মেয়ে ত' বড় হয়েছিল।'

'হ'লই বা!—একেও কি তুমি বিয়ে বল নাকি? বিয়ের নামে এ-ত' অন্তাচার। এ অন্তাচারের চেয়ে মেয়েটাকে আইবুড়া করে' রাখাও ঢের ভাল ছিল।'

বিস্ময়াই সে আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আর কোনোদিন কোনো কথাই তাহাকে বলি নাই।

কুম্ভার কথা উঠিলে আমার স্বীতা তাহা শুনিতো চায় না। বলে, 'চুপ কর।'

চুপ করিয়াছিলাম। ঘরে-দ্বারে ঘরে ঢুকিতাম, আমার প্রবেশন হইলে নিশ্চয় ব্যর্থ হইয়া বাইতাম। কাশানীচরণ কি করিতেছেন না করিতেছেন কেনিও সংবাদই লইতে পারি নাই।

সেদিন অমনি বাড়ী হইতে বাহির হইতেছি, কাশানীচরণের ঘরের দ্বারের কিস্তর কেনন বেন দিখী একটা গোজানির শব্দ পাইলাম। তাকাইতে দেখি—বিছানার ওপর ভুইয়া-ভুইয়া তিনি ছট্‌ছট করিতেছেন।

যত্নে চুপিয়া তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই তিনি আমার মুখের পানে কেনন বেন বিচারগত যোগীর মত একবার তাকাইলেন। তারপর ভক্তিতে হাতের ইশারা করিয়া বলিলেন, 'বহন!'

বিছানার একপাশেই বসিলাম। 'কি জাঙ্গা করিলান, কি হচ্ছে?'

'স—র—'

'কখন থেকে?'

'আজ তিন দিন।'

বেশিলাম, এ অবস্থার প্রকাশী এরকমভাবে তাহাকে ফেলিয়া রাখা অস্বাভাবিক। সেবা-সুস্বাসের প্রয়োজন। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কুম্ভারকে নিয়ে আসিবে?'

কাশানীচরণ ফাল্‌ফাল করিয়া আমার আমার মুখের পানে তাকাইলেন। বেশিলাম, ঠোঁট ভুইট তাহার গর্ভে-গর্ভে করিয়া ধাপিগতছে। অনেককণ পরে বলিলেন, 'আসবে?'

বলিলাম, 'বেশি চেষ্টা করে, যদি আসে!'

আর কিছু তিনি বলিতে পারিলেন না। চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া কি বেন ভাবিতে লাগিলেন।

দ্বারের উত্তাপ দেখিলাম, 'অতঃপর বেশি।' চোখ ভুইট দিল। ডাক্তার ডাকিবার প্রয়োজন ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ একজন ডাক্তার ডাকিয়া আনিলাম।

ডাক্তার দেখিয়াই কাশানীচরণ আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'ডাক্তার?—কি জন্মে ডাকিলেন বহন ত?—আমার

কি আর ডাক্তার দেখিবার পরমা আছে?—আজ্ঞা বিন আপনি, তারপর ঘরে উঠে না হয় ভাড়া খেঁকে বার দিয়ে দেখো।'

ডাক্তারের ওষধ চলিতে লাগিল।

বৈকালে নিজে গিয়া কুম্ভারকে লইয়া আসিলাম। 'আসিতে কেনিপ্রকার আশঙ্কি করিল না।'

সেই কুম্ভার আমার আসিয়াছে। আমার স্বীকে সাবধান করিয়া দিলাম, 'বিবাহ-সংস্কার কোনও কথা ওকে জিজ্ঞাসা করো না।'

'কেন?'

'হয়ত চমক পেতে পারে।'

গুপ্তি বলিল, 'না বললেও যে আমার নিজে বলবে।'

'তা বৃদ্ধ।'

তিনি কিছু বলে নাই।

বলিবার অবসরই বা কোথায়? শিতার শিরের বসিয়া দিবারাজি তাহার শুভ্রা করিতেছে। শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, সেবারতা কুম্ভার সে কী জগৎ! কি নাশুণা। মুখে একটি কথা বলো না, এতটুকু বিরক্ত প্রকাশ করে না, আমার নিভা ত' এরকম পরিতাপ করিয়াছে বলিলেই হয়।

আমার স্বী সেদিন তাহার সেই শুভ্রা কক্ষ চেঁচায়া দেখিয়া বলিল, 'ও কি করহিমু কুম্ভার, মরে' বাবি যে?'

কুম্ভার তাহার ঠোঁটের ফাঁকে ম্যান একটুখানি হাসিল।

হৃদয়ন্ত হস্তী মুক্তার মত দাঁড়গুনি দেখা গেল। 'যদি নাড়িয়া বলিল, 'না, মরব না হৌকি—যে মুগ্ধ আমার দেহী।'

শব্দের কথাটি বলিতে গিয়া দেখা গেল, তাহার গর্ভে ভুইট অশ্রুভরে টলমল করিতেছে।

কিন্তু এত যে সেবা, এত যে যত্ন, তবু সে তাহার গিলাকে রক্ষা করিতে পারিল না। চারিদিকের দিন-কালানীচরণের বান্ধবক হইয়া গেল। শব্দন্ত রাত্রি দ্বিতীয় কথা বলিবার ঠিক-সে কী তাহার ব্যাধুশক্তি। বিদগ্ধ-বলা

কুম্ভারকে সে কি যেন বলিয়া বাইতে চায়। 'কিন্তু কথা-কথা'র মুখ দিয়া রাহির হইতে চায় না। বিধাতা যেন যত্নে তাহার কৃত্যেরা করিয়া ধরিয়াছেন। প্রকৃতি

এতদিন পরে হয়ত, তাহার এই বিরোধী সন্ধানের উপর প্রতিশোধ লইতেছে। কিন্তু আর কেন?—

কাশানীচরণের দিকে বৈদগ্ধ্য তাকাইয়া থাকিতে পারিলাম না, ছট্‌ছটা দেখান হইতে পলায়ন করিলাম।

মুভার যে এত কষ্ট তাহা 'আনিলাম না। কাশানীচরণ যত্নে কানোবিন চায় নাই, কীবনকে সে বড় বেশি ভালবাসিয়াছিল, তাই আজ তাহার এই ক্ষুদ্র গৃহ, নির-হাত-গড়া গৃহের প্রত্যেকটি অঙ্গাব্যবস্থা, তাহার এই সমস্ত

শক্তি কিম্বৎ অর্থ, আকিঞ্চকর সম্পদ, সবই যেন আজ তাহার বিদায়ের বাহা-পথে ছ'হাত বাড়িয়া আঙুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ তাহাকে বাইতেই হইবে।

সমস্ত বিদ্যারূপি প্রাণপণে বুঝিয়া শেষ কীবনীশক্তিটুকুও যেন তাহার নিশ্চেষ্টে ফুরাইয়া গেল—রাহি তখন প্রকৃত হইয়া আসিয়াছে।

কুম্ভার ঘরে ঘরে আমার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহের মুখ দেখিয়া বুলিলাম সব শেষ হইয়া গেছে। কিন্তু এই অতটুকু মেয়ে কুম্ভার দ্বারাও কেন এমন করিয়া চাপিয়া ধরিবার শক্তি পাইল কোথায়? কাদিল না, অধীর হইয়া হুটু করিল না,—নিরব নিষ্কিয়ার কুম্ভার যেন পাখ-মুখের বহু গৃহের মরিয়া দাঁড়াইয়া বহিল।

কাশানীচরণের মরিবার বয়স হইয়াছিল। সে-কষ্ট চুপ করিবার কিছুই নাই।

দৈন্যনি পূরে কলঙ্ক শ্রদ্ধ করিতে হয়। বৎসামাত্র মায়াজন করা প্রয়োজন। কুম্ভারকে ডাকিয়া বলিলাম, 'কলঙ্কতক রক্ষণ ডেকে এনে শ্রদ্ধাটি চুকিয়ে ফেলি না, বিশুদ্ধ কুম্ভার?'

কুম্ভার নীরবে ঘাড় নাড়িল।

বলিলাম, 'তাকাও কি ব্যর্থ হয় আমিই দিচ্ছি, ভাড়া-ক'কে কেউ নেবে, তুমি ভেব না।'

কুম্ভার হাসিল। তাহার সেই নীরব হাসি। এত গৃহের দিনেও যত্নে তাহার হাসি দেখিবার অবকাশ হইয়া গেলো।

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গেছে।

নীচে মনের ঘরে আমার স্বী কাপড় কাচিতেছিল, হঠাৎ কুম্ভারকে সে তাকাও ডিগেরে উঠিয়া আসিয়াই হাঁপাইতে লাগিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হলো?'

'হয়নি কিছু।' বলিয়া সে কাপড় ছাড়িয়া কুম্ভার কাছে হইতে একটুখানি দূরে সরিয়া গিয়া আমার চুপি-চুপি বলিল, 'দোনা।'

বলিয়া 'দে' একবার দরজার দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল, 'হঠাৎ মনে হ'লো যেন কুম্ভার বাবা ঘুরে' বেড়াচ্ছেন। চক্কাশুকা ঘুরে' বেড়াতে দেখতাম কিনা।' প্রাচী ঠোঁট দিয়ে উঠতেই, মনে হ'লো পালাই। আবার কাঁদলাম, থাক, কাপড়টা কেটেই নিই। কিন্তু কাপড় কাচতে-কাচতে ভবন মনে হ'লো। নীচের ওই ঘরে কে বেন ভুলান বুলছে। মনে হলো ইহঁদের অমনি করছে। কান পেতে ভ্রমভে লাগলাম। নীচের বাপু, ইহঁদের ওরকম শব্দ কখনও করত প্যারে না। ভয়ে তাই পালিয়ে এলাম।'

'চোর-চোর নয় ত?—দাঁড়াও দেখে' আসি।' বলিয়া আলো লইয়া নীচে নামিয়া গেলো। বেশিলাম, কোথাও কিছু নাই। মনে হইল কোথায় যেন শব্দ—একটা 'বি-বি-বি' পোক ডাকিতেছে। আমারজার রাহি। চারিদিক ঘোর অন্ধকার। আকাশে মেঘ জমিয়াছে।

উপর উঠিয়া আসিতেই কুম্ভার জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি এমন হঠাৎ যে বেনে গেলেন দাড়া।'

বলিলাম, 'তোমার বৌদি হঠাৎ ভয় পেয়ে ওপরে উঠে এলো। বললে, মনে হলো কে বেন-নীচের এই অন্ধকার ঘরে তালান বুলছে। ইহঁদের হয়ত গুট-গুট করছিল, ভীত-মায়া—ভয়ে তখন ওর হয়ে গেছে।'

কুম্ভার নতুনই চুপ করিয়া কি বেন ভাবিতে লাগিল।

বলিলাম, 'তাকাও কি ব্যর্থ হয় আমিই দিচ্ছি, ভাড়া-ক'কে কেউ নেবে, তুমি ভেব না।'

কুম্ভার হাসিল। তাহার সেই নীরব হাসি। এত গৃহের দিনেও যত্নে তাহার হাসি দেখিবার অবকাশ হইয়া গেলো।

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গেছে।

নীচে মনের ঘরে আমার স্বী কাপড় কাচিতেছিল, হঠাৎ কুম্ভারকে সে তাকাও ডিগেরে উঠিয়া আসিয়াই হাঁপাইতে লাগিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হলো?'

'হয়নি কিছু।' বলিয়া সে কাপড় ছাড়িয়া কুম্ভার কাছে হইতে একটুখানি দূরে সরিয়া গিয়া আমার চুপি-চুপি বলিল, 'দোনা।'

বলিয়া 'দে' একবার দরজার দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল, 'হঠাৎ মনে হ'লো যেন কুম্ভার বাবা ঘুরে' বেড়াচ্ছেন। চক্কাশুকা ঘুরে' বেড়াতে দেখতাম কিনা।' প্রাচী ঠোঁট দিয়ে উঠতেই, মনে হ'লো পালাই। আবার কাঁদলাম, থাক, কাপড়টা কেটেই নিই। কিন্তু কাপড় কাচতে-কাচতে ভবন মনে হ'লো। নীচের ওই ঘরে কে বেন ভুলান বুলছে। মনে হলো ইহঁদের অমনি করছে। কান পেতে ভ্রমভে লাগলাম। নীচের বাপু, ইহঁদের ওরকম শব্দ কখনও করত প্যারে না। ভয়ে তাই পালিয়ে এলাম।'

'চোর-চোর নয় ত?—দাঁড়াও দেখে' আসি।' বলিয়া আলো লইয়া নীচে নামিয়া গেলো। বেশিলাম, কোথাও কিছু নাই। মনে হইল কোথায় যেন শব্দ—একটা 'বি-বি-বি' পোক ডাকিতেছে। আমারজার রাহি। চারিদিক ঘোর অন্ধকার। আকাশে মেঘ জমিয়াছে।

উপর উঠিয়া আসিতেই কুম্ভার জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি এমন হঠাৎ যে বেনে গেলেন দাড়া।'

বলিলাম, 'তোমার বৌদি হঠাৎ ভয় পেয়ে ওপরে উঠে এলো। বললে, মনে হলো কে বেন-নীচের এই অন্ধকার ঘরে তালান বুলছে। ইহঁদের হয়ত গুট-গুট করছিল, ভীত-মায়া—ভয়ে তখন ওর হয়ে গেছে।'

কুম্ভার নতুনই চুপ করিয়া কি বেন ভাবিতে লাগিল।

বলিলাম, 'তাকাও কি ব্যর্থ হয় আমিই দিচ্ছি, ভাড়া-ক'কে কেউ নেবে, তুমি ভেব না।'

কুম্ভার হাসিল। তাহার সেই নীরব হাসি। এত গৃহের দিনেও যত্নে তাহার হাসি দেখিবার অবকাশ হইয়া গেলো।

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গেছে।

নীচে মনের ঘরে আমার স্বী কাপড় কাচিতেছিল, হঠাৎ কুম্ভারকে সে তাকাও ডিগেরে উঠিয়া আসিয়াই হাঁপাইতে লাগিল।

কুকা মুখ তুলিয়া চাহিল। বলিল, 'চলুন দাশা, এক বাজীটা ভাড়ার বসিয়ে আমরা অল্প বাজীতে উঠে যাই।'

'কেন রে, তা কেন?'
কুকা রান একটুখানি হাসিল। বলিল, 'না দাশা, বৌদি মিছে বলেনি। ও শব্দ আমিও শুনেছি। ও ইউরেনের লুন্ড নর।'

আমার গৃহিণী এককক্ষে জোর পাইয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'শোনো। আমার কথা তুমি হেসেই উড়িয়ে দাও।'

বলিলাম, 'কুকার কথাটা ই বুঝি বিশ্বাস করব মনে করছে?'

'বিশ্বাস আপনাকে করতেই হবে দাশা, আহুন।' বলিয়া লণ্ডনটা তুলিয়া লইয়া কুকা উঠিয়া দাঁড়াইল।

গঙ্গালীটা আমাদের কোথায় লইয়া যায় দেখিবার জন্য তাহার পিছু-পিছু চলিতে লাগিলাম। কুকা আগে-আগে, আর আমরা দুজনে তাহার পিছু-পিছু। সিঁড়ি ধরিয়া নীচে নামিয়া গিয়া কুকা চাবি দিয়া নীচের সেই অন্ধকার ঘরের তামা খুলিল। অন্ধকার ঘরের মধ্যে ইউরগুলা এককণ্ঠ ছুটাইয়া উঠিতেছিল, মাফ দেখিয়া ছুটিয়া পলাইল। কয়েকটা আরহুলা যন্-কন্ করিয়া উড়িতে উড়িতে আমাদের গায়ে আসিয়া বলিল। ঘরের মধ্যে আবার আর একটা ঘর। এ-ঘরটা আমি পূর্বে কখনও দেখি নাই।

দেখিবার প্রয়োজন হয় নাই। সে-ঘরেরও তামা খুলিয়া, দরজা চৌকিয়া কুকা আগে ঢুকিল। যেহেতু কি সত্যই পাগল হইল নাকি? কিন্তু পাগলামির কোনও চিহ্নই তাহার দেখানাম নাই। ঘরখানা বায়-পাটারা জিনিষপরে ঠাসা। লণ্ডনটা হাত হইতে নামাইয়া কুকা একটা বায় খুলিল। খুলিয়াই হাতের আলোটা তুলিয়া ধরিয়া ডাকিল, 'দাশা আহুন।'

কাছে গিয়া বাহা দেখিলাম, বিষয়ে হতবাক হইয়া সেই-খানেনে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া পাশা ছাড়া আর উপায় রহিল না। টাকা ও নোটের ভাড়ার বাস্কাটা ভাঙি। সংখ্যার যে কত হইবে তাহার ইয়দা নাই।

কুকা আবার বলিল, 'দেখলেন?'

বলিতে গিয়া নীচের টেটটি তাহার পথ-পথ করিয়া কাপিতে লাগিল।

'এ কি তুমি আগে থেকে জানতে কুকা?'

কুকার চোখে তখন জল আসিয়াছে। প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া 'না' বলিয়া হাতের লণ্ডনটা তাহার পাশের একটা বায়র উপর নামাইয়া রাখিয়া, সেইখানেনে সে বলিয়া পলিল এবং সেই বায়ের গায়ে লুটাইয়া পড়িয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া দাঁড়িয়া উঠিল।

আমরা দুজনে মিলিয়া কুকাকে কিছুতেই আর থামাইতে পারি না। এতদিন পরে এমন করিয়া তাহাকে এই প্রথম আমি কাঁদিতে দেখিলাম।

ভাবলোকে মেটারলিক্স

৪

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

'অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্ট' পুস্তকে আমরা মেটারলিক্সের জীবনের একটি নতুন অধ্যায়ের স্বরূপাত দেখিতে পাই। প্রথমপুণের অজ্ঞানজনিত রহস্যবোধের বিজীকিা এবং অশক্তজনিত নৈরাশ্র্য আমরা Serres Chaudes (সেরার শোঁদ) হইতে আরম্ভ করিয়া 'বিস্তারিতলের সূত্র' পর্যন্ত দেখিয়াছি, তারপর 'দীনের সম্পদ' ও পরবর্তী নাটক এগাতেন ও সেলোটে, তাহার অন্তরের রহস্যময় নিগূঢ় অহুতনের আলোকে অন্ধকারের অপলমণ ও অতীন্দ্রিয় ভাবলোকের আনন্দজ্যোতির বিকাশও আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু বীরে বীরে প্রথম প্রকাশের এই অস্বাভাবিকতা ও অতীন্দ্রিয় বিশ্বাসের প্রবল উক্তি কাটিয়া গিয়া মেটারলিক্সের মধ্যে দীর দীর সত্যাহুদ্যমনের একটি দৃঢ় সত্ত্বয় সূত্রটি উঠিতেছে তাহারই অভ্যাস আমরা পাই সর্বপ্রথম 'অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্ট'। পরবর্তী লেখায় এই ভাবটি যে আরও প্রবল হইয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাও আমরা বধ্যস্থানে দেখাইবার চেষ্টা করিব।

অতীন্দ্রিয় ভাবলোকে উপলব্ধ অহুতৃতিকে বাস্তব-বগতের পূর্ণবেশলগ্ন সত্ত্বয় মায়েও সত্য বলিয়া পাওয়া যায় কি না, রহস্যাহুত্বিত কোন বাস্তব/ভিত্তি মানব, তাহার অহুতবশক্তি দিয়াই শুধু না, তাহার শ্রেষ্ঠতম বুদ্ধির দ্বারাও সম্ভব করিয়া পাইতে পারে কি না, তাহাই যেন এই যুগে মেটারলিক্সের বিশেষ অহুদ্যমানে বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাই এই অধ্যায়ে আমরা মেটারলিক্সকে পূর্ব বেশী পরিমাণে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সত্যাহুদ্যমানে নিষ্ঠি রেখিতে পাই। জীবনের বাহা কিছু রহস্ত তাহাকে দার্শনিকের মত বুদ্ধি বিচারের দ্বারা উপলব্ধি করিয়া, তাহার মর্ন্ত্বলগ্নকি অবিচার্য করিবার সত্ত্বয় তাহার প্রত্যেক আশোচনায় সূত্রটি উঠিয়াছে দেখিতে পাই। এইজন্য বেশীর ভাগ দলখ্যাই

তাহাকে নৈতিক সমস্তার ও রহস্তবোধের দার্শনিক আলোচনা করিতে এবং প্রাকৃতিক জগতের সৌন্দর্য্য পূর্ণ্যালোচনা করিতে দেখি। এই যুগের নাটকেও এই রহস্য আর পূর্কের মত রহস্তকে সূত্র করিয়া দেখাইবার সেই চেষ্টা নাই, আছে মানবজীবনের উচ্চতর নৈতিক সমস্তার বিকাশ।

ইহার অর্থ কিন্তু পূর্ণযুগের—দীনের সম্পদের—অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস বিশ্বজনন নহে। তবে ইহা সত্য যে মেটারলিক্স সেই বিশ্বাসকেই চরম সত্ত্বয় মাপকাঠি বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। মেটারলিক্সের অন্তর, বিচার দিয়া, বুদ্ধি দিয়া, বৈজ্ঞানিক সত্ত্বয় পথ দিয়া মানবজীবনের, এই পরমাণ্ডা বিশ্বরহস্তের বিপুল বিশ্বয়-মন্দিরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। আমরা তাহার এই চেষ্টার পথটিকে এবার অহুদ্যমণ করিবার চেষ্টা করিব।

১৮৯৮ সালে 'অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্ট' গ্রন্থে মেটারলিক্স তাহার দার্শনিক মতবাদ ব্যক্ত করেন। মেটারলিক্সীয় মতবাদ আলোচনায়, এই পুস্তকের যুক্তিগতপন্থাকেই বিশেষ ভিত্তি করিয়া, তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। স্বতরাং এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি নিম্নোক্তজন। 'দীনের সম্পদের' লেখার ভঙ্গী হইতে ইহার লিখনভঙ্গীটি স্বতন্ত্র। এখানটির লেখার লেখকের স্ববৃত্ত ভাবটি স্বতন্ত্রাচ্ছসিত হইয়া যেন বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহার মধ্যে যুক্তির শৃঙ্খলা রাখিবার কোন সচেতন প্রয়াস নাই; কিন্তু ইহার মধ্যে লেখক আপনার অভিজ্ঞার সম্বন্ধে সচেতন; মত প্রচারের সত্বকতা আসিয়া তাহার ভাবোচ্ছাসকে চাপিয়া ধরিয়াছে। আর একটি দৃষ্টান্ত এখানে আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়া পড়ে। 'দীনের সম্পদের' লেখক এই বিশ্বের কর্তৃজীবন হইতে যেন আপনাকে একান্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্তরের নিহুতলোকে নিচরন করিতেছেন; কিন্তু 'অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্ট' দার্শনিকটি

জগতের কর্মপ্রাধিকার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াছেন দেখিতে পাই। প্রেমালোকের কর্মধীন নিভৃত অবসারের মাঝে মানবজাতির পুরন পুরন্যকই বিনি জীবনের চরম সার্থকতা বলিয়া পূর্ণ প্রচার করিয়াছেন, তিনিই আবার এদিকে বসিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে বৈতিক জীবনের প্রকৃত বিকাশই আমাদের লক্ষ্য হওয়া চাই, এবং এই বিকাশ একমাত্র কর্মের মধ্যদ্বারাই হইতে পারে; যে ভাবুকেরা কর্মে আপনাকে বিকশিত করিতে পারিতেছে না, তাহা জীবন বিকাশের কোনই সহায়তা করে না, করিতে পারে না। এই যে জীবনে কর্মপ্রাধিকার স্বীকার, ইহার মূল কারণটি বিশ্বস্ত হইলে মেটারলিকজীবী ভাববিশ্বাস বৃদ্ধিতে পারা বাইবে না। যদি কাহারও নিয়তির প্রত অচল বিশ্বাস থাকে, যদি সে মনে করে যে শত প্রয়াস-সঙ্গেও নিয়তির শাসন অটল থাকিবেই, তাহার ইচ্ছাতে মাহুকের স্বপ্নচালিতের মত চলিতেই হইবে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি কখনও জীবনে কর্মের উপর কোন শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে পারে না। স্মৃতরোগ বৃদ্ধিতে হইবে যে কর্মের দ্বারা নৈতিক জীবন বিকাশ হয় এ তত্ত্ব বিনি প্রচার করতেন, নিয়তির উপর তাহার অচল বিশ্বাস নাট। যে নিয়তি মৃত্যু এবং বিশ্বাস দ্বারা জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছেন, মেটারলিক সে নিয়তিকো সত্য বলিয়া যে আর মনে করেন না তাহারই আভাস আমরা এ তত্ত্বজ্ঞানের মাঝে দেখিতে পাই। এই বহুদূর মূল কথাই এই যে মাহুকের অদৃষ্টের অধীন নহে; বহির্জগতের ঘটনার উপর অদৃষ্টের অস্বাভাব্য পালন চলিতেছে না, এখানে অদৃষ্টের বিকাশ হইতে বাওয়া ব্যতীত ইহাও সত্য, কিন্তু অন্তরের দিক দিয়া বহির্জগতের সমস্ত ঘটনাকে আপনায় মধ্যে গ্রহণ করিতে গিয়া সে তাহার ইচ্ছামান রূপ দিয়া ঘটনার প্রভাবকে নিয়মিত করিতে পারে। অদৃষ্টের উপর অন্তরের এই প্রভাব মেটারলিক আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই, এই পুস্তকের সঙ্গত জীবনকে আনন্দের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার কথাটি স্মরণ হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিব্যাহুদৈবিক বাধ্যতা আত্মগাণ, অহুতাপ, অর্থহীন সযম প্রকৃতি প্রকৃত আনন্দ-লাভের পথে জীবনকে বাধা দেয় বলিয়া মেটারলিক ইহাদিকে অস্বীকার করিয়া জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে

চাহিয়াছেন; এইজন্য এই পুস্তক-প্রচার পৃথিবী জগতে মেটারলিককে খৃষ্টপুর্ষের বিরোধী বলিয়া পরিচিত করিয়াছে।

ইহার বহুর তিনেক পরে প্রকাশিত 'মক্ষিকা-জীবনের' মধ্যে যে মেটারলিক নবীমপ্ৰেণে দেখা যেন তাহা আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খই বলিয়াছি। তিনি তাঁহার বিশবসায়ের মক্ষিকা-পূর্ববর্তনের কল অসুখী ভাষায়ও ভাবে এই পুঙ্খকে প্রকাশ করিয়াছেন। মক্ষিকা-জীবনের বা কিছু সৌন্দর্য ও মাহুর্বা, বা কিছু অশুদ্ধ পদার্থ ও পরমাণু তাহাকে এত স্নেহের করিয়া কেহ কোন ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন কিনা জানি না; তবে মনে হয়, বৃষ্টি এমনটি মেটারলিক ছাড়া আর কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়; তিনি বাহ্যে দেখিতে পাইয়াছেন ও দেখাইয়াছেন, তাহা দেখিতে হইলে মেটারলিকের মত প্রাণ দিয়াই যে দেখা চাই।

সাধারণতঃ আমরা মাহু ছাড়া অপর জীব জন্তকে মন-শক্তির অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে নারাজ; তাহার বাহ্যে কিছু ক্রতে, অদৃষ্ট এবং বিশ্বজনক হইলেও তাহা কেবল প্রকৃতির প্রেরণায় মূঢ়ভাবে কি করা থাকে ইহাই মনে করিয়া আমরা বৃহস্পতির মধ্যে আত্মপ্রাণের প্রচার করিতে চাই। মেটারলিক এ ভাবের বিরোধী। মক্ষিকা-জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ের অসুখী চিত্র দিয়া তিনি আমাদের এই কথাটি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে মক্ষিকার জীবনেও বুদ্ধিশক্তির অত্যাশ্চর্য বিকাশ বেদিত পাওয়া যায়। মেটারলিক ইহাও বলেন যে না হয় বাই ইহাও মানিয়া লওয়া যায় যে মক্ষিকার বাহ্যে কিছু করিতেছে 'তা মূঢ়তবে প্রকৃতি-প্রেরিত হইয়া' করিতেছে, তাহা হইলেই বা বিশ্বস্তের শিখ হইবে কেন? কারণ? না হয় মক্ষিকার বুদ্ধি নাহ-ই, কিন্তু তাহার জীবনের পরমাণু ঘটনাগুলি যে-শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, যে শক্তি যে এই বিশ্বজগতে একটি পরম রহস্যময় শক্তি এ কথা অস্বীকার করিবার ত কোন উপায় নাই। প্রকৃতির 'আমরা' কতটুকু জানি? এই অত্যাশ্চর্য শক্তিকে মাত্র একটি নাম দিয়াই যে আমরা পরম বিজ্ঞান, মত নিশ্চিন্ত চিন্তে বাধ্য বাসি, ইহা প্রকৃতির কাজ, তাহার মধ্যে ত কোন বিজ্ঞানও নাই, পৌরষও নাই।

মোমাছির চাক হইতে মূদ্র দল স্ত্রী কেমন করিয়া হয়, কেমন করিয়া একদিন অক্ষয়্য মোমাছির তাহারের নরজাত বংশধরগণকে তাহারের ঘর বাড়ী এবং প্রভূত সঞ্চয় নিশেঘে দান করিয়া, মাত্র দিন কয়েকের মধ্যে লুপ্ত হইয়া তাহারে আনন্দে সখ ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ ব্যাভ্র বাহির হইয়া পড়ে, কেমন করিয়া আবার তাহারের মূদ্র সঞ্চয়, মূদ্র রাজ্য স্থাপিত হয়, মক্ষিকার বিবাহ। এক কথায়, কি নিগূঢ় রহস্যময়, তাহার আকাশ-বাসর কি এক অশ্চর্য ঘটনা, বিবাহের পর আনন্দময় পুত্র মক্ষিকাদের নির্মম হত্যাও কি এক অদ্ভুত ব্যাপার, সে সব কথা বিবাহের স্থান আমাদের নাই। মক্ষিকার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, তাহার অপরিমেয় সাহস, তাহার অসম্ভব আত্মগাণ, তাহার কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বীশীলতা, তাহার অত্যাশ্চর্য কামনা ও সংঘ সংগ্রাম মক্ষিকার সাম্প্রতিক কল্যাণের, তাহার অদ্ভুত আত্মশক্তি, মূঢ়তা পশু-পক্ষিপক্ষির প্রতি বিরূপ, ভবিষ্যতের নিশেঘে আত্মনিবেদন এ সমস্ত যে মেটারলিক কি অশ্চর্য্য সহমুখিতার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ক কথায় প্রকাশ করিয়া বোঝান সম্ভব নহে।

মেটারলিক মোমাছির জীবনটিকে বাহির হইতে না দেখিয়া অন্তরের দিক দিয়া তাহাকে দেখিবার ও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। মক্ষিকা-জীবনের ক্রমোন্নতির পথে ব্যক্তি কেমন করিয়া ক্রমে ক্রমে সমাজের বৃত্তের সমস্ত নিকট এবং ভবিষ্যৎ বংশের ততোধিক বাপক সমস্ত দিককে আশ্রয় করিয়া বহির্জগতের দিকে তাকাইতে গেলো মানব-বুদ্ধিকেও স্তম্ভ হইতে হয়। মোমাছির গণতন্ত্র (Republic) ব্যক্তিবিশেষের কোন প্রাধিকার নাই; সমাজের সদস্যের নিকট

ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গীকৃত। সমাজের বর্তমান আবার প্রতিমুহুর্তে ভবিষ্যতের নিকট উৎসর্গীকৃত। ভবিষ্যতের দাবীর নিকট, বর্তমানের কোন দাবী মক্ষিকাসমাজে প্রাধিকার নাই। বইখানির বিষয় পধ্যোলাচন। উপলক্ষে মেটারলিক তাঁহার জীবনে যে সব পরিবর্তনের আভাস দিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি যে যৌবনের কালজিন সৌন্দর্যের মোহ ছাড়িয়া, দীর্ঘে দীর্ঘে বৈজ্ঞানিক সত্যের মধ্যে সৌন্দর্য দেখিতে পাইয়াছেন, তাহার মূলে জীবনের মাঝে একটি পরিবর্তনের ও মূদ্র অভিজ্ঞতার পরিচয় রহিয়াছে। এই পুস্তকের প্রারম্ভেই তিনি বলিতেছেন—...অন্যে কদিন হইয়া গেছে, আমি এ জগতে সত্যের চেয়ে,—অন্ততঃ সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারটা চেষ্টা করে, বেশী স্নেহ অথবা চিন্তা-বৈক বস্তুর সন্ধান ছাড়িয়া দিয়াছি। সমস্ত বইখানির আলোচনার মধ্যে দিয়া মেটারলিকের জীবনের উপর দৃঢ়তার দ্বারা ছুটয়া উঠিয়াছে; তাই তাঁহার মখে শুনিতে পাইতেছি যে 'জীবন আমাদের কাছে কোন নিশ্চিত ভরসা না দিতে পারিলেও, বিপরীত কোনও সত্য-সংকে নিশ্চিত না হওয়া পর্যায় আমাদের প্রেমের কর্তব্য হইতেছে জীবনের উপর বিশ্বাস রাখা।'†

এই বিশ্বাসের মূলে কিন্তু মেটারলিকের জীবন একটি শক্তি লোকের পরিচয় রহিয়াছে। এই বইখানির সঙ্গত মক্ষিকা-জীবনে বুদ্ধির অপরিসীম শক্তি দেখাইতে গিয়া মানবজীবনের এ শক্তির প্রভাব যে আরও অধিক হইতে পারে সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। আদিত মক্ষিকার শেখানীর অবস্থা হইতে বর্তমান মক্ষিকা পঞ্চাশ ক্রমোন্নতির মূলে বুদ্ধির পরমাণু প্রকাশ ও প্রভাব মেটারলিক দেখাইয়াছেন। এই শক্তির দ্বারা মক্ষিকা তাহার চতুর্দিশের রহস্যময় বিশ্বকে,

* For in them, individual is nothing, her existence conditional only, and herself for one indifferent nature, a winged organ of the race. Her whole life is an entire sacrifice to the manifold; everlasting being, whereof she forms part. It is strange to note that it was not always so. (Life of the Bee, p. 72).....at last we arrive through successive stages, at the almost perfect but pitiless society of our hives, where the individual is entirely merged in the republic and the republic in its turn invariably sacrificed to the abstract and immortal city of the future. (Life of the Bee p. 26).

† "I myself have now for a long time ceased to look for anything more beautiful in this world, or more interesting, than truth; or at least than the effort one is able to make towards truth." (Life of the Bee p. 4).

† "...Confidence in life, until certitude to the contrary reach us, must remain the first of all our duties, at times when life itself conveys no encouraging cleanness to us"

Life of the Bee p. 315.

তাঁহার অগমিত বিপদকে সে জয় করিতে সক্ষম হইয়াছে। তাঁহার গণতন্ত্রের মধ্যে ক্রমোন্নতির ফলে আত্মবী শক্তির বিকাশ ঘটিয়াছে। ব্যক্তির এখানে স্থান নাই সত্য, কিন্তু সমাজের এবং জাতির জন্মবিকাশের পথটিকে এই বুদ্ধিশক্তি আশ্চর্যরূপে সহজ করিয়া তুলিয়াছে। মক্ষিকার শরীর-বীজনের দিকে লক্ষ্য করিলে তাঁহার জীবনের বিশেষ বস্তুটি যে মনুষ্যই তাহা ধরা পড়িয়া যায়। মানবশরীরের দিকে নুঁপাত করিলে তেমনই ইহা বোঝা যায় যে মস্তিষ্ক অর্থাৎ মনসশক্তিই হইতেছে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। মানবের বাহা কিছু বিশেষত্ব তাহাকে সে পূর্ণ বিকশিত করিতে পারিবে এই চিন্তা পরিচালনার দ্বারা। মেটারিস্তিক এ শক্তিকে কি চক্ষে দেখেন তাহা নিম্নোক্ত লেখা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে :

“এই আশ্চর্য্য বস্তুগণটি (বুদ্ধিশক্তি) যেখানেই থাকিবে সেখানেই সে অঙ্গ প্রয়োজনকে রূপান্তরিত করিবে, জীবনকে গড়িয়া তুলিবে, তাহাকে সুন্দর করিবে এবং বাড়াইয়া তুলিবে এবং সব চেয়ে অল্পত এই যে এই বস্তুটি মৃত্যু এবং সেই দাম্ভিকবোধহীন বিপুল ভক্তির শক্তিকে পঞ্চম লব্ধি করিয়া রাখিতে পারে, যে তরঙ্গ প্রায় সমস্ত অস্তিত্বশীল বস্তুকেই চিরন্তন চেতনানীহীনতার মাঝে ডুবাইয়া ফেলে।”

প্রকৃতির ক্রমোন্নতিশীল চেষ্টার দিকে লক্ষ্য করিলে এই কথাটির স্বভাবতঃ মনে হয় যে তিনি মক্ষিকাকে যেমন ঘরে ঘরে, স্তনের শুভে জীবন জয়ের শক্তি দান করিয়া আনিতেছেন, মানবও তেমনই বুদ্ধিশক্তির বিকাশ ও পরিণতির ফলে এই বিশ্বশক্তিকে ক্রমশঃ আশ্রয় করিয়া চলিয়াছে। তাই মনে হয় একদিন মানবজাতি বিশ্বশক্তির উপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখা করিতে সক্ষম হইবে। এই ভাবের বিশ্বাস মেটারিস্তিকের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই এই পুস্তকে তাঁহাকে নিয়তির ‘অতিবাস্তবিক’ করিতে দেখিতেছি। নিয়তি বলিয়া যে কোন একটা সত্য শক্তি এ জগতে ক্রিয়া করিতেছে, এই বিশ্বাস তাঁহার পূর্বে ছিল ইহা আমরা দেখিয়াছি কিন্তু এখন তিনি বলিতেছেন “মোমাইদি হোক, আর মায়ুই হোক, (জীবনের) যেটুকু আমরা এখনও পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই, তাহাকে নিয়তি বলিয়া মনে করা আমাদের একটি

সংস্কার মাত্র।”^{*} মস্তিষ্কের শক্তি অর্থাৎ বুদ্ধি এই অজ্ঞান নিয়তিককে জয় করিতে পারিবে এই বিশ্বাসের বশেই মেটারিস্তিক মানবজাতির ভবিষ্যৎকালে মহানুভব করিয়া দেখিতে বলেন। কারণ জীবজগতে যেখানে মস্তিষ্ক রহিয়াছে সেখানেই প্রকৃত্ব এবং বিজ্ঞান, জ্ঞান এবং সত্যশক্তিও রহিয়াছে। ‘অদৃষ্ট’ ও ‘অদৃষ্ট’ মেটারিস্তিক অস্বচ্ছন্দে অদৃষ্টের প্রভাব অস্বীকার করিলেও, বহির্জগতে তাহাকে স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু ‘মক্ষিকা-জীবনের’ মেটারিস্তিক আরও অগ্রসর হইয়া বলিতেছেন—নিয়তি বলিয়া কিছু নাই; আছে অজ্ঞাত শক্তি, —তাহাকে মস্তিষ্ক একদিন জ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া শ্রেষ্ঠতম শক্তির পূর্ণ অস্বীকার হইতে পারে, ইহা অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু নাই। জে, বিফেল মহাশয় এইজন্মই এই বৈধানিকে ‘মস্তিষ্কের শক্তি-সম্পদ’ একদানি শ্রেষ্ঠ মহাকলা’[†] বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন; এ প্রশংসা যে অস্বাভিক নয়, ইহা এই পুস্তকের কোন পাঠক অস্বীকার করিতে পারিবেন না বলিয়া আমরা মনে হয়। অতীন্দ্রিয় ভাবুকতার মুগ্ধ আবেশ কাটাওয়া এখনো তিনি পাশ্চাত্য বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী, প্রথম অশাব্দী বৈজ্ঞানিকের বেশে দাঁড়াইয়াছেন। মানবজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও মানবীয় শক্তির উপর বিশ্বাস আদিয়া যেন অতীন্দ্রিয় রহস্তবোধকে ‘অনেকটা চাপা দিয়া ফেলিয়াছে মনে হয়।

‘গোপন মন্দির’ বইখানি ফলতঃ বছর দুই তিন পরে প্রকাশিত হইলেও তাঁহার সমস্ত খোঁজ বাস্তবিক ‘অদৃষ্ট’ ও ‘অদৃষ্ট’ এবং ‘মক্ষিকা-জীবনের’ মন্যবত্তি। স্তত্রাং মেটারিস্তিকের চিন্তার গতি এই সময় কোনদিকে ছিল তাহা “যেখািতে গিয়া যদি এখানেই তাঁহার আলোচনা করা যায় তাহা হইলে অস্ত্রায় হইবে না, বরং ভাবধারাটির পার্শ্বপাশ্বে

* “It is our habit in the case of the bees no less than our own to regard as fatality all that we do not as yet understand.”

—Life of the Bee p. 46.

† “...where the brain is, are authority and victory, wisdom and veritable strength.”—Life of the Bee.

১ “A powerful epic of brain force”

J. Bathe's Life and Writings of

Maurice Maeterlinck p. 114.

অজ্ঞত থাকিবে বলিয়া মনে করি। এই পুস্তকে চারিটি প্রধান প্রশ্ন আছে, এই বইখানিকে চারিটি পুস্তিকার সংগ্রহ বলিয়াও চলে। এই জন্মই তাঁহার এই প্রশ্নগুলির সার-মর্ম হু কথার না বলিয়া একটু বিস্তৃত করিয়া বলাই বাহুল্য। এই পুস্তকের অনেক কথারই পুনরাবৃত্তি মেটারিস্তিকের মতবাব আলোচনার করিতে হইবে সত্য, কিন্তু তাঁহার ভাববিকাশ দেখাইবার উদ্দেশ্য এখানে কিছু না বলিলেও আলোচনা বাধ্যদ্বারা হইয়া পড়িবে।

প্রথম প্রশ্নটির নাম চায়-রহস্ত (Mystery of Justice)। লোকে সাধারণতঃ বহির্জগতের ফলাফলের মধ্যে মানবীয় কর্মের একটা নৈতিক বিচার প্রত্যাশা করে কিন্তু ইহা মিথ্যা; বহির্জগতের মাঝে কেবল ভৌতিক কাণ্ডকারখান সম্পর্কই থাকিবার কথা চলে। (১) “পিতৃক্রমের (Herodity) ফলে মানব জন্মগত যে সব নৈতিক গুণাগুণ প্রাপ্ত হয় তাহার মধ্যেও অনেকে একটা নৈতিক বিচার দেখিবার চেষ্টা করেন, ইহাও একটা ভ্রান্তি; এখানে চায়-রহস্ত নাই। (২) পিতৃক্রম একটা জড়জগতের নিয়ম, এখানে জড়জগতের কাণ্ডকারখান সম্বন্ধ “রহিয়াছে মাত্র।” অনেকে বলিতে পারেন এত সত্যমিথ্যা বিচারের প্রয়োজন নাই, যদি স্বাভাবিক-বিষয়ে ভাল হয় তাহা হইলে এ সব ধারণাও বাকী নয়। মেটারিস্তিক ইহা স্বীকার করেন না, তাঁহার নিকট সত্যের সামান্যই বাঁচিয়া থাকার শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। (৩) এই জন্মই ভৌতিক জগতের ফলাফলের সহিত নৈতিক কারাবের মিথ্যাযোগে তিনি স্বীকার করিতে চাহেন না। ভৌতিক জগতে প্রাকৃতিক নিয়মেরই একাধিপত্য, অস্বচ্ছন্দে আবার তেমনই নৈতিক নিয়মের “অব্যাহত প্রভাব, সেখানে আর” বিচারই প্রধান। (৪) তারপর আমরা যে ক্রমাগতই প্রাকৃতিক নিয়মকে নিষ্কৃত, মাহুয়ের ভাষা আয়ের প্রতি উদ্দামীন বলিয়া গালি দিই, তাহাও ঠিক নহে; তাহার পূর্বে আমাদের

আপনার হাতেগড়া অবিচারের এবং নিষ্ঠুরতার পরিমাণ যে অনেক বৈশী তাহা মনে রাখা উচিত। কিন্তু আমাদের অবিচার অনেক হইলেও একথা সত্য যে মানব-প্রকৃতির মধ্যে জন্মের দিকে একটি সহজ প্রশংসা রহিয়াছে। (১) চায়-বোধটি বাস্তবিকই একটি রহস্ত। এই চায়-রহস্ত যুগে যুগে নানানরূপে আমাদের নিকট দেখা যায়। আমাদের নৈতিক-বোধের অধীনতাক্রমে যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। বহুই কারণিক ভিত্তি টুটরা, থাকে তাহার সত্যকার একটি রহস্তময় ভিত্তি আছে বলিয়াই, প্রাচীন বিশ্বাস ‘ভাদিয়া বাওয়া’ সহজে চায়-রহস্তের শেষ হইল না। মিথ্যা বিশ্বাস গিয়া আজ বাস্তব রহস্তের বিপুলতা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। (২) প্রাকৃতিক জগতে চায় নাই বলিয়া, মাহুয়ও যদি তাহার জন্মতে নৈতিক নিয়মকে অস্বীকার করিতে থাকে, তাহাতে তাহার শক্তির বিকাশ ত হয়ই না, বিনাশ হয় মাত্র, অস্ত্রের নৈতিক বিরোধ আমাদের শক্তিকে ক্ষয় করিয়া ফেলে। (৩) প্রাকৃতিক জগতের নিয়ম একদিকে ইহিত করে, আর প্রকৃতিগঠিত মানব-অস্ত্র জীবনের প্রতি অপর দিকে ইহিত করে যে একটা সত্য বটে, রহস্তও বটে, কিন্তু এই দুইটি আদর্শের বিরোধ হইতে এই ধারণা করিয়া লওয়া চলে না যে প্রকৃতির কোনও নৈতিক লক্ষ্য নাই। (৪) জীবন-মুখার রহস্তকে না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃতির লক্ষ্য নির্দেশ করিতে বাওয়া বুঝা। যে জন্মই মানবের কর্তব্য তাহার অস্ত্রের নীতিবাধ্যতাকেই পালন করিয়া চলা। চায়-রহস্তের মীমাংসা করিতে গিয়া সেবালোকে বা অস্বচ্ছন্দাকের সম্মান আজ মানব করিতে চাহে না, আজ মনে হয় এই চায়-রহস্তের ভিত্তি মানব-অস্ত্রের গোপনেই নিহিত রহিয়াছে। আজ

1. Bur. Temp. p. 40: “our mind no less than our character, is incapable of living and acting except in justice.”

2. Bur. Temp. p. 26 “And as the artificial mysteries vanish, so will the ocean of veritable mystery stretch out further and further.”

3. Bur. Temp. p. 36: “an act of injustice must always shake the confidence a man had in himself and his destiny.”

৪. চায়-রহস্ত সপ্তম পরিচ্ছেদে ‘মীমাংসা (mystery of Justice ch. 17, p. 35-6.)

4. Bur. Temp. p. 50.

যাহা সত্য বলিয়া মনে হইতেছে তাহার অঙ্গসমূহ করাই মানবের পক্ষে গোঁরব এবং সম্মানের পথ। (১) আমাদের অঙ্গসমূহের ভাষ্যবোধটিকে কর্মক্ষেত্রে সাদানার দ্বারা শুদ্ধ করিতে হইবে। আমাদের জীবনের চারিটিকে অঙ্গন নৈতিক জটিল হইয়াছে, নৈতিকবোধের মাঝিষ্ট বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব জটিলতা গঠিত থাকিবে। (২) আমরা জীবনে যে সব অধিকার আজ ভোগ করিতেছি, তাহাদের প্রত্যেকটি আমাদের কোন না কোন নৈতিক পাপের সাক্ষী হইয়া আছে। (৩) পূর্বে বিখ্যাপী অজ্ঞাতকে অদৃষ্টপ্রেমিত জানিয়া, পরিবর্তন ব্যক্তিও নিশ্চিতমনে আমাদের সার্বভৌম গণিতকে থাকিতে পারিতেন। আজ আমাদের সেই গণিতকে শাস্তির অচলায়ন ভাঙিতে আরম্ভ হইয়াছে। আজ আমরা জানিতেছি, বিখ্যাপী অজ্ঞাত অবিচার এবং অসম্পন্ন মূল অদৃষ্ট নাই, আছে মানবজাতির কর্ম। (৪) মানবের অঙ্গরায়ের সমুদয় আজ তাই এক বিরাট সমস্ত উপস্থিত। কিন্তু ব্যক্তির কর্তব্য সর্বপ্রথম তাহার সীমার মধ্যেই সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করা। কারণ হৃদয় বিখ্যাপী নৈতিক সামঞ্জস্য জাতির অঙ্গরায়ের সমষ্টিগত প্রেরণার উপরই নির্ভর করে। একবার মানবজাতির গোপনচেতনা এই ভাবের একটি সমস্তার নীমাংশ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। উৎকট প্রতিশোধবৃত্তির সংঘম ও প্রশমন সেই সমস্ত। 'প্রাণের মূল প্রাণ' এই মত পরিবর্তনের মূল মানবচেতনার একটি নিপুট উদ্দেশ্য রহিয়াছে। জাতির মর্গগত উদ্দেশ্য হইতেছে বাঁচিয়া থাকা। (৫) প্রতি মানবকে বিশ্বমানবের, জাতির এই উদ্দেশ্যের সহিত যোগ রাখিয়া চলিতে হইবে। এই নৈতিকবোধ প্রতি মানবের অন্তরেই রহিয়াছে। যদি মানব চিন্তায় এবং প্রেমে বসীমান হইয়া আপনার নৈতিক জীবনকে

বিকশিত করিতে পারে তাহা হইলে মানব তাহার জীবনের পরম গোঁরব অঙ্গরায় করিতে সক্ষম হইবে। (৬) মেটোরলিক জীবনের চেতনার ভাষ্যবোধের সঙ্গে সঙ্গেই যে রহস্য বাস লইয়া জাগিয়াছেন তাহা আমরা দেখিয়াছি। এই রহস্য জীবনের নিকট নিষিদ্ধ এবং মৃত্যু এই দুইকল্পই প্রকাশ পাইয়া জীবনের চিত্রকে বিপদ ও বিষম করিয়াছিল, কিন্তু পরে তিনি এই জীতি ও বিবাদ কাটাঁয়া উন্নিয়ছেন দেখিতে পাই। রহস্য বস্তুটির স্বরূপ কি, মানবজীবনে তাহার স্থান কোথায়, এটি মেটোরলিকের একটি বিশেষ আলোচনার বিষয়। 'রহস্যবিবর্তন' (Evolution of Mystery) প্রসঙ্গে তিনি এই রহস্য লইয়াই বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। জীবনের মত রহস্যবোধ জীবনের পক্ষে একটা প্রয়োজন; কেবল বড়ত্ব জানা, বড়ত্ব সীমার মধ্যে তত্ব লইয়া থাকিলে জীবন তাহার বিপুলতা ও মহিমা হারায়া ফেলে; অজ্ঞানার ডাকই জীবনকে উন্নতির পথে, বিকাশের পথে লইয়া যায়। (২) বিশ্বরহস্য অর্থাৎ অজ্ঞানার ধারণাই আমাদের সত্যকার জীবনকে রূপ দেয়; যাহা আমরা বিশ্বাস করি না তাহাকে আঁকড়াইয়া থাকিলে তাহাতে জীবনের পরম ক্ষতি হয়। 'অজ্ঞাত' রহস্যের দিকে চাহিয়া একটা বিখ্যাত কল্পনা গড়িয়া তাহার পূজা হৃদয়ের হইতে পারে কিন্তু সত্য হইতে পারে না। কিন্তু আজ আমাদের নিকট সত্য এবং আনন্দিতা (Sincerity) র-মূল খুব বেশী। (৩) মিথ্যা এবং অর্দ্ধমিথ্যা বিয়া আলম পূর্ণ করার চেয়ে, সে আসন চিরন্তন রাখাই শ্রেয়। আজও আমরা রহস্যের স্বরূপ জানিতে পারি না কিন্তু সত্য কিছু, আজ আমরা অন্ততঃ কতকগুলি মিথ্যা কল্পনা হইতে তাহাকে মুক্ত করিতে পারিয়াছি এবং তাহার ফলে জানিতে পারিয়াছি কি কি রহস্য নয়। বর্তমান যুগে আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না যে বারিদের দিক দিয়াও মানুষ সর্বদাই হুইন, পান্থীই সর্বদা পরাভূত হয়; ইহাও স্বীকার করিতে পারি না যে কোন অদৃষ্টশক্তি মানবজীবনকে বাহির হইতে সর্বদাই বিপন্নও

1. Bur. Temp. p. 93.
2. Bur. Temp. p. 102.
3. Bur. Temp. p. 105.

দুর্দশাগ্রস্ত করিতে ব্যস্ত রহিয়াছে; ইহাও আমরা আজ বলিতে পারি না যে প্রাকৃতিক জগতের সমস্ত ঘটনা মানব-জীবনের উপর কোন নৈতিক বিচার লইয়া আসিয়া থাকে। আজ আমরা ইহাই স্বীকার করি যে নৈতিকবোধ মানব অঙ্গসমূহের বস্তু; পাপপুণ্যের বিচার বাহিরের জগতে নাই, কিন্তু মানব-অঙ্গসমূহের অজ্ঞাতের সনিবিধা বিচার প্রতিনিষিদ্ধই চলিতেছে। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া বর্তমান যুগের (psychological drama) মনস্তত্ত্ববিদগণ-মূলক নাটক সৃষ্টি হইতে পারে। (২) প্রাচীন আদর্শের নাটক বর্তমান যুগের জীবনে সত্য হইবে না। মানবজ্ঞানে আজ এই সত্যবাদিনীটাই বেশী প্রবল যে, রহস্যময় বিশ্বশক্তি প্রাণ্ড, উদাসীন এবং অন্ধ; তাহার ফলে মানব-জীবনে কল্পনাতীত দুঃখনা ও বিপদের আবির্ভাব যে ঘটে না তাহা নহে। কিন্তু এই কল্পনা মানবজীবনের বাহিরে কোন একটি স্ফুটন নিষিদ্ধ স্বীকার করিবার কোনই হেতু পাওয়া যায় না। ইংসেন মানবজীবনে নিষিদ্ধির একটি নবরূপ আনিয়া মানবজীবনকে কতকটা বিভীষিকাগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছেন— এই নবরূপ হইতেছে Heredity বা পিতৃজ্ঞান। (২) মেটোরলিক বলেন, কোন জৈবিক কারণ আমাদের অঙ্গসমূহের বিপন্নতার কারণ হইতে পারে না; মৃত্যুর পক্ষান্তে আমাদের একটা ব্যক্তিত্বের কল্পনা করি বিপন্নাই আমরা ভয় পাই। এই পিতৃজ্ঞানও আমাদের অঙ্গসমূহের জীতি জাগায় কারণ পিতৃ-জন্মের মধ্যে আমরা জাতির (aspects) অবিচ্ছিন্নতা দেবতার সনিবিধাও বিচারের এবং আমাদের প্রতি কর্মের প্রতি জীবনের নিমিত্তভাষণের মতো দুটির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই। (৩) এবং এই বিচারের মধ্যে আমরা নৈতিক দণ্ড এবং পুরস্কারের ইঙ্গিত পাই বসিয়াই আমরা এতটা ভয় পাই। ইংসেন পিতৃ-জন্মের মধ্যে নৈতিক বিচারের ইঙ্গিত করিয়াছেন বসিয়াই

পিতৃজন্মকে একটা ট্রাজেডির ভিত্তি করিতে পারিয়াছেন; কিন্তু মেটোরলিক আবার এই ভয়ই ইংসেনের প্রচারিত পিতৃজন্ম রহস্যকে বিকৃত এবং অসত্য বলিয়া অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, পিতৃজন্ম একটা প্রাকৃতিক নিয়ম, নৈতিক নিয়ম নহে। কোন রহস্যকে দেখাইতে গিয়া কবিকে সর্বদাই সত্য এবং সত্যনিষ্ঠ হওয়া উচিত। জাত এবং সমাজের পর্যবেক্ষণ যখন আমাদের দ্বারা দেহের উপনীত করে তখনই আমরা জীবনের সত্য পরিমাপিত বৃষ্টিতে পারি; তাহার পূর্বে শুধু অজ্ঞান এবং অস্পষ্টতা হইতেই আমরা রহস্য-মঞ্চকে একটা জীতিমাণা ধারণা করিয়া বসি। মানবজীবনে মৃত্যুটাই যে সব চেয়ে বড় সত্য তাহা নাও হইতে পারে, হেতু বাঁচিয়া থাকার মূল কোন একটি রহস্য সত্য রহিয়াছে। (২) স্বতঃবা মৃত্যুকে নিষিদ্ধ মনে না করিয়া, মানব জীবনের অজ্ঞাত কারণ বলিয়া মনে রাখাই আমাদের উচিত। কিছুই জানিয়া বসিয়া, অদৃষ্টকে শূন্য বলিয়া মনে করা অসঙ্গত এবং সেই ধারণার বশে পিতৃ-জীবনের মত জীবন বাণন করাও অসঙ্গত।

'জগৎ রাজ্য' (Kingdom of Matter) প্রসঙ্গে মেটোরলিক বর্তমান জগতের আদর্শ আলোচনা করিয়া মানবজাতির ভবিষ্যৎ আদর্শের দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি বলিতে চান যে মাঝে মাঝে প্রাণ-বিশিষ্ট জড়বস্তু (২) এইজন্ত তাহার আদর্শ দুইটি ভিন্ন দিকে তাহার প্রাণশক্তিকে আকর্ষণ করে, এক দিকে 'দৈহিক ভোগ বিলাস, দেহের চরম বিকাশ ও বিলাস, আর দিক আধ্যাতিক বা মানসিক উন্নতির আদর্শ তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে। মানবীয় আদর্শ প্রথমটিকে কাটাঁয়া উঠিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞান আজ যেন কতকটা সন্ধান পাইয়াছে যে মানব প্রাণের সত্যকার গতি, প্রবলতার আকর্ষণ কোন দিকে। যুগযুগান্তের চলাপের পর মানবপ্রাণ বুদ্ধিধার (intellect) চরম বিকাশকেই তাহার লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। (৩) আজ

1. Bur. Temp. p. 121.

২. ইংসেনের Ghost নাটকখনি বিশেষভাবে এই পিতৃজন্মের বিদীর্ণকারণ ট্রাজেডি। তা ছাড়া ইংসেনের নাটকের বহু দৃশ্যই

পিতৃজন্ম বস্তুকে নিষ্পন্ন করে দেহধারার চেষ্টা করিয়াছে।
3. Bur. Temp. p. 153 "that a sovereign Judge, a godless of the species, is for ever watching our actions..."

1. Bur. Temp. p. 158.

2. Bur. Temp. p. 171 "We are, after all, only fragments of animate matter."
3. Bur. Temp. p. 177 "To-day, however, it clings with ever profounder conviction, to the human intelligence."

5. Bur. Temp. p. 58.

6. Bur. Temp. p. 63 "It may be that there passes, unperceived of us, to our right or our left, an illimitable injustice that spreads over three-fourths of our life."

2. Bur. Temp. p. 75-6.

3. Bur. Temp. p. 78.

4. Bur. Temp. p. 87. And of ideas it (species) has only one, which is that it wishes to live.

মানবজাতির সাধনার লক্ষ্য হইতেছে, বুদ্ধির দ্বারা গুরুত্বিত রহককে অনায়াস করিয়া তাহার শক্তি-কোষটিকে আশ্রয় করার। (১) মোট কথা এই যুগটি ভৌতিক শক্তির, প্রকৃতি ভয়ের যুগ। কিশোরী বুদ্ধি, ছাত্রবল এবং জেমসবুর্গের ও অমীম সৌন্দর্যবোধ—জানাহৃদয়গ্ৰহণ মন এবং প্রেমাত্মক ভাব ইহাই আজ মানবজাতির আশ্রয় হওয়া চাই। (২) ভক্ত ভগবতের বিলাস আনে বার্ককা, দৌর্যোগ এবং অবসাদ, কিন্তু মনোভগবতে, চিত্তার ভগতে, বুদ্ধির ভগতে বিলাস আনে যৌবন, শক্তি এবং উৎসাহ; ভক্তভগবতের নাতাল সত্যকে ডাকিয়া আনে, আর—মনোভগবতের মাতাল, উৎসাহকে জানাহৃদয়কে এবং বিশ্বের পাপল মাতাল বাচ্চিয়া থাকে, জীবনে আরও ভরসা উঠে,—তাইটি বিভিন্ন আদর্শের পার্থক্য এইখানে। (৩) মানবজাতির ভবিষ্যৎ লক্ষ্য এই মনোভগবতের দিকে। এই ভক্তই মানবজাতির নীতির মধ্যও পরিবর্তন অবস্থান্তর। যাহাতে মানবজাতির কল্যাণ, যাহাতে মানবজীবিত তাহার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারে তাহাই মানবজাতির নৈতিক আশ্রয় হইবে। সমগ্র জাতি সমষ্টিগত ভাবে তাহার আশ্রয়ভগবতের দিকে আকৃষ্ট প্রয়াস না করিতে পারিলেও, উচ্চতর নৈতিক আশ্রয়টি সমষ্টিগতভাবে অল্পস্বত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন; কারণ আদ্যদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে বিশ্বমানব একটি বিশিষ্ট সত্তা। (২) সমগ্র ভগবৎ নিম্নতর

নৈতিক হাওয়ায় বিচরণ করিবে আর মানবজাতির কয়েকটি বিশেষ বাক্তি উচ্চতরের নির্মলতা উপভোগ করিতে থাকিবে ইহা অসম্ভব। (৩) সমগ্র জাতির অবনতি ব্যক্তিবিশেষের উর্দ্ধগতির পথে বিপুল অসুখার; মহাপ্রাণের আর্জিও সমগ্র জাতির নৈতিক সহায়তার প্রয়োজন। (৪) জাতির এবং ব্যক্তির মনগঠনে, তাহার নৈতিক চরিত্র গঠনে যাওয়ার প্রচণ্ড প্রভাব বহিয়াছে। (৫) মেটারলিকের মতে নিয়ামিব-ভোজন মানবজাতির নৈতিক বিশেষের বিশেষ উপযোগী এবং মাস এবং মজ মানবজাতির উদ্দেশ্যের সিদ্ধিগণে গুরুতর অসুখার। আশা করা যায় মানবজাতি এই অসুখার কাটিয়া চলিবে। ইহাও মনে হয় যে বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে প্রাণ-ধারণের জন্ত, মানবজাতিকে ভবিষ্যতে অতি অল্পমাত্র আহার স্বীকার করিতে হইবে; তখন মানবজাতি একটি অতিবাস অবসর যুগে উপনীত হইবে। মানবজাতির সেই অবসর কেমন করিয়া কাটিবে তাহা নির্ভর করিবে জাতির সভ্যতার অবস্থার উপর। এখনও মানবজাতি অবসর গ্রহণের কোন পথ পায় নাই। এখন দেখা যায়, কব্দের চেয়ে অবসরই মানবকে অসুখ করিয়া তোলে। আশা করা যায় মানবজাতি এ সমস্যাও সমাধান করিয়া লইবে। জীব-বিজ্ঞানের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে অতীতযুগের বিপুল জীবরাজ্য বিলম্বই লগথৎ উচ্চতর শ্রেণীর জীবের বাসযোগ্য করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। আমাদের আদ্যদের-শক্তির কিঙ্গা দ্বারা জড়বস্তুকে এক অভিন্ন পরিণতির পথে লইয়া চলিয়াছি; নিশ্চয়ই এই

৩। এই গ্রন্থকে কিসম্বাটী রীতিনীতির 'হে মোর দুর্ভাগ্য লে' যাবের করছে অদ্যদ্য' বহিবার কল্লি লগ্নি আশ্রয়িত মনে আসে।

যার তুমি নীচে ফেল যে প্রেমাবের বহিবে যে নীচে পশ্চাতে রেখেছ যার সে ভোম্বার পশ্চাতে টানিছে

অজ্ঞানের অন্ধকার
আলোকে ডাকি যাবে

প্রেমার ময়ল গলি গড়িছে সে মোর সাধন।

অদ্যদ্যে হতে হবে তাহারের সখা সমাধি।

৪. Bur. Temp. p. 183.

৫. Bur. Temp. p. 184 "for in truth all our justice, morality, all our thoughts and feelings derive from three or four primordial necessities, whereof the principal one is food."

অভিন্ন পরিণতির পথে লইয়া চলিয়াছি; নিশ্চয়ই এই পরিণতি ভবিষ্যতের কোন অবিস্মরণ আগন্তকের পথ কাটিতেছে। (১)

মাহুর মানবজাতির পথে মুক্তপ্রাণ লইয়া চলিতে চায় কিন্তু তাহার পশ্চাত হইতে তাহাকে বেন একটি ভূমিবার শক্তি নিবর্তিত মত তাহাকে টানিয়া রাখে: 'অতীত' আমাদের কেবলই অশুশোচনা, ভয় আশা এবং নৈরাগ্য দ্বারা বান্ধিয়া রাখিতে চায়, বিগত জীবন আমাদের বর্তমানের উপর একটি অপরিবর্তনীয়, অচল বোয়ার মত চাপিয়া থাকে। মেটারলিক তাহার 'অতীত' প্রবেছে তাহারই আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে মিথ্যা 'অতীত'-ভিত্তির মত এও একটি ভিত্তি-মাত্র, ইহার অস্তরে সত্য নাই। কারণ 'অতীত' মৃত মন, অপরিসংখ্য নব, সেও সজীব, সচল। আমাদের বর্তমান জীবনের পরিণতি প্রতি নিম্নে অতীতকে রূপান্তরিত করিয়া চলিয়াছে। 'অতীত' বাস্তবিক কি ছিল এবং ছিল না তাহার উপর আমাদের জীবনের কোন কিছু নির্ভর করে না। আমাদের জীবনে 'অতীতের সত্য' এবং প্রভাব ততটুকু সত্য ততটুকু সে আমাদের বর্তমান জীবনের রহিয়া গিয়াছে: এই থাকিয়া যাওয়া মানে দৃষ্টিরূপে থাকা নহে, কতকগুলি নৈতিক প্রতিজ্ঞার-রূপ ধারণা থাকা। নৈতিক প্রতিজ্ঞার নাকেই 'অতীত' সজীব এবং আমাদের জীবনে ক্রিয়ানীল। আমাদের নৈতিক জীবনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এই সন নৈতিক বিজ্ঞাও পরিণতি হইতে বাধ্য। যে এখনও পাপপত তাহার নিকট 'অতীত' পাপের প্রতিজ্ঞা এক ভাবের, আর যে আজ পাপের উর্দ্ধে তাহার নিকট 'অতীত' পাপের প্রভাব অজ্ঞানের, একজন পাপের দিকে আরও গড়াইয়া পড়ে, যার একজন উচ্চতর নৈতিক ভূমির দিকে চলিবার শক্তি ও হাঙ্গ পাশ। এই ভক্তই 'অতীতের দিকে চোখ ফিরাইতে চাইল' আমাদের শ্রেষ্ঠতম শক্তিবিশেষ মুহূর্ত্তই 'অতীতের দিকে চাওয়া উচিত। বাহিরের দিক দিয়া বিচার করিতে

পেলে বলিতে হয় যে অনেক সময়ই 'অতীতের প্রাকৃতিক প্রতিজ্ঞা' প্রতিজ্ঞা হইবার নয়; কিন্তু অস্তরের দিক দিয়া 'অতীতের বাদন' সেই মুহূর্ত্তই শিথিল হইয়া যায় বদনই 'আমরা' 'অতীতের জীবনকে একটু উচ্চতর ভূমি হইতে অবলোকন করিতে পারি। মানব 'আপনার মানবশক্তির বলে' 'অতীতকে, আপনার নিত্যকৈ পরিবর্তিত করিতে পারে' (১)।

'অবজ্ঞ' 'কপাল' বসিয়া 'ভাগ্য' বসিয়া একটা বস্তু যে মানবজীবনে কীলা করিতেছে তাহা মেটারলিক স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু 'তা'হা সত্য বলিয়া তিনি একথা বলিতে চাহেন নাই যে মানবজীবন 'কপাল' নামীয় কোন বহিঃশক্তির 'অদীন'। দেখা যায় বটে যে কাহারও জীবন কেবলই দুর্ভবের তাড়নায় তড়িত, আবার কাহারও জীবন সৌভাগ্যের 'পর্শে' সম্বল। ইহার মূল একটা কারণ বহিয়াছে; হৃদৈব, হৃদৈব মানবকল্পনার সৃষ্টি নহে। কিন্তু এই কারণ কোন বাহিরের নিরালম্ব শক্তিও নহে উহা আমাদেরই 'অস্তরের গোপন শক্তির কীলা, এই মতটিই 'মেটারলিক' পোষণ করিতে চান: 'অবজ্ঞ ইহা একটা 'খিওরি' মাত্র তাহা তিনি স্বীকার করেন। তিনি বলেন যে যুক্তি এবং ইচ্ছার বশে আমাদের যেটুকু জীবন চলিয়াছে, তাহাকে ছাড়িয়াই আমাদের আর একটি গভীরতর জীবনধারণ, আমাদের মনোভবনলোকে 'অজ্ঞাতমূর্ষ' বহিয়া চলিয়াছে। তাহার নিকট 'অতীত' এবং ভবিষ্যৎ নাই, যাহা হইয়াছে এবং হইবে, সবই তাহার নিকট নিত্য বর্তমান, প্রাকৃতিক ভগবতের কোন ঘটনাই তাহার দৃষ্টির অতীত নহে। (২) সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের বখা 'বৃথিতে হইলে' আদ্যদিগকে এই গোপন-জীবনের কথা ভাল করিয়া জানিতে হইবে। আমাদের অক্ষজীবনটি দৃষ্টির

1. Bur. Temp. p. 218. "We are well aware that what destiny has given and what destiny holds in reserve, can be revolutionised as utterly by thought as by great victory or great defeat."

2. Bur. Temp. p. 250. "Within us, underlying the conscious existence that our reason and will control, is a profounder existence one side of which connects with a part beyond the record of history, the other with a future that thousands of years cannot exhaust."

অতীতবৃণ হইতে চলিয়া আসিয়াছে—ইহা অসীম, বিধ্বজনো এবং বোধ হয় মরণাতীত (২)। বুদ্ধি দিয়া এই জীবনকে জানা যায় না, কারণ বুদ্ধি এই জীবনের উপরের একটি উচ্ছল শিখাভাগ (৩), এই মানবের গোপন অস্তরাত্মার শক্তি যেন দেশকালের অতীত তেমনি জড়শক্তিরও অনবীন : এই জড় ইহার শক্তির অতীত কিছুই নাই (৪)। আমাদের গোপন-চেতনার জীবন অহরহের বলিয়া ইহার সহিত বুদ্ধির কোন সাক্ষাৎসম্পর্ক নাই। বাহিরের ঘটনা অক্ষয় নিয়তি-নির্দিষ্ট : কিন্তু গুপ্ত চেতনার নিকট এই সব ঘটনা বস্তুমানেরই মত প্রত্যক্ষ। তবে যে যেহেতু এই ঘটনার হাত এড়াইতে পারে না তাহার কারণ এই যে কাহারও কাহারও গুপ্তচেতনা জাগ্রৎ ক্রিয়াশক্তি লাভ করিতে পারে নাই। বাহ্যের মধ্যে এই গোপন চেতনা ক্রিয়াশক্তি লাভ করিয়াছে তাহারা পূর্ষ হইতেই দৃষ্টান্তের যান কাল জানিতে পারিয়া তাহারিগণকে এড়াইয়া যায়। অংগ এ জানিতে পারা মানবের বহিঃকর্ণের চেতনার সহিত সম্পর্ক রাখে না। সূত্রাং সৌভাগ্য দৃষ্টাংগের জড় দ্বারা মানবের গুপ্ত চেতনাই বাহিরের গ্রহনকর নহে, গগনচাটী দেবতাও নহে। এই জড়ই আভিকার সমগ্রা হইতেছে এই যে

2. Bur. Temp. p. 251 "Within us is a being that is our veritable ego, our first born immortal, illimitable, universal and probably immortal."

3. Bur. Temp. p. 251 "Our intellect which is merely a kind of phosphorescence that plays on this inner sea, has as yet but faint knowledge of it."

4. Bur. Temp. p. 252 "It is familiar with all things, there is nothing it cannot do"

মানবের এই গোপন চেতনাকে গোপন জীবনকে জাগ্রত করিয়া ক্রিয়াশীল করিয়া তুলিতে পারা যায়, না, ইহাও নিয়তি-নির্দিষ্ট (১)। হয়ত মানব একদিন এই শক্তিকেও আপন নার শক্তি বসিয়া বুদ্ধিতে পারিবে এবং এই শক্তিকে আপনার কয়লায় করিয়া জীবনের উপর পরিপূর্ণ জয়লাভ করিবে।

'গোপন মন্দির' বৈখানির বিদ্যুত আলোচনা করিয়া আমরা তাহার ভাবধারাটির গতি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। 'দীনের সম্পদের' মাঝে মেটারলিক তাঁহার চিত্রের যে অস্থায়ীটির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার সহিত তাঁহার জীবনের এই অধ্যায়ের স্বাতন্ত্র্য কোথায় তাহা দেখানও এই বিদ্যুত আলোচনার একটি উদ্দেশ্য। 'দীনের সম্পদে' মেটারলিক চিত্রের গভীর অহুভবময় কবি—তাঁদের আবেশে দ্বন্দ্ব তাঁহার যেন মাতোয়ারা, কোন্ গুহ্র অতীন্দ্রিয় শোকের আনন্দাহুতি যেন প্রত্যেকের তুলনাপ্রদত্তা মিষ্ট বায়ু মত তাঁহার চিত্রের উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। কিন্তু 'গোপন মন্দিরে' মেটারলিক সত্যাহুতদাননিরত দার্শনিক—অহুতীর আনন্দ এখানে পরোক্ষ। চিত্রার দ্বারা জীবনের রহস্যটিকে ধারণা করিবার চেষ্টাই এখানে তাঁহার বিশেষ সাধনা। বৈজ্ঞানিক সত্যাহুতদ্বিংশা এবং দার্শনিক জ্ঞানসুহাই এই যুগের মেটারলিকে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

ইহার ফলে তাঁহার নাট্যহস্তিও যে স্বতন্ত্র পথে প্রায়গ করিয়াছে, এবার আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

1. Bur. Temp. p. 268. "We ask ourselves, therefore, whether self-consciousness, which we regard as the source of our luck, is really incapable of change or improvement"

পূর্ষ প্রকাশিতের পর

ব'লে শ্রাঙ্গোনের গেলো চুমুক দিয়ে চাং বলুতে লাগল : "পোনে চীনাছবির তেমন আমার নেই—দাঁড়িয়ে বোনার কখনো কদাচিত্ত আমার পাঠানো প্রকট ছবি বিক্রি করিয়ে দিয়ে কিছু টাকা পাঠাতে—ধরতে গেলে তাতেই কোনমতে দিন গুজরান হ'ত আমার।—কিন্তু সে 'আহও ক্রমে ক'মে এল। ফলে শেষটায় এত দুখে পড়তে হ'ল যে সত্যিই অন্যায়ের কাটতে হ'ত সময় সময়। উপায় না দেখে অবশেষে নানা বাজে ছবির কপি ব্রু করলাম—জীবিকার জন্তে। ভাবতে পারো?"

খপনের মুখ দিয়ে অস্পষ্টধরে বেরিয়ে গেল : "বেচারী!" —"না। আমার জীবনের এ-অম্বারাটা সত্যিই ছিল অভ্যস্ত চিত্তাকর্ষী। এই সব চাপকটের মধ্যে জীবনের যে-সব চিত্র দেখেছি—স্বন্দর ও অসুন্দর—সে সব হাত আমার চিরদিনই অজ্ঞাত থেকে বেত যদি প্রাচুর্যের মধ্যেই বরাবর আমার দিন কাটত। তাই এজন্তে আমি দুঃখিত নই। কিন্তু ফের গবেষণা এসে যাচ্ছে।" ব'লে ব্রু বদলে চাং বলুতে লাগল :

"দিক্ এই সময়ে আমার দেখা ইসার সঙ্গে। আমি প্রাণো মুন্সিয়ানে ব'লে ভেলায়ের বিখ্যাত "বয়নরতা"-র কপি আঁকছি এমন সময়ে দেখি পিছনে—সে। দেখতেই চিন্তলাম। তার পিছনেই রন করিয়ে। তিনি আমাদের আশা করেছিলেন।

"ইসাবেলা একটু অগাধের পরেই বলল : "ভুলাম আপনার কাছে কয়েকটি চীনা ছবি আছে। আমি বড় ভালবাসি চীনদেশের ছবি। আমাকে দেখাতে আপত্তি আছে কি?"

"আমি মৃগলে পড়লাম। আমার গ্যারেটে জেনেরাল সেরানোর মেয়েকে আশতে বসুতে লজ্জা করল। প্রতি শিল্পীর মধ্যেই একটি snob আছে জানো তো"—দন

দৌল

প্রদীপীকুমার রায়

করিয়ে বুললেন। তৎকথায় ইসাবেলাকে বললেন : "আমার ওখানে কাল আসবেন—স্তর ছবিগুলি আমার ওখানেই আছে।"

"আমার মনটা ক্লান্ত হ'য়ে উঠল। তারপর দিন দন করিয়ে ইসাকে ও আমাকে চা খাবার নিমন্ত্রণ করলেন তাঁর ওখানে।"

চাং বলুতে লাগল : "তারপরে ইসার সঙ্গে দীয়ে দীয়ে কেমন ক'রে যে প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হ'ল, প্রীতি বন্ধুত্ব ও বন্ধুত্ব প্রেম—স্বপ্নাশ্রিত হ'ল সে-সব আজকের বর্নীর বিষয় নহ। এ-সঙ্গে মারিয়ার কথাই শুধু বুলি আচ্ছ।"

চাং বলুতে লাগল : "মারিয়া প্রথম থেকেই একে বিষয়কে বেপুল ভাদের ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণে সেই বিকলে। প্রথম কারণ—অপ্রচলিতভাষাধিনী উদীয়মানাকে কোনদিন কমা করতে পারে না, দ্বিতীয় কারণ—বোধ হয় বলুতে হবে না?"

—"না।"

"টেবিল ঘুরে গেল যাকে বলে। অর্থাৎ এবার 'আমার' প্রতিশোধের পালা—বুঝতেই পারছো? এং আমি প্রথম দিকে নিচুর ভাবে মারিয়াকে বেদনা রিতে ব্রু করলাম। সপাশ, অস্বাভাবিক, বোহাঙ্গ দন করিয়ে চোকারী অবস্থা কিছুই জানুতেন না—তিনি আমাকে ও ইসাকে তাঁর ওখানে প্রাইই ডাকুতেন। ও—বলুতে ভুলেছি—ইসা আমার ছতিনটি ছবি বিক্রি ক'রে দিয়েছিল, একটি নিজেও কিনেছিল। তাতে আমার পক্ষে একটু মাথারি গোছের হোটেলের আশর নেওয়া সম্ভব হয়, এবং পারিত্রিক না বাক্—অন্ততঃ অন্যায়ের যরণার থানিকটা নিরসন হয়।

"ক্রমে ইসাবেলা আমার হোটেলের ঘরেই দোজা আগা ব্রু করল। জেনেরাল-সেরানোর উচ্চতা মেয়ে সে—

বোকের নিন্দা-প্রশংসা ছিল তার কাছে হাসির বস্তু—
কেবলই এই এক বিষয়ে পিতাপুত্রীর গাধী মিল ছিল।”

চাং বলতে লাগল : “মারিয়া এবার প্রায় তেরো পড়ল।
মুখে অবঙ্গ সে কিছুই বলত না—কিন্তু তার মান মুখ দেখে
শেখোয়ার আমার দয়া হ'ল।—বিশেষ করে এইজন্মে যে তার
প্রতি টান আমার তখনো অস্ত্র বায় নি। ইসার প্রতি
আমি হীরে হীরে আকৃষ্ট হচ্ছিলাম সত্য—কিন্তু মারিয়াকে
ঢের বেশি ভালোবাস্তাম এ-ও সমান সত্য।”

—“শুধু কি ভালোবাসা?”
—“না। নারীর মধ্যে বতরিন যৌবনের অন্তরাগের শেখ
ছটা-টিও খেলে ততদিন সে একটু ইচ্ছা করলেই পুরুষ-পতনের
কাছে দীপশিবা হয়ে উঠতে পারে। যৌবনের প্রত্যঙ্ক-
নয়নও তার এ-কন্ড-অধিকার সে বঞ্চিত হয় না; যুগোপের
বসন্তগোপালির মতন—আলো ভূঁই ডুবু হ'য়েও ডোবে না।
তার ওপর মারিয়া ছিল স্বন্দরী—বেশভূষার পারিপাট্যও
অসামান্য। সে আমার ডাক দিত—শুধু তার স্নেহে নয়—
বেহেও। অঞ্চ এ ডাক নিজেই বৈহিকও নয়। মনের
মধ্যে দেখানোই একটু মঙ্গলকর্ষণ থাকে সেখানেই ইন্দ্রিয়ের
নিমন্ত্রণ সরস হ'য়ে ওঠেই—ভূরিভোজনের উপাদান না
থাকলেও।”

চাং অমনমনভাবে একটু ধামস—যেন কোনো স্থির মন্দ
গতিতে। পরে বলতে লাগল : “কিন্তু তবু বশন, এমনি
আমাদের প্রবৃত্তি যে ইসাবেলার সঙ্গে একটু সখা হ'তে
না হ'তেই মারিয়াকে কেমন যেন নিমন্ত্রণ ক'রে তাকে সন্তপা।
টিক নিমন্ত্রণও না। তার আকর্ষণী শক্তি উজ্জ্বলই ছিল—
তবে কি-রকম জানো?—এক-একটা অস্থর আছে না,
যার মধ্যে তেঁস্তাও পায় অঞ্চ বেশ বোঝা যায় কল খেলে
কোনো শান্তিই আসবে না।”

—“বেশ বলছে এবার?”
—“বলেছি—কারণ এ আমি অস্থর ক'রেছি বহুবার।
আর শুধু যে মারিয়ার সম্বন্ধে তাই নয়—নানা শেষের সম্বন্ধে
—নানা ঘরে। কিন্তু আর নয়—এবার শেষ অস্থরের শেষ
দৃষ্টি বলে বসিকটা ফেলি।—সেই রাতিটির কথা—যা
জীবনে কোনো দিন তুলব না।”

ব'লে শ্রাশ্রোনের গোলসটি নিঃশেষ ক'রে সরিয়ে রেখে
চাং বলতে লাগল : “সেদিন সকালেই ইসাবেলো আমার
অস্থরোপ ক'রেছে তার শিশুর সেক্রেটারির পদ স্বীকার
করতে এবং তেবেদিয়ে আমিও রাজি হ'য়েছি। কেননা তা
বোধ হয় বলতে হবে না?”

—“ইসাবেলার একটু কাছে আমার জেছে?”
—“হ্যাঁ। তাছাড়া এ তিনমাস দারিদ্র্যের সঙ্গে অশ্রান্ত
যুদ্ধ ক'রে একটু বিলাসও চাইছিলাম। আশেপাশ বিলাসে
মাছুষ আমি—এ অপরূপ স্বন্দরী। মাছুষ শুধু বীর নয়—
কাপুরুষও। স্ত্রী নয়—প্যারাসাইটও।”

রূপন হেসে বলে : “কাকে বলছ চাং?”
চাংও হাসে, বলে : “তা বটে—তোমার সোনার-
চমচমে মুখে ভঁজ। তবু এটা বললাম দেখতে যে আমি
মাত্রোপ শিশুর কাশোবাগা মচও প্যারাসাইট
হ'তেও যে কম ভালোবাসি তা নয়। কারণ যখন সত্য
পরীক্ষায় পড়লাম তখন বিলাসের জেছে চান্দ্রিও স্বীকার
ক'রেছিলাম—বিশেষ এমন একটা অক্ষর চান্দ্রি—
যার সঙ্গে ছবি-আঁকার কোনো সম্বন্ধই নেই। যাক। যা
বলছিলাম।”

“মারিয়া কোথা থেকে খবর পেয়েছিল জানি না—
সেদিনই সন্ধ্যাবেলা বাহু হ'য়ে আমার ঘরে এসে হাজির।
আর টিক এমনি সময়েই এলো যে-সময়ে ইসাবেলো আমার
ঘরে থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি ইসাবেলার জেছে বোর
গলবেই দেখি সামনে মারিয়া।

“ইসাবেলো তাকে বিবাহ দস্তাবেজ করল—কিন্তু সে উত্তরও
দিলা না, আমার ঘরে ঢুকেই ইসাবেলার ঘুরে ওপর আমার
ঘরের বোর বন্ধ ক'রে দিয়ে বলল : “তুমি নাকি ছবি-
আঁকা ছেড়ে মোগাহেবি-পদের কাজ দখখাত ক'রেছ?”

“অজ্ঞ সময়ে হ'লে আমি রাগ করতাম—কিন্তু আজ
আমার মনে কেমন যেন করণা এল। মারিয়ার মুখ রান,
নয়নে অশ্রুভাবিক ভ্রোতি, চোখের পাতা ঈষৎ
স্ফীত। গভ্র হ্রতিন মাস ধরে গরম গরম যে নানা
অচ্ছাদ্য বিলাসের-ইপিতে কত জুখ দিয়েছি হঠাৎ মনে
প'ড়ে গেল এক ভোটে। শান্ত স্বপ্নেই বললাম :

‘মোগাহেবির নয়—সেক্রেটারির পদ।’ আর দরখাস্ত করিনি
তার জেছে—ইসাবেলো নিজে অস্থরোপ করতে এসেছিল।’
মারিয়ার চেখচটি ইসাবেলার নামে জলে উঠল, সে বলল :
‘অস্থরোপ? কাকে ভালোজ্ঞ চাং? আমি সবই জানি।’
‘আমি বললাম : ‘কী জানো?’ মারিয়া বিজ্ঞপের হর ধরল :
‘যে কেন তোমাকে ওরা চায়?’ আমি বললাম : ‘ওরা
করা? আমাকে সেক্রেটারি হিসেবে চান তো একা
জেনেরাল সরানো।’ জানুতাম অবঙ্গ কথাটা সম্পূর্ণ সত্য
না। মারিয়া বলল : ‘কেন এ প্রবন্ধনা চাং? আমি কি
জানি না যে—’কথাটা সে অসমাপ্তই রেখে দিল। আমি
বললাম : ‘কী জানো মারিয়া? যদি এমন কিছু জানো
যা আমার জানলে ভালো হয় তবে বলাই তো ভালো।’
আমি যদি তা বলার মতন না হয় তবে মিথ্যা মিথ্যা কেন
নিজে তা নিয়ে গুণ পাছ? তার ঠোঁট এবার কেঁপে
উঠল থর থর করে, বলল : ‘গুণ পাই তো তোমারই জেছে।
তোমাকে ওরা কী ব'লে? তোমার মতন শিল্পীকে বার—
বার—সেক্রেটারির পদে বাহাল করতে চায়?’ আমি
একটু নরম স্বরে বললাম : ‘বোসো না মারিয়া—শাড়িয়ে
কেন?’ সে যাবৎ একটু ডাইতানে। আমি তার পায়ে
বললাম। বললাম : ‘কী হ'য়েছে বল না।’ সে মুখ ফিরিয়ে
বইল। আমি বললাম : ‘আমার ওপদু রাগ করছ কেন
মারিয়া? বলা তো, সেক্রেটারির পদ নিয়ে কী-এমন
অস্ত্র্য করছে যে আমাকে মোগাহেবি বলতে পারলে?’
মারিয়া আমার ঠিকে ভালো, বলল : ‘ব'লতে কি পারো
না কত জুখে ব'লেছি? তুমি কি না শেখোয়ার ছবি আঁকা
জেছে সেক্রেটারি হ'তে চলে জেনেরাল সরানোর মতন
জব্বল চরিত্র লোকের?’ আমি বললাম : ‘কিন্তু ছবি-আঁকা
আমি ছাড়ব একথা ক'রে বলতে তোমার? ইসাবেলো এইমার
আমাকে ভরসা দিচ্ছে যে জেনেরাল সরানোর সেক্রেটারি
হওয়া মানে কোনো কাজই নেই। তাই ওপদে বাহাল
হ'লে আমি অজ্ঞ অবসরই পাবো—জীবিকার জেছে অস্থর
পারজ ছবি কপি না ক'রে নিজের ইচ্ছানুযায়ী ছবি আঁকতে
ব'লেছি।’ মারিয়া বলল : ‘কিন্তু বিজ্ঞানেই যে ওপদে
কোনো কাজই নেই তবে তার জেছে টাকা নিতে চায় কেন?’

অঞ্চ আমি যখন সাহায্য করতে চাই তোমার আত্মসংধান
বাধা দেয় তা গ্রহণ করতে।’ আমাকে বাঙ্ল, মারিয়া
টিক জারপাটাই ছুঁয়েছিল বই কি। মুখে কিছু এ-এমের
উত্তর এড়িয়ে কথার-চাতুরী ধরলাম, বললাম : ‘তুমি তো
দন কবিয়াগের মত নিয়ে সাহায্য করতে আসো। আমি মারিয়া
যেমনো। তাকে কি আমায় টাকা-দেওয়ার কথা বলতে
পারো?’ মারিয়া এ কথায় কেঁপেঠো হ'য়ে উত্তর স্বর ধরল,
বলল : ‘মিছে আমাকে এ সব কথা বলতে লজ্জা করে
না তোমার?’ তুমি কেন ওপদে নিতে যাচ্ছ তুমিও জানো
আমিও জানি। তবে কেন মিছে—ব'লেই সে থেমে গেল।
আমি এবার একটু শুক স্বরে বললাম : ‘মারিয়া, যে-লোক
দারিদ্র্যের মধ্যে প'ড়ে যুগছে সে যদি একটা চাকরি পায়
তবে যে তা নিতে গেলে তার এতটা কৈফিয়ৎ দেবার
প্রয়োজন আছে, আমার মনে হয় না।’ মারিয়া তার একটু
নামিয়ে বলল : ‘আমি তোমার কৈফিয়ৎ চাইতে তোমার
কাছে আমি নি তা তুমি বেশ জানো। আমি এসেছিলাম
তোমাকে সাধবান ক'রে দিতে। কিন্তু দেখছি তা নিফল।’
আমারও রাগ একটু পড়ল তার নরম স্বরে, বললাম : ‘সাধবান
কিসের জেছে? বলই না।’ মারিয়া বলল : ‘হিলালোকে
তুমি জানো না, এহ কথা বলতেই এসেছিলাম। ও নিঃস্বাধ
ভাবে তোমার উপকার করে নি।’ আমি অবঙ্গ বুকেছিলাম
যে হাওয়া এই ঠিকে বইবেই শেখোয়ার। তত শান্ত স্বরেই
বললাম : ‘কেমন ক'রে জানলে?’ মারিয়ার ঠোঁট দুয়ার
কাঁপা হ'ল, বলল : ‘মারিদ্র হ'লো কানে।’ ওর স্বকণ
পুরুষ দেখলেই টোপ ফেলা।’ এবার আমি ঈষৎ ঝাঁকালো
স্বরে বললাম : ‘ইসাবেলোকে আমি বোধ হয় তোমার চেয়ে
একটু বেশি জানি। তাছাড়া একজন ভদ্রকন্ডার সম্বন্ধে
ও টোকে কথা না বললেই বাখিত হব।’ মারিয়া এবার
টিক কঠে ব'লে উঠল : ‘বড় দরজা যে।’ আমি বললাম :
‘ভদ্রকন্ডার সম্বন্ধে কুংসা শুনতে না-চাওয়ায় নাম যদি দরজ
হয় তবে তাতে বোঝ দেখি না। অস্থর : কন্ড কুংসা
রটানোর চেয়ে দরজ দেখানো ভালো।’ মারিয়া
আহত স্বরে বলল : ‘কন্ড কুংসা!—বলতে পারলে—
এতদিন আমাকে দেখে? আমি কি মিথ্যা মিথ্যা কারণ

চরিত্রে কখনো—তার ঠোঁট ঠাঁতে চেপে সে চুপ করে গেল। মুখ তার বেগলো খড়ির মতন শাদা। আমি কথাটা বলেই ভুল ব্লেঞ্চিলাম, কারণ ব্লেঞ্চি মারিয়ার পরে আর রাগ আমার এতটুকু ছিল না, ছিল শুধু নির্বিড় ককণা; বললাম: 'আমাকে কমা কোরো মারিয়া—আমি ক্ষত বশেছি।' মারিয়ার চোখে এবার জল উল্লেছে পড়ল, কিন্তু সে আশ্চর্যস্বপ্ন করে বলল: 'শুধু এই জন্মেই কমা? তুমি কি জানো না—কেন—' বলে গেলো ব্লাইসের হাতের চোপ মুখে জলে: 'এতদিন কি তুমি আমাকে কিছুই চেনো নি—যে আমাকে এত হীন ভাবতে পারলে?' আমি তার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললাম: 'তোমাকে হীন আমি কোনোদিনই ভাববো না মারিয়া। ওজাড়ো তোমার স্বপ্নে আমি কোনোদিন অশ্রুতে পারবো না।' সে চাপা-অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে বলল: 'তাহলে ওদের সঙ্গে যাচ্ছে কেন?' আমি বললাম: 'মারিয়া, জানো কালকে হোটেল বিলের টাকা দিতে হবে ও আমার কাছে শুধু দুটো পেসেতো? তুমি তো সবই জানো আমি কত দরিদ্র।' মারিয়া এবার স্বর স্বর করে গেলো ফেলু, তার ছই বাহুতে আমার কণ্ঠ-যেমন করে বলল: 'আমি কী করতে পারি বলো, তুমি তো আমার কাছ থেকে ধারও নিতে চাও না—তুমি চাও শুধু আমার স্বপ্না দিয়ে।'।

"তার দেহ স্পর্শনাহে আমার মন বেন কেমন হয়ে গেল। মনে আছে তৃতীয়ার বাঁকা চাঁদের এককরো এসে তার তুবারতল স্বপ্নের ওঁবায় ও প্রজ্জ্বল নয় বাহুতে লুটিয়ে পড়েছিল। তার ঘনকক্ষ কয়েকটা চুর্ণালিক তার কণ্ঠ বেয়ে বৃক্কের ওপর ছড়িয়ে পড়েছিল। তার স্বপ্নের নীল রাউন্ড তার ঘন ঘন নিশ্বাসে উঠছিল পড়ছিল। আমার রক্ত নাভাল হয়ে উঠল মুহুর্তে। তাকে বৃক্ক চেপে ধরলাম। সে-ও আর থাকতে পারল না। আমার বৃক্ক মুখ লুকিয়ে শিশুর মতনই হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে দাঁড়তে লাগল: 'আমাকে কমা কর—ক্ষত বশেছি বলে।'। আমার মনের মধ্যে বেন বিশ্বের কোমলতা নির্বিড় হয়ে এল। আমাদের ওঁধার নির্মিত হল—আমার কীধের প্রথম চুখনে। সে-খার আর কখনো-পাই নি ইশাকে পেয়েও না।"

চাঁও বলতে লাগল উল্লাস স্বরে: 'মনে আছে মনের মধ্যে শুন্‌গুনিয়ে উঠেছিল।

'To hold infinity in the palm of

your hand,

And eternity in an hour.' মনে আছে

সে-দীর্ঘ লাগে ভাগ্যের প্রত্যেক প্রেমের কবির কাছেই রুমজ মনে হয়েছিল ভেবে যে প্রেমের অ-স্বীকার স্বাকর করে তারা এর দ্বারা কত বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন—'অখচ তবু'...

শব্দ তার মূখের দিকে তাকাল। ধানিকবণ কেউই কথা বলল না। বাইরে একসার রাউন্ডের মধ্যে দিয়ে একটা দমকা হাওয়া ব'য়ে গেল। চাঁও বেন কান পেতে কী শুন্‌ল তার মধ্যে।

...তারপর কি ভেবে বেন 'আপন মনেই বলে চলল: 'অখচ তবু আমার কাছ সবই মনে হয় কেন মনে ছায়ায় মনে হয় যাকে আমরা প্রেম প্রেম বলে এত উচ্ছ্বাসী হয়ে উঠি সে বৃষ্টি আলো নয়—কুহেলিকা।' অস্বস্তি অনেকখানি কৃষ্ণাশি যে তার মধ্যে আত্মগোপন করে তাকে এতখানি আত্মতন—এতখানি স্বীকৃতি দিয়েছে এ আমার বার বার মনে হ'য়েছে। ইয়ারও হয়েছে—জানি না তোমার হ'য়েছে কি না কখনো?'

স্বপ্নের মনের চক্রবালে কেমন একটা বিবাদের মেঘ ঘনিয়ে আসে, সে বেলা: 'হয়েছে—শুধু হ'য়েছে না—মাঝে মাঝেই হয়—কিন্তু কেন যে হয়...বৃষ্টি না।'

চাঁও তার কথা যেন প্রতিধ্বনি করেই বলে: 'কেন হয়?... সত্যি, কেন হয়?... কে জানে? এ-প্রশ্নের কোন উত্তরই আমি পাই নি আজ পর্যন্ত...অখচ এ আমি কতবারই না দেখেছি যে প্রবলরতম নির্বিড়তম গুণ্ডারতম আবহের অস্বীকারও জীবনের বৈদিক খণ্ডে—হুলহস্তাবলগে নির্মলক হয়ে মুছে যায়। প্রেমের স্বাক্ষরের মধ্যাং স্বাক্ষরের কাছে কতটুকু?... অখচ...অখচ কেন এমন হয়? কে বলবে?'

শব্দন বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে রইল। এক-টুকুরো মেঘ দীপাকৃতি হয়ে পলিনাকশ ছেয়ে গেছে। ...চাঁও বলতে লাগল: 'এর কত দূরীস্থ আমি দিতে পারি প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে। মারিয়ার সঙ্গে মিলনের

সেই দ্বন্দ্বীয় স্বাক্ষার কথাই নেও না। সে-বারে তাকে পরিত্যক্ত রূপে এত কাছে গোলাম তো? কিন্তু পেয়ে কোথায় সে আরও কাছে আসবে না গেল দূরে সরে। সেদিন রাতে ...বেশ মনে আছে...তাকে পেয়েছিলাম কী অবিস্মরণীয় অনন্দের উদ্ভাদনায়—যেহেতু কোমলতা। সমস্ত দ্বন্দ্ব আমার কারণ্যে, উচ্ছ্বাসে, মাদকতার ছেয়ে গিয়েছিল তো? কিন্তু তার পর দিনই ভোরে ইয়াবোনার সঙ্গে ট্রেনে হুইকল ও যাত্রা করার সময়ে সে বিচিত্র লক্ষণক ইন্দ্রধর কতটুকু রু-অবশিষ্ট ছিল?'

শব্দন একটু চুপ করে থেকে বলল: 'কিন্তু এত এত ছুখেই বা পাই কেন আমার? বলি না কেন জীবনকে সারা চোখে দেখাই ভালো—প্রাকটিক্যাল লোকদের মতন— to take life as we find it?'

চাঁও অবস্থা হাল্‌ল, বলল: 'ঐ তো ভাই। এ তো বৃষ্টির কমনসঙ্গের কথা নয়—দরদরে কথা, প্রকৃতির কথা। জলের কুঁড়ি বারা মাড়িয়ে যায়, দেখেছি তাদেরকে আমাদের দেশে অনেক পুষ্টিবিশালীরা কোনোমতেই বোঝাতে পারেন না তারা ওতে কোন বেন্দনা পায়। আমি সেই দেশের লোক। আমি হুগে পাই ভাবতে যে রক্তন মুহুর্তে প্রেমের বের-ক-শব্দ চিরঞ্জীবী ব'য়ে মনে হয়—সহজ মুহুর্ত তা যায় নিঃশেষে মিলিয়ে—কপূরেরই মতন শুধু কণিক গন্ধ বিলিয়ে। আমার বহুজ ভাবতে যে প্রেমের মিলন-লাগে যাকে এত প্রবল—এত দীর্ঘায় মনে হয়—বাক্যের ধূসর আলোয় তাকে এত পাণ্ডুর এত ভদ্রর দেখাতে পারে। প্রেমের উদ্ভাদনও যদি দৃষ্টিভিত্তি না হয় তবে সত্যতার পীঠ বলব কাকে? দাঁড়ব কাকে অহুত্বির পরে ভর্য করে?'

বেলা একটু চুপ করে থেকে বলল: 'যেখানে দ্বন্দ্ব কথা দেয় না, যেখানে প্রকৃতি স্বভাব-রূপ সেখানে তার অনৌ-বাধ্য আমি তত হুগে পাই না স্বপ্নন। আমি হুগে পাই দ্বন্দ্বের শৈবিক উচ্ছ্বাসকেও কালের তুয়ারপারের স্পর্শে নিঃশব্দ হয়ে দেখলে। নিজের কাছে নিজে চিরজীবন অতের রাগে গোলাম এ চেয়ে ছাপ আর হচ্ছে? বলতো?'

শব্দন প্রমত্ত এড়িয়ে গেল, বলল: 'তারপরে তার সঙ্গে প্রেমার আর দেখা হয় নি?'

—'না। চাঁদাং বাবে নানা দেশ ঘুরে বখন জেনেরাল সেরানোর সাথে মারিকে ফিরি তখন মারিয়া আর এ জগতে ছিল না।'

শব্দন মুহুর্তের জিজ্ঞাসা করল: 'মনোহুগে?'

—'না। সে আর এক কাহিনী—কুরিয়ো-দম্পতী ছুটিতে গিয়েছিল কাহিনীর 'রান্না উপত্যকা' বেড়াতে। সেখানে একদিন নৌকো থেকে দূর কবিয়ে হঠাৎ কেমন করে জলে পড়ে যান ও মারিয়া তাকে বাচাতে তৎপরতা রাখা দেয়। কেউই সাঁতার জানত না—কোথায় তলিয়ে যায়—হুগেই।'

শব্দন স্তম্ভিত হয়ে তার মূখের দিকে চেয়ে রইল।

চাঁও মান ভেবে বলতে লাগল: 'এ নিয়ে আমিও অনেক ভেবেছি ভাই, কিন্তু ভেবে কোনো সুপ পাই নি। শুধু এই-ই মনে হ'য়েছে যে মারিয়ার নানা আচরণ সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের প্রত্যাশা করেছে হয়ত আমার। এত বেশি যা খাই, ভুল বৃষ্টি। ধর না কেন, আমি ভাবতে ভালোবাসি সে ছিল শুধুই অতি-পারিত্য। সমাজ ভাবতে ভালোবাসে—যা ছিল শুধুই প্রতিপ্রাণ। কিন্তু আমলে হয়ত সে এ ছই-ই ছিল—কিন্তু...কে জানে?... হয়ত জয়ের একটাও না। কেন না এ-ও হ'তে পারে যে অল্প কোনো যোগাযোগে তার এমন এক তৃতীয়ক মুটে উঠে ত—না তার এছই রূপকেই অস্বীকার করে।' অখচ...কী বলব?...যে মুহুর্তে সে আমার কাছে এসেছিল সে-মুহুর্তে অভিমারিয়ার সমগ্র আত্মদান দিয়ে সে একা আমাকেই চেয়ে ছিল এ-ও আমি জানি—এং যে মুহুর্তে সে স্বামীর জন্তে প্রাণ তুলছে করে জলে রাখা দিয়ে ছিল সে-মুহুর্তে যে সে স্বামীকে একান্ত ভাবেই ফিরে চেয়ে ছিল এ-ও বিধাশ করি।'

—'কিন্তু তাহলে হুগে পাও কিসে?'

—'এই ভেবে যে তার নিজেরই ছুটা সত্য স্বপ্নের সংঘর্ষে কেন যে এত হুগে গেল? বলবে কি—ছই সত্যের সংঘর্ষে মিথ্যার সৃষ্টি হয়? না, ছই প্রেমের সম্মুখতে ওঠে শুধুই হলাহল। যদি বলো, ছই-ই প্রেম তবে প্রাণ ওঠে—ওদের বাত-প্রতিবাহিত অমৃত গুণায় বা বাধা কী ছিল?...কিন্তু হয়ত এই-ই জীবনের স্বপ্নন।'

হয়ত...না! অদৃশ্য বিবেচী শক্তিম্পন্দনেই আমাদের জন্ম—
—তাদের দ্বারা! আমরা চালিত—যেমন জন্ম হাওড়ার সঙ্গে
শ্রোতের সজ্জাতে বৃষ্ণ—যেমন চলে এছের টানে উপগ্রহ।
অথচ আচ্ছন্ন এবে যে বৃষ্ণ তাহে—সে স্বাস্থ্যমিচ্ছ।...কিন্তু
স্বাধীনতার এ চেতনাই বা তার এলো কোথা থেকে? উপগ্রহ
তাহে—সে খোয়ালী অমণালন্দেই আকাশ পথে চ'লেছে।
এ-ধারশাই বা তার হ'ল কেন? যন্ত্র-চালিত মানুষ বিচার
করেই বা কেন? তবে হয়ত এ-জীবনে নিহতির এই অঙ্গুলি-
নির্দেশে বিচারসার অবশ্য নিলক্ষ্য গতির নামই জৈবনীলা।
তোমার কী মনে হয়?"

স্বপন চিন্তিত স্বরে বলে: "আমি কেবল কোনো তল
পাই নি তাই। তাই কিছুই বলতে পারি না জৈবকীলার
রক্ত-সংক্লে—তবু এইটুকু চাড়া যে নিয়তি, নীলা, যোগা-
যোগে প্রভৃতি কথা আমার মনে করে না।" আমার মনে হয়
কোনো কিছুটা বিশা। পেলেই মানুষ ঐ ধরণের কয়েকটা স্বপ্ন-
সমূহ বুলি স্থায়ী করে পরকেও ভোলায় নিজেও ঠকায়।
ওর চেয়ে বরং তোমার সেদিনকার কথাটা আমার বেশি
কালো লাগে—যে এ-রক্তপুত্রীর চাবি আছে, কেবল
আমরা সন্ধান পাই নি এ-অবধি। তাই বেদনাকে আমি
কাবাকুশা দিয়ে ইন্দ্রধ্বজ প্রদর্শিত করতে চাই না। আমি
জানতে চাই বেদনা এলো কেন?—আমি এই প্রশ্নের উত্তর
চাই—কেন মারিয়ার মতন স্বপ্নের জীবনও শেষে এ "দুঃখ-
বহন" মতো দিয়ে বাণ্যতার মকতে বিলুপ্ত হয়ে গেল?
কবি বলেন কাঁটার গোলাপ হয়ে ফোটে। কিন্তু ও ধরণের
কপার আমার সামনে নেই। কাঁটার অস্তিত্বই আমাকে
পীড়া দেয় যে।"

চাঁচ বলল: "ঠিক ব'লেছ স্বপন। আমার জন্মের
তারেও একথা এছন্দে না হোক, এ-স্বরে বেজেছে। আর
একবার নয়—বার বার। কাঁটার গোলাপ হয়ে ফোটার
করা বলছিলো না? ও-সামনে যে একবারেই কুরো, এ বিষয়ে
যে একবারেই কুরো এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি একমত।
জীবনে কুল বহন পরম হয়ে ফোটে তখনই তো কাঁটার
প্রাণীমতা সব চেয়ে ঘন থাকে, জগতের দুঃখে বৃদ্ধের মতন
মানুষই কেপে বেরিয়ে যান—শ্রমিকের দুঃখে প্রিয়

ক্রপটিকনের মতন মানুষই কারাবরণ করেন। অর্থ
তারপর কল্পে পৃষ্টকে কুসে ফুলতে হ'ল এর সামনা কোথায়?"
ব'লে চাঁচ অস্থমন্ত্র ভাবে একটু ভাবল, পরে বলতে
লাগল: "বড় বড় কথা রেখে ছোটো ব্যক্তিগতভাবে এটা
হয়ত আরো পরিষ্কার হয়। ইসা ও মারিয়ার কথাই বেশ
না। ইসাকে তো আমি—বলে থেমে মুহূর্তের বলল:
"সত্যিই ভালোবেসেছি—তেনে ভালো। কখনো কাউকে
বাসিনি?—কিন্তু তবু একে সব চেয়ে কাছে পাওয়ার মুহূর্তেই
তো মারিয়ার কাঁটা সবচেয়ে তীক্ষ্ণ হয়ে বিদেছে! মনে হ'য়েছে,
ইসাকে আমার ভালোবাসার জ্বলে যে মারিয়ারকে দুঃখ পেতে
হ'ল এ ব্যবস্থার মধ্যে কোথাও মস্ত একটা অব্যবস্থা আছে।
নইলে একজনকে স্বপ্ন আর একজন অস্থায়ী হবে কেন?"

স্বপন বলল: "কবি বলছেন 'দুঃখ শেখায় হার্মনি—
দার্শনিক বলবেন দুঃখ শেখায় মালা।'"

চাঁচ দুঃখের বলল: "ওর চেয়ে একটাই আমার মনে
সায় দেয় না। ফুলের কলির মধ্যে মাটির ঢোকা
সাজিয়ে হার্মনির মালা পাঁখা যায় একথাও যেমন-তর কবির
স্থিতি, দুঃখকে প্রাণপণে এড়িয়ে সফলশী হ'তে হবে
এও তেমনি মালা দার্শনিকের সমাধান।"

—"কিন্তু ধর, মারিয়া যদি তোমাকে এড়িয়ে স্থায়ী
হ'ত—তাহলে?"

—"স্বপন, স্বপ্ন ও সার্থকতা কি এক? স্বপ্ন যে ঠিক
কী রকম তার বিশা আজ অবধি আমি পাই নি।
কিন্তু যদি ধরেও নিই যে মারিয়ারকে তার স্বামীর প্রেমের
বাঁচার কর্তব্যের শিক্ষায় তুলে বন্ধ করে রাখলেই সে নিটোল
স্থায়ী হ'ত—তবু একথা কখনই মানিব না যে এঁড়িয়ে চলার
পথেই সে সার্থক হ'ত।"

—"কিন্তু হ'ত না একথাই বা প্রমাণ করবে কী করে?"

চাঁচের মুখে সেই কল্পন হাসি ফুটে ওঠে: "প্রমাণ
তাই আমি কিছুই করতে পারি না; এমন কি তার ধরণের
সম্বন্ধেও কৃতনিশ্চয় হ'তে পারি না। একসময় জিল যখন মনে
হ'ত জগত বৃত্তি আমার অহমোমনকেই কেন্দ্র করে প্রাণকণ
করছে—তাই অনেক কিছু সম্বন্ধেই বিজ্ঞভাবে রায় দিতাম—
অনেক কিছুই মহা উৎসাহে প্রমাণ করতে ছুটতাম। আর



বন্দন-মোচন

শিল্পী—Sir John Everett Millais.

মুখেছি জগত আমাদের স্বপ্ন গ্রন্থের প্রমাণ অগ্রদূতের
একটুও অপেক্ষা রাখে না। সে চল তারই একটা
নিজস্ব ছন্দে, নিজস্ব নিয়মে। আমার লক্ষ্য—বাঁচাই না,
আমার লক্ষ্য—একটু স্বপ্নের পথ ক'রে চলা, এ-অস্বপ্নের
পরশে, এ অব্যাহা ধাঁধায়। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে
দু'জতে দু'জতেই আমি চলি, বে-জব্ববুদ্বো সত্য
ও স্বপ্নের কথা পাই—দেখি আমার পথচলার তারা
আলো ধরতে পারে কি না। আমার জীবনে একটু আলো
তারা ধরে বই কি—তাই তো তাদের আদর করি, কিন্তু
এতল বোধ হয় আর করি না যে তারা সবাই পথেই আলো
ধরে। কারণ আমি দেখেছি একের আকাশ নিতাই
অপরের আকাশ-স্বপ্ন হ'য়ে ওঠে। আমি শুধু এইটুকু
নার বুকেছি যে মাহুরকে জোর ক'রে বাঁচার পূর্বে
শান্তি দিতে চাওয়া কিছু না।—অশান্তির আকাশে
লক্ষ গ্রন্থ থাকলেও সেইখানেই তার স্থান—পরমরমা
স্বস্তির বাঁচার মধ্যে না। তাই আমাকে সবচেয়ে বাজে
বন্দ দেখি একের স্বপ্ন অস্ত্র হিঁক ক'রে দিতে ছোটো, সমাজ,
নীতি, দেশ, ধর্মের হাজারো অজুহাতে, মুক্তিভে, অম্মশাসনে।
চাঁও বলতে লাগল : “একটা ছিল এক বিরাট বনপতি,
নাম কিরি। একটি বাতকর তার কাঠ দিয়ে একটি অত্যন্ত
বীণা তৈরি করেন। এমন ভাবে বীণাটি নিখিত যে জগতের
শ্রেষ্ঠতম বীণাবাদী কেবল তাকে স্বরে বাগাতে পারবে। কত
বড় বড় গুণী উদ্ভূত হ'য়ে আসে কিন্তু কান্দর হাতেই সে বেজে
ওঠে না। শের একদিন এল গুণিরাজ নেইও। বীণার তারে
তারে উঠল স্বকার, আকাশ স্থির হ'য়ে শুন্ল। গীমসরাট
তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : “গুণী, কেমন ক'রে তুমি সে-
বীণাকে স্বরে বাগালে বা জগতের সব বীণাকারের হাতে
বুধ ছিল? অগুরে বা পারবে নি তুমি পারলে কেন
নয়লে?” পেইও বলল : “মহারাজ, অগুরে পারো নি কারণ
স্বারা তাদের নিজের স্বর বীণার জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিল—
আমি পেরেছি কেন না আমি বীণাকে বলেছিলাম তুমি
তোমার নিজের স্বরেই বাজো। তাই ও সার্বক
হ'য়েছে।”

চাঁও বলতে লাগল : “মাহুরের স্বপ্নে এই কথা বারবারই
আমার মনে হ'য়েছে। আমি বোধহয় কখনো ভুলব না
সেদিন রাতে আগার বুকের মধ্যে মুখ দৃষ্টিয়ে মারিয়ার সেই
চাপা কান্না—সে একী কান্না বলে? এ-কান্না সে কান্না
কেন? শুধু এই জন্তেই নয় কি যে সমাজ তাকে যে-বীণা
শড়কে চলার বিধান হ'রে দিয়েছিল সে শত চেষ্টায়ও
সে-বিধানকে মানতে পারেনি—অথচ ভেবে দেখ, সমাজের
এ-বিধান না থাকলে আমার সহবাসে অন্ততঃ সে-রাতে সে
কী আনন্দই না পেত?”

ঘরের মধ্যে বাইরের হাওয়ার কোথা থেকে বেহালার
একটা বিচ্ছিন্ন মৌড় ভেসে আসে।...তার পরই সব চূপ।...
বাইরের ঘরে ব্যাঙ কখন থেমে গেছে?...এত নিতক
লাগে!...স্বপন চাওর দিকে চায়; কিন্তু তার দৃষ্টি দূর
দিগন্তে নিবদ্ধ...দেখানে শুধু একটুকুরো আলুয়া মেঘ ধূসর
চোখে চেয়ে।...তার ভুরু উপরেই একবিন্দু পীতাক
রশ্মির টিপ।...

চাঁও বলতে লাগল : “এ আমার থিওরি নয় তাই।
আমার স্বস্তির ফলকে খোঁরা র'য়েছে মারিয়ার সে-রাতের
প্রতি কথাটি। তার মধ্যে তার দেহদানের জন্তে নিরানন্দ
একটুকু ছিল না। ছিল শুধু তর যে-কাঁটার মধ্যে
লোকমত তাকে পাকতে ব'লেছিল পাছে সে-কাঁটাগুলো
নড়জড় হ'য়ে যায়। সার্বকতা সার্বকতার প্রায় তার মনে
একবারও উদয় হয় নি—সে দিক দিয়ে কেউ তাকে ভারত
শেখানোই বা কবে?—তার মূল স্বরটি ছিল ‘ধায়, কী
করলাম?’ কেন এ প্রশ্ন তার মনে উদয় হ'ল সে-কথাও
সে ভেবে দেখেনি, এমন কি কখনো বোধহয় অহুতবই করেনি
যে তার নিজের স্বরে সমাজ তাকে ভুলেও বাজতে বলে নি—
ব'লেছিল সমাজের মনগড়া সুবিধানকর স্বরে নিজের স্বর
বেলাতে।”

হঠাৎ বাইরে একটা হাওয়া ওঠে। বৃষ্টি নামে!
বাইরের বাগানে পাতার পাতার ধ্বনিতে হ'য়ে ওঠে স্বর
তরল। স্বপনের বুকের কোথায় কি একটা উদাস তার
বেজে ওঠে যেন এ পথভোলা শব্দ!...একটা বেদনার
পূর্ণিমার...সঙ্গে নবপ্রাণির চূর্ণ আলোকা।...

চাঁৎ বিগলনের দিকে চেয়ে যেন স্বপন মনেই ব'লে চলে :
কিন্তু না। আরও একটা কথা মনে হ'য়েছে আমার। শুধু
যে সমাজই মারিয়ার হৃদয়ের জন্তে দাবী তা হয়ত নয়। মনে
হ'য়েছে হয়ত মানুষের মধ্যে একটা হীনতা—দুর্গলতার
ইসারা আছে ব'লেই সমাজ এভাবে চড়াও হ'তে পেরেছে।"

—“কী দুর্লভতা ?”

—“চাওয়ার দুর্গলতা—কাড়াকাড়ির দুর্গলতা—প্রতি-
পদে অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতকে লোভে হোক্, ভয়ে হোক্,
বানানয় হোক্—দাসের মতন অহসরণ করার দুর্লভতা—
মেনে নেওয়ার মানি।”

স্বপন বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে রইল, কোনো
কথা কইল না।

চাঁৎ বলতে লাগল : “ভানি, আমরা জীবনে বাঁচবার
জন্তে অনেক সময়ই না। জিনিষ চাইতে বাধ্য হই; মনে
করি বৃষ্টি না চাইলে বাঁচবই না। কিন্তু তবু আমার
কেন ভানি না মনে হয়—বদিও আমি প্রমাণ করতে পারি
না একথা—যে এই চাওয়ার হীনতাকে না মেনেও বাঁচা
চলে। এবং তাইহেই বৃষ্টি সত্যিকারের বাঁচা; মনে হয়
এ বদি পারতাম তাহ'লেই বৃষ্টি জীবনের চিরকুন্ডাকার নিশাঙ্ক
হ'ত। এক এক গভীর মুহূর্তে এর চাকিত আভাষ পেয়েছি
—মন ব'লেছে সঙ্গরথ হোক্, বিলাস হোক্, ভোগ হোক্,
বাই হোক্ না কেন নিজের জন্তে চাইব কেন? কিন্তু ঐ
পর্যন্ত; ওর পরের ধাপে উঠতে পারি নি। কি ক'রে
যে এ-হীনতা থেকে—জীবনের এ-লাসখণ্ড থেকে মুক্তি পাওয়া
হেতে পারে তার কোনো দিশাই পাইনি; বদি পোতাম
তাহ'লে হয়ত ব'লে দিতে পারতাম আমার ও মারিয়ার মধ্যে
এ-মেঘ-সম্বন্ধের কেন এমন বন্ধন্যার পরিসমাপ্তি হ'ল,—কেন
বাঙ্কিত সার্থকতাকে না পেলাম বিরহের মধ্যে, না মিলনের
মধ্যে।”

বাইরে বাতাস ছু ছু ক'রে ওঠে।... স্বপন টেবিলের
উপর ক্ষুণ্ণ চাঁদের একটি হাতের 'পরে হাত রাখা। হঠাৎ
মনে হয় যেন কতদিনের চেনা সাথী, দেখা পেতে না পেতে

বিদায় দিতে হবে।...বৃষ্টির ফোঁটা বড় বড় হ'য়ে পড়ে।...
দেখতে-দেখতে মেঘের কণালে বিজলির জুকুটি কিলিঙ্ক
যের ওঠে।...সপিল...আশাময়।...

চাঁৎ স্বপনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে : “আমার মনে
হয় কি জানো স্বপন ?”

—“কী ?”

—“কোথায় আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি। তাই প্রতি
পাওয়া ও চাওয়ার মধ্যে এই চির বিরোধ। তাই আজ দূর
থেকে থেকে অকারণ স্বর স্বর ক'রে ওঠে ঐ নিরাশ্রয় বৃষ্টি
বিশ্বর মতন। তাই মানুষ আঝো পাহাড় পর্বত প্রান্তর
কান্তারে ছুটে ছুটে বেড়ায় ঐ অবেষ্টি হাওয়ার মতন—দীর্ঘ-
বাসের বোঝা বৃকে চেপে। তাই তার দুষ্টির চক্রবালে
আজো রং ধরে, কিন্তু চক্রবালেনমির মধ্যে উদার রেখা
মেলে না।”

চাঁৎ বলতে লাগল : “কেবল কখনো কখনো...কেন
পূত দীপ্ত মুহূর্তে এক টুকরো রশ্মি প্রাণপণে ভেসে ওঠে
বিগলনের ঊর্ধ্বে—কিন্তু অগত্যা-জোড়া অন্ধকারের পিছুটানে
অন্ধোদয়েই ফের ভুবন যায়। এতটুকু শক্তির স্রোত বদি বা
রসনায় বইতে চায়—কিন্তু আমাদেরই মুখর শ্রীহীন কাড়া-
কাড়িতে এক লহমায় যায় বিশ্বাস হয়ে। তাই বৃষ্টি আমরা
বা চাই তা পাই না, বা পাই—গেলে দেখি তা চাই না। তাই
প্রতিপদে অনন্দ আমাদের পথ চলায় বাঁধি ধরতে পারি না,
ধরে ভয়।”

মেঘের বৃকে সুদল বেড়ে ওঠে। চাঁৎ চাঁৎ ক'রে বাজে
বারোটা।

স্বপন উঠে পাড়ায়।

চাঁৎ বলে : “কিন্তু এই জল-ঝড়ে আহাছে উঠবে ?”

স্বপন বলে : “না, টেনে।”

চাঁৎ আশ্চর্য হয়ে বলে : “টেনে! কোথাকার ?”

—“পারিসের। বারোটা পড়িশে ছাড়ে বলছিগে না ?”

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

গান

নীচ বিগ—লাটনি

নজরুল ইসলাম

বকুল-চাঁপার বনে কে মোর

চাঁদের স্বপন জাগালে।

অহুরাগের সোনার রঙে

হৃদয়-গগন রাঙালে।

ঘুমিয়েছিলাম কুমুদ-ইন্ডি

গাইন ঝিলের নীল জলে,

পূর্ণশশী তুমি আসি

আমার সে ঘুম ভাঙালে।

হে মায়াবী, তোমার ছোঁওয়ায়

সুন্দর আজ আমার তছ,

তোমার মায়া রচিল মোর

বাদল-মেঘে ইস্প্রহু।

তোমার টানে, হে দরদী,

দৌলু খেয়ে যায় কাদন-নদী,

কুল-হারী মোর ভালোবাসা

আজকে কুলে লাগালে।

‘এক সমুদ্রের ধারে নিয়ে যান,’ নিম্নতভাবে ব্রূশ-করা তাঁর চুলের ওপর ডাক্তার একবার সমস্ত, মুহূর্তে, যেন টিক না ছুঁয়ে’ প্রজাপতি-ধরণে হাত বুলিয়ে গেলেন। (ডাক্তারের ধরণ-ধারাই আগাগা!) ভবকুমার তাববার সময় পেলো, এরা সুবাই যেন চিকিৎসা-শাস্ত্রের জীবন্ত বিজ্ঞাপন। কী গোলাগাল, নম্বর, হুপুঠি চেহারা, যেন ঈশ্বরের বিশেষ অমৃত নিয়ে এরা বাঁচছে। আর কী মাজ্জিত, কী পরিপাটি—অতিরিক্ত রকম, বলতে হবে। এক-এক সময় অসহ্য লাগে।) ‘খত’ শিগুগির পালেন, দরবার দিকে এগোতে-এগোতে হঠাৎ একটু থমকি দাঁড়িয়ে ডাক্তার বললেন। ‘বরি একে বাঁচাতে চান,’ ডাক্তারের স্বর মুহূর্তে, প্রায় আবারের মত। তারপর—কাণ, ভবকুমার নীরব—‘বুঝছেন?’ প্রশ্নটা জীর্ণ, স্পষ্ট; ভবকুমারের মুখের ওপর সোনার চশমা বলকুর দ্বারা অধিকতরোক্ত পরিষ্কৃত।

ভবকুমার তবু কোনো কথা বললো না; শুধু মাথা নাড়িলে। বুঝেছে—অনেক আগেই সে বুঝেছে, সবই বুঝেছে। আর, বোধহয়ই বা কী আছে—সাহা বাঁচবে না, এই তো কথা। সাহা বাঁচবে না—এ নিতে কী করতে পারে সে? সাহা যদি নিজেই ইচ্ছের টিক করে থাকে যে সে মরবে—কাণ, এ তো ভাই, তা ছাড়া আর কী? না হ’লে, সাহাকে কি মানার একরকম বড়গোলা রোগ বাধিয়ে বসা? সমুদ্রের ধারে নিয়ে না গেলে বাবা চিকিৎসা হয় না? আশ্চর্য, আশ্চর্য, সাহিচরা একটু, যদি কাণজান থাকতো! ভবকুমারের মনে ছেলের-বিককে একটা অবিবোধ—রীতিমত একটা রাগ—আবার-ধারণ করে উঠলো। ওর কাণজান-হীততা, ওর নির্ভীকতা, ওর এই অসময়ে—হাস্তকর অসময়ে—মরবে বলে’ পণ! আমি কী করতে পারি? নিজের মনে ভবকুমার বাব-বাব বলতে লাগলো, আমি কী করতে পারি?

ডাক্তারের শেডোলে-এজিনের শব্দে ভবকুমারের চমক ভাঙলো। সমুদ্র-সমুদ্রের ধারে একে নিয়ে বাও। পুরী, ওয়াস্টেয়ার, গোপালপুর-অন্য-নৌ। পূজো আসছে—বেল-কোপানীগুলো বিজ্ঞাপনের ধামা দিচ্ছে। সেদিন আশিগ থেকে ফেরার সময় বেসল-নাগপুর রেলোয়ের টিকিট-আপিসের জানালায় একটা প্রকাণ্ড, অল্পস্ত শোশটার তাঁর চোখে পড়েছিলো; নীল, গভীর-নীল—যে-রকম নীল রেল-কোম্পানির’ পোস্টারের বাইরে কোথাও দেখা যায় না—সমুদ্র সমস্ত পচারাগ জুড়ে’ একটা রহৎ গোথ-না না পতর মত পড়ে’ আছে; সামনের দিকে নাথানারি জায়গায় টেনিস-ক্রীড়ারত কয়েকটি মেথেকুপের সুরাস্ক্রিত রেখাচিত্র, সেখান থেকে একটা ছাই রঙের মোটার গাড়ি সঞ্চিত, আঁকাবাঁকা, শাবা এক হাতা ছবির বা কানেশ বিশাল হোটেল পথান্ত চলে গেছে। আর, সমুদ্রের ওপরকার অমানো-নীল আকাশের গায়ে ছড়ানো, লাল কন্দরে লেখা, ওয়াস্টেয়ার। এবার রেলভাড়া অস্ত্রাভ বছরের চেয়েও কমিয়ে দেয়া হয়েছে; রেলোয়ে হোটেলের চার্জ দেশের কবিরে দেয়া হয়েছে; রেলোয়ে হোটেলের চার্জ দেশের কবিরে দেয়া হয়েছে; রেলোয়ে হোটেলের চার্জ দেশের কবিরে দেয়া হয়েছে। এমন লোকও আছে, একটা হোটেলের দৈনিক পত্রের টাকা মা’রা খজলে দিতে পারে, দশ টাকা বা’দের পক্ষে সমতা। এমন লোকও আছে মা’রা, প্রায় মূহ একটু মান পেতেছে কি এখানে কিছুটা ভালো লাগছে না, এই কারণে বা’ কবে’ চলে যায় ওয়াস্টেয়ার, ওয়াস্টেয়ার কি উটকামও, কি কান্দার। সে এখন পথান্ত কিয়ে ছাড়া কখনো সমুদ্র দেখে নি—তা’র পরগির বছর বয়স হ’তে চললো। সাহাকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে যেকোনো ভাগ্যায় গিয়ে অল্পত এক মাসও থাকতে হ’লে কণ পক্ষে তা’র ভিত্তি মাসের মাইনে দরকার। সাহুর অস্থিরতার আরম্ভ থেকে এ-পথান্ত বেদন থেকে যা পেরেছে সে ধার করেছে—করত

বাবা হয়েছে; এখন আর কে তা’কে ধার দেবে? বর—পূজো আসছে—এখন সবাই সেগুলো ফের পেলে বাখিত হবে। ওপরের দোকানে পল্লীপ্রমাণ দেনা জমেছে। ডাক্তারের ভিজিট বা দেখা হয়েছে, তা বোধ করলে কলগো পথান্ত গেলেও রাশের ভাড়া হয়। সমুদ্রই যদি সাহুর এক মাত্র ওপুথ, ডাক্তার তা হ’লে তা আগে বললেই পারত। নিজে কেন তবে সন্ধ্যার করত গেলো—ওর তো কত টাকাই আছে, আর একটা টাকা না মারলেই কি ওর চলতো না? ছোটলোক, ছোটলোক। ‘ভর নেই; কিছু ভয় নেই, কতদিন পথান্ত তো শুধু একথাই বলেছে। কিন্তু জর কিছুতেই ছাড়ে না, ছেলের চেহারাও দিন-দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। কত প্রেক্ষণপন বদলানো, অশ্রুত-পূর্ণনার কত পেটেটু দুঃখও বিদেশী ফল—কী ছাড়া ও-সব? ছাই হ’লো—শুধু মাঝখান-থেকে কতগুলো টাকা জলে গেলো। একদম জলে। ওটা অবিভিক্তি কথার কথা; টাকা কখনো জলে যায় না; আমার যা ছিলো, তা আর একজনের হ’লো, আমার যেটুকু কম, আবার একজনের সেটুকু বেশি। ভবকুমারের বা কতি হয়েছে, ডাক্তার শুনলি সারকারে বাছ-আকাউট তা দখল করেছে। তারপর—এতদিন ধরে’ আগ-তুঘ-বাগ-তুঘ করে’ শোকাটা আজ কিনা বলে, ‘সমুদ্রের ধারে একে নিয়ে যান,’ যদি ওকে বাঁচাতে চান। না, বাঁচাতে কি আর চাই! কেবল তোমার চারপাশ দেখবার জুড়েই অষ্টমুদ্রা দক্ষিণা দিয়ে তোমাকে রোজ রোজ ডাক্তার। ডাক্তারের স্বীকৃতিও, রক্তিম মুখমণ্ডল ভবকুমারের মনে পড়লো, আরকের মত মুহু সেই কণ্ঠস্বর: ‘ভর নেই, ভয় নেই,’ না, ভয় আর কী? ছেলোটো মতো’ বাবে, তা’তে আর ভয় কী? ভবকুমার ততবে গেলো। সাহুর শিরে বসে’ স্বরমা; হঠাৎ দেখে মনে হয়, স্বরমারই বুদ্ধি অস্থির করেছে। ‘কী বললে ডাক্তার?’ উৎকলিতস্বরে স্বরমা প্রশ্ন করল। ‘বললে’, এক জুজুয়, রংহস্তর উপায়ে ভবকুমার ডাক্তারের ওপর প্রতিশোধ নিয়ে, ‘কেনো ভর নেই।’ ‘তা’ই বললে?’ বহু অনিবার, বহু ক্রেশে শুক, মান স্বরমার মুখ হঠাৎ আশ্চর্যকর উজ্জল হয়ে উঠলো।

সে-হাসি এত উৎফুল্ল, এত নিলজ্ঞভাবে স্বন্দর যে ভবকুমারের চোখে তা রীতিমত বিস্ময়—এমন কি, একটু অনীল ঠেকলো। ইচ্ছে করলেই, মুহূর্তের মধ্যে এই সমস্ত আলো সে নিরিরে দিতে পারে। যদি সে বলে, ‘তোমার ছেলে মরবে।’ তা’র হঠাৎ একটা অশ্রুতলক উৎকট ইচ্ছা হ’লো ও-কথা বলবার; নির্দোষভাবে মনে-মনে সে বললে, ‘তোমার ছেলে মরবে, তোমার ছেলে মরবে।’ ‘তুমি একটু বোসো এখানে’, স্বরমার কণ্ঠস্বরে একটা স্বর থেকে উঠলো, মা’তে ভবকুমারের হঠাৎ মনে পড়লো তা’র বিয়ের প্রথম বছরের কথা, ‘আমি ততক্ষণ বেদানার রস করে’ আনিছি।’ তা’দের বিয়ের প্রথম বছর, স্বরমার বয়স’ তখন আঠারো। ধেখতে দেখতে তখন স্বন্দর ছিলো—লোকে তা’ই বলতো; পূজোর সময় স্বরমারক নিয়ে সে তা’দের দেশের বাড়িতে গিয়েছিলো। তা’রা যে-ঘরটাও শুতো, জানালায় টিক বাইরে ছিলো একটা শোফা গাছ। তা’দের দিকে মরতো অজস্র ফুল, পাকে ভেঙে যেতো তা’দের ঘুম। সেই শোফানি-সৌভ, শোফানি-সুভতা পরের বছর মুক্তিধার করলো, থোকা হ’য়ে, তা’র ছেলে, স্বরমার ছেলে হ’য়ে। ক’দিনের কথাই বা? এরি মধ্যে...? একপাশে ‘কাং হ’য়ে, তা’র শীর্ণ মাংসহীন হাত হুটি অসমভাবে পানবাশিরের ওপর রেখে, সাহু এতক্ষণ চোখ বুজে ঘুম আর অরের মোহের মাঝামাঝি অবস্থার পড়ে’ ছিলো; হঠাৎ ভেঙে উঠলো, ‘মা।’ ‘মা তোমার রক্ত দেবার রস করে’ আনতে গেছেন।’ ‘বেদানার রস’ ভালো না, বাবা।’ সাহু পরিপূর্ণ করে চোখ মেলে’ তা’র বাবার মুখে তাকালো। দাঁড়, কালো পক্ষের নীচে সেই কালো ছোট ছোট ভবকুমার ভালো-বেসেছিলো। স্বরমার চোখ—শুধু, আরো স্বন্দর। কিন্তু সে-চোখের সব আলো নিবের’ গেছে; কোটরের গম্বীর থেকে মান, বাহানানী, ঐ ছোট শরীরের সমস্ত দীর্ঘখণার দুঃখানা প্রত্যেকের মত তা জ্বলিয়ে আছে। ‘বেদানার রস খাবো না, বাবা।’

‘আজু, তবে?’ ভবকুমার তাঁর সাধামত সাধনা দিতে চেষ্টা করলো।

‘না, না, আজুর থাকো না। ডিম থাকো, মাগুরা আছে’ কোল দিয়ে ভাত খাবো, কাঁচা আমের অঞ্চল—’

‘আর?’

‘আমি কবে ভালো হ’বো, বাবা?’

‘লীল গিরই’, গতাহরণভিত্তিকে ভবকুমার বললে।

‘কেন আমার অম্বুৎ করলো?’

‘কেন?’ এ-প্রশ্ন সে ভিজ্ঞপ করতই পারে। ‘আরো বেশি; কেন তাঁকে সন্দের ধারে নিয়ে যাওয়া হ’বে না, কেন তাঁকে বড় হ’য়ে উঠতে দেখা হ’বে না, কেন একজন বড় কবি হ’বার স্বেযোগ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হ’বে?’

‘কেন?’ কেন?

‘খানিক চূপ থেকে সাহু হঠাৎ একটু সাঁওতড়ের বলে’ উঠলো, ‘বাবা, কবিতা বলা।’

‘কোনটা, সাহু?’

‘রামায়ণ বলা।’

ভবকুমার—হেলের সঙ্গে পড়তে-পড়তে তাঁরো মুখের হ’য়ে গিয়েছিলো—সুর করে’ আবৃত্তি করলে:

‘তমসার নীল জল চলে সুদুপল,
বনে পাখী গায় গান, ফেটে নীল ফুল।
বড়ের ফুটাঝাবনি গাছের ছায়ায়,
চলল হরিণ কলে তাঁর আদিনিয়।
সেখা দুনি খাটুকি লেখে রম্যাল,
সে বড় সন্দর কল, শোনে দিগা-মন।’

স্বনতে-স্বনতে সাহুর চোখে যেন আলো ফিরে’ এলো, তাঁর চোঁটের কেনে হাসি ফুটে’ উঠলো। লাইনগুলো তাঁর বাবার বলা শেষ হ’বার আগেই সে তাঁর নিজের মনে আবৃত্তি করছিলো; পরবর্তী পরিচিত পদের প্রত্যাশার অক্ষুট উজ্জারণ তাঁর চোঁট নড়ে’ উঠছিলো।

‘ভটা বলা, বাবা—রামায়ণের ছান—’

ভবকুমার অস্থায়িক অসুস্থতা-সহকারে আবৃত্তি করলে,

‘রামায়ণের ছান—’

‘হাসির কথা শুনলে বলে, ‘হাস্যবো না, না, না, না।’

সময় মরে আসে, এই মুখ কেউ হাসে,

একসঙ্গে তাই চিন্তি দিয়ে তাকায় আপো-পাশে।

যাও না বনের কাছে, কিংবা গাছে-গাছে,

দখিন হাওয়ার হুঃ-হুঃতে হাসিয়ে ফেলে পাশে।’

‘হি-হি-হি’, সাহু হেসে উঠলো, ‘একচেত্রে তাই চিন্তি-’

মিটিয়ে—হি-হি—তাকায় আশে-পাশে। আরো বলা, বাবা।’

গ্রিক এই মুহুর্তে ঘরে ঢুকে’ সুরমার মনে হ’লো, যেন তাঁর সামনে স্বর্গের এক দৃশ্য উন্মোচিত হয়েছে। ‘খুব বেঁহা হাঙ্গ হচ্ছে’-প্রাচীন মিলে। ‘আগে চাট করে’ এঁটুকু খেয়ে নাও এক লক্ষী, তারপর আরো শুভো।’

বেলা বাঁচোটার পর, তাঁর সব রোগী সেখে এবং চার ফাঁটার মধ্যে ভবকুমারের পাকা এক মাসের মাইনে উপার্জন করে ডাক্তার হুশীল সরকার সবে বাড়ি ফিরেছে, একটু পরেই চাকর এসে খবর দিলে, কর্তাবাবু তাঁকে ডাকছেন।

‘কর্তাবাবুর নিকুটি!’ দৈতর কঁপে তীরথের হুশীল বলে’ উঠলো।

‘আজ্ঞে?’ চাকরটা দরবার কাছে গিয়ে তাকে কিছু বলা হয়েছে মনে করে থামলো।

‘না উঠে যা।’ ডাক্তারের নীল সিনের শাটটা ঘামে একবারে ভিজ গিয়েছিলো, সোঁটকে দেয়ালের গায়ে একটা ছায়াধরে সুলিয়ে রেখে সে তার স্ত্রী শ্রীমামীর দিকে তাকালো। ‘কর্তাবাবুর হয়েছে কি?’

‘নতুন আর কি হবে?’ চোঁট ঝিকিয়ে শ্রীমামী বললে, ‘একটু বেশি করে’ ব্র্যাদি প্রেক্ষণইব করো—তা হ’লেই আর মালাবে না।’

‘ব্র্যাদি! যেন উনি এক ছীবনে সাত জনের আদার ব্র্যাদি গের্শেনি নি। আর সেই ভেত্রে তো—’ গোষ্ঠী

মুখের ওপর দিয়ে টেনে শুলতে হুশীলের বাকি কথাগুলো চাপা পড়ে’ গেল।

কয়েক মিনিট পর হুশীল তাঁদের প্রকাণ্ড পৈপাক বাড়ির তেতলার গিয়ে পৌছলো। দক্ষিণের ঘরটায় পাহাড়ের মত উঁচু ও মাঠের মত বিস্তৃত এক পাটে ‘অশ্বমুতি বালিশের দরীয়াটাকে আশ্রিত করে’ এককালীন প্রতাপশালী জমিদার, এককালীন বহুবিখ্যাত মজল ও কৌমাধ্যাহর জগবন্ধ সরকার গারিত। তাঁর পরণে সবুজ সিনের ব্রুটি, গায়ে সিনের চতুয়া, অশীতপরি ব্রুজ, তাঁর ঘন কৃষ্ণিত কালো চুলের এখন বা অবশিষ্ট আছে, তা শুধু নাপার পেছনে ও হুকানের ওপর কয়েক গোছা শাড়া দড়ি। তাঁর মুখ নতুন কামানো, ফচার করে’ ছাঁটা শাধা গোঁফে কাছে গেলে আতরের গন্ধ টের পড়তো যায়। বালিশের ত্বরে ওপর কাঁধ রেখে আশে-পাশে অবস্থান তিনি শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছেন। সতর্কতা, একটু ভয়ে ভয়ে হুশীল চুপলো; জগবন্ধ নড়লেন না, যেন তাঁর পায়ের শব্দ শুনতে পান নি। বিস্তৃত পারায় কার্পেটের ওপর নিশেদ পা ফেলে হুশীল ঘাটের পাশে এসে দাঁড়ালো। জগবন্ধ যেন সাধা দেয়ালের গায়ে কোন অসুস্থ লেখা, পড়ছেন, সেখান থেকে তাঁর স্রোত সরছেই না। হুশীল অপেক্ষা করলো, একবার এ-পাশে, একবার ও-পাশে ভর দিয়ে দাঁড়ালো; একটু কাশলো:

‘একদা-ভীতিকর মাথা আত্রে আত্রে সরে’ হুশীলের মুখের প্রতি উদ্ভিষ্ট হ’লো; ধানিকম্প জগবন্ধ তাকিরেই হইলেন, যেন দেয়ালো বা পড়ছিলেন, তাঁর স্রোশেই এখন হুশীলের মুখে পড়ছেন। বুড়ে হাঁদারাম ও-রকম করে’ তাকিয়ে আছে কেন? হুশীল মনে-মনে ভাবলো। তাঁর গারি অশ্বতি লাগছিলো; থিয়ে, তাঁর ওপর, তাঁর গোট এসে’ বাচ্ছে। নিজের শরীরের কী একটু হয়েছে কি না হয়েছে, তা নিয়ে ঝেঁটে-ঝেঁটে করে’ বাড়ি মাথা কবুতে তাঁর বাবার মত কেউ নয়। চূপ করে’ সে তাঁর বাবার গা বলায় জড় অপেক্ষা করতে লাগলো। ঘরের মধ্যে ধানিকম্প শুধু ইলেকট্রিক পাখার মৃদ গুজন ঝাঙাতিপাত নির্দশ করছে।

হঠাৎ, যেন তাঁর অশ্বতি বই পড়া হ’য়ে গেছে এবং সে-সংক্ষেপ তিনি মস্তব্য করছেন, এ-ভাবে জগবন্ধ বলে’ উঠলেন, ‘আমি আর বাঁচবো না।’

‘না, না, সে কী কথা!’ তার বাববার ধরণে, সিনের ঘরে হুশীল বসলে, ‘বাঁচবেন বই কি। কিন্তু আপনার হয়েছে কি?’

‘ভালো লাগছে না—শরীর ভালো লাগছে না।’

‘কিন্তু হয়েছে কি?’

‘হয়েছে কী!’ জগবন্ধ হঠাৎ গর্জন করে’ উঠলেন, ‘সেই-ইচ্ছাই তো তোকি ডেকেছি। তা-ও যদি আমাকে বলে’ দিত হ’বে, তা হ’লে পাঁচটা বছর বিলেতে থেকে কুই কী করুণাড়া করে’ এলি!’

এই ভয়ানক কণ্ঠস্বরে হুশীলের মনে আবার যেন মুহুর্তের জড় তাঁর ছেলোবলকার ভয় ফিরে’ এলো। ছেলোবলার তাঁর মনে বাবার প্রতি বে-চুর্জয়, বে-প্রচণ্ড ভয় বহুদূর হয়েছিলো, এখন পর্যন্ত সে যেন তা ঠিক কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাঁর বাবার উপস্থিতিতে গ্রিক আবালক হ’য়ে উঠতে সে এখনো পারলো না। সেই তব্বর, রক্ত-হিম-করে-সেবা কণ্ঠস্বরে, সেই-সব মার—ভাবতে এখন পর্যন্ত হুশীলের হাত-পা দুর্বল হ’য়ে আসে। মার খেতে-খেতে নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে যেতো। ওং, সর্বাঙ্গিকরসে, নিরাশ্র-তার পর বললো, ‘আমাকে ডেকে ছিলেন?’

একদা-ভীতিকর মাথা আত্রে আত্রে সরে’ হুশীলের মুখের প্রতি উদ্ভিষ্ট হ’লো; ধানিকম্প জগবন্ধ তাকিরেই হইলেন, যেন দেয়ালো বা পড়ছিলেন, তাঁর স্রোশেই এখন হুশীলের মুখে পড়ছেন। বুড়ে হাঁদারাম ও-রকম করে’ তাকিয়ে আছে কেন? হুশীল মনে-মনে ভাবলো। তাঁর গারি অশ্বতি লাগছিলো; থিয়ে, তাঁর ওপর, তাঁর গোট এসে’ বাচ্ছে। নিজের শরীরের কী একটু হয়েছে কি না হয়েছে, তা নিয়ে ঝেঁটে-ঝেঁটে করে’ বাড়ি মাথা কবুতে তাঁর বাবার মত কেউ নয়। চূপ করে’ সে তাঁর বাবার গা বলায় জড় অপেক্ষা করতে লাগলো। ঘরের মধ্যে ধানিকম্প শুধু ইলেকট্রিক পাখার মৃদ গুজন ঝাঙাতিপাত নির্দশ করছে।

‘তা হ’লে বাবার লাগে কেন? ভালো লাগে না কেন?’

‘আপনার বয়সের অনেকের চাইতেই তো।’ আপনি ভালো আছেন।’

‘রাখ, বয়েস।’ তাঁর বাক্যের প্রতি কোনো ইঙ্গিত জগবন্ধ একেবারেই সহ্যে পারেন না। ইয়া, তাঁর বয়েস অল্পবারে তিনি ভালো আছেন, তাঁরিক। ‘কিছু বয়স’ ছেড়ে তাতে। বয়েস তো আর তাঁর কম হয় নি—পাকা একাশি, একটি দিন কম নয়। ও-বয়েসের লোক এ-দেশে তো সাধারণত বেঁচেই থাকে না। ভারি তো ভালো আছেন তিনি, মরা মানুষের তুলনায় ভালো! জীবিত শোকের মধ্যে তিনি বাঁচতে চান; মৃতের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অহুগ্রহ চান না। ‘একটু বুড়ো হয়েছি বলেই’ সারাক্ষণ পাটের ওপর চিহ্ন ছাড়ে থাকতে হবে নাকি?’

‘কিন্তু আপনার যে এখন বিশ্রাম দরকার—complete rest!’

জগবন্ধ মাথা নাক্ষেপে।—‘না, আমি আর বাঁচবো না।’ মৌখিক এবং মামুলি প্রতিবার করলে। কিন্তু মনে মনে সে ভাবলে, ‘সত্যি, বুড়ো কি কোনোদিন মরে যে না? কতকাল আর বেঁচে থাকবে! কী অহরিক শরীর!’

‘আমি মরিছি,’ অনেকদিন নিজের মনেই জগবন্ধ বলছেন, ‘এবার আমি নিশ্চয় মরিছি!’

এক গোলা ‘ছ’বছর ধরে’ ক্রমাগত, অবিচ্ছিন্নভাবে তিনি মরছেন। তেতলায় তাঁর কার্পেট-বিছানো ঘরে বৃথদায়ন খাটে শুয়ে তিনি মরছেন, এ-মাসের ঠা’ বছর ধরে তাঁর চেলেসমেয়েদের, পুত্রবধূ-জামাতাদের, মাতা-নাথনদের, বাড়ির আশ্রিত, জাতি, দাসদাসী সবার গোচর হয়ে আসছে। কর্তাব্য মরছেন—এ-কথা শুনে শুনে তা’দের অভ্যাস হয়ে গেছে, যে-কোনোদিন, যে-কোনো সময়ে তাঁর মৃত্যু-সংবার শোনার জন্য তাঁরা প্রস্তুত। তাঁদের কল্পনায়, বসতে গেলে, কর্তাব্য ইতিমধ্যেই। কিন্তু বাস্তবিকক্ষে, ‘ছ’বছরের মধ্যে তিনি আশ্বের চাইতে মৃত্যুর এতদূর নিকটবর্তী হয়েছেন বলে’ মনে করা যায় না। যেন মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবন প্রতিজ্ঞায় তিনি টিকে আছেন—আরও কত কাল থাকবেন, বাড়ির লোক কখনো-না-কখনো কেবে অধিক হয়। তাঁর অস্বর্থ আর কিছুই নয়; অস্বর্থ তাঁর নিজের

জীবন, তাঁর একাশি বছরের দীর্ঘ জীবন। তাঁর জীবনই এখন তাঁকে ক্ষয় করছে। কিন্তু প্রকৃতির সেই ক্রিয়াকে তিনি রোধ করছেন, উন্মোচনা আক্রমণ করছেন, বাড়ির কীটা-অল্পবারে দিন-নাগনে, পরিমিত আহারে, খাওয়ার সঙ্গে প্রায় সম-পরিমাণে পেটেট, গুণ-সেবনে, প্রতি মুহূর্তে ভাত্যারের পরামর্শ নিয়ে। তাতে তাঁর রাস্তামত শারীরিক বয়স হয়, তবু তাঁর মস্ত-সেবন তিনি সম্ভাব্যে। হুটামাত্র পেগে পরিমিত করেছেন। কেননা, তাঁকে বাঁচতে হবে।—কেন বাঁচতে হবে? বাঁচলেই বা আর কতদিন বাঁচবেন? ও-সব কথা তাঁর মনে হয় না। কিংবা হলেও তিনি সেগুলো জোর করে’ চাপা দিয়ে রাখেন: ও-সব অনাবশ্যক। ইচ্ছা, বাঁচবার অঙ্ক ইচ্ছা এখন তাঁর মধ্যে অসু-সব জিনিষের চাইতে প্রবল। যে-কিছু নিয়ে, এবং যেমন করে’ পাবেন, তিনি বাঁচবেন। এ-সেই কারণেই মুখে তিনি বার-বার করে’, জোর করে বলবেন, ‘আমি মরিছি, আমি মরিছি।’ কারণ তাঁর মনে এক-সুসংসার আছে যে বা মুখে বলা যায়, তা কখনো ঘটে না। কোনো অস্বৃত রহস্যময়ভাবে এই উপায়ে তিনি তাঁর মৃত্যুকে ঘুরে সরিয়ে রাখছেন; মৃত্যুর কণায় বার-বার মৃত্যুকে অধ্বান করে’ মৃত্যু-দেবতাকে তিনি তুই রাখছেন, এই আশায় যে দেবতা তাঁকে সত্যি-সত্যি আঘাত কর্তে ভুলে’ থাকবেন।

আরো একটি মামুলি আশ্বাস-দানের পর প্রশ্ন চল’ বাচ্ছিলো, জগবন্ধ পেছন থেকে তাঁকে ডাকলেন। ‘শেন্—’

‘কাল রাতিরে কালো ঘুম হয় নি?’

‘সেই ঘুমের ওষুধটা খেয়েছিলেন?’

‘খেয়েছিলাম।’

‘তবু হয় নি?’

‘না, না, তবু নয়।’ জগবন্ধর মেজাজ হঠাৎ চড়ে’ গেলো, ‘তোকে বললুম?’ তাঁরপর আবার স্বাভাবিকভাবে: ‘আমার মনে হয় রাতিরে আরো ছুটো পেগ ব্যাতি খেয়ে শলে ঘুমটা ঠিক আসবে।’

‘আমরা তো মনে হয় না সেটা উচিত হবে।’

‘তোকে ডাকারিমাশে মদ-সদ-সদে এত কড়াকড় কেন? Idiot!’

সমস্ত ডাকারিমাশের মত ক্রমাগত, প্রশ্ন কীটামুচি মুখে বললে, ‘বুঝতে পারছেন না, লিভার। লিভারই হচ্ছে আসল।’ আপনার শরীরটাকে একটা নিম্নত বায়োসেলের মধ্যে রাখতে হবে, একটু এদিক-ওদিক হলেই—’

‘বা-বা—’ আর শুভে চাই নে।’ সত্যি, আর শুভে আপনজু চালুও না। একটু এদিক-ওদিক হলে কী হবে তা তিনি ভাবেন—ভালো করেই জানেন। কতগুলো গাখা আর ছাগল—ওদের সঙ্গে এক ফোটা ব্যাতি খাবার পথ্য উপায় নেই। রোজ ঠা’ পেগ—কী ছেলেরা! কী হাত্যকর! তাঁর বন্ধ ভরনারায়ণ সিংহ কি এক-কথা শুনে হেসে শটুয়ে পড়তো না? কিন্তু ভরনারায়ণ সিংহে আঁক দশ বছর সূত। তাঁর বন্ধদের মধ্যে একজনও, একজনও নেই, যে এখন তাঁর এই হাত্যকর, অসহ্য অসহ্য দেখতে আয়েত পড়ে। সেটা বা হোক একটা বাচ্ছো। ‘আরামের স্বপ্নে’ আশ্রিত, জগবন্ধ সামনের ঘোলে আবার তাঁর জন্মক, অসহ্যই নই পড়তে আরম্ভ করলেন।

পড়লো বাঁশি কাগজের বস্তো দিয়ে ঘরে সেলাই-করা এক খাতা, বাঁর ভেতরের লেখা ভল্লুকায় সঁই জানে। খাতটা গুলে’ সে পড়তে আরম্ভ করলো। ছোট-বড় ছেলেরাও অক্ষরে সবারে কালি দিয়ে লেখো:

আমি কী-কী ভালোবাসি

ভালোবাসি গাল মূল,

ভালোবাসি কীলাকান,

ভালোবাসি পা-র নিচে

নবর মূল্য পায়।

ভালোবাসি বিদ্যার

হালুকা টানের আলো,

আমি মূল্যের চোখে

সাব মূল্য জানো।

ভালোবাসি কীলা আর

আর মূল্যের মূল,

সব চেয়ে ভালোবাসি

রাতিরে মিটে ঘুম।

ভল্লুকায় পাতা উ-টিয়ে গেলো:

আমাদের বাড়ি

আমাদের বাড়ি কাই সোনারগুণ,

গীলাক বৈদ্য থেকে কম খেলি দূর।

মেঘগাড়ি বাড়িয়ে ঘরে ছিল হাওড়ার,

চলিয়ে গিয়েছে কত পল খাওড়ার।

ছই পাখি ছুটে ছলে মাঁ খোপ নয়,

আকাশপাটী থেকে যায় অসুত কমম।

কৈলিগোবর্দন থেকে বসে’ কালি পানী,

ওরা কি শুভিতে পার আমি বহু ভাকি?

এলিয়েন খোঁটা ওঠে খোঁটা কালো খান,

বসে-বসে’ দেখি আমি কী মাইল এলায়।

এই ভাণ্ডো এলো এক বড় ইষ্টান,

কেউ হার মীহাতোপ, কেউ চায় পান।

বিকর্ণ পাটোটা হলো, এসেছি গোপাট,

মা থাকে পাকি ছেড়ে, আমি থাকো ছোট।

আমি ছিলাম অগ্নি-আগ্নে, বাবা আসে পাকে,

আকাশে পানী কী উড়ে চলিগো।

হঠাৎ কোঁট খেদে সেই বাই পড়ে’
অমনি বাবার কোলে গেলি আমি চড়ে’।
চলতে যেতের মধ্যে গোলা একপাল,
স্বচীতা জ্বলত, জ্বলো, গোলা আর বাব’।

তারপর :

আমাদের যি

ঐ আমদের যি—

বলতে পারো আমছে সে তা’র কোঁট ভরে’ কী ?

যুগ্মগিরে হাটটি কিলে,

নিজের মনেই কেবল শাপে,

একশো বছর বয়েস হবে এমন সুচীতি,

বলতে পারো আমছে সে তা’র কোঁট ভরে’ কী ?

ভাঙে বুধি সোলাসমান

কালো কালো গোলাগি ভান’

হাঃ-হাঃ-হাঃ! এমন মধ্য কোথাও বেধি নি’

কোঁট ভরে’ আমছে বুধী কখনো বুটে-বিঃ—

বিঃ—বিঃ-বিঃ—

এর নীচে লেখা : ‘আমি যখন বড় হবো, এমন একটা

বাড়ি কবো বা যে দেখে যে সেই বলবে—বাঃ, কী স্বন্দর !’

ভবকুমার আর পড়লো না, খাভাটা বন্ধ করে’ রেখে

দিলো। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলো, শরতের

নীল আকাশে বৃহদায়তন শালা সব মেঘ পরম-পরিতৃপ্তভাবে

ঘুরছে—তা’দের ‘গা’ থেকে যেন রোদ ফেটে বেরুচ্ছে—এত

উজ্জ্বল। সমস্ত আকাশ যেন শান্তি, পরিপূর্ণতায় তুঙ্গ।

শান্তি, অপার, অবর্ণনীয় শান্তি। পৃথিবীতে এত সৌন্দর্য—

অস্বাভিত, বিনামূলো বিস্তারিত এত সৌন্দর্য, তা যেন বিশ্বাস

করা যায় না। আর এই শান্তি আর সৌন্দর্যের মধ্যে সাহ, তা’র ছেলে, সাহ বসছে।

গোক আর ছাগল—এক ফোঁটা ত্র্যাপ্তি থেকে কী হয় ?);

হৃদয়েরও গোলাগাল হচ্ছে; কবিরের মধ্যে তাঁর শরীরও

যেন একটা রোগা হয়ে গেছে। হৃদয়ের কাছে তিনি

একদিন চিকিৎসা-বাবসারীরের অপার মৃত্যুও সেই শায়ের

চূড়ান্ত নিষ্ফলতা নিয়ে তাঁর অবিচ্ছেদ্য জানালেন। তাঁর

শরীরের কিছুই উন্নতি হচ্ছে না, দিন-দিন বয়ঃ পারাপ হতে

যাচ্ছে; কোন সন্দেহ নেই, শীর্ণগিরিই তিনি মরবেন। শুধু

কতগুলো ছাগল-ডাক্তারের হাতে পড়েই তিনি অকালে

মরতে বাধ্য হচ্ছেন, না-হয়...যে আশি বছর বেঁচেছে, সে

নকলুই বছরও বাঁচতে পারে। নকলুই বছর, মনে-মনে

যম-দেবতার কাছে সে নিবেদন করলো, আমি মরণের ক্ল

প্রস্তুত হবো, তখন হবে তোমার সুসময়। পঞ্চাশ বছর

বয়সে তিনি বাটে মরতে প্রস্তুত ছিলেন, বাট বছরে মাহুয়ের

বাইবেল-উক্ত পরমাণু লাভ করার তাঁর আকাঙ্ক্ষা জমা

সত্তর যখন পেরুলো, মনে-মনে তিনি নিজেকে আশি দিয়ে

রাখলেন। আশির ওপরে—সেটা বড় বেশি, অন্তর্যনে

তিনি বাঁচতে চানও না। কিন্তু সে-সব কথা এখন তিনি

ভুলে গেলেন।

রকমের একটা ফাল্গেমি করলে। হৃদয় থেকে আরম্ভ

করে’ ছেপেপিলেদের নেড়ি, কাপড়, কাচবার যি পর্যায়

সবাই জেনে গেলে যে এতদিনে সেই দীর্ঘ-প্রত্যাশিত মুহূর্ত

এসছে; কর্তব্যাব্য এইবার সতি-সতি মরছেন। বাড়িতে

শোকের আবহাওয়া ঘনিয়ে এলো, কিন্তু সেই শোক যেন

একটা পরিপূর্ণতা। শহরে সব বড় ডাক্তারদেরকে ডাকা

হ’লো; উৎকণ্ঠায় ও প্রত্যাশায় সারা রাত কাটলো।

উদ্ভামভাবে, অনিয়মিতভাবে, রক্তির ভেতর দিয়ে জগদ্বজ্র

ফুগিও বেজে চলছে। ভোনের দিকে তা আবার শান্ত

হ’লো, স্থব্র হ’লো; জগদ্বজ্র ঘুমিয়ে পড়লেন। কাঁড়া

কেটে গেলো। আরো কয়েক লক্ষ বারের জন্ত, জগদ্বজ্র

যাদাবিক জগৎপদ্মন আবার আরম্ভ হ’লো।

পূর্বের জানালা দিয়ে সকালবেলার তীব্র রোদ চোকো

হ’য়ে তল্লপোনের পাতাতে এসে ঠেকেছে। ঘরটি নিম্নত

রকম পরিষ্কার; হরমন্ডা ভোর হ’তেই ঘর মুখ-মুখে কলকল

করে’ এখন জটো টুটিয়ে রাখতে গেছে রান্নাঘরে। সমস্ত

বাইরের পৃথিবী আলোর আলোময়, যেন আলোর চেয়ে

হৃদয়, সর্বাঙ্গীণ, স্বতঃ-উৎসাহিত কোনো অজ্ঞাত পদার্থে

বিধ উদ্ভাসিত। ঘরের আবহাওয়াতেও সেই আশ্চর্য

দৃষ্টি; কোনো বাগ্বেথালি দেবতা যেন মায়-পূর্ণ সমস্ত

তুচ্ছ, পরিচিত ভিন্নিকে অভাবনীয়রূপে রূপান্তর করে’

দিয়েছে।

করে' তাঁর প্রাণ-শক্তি বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আজ হঠাৎ—
—কী হ'লো? ভবকুমার অবাক হ'য়ে ভাবলো, শেষ
পাখা সাহু এমনভাবেই সেয়ে উঠে না তো? কিছুই বলা
যায় না, অনেক সময় এরকম হয় শোনা গেছে।

'সমুদ্রে ঝড় উঠেছে, বাবা?'

'হ্যাঁ, জাণো। জাহাজ ডুবছে, আকাশে পতঙ্গা পান
করছে।'

'উঃ, কত বড় ডেউ!'

'প্রকা—ও!'

'সমুদ্রে কেন্দন, বাবা?'

'ম—সু। তাঁর শেষ নেই। জল, জল, খালি জল।
ডেউয়ের পর ডেউ!'

'জাণো, বাবা, এ-ডেউটা ঠিক একটা হাতীর মত।
একটা হাতী শুঁড় তুলে ছেড়ে আসছে।' কী মজা! সাহু

কোন একটা আনন্দের শব্দ করে' উঠলো। তারপর হঠাৎ
বললো—'বাবা আমি সমুদ্রে দেখে'বো।'

'দেখ বে বই কি, সাহু।'

'কবে?'

'তুমি বড় হ'য়ে নাও—'

'না, না, বড় হ'য়ে তো আমার ঢের বেরি। আমি
এখন সমুদ্রে দেখে'বো—এখন।'

'এ-ছবিটা জাণো, সাহু; জাণো, গাছের নীচে শুয়ে
এরিয়েল স্বপ্ন দেখছে—'

'না, আমি ছবি দেখে'বো না, ছবি দেখে'বো না, আমি
সমুদ্রে দেখে'বো।'

'বোশি চেঁচিয়ে না, সন্ধ্যা—'

'সাহু তাঁর দুর্বল শরীরের পক্ষে বখাসম্ভব জোরে চেঁচিয়ে
উঠলো, 'আমি সমুদ্রে দেখে'বো, সমুদ্রে দেখে'বো।'

সেই যে সাহুর মাথার কী ঢুকলো, তাঁর পর ছেলের
মুখে আর-কোনো কথা নেই; থেকে-থেকে খালি বসে'
ওঠে, 'সমুদ্রে দেখে'বো, সমুদ্রে দেখে'বো।' জুপুর পর্যন্ত সে
ছটফট করলো, মা-বাবাকে মেরে-পামচে অস্থির করে'
তুললো, কাঁদে উজ্জল হ'য়ে উঠলো তাঁর চোখ, সমস্ত মুখ
রক্তিম। তারপর হিকেলের দিকে আন্তে-আন্তে সে শান্ত

হ'য়ে এলো। হুরমা তাকে যুগ পাড়াবার চেষ্টা করলো,
কিন্তু সাহু তাঁর অস্বাভাবিক উজ্জল চোখ মেলে চুপচাপ
শুনে' রইলো—একটি কথা বলছে না, চোখ কিছুতেই বন্ধ
না। ঘটাবানকে এমন কাটলো, তারপর হঠাৎ সে অস্টট
আন্তনার করে' উঠলো, 'মা।'

তাঁর মুখের সঙ্গে প্রায় যুগ লাগিয়ে হুরমা বললো,
'কী? কেন্দন লাগছে সাহু?'

'সাহু আর-একটু দীঘ করে' টেনে আবার বললো,
'মা।'

হুরমা মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে
তাকালো। ভবকুমার কোনো কথা বললে না, শরীরের
কোনো ভঙ্গী করলে না; একটু দূরে চেয়ারে যেমন ছিলো,
তেমনি বসে' রইলো। সে জানতো কী ব্যাপার। এ তো
জানা কথাই—তবু একটু আগে, এই একটু আগেই সে
আশা করেছিলো—

'মা, মা।' একটু পরে-পরে পাখীর ছানার মত দুর্বল,
কোনপক্ষে সাহু বসে' উঠতে লাগলো। আর-সব কথা
সে যেন ভুলে' গেছে, ঐ একটা কথা দিয়েই যেন সে তাঁর
মনের সব আকাঙ্ক্ষা, শরীরের সব যুগ্মা, এই অর্থহীন,
অসহ যুগ্মা-ভোগের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ, বাঁচবার ভজ
তাঁর অদম্য ব্যাকুলতা বড় হ'য়ে অপূর্ণ প্রহর একটা
বাড়ি করবার কল্পনা, কবিতার আর কাঁটা আনের ভজ
তাঁর ভাগ্যবাসা—সব প্রকাশ করছে চায়। হুরমা আর
ভবকুমার শুক; শান্তিহীন, নিষ্ঠুর, যুদ্ধের সঙ্গে যুদ্ধ
'সংযোজিত হ'য়ে চিরকাল রচনা করে' যাচ্ছে।

শেষটায় ভবকুমার চেয়ার ছেড়ে উঠলো। করলো
নীচে সাহুর পায়ের গুপের একবার হাত রাখলো। হিম।
পা-টা একটু তুলে' দেখলো; লোহার মত শক্ত, ভারি।
পা-টা এর মধ্যে মরে' গেছে। নীচের দিক থেকে প্রথম
আক্রমণ করে' মুক্তা আন্তে-আন্তে ওপর দিকে পথ করে'
যাচ্ছে। সাহুর ছোট শরীরে মুক্তা এখন বাসা বেঁধেছে;
সাহুর মধ্যে মুক্তা এখন একমাত্র জীবিত শক্তি। আর আর
ঘণ্টার মধ্যে যা সাহু ছিলো, তা শুধু কতগুলো রাসায়নিকের

সমন্বয়ে পরিণত হ'বে। বা সাহুর শরীর ছিলো, তা অগাধ
মৃত্যুশী জীবায়ুর গৃহে পরিণত হ'বে। এই মৃত পায়ে এর
মধ্যে সে পচনক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে।

সাহু আর কোনো কথা বলছে না; শুধু তাঁর হৃৎকণ
যেন ভেতর থেকে ধাক্কা পেয়ে মাঝে-মাঝে কেঁপে উঠছে।
আর তাঁর বড় করে' খোলা চোখে পাখরের চোখের মত
নিম্পলক, নিম্পল দৃষ্টি। জন্মে-জন্মে কাঁধের সে-ক'নুনিও
থেকে গেলো, হাত ছ'খানা কাঠের মত স্থির, ছ'পাশে পড়ে'

'অন্ত কেঁদো না, হুরমা—এখনো সে ওর জ্ঞান রয়েছে।'



চন্দন-সাবান

সভ্যতার আদিযুগ হইতে আজ
পর্যন্ত চন্দন, সকল শুভ-কার্যের
ও পবিত্রতার অঙ্গ। অতি পুরাতন
হইলেও ইহা চিরনূতন। চন্দনের
অবিকল গন্ধ ও রং আমাদের
সাবানে প্রতিফলিত

—আমাদের সাবান—
ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়।

কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস
কলিকাতা।

'চন্দন লেখা দ্বারে দ্বারে
চন্দনমালা ছলিছে বায়ে।'

নিপ্পনের যাত্রী

২

কিয়োটো বহুদিন ধরে জাপানের রাজধানী ছিল। তাই জাপানের প্রাচীন ইতিহাসে কিয়োটোর স্থান খুব উচ্চ। জাপানের সাহিত্য, শিল্প, শিল্পকলা প্রভৃতির প্রথম উদ্ভাবন এখানে না হ'লেও এই কিয়োটোতেই তা'রা পরিপুষ্ট লাভ করেছিল। বৃষ্টির ঝড় শতকের শেষভাগে মিকাদো বা জাপানরাজের ক্ষমতার হ্রাস হয় ও প্রধান মন্ত্রী বা শোগনের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এবং শোগনের অস্তিত্বই নিজেদের জন্য গৃহক রাজধানীর স্থাপনা করেন। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে নতুন শাসনব্যবস্থার প্রবর্তিত হয় ও শোগনের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়। এই সময় পর্যন্ত কিয়োটোই মিকাদোর রাজধানী ছিল। নতুন শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গেই রাজধানী তোকিয়োতে স্থানান্তরিত হয়।

কিয়োটো থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হ'লও কিয়োটো। তার কোন সম্পদ হারায় নি। জাপানের সংস্কৃতির বহু বৈশিষ্ট্য কিয়োটো রক্ষা করতে পেরেছে। হস্তিদন্ত, লাক্সা, চীনালাটি প্রভৃতি কাকশিয়ে এখনও কিয়োটো জাপানের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে। হুচীশিয়েও কিয়োটো বিখ্যাত। কিমোনো, গুডুনা ও সিডের অজ্ঞাত কাপড়ে কিয়োটোর শিল্পীরা এখানে যে শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়ে থাকে তা অজ্ঞাত ভুলত। চিত্রে এখনও কিয়োটোর শিল্পীরা তা'দের প্রাচীন ধ্যানটি অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে। বৌদ্ধধর্মবাদের মূর্তি নির্মাণে কিয়োটোর ভারতেরা এখনও দক্ষতর। বস্তুত: 'তোকিও' রাজধানী হ'লেও কিয়োটো এখনও নানা ভাবে জাপানী সভ্যতার কেন্দ্রস্থান।

কিয়োটো এখনও জাপানী বৌদ্ধধর্মের প্রধান স্থান। কিয়োটোতে প্রায় ৮১৩টি বৌদ্ধমন্দির আছে। এবং জাপানী বৌদ্ধধর্মের সকল সম্প্রদায়েরই ইতিহাস কিয়োটোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বৌদ্ধধর্ম এখন জাপানে প্রচলিত—

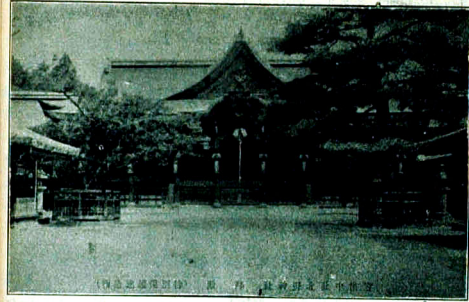
শ্রী প্রবোধচন্দ্র বাগচী

তখন নারা রাজধানী ছিল। কিন্তু কিয়োটোতে রাজধানী স্থানান্তরিত হ'বার পর থেকেই জাপানে বৌদ্ধধর্ম পরিপুষ্ট লাভ করতে থাকে। বৌদ্ধধর্ম জাপানে প্রসার লাভ করলে নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হ'ল। সে সব সম্প্রদায়ের কতকগুলি মূল হচ্ছে চীনদেশে এবং কতকগুলি সম্পূর্ণভাবে জাপানী। জাপানে বর্তমানে মোট বারোটি প্রধান বৌদ্ধসম্প্রদায় আছে। তাদের নাম হচ্ছে—কুশা, জো-জিৎসু, রিৎসু, হোমসো, সান-রেন-; কে-গোন, তেন-গাই, শিবোন, জেন, নিচিরেন, জো-দো ও শিন্-শু। কিয়োটোর যুগেই এ সম্প্রদায়গুলির উদ্ভব হয়—বৃষ্টির সপ্তম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে। কুশা নামটি সংস্কৃত 'কোশ' শব্দের রূপান্তর। সংস্কৃত বৌদ্ধ অভিধর্ম শাস্ত্র—'অভিধর্মকোশ'কে অবলম্বন করেই এ সম্প্রদায়ের উদ্ভব। চীনদেশে এই সম্প্রদায়ের প্রথম উদ্ভব। বৃষ্টির সপ্তম শতকের মধ্যভাগে চুইজুন জাপানী আচাধ্য জাপানে এই সম্প্রদায়ের প্রধান স্থাপনা করেন। অনাস্থাবাদ ও মারাবাদই এ সম্প্রদায়ের প্রধান মন্ত্র। সেই জুজই এ সম্প্রদায় জাপানে বিশেষ প্রসার লাভ করে নি—কারণ জাপানীরা অল্প হিসাবে বৌদ্ধ হ'লেও মারাবাদকে কখনো পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে নি। জো-জিৎসু—জো-জিৎসু-রেন- বা সত্যসিদ্ধি-শাস্ত্র নামক সংস্কৃত বৌদ্ধপ্রাণের মতবাদ নিয়ে গড়ে উঠেছিল। 'কুশা' সম্প্রদায়ের মতবাদের সঙ্গে এর বিশেষ যোগাযোগ রয়েছে। এ মতবাদের সপ্তম শতকে জাপানে প্রচারিত হয়—কিন্তু বিশেষ প্রসার লাভ করে নি। রিৎসু, বৌদ্ধ বিনয়, হোমসো—বিজ্ঞানবাদ, সান-রেন—নাগার্জুনের মায়ামক শাস্ত্র ও অজ্ঞাত গ্রন্থ এবং কে-গোন—মহাবান বৌদ্ধধর্মের অবতংসক হ'লকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। এই সব শাস্ত্র জাপানে—হয় চীনা ও জাপানী অনুবাদে, না হ'ল সংস্কৃত মূলে এখনও বিশেষভাবে পঠিত ও আলোচিত হয়। অজ্ঞাত জাপানী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের কথা পরে বলবো।

১০০২

শ্রী প্রবোধচন্দ্র বাগচী

উত্তরা
৩৫৭



বৌদ্ধ মন্দির—
বগদেহর ভারতের যখন
সাক্ষর্য মূলে উজান
করে ওঠে।



কিয়োটো
'মিনা' বা 'পলিন্দ'
জোগ্যানবি ওতামি
সম্প্রদায়ের প্রধান
মন্দিরের সিংহদ্বার।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে কিয়োটোর ও তাঁর নিকটবর্তী শ্বনসমূহের—মন্দির ও বিজ্ঞানশাখা বৌদ্ধশাস্ত্রের গভীর আলোচনা হয়ে থাকে। ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোচনা প্রায় সোপা পেরিয়েছে—ভারতের নিকটবর্তী দেশসমূহে যেখানে বৌদ্ধধর্ম এখনও চলছে—যেমন সিংহল, বর্মী, শ্রাম, কাশ্মির—সে সব দেশেও একটি মাত্র সম্প্রদায়ের বৌদ্ধধর্ম জীবিত। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও আলোচনার সে সব দেশে কোন অঙ্গদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু জাপানী বৌদ্ধাচার্যদের ক্ষেত্রে যে অঙ্গদৃষ্টির পরিচয় বেশ গভীরভাবে পাওয়া যায়—তাঁরা নানা সম্প্রদায়ের বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোচনার যে গভীর পারিতোষ পরিচয় দিয়ে থাকেন তাতে আশ্চর্য্যবোধ হ'তে হয়। বর্তমান কালে জাপানী বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রকৃত পীঠস্থান।

আর সাধনার কথা বলতে গেলেও ঐ একই কথা বলা চলে। জাপান বৌদ্ধসাধনাকে সম্পূর্ণভাবে জীবিত রেখেছে আর—তার প্রচারকাণ্ড বর্তমান কালে শুধু জাপানই করছে। প্রশান্ত মহাসাগরের ধীপে ধীপে বৌদ্ধ আচার্য্য গায়ের মন্দির ও বিজ্ঞান প্রকৃতি স্থাপনা করে, জাপান বৌদ্ধধর্মের প্রচারে বিশেষ সচেষ্ট। সে চেষ্টার পেছনে কোন গুঢ় রাজনৈতিক মতিসন্ধি থাকলেও থাকতে পারে—কিন্তু বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মের প্রতি জাপানীদের যে ভক্তি সেটা সম্পূর্ণ ঐকান্তিক ভক্তি।

কিয়োটোর জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে চার লক্ষ। সহরের মাঝখানে দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত, নদীর নাম কামো-গাওরা। নদী সুপ্রশস্ত, কিন্তু সুপ্রশস্ত নহে। পার্শ্বভাষ্য নদীর মত—বর্ষার পরে জলপূর্ণ হয়—অল্প সময় প্রায় শুক। তাহ'লেও কামো-গাওরা-যে কিয়োটোর পৌত্ত্বর্য়্য করে ছেড়ে তাতে সন্দেহ নেই। প্রাচীন জাপানী সাহিত্যে কামো-গাওরার নাম অমর হয়ে রয়েছে।

কিয়োটোর অল্পের কতকগুলি অল্পক্ষ পাছাড় বেধা যায়। তন্মধ্যে উত্তর-পূর্বদিকে হিয়েই (Hiei Shan) ও পশ্চিমে 'আরাশি-ইয়ামা'ই বিখ্যাত। এই সব পাছাড়ের দনসন্নিবিষ্ট বনানী কিয়োটোর চারদিকের দৃশ্যকে মনোহর করেছে।

কামো-গাওরা নদীর উৎপত্তি হয়েছে এই সব পাছাড় থেকেই।

হিয়েই-শানের নাম নানাভাবে জাপানের ইতিহাসের মধ্যে জড়িত। প্রবাদ যে কিয়োটো রাজধানীর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা নিকাদো 'কোয়ামু' অষ্টম শতাব্দীর শেষদিকে এই পর্বতে প্রথম মন্দির নির্মাণ করেন। হিয়েই পর্বতের আশীর্বাদ দেবতাপ্রদেয় প্রীতির অঙ্গই এ মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। এ প্রবাদ কতটা ঐতিহাসিক সত্যতার ওপর স্থাপিত তা বলা যায় না। তবে কিয়োটো নগর স্থাপনার সময়েই যে হিয়েই-শান জাপানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাতে সন্দেহ নেই। কারণ অল্পদিন পরেই হিয়েই জাপানী সাধকদের সাধনার একটি প্রধান স্থানে পরিণত হয়। পুষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে জাপানের একজন প্রধান বৌদ্ধসাধক দেস্কীয়ো (Dengyo) যখন প্রথম বৌদ্ধধর্মে উদ্বুদ্ধ হ'ন তখন তিনি হিয়েই পর্বতে একটি ক্ষুদ্র আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সাধনা শুরু করেন। দেস্কীয়ো ছিলেন অধ্যাত্মবাহী বৌদ্ধ। নির্জনে ধ্যানধারণাই যে অধ্যাত্মমার্গে উন্নীত হ'বার একমাত্র উপায় তা তিনি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেছিলেন। তাই প্রকৃতাভাবে ধর্মপ্রচারের পক্ষে তিনি এই পর্বতে নির্জনে কিছুকাল আত্মোচ্ছলিত নিরত ছিলেন। তাঁর প্রধান শিষ্য কোবো দাই-শিও এই খানেই মন্ত্রগ্রহণ করেন। জাপানের ইতিহাসে দেস্কীয়ো ও কোবোর স্থান যে কত উচ্চে তা অল্প নিদ্রাধর করেছি—পুনরুজ্জীবিত প্রয়োজন নেই। দেস্কীয়োর পরে অনেক জাপানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মাধকরাই এখানে মগ্ন নিবেছেন ও তাঁদের ধর্ম জীবনের কিছুকাল এই আশ্রমেই অতিবাহিত করেছেন।

মধ্যযুগে হিয়েই-শান বৌদ্ধদের একটি প্রভাবসম্পন্ন কেন্দ্র পরিণত হয়। পরে বছরার রাজনৈতিক নিয়নের সময় হিয়েই-শানের মন্দিরগুলি কতক ধ্বংস হ'লেও তার আশ্রম আজও জাপানী-বৌদ্ধের একটি প্রধান তীর্থক্ষেত্র।

কিয়োটোর প্রাচীন রাজপ্রাসাদ কামো-গাওরার দক্ষিণ তীরে সহরের মাঝখানে অবস্থিত। এই রাজ-প্রাসাদ, সাধারণতঃ তার জাপানী নাম গোশো (Gosho) দ্বারা পরিচিত। গোশো প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত, আর প্রাচীরে



"Saionji gate, Kiyomizudera."



কিয়োটো—
কিওমিজু-দেয়া মন্দির
সাইমন্ নামক প্রধান
জগেশ্বরদার :



কিয়োটো—
কিওমিজু-দেয়া—মন্দির,
পাথের পাথোলা

"Hondo, Kiyomizudera."

清水寺の本堂

চারদিকে প্রকাণ্ড উজান। এই উজানেই প্রাচীন কালে মিশারের পার্বণ্য বাস করতেন। ক্রিসোস্তোর প্রথম রাজপ্রাসাদ ৭৩৩ খৃষ্টাব্দে এই স্থানেই নির্মিত হয়। এই স্থানের তৎকালীন নাম ছিল উদা (Uda)। ১২৭৭ খৃষ্টাব্দে সেই প্রাচীন রাজপ্রাসাদ অগ্নিতে ধ্বংস হয়। সেই সময় থেকে মিশারেরা কিছুদিন অল্পস্থানে বাস করেছিলেন। পরে বোয়ান শব্দার্থী শেখ ভাণ্ডে এই স্থানেই দ্বিতীয় রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয়—সে প্রাসাদও কিছুদিন পর অগ্নিতে নষ্ট হয়। পরে প্রাচীন প্রাসাদের অল্পকরণে যে রাজপুত্রী নির্মিত হয় তাহাই আজও বর্তমান আছে। জাপানরাজের অধমতি বাতীত 'মোমো' বিদেশী গণ্যাকেরা বেধতে পারে না। তবে এই রাজপ্রাসাদ নির্মাণে যে জাপানীরা তাঁদের স্থাপত্যের প্রাচীন-ধারা রক্ষা করেছে তা' বাইরের থেকেই বোঝা যায়। জাপানের রাজারা এখানে আসার বাস না করলেও রাজপ্রাসাদ এখনও সুসজ্জিত ও জাপানের প্রাচীন চিত্রকর্মের অঙ্কিত চিত্র ও লাকার কাজে সুশোভিত।

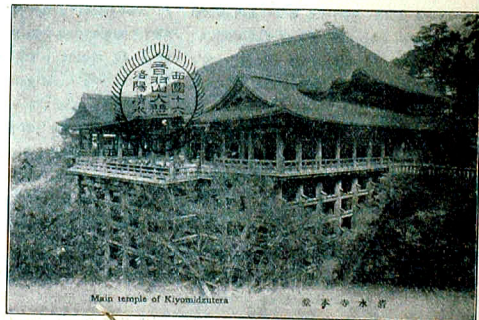
নদীর অল্প তীরে গোশের অন্তর্ভুক্ত ক্রিসোস্তোর রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ক্রিসোস্তোর তিনটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় আছে তন্মধ্যে এইটি সরকার পরিচালিত। এ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণভাবেই আধুনিক—৩০টি বিভিন্ন শাখার বিভক্ত—Law, Medicine, Engineering, Literature, Science ও Economics, Literature বা সাহিত্য-বিভাগে যেমন ইউরোপীয় সাহিত্য অধ্যয়নের ব্যবস্থা আছে তেমনি সংস্কৃত সাহিত্যেরও আছে। সংস্কৃত-সাহিত্যের অধ্যাপক ত্রীমুখ সারাকি প্রথমে পার্সিগে অধ্যয়ন করেন পরে ভারতেও কিছুদিন অবস্থান করে পুঁথিগত সংগ্রহ করেন। বর্তমান কালের প্রোভাতবিস্তারের নিকট এর নাম সুপরিচিত। জাপানে সংস্কৃত শিক্ষার আদর অল্পদিনের নহে। প্রাচীনযুগে অর্থাৎ নারা ও ক্রিসোস্তো যখন রাজধানী ছিল তখন জাপানের অনেক বৌদ্ধাচার্যেরা চীনদেশে আসতেন ও সেখানে চীনা ও প্রবাসী ভারতীয় পণ্ডিতদের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করে দেশে ফিরে যেতেন। ভারতীয় পণ্ডিতেরা কেহ জাপানে গিয়েছিলেন কি না তাঁর কোন

প্রমাণ নেই—তবে ক্রিসোস্তোর যুগে যখন জাপানী বর্ণমালা সৃষ্টি হয় তখন ভারতের প্রভাব প্রবল। শিক্ষিত জাপানীরা তার পূর্বে চীনা ভাষা শিক্ষা করতেন ও চীনা ভাষাই লিখতেন। নিজেদের ভাষার বর্ণমালা না থাকায় সে ভাষায় কোন লেখাপড়া চলত না। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার সঙ্গেই তাঁরা—শব্দ-বিশেষণ করতে শিখলেন ও শব্দ-বিশেষণে নিজেদের ভাষার জন্য একটি বর্ণমালা সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেন। প্রবাসে আছে যে এ বর্ণমালা সৃষ্টি ভারতীয় পণ্ডিতদের হাতেই হয়েছিল—কিন্তু সে প্রবাদের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না বলা যায় না। তবে এটুকু নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা চলে ভারতীয় বর্ণমালায় অক্ষরগুলি ও বর্ণমালায় সৃষ্টি। সংস্কৃত বর্ণমালায় মত ইহাও নানা বর্ণে বিভক্ত—যথা কা, কি, কু, কে, ক্ ইত্যাদি। যাহোক প্রাচীন যুগে জাপানে সংস্কৃত শিক্ষার কথঞ্চিৎ চল থাকলেও মধ্যযুগে জাপানে তাঁর কোন প্রভাব দেখা যায় না। পরে যশ্বরথ-অষ্টাদশ শতকে সংস্কৃত শিক্ষার আগ্রহ পুনরায় জাপানী বৌদ্ধাচার্যদের প্রবল হয়ে ওঠে। তখন জাপানের নানা প্রাচীন মন্দির গুঁজে সংস্কৃত পুঁথি বের করা হয়। এই সময়ে জাপানের নানাস্থানে যে-সব সংস্কৃত পুঁথি সংগৃহীত হয় তন্মধ্যে বিখ্যাত হোয়ি-জী-মন্দিরের পুঁথিগুলি উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে লিখিত সংস্কৃত বৌদ্ধ পুঁথির উজ্জ্বল হয়—ও পরে ইংকেও মায়াজুয়ার সাহায্যে সংগৃহীত প্রকাশ করেন। বহুদিন ধরে ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি হিসাবে এগুলি পরিচিত ছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে—এর চেয়ে প্রাচীন ভারতীয় পুঁথি মধ্য এশিয়ায় পাওয়া গেছে। সে যা' হোক খৃষ্টীয় যশ্বরথ শতকে জাপানে সংস্কৃত শিক্ষার পুনঃপ্রচার হয় ও তারই দারা আজ অবধি চলে আসছে। সুতরাং জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা যে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে হয়েছে এ কথা মনে করবার কোন কারণ নেই। জাপানের প্রাচীন সভ্যতা ভারতের সহিত অতি নিগূঢ়ভাবে সংযুক্ত।

ক্রিসোস্তোর রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে সব বিখ্যাত স্থান আছে তার মধ্যে চিওন-ইন (Chion-in) বিশেষভাবে



ওন সেন মিনে—ক্রিসোস্তোর
বাইরে পাড়াভরতনীর দৃশ্য।



ক্রিসোস্তো
কিওমিডু-কো—মন্দির
নীচে বিরাট নদী প্রবাহিত—
এই নদীতে বৌদ্ধ উপাসকেরা
ভীর্ণগমন করেন।

Main temple of Kiyomidzu

清水寺

উল্লেখযোগ্য। চিওন-ইন মন্দির একটি বড় উড়ানের মধ্যে অবস্থিত। এই উড়ানে এক অশ্ব মারুখান (Maru-yama) পার্ক নামে অভিহিত। চিওন-ইনের আর এক নাম কোয়া-চো-ভান (Kwa-cho-zan) এ নামটির আঞ্চলিক অর্থদ্বয় করা যায় ‘পুষ্পকুটিগিরি’। বসন্তঃ বসন্তকালে যখন এই উড়ানের মাছুরা ও উমে (Cherry ও Plum) ফুলে ভরে ওঠে তখন চিওন-ইন মন্দির পুষ্পকুট বলেই প্রসিদ্ধমান হয়। প্রবাসী আছে যে—প্রাচীন ভারতের শ্রাবস্তী নগরে যে জৈতবন ছিল সেই জৈতবনের দ্বিতী তালিয়ে তুলবার ক্ষেত্রে এই উড়ান ও তাপ নামে মন্দিরের প্রাণের পরিকল্পনা হয়েছিল।

জিন্‌-ইন জো-দো (Jodo) বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান মন্দির। ১২১১ খৃঃ অব্দে এটি মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। পরে জাপানের কয়েকজন প্রধান মহীনা শোভনগোষ্ঠীর সর্বোচ্চ কালফান এটি মন্দির ত্রি-সম্পদ হয়ে গঠে। বর্তমানে কালে ইহা জাপানের একটি প্রধান মন্দির হিসাবে গণ্য হয়। এ মন্দির বৈসম্প্রদায়ের প্রধান তাঁর নাম বোজিৎ-জো-দো। 'জো-দো' কথাটির চীনা উচ্চারণ 'জি-তু'-ইহা সঙ্কট 'স্বহাবাচী' শব্দের অর্থব্যয়। এটি 'স্বহাবাচী' বুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী বুদ্ধ হলেন-অমিত্যভ বুদ্ধ। অমিত্যভ বুদ্ধের একমাত্র উপাশ্রয় বুদ্ধহিসাবে যাঁরা গ্রন্থে কর্তৃত্ব তাঁরা প্রাচীন কালে একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় গঠিত করেছিলেন। ভারতে এ জাতীকে বৌদ্ধসম্প্রদায় ছিল কিনা তা'র সন্ধান প্রদান নেই-তবে বুদ্ধীর পঞ্চম শতকেই চীনদেশে এ সম্প্রদায়ের পথ পাওয়া যায়।

স্বাধীন জাতিশব্দ শতকের প্রথমে এই সম্প্রদায়ের নাম
জাপানে প্রচলিত হয়। জাপানে এ মতের প্রথম প্রকাশ
হলেন আচাধ্যা—গেন্-সু। খ্রিস্টাব্দ ১৮৩৩ খ্রীঃ জাপানে
নিম্নাঙ্গী—ফেদুক জগতপ্রেম করেন। মতে স্বাধীন যত
কোষবঙ্গের বয়স তখন তিনি ক্রিষ্টোত্তর নিকট দিয়ে
পঙ্কজের আশ্রয়ে বোধধর্ম্যে লিপ্ত হন। সেখানে
কিছুদিন সাধনা করার পর তিনি ক্রিষ্টোত্তর
বোধ-সাহিত্য অধ্যয়ন করেন—আরও গভীরভাবে
বোধধর্ম্য অন্বেষণ করেন। এই সময়ে তিনি প্রাচীন

মতের যোগাভাগ্য পরিভাগ্য করে অমিত্যত বৃদ্ধের নাম-জন্মই
মাক্সবাস্তবের একমাত্র উপায় ব্লির করেন ও নিজে নূন
বৌদ্ধসম্প্রদায় স্থাপিত করেন। অমিত্যত বৃদ্ধই এই সম্প্রদায়ের
একমাত্র উপায় দেবত-অমিত্যত বৃদ্ধের ভূমি-স্বাধাবতীই
একমাত্র কাম্যস্থান-ও অমিত্যতই ঐশ্বর্যিক ভক্তিই এই
সম্প্রদায়ের নুম্যম। অর হইকীয়েবের শেষ মুহূর্ত পায়ত
বৃদ্ধের নাম জগতের পালকীই যে মৃত্যুর পর স্বাধাবতী
লাভ হয়ে-সে সম্বন্ধে এই সম্প্রদায়ের বিবাস্য অত্যন্ত দূর।

চিওন-ইন্ মন্দিরের অন্তরে মাক-ইরামা উঠানে একটি ছোট মন্দির আছে—তার নাম গিওন (Gion) । প্রবাদ আছে যে প্রথম মতকে কোরিয়া থেকে তখন রাজত্ব বৌদ্ধ-শাসন নিয়ে প্রথম জাপানে আসে তখন তিনি এই এক মন্দির স্থাপন করছিলেন। সে বা 'হোক' ৮৭৩ খ্রঃ অব্দে এক বৌদ্ধ ভিক্ষু এখানে প্রথম বৌদ্ধমন্দির স্থাপন করেন ও মন্দিরের নাম রাখেন 'গিওন'—এই শব্দের চীনা উচ্চারণ—'জে-ইয়াত্সা' অর্থাৎ 'চ' উচুন। 'চ'র প্রাচীন উচ্চারণ জেত্—ইহা সংস্কৃত 'জৈত' শব্দের রূপান্তর। পুণ্ড্রিই বংশের যে 'জৈত' বনের পুত্রিক জ্যোতিষের তুলসার ফলই এ 'চ' ও তৎসংস্কৃত মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠা। এইখানে প্রতিবৎসর জুলাই মাসে সম্ভ্রাহাঙ্গ্যাপী একটি উৎসব হয়—তা'কে বগ হয় গিওন-মাত্সুরী (Gion-Matsuri) । এই উৎসবের সময়ে নানাতুল্য থেকে বহু লোকের সমাগম হয়। কো-বৎসর এই মন্দিরের নিকটে জাপানের বিখ্যাত নাট্য—'মিয়াকো-ওদোরী' (Miyako-Odori) হয়ে থাকে। এই নাট্য জাপানবাসীরা বহু প্রথমে সাসুত্রা বা চেসি হোক নোটে তখন হয়। শুধু 'গোইশা'-রৌই এই নাট্য পারদর্শী।

মন্দিরস্থান উত্তানের দক্ষিণদিক আর একটি মন্দির দেখা যায়। এর নাম 'হিন্দ্রাশি ওতানি' বা পূর্বে 'ওতানি' নামক-ইয়োনা থেকে হেরিয়ে দক্ষিণ দিকে যেতে 'নিশি ওতানি' বা পশ্চিম 'ওতানি' মন্দির দেখা যায়। হিন্দ্রাশিত-ওতানির পূর্ণশাখার প্রতিষ্ঠাতা কোমন্শু আর 'নিশি'ওতানি শাখার প্রতিষ্ঠাতা শিন্‌রানের সমাধি স্থান রয়েছে। এইখানে ওতানি-সম্প্রদায় সংকে কিছু বনা আবাসক।

সম্প্রদায়ের বৈদ্যধর্মের দীক্ষিত। এই সম্প্রদায়ের সমস্ত
গাণ্যমে প্রায় প্রতিশ হাজার মন্দির ও ত্রিশ হাজারের বেশির
মন্দির আছে। এই সম্প্রদায় প্রাধান্যে ছাট্টি বড় শাখার
বিত্তক—তাদের শাখা হয় ‘হিরাশি’ ও ‘নিশি’। বড় ছাট্টির
অর্থক্ষেত্রে পুষ্টি পাক্‌তিন। ব্যবসায় এ ছাট্টি শিন্‌স্ত্র নারক
বৌদ্ধ-সম্প্রদায়েরই ছাট্টি শাখা বর্তমানকালে ওড়ানি নাম
যে—ওয়ানি নামেই পরিচিত। প্রথমটি সম্প্রদায়ের নাম,
দ্বিতীয়টি (ওড়ানি) প্রাচীন অবশ্যকৃত্য বংশের নাম ও তৃতীয়টি
সম্প্রদায়ের প্রাচীন মন্দিরের নাম। পূর্বশাখার প্রাচীন
মন্দিরের নাম ‘হিরাশি’ যৌ—ওয়ানি’। বড় শাখার
মন্দির নাম ‘নিশি’ যৌ—ওয়ানি’। বড়
মন্দির বিলাতেও এই অর্থিত—মন্দিরের বিলম্বিত। ছাট্টি
প্রত্যেক মন্দির—গাণ্যনি স্থাপত্যের অক্ষুণ্ণ নিদর্শন। ‘নিশি
যৌ—ওয়ানি’ মন্দির প্রায় ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়,
মথি—মন্ড হ’বার পুরনো নির্মিত হয়। হিরাশি মন্দির—
সম্প্রদায় মন্দির নির্মিত হয়।

‘শিন্-স্ত’ সম্প্রদায়ের এই দুই শাখার মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। অনিত্য বাক্যই ‘শিন্-স্ত’ সম্প্রদায়ের উপাত্ত

দেবতা ও সুধাবতীই কামাখ্যান। সুধাবতী লাভের উপায়
— অমিতাভের ধ্যান, অমিতাভে ঐকান্তিক তত্ত্বি ও
সুধাবতীকে পুনর্জন্মগ্রহণ করবার জন্য ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা
পোষণ।

এই সুপ্রদায়ের ছই শাখাই অর্থশালী। তপান সরকারের
কোম্পান অর্থশাখা গ্রহণ না করে কয়েকটি বিবিধভাগসহ
ও নানা প্রাথমিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ এরা চালিয়ে থাকেন।
কিন্তুভাতে এদের ছটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে; তা'তেই
ধর্মোচোচনা বাস্তবী আনুগমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।
এদের প্রথম একজন বিখ্যাত সংস্কৃত-বুনিও মাজিও, এই
বিশ্ববিদ্যালয়েই সংস্কৃতের আধাপনা করছেন।

এই সম্প্রদায়ের প্রধান সহায়ক ওতানি বংশ জাপানে বিশেষ প্রভাব-সম্পন্ন। তারা বহুদিন ধরে জাপানের রাজনীতিতে ও আর্থনৈতিক আদানপ্রদান বিষয়ে নানাভাবে সক্রিয়। কয়েক বৎসর পূর্বে এই বংশের কাউন্ট ওতানির চেয়ার ও বায়ে মধ্য এশিয়ায় জাপানী পণ্ডিতদের এক অভিন্ন প্রেরিত হয়। তাতে বহু নূনুতথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে।

[illegible]

100

সকল বক্তাব্যব সম্বন্ধী বৈশেষ্য প্রস্তুত

শুভানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ও প্রিয়জনের

উপহার উপযোগী
বেনারসী সাড়ী ও জ্যাকেট

একমাত্র আমরাই প্রস্তুত করিয়া থাকি
এবং আধুনিক যুগের ভীষণাঙ্গাশুনির

ভসর গরদ, মটকা, খন্দর ও সিল্কের চাদর
প্রভৃতি আমাদের কারখানায় প্রস্তুত হয়।

ভূদেব উইভিং ফ্যাক্টরী

সো-ক্রম :—
 বেনারস সিটি

ক্ষণ-কাব্য

শ্রীপ্রণব রায়

মায়াবী চাঁদের আলো পড়েছে মোদের ছোট ছোটে,—
(শহরের ঘোঁরাটে আকাশে
এমন রূপালি চাঁদ ওঠে নাক' প্রায় ।)
পুরোনো মাটির ভাঙা টবে
একটি হেনার ঝুড়ি চুপিচুপি দেখা দে'চে সবো ।
আকাশের নীচে আর দক্ষিণ হাওয়ায়
তুমি-আমি বসে' পাশে-পাশে
জাপানী ছবির মতো আজিকার অপরূপ রাতে ॥

পাশাপাশি বসে' আছি, হে'বার্ঘে'বি করে' হুঁজনাতে—
হাতে হাত, কপোলে কপোলে,
(বৈষ্ণব-কাব্যের মতো মদির শরীর !
একগোছা যেন শাদা ফুল !)
আমরা হুঁজনে চুপ, কথা কয় মোদের আঙুল
শহরের পথে পথে খেমে গেছে ভীড়,
খেমে আসে স্বপ্নের করলো—
স্বপ্নের স্বপ্নের মতো আজিকার অপরূপ রাতে ॥

ক্ষণিকের গান বাজে কিরিকিরি দক্ষিণ হাওয়াতে ;
(তোমার চুলের আগে আজ
ফেনিল রক্তের তাপ গিয়াছে জুড়িয়ে !)
হুঁজনেই বসে' চুপচাপ,
হৃদয়ের সাথে চলে নিরিবিলা মনের আলাপ ।
এ নিরালা অবকাশে গিয়াছে ফুরিয়ে
ঘর আর বাহিরের কাজ —
প্রথম প্রেমের মতো আজিকার অপরূপ রাতে ॥

তারপর ? মায়াবিনী এই রাত চলে' যাবে দূরে ;—
(রাতের ফুলের মতো গায়
স্বপ্নজ্বের মতো মিঠা তোমার যৌবন—
সব বাসি হয়ে যাবে কাল ।)
এমন রাতের মোহ কেটে যাবে ; আসিবে সকাল
আমিও চলিছা যাব দূরের রাস্তায়,
যেথা ভীড়, বিচিত্র জীবন ;
তামাটে রোদের তাপে পথরাস্তা মুখ যাবে পুড়ে' ॥

পৃথিবীর মাথামেরা ভুলে' যাবে আমাদের সব ;
হৃদয়ের ক্ষণ-পরিচয়
একবারে ভুলে' যাবে দিন ছুই পরে !
একনি তো কত ক্ষণ আসে,—
কে-ই বা স্বপ্ন রাখে জীবনের করলো-উজ্জ্বল !
কেবল বিধাতা-কবি তারার আখ্যরে
মুহূর্তের প্রেমের বিষয়
অপূর্ব কবিতা লেখে সেই রাতে—যে-রাত নীরব ॥

ক্ষণকাল

—গল্প—

শ্রীপাঁচগোপাল মুখোপাধ্যায়

বাড়ীর পরিচ্ছন্নতা ত' ছিলই না, বাড়ীর অধিবাসী-
দেরও নয় ।
একদিন সেই অপরিসর, অপরিসর বাড়ীর অপরিসর
মনের মধ্যে গিয়া পড়িলাম ।
দেশের ভক্ত বেদনাবোধ করার ফলে কয়েকমাস জেলে
সেবাস করার পর, যে-দিন বাহিরে আসিয়া গড়াইলাম,
সে-দিন চল্লিশ টাকা মাহিনার চাকুরিটি আর নাই । মার্কেট
মফিসের চাকরী, থাকিবে আশাও করি নাই ; তাই ট্রামে এক
ঘন্টার এক টিকিট কাটিয়া খিরিপুত্রের এই বাড়ীটিতে
ঘাসিয়া উঠিলাম । বাড়ীতে প্রবেশের অধিকার লাভের
পর একজন আত্মীয় গৃহিণী বাহির করিতে আমার ভুল হয়
নাই । তিনি আমার মামার শাশা । মাতুলের জালক এবং
ভাগও কোন এক আত্মীয়ের ভাতার সহিত সম্পর্ক না-
গাথা স্বহস্তে চলিবে একটা কথা, আমারও শোনা ছিল ; কিন্তু
এক্ষেত্রে সেটা পালন করা মুক্তিযুদ্ধ মনে করিলাম না ।
বারণ কলিকাতা শহরে আর কাহারও নিকট পরিচয়ের
দাবী করিতে পারিব এমন ভরসা ছিল না ।
ভূমিকা এই পর্যন্ত ।
এখন বাড়ীটির কথা বলি । তা বাড়ীটি যে খুব ছোট
র' নয় । উপর-নীচে মিলাইয়া খান দশ ঘর তাহার ছিল ।
কিন্তু সবগুলিকে ঘর বলিয়া পরিচয় দিলে শব্দটার প্রতি
রাহুর যথেষ্ট প্রভা প্রদর্শন করা হইবে না । বিশেষ করিয়া
নীচের দিকের ঘরখানি ঘরের কথা আমার অনেকদিন মনে
থাকিবে । ঘরগুলিতে আলোবাতাস নির্বাপক-কৌশলের
কুই আসিত না, তার উপর আরু নিয়ারদের ভক্ত
খোলাগুলিতে চটের পদ্ম স্থলিত । যে-উঠানটুকুর চারি-
গশ ঘিরিয়া এই ঘরগুলি—তার মাথানেই কুইট কল,
সক সেখানে জমাগত আনাগোনা করিতোছে ।
কলতলার চারিদিকে আনাগোনা খোলা, ডিম ও মিড়ী

মাছের খোলা, এ'টো বাসন এবং ছাই প্রায় সব সময়েই
সুপাকার হইয়া থাকে । বাড়ীর সব কয়টি পরিবার নিমিয়া
যে মেথরটিতে টিক করা হইয়াছে সেখানেই কুইবার আসিয়া
সে কজালগুলি পরিষ্কার করিয়া দিয়া যায় । উপরতলার
ঘরগুলিও টিক হারিটেন ট্রাটের স্ট্যাট নর, তবু সেগুলিতে
বাস করিতে খাস বন্ধ হইয়া যায় না, এই যা ।
এমনি দশখানি ঘরের মধ্যে অল্পতপক্ষে পরিষ্কার জনের
বাস এবং কোনরকম অতিশয়াকি না করিয়াও বলিতে
পারি, ঘরগুলির সহিত তাহাদের জীবনযাত্রা প্রাণালীর
একটি সহজ যোগসূত্র ছিল । মামার শাশাটি অবশ্য উপরের
একটি অনতিসকলী ঘর লইয়া বাস করিতেন, কিন্তু কুই
বলিয়া তাঁর দিনখানপ্রণয় প্রাচুর্য ছিল না । বাড়িতে
ভক্তের ধারে, জাহাজ হইতে স্থান কেনের নীচে গড়াইয়া
তিনি মালতোলায় হিসাব করিতেন, কোন কোন বস্তা
কোন বস্তা চলিয়াছে তাহা লিখিয়া দিতেন, এবং সকলে
অনেকখানি কাশো হইয়া বাড়ী করিয়া গুমাংহতেন । যৌবনে
বিবাহ করিয়াছিলেন এবং যৌবন শেষ হইবার আগেই স্ত্রী
ঊঁহার রোগে ভুগিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে । দ্বিতীয় দীপ
অনিবার ভক্ত একটি মেয়ে তিনি রাখিয়া গিয়াছেন ; সেটি
ঊঁহার প্রালিকার কাছে থাকে এবং সেই মেয়েটির ভক্তই
ঊঁহার অর্থোপার্জনের এই প্রাণালিকার প্রস্তুত ।
তবু রাখালবাবুকে—অর্থাৎ আমার আত্মীয়টিকে এই বাড়ীর
বাতিক্রম বলিতে হইবে । কারণ আর সবাই মেয়ে-ছেলেদের
ছিড়ে বাড়ীটিকে একটি চিহ্নিতাখানা করিয়া তুলিয়াছেন ।
সকাল হইতে রাত্রি একটা পর্যন্ত ইহাদের বিভিন্ন ঘর ও
দুই ঘনমিত ঘনমিত যে কোন স্থান ব্যক্তিই যৈধ্যুত
ঘটবার সম্ভাবনা । তা ছাড়া বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যের
উগ্র-মধুর পরিচয় এবং একঘরের সহিত আর একঘরের
বাসিন্দাদের নিত্যকার কলহ ও আছে ।

আমি জেমে গিরাছিলাম শুনিতে বাড়ীর ভোমেরে বেধে
হয় আমার চরণেরে উপর সন্দেহ করিবে এবং আমিহে কাল
করিয়া দরজা-জানালা না দিয়া ঘুমাইতে পারিবে না
করিয়া কবিতা ক্রিয়রা জেলে য়িরাছিলাম, এটা এবং দ্বিতীয় পক্ষে
রোহিতম বিখ্যাকর। এই নীতিগতর ভাগলোনবাবু প্রত্যভাষ
অক্ষিমে গিয়া, মোটা মোটা থাড়া ভড়াইয়া য়েহেন, ঈর্ষাক্ষেপে
ত' জেলে বাধেহেহর-বাই- উপতরর নৈ-কান্দিয়া
ঈদর চক্রবর্তীর ভাইগছ ত' তাদের ক্রোশর জ্বালালে
মোকামেরে হঠাৎ কত আন্ধি নিষিদ্ধেহে, অপর উপর
সম উপরহেহর হয় নাই। স্বতরাং

কিন্তু বাড়ার সকলের কথা বলিবার ক্ষমতা আশ্চর্য লিখিত
 বসি নাই, এই বাড়ীর একটি মাত্র কোমর-কথা বলি-
 বলিই আশ্চর্য কবিতা, এবং তাই কথাই বলি-
 সেই অতি জীর্ণ এবং অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর বাড়ীটির সমস্ত
 কিছু মতো সেই একটি কোকিল আমার কাছে স্বতঃস্ফূর্ত
 আশ্চর্য-বিন বসার পূর্বের কয়েকটি মুহূর্তের উপর এখন
 বিস্তারিতভাবে টানসা বোঝায় হয়-নাই।

এই গল্পে তাকে বীণা-বলিয়া পরিচিত করিলাম, আর
এতবড় পূর্ণিমার কোনখানে এখনও হয়-ত' মে-বাচিয়া
আছে।

যখন এই বাজীতে প্রথম পা দিই তখন হাতছাড়া বেশী
নাই। নাসপাশকে কাটাবার পর একদিন বুটেরাওয়া, ত্রাণি
করিয়া বাজী কিরবার সময় তাহার মধ্যে প্রথম দেখা। হাতে
কোরোসিনের ফিরাই লইয়া দেহদ্বারা পুষ্টা গিয়াছিল-
সামনে অগুরিতই আমাকে দেখিয়া, কাননন্দসিঁথি হরিণ-
মত কৃত সন্নিহা গিয়াছিল। এইটুকু কইয়া, মনে মনে
একটুখান কাব্যরসনা করিয়া সেখান আশ্রয়ভুক্ত হইয়া
লোকের পাশে আসিয়া অস্থাবরিক হইত। না কি
কোরোসিনের স্নানগোচ্য বর্ণকালিয়ায়, সামনে প্রথম গিরজা
বসিয়া বোধকরি, কদাচিৎ স্তম্ভ হইয়া নাই।

আবার অস্থগতিকালে সেই দিনই সে আসিয়াছে।
তার দ্বারা মহাশয় এই বাতীরই নীচেতার একজন প্রতি-
বাসিন্দা। সকাল হইতে কাশিয়া কাশিয়া তিনি পতিব্রতকে
প্রত্যেকের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া থাকেন। চাকরী

পেপন লইয়া নীচে একটী ঘরে পড়িয়া তিনি প্রথমে বিদ্যাতার অবশেষের নিদ্রা করেন। জামাই ও মেয়ে তাঁহার বহর আটন করি অগ্রে তাঁহাকে ছাড়িয়া চরণাড়া হইয়াছে। বীণার বিবাহ-অবস্র তাঁহারা দিয়া গিয়াছিল, কিন্তু বিবাহের পর দুই বৎসর কাটিতেই তাহা প্রয়োজী-জীবন দুরাধা হইয়াছে। বীণা যে তখন বিবাহিত হইতে চাহ ন, সেম মাত্র জীবনের হতাশা পন্ন করিয়া ছাত্র পত্নীরা কাশীে দুইটি মাস অনিচ্ছজন্যে অবশেষে মগির নদীে উঠিতেছিল, এমন সময় স্বরাগণা গেল ভাঙ্গিয়া, চুসবার হইয়া।

এসব কথা অবজ্ঞা বিদ্যার কাছে শুনি নাই, বরং দাড়াইয়াই নিজেই বলিয়াছিলেন। কিন্তু সে-কথা আমাদের কান্ধা কান্ধা ছাড়াই গেল।

কতদিন পরে গ্রিক মনে নাই, হুগুর কেবার চুপ করিয়া বিছানার উপর পড়িয়াছিলেন; ঠেক-বিগ্রহের বাহিরে এক-তাই-বিছাইয়া পড়িয়া মনেও বেধেকরি তাহার চেয়ে লাগিয়াছিল। আত্মীয়তার গলগ্রহ না হইবা অজ কোথা রাইতে পারি কি না সে সম্বন্ধে মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন এমন সময় বাহরের বাহিরে যে ছাত্রা ফেলিয়া সে বীণা সেইভাবে হইতেই বলিল একবার নাচে আহ্নন শব্দগিরি করি দাড়াইয়া কি রকম কবলার।

দাদামশায়ের জীবনে যেন মুহূর্ত 'আসন্ন হইয়া আসিবে'
বীণার পক্ষে তাহা চিন্তার কথা, কিন্তু এ জ্ঞান আমার কেন
বিস্ময় তখন মনের অঙ্গ অমুত্তিগুণকে ছাড়িয়া
উন্মিষাছে।

কাকিয়ার বিবাহের সঙ্গে একটি কথাও না বলিয়া এক সম-
তাহার, সমীক্ষিত নাতনমহের শিরের আশিয়া পাড়াইল।
কল্লিন-লালিত কাশির লমকে উত্তার সমস্ত শরীর ধর-
করিয়া লালিয়াছে, তেজ হুইট রক্তবর্ণ হয়। উত্তিয়াছে
মুগা, দিয়া, পানিকটা, পুত, রসের হয়। পড়িতেছিল, তৌ-
নিত হইতে একটি পিকবানী লেখা, বোনা বালান'য়ের ম-
ধরিল।

সেইজান তিন যেন মানলাইয়া গেলেন ; থুতু ফেলিয়া

চোখ বুজিয়া পড়িয়া রছিলেন। নিজের কাশির শব্দ ছাড়া।
পৃথিবীর আর সমস্ত শব্দ তখন তাঁহার কানের কাছে কুরাইয়া
গিয়াছে।

বীণা কহিল, বাড়ীতে আগনি ছাড়া প্রথম মাহুয় কেউ
নৈ, মেয়েরা যে বার পরে পড়ে পুচ্ছে। কি করব হঠাৎ
আগনার কাছেই গিয়ে পড়লাম! সকাল বেলায় ডাক্তার
এধ লিখে দিয়ে গেছেন, কিন্তু লোকের অভাবে আনানো
হয় নি। দেবেন ওটা এনে?

নীবার কথা রাখিগাছিলাম। ইচ্ছা হইয়াছিল, ওষুধের দামটা নিজের কাছ হইতেই মিটাইব, কিন্তু এত বড় উদারতা দেখাতে হইলে আমার আত্মীয়টির পকেটের উপর অত্যাচার করিতে হয়।

তাহার সাহিত্য আমার পরিচয়ের ভূমিকা সত্য বলিতে
গেলে ওইটুকুই।

ইহার পর আরও ছুইমাস বোধ করে সেই বাড়ীতে ছিলাম কিন্তু তার মধ্যে একটি দিন ছাড়া বীপাকে আমার কাছে আসিতে দেখি নাই : দরকারের অস্বত্বতেও নহা এ জন্ম নবনে মন্থীভাবিত চিত্তের তরলতা-সম্বন্ধে অস্বস্ত্যর একটি দরবে একেবারে বাধ্য হয়ে নাই, এ কথা স্বীকার না করিলে মস্তার অস্বাভাব কথা হয়। প্রত্যেকদলের দিনে আমার কাছে আসিতে তার বাইদে নাই, স্বতরাং বিনাকাজের প্রত্যেকজনে কোন দিন সে হয়ত আমার আমার দরদর সামনে আসিয়া পড়াইয়াই—উহা আশা করিয়াছিলাম। কারণ দামরা প্রত্যেকেই পরের কাছ হইতে অগ্রত্যগানিত কিছু প্রত্যাশা করিবার স্বাধিকার সম্বন্ধে পরের ভিতর লগন করিয়া থাকি।

কিন্তু দুই মাসের মধ্যে তাহাকে আর দেখি নাই এবং সেদিন যে ভাবে তাহাকে দেখিয়াছিলাম, সেই দিনই তাহার সমাপ্তি।

সে-দিন উপরতলার শ্রীপদ চক্রবর্তীর মেজোমেয়ে কালীর
বিয়ে। বিবাহ করিবার বয়স তাহার হয় নাই, কিন্তু সদ্দা-
মটিন শীঘ্রই পাশ হইয়া হিন্দুর পবিত্র বিবাহ-প্রবন্ধ মলে

কুঠারাবাত্ত করবে এই আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া চক্রবর্তী তাঁর
মেয়েকে বিদায় করিবার আয়োজন করিয়াছেন।

পরাবরে দেয়ের বিবাহ, ধূম্যাম এমন কিছুই হইবার কথা নয়। তুমারে নহবৎ বেশে নাই, ছাঁবে হোপোটা টাটানো হয়ে নাই। তবু সেদিন সমস্ত বাড়ীতে ঢাঙ্কো বেগুন বিয়াছে। ছোট ছেলেরদেরগুলি সন্ধ্যা হইতে-রাখিবে একটু বিশেষ সমারোহ করা প্রতীক্য করিতেছে,—আজ তাহারো লুচি খাইবে এবং আরও কত কি। এই বাড়ীর এক পরাবরে সমস্ত আরও কত পরাবরে প্রাতিদিন একবার ময়োরা আনবে, আজ সেই চিরায়ত-নীতির ব্যতিক্রম। আজ ময়োরা উঠনে তোমাদের ভিতর তাহাখানি বিয়া সমস্ত-রসিক গাটেরা ভাগ কাণ্ডগুলি ভিচ করিয়াছে, যে যেউটিতে কোনদিন মাথায় তেল দিতে বেশি নাই, কথু-চুপের আঁচর বাস সীম্প-সিমুর ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল,—আজ আর সব-বেহতা নিম্নারি। তার ভক্ত ছাড়াইয়া দিয়াছে; তার আশ্রয়-বিক্রয় দেশেরা আজ অসম্ভবত্বের নীচে পড়ের। তার লুচিটোছে

এবং নীমস্ত্রে অত্যন্ত প্রবল একটি আয়ত্তিরেখা শোভা পাইছে। একটি বিশেষরীর লগাটে আরও নূনন করিয়া সিম্ফ-রেখা প্রত্যাহিত, সম-মেরেদের কাছেই তাই এই নিমিত্ত আশ্বাসের গোড়োয়া ভরিয়া উঠিয়াছে। নীচতলার বৈমোচন ড্রাইক্যুটি পালের মধ্যে রয়েছে কুঁড়িগির ফাটের নৈ এবং তিন পালের পথভাঙা বাকী না পড়িলে টকা মিটাওনা করিলে কথা ভাবিবেই পারে না। পালের দ্বীও আটিকার কক্ষ-চাকলার মধ্যে বৈমোচন ক্রমেই অস্বাভাবিক স্থল বেতিবেছে—যেদিন পুষ্পাস্ত্র জগৎ-মন্ডর বেশতশবার পালে গিয়া দাঁড়াইবার সময় তার অক্ষর-লাহিত প ছুটী হইয়া বিশদ হইয়া গিয়াছিল; যেদিন দ্বারের বাহিরে, জানালার পানে একটা অক্ষর বাগ চক্ষু ঠাট্ঠার প্রথম পরিত্র দেখিবার স্তম্ভ বাগস হইয়াছিল।

কিন্তু কল্পনার জাল নাই বুনিলাম, সেই দিন সন্ধ্যার পর
যে ঘটনা আমার সমস্ত কবি-কল্পনাকে ছাপাইয়া উঠিল
তাঁহাই বলি।

হইয়া গেল এবং এমনি সমারোহের সহিত বৃষ্টি নামিয়া আসিল যে চারিদিকে একটা ব্যস্ততা দেখা দিল। চক্রবর্তী বাজার হইতে কি-একটা জিনিষ কিনিয়া উপরে উঠিবার সময়, পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেলেন এবং এমন ছোটটাকা অর্থ আরও ঘটিল। আমার স্বাভাবিক কৰ্ম-বিমুখতা আমাকে এই কোমাল হইতে ঘুরে সরাইয়া রাখিয়াছিল। রাণালবাসুর ছোট ঘরটিতে পড়িয়া পড়িয়া ভিতরের কলসর এবং বাহ্যিকের বৃষ্টির উজ্জ্বলতার মিল খুঁজিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। উৎসব-উল্লাসের প্রতি আমার কোন-একটা প্রত্যাশীনতা আছে; ধনজনদের সঙ্গে মিলিয়া যে-কোন কারণেই হউক, হটগোল করিতে আমার বাধে। ঘরে শুইয়াই দেখিলাম, অন্ধকার হইয়া আসিল, উপরে উঠিবার সিঁড়িতে গ্যাসের আলো জালিয়া দেওয়া হইল। বৈজ্ঞানিক ব্যক্তি জগাইবাবুর মত বিদ্যাসিদ্ধ এ-বাড়ীর কাহারও ছিল না।

বর আগিতে তখনও ঘটা ছই বাকী; ইতিমধ্যে ছেঁড়া ধনুকের পাখাবীড় কাঁধে ফেলিয়া, কিছুক্ষণ পথে ঘুরিয়া আসিব কি না ভাবিতেছিলাম, সেই সময় স্বয়ং চক্রবর্তী ঘরের সামনে হাজির। তাহার ভেড়ামার্কী টুইলের কতরা দিয়া ভ্রূক্ষ বাহির হইতেছে,—ঘরে বসিয়া টেব পাইলাম; কপালে গাম; রূপার চশমাটার একটি ভাটা কাল কি করিয়া ভাঙিয়া গিয়াছে—সেই নিচুটা কাপো, মোটা হুতা দিয়া জড়ানো।

—বেশ লোক ত' মশাই আপনি শ্রীজীব বাবু! কখন-বাড়ীতে লুকিয়ে ঘরের মধ্যে বসে আছেন! চলুন ত' দেখি আমার সঙ্গে, ঢের কাজ রয়েছে!

বিরোধীভাৱে কাজের অভাব হয় না, এ-আমার জানা ছিল। কিন্তু—

চক্রবর্তীর কাছে কোন আপত্তিই টকিল না।

—বামুনগুলো সব কটা জোড়ের। সকলে বেটাগা বললে,—সাদে সাত সের গি হলেই চমৎকার লুচি হ'বে মশায়, এখন বল কি না আরও বেড়সের গি হলে খোশা উঠবে না। চলুন ত' ওপরে, ওপরে কাছে আপনাকেই বসে থাকতে হ'বে, নইলে ভক্তশেকরা হয় ত' এসে না থেতেই দিগে যাবেন। দ্বিধা থেকে প্রত্যেকটা বামন শিব হয়ে বসে

আছে, ওরা ক'মনেই লুচির মুক্তিগুলো সাফ করে দিতে পারবে।

নিরুত্তি নাই বুদ্ধিগা চক্রবর্তীকে অস্বরণ করিলাম।

উপরের ছাবটি নিত্য ছোট ছিল না, কিন্তু বাহ্য-ভবে বেগোলা টাঙানো হয় নাই; বৃষ্টি নামিবে তাই বা কে জানিত। কেবল রান্নার জন্ত সেই ছাবের একপাশে তেরপল টাঙাইয়া বানিকটা জাখ্যা ঘিরা দেওয়া হইয়াছে। চক্রবর্তী সেইখানে আমার পৌছাইয়া গেলেন। একটি টুল টানিয়া একপাশে বসিয়া পড়িলাম।

তখনও বৃষ্টি পড়িতেছে, তবে প্রাথমিক সমারোহ আর নাই। রান্নার শব্দকে ছাপাইয়া বৃষ্টির উজ্জ্বলতা তখন আর কানে আসে না। তবে হাওয়ার বেগে ত্রিগলটা মাকে-মাকে স্বানচূত হইবার আশঙ্কা জানাইতেছিল। ছাবের ও-পাশটা অন্ধকার, লোকজনও কেউ নাই। মনে হইল, গরমের মধ্যে না বসিয়া, গৃহ বৃষ্টির মধ্যে বানিকটা গুই অন্ধকারে ঘুরিয়া আসি। অন্ধকারের মধ্যে আমি নিজেকে অত্যন্ত বেশী করিয়া অহংকর করিতে পারি। কথটা মনে হইতেই উত্তীর্ণা পড়িলাম।

কিন্তু কে জানিত যে সেই সময়, সেই অন্ধকার ছাবের এককোণে বীণাকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিব! অথবা বাহ্যকে দেখিলাম সে বীণাই। কোণটিতে কতকগুলি ইঁট জড় হইয়া পড়িয়াছিল, বীণা সেই গুলির উপর বসিয়া আছে। তাহার মুখখানি ছই হাতের তালু দিয়া ঢাকা, তবু তাহাকে চিনিতে দেরি হইল না। অমন রাশি রাশি মেঘের মত চুল সে ছাড়া এ বাড়ীর আর কোন মেয়ের নাই।

কথা বলিব কি না ভাবিতেছিলাম, বাড়ীর সমস্ত কৰ্ম-জালকা হইতে নিজেকে ছিঁড়িয়া আমিরা সে যখন-আমাকে এমনি জনহীনতার মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছে—তখন নাই, যা তার ধানভঙ্গ করিলাম। কিন্তু নিজের উপর আশ্রিত্য করিবার সময় তখন হারাইয়া ফেলিয়াছি।

বর্জিলাম, বীণা, এই বৃষ্টিতে বসে বসে ভিজত কেন?

বীণা মুখ তুলিয়া চাহিল। কিন্তু কথা বলিতে তার অস্বস্ত দেরি হইতেছে। অস্পষ্ট দুইটি গভীর দৃষ্টি দিয়া নিশ্চয়ে সে আমাকে দেখিতে লাগিল।

নীচে থেকে তোমাকে কি ওরা ভাড়িয়ে দিয়েছে?

না!—এতকণে বীণা শুধু একটি কথাই বলিতে পারিল। তবে?

বীণা উত্তর দিল না। আর তাহাকে বিরক্ত করা উচিত হইবে না মনে করিয়া ফিরিতেছিলাম; হঠাৎ বীণা ডাকিল—শোনো।

এই আকাশের ভাষা আমার কাছে, বাণীকর কানে নিজের মূখ দিয়া উদ্ভারিত প্রথম নোেকের চেয়ে বিস্ময়কর! কিছু বলা শোমন হইবে কি না তাই ভাবিতেছিলাম, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌছিবার পূর্বেই বীণা আমার একটা হাত ধরিয়া উঠিল—অত্যন্ত শঙ্কভাবে, কিন্তু অত্যন্ত নিরীড়ভাবে সহিত, বলিল, বসো।

নাটকের ভাষায় বলা যায় স্বান-কাল-পাতা তুলিয়া গিয়াছিলাম। শুধু বলিতে পারিলাম, কেন?

বীণা বলিল, কেন আমার কাছে একটু বসলে তোমার কি হ'বে?

তার কণ্ঠস্বর আমার কানে এত গভীর হইয়া আর কোন দিন বাজে নাই।

অনুত যোগল :তবু সেই স্ত্রীপাকার ইঁটগুলির কোমরে বসিয়া পড়িলাম।

এখনও চুপি চুপি বৃষ্টি করিতেছে, বাতাসের উদ্ভাসতা বয়ে নাই। বীণার রম্য চুলগুলি গিটার উপর, মুখের উপর রাঙা পড়িয়াছে। মনে হইল, বীণা চুলে উগ্র স্বপ্নের রান্না আসিয়াছে, আরও বানিক এমনি পাশাপাশি বসিয়া থাকিলে নেশা ধরিয়া যাইবে। তার সমস্ত দেহের আর কোণও কোনরকম পরিপটা নাই, কিন্তু চুলগুলিক এমনি বিরাময় করিল কেন সেই জানে! তাহার পাশে বসিয়া রান্নার কথাই অবজ্ঞা ভাবিতেছিলাম; সেই সময় বীণা বলিল, সবে এসো।

সে তার আদেশ নর, অস্বপ্নের এবং সে অস্বপ্নের আমি গিয়ালাম।

বীণা আমার একখানি হাত, তার নিজের হাতের মধ্যে দিয়া কৈশোর উপর রাখিল, বাধা দিলাম না। তারপর বলিল, তোমার মধ্যে হচ্ছে, নহ? আচ্ছা, বাও।

‘কিন্তু কি জানি কেন, যুগা আমার সত্যই হয় নাই, গুই উত্তীর্ণা আবিলাম না। বীণাও বোধকারি দেটা

বুলিল। তারপর হঠাৎ আমার দুইটি হাত তার কাঁধের উপর রাখিয়া বলিল, আমার কাঁধ দেটা খুব জোর করে চেপে ধরতে পারো; আমার বন্ধ কই হচ্ছে।

তার কাঁধের ছই পাশে চাপ দিতেই বীণা চোখ বুজিয়া বানিক স্তম্ভ হইয়া রছিল, যেন স্বপ্ন দেখিতেছে। তারপর সেই ভাবেই বলিল, নাচে-বাঁচে শব্দেদী করে বেরাও, হাতে একটু জোর দেই? এমন করে চেপে ধর বাতে মনে করত পারি, আমাকে এখান থেকে কেউ সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

কে তোমাকে সরিয়ে নিয়ে যাবে?—জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।

কেউ না, কেউ না, তুমি তা বুঝেনা,—বীণা বলিয়াছিল এবং সত্যই বীণাকে আমি বুদ্ধি নাই।

এমনি করিয়া প্রায় আধ-ঘণ্টা দুইজনে পাশাপাশি ধসিয়াছিলাম এবং দুইজনের কেউ একটি কথা বলি নাই। বীণাকে তাহার এই অদ্ভুত আচরণের কৈফিয়ৎ দিবার জন্ত পীড়পীড়িত যে করিতে পারিতাম না, এমন নয়; কিন্তু তাই এই স্বপ্ন কয়েকটি মুহূর্তের মাধ্যম পাছে নষ্ট হইয়া যুগ, তাহে ভয়ে গোষ্ঠীর মত চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম। বীণাকে কতদিন চেপে পড়িতেছে, আমার কাছে না আসিলেও প্রায় প্রতিদিন এই বাড়ীর কোণাও-না-কোণাও একবার দেখিয়াছি, কিন্তু এত কাছে আনিয়া, এত নিবিড় করিয়া দেখা আর হয় নাই। এতদিন তাহাকে সাধারণ, স্বরূপ ভাণের উপেক্ষা একটু শ্রামলা মেয়ে বলিয়া জানিতাম, আচ্ছা এই অন্ধকারের মধ্যে তার কপের নিশ্চল-ঐশ্বর্য যেন আকাশের তারার মত আমার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল।

সকলের চেয়ে বেশী করিয়া অহংকর বলিমে যে এমনি নীরব কাছে তার নিঃসহায় একাকিত্বের কথা বুদ্ধিহীন অত্যন্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেইটাই কারও হাতে তুলিয়া দিতে পারিলে যে বাড়িয়া যাইবে। সে ব্যক্তি তুমি হইতে পারো, আমি জীবীর হইতে পারি এবং অজ্ঞ যে-কেউ। হস্ত তাহাকে ভুল বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু তার জীবাণু স্বপ্নকে বেশীক্ষণ লালন করিবার মত সময় দিতে সীক্লাম না; যে পথ ধরিয়া চলিয়াছি মনোবিশ্বাসের মত পাপ সেখানে আর নাই, এই কথা মনে করিয়া তাড়াভাড়ি উত্তীর্ণা পড়িলাম।

কিন্তু বীণা উঠিল না, প্রাণবীণ প্রতীহার মত সেইখানে বসিয়াই অন্ধকারকে ছই চোখ রাখিয়া মন করিতে লাগিল।

[একটি শরনকক্ষ। খুব বড় একটি জানালার পাশে একখানি খাট। জানালার বাইরেই হাবিধ্বস্ত বারান্দা। কক্ষের বেরিকে এই জানালা সেই দিকেই কক্ষের দরজা, দরজার সম্মুখেও এই বারান্দা। বারান্দার নীচে ছোট একটি ফুলের বাগান। তাহার পরই খুব উঁচু দেওয়াল। দেওয়ালে শতাব্দী গোলাপের গাছ। ঘরে খাটের ওপর গোশ-শয্যাও একটি ছোট মেয়ে, বছর দশেক বয়স হইবে। নাম টিয়া। তাহার নাথার কাছে তাহার মা করুণা বসিয়া আছেন। খাটের পার্শ্বে টি-পত্র, তরুণীর একটি বড়ি টুকু টুকু করিয়া চলিতেছে, এবং ঔষধপত্র, পার্শ্বোন্মিটার প্রভৃতি রাখিয়াছে। বারান্দার কদেকখানি চেয়ার। তাহাতে টিয়ার পিতা মহুজন্য এবং তাঁহারই আত্মীয় স্বজন এবং ডাক্তার বসিয়া আছেন।

বারান্দার ত্রিক জানালার সম্মুখে একটি টিয়া পাখীর গাঁচা ঝুলিতেছে। গাঁচাতে পানী নাই, গাঁচার দরজাটি খোলা। টিয়াপাখীটি উড়িয়া গিয়া দেওয়ালের উপর বসিয়া আছে।

মেয়েটির অন্নহা খুবই স্বচ্ছপন্ন। সকলেই অত্যন্ত বিবাহ। ঘড়ির টিকটিক শব্দটাও ভালো লাগিতেছে না, তাহারই তালে তালে সকলের হুকুর ডুক ডুক শব্দও বুঝি শোনা যায়।—আসর সন্ধ্যা।—]

মহুজন্য। সন্ধ্যাটাও কি পার পাবে না ডাক্তার?
ডাক্তার। নিশ্চয়।

[পার পাইবে কি পাইবে না, কোনটা নিশ্চয়, ভাল বোঝা যেন না।
কিন্তু এ দশকে বিতীরা এক কথিতেও কেহ সাহায্য হইল না!—]

মহুজন্য। ডাক্তার, তুমি আর একটা ইনজেক্সন দাও—

ডাক্তার। না।
ললিত। ঐটুকু মেয়ে... আর কত হইবে!
অমির। বেশ যুগুচ্ছে...ওকে আর জ্বালাতন...
ডাক্তার। রোগ হলই জ্বালাতন হতে হয়।...
আনন্দা। মনে ভাবছেন যুগুচ্ছে, কিন্তু ওকে যুগু বলা চলে না। তবে, ইনজেক্সনেরও আর প্রয়োজন নেই।

[গভীর নিঃশ্বাস]

মহুজন্য। এক! করুণা উঠে আসতে!
ডাক্তার। এইবার যদি শুক ওঘরে পাঠাতে পারেন। বিশ্রাম স্তর নিত্যক আবশ্যক। রাতের পর রাত জেগে, দিনরাত রোগীর পাশে থেকে থেকে স্তর চেহারা যা হচ্ছে, দেখলে আমারি ভয় পায়। স্তর কোন গুরুতর অসুখ করেছে নিশ্চয়।

মহুজন্য। টিয়া গুর প্রাণ। টিয়া না বাঁচলে শুকও বাঁচেনা যাবে না ডাক্তার। আমার নিস্তা ও সাধ করে তাগ করে নি ডাক্তার—!

ডাক্তার। কিন্তু তথু...
মহুজন্য। চুপ—

[করুণা তথার আদ্যা ধায়ইছেন]

মহুজন্য। কি করুণা?
করুণা। [দেওয়ালের দিকে তাকাইয়া.....] টিয়া-টি এখনো... আছে!

মহুজন্য। কিন্তু আমারের টিয়া? যুগুচ্ছে? কি বুঝে?

করুণা। হাঁ, বুঝিয়েছে, কিন্তু কথা বলে বলে স্নায়ু হয়ে তবে বুঝিয়েছে—!

মহুজন্য। কি—কি বলল?

করুণা। ওর ঐ মিতার কথা। তোমার কথা নয়, আমার কথাও নয়, কল-ফুল-খেলনা...কোন কথাই নয়, শুধু ঐ টিয়ারই কথা!

মহুজন্য। -ওটাকে দরবারও তো কোন উপায় দেখতি নে। দরতে গেলেই—

করুণা। [আতঙ্কে] না—না—

ললিত। কি করে ওটা খাচার বাইরে গেল?

মহুজন্য। ডাক্তার কবরেজ নিরৈই আমরা বাস্ত, সেই ঠাঁকে—

ডাক্তার। টিয়ার টিয়া-টি—

করুণা। চুপ। কথা আছে, শুধু—

ডাক্তার। [করুণাকে] আপনি বহন না—

করুণা। না। ব'লে গল্প করবার মতো শক্তি নেই। শুধু একটা কথা...জীবন-মরণের কথা...

[গভীর নিঃশ্বাস]

মহুজন্য। কি কথা করুণা?

করুণা। জীবন-মরণের কথা।

মহুজন্য। সে কি করুণা?

করুণা। হাঁ, জীবন-মরণের কথা। তজ্জায় আমি স্বয়ং দেখেছি, স্বয়ং কেন, আমার মনে, আমার প্রাণে সেই পরম সত্য ধরা দিয়েছে—

মহুজন্য। কি করুণা, কি?

করুণা। টিয়ার প্রাণ ঐ টিয়া। ঐ টিয়া যে মুহুর্তে এখান থেকে উড়ে গালাবে, আমার টিয়াকেও সেই মুহুর্তেই ধরাযাবে—[বদনব্যঙ্গে মুখ ঢাকিয়া উল্লসিত ক্রন্দন রোধ করিয়া মেয়ের কাছে ছুটিয়া চলিয়া গেলেন।]

[গভীর নিঃশ্বাস। সকলে দেওয়ালের উপর উপবিষ্ট টিয়া পাখীটির দিকে চাহিয়া রহিল।—]

ডাক্তার। ঐ টিয়া পাখীটি দেখতি পরম রহস্যময় হয়ে উঠল।

মহুজন্য। ডাক্তার, একখনো সত্য হতে পারে? ডাক্তার। রূপকথার একথা রাসাকালে শুনে কি-নিগারখ বিশ্বাসই না অক্লান্ত হতেই!

মহুজন্য। রূপকথার সে-কথা কি সত্য? ডাক্তার। রূপকথা যদি সত্য হয়, সে কথাও সত্য!

মহুজন্য। কিন্তু, ডাক্তার কিন্তু... ডাক্তার। এখন সত্য সত্য হয় কি এই তো?

মহুজন্য। মহুজন্য। বদন ডাক্তার বল— ডাক্তার। সত্য হয়।

মহুজন্য। [চীৎকার করিয়া উঠিলেন] ডাক্তার! ডাক্তার!

ডাক্তার। চুপ। চীৎকার করো না, টিয়ার খুন ভেঙে যাবে—

ললিত। পাখীটাও ভয়ে উড়ে যেতে পারে— [গভীর নিঃশ্বাস]

ডাক্তার। ঐ পাখীটির কি বিশেষ কোন ইতিহাস আছে? মহুজন্য। কিছু না। আমার মার ছিল একটা

পোষা টিয়াপাখী। আমাকে তিনি বেশী ভালবাসতেন কি ঐ পাখীটাকে বেশী ভালোবাসতেন, এ প্রশ্নটা সকলের সঙ্গে আমার মনেও জাগতো। আমার খুন ঐ মেয়ে হল, আমার করে ওর নামও তিনি রাখলেন টিয়া। কিছুদিন পর পাখীটা মারা গেল। মা তখন ঐ টিয়াটাকে কিনে এনে বাড়ির দিলেন, কিন্তু, নিজের আর বেশীদিন বাঁচলেন না। এই তো ওর ইতিহাস।

ডাক্তার। এ ইতিহাসে কোন বিশেষত্ব আছে কিনা সে কথা আলোচনা না করে, আমি বরং এই জানতে চাই, ও টিয়া-টা নিয়ে কে বেশী মাথা ঘামায়...মেয়ে না মা?

মহুজন্য। উত্তরেই। আমার বাড়ীতে ঐ পাখীটির যা আদর, আমারো যে আদর ছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু তাই বলে কি—এ কথা...করুণার ঐ কথা...কখনো সত্য হয় ডাক্তার?

ডাক্তার ॥ মনে প্রাণে যদি কোন একটি বিশেষ বিশ্বাস, বন্ধন হয়, সে বিশ্বাস তখন বিশেষ শক্তিমান হয়ে পড়ায়। সেই শক্তিতেই সে সত্য হয়, সত্যসত্যই দেখেছি।

মহজন্য ॥ ডাক্তার—ডাক্তার—
ডাক্তার ॥ মার ঐ বিশ্বাস মেয়ের মনে সংক্রামিত না হলেই মঙ্গল।

অমিয় ॥ সকলের চেয়ে মঙ্গল ঐ পাখীটা উড়ে না পালায়।

ডাক্তার ॥ করুণা দেবীর বিশ্রাম নিতান্তই অব্যবস্থিক হয়ে পড়িয়েছে। অনাহারে অনিদ্রায় একপ্রকার মানসিক বিকার।

করুণা আসিচ্ছেন দেখা যেন।

মহজন্য ॥ চূপ—

[নিতম্বতর মতো করুণা আসিয়া গড়াইলেন।]

করুণা ॥ [পাখীটার দিকে চাহিয়া] ওরে; অমিয়া কি ভয়ে করেছি যে তুই পালাবি? ফিরে আস, ওরে, ফিরে আস!

মহজন্য ॥ [করুণাকে] ওরিকে বেরো না...ও হয় তো...হাঁ, ঐ বে—

করুণা ॥ চূপ—চূপ—

[নিতম্বতর]

ললিত ॥ না, আর ভয় নেই। ও স্থির হয়ে বসল।

করুণা ॥ ও খাটার কেন ফিরে আসে না কেউ বলতে পার? ওকে কি-আরই নে না কি...কি যত্নেই না ওকে রাখি, তবু আজ... ওরে আয়—আয়—তোর পায়ে পড়ি, ফিরে আস—

ডাক্তার ॥ আপনি বহন। আপনার টিয়ার কথা বলুন—এখন কেমন বৃদ্ধেন?

করুণা ॥ ভেগেছে। ভেগেই বলল মিটা কই? আমি দেখালুম। বলল,—মাগো ও আজ আকাশে উড়বে। এখানে আর ওর মন নেই। ও আমার সব কথা শুনেছে, শুনে ওরও মন ছুটতে মেয়ের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে কে চলে জাচ্ছে, রানধর্য্য কার দ্বন্দ্ব তাই দেখতে, দুর্বিধাতার কোন পাটে ওঠেন, কোন বাটে ডাবেন জানতে, চাঁদের নাখে যে

বুড়ী চরকা কাটে তাকে দেখতে, দীর্ঘখাস ফেলে শেষে বলে,—মাগো, আমার যদি পাখা থাকতো! মাগো, ওর মতো আমার যদি পাখা থাকতো!

মহজন্য ॥ চূপ—[অস্থূলি সঙ্কটে টিয়ার উপর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।]

করুণা ॥ সর্বনাশ—[ছুটিয়া মেয়ের কাছে ঘরে গেলেন।]

অমিয় ॥ না, স্থির হয়ে বসেছে। আর ভয় নেই।

ললিত ॥ ওটাকে ধরবার কোন উপায় নেই?

মহজন্য ॥ [সাতকে] না—না—, ধরতে গেলে যদি উড়ে পালায়!

ডাক্তার ॥ জোর করে কি কাউকেই ধরে রাখা যায় ললিতাবু?

মহজন্য ॥ করুণা আবার। [ছুটিয়া করুণা আসিয়া গড়াইলেন।] কি করুণা?

করুণা ॥ ওর ভয় বে মৃতন শাড়ী এনেছ, নতুন জুতা, নতুন জামা, নতুন ওড়না...ও চাইছে। এখনি—এখনি—

মহজন্য ॥ ললিত, মল্লিকা কে বল—

ললিত ॥ [ছুটিয়া বাইতে বাইতে] এখনি আনছি—

করুণা ॥ বল,—এ পুরাণো জামা-কাপড় আর নয় মা, নতুন জামাকাপড় দাও—আজ আমি নতুন সাজে সাজব—

খুব খুশী মনেই বসলো।

ডাক্তার ॥ আমি বরং একবার দেখে আসি—

করুণা ॥ না প্রয়োজন নেই। কোন প্রয়োজন নেই। আপনাকে ও দেখতে পারেন না। আপনি গেলে ওর মন আবার বিবিধে উঠবে!

ডাক্তার ॥ ও...একটাবার...

করুণা ॥ না। কেন আপনি ভয় পাচ্ছেন ডাক্তারবাবু? বিশেষ এমন! এখন ওকে দেখে মনে হচ্ছে ওর অস্থখই আর নেই। তবে কেন মিচিমিচি ওকে—

মহজন্য ॥ হাঁ ডাক্তার, তুমি বং...ওরে, ডাক্তার বাবুকে চা দেখো হুমনি—[নতুন জামা-কাপড় লাইয়া ললিত আসিল—] এই যে ললিত—

করুণা ॥ [ললিতের দিকে ছুটিয়া গিয়া] দিনু-দিনু—নতুন এই জামা-কাপড় পড়লে ওর আর কোন অস্থখই থাকবে না, এখনি খুশী হবে...ও। ডাক্তারবাবু, আপনি যাবেন না, সত্যকে দেখে যাবেন, কিন্তু কাছে গিয়ে নয়, দূর থেকে, আড়ালে থেকে—

[জামা-কাপড় লাইয়া ঘর চলিয়া গেলেন।]

মহজন্য ॥ ললিত—ললিত—তুমি ছুটে দোকানে বোঝান গিয়ে এখনি আরো সব শাড়ী—আরো সব জামা—ওর সারাটি দেহ মুড়ে দিতে দোকানে যা আছে... সব—সব—ব—বত দামই হোক—বাও—বাও—

[ললিত চলিয়া গেল।]

মহজন্য ॥ ডাক্তারের চা এলো না! অমিয়, তুমি বাও ভাই—

অমিয় ॥ বাছি—

মহজন্য ॥ খেলনা, বৃষ্টি অমিয়, রং-বেরং-এর এত খেলনা...কাঠের রবারের, কাঠের। লাটিন, বল, নৌকা, হাতী-ঘোড়া, সাপ, একটা বাঁশী, লুডো, কিছু জলহবি, হাতীর দাঁতের একটা বাল্ল—ঐ সগোপনীর দোকানে আছে, খেত-পাথরের ডাকমহল, হাঁ, রাষ্ট্রদ্রাঘা ওর ভারী সখ, খেলনার কড়াই, ডেকু, হাতা; গুটি, বেড়ী, জানো তো সব?

অমিয় ॥ জানি—

মহজন্য ॥ পূজা করতে ওর ভারী সখ। ছোট রেকাব, পেতলের সাজি, চন্দনের বাটি, ধূপধানী, পঞ্চগ্রন্থী, মনে থাকবে—

অমিয় ॥ থাকবে।

মহজন্য ॥ গাড়াও। ওরেন আমার কাছে সেদিন কি চেয়েছিল, দিতে পারি নি...কিন্তু আজ তো তা মনে পড়ছে না...টিয়া—টিয়া—

অমিয় ॥ চূপ—ঐ দেখুন—[অস্থূলি-সঙ্কটে পাখীটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ। পাখীটি উড়বার উপক্রম করিতেছিল মনে হইল।...গভীর নিতম্বতা।]

মহজন্য ॥ না—না, আর ভয় নেই। ও ভালো করে বসল।...কি চেয়েছিল—কি চেয়েছিল—[ধরণ করিতে না পারিয়া] মনে পড়ছে না, আচ্ছা ভাই, তুমি

এসো—ফিরতে কিছ ভাই বিশ্রয় করো না—কোনটাই জুলো না—

[অমিয় বাইতে গেল।]

ডাক্তার ॥ জুলো না। খেলনা—পূজার বাসন—এবং...

অমিয় ॥ এবং—?

ডাক্তার ॥ যাবার পথেই—

অমিয় ॥ বসুন—

মহজন্য ॥ কি ভুল করলুম ডাক্তার?

ডাক্তার ॥ এক গোয়ালী চা—[হাসিয়া অমিয় চলিয়া গেল।] এদিকে করুণা আসিয়া গাড়াইলেন।

মহজন্য ॥ করুণা, খবর?

করুণা ॥ লঠনকে দেখেছে?

ডাক্তার ॥ লঠন!

করুণা ॥ রাষ্ট্রবাহীর সেই ছেলেটা। লঠনকে এখন না গেলে তো আর চলেছে না!

মহজন্য ॥ কেন? কেন?

করুণা ॥ পুরাণো জামা-কাপড় ছেড়ে নতুন জামা-কাপড় পরতে এখন এক আপত্তি পড়িয়েছে।

মহজন্য ॥ কি আপত্তি?

করুণা ॥ বলে, নতুন সাজে যে সাজব, বোঁপাতে কি দেব?

মহজন্য ॥ কি চাই?

করুণা ॥ তোমার কাছে সে তা একদিন চেয়েছিল। তুমি দাও নি।

মহজন্য ॥ চেয়ে যে ছিল মনে পড়ছে, কিন্তু কি যে চেয়েছিল সেইটে কিছুতেই মনে পড়ছে না। কি চেয়েছিল?

করুণা ॥ জুল।

মহজন্য ॥ হাঁ, জুল—আমি এখনি দিচ্ছি—

করুণা ॥ কিন্তু কি জুল?

মহজন্য ॥ [ধরণ করিতে চেষ্টা—না পারিয়া] কি জুল?

করুণা ॥ অভিমতিনি ত। আজ আর তোমায় বলবে না। আমারও বললো না। বলে, ঘরের লোক বা দেহনি, বাইরের লোক তাই দেবে। বাইরের সেই লোক লঠন।

মহুজনাথ ॥ তা দিক...সেই দিক...কোথার সে?

করুণা ॥ তার খোঁজে এখন লোক পাঠাও, নইলে
অনর্থ হবে—

মহুজনাথ ॥ [একজনকে] খুঁজে আনো ভাই, তাকে
এখন যেখান থেকে পার ধরে আনো—

করুণা ॥ তাকে গিয়ে বল টিগাকে তুমি কি ফুল দিতে
চেয়েছিলে, নাওনি কেন? টিগা যে তোমার আশায় বসে
আছে। শীগগির গিয়ে টিগাকে সেই ফুল দিয়ে এস।
ব'লো, টিগা কাঁদছে...টিগা রাগ করে তোমার পথ চেয়ে
বসে আছে।

[সে চলিয়া গেল]

ভক্তার ॥ লঠন! বাপ-মা আমার নাম পায় নি!
করুণা ॥ তাই টিগা হেসে বলে স্বাধি বখন ভুলে যাবে,
তুমি ভাই আমার পাশে থেকে, তোমার ঈশ্বরের পানে চেয়ে
থাকবে, আঁধারের মুখ দেখব না!

ভক্তার ॥ ভুবতে তো আর বিশেষ নেই। শুধু লঠনেরই
বিশেষ, এবং—

করুণা ॥ এবং?
ভক্তার ॥ ঐ এক পেয়াল চা!
মহুজনাথ ॥ মনে পড়েছে—মনে পড়েছে—কি ফুল...
আমার মনে পড়েছে—কিন্তু ওঃ [অশ্রুট, আঁঠুনাং করিয়া
উঠিলেন।]

করুণা ॥ ও কি? 'অমন ক'ছ'বে? কি ফুল?
মহুজনাথ ॥ না—না—ওঃ [লজিত ও অনিয় এই সময়
আসিয়া দাঁড়াইল ও ক'কা-মুঠের মাথা হইতে সগদা
নামাইতে লাগিল।]

করুণা ॥ [মহুজনাথের প্রতি] কি ফুল, ওগো বল...
কি ফুল?

মহুজনাথ ॥ ঐ লতানে গোলাপ...হলুদ ঐ মাদাল
নীল...দেওয়ালের ঐ মাথার...টিয়াপাখীর ঠিক নীচে—
করুণা ॥ সন্ধান! ও ফুল এ গায়ে—
মহুজনাথ ॥ কোথাও নেই—কোথাও নেই—তাই আমি
ও ফুল সেদিন তুলি নি—কিন্তু আজ—

করুণা ॥ আজ তুলবে?
মহুজনাথ ॥ তুলব?

করুণা ॥ [ভয়ে চিংকার করিয়া উঠিলেন—] না—
মহুজনাথ ॥ চুপ—চুপ—[পাখীটির দিকে অস্থূলি
নির্দেশ করিয়া কয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। পাখীটি প্রায় ওড়ে
এই অবস্থা—]

করুণা ॥ ওঃ [আঁঠুনাং করিয়া, ছুটিয়া ঘরে গেলেন—]

[দেখা গেল দেওয়ালের ওপার হইতে একটি ছোট
হাত পাখীটিকে চালিয়া ধরিয়াছে। পরমুহূর্ত্তে দেখা
গেল সে হাত আর কাহারও নয়, সেই লঠনের। সে
টিগাটিকে মুঠস্থ করিয়া দেওয়ালের উপর উঠিয়া বসিয়া
নীচের সেই গোলাপটি ছিঁড়িয়া, একহাতে টিগা এবং অস্ত
হাতে ফুল, লইয়া মাটিতে লাফাইয়া পড়িয়া টিগার ঘরে
লাফাইতে লাফাইতে চুকিয়া পড়িল। বাহিরে বাহারা তাহাকে
চিনিল, তাহার সমস্তের আঙ্গুর চিংকার করিয়া উঠিল,—
লঠন! লঠন!]

ভক্তার ॥ হী, লঠন এল, কিন্তু আমার চা?

[ঘরে বাহিরে মধ্যবর্তী হাসিয়া উঠিল—]

বারণ

শ্রীহরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বাগী

অনাদি আধার বন্ধ, দেখো চাহি, মোর কক্ষকেশ,
বিমুগ্ধ ভক্তের মতো, স্বপ্ন হয়ে ভুলেছে প্রণাম!
চিরস্তম্ভের শোনা, কী আনন্দে বাজে অবিশ্রাম,
কী বেদনা বিশ্বরবী, বাহে দূর-স্বপ্নের আবেশ!

দুঃস্থ চুপে এক, অধরের রুদ্রির নিঃশেষে,
মুছিয়া, সর্বক্ষেপে দাঁও চেতনার অতীত আরাম।
কম্পিত যৌবন-তন্তু জানে শুধু সেই পূর্ণ নাম,
যে-নামে আত্মার মোরা!—সে অগ্নিতে জ্বলিবে নিমেষে!

বাম

ও-দেহের পাত ভরি' এনেছ যে-অগ্নি-উৎস-ধারা,
হে বহ্নি-রূপিনী নারী,—শাস্ত করো, নির্বাণ তাহারে।
ইন্দ্ৰিয়ের ইন্দ্রধনু!—বাসনার স্বর্ণ-কারাগারে,
মুহূর্ত্তের উদ্দামনে, জীব-ধর্মে পীড়িত বাহারা—

মোরা ত' তাদের মহি!—বিধাতার জঙ্কট-ইসারা
বার্থ হোক; জয়ী হবো প্রাণিময় মিথ্যার সংসারে।
আনো ছায়া অপক্লপ, নীলাঞ্জন-নবমেঘভারে,
লঘু পালকের স্পর্শে, স্নিগ্ধ করো ছুটি চক্ষু-তার।

দেহ-সৌধ-বাতায়নে, লাগে বন্ধ, দক্ষিণ সমীর!
সাগর-তরঙ্গ-শিরে কত বর্ণে মাচে উর্ধ্বমালা,—
স্বর্গের রথাত্রে চলে, দিনান্তের রক্তা-দীপ জ্বলা!
—সমস্ত অস্তিম প্রাণ, মোর দেহে করিয়াছে ভিড়!
তাই মোর প্রাণ বাহে, ধানমৌন গম্ভীর মহিমা,
এ-দেহে অরণি নাহে, অগ্নি হেথা হারায়ছে সীমা।

আট বৎসর

— গল্প —

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

রাজের ট্রেনটায় বিশেষ ভিত্তি নাই দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইলেন। হাত-পা ছড়াইয়া ঘুমাইয়া নিতে পারিব। কান্নাঘাটা একদম ফাঁকা।

শীত পড়িয়া গিয়াছে। বেকির ধারের জান্নালা তিনটা তুলিয়া ধরিয়া মোটা কথল মুক্তি দিয়া শুইয়া পড়িলাম।

গড়াইয়া-গড়াইয়া গাড়ি কখন বহরমপুরে আসিয়া থামিয়াছে খোঁজা করি নাই। সমস্তটা রাত্রা যেন এক নিশ্বাসে বসাইয়া গিয়াছে। হঠাৎ দরজার সামনে কাহার পুরুষ কণ্ঠের চীৎকারে ধবধব করিয়া জাগ্রত উঠিলেন।

এই যে এই গাড়ি। চলতেও যে মাত মাইল পিছিয়ে থাকে। ওরে রামহরি, লঠনটা একবার ধর এদিকে। বেথেন চলতে দেখোনি? হোচট খেয়ে পড়ছে যে ছদ্মবেশে? বাপের জন্মে কোনো-কালে ট্রেনে চাপো নি বৃষ্টি? চোখ জুটাই বা আছে কী করতে? লোহার ছাঁচাকা দিয়ে পুড়িয়ে দিলেই হয়!

বলিতে বলিতে একটি মোটা-মোটা জোয়ার ভুলোকে কানয়ার ভিতর উঠিয়া আসিলেন। গায়ে কাশো সাধের গলা-বন্ধ কোট, গলায় পুরু করিয়া উলের কন্ডার্টার জুড়ানো, মাথায় কান চাকা মাস্ক-ক্যাপ। সঙ্গে স্লোকো আছে আঁকাশ না পাইলে স্বীভিন্নতা ভর গায়েতে হইত। উপরে উঠিয়া হালির মাথা থেকে মোটো-বাটগুলো নামাই-তেছেন—কী বিশাল থালা, কী চওড়া কল্লি! ট্রাক একটা আমার মাথার উপরকার বাক্সে তুলিয়া দিতে দিতে ভুলোকে বলিলেন: একেবারে ঠেগনের দিকের জান্নালাগুলো তুলে দিবি যে ঘুম পারছেন মশাই, গাড়ি ফাঁকা কি ভল্লি স্লোকো বাইরে থেকে টের পাব কী করে? থালা আরানোই আছে ঘুম বা হোঙ্ক। বলিয়াই দরজার ধারে গিয়া হাঁক পাড়িলেন; এগো, মাল-পণ্ডরের মধ্যে তুমিই শুধু বাকি আছে দেখছি। উঠে পড়ো টট করে!। গাড়ি কি তোয়ার

বাবার টাটখোড়া নাকি যে চলতে বললে চলবে, থামতে বললে থামবে। দিব্ কবরবার আর জাখা পাও নি। বলিয়া স্লোকো পড়িয়া নীচে হইতে বাহকে তিনি টানিয়া তুলিলেন তাহার কৃত আবির্ভাবের ঊজ্জ্বলো অকস্মাৎ জ্বল, চকল হইয়া উঠিল। উপমা দিলে কথাটা হয়তো নিতান্ত অবাস্তব ঠেকিবে, কিন্তু মনে হইল ছুঁইছুঁনি জোৎস্নার অন্ধকার যেন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মেয়েটিকে অন্ধ দিকের বেকিটার দিকে ঠেলিয়া দিয়া ভুলোকে নিতুন কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন: বন্ধমান! সব করে' কেউ আবার এককি মাথা পেতে নেই। ইতিমুট কোথাকার!

গাড়ি বহরমপুরে বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না, আবার চিনাইয়া-চিনাইয়া চলিতে আগ্রস্ত করিয়াছে। গাড়ির শব্দ ছাপাইয়া ভুলোকেদের গালিবর্ষণও বিরাম মানিতেছে না। আমার দিকের জান্নালা তিনটা সমস্ত ফেলিয়া দিয়া গলাবন্ধটা একটু আলগা করিয়া আমারই পায়ের দিকে তিনি বলিলেন। পা ছুটাই গুটাইয়া নিয়া বিরক্ত হইয়া কহিলাম,—এ কী মশাই, ঠাণ্ডার মারাবো যে!

জান্নালা দিয়া মাথাটা বাহিরে গলাইয়া দিয়া ভুলোকে কহিলেন,—রাখুন মশাই, দাঁড়ান। আমার বলে মাথা গেলো বেড়ে, সারা গায়ে কালপাথর বেরছে—আর আমি এখন অন্ধকূপে মারা যাই আর-কি। দিবি একলা বাজেন কি না, তাই এতো আরোপ—যে নিয়ে তো আর গথ বেরতে হয় না, টেঙ্গা বুঝবেন কী করে?

বলিয়াই তিনি মুখ ভিতরে আনিয়া অপরাগত স্লোকোটির নীচের উদ্যমীন মুখিকে উদ্দেশ্য করিয়া বিকৃত স্বরে কহিলেন,—কী গো, হাত-পা গুটিয়ে বসে' রইলে ত্রে, বিছানাটা পেতে কাল, বড় যে ঘুম হ'ল না বসে' তখন তড়পাড়িয়ে।

স্লোকোটি তেমনি নিদ্দল-ভঙ্গিতে চুপ করিয়া বসিয়া

রহিল। ভুল্লোলক হঠাৎ আমাকেই বিচীরক মানিয়া বসিলেন: দেখলেন, দেখলেন মশাই। কথা বললে কথা পোনো না—এ সব আশা স্লোকো কী করতে ইচ্ছে হয়? জান্নালা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিতে ইচ্ছে হয় কি না বলুন। হাসছেন কী মশাই? বিয়ে করছেন?

হাসিয়া বলিলাম,—না।

মুখতপ্ত করিয়া ভুল্লোলক কহিলেন,—না! তবে ঠাট্টা করেন কোন মুখে? নতুন জুতো পায়ে না দিলে কী করে' মুখেরে ফোঁফোঁ পড়বার আলা কী! তারপর হঠাৎ আবার মেয়েটির দিকে কঠিন দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন: কী, কথাটা কানে গেলো না? কানটাও অশাড় হ'লো নাকি এতোদিনে? খুব যে কবিয়ানা করে' বসে' রইলে? ঠাট্টা মেগো টেনিস্ ক্লাসে কে তখন গলার বেলেস্তালা লাগবে?

মেয়েটি তেমনি নিম্নিকিরা হইয়াই বসিয়া রহিল। ভুল্লোলক মুখ-চোখের ভকি স্টুটগলত করিয়া জাখা হইতে উঠিয়া পড়িতেছিলেন, কী একটা অব্যব বিপৎপাতের আশঙ্কা করিয়া উঠাকে বাধা দিলাম। কহিলাম,—বহন, ওর হয়তো এখন ঘুম পাচ্ছে না। হাওয়ার মাথাটা কিছু ভুলোকেদগ আপনি ঠাণ্ডা করে' নি।

—ঘুম পাচ্ছে 'মো কী মশাই? ভুল্লোলক শেষকালে আমারই উপর থালা হইয়া উঠিলেন: ঘুম ছাড়া আর ওরা জীবনে জানে কী! ঘুম পাচ্ছে না, হাতী! সব বদমায়েসি মশাই। ঠেগনে আসবার আগে কেন ঘুম ভাঙিয়ে তুলে জানলাম তাই রাগে উনি অমন ফ্যাগান করছেন। একলা চিন্তানায় ফেলে এলেন যেন ওর মোক মিলতো! মাঝা করে' সঙ্গে নিয়ে এলাম কি না তাই এই প্রতিশোধ। বুঝলেন মশাই, এদের মতো ছায়াছড়া প্রাণেশোপ নিতে আর কাউকে কোনদিন দেখবুন না—সোজা হুজি কিছু করতে পারবে না, হিন আসিয়ে না-খেয়ে অবলোয় চানু করে' যতো রাগের 'অহুহ করে' ডাকাতের পিছে গুহেরে আপনার পদমা খসিয়ে তবে ওরা ঠাণ্ডা হ'বে। আট বছর ধরে' যিহে হয়েছে মশাই, কিন্তু হাং ক'দনা কালা-ভালা স্বপ্নেরে করে' ছাড়লো। গলার কাঁটা নেমেও যায় না, উঠেও আসে না—কি-জানি বলে, সেই জিশকুট অবস্থা।

গ্যাসের এক টুকরা নরম আলো মেয়েটির মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। তৃতীয় ব্যক্তির সম্মিথনে অশোভন সম্মানে মেয়েটি মুখের উপর থোমটা টানিয়া দেয় নাই। ছোট কপালটির উপর চুই একগাছি চুই কুশল হাওগার অন্ধকারের কীম শিখার মতো কীপিতেছে বেবিলান। বসিবার ভঙ্গিটি ভারি কোমল, ছুইটি চোখে ও চিবুকে করুণ একটি ঔদাভ। সব মিলিয়া মেয়েটিকে ভারি মিষ্টি ও সুন্দর লাগিল। গরীব একটি স্তব্ধতা সর্পদে তাহার একটি অপরূপ শোভা বিস্তার করিয়াছে। বিবাহের দীর্ঘ আট বৎসর অতিবাহিত' করিয়াও মেয়েটি তাহার দেহের একটি ললিত রেখাও হারাইয়া ফেলে নাই, এই রক্তভাষী, বর্ষর ভাবাপন্ন স্বামি-মাদ্রিমা আসিয়াও তাহার চরিত্রের নীলমুখি অমন আলো তাহার মুখমণ্ডলে স্ফ্যান রহিয়াছে। আমিও বছরের নিবিড় 'মোনে' তাহাকে সহ্যহুজি জানাইতে লাগিলাম।

কিন্তু ভুল্লোলক আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। তিনি আমার গা বেঁসিয়া আগিলেন; কহিলেন,—আট বছরের একটা মিনিটও নিকশিত করিয়া ফেলতে দিলো না মশাই! অথবাহের একশো। যেমন মুখের ছিট, তেমনি স্বভাব। আমাকে তো চেনে নি, এখনো? ভেবেছে লেজুড় সঙ্গে করে'ই আমাকে জিহ্বন হঠাৎ ফিরতে হ'বে। হিন্দু আইন মশাই, ইচ্ছা করলেই জুতোর স্বত্বদার মতো ছুঁড়ে ফেলতে পারি, করুক না আমনা—মাগে পাঁচটি টাকা দিখেই থালাস। এতো ভেনেও তেজ বাহি একবার দেখেন। দেখুন, দেখুন, এই ভরা হাড়-কাঁপানো নীত, শালটা গা থেকে যুগে' ফেলবার কী হয়েছে! সয়তানির নতুন দেখুন একবার। বদুন, কী করছে'ছে হয় এখন?

অশ্লষ মাগিতেছিল, নিতান্ত বিরক্ত হইয়া কহিলাম,—চুপ করুন। অজ পুরুষের কাছে স্বীরা নিম্নে করতে আপনার লজ্জা করে' না?

—স্বভাবটি কবরার আছে কী যে ঢাক শিটিয়ে বেড়াতে হ'বে? আমি বিবাসগোষ্ঠের কাছে গলা থুগে' সত্যি কথা বলবো জ্বতে কাঁর কী যায় আসে? ভুল্লোলক

কথার ভেত্রে অনর্গল গুহু ছিটাইতে লাগিলেন : 'শুনতে ইচ্ছে না করে, পরের টেশনে নেমে অজ গাড়িতে চলে' যান, কে আপনাকে ধরে রাখছে? আমি তখন একবার তুকে দেখে নেব। ও কিসের জোরে আমাকে এমন অমাত্র করে' বেঁধে? এতো বড়ো সংসারে আমি ছাড়া ওর আছে কে?'

বুজিত হইয়া কহিলাম,—যুম না পেলেও গুর যুমোতে হ'বে নাকি?

—না, তাই বলে' রাত জেগে অস্থির করবে? তখন তো এই শয্যা ছাড়া আর কেউই আসবে না' ডাক্তারের পথসা জোগাতে। এই যে কাশিমবাজার এসে গেলো, মশাই। যান, নেমে যান, পরের স্থান নিশ্চয় ভালো মহাভারত যদি অস্থির হই মনে করেন, যান না নেমে। নাথার দিবা দিয়ে কে আপনাকে এখানে বেঁধে রাখছে?'

হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। গাড়ি আবার চলিতে লাগিল। ভয়েকো মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন,—পরের দ্বার করে গুব কে দরদ দেখছি আপনাকে। আমার চেয়ে আপনাকে বেশিই অচল মাথা। ঘর করতে হয় না কি না, তাই মনে-মনে বিবি করিযা না খেলেছে। বিবি চাপানা মুখখানা ঘেঁষেছেন আর দরদ সাগর একেবারে উল্টে উঠেছে। বলিয়া ভক্তলোক বিকট, কিন্তুকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন।

নিদান্দ্র লজ্জার সর্বাঙ্গ বিকট হইয়া গেল। কী ক্রুদ্ধে মহাশয়ত্বের ঐ কথাটা মুখ দিয়া বেকায় বাহির হইয়া গড়িয়াছিল পাইয়া পাইলাম না। ভক্তলোকের নিলজ্জ কটুবাণে পীড়িত বোধ করিয়া থাকিলে অস্তর চাছিল। গেলেই তো হইত। মাল-পরের বিশেষ কিছুই তো হাফা মছিল না। কিন্তু অজ কামরার দিয়া উঠিলে পাছে এই অস্বাভাব্য অপরাধিনী মেয়েটির প্রতি বাসিষ্যে নিদ্রিত অধিকারে ভ্রমবশী এই বন্ধুরাট কিছু অত্যাচার করিয়া বসে, তাহাই ভাবিয়া ধরতো সেই বৈকিঙেই 'অমড় হইয়া' বসিয়াছিল। কিন্তু অত্যাচারটা শেষকালে আমাকে লক্ষ্য করিয়াই এমন বিসমৃদ হইয়া উঠিলে তাহা ভাবিতে পারি নাই।

হাসি ধানাইয়া ভক্তলোক কহিলেন,—নিন্ না, ডা' দিন ঘর করে' দেখুন না—আমি তো তা হ'লে বাড়ি।

রোগ করিয়া বলিলাম,—কী বলছেন যা-তা? উনি আপনার বিবাহিতা স্ত্রী নু?

ভক্তলোক হাসিয়া বলিলেন,—একশো বার। তাই তো আমার চেয়ে আপনার বেশি মায়ী।

—তাই বলে' ভক্তমহালোকে আপনি আরেকজনের সামনে অকারণে যা-তা অপমান করেন?

—কারণ-অকারণের আপনি কি জানেন স্ত্রী? তাই তো বলছিলাম, নিয়ে দেখুন না হাবি ঘর করে'।

এই শোকটা ঐ মেয়েটির স্বামী না হইলে তখন যে কি করিয়া বসিতাম টিক নাই, কিন্তু কাহার ছুটি চক্ষু যেন সাহসের নীরতায় আমাকে নিরস্ত করিল। হাতলোড় করিয়া কহিলাম,—যা যুমি আপনি বলে' যান, আমাকে আর এর মধ্যে টানবেন না। বাট হয়েছে, মা'প চাইছি—আমাকে এবার একটু যুমোতে দিন দয়া কর।

সেই দুমাইয়া লইবার কালে মেয়েটির দিকে আরেকবার তাকাইলাম। শুদ্ধতার পাথরে উৎকীর্ণ একটি প্রাণাঙ্গ মুখ—তাৎহাৎ কোথাও একটি অসহিষ্ণু রেখা নাই। তেমনি জানালার বাহিরে পূজীকৃত ঈর্ষাকারের দিকে চাছিল। আছে। এই নিলজ্জ অপমানের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র প্রতিবাহুর ভঙ্গি দেখিযাও দেখিলাম না, চুপ করিয়া সব সেরে নিরিবাবধে সহ করিল। অথচ তাহার মুখীতে কোথায় যেন প্রজ্জ্বল একটা তেজ ছিল, সর্বাঙ্গে তাহারই আভা যেন লাবণ্য বিস্তার করিয়া আছে। কী যে তাহার অলপার, কেন যে সে গত আট বৎসরে তাহার স্বামীর কজ্জর করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার কথামাত্র কারণ অবিকার করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। বহুদুরের মতো এমন বাহার অবিকলিত সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা সে কেনম করিয়া তাহার স্বামীকে এতটা অনাযত্ন করিয়া ভুলিতে পারে? যুগের মুকুরে বাহার চরিত্রের দীপ্তি এতো সহজে প্রতিকলিত হইতেছে—সে কি না এই বঙ্গ পুরুষের কাজ এমন নিম্ন ও নিরস্তর হইয়া বসিয়া আছে? তাহাকেই কি না সে, পুরুষটা ভাগ্য করিবার ভর দেখার?

ভক্তলোকের অসীম উৎসাহ। তিনি তখনো বলিয়া চলিয়াছেন 'আমার পাঠা, ল্যাকের দিকে কোণ বসালে

গার কী ক্ষেতি হচ্ছে? গায়ে পড়ে' মাথা দেখাতে এসেছেন। ইষ্ট, পিড-ই-স্টার ওপর আবার মাথা। চলো না একবার। তোমার হৃদয় যুগের জাগ্রৎ এবার বার বসবে। বলিয়া বলা-কথা নাই ভক্তলোক আবার অন্তহাস্ত করিয়া উঠিলেন।

লালগোলায় টিমার তৈরি। তাড়াতাড়ি নামিয়া গড়িলাম।

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ডেকে দাঁড়াইয়া চা বাইতেছি। মেয়েট তাহার বানি-সমভিষাহারে কখন আসিয়া টিমারে গিলি বা আসে চাপিল কি না কিছুই কোনদিকে খোয়াল গর নাই। কেবল কুছটাকা-ধূসর স্তিমিত নদীর দিকে গরিয়া সেই সৌন্দর্য্য মেয়েটির বিধুর মুখচ্ছায়া মনে পড়িতে লাগিল।

আপশটা সেই তরুণীর শিখির মত লাগে হইয়া উঠিয়াছে, টিমারের শিকলে টান পড়িল। ঘুরিয়া চাছিল। দেখি ঐ যে মেয়েট অস্থিরভাবে এ-দিক ও-দিক তাকাইতেছে। বাপাটা টুট করিয়া বৃথিকে, প্রাশিলাম না। বেশদগ কেনম বিপথগত, চাইনিতে কেনম একটা অসহায় অকথকের দিয়া। আমার সঙ্গে হঠাৎ চোখোচোখি হইতেই সে তাড়া-হুড়ি হাহাচানি দিয়া আমাকে ডাকিয়া উঠিল।

বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলাম। মেয়েট না-জানি কেন ভীষণ বিপদে পড়িয়াছে!—কিন্তু উদ্ভাদের মধ্যে গিয়া যানি আটকাইয়া পড়ি কেন? বারো-কাছে মেয়েটির ঘরমুকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। আমার কাছে কিয়েন তাহার একটা প্রবল বক্তব্য আছে এমনভাবে গাঢ় ভঙ্গি করিয়া সে আবার আমাকে ডাকিল। তবুও ইহুত করিতেছিলাম, কিন্তু মেয়েটিই দেখি আমার দিকে আগাইয়া আসিতেছে।

তাহার সেই শূন্য নিরবলম্ব দৃষ্টি দেখিয়া গভীর সহহৃদিত্তে তাহার খেচ্ছাচাণী স্বামীর সকল সতর্ক-বাণী বিহত হইলাম। কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—কী হয়েছে?

মেয়েটি কিছুই কহিল না, সেইখানে বসিয়া পড়িয়া নীরবে কাটিতে শুরু করিল।

অসহিষ্ণু হইয়া কহিলাম,—কানছেন কেন? আপনার স্বামী কোথায়?

মেয়েট তবুও মুখ গুলিল না, অক্ষয়ান গভীর দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

কহিলাম,—বলুন কী হয়েছে? কিছু না বললে আমি প্রতিবধান করি কী করে'?

তবুও মেয়েটির কথা নাই। ও বোঝা নাকি? ডাকিয়া আনিত পারে, শুধু অতিবাহে জানাইতেই তাহার বত বাধা।

চলিয়া বাইবার তঙ্গি করিয়া বলিলাম,—এ-অবস্থায় আপনার স্বামী আপনাকে দেখে ফেললে আর আত্ম রাখবেন না। আমি যাই। তিনি থাক্তে আপনার ভাবনা কী!

মেয়েট গলায় বধা হইতে কেনম একটা শব্দ করিয়া উঠিল। থামিলাম। মেয়েট আসিলে মুখ ঢাকিয়া কজ্জর কী যে বলিল প্পষ্ট বুঝিলাম না। এইটুকু শুধু মনে হইল—সে তাহার স্বামীকে উপরে-নীচে কোথাও গুঁজিয়া পাইতেছে না, সে ভীষণ বিপদে পড়িয়াছে।

বলিলাম,—প্পষ্ট করে' বলুন। ভালো করে' কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। আপনার স্বামীকে খুঁজে পাচ্ছেন না? শাসটা মুখ থেকে সরিয়ে নিন্ দয়া করে'।

আঁচল সরাইয়া মেয়েট কহিল,—না।

—কোথায় গেছেন?

মেয়েট অতি কষ্টে তেঁতলাইয়া কহিল,—জ—জানি না।

—জানেন না যান? কা'র সঙ্গে টিমারে এসে উঠবেন?

প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে চটপট উত্তর দিবার তাহার নাম নাই। আঁচলে মুখ ঢাকিয়া আবার সে কাঁটিতে বসিল।

বিরক্ত হইয়া কহিলাম,—সব কথা প্পষ্ট করে' না বললে আমি বৃথি কী করে'? উনিই আপনাকে টিমারে পৌঁছে দিয়েছেন তো?

মুখ ভুলিয়া মেয়েট কহিল,—হ্যাঁ।

—আর খুঁজে পাচ্ছেন না?

—না।

—দাঁড়ান, আমি দেখে আসি।

সনেট

মনের সোনার কাঠি ছুঁয়েছে সনেট :—
অঙ্গ ঘেঁরি' নামে তাঁর নীলাশ্বরী নীল,
চরণে চরণে যুদ্ধ-গুঞ্জরিত মিল,
হাতে তাঁর স্বর্ণোজ্জল চম্পকের ভেট !
সঙ্কোচে সরমে তবু মাথা কেন হেঁট ?
এত দিনে খুলে' গেছে জীবনের খিল,
পেয়েছি রহস্য-চাবি, খুঁজিয়া নিখিল,
আমি রাজপুত্র,—নহি সৌন্দর্যের শেট ।

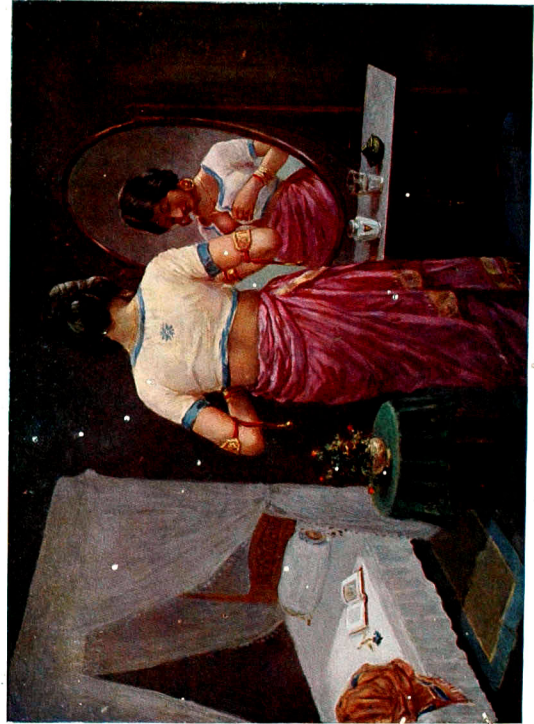
মহল হইয়া পার, সপ্তম মহল,
দ্বি-সপ্তে আসিয়া বৃষ্টি হয়েছি সফল :
চতুর্দশ ভুবনের সুষমায় গড়া
মনের পালঙ্কে শুয়ে—মাধুরী অমল !—
রাজকন্যা নিদ্রা যায়, স্বপ্নে আঁখি ভরা,
পরশে মেলিল দল, নয়ন-কমল ।

জয়যাত্রা

যুদ্ধ নয়, যুদ্ধ নয়, আজ শুধু জয়,
শঙ্করের শৃঙ্গে বাজে—'এসেছে সময় !'
দ্বিধা-দ্বন্দ্বের বক নাহি কাঁপে ছক ছক,
মাহেন্দ্র-মুহুর্তে এই যাত্রা হ'ল শুরু ;
পাথে জন-কোলাহল, আকাশে আলোক,
বাতাসে পুতাকা কাঁপে, বন্দনার শ্লোক
বন্দীরা উচ্চারি' গুঠে, উৎসব-উৎসুক
কোতুহলী দর্শকেরা আগ্রহে উদ্গুহ !

পথ-পানে চেয়ে আছে প্রতীকার চোখে !
মন্দিরের স্বর্গচূড়া অরুণ-আলোকে
ঝলকি' ঝলকি' গুঠে, পুরাঙ্গনা-দল,
লাজাঞ্জলি বৃষ্টি করে, আনন্দ-চঞ্চল ।
বিজয়-তিলক ভালে জয়যাত্রা-গামী
অজি জীবনের পাথে—আমি, আমি, আমি ।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা



BEFORE RETIRING
This masterpiece by Mr. H. Mazumder
is presented with Oatine Co's compliments.

শ্যামের পূর্বে
রূপক জ্যোতিষের মন্দির
—এই জ্যোতিষের মন্দির

তাতি-বো

—গল্প—

শ্রীমাদিক বন্দ্যোপাধ্যায়

নীলমণি বসাকের মেটে বাড়ীর পশ্চিমদিকে প্রকাণ্ড একটা তেঁতুল গাছ আছে। গাছটা যদিও নীলমণির কোন পুরুষের সম্পত্তি নয়, তথাপি সারা বছর তাহাকে তেঁতুল কিনিতে হয় না। তাহার বোঁ মুক্তা পরের গাছের তেঁতুল দিয়া প্রত্যেক বিন্দু স্বামীকে অঞ্চল রান্নিয়া খাওয়ায়।

অঞ্চল রান্নিতে কোন হাঙ্গামা নাই, নুন দিয়া তেঁতুল ওলি সিদ্ধ করিলেই হইল। মাঝে মাঝে অঞ্চল এক পরসার গুড় দেওয়া হয়। সেদিন আর নীলমণি পদার্থটাকে অঞ্চল বলে না, বলে চাটনি। বিনা পরসার তেঁতুল-গোশার মধ্যে এক পরসার গুড় আর আধখানা কুচানো রাঙা আলু দিয়া তাহার রীতিমত চাটনি খায়।

‘ও মুক্তো, এ যে অমর্ত্য রে!’

মুক্তা রুদ্ধশব্দে বলে, ‘আদেখলেশনা করিস নে বাপু, মূখ বুজে খেয়ে যা। তেঁতুলগোলা জল সে ছ’ল গুঁর অম্মেত! নরনার পাক পেলে তুই সোনামুখ করে’ খাবি।’

নীলমণি চৌক পাকাইয়া বলে, ‘কি বলনি?’

‘তোরা মাথা!’

‘জুতয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব জানিস?’

মুক্তা রসদাকে মুক্তি দেয়। সে অত্যন্ত বদমেজাজী মেয়ে-নাগর্য। শুধু মুখ ছুটাইয়া সে ক্ষান্ত হয় না, কোমরে ধাক্কা দিয়া এমন অপক্লপ উজ্জ্বল ভঙ্গিতে সামনে হুকিয়া গাড়াইতে পারে যে দেখিলে—

কিন্তু সে কথার উল্লেখ করা মিথ্যা। নীলমণির চোখ ভোঁতা হইয়া গিয়াছে, সে দেখিতে পায় না। নহিলে শুধু মুক্তার কথাই নয়, তাহার দেহের না-ছেঁড়া-আঘাতেই নীলমণি খ’ বনিয়া হাইত।

নীলমণি নেহাৎ অপদার্থ লোক। রাগে ঘরখানা দিবি অঙ্গুলি করিয়া সে শোয়, একটা প্রাণীপ আলিবার সম্ভব পথ তার ঘাই। মুক্তার নিশ্চিন্ত আলুখালু বেশ বেড়ার খাচার

হুতীভেদ্য অঙ্গকারে বার্ষ হইয়া যায়। প্রাণীপ আলিতে কত আর খরচ? এক পরসার তেল কিনিলে রাত বারোটা অবধি রীপ জলে—বারোটার পর নীলমণি আর নাই-বা গাট জাগিল। চাটনি না খাইয়া গুড়ের পরসারটা তেলের পিছনে সে অন্যায়সে খরচ করিতে পারে, কিন্তু সে বুদ্ধি ওর মাথা হইতে ঠাট আর মাকু কাড়িয়া নিয়াছে।

নরনারী লজ্জা নিবারণ তার পেশা, কার্পণ্যের অঙ্গকারে স্ত্রীর লজ্জা সে নিবারণ করে।

অবশ্য মুক্তার তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। নীলমণির ছোট ছোট চোখের সোহাগ দিয়া তার শোন প্রয়োজন নাই। নীলমণি যে আজও গা বেঁধিয়া শোয় এই তার চের।

আসল কথা, এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের যেমন হয়, মুক্তার মায়া মমতা কম। পেটের ছেলে পথ্য ইহাদের যতদিন ছোট থাকে ততদিনই তাহাকে শুধু ইহারা ভিত্তিভাবে ভালবাসিতে পারে, ছেলে ‘লায়েক’ হইলেই মাতৃমেহের ইতি। পুরুষের পক্ষে মমতাবান হওয়া বয়ঃ সম্ভব, ইহাদের জোরালো দেহ-মমতার বালাই থাকিলে চলে না। ভালবাসিবে কাহাকে? পেটের ছেলে এবং মাথার স্বামী পথ্য ইহাদের এমন ধাতু দিয়া গড়া যে শুধু ভালবাসাকে ভোঁতা করিয়া ক্ষান্ত হয় না, স্বয়ংকে চুরমার করিয়া ছাড়ে। বেহ তাহাদের কাছে একটা স্থযোগ মাত্র। বাজারের বেস্তার চেয়ে মুক্তার জীবন-যুদ্ধ তাই কঠিনতর, কারণ বেস্তার প্রেমিকের মত অকরণ পুরুষের সঙ্গেই তার কারবার, অথচ বেস্তার স্বামিনতা তার নাই।

মুক্তা নিজে রোক্তগার মন করে না, যদিও নীলমণি তার অধিকাংশই নিষিদ্ধবাদের অধিকার করিয়া বসে। সরকার বাড়ী টিকে, কাজ করিয়া মাসে সে তিনট টাকা পায়, আর চার আন। জলখাবার। মুক্তার গায়ে শক্তি আছে,

গ্রামের অনেক ঘুরা কাজ তারই আশ্রয়ে। ধানও সে ভানে, আবার কনে-বৌ-এর কি হইয়া সবে শব্দরবাণী ওয়ায়।

জলপাড়া আর মাহুলি বিতরণের কৌশলও মুক্তার অজানা নয়। মরিগার আগে তার শাউরী ময়-ভর, ব্রহ্মাণ্ড আর ভৌতিক আশ্রিত তাহাকেই দিয়া গিয়াছে। ঐব তাহার হাতের মুঠার, তার জলপাড়া আর মাহুলি একেবারে অস্বাভাবিক।

এ ছাড়া মুক্তার আরও একটা উপাধি আছে। সরকার বাউরি ছোটকর্তা কেদার মধ্যা মধ্যে তাকে সিন্ধিটা অধুনিটা বধ শিশু করে।

কোন কিছু মূল্য-বান নয়, নিছক বধ-শিশু। দাম নিয়ার ইচ্ছা থাকিলে মুক্তা সিন্ধি অধুনি ছুইত না, কেদারের মুখের উপর হাসিয়া বলিত 'তোমারি থাক, ছোটবাবু।'

কেদার দেখে বলিয়াই তুচ্ছ কয়েক আনা পরমা সে হাত পাতিয়া গ্রহণ করে।

প্রেমের বিলাসিতা তাহার নাই, এ তবে কি ব্যাপার? সিন্ধি কাটিয়া যাওয়াটাই যার জীবনে একমাত্র সত্য সে তবে কিসের খাতির মাঝে মাঝে নির্জন রূপেই কেদারের ঘরে অস্বাভাবিক গোপন নিমন্ত্রণ রাখিতে যায়? সে স্বভাবতই ধর্মভীরু মেয়ে, নরকের ভয়ে পাগল তার কৃতি কর্ম। 'তবু সে পাপ করে কেন?'

কুসৃতার কুসৃতারে। সে নিছক ভূতি-বৌ—ছোট-ভাত। ছোট ধ্রুবনা মেয়ে ঘরে ভাঙা হাড়ি, ভেঁড়া কাপড়, ও নোংরা বিছানা ও ছোটলোক স্থানী নিয়া তার দিন কাটে, মাছঘরে কাছে তাহার সম্মান নাই, স্বকিয়ার পাওনা নাই, সবারে সে সব চেয়ে অশুভ, দুর্গম। সমাজের আইন-কানুনগুলি পর্যন্ত তার জ্ঞান শিথিল, এমন অস্বাভাবিক তাহার তুচ্ছতা। পাপ সে অনায়াসে করিতে পারে, সেজ্ঞ কানো কিছু আসিয়া যায় না। বিনা-আড়ম্বরে সকলে স্বীকার করিয়া মেয়ে ঘর পাপ করাই ওর পক্ষে স্বাভাবিক, ওতে বিস্ময়ের ও কিছু নাই ও নিয়া বাত হওয়ারও কোন প্রয়োজন নাই। কেদারের কথা জানাজানি হইয়া গেলে সরকার-বাউরি হইতে অবশ্য ঝুঁকতে তাড়াইই দিবে, কিন্তু সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও সবে সবে তাহাকে ক'জ রিতে রান্ন-বাড়ী এতটুকু বিধা করিলে না।

'ওয়া সবাই ও রকম বাবু।' অত বাছিতে গেলো বিরাধা চলে না।'

মুক্তার তুলনায় কেদার আকাশের মাহু—দেবতার সামিল। সে কথা বলিলেই কি মুক্তার বগিরা বাজা উঠিত নয়? কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কেদারের ঘর, কি স্বচ্ছক টেবিল-চেয়ার, কি ধ্বংসে বিছানা, মনুষ্য-শিল্পী পালকে, কাঁচের আলমারিতে কত বই! ঘরে ঢুকিয়া পাড়াইতেই মুক্তার কেমন বেন লাগে, নাভা বুলিয়া মেয়ে পরিষ্কার করার অধিকার পাওয়াটাই তার যেন অনেক তপস্যার ফল। কেদার বখন আদ্যনার সামনে পাড়াইয়া মুখে সাবানের ফেনা মাখিয়া, বাড়ি টাচ্ছে—মুক্তার ইচ্ছা হয় পাণের কাছে গড়াগড়ি দিয়া জীবন সার্থক করিয়া দেয়।

হুতরাং অর্ধের জন্ম নয়, প্রেমের জন্ম নয়, শুধু অস্বাভাবিক পার্শ্বকোর জন্ম মুক্তা কেদারের দানী হইয়াছে। অতঃপর কেদারকে সে ভর করে কিন্তু শিলে সেওয়া ঘরের মধ্যে সে অনেকটা স্বাধীন, নিজেই জাঁকলে পা মুছিয়া খাটে উঠিয়া শুইয়া পড়ে, আড়-চোখে কেদারের দিকে চাহিয়া মুচকি হাসে, কেদারের স্পর্শ এড়াইতে দেয়ারের দিকে সরিয়া যায়। দানী কি না, বেড়া হাত ধরষ স্থিতি করিয়া নিজেই গল'ভ করিয়াও হুথ পায়া। কয়েক ঘের-ওরে খেলা, এককণা আশ্রয়দানী!

হুতরাং মুক্তার মধ্যে যথেষ্ট জটিলতা আছে। ভায়া তাহাকে অস্বভাব্য একমিকে টেলিয়া নিয়া যায় না, তার জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে কারণ ও ফলিত শৃঙ্খলা আবিষ্কার করা যায়। হীন অস্বস্তার দুর্গলতায় অতি আশ্রয়ে কেদারকে সে গ্রহণ করিয়াছে এবং কেদারের কাছে বহুদূর সম্ভব তুচ্ছ হইবার তা হইয়াছে—কিন্তু ইহাই তাহার কান্দা। যত অবহেলার সঙ্গে কেদার তাহাকে গ্রহণ করে কেদারের প্রতি ভক্তি ততই বাড়িয়া যায়, কেদারের কাছে অক্ষয়ন পাওয়াটাই তার স্বপ্ন।

কেদার বিপত্নীক। অনেকদিন ধরিয়া আত্মীয়-স্বজন আবার তাহার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতেছিল, কেদার রাজি হয় নাই। বৌ নিয়া সে মৃত্যু হইতে পারে নাই। 'আ বাইলে' বৌ কবিত্ত, মারিলে মুক্তা শূন্য হইত। সে ছিঃ কারি

মুঃ, কারি কৌশল মেয়ে, বাণের আঙ্গুরী আর মুকুরী। টানা চোখ তার দিবারাত্রি ছলছল করিত, তা ছাড়া তার ছিল অস্বপ্ন, অস্বপ্নের জন্ম তার মুখে এমন একটা অস্বপ্ন বিবর্ণতা সৃষ্টিয়া থাকিত যে সেদিকে তাকাইলে পৃথিবীভক্ত মহলের একথা মনে হইবার সম্ভাবনা ছিল 'যে তাহাদেরই অত্যাচারে মেয়েটি নিরবে অকথা মধ্যা ভোগ করিতেছে।'

বড়-বৌ বলিত, 'এমন না হলে বৌ? পুণ্ডে কোন ঘর নেই। পানীর আহার খাব আর কি চাকরাণীর মত খাটে।'

গলা নামায়া—

'পড়েছে ও তেমন গোঁড়াডের হাতে!'

ওই বউ নিয়া ভূগিয়া ভূগিয়া বৌ-সম্বন্ধে কেদারের মনে হইয়াছিল। বৌকে যখন দিয়া তার কষ্টের সীমা থাকিত না, কিন্তু সে নিষ্ঠুরতা তাহার নেশার মত হইয়া উঠিয়াছিল, না হইলে চলিত না, বৌকে না কাঁদাইলে হায়ে তার ঘুম আসিত না, মনে হইত জীবনের কোথায় যেন ঠাঁক বহিয়া গিয়াছে, পানেশর স্রীণ নিছকীয় প্রাণীটাকে দেহ-মনে নিয়ান্তিত করিত না পারিলে বাচিয়া থাকিয়া হুপ নাই।

'সত্যি বলছি আজ আমার'অর হয়েছে। বিবাস না হয়, কপালে হাত দিয়ে জাণো।'

কপালে হাত সিবার চের আগে অরের সংবাদ কেদার পাতিত। গা মনে পড়িয়া বাইতেছে।

'কই জর?'

বৌ ছঃ করিয়া কানিত। 'আঃ, কি উত্তট উজ্জ্বলের সঙ্গে বৌ তার কানিত।'

'হেনে শুনে তুমি বলছ জর নেই, না কাশীর দিয়া ক'রে লছি আমার জীবন জর হয়েছে, যন্ত্রণার আমি ম'রে যাছি।' 'মিথাক।' না কাশীর নাম নিতে লজ্জা হয় না?'

কেদার যেন উত্তত ধ্বংস, অনিবার্য সর্বনাশ। বৌ এর বী সে গাণা মিমতি, ধয়া-ভিকা।' কে শুনিবে? সে সম্বন্ধে প্রতিবার তক্ত করিয়া। সিতে গোটা দুই কিল, গোটা চারেক ড় আর একটু চুল ধরিয়া টানাই যথেষ্ট ছিল।

অপরূপার পর সারাজীব্যাপী প্রেত হইয়া থাকার শিকড়তা কেদারের একদিনের ময়। অরে বেরে'স বৌকে

লাগি মারিয়া খাটের নীচে ফেলিবার পর সমস্ত রাত বৃকর ভিত্তা তাহার নিবিত না। কী সে নিশ্বাস পাশবিক বিলাসিতা, অর্থহীন অত্যাচার্য্য খোয়াশ!

ধাতে সহ হইবে না ভরে কেদার এককাল আর বৌ চায় নাই, এবার সে রাজী হইয়া গিয়াছে। রাজী না হইয়া উপায় ছিল না। পাখী বড়-বৌ-এর ছোট বোন, বড়-বৌ-এর বাবার আর ছেলে মেয়ে নাই, কিন্তু সম্পত্তি আছে অনেক।

ধবর শুনিয়া মুক্তা বিশেষ খুসী হইল না। গায়ে আর হিংস্র সারাদিন তার বৃকর মধ্যে আলা। করিতে লাগিল। নীলমণির সঙ্গে সে এমন কলহ করিল যে নীলমণিও শেষ পর্যন্ত বিব্রিত ও ভীত হইয়া চুপ করিয়া গেল।

কাজ শেষ হইলে রূপের লোটা চুপি-চুপি মুক্তা একবার কেদারের ঘরে উকি মারিয়া আসিল।

'আমি বাড়ি যাচ্ছি ছোটবাবু।'

যে কিরিয়া মুক্তার ইচ্ছা হইতে লাগিল একটা ভয়ানক কিছু করিয়া দেয়। একবার তারিফ ঘরে আগুন দিয়া দেয়, না হয় নীলমণিকে খুন করে, না হয় কেদারের জন্মের কুঁদার থাকিত। সাঁচো বিস মিলাইয়া দিয়া আসে। কিন্তু এসব রুদ্ভি বৌশীকণ তাহার মনে রহিল না, কেদারকে মন্ত্রণত শিকড় খাওয়াইয়া বশে রাখিবার ইচ্ছাটা পর্যন্ত তার মধ্যে আপনা হইতে সোপ পাইয়া গেল।

বিরোধে মুক্তার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। কেদার বিবাহ করিলে তার পক্ষে সে যে-রকম স্বাধীন মেয়েদার, কতি সহ করা তার পক্ষে কঠিন, কিন্তু অস্বাভাবিক বিশেষ প্রতিবাদ অথবা প্রতিকারের চেষ্টা করাও তার দ্বারা অসম্ভব। নিদারুণ হিংস্রা ভিতরে-ভিতরে সে নিশ্চেষ্টে জলিতে লাগিল।

উত্তিমধ্যে নীলমণি একদিন বোন। কাপড়গুলি নিয়া সহরে চলিয়া গেল। কাপড় নিয়া নীলমণি যেদিন সহরে যায়, সেদিন সে আর ফেরে না। রাজিতি-মুক্তা কেদারের ঘরে, কেদারের ময়-শিল্পী পালকের ধবংসে নরম বিছানার বাটায়।

মুক্তা এক কক্ষকে কোদারকে খবরটা দিয়া রাখিল।
'ভীতি আজ কাণ্ড নিয়ে সহরে গেছে ছোটাবাদু।'
'স্বাস্থ্য আসিন্দু।'
একান্ত তাক্সাভার নিমন্ত্রণ, স্বরটা পড়াই বরশায় নাই।

মুক্তার আনন্দের অবস্থা রহিল না।
পাহাড়ে মারের বিছানায় মুক্তা শুইয়া রহিল।
বড়-বো বলিল, 'কি সো, ভীতি সহরে গেলে আজও
ছোটাবাদু দরজা খোলে নাকি?'

'হুই ত কথা না ওদের!—মরেও না হতছোটাবাদু।'
বড়-বো ঘরে গিয়া দরজা দিল। 'মুক্তা মনে-মনে হাসিয়া
কবিল, সবাই কবছে এই শুল্ক মাহুরে শুনে থাকব মারাগাত,
কি নাম গবির বিছানায় গিয়ে শোবে একটু পরে কেউ তা
জানেন না!

তারপর সকলে ঘুমাইলে পা টিপিয়া টিপিয়া-গিয়া মুক্তা
কোদারের দরজা খেলিল।

কোদার আজ দরজা বন্ধ করিয়া ঘুমাইয়াছে।
এরকম কখনো ঘটে নাই। রাত্রি বেশী হইলে
কোদার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে বটে কিন্তু তাহারই আদেশে
তাহাকে ভাগ্যহতে মুক্তা কব্বর করে নাই। কিন্তু দরজা
বন্ধ থাকিলে ডাকাডাকির আদেশ তো নাই কোদারের!

বো বিশেষ হুন্দরী নয়। নাম মুক্তা, এবং এখনো
সে মুক্তাই বটে।

মুক্তাকে কোদারের ভালো লাগিল।
মুক্তা তাহার বন্ধ যৌবনকে অনেকটা পরিতৃপ্ত
করিয়াছিল, 'অভাগ্যার মুক্তা ভালই লাগিত।' বিবাহের
রাত্রে মুক্তার ছলছল চোখ দেখিয়া কোদারের সহসা
অভ্যস্ত মনতবোবো হইল। তাহার দরজা নারীপ্রেমে একদ্বারে
বাসল্যা সকারিত হইয়াছে।

বিবাহের পর যে সাতদিন মুক্তা এখনো রহিল, তার
মধ্যেই মুক্তা কতবার যে নববধূর মুক্তাকামনা করিল তাহার
ইচ্ছা নাই। মুক্তার বাওয়ার দিন সন্ধ্যাঝেবা বড়-বো
হঠাৎ আবিষ্কার করিল, মুক্তা কি-কেন মুক্তার আঁচল
বাঁধিয়া দিতেছে।

'কি রে মুক্তা?'
মুক্তার চমকটা বড়-বো-এর ভাল লাগিল না।
'এটা শেকড় বেঁচে দিচ্ছি গো—এক বছরের মধ্যে যদি
বাটা কোলে না আসে ত' আমার নাম মুক্তা বধেণে রেখো।'
'আজ্ঞা তুই যা, বাসন মাল পে।'
মুক্তা চিনিয়া গেলে বড়-বো মুক্তার আঁচল বুলিয়া
শিকড়টা ছুঁড়িয়া কেশিয়া দিল, বলিল, 'ঘাট ঘাট, এমনি
বাটা-কোটেই কাজ নেই বাপু।'

মুক্তা লজ্জার মাথা তুলিতে পারিল না। মুক্তার উপরে
তাহার রাগের সোনা রহিল না। এক কথা বলিয়া আসিলে
শিকড় বাঁধিয়া দিবার কাছে আরেক কথা বলিবার কি
মরকার ছিল গুণ?

মুক্তা প্রায় এক বছর বাগের বাড়ী পছন্দ। প্রথম-
প্রথম মাসখানেক কোদার মুক্তার দিকে ফিরিয়াও তাহার
নাই, তারপর হঠাৎ একদিন আনমনে তার গালে একটা
টোকা মারিয়াছিল।

স্বাস্থ্যযোগ করিয়া মুক্তা বলিয়াছিল, 'রাত্রে এসে থাক
ছোটাবাদু?'

'ভীতি সহরে গেছে নাকি?'
'না। ভীতিক কিছু একটা বানিয়ে বলগেই হবে।'
'বিকলে আমি কল্‌কাতা যাচ্ছি, আজ আর হ
না। ওইনে—'

মুক্তা হাত পাতিয়া আঁখুলিয়া গ্রহণ করিল।
তারপর একবছর কোদার গ্রামে ফিরিল না। চাঁটুঘোদের
বিবাহ মেটেটাকে নিয়া সে যে কোথায় গিয়া ছুব মারিয়া
রহিল, সে খবরও কেহ পাইল না।

চাঁটুঘো কল্লার সৌভাগ্যে মুক্তার বহই হিঙ্গা যোগ,
মুক্তারের হুঁদা কলনা করিয়া আনন্দও হইল প্রচুর।
উপর-উপর হুঁদা নীলমণিকে সে গুড় দিয়া অঞ্চল রঁধিয়া
খাওয়াইল এবং রাত্রে তার গলা হুড়াইয়া দিয়াই বলিল,
'এখনো তো বড়ো-হানডা হইনি রে, এত হেঙ্গা
করিস কেন?'

একবছর পরে গ্রামের গাভাশটা শিশু গাছ বধন লাগে-
লাল হইয়া গিয়াছে কোদার তখন গ্রামে ফিরিল। কয়েকদিন

পরেই বড়-বো মুক্তাকেও নিয়া আসিল। চাঁটুঘোদের
বিবাহ মেটেটা বোধ হয় নিশাইয়া গেল শুনাই।

প্রথম চিরদিনই মুক্তার আয়ত্বাভীত ছিল, কিন্তু আজ
কৌতুক হওয়ার ভাগ্যও তার ঘটিয়াছে। তবু তাই নয়,
তারি চোখের উপরে তার খোয়ানো বিধাতা আজ নতুন
পুতুল নিয়া খেলার মত। একা পাইলেই নববধূকে কোদার
চুম্বন করে, কিন্তু সেটা প্রায়ই মুক্তার চোখে পড়িয়া যায়।
মুক্তার দিকে মুক্তা সর্গদ্বারই সতর্ক দৃষ্টি রাখে।

তার আকৃষ্ট তীর হাটনি মুক্তা সহিতে পারে না। ভয়ে
তার মুখ বিবর্ণ হইয়া যায়।

মুক্তা একগাল হাসিয়া বলে, 'কি সো ছোটাদিদি, বরের
আঁদর বড় মিষ্টি লাগে, না?'

মুক্তা ভগ্ন-ভয়ে বলে, 'তুমি তোমার কাজ করগে যাওনা
বাবা, আমার সঙ্গে ঘুরছে কেন?'

মুক্তার গেলব কওঁদগের দিকে চাহিয়া মুক্তার হাত
নির্গপ্ন করে।

'আমরাও তো তাই বলি—এও-কি একটা কথা!
ছোটাবাদু দেবতুল্যা লোক, শুল্লের বো-কি বার করা কি তার
কাজ! যাও এমন সোনার, প্রতিমে বো—'

কোথায় অর্থাৎ করিলে তার কতখানি বাড়িলে মুক্তা
তাছাড়া জানে। কোদারের অগকীতির কথা ভুলিবার হযোগ
মুক্তাকে সে দেয় না। মুক্তার মুখ যত পাংস্ত হইয়া যায়,
ততই সে তার ছোটাবাদুর গন্ধ-সমর্পন করিয়া সত্য কল্লের
গতিয়া প্রতিবাদ করিতে থাকে।

যেবে একদিন সহিতে না পারিয়া কাদিতে-কাদিতে
মুক্তা কোদারকে সব বলিয়া দিল।

মুক্তার গায়ে লাল আনিয়া মুক্তা তখন পরম আনন্দে
রোয়াকে মল্লা পিথিতে বসিয়াছে। কোদার কথাটা না
কহিয়া তার গায়ে সেখানে এক লাথি বসাইয়া দিল।

মুক্তা একটা বিশ্রী শব্দ করিল।...তার কপাল ভয়নকভাবে
কাটিয়া গিয়াছে, একটা কানের চাঁদ তার মাঝি রোয়াকের
প্রান্তে লাগিয়া ছিঁড়িয়া চিনিয়া আসিয়াছে।

কোদার বলিল, 'মল্লক!'
মুক্তা পিছু-পিছু ছুটয়া আসিয়াছিল, কামা ব্যাপারটির

মধ্যে রক্তের আবির্ভাবে ভয়ে সে পর-পর করিয়া কানিতে
লাগিল। মেয়েমাহুরের গায়ে হাত তোলার অভ্যাস যে
কোদারের একদিনের নয় জানা থাকিলে সে তাহাকে ঘরের
বাহিরে আসিতে বিত না।

বড়-বো বলিল, 'কি, হয়েছে কি তুমি?'

কোদার কক্ষের বলিল, 'সে তোমার শুনে কাজ নেই।
মাইনে দিয়ে ওকে তুমি আদর্শকে বিরোধ করে দাও বৌদি।

কাল থেকে বড় বড়িভেতে চোকে, ভাল হবে না।'

রাত্রে মুক্তা বলিল, 'দোষ করেছে, তাড়িয়ে গিয়েই হ'ত!
মেয়েমাহুরকে এমন মার কি করে মারলে গো?'

কোদার তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, 'চুপ কর।'

মুক্তা ধতস্ত থাওয়া গেল। মুক্তার এমন নিখাতিন
দেখিয়াও সে ভাবিতে পারে নাই যে কোদার ধমক দিতে
পারে—তাহাকে!

মুক্তার গুণগ্রন্থের প্রথম ভাগের সন্ধান এইখানে।
এ সমাপ্তি যে কী, কেহ তাহা বুঝবে না। পূজা নিয়া যার
দেবতা বিনিময়ে সর্গনাশ করিয়াছে সে-ও না। কারণ,
লাগি মারিয়া তাড়াইয়া দেওয়ার চেয়ে সব রকমে সর্গনাশও
মুক্তার ভাল ছিল। তাছাড়া সে বুঝিতে পারে না,
অবহেলায় বিরুদ্ধ অভিযোগও সে করে না, কিন্তু মেরুতে
মাগধিক কালবাণী অসহ বয়স, কপালের গভীর ক্ষত
আর কাটা কানের লজ্জা তুচ্ছ করিয়া দেওয়া মুক্তার ক্ষেতও
সম্ভব নয়। কোদার আর কেহও নয়, দানব। নীলাম্বরিত মত
কোদারকেও মুক্তা আজ সামনা-সামনি অত্যা গাল দিতে
পারে, বোধ করি হাতের কাছে ছুঁড়িবার মত কিছু থাকিলে
ছুঁড়িয়াও মারিত পারে।

রাগের মাথায় নয়, ঠাণ্ডা মাথায় চাটিকি বিবেচনা
করিয়াই মুক্তা বদলে কোদারের নামে লালিশ হুঁকিয়া দিল।

কোদারের দশবছর জেল হইলেই মুক্তার মনের মত হইত,
কিন্তু সে বকম পিছুই হইল না। আদারতে প্রায় হইয়া
গেল, মুক্তা যেমনি তার খাইয়াছে কোদার সেদিন এবং তার
আগের ও পরের অনেকদিন কল্‌কাতাভেই ছিল।

নামনি বলিল, 'কি করবি বল, গরীবের বিচার নেই।'
তারপর আপশোষ করিয়া বলিল, 'মায়ের থেকে বাবুদের
চোখে রাখি।' ওনারের সাথে নাকি আমরা শ্রদ্ধা করে
পারি।' তখন হঠাৎ করে মূকতা পড়ল।

কিন্তু দিনের পর দিন কাটিয়া গেল, শোধ আর মুক্তা
তুলিতে পারিল না। শিশু গাছের লাল ফুলগুলি অনেক-
দিন তুলিয়া হইয়া উড়িয়া গিয়াছে, সরকার বাড়ী ধুমধামের
সঙ্গে পূজা হওয়ার পর শীতের গোড়ার দিকে ছেলে হওয়ার
জন্ত মূকতা বাবুদের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। মুক্তা এখনো
কোদারের কিছু করিতে পারে নাই।

মাঝ মাঝে কার কুপারামর্শে এক বস্তা ভীতের কাগড়
নিয়া আঁশনি একবারে কলিকাতার চলিয়া গিয়াছিল,
একদিন সন্ধ্যার পর কোদার আসিল।
'কেমন আছিল, মুক্তা?'
'ভাল আছি ছোটবাবু।'

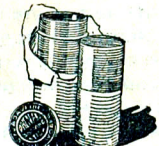
হতভম্ব মুক্তা না পারিল কোদারকে প্রশ্নান করিতে, না
পারিল বলিতে বলিতে। নিশ্বাস রোধ করিয়া শুধু চুপ-চাপ
মাড়াইয়া রহিল।

'সেদিন তোকে মেয়ে অবশি এমন মন ধারণ হয়ে আছে
কি বলব। খুব টেঙেছিল, না?'
বলিতে বলিতে নিলজ পদক্ষেপে কোদার ঘরে ঢুকিয়া
পড়িল। মুক্তা তাহাকে অসুস্থ বলিয়া দরজা ডেঙাইয়া
দিল। একটা বেকরপ শব্দ হইল সেটা দরজাই মরিচা-
পড়া কজার।

কিন্তু মুক্তা মুক্তা না পারিল কোদারকে প্রশ্নান করিতে, না
পারিল বলিতে বলিতে। নিশ্বাস রোধ করিয়া শুধু চুপ-চাপ
মাড়াইয়া রহিল।



JADAVPUR SOAP WORKS.
অল্প বর্ষে সৌন্দর্য সম্পাদিত করিত "অদ-
রণ্য" সাবানের তুলনা নাই। অদর্যগ
সাধারণ সাবানের হার অধের কোমলতা
নষ্ট করে না—ইহাই ইহার বিশেষত্ব।



ফেনকা শেভিং স্টিক

ফেনকার স্বরচিত ফেনপুঞ্জ কোরকক্ষে
সত্যি আনন্দ দান করে। যিনি ব্যবহার
করিয়াছেন তাহাকেই জিজ্ঞাসা করুন।
আপনার ষ্টেশনের কাছে যদি না
পান, আমাদের হাট্টি লিখিতে বসুন।

বাদবপুর সোঁপ ওয়ার্কস্
২৯নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

পুস্তক-পরিচয়

মণিদীপা
কে-কোন জাতির সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় তার
সাহিত্য-স্মৃতিতে, যেমন ব্যক্তির জীবনে যেমনি জাতির
জীবনে স্বপ্ন-স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দর্শ-বৈশা বড় গভীর-
ভাবে রেখাপাত করে যায়। জাতির বিভিন্ন সাধনার এই
যে বিভিন্নরূপ তা' রয়েছে, রসে রূপায়িত হয়ে প্রকাশ
পায় তার সাহিত্যে। কাজেই যে-কোন জাতির অঙ্গের
পরিচয় পেতে হলে, তার সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়
হওয়া চাই।

রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে আমরা বিভিন্ন প্রদেশের
সঙ্গে পরিচিত হয়েছি বটে কিন্তু সে পরিচয় পনিটিজের
ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, প্রাণের যোগে তাতে ঘটে নি—কারণ
কারো প্রাণের খবর কেউ রাখেনি। প্রাণের খবর পেতে
হলে আমাদের পরস্পরের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে
হবে। এদিক দিয়ে যুক্তি শ্রীমুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায়ের
'মণিদীপা'ই অগ্রপথিক। এই কাব্য-সংগ্রহে তিনি ভারত-
বর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার বিখ্যাত কবিদের মণি-
মণ্ডা থেকে যে উজ্জল মণিগুলি, চয়ন করে বঙ্গভারতীয়
পূজাপ্রদীপ সাহিত্যেছেন—তার 'মণিদীপা' নামটি যুগ্মর ও
স্বাক্ষর হয়েছে।

এই 'সিরিক' জাতীয় কবিতা-সংগ্রহে স্থান পেয়েছে,—
সংস্কৃত, হিন্দি, তামিল, গুজরাতি, সান্ঠালী, কোচ প্রভৃতি
বিিন্ন ভাষার কবিতা; বৈষ্ণব কবিতাগুলিকে একটি
আলাদা ভাগে স্থান দেওয়া হয়েছে, এটা সমীচীনই
হবে; কারণ বৈষ্ণব কবিতার নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য পাড়িয়ে
গেছে, তার গভীর অহুতির বিভিন্ন প্রকাশ-ভঙ্গীতে।
সংস্কৃত কাব্য ও বৈষ্ণব পরাবলীর সঙ্গে রাজনীতি পাঠকেরও
এক রকম সাধারণ পরিচয় আছে হতে, তবে আর কোন
ভাষার কাব্য-সমৃদ্ধ আমাদের বিশেষ কোন ধারণাই ছিল না,
কিন্তু তামিল, গুজরাতি, হিন্দি ইত্যাদি—জগত ভাষার

বহুতর পরিচয় কবি হেমেন্দ্রলালের 'মণিদীপা'র
পেলাম তাতে বিশ্বাস, আমরা মনপ্রাণে ভেঙে উঠি।
এ আনন্দ দূরদেশে অপরিসীমের মনোহর আপনার জনকে
আবিষ্কারের আনন্দ। ভিন্ন ধর্মের গোষ্ঠিক-পরিচ্ছদ-পরা
বেশে পাশ কাটিয়ে চলে বাঙ্কিলাম—সে বহি: আবার
আপন মাছুষাধার কথা বলে শুভে: অব:প্রাণে: যে আনন্দ
হয় এ সেই আনন্দ। তামিল, গুজরাতি, হিন্দি কবিতা-
গুলিকে তাদের ভাষার গোষ্ঠিক ছাড়িয়ে বাঙালি ভাষার
চিরপরিচিত গোষ্ঠিক পরিচয় কবি হেমেন্দ্রলাল বন্দ্য
আমাদের সামনে দাঁড় করিয়েছেন, তখন দৃশ্য দিয়ে তাদের
দ্বন্দ্ব এক মুহূর্তে অহুতর করে: বিশ্বকে আনন্দপ্রাণ উলস
হয়ে উঠিলো। আমাদের ঘরের পাশের প্রতিবেশীকে
আমরা জানিতাম না, কবি হেমেন্দ্রলাল—এই পরিচয়ের স্বাধী
বেশে দিয়ে রস-পিপাসু চিত্তের চিরন্তনতত্ত্বা অর্জন
করলেন।

কবিতা দ্বয়ের জিনিষ। কবি তার কাব্যের কথা-
বস্তুকে প্রাণের মধ্যে রাঙিয়ে অসুখ অহুতির রসে ভুবি
যে অপকল্প রূপ দেন, কবিতার সেই হলো প্রাণ। কবিতার
সেই প্রাণবন্ত বাক্য রেখে ভিন্ন ভাষার ভাষকে রূপান্তরিত
করা যে কি কঠিন ব্যাপার, তা কাব্যরসিক মনেই
জানেন, কিন্তু এই অধি-পদ্যকা কবি হেমেন্দ্রলাল আমাদের
উজ্জ্বল হয়েছেন। তার সাধনী ছন্দে রস-স্বাদ, শব্দ-
চয়ন ক্ষমতার জন্ত কবিতার অধ-সৌন্দর্যের কোথাও এতটুকু
ক্রটি হয়নি। কবিতার কাব্যের সঙ্গে কবীর ও ছন্দের সম্বন্ধ
প্রাণ থেকে শেষ পর্যন্ত সমান—তালে, চাচিয়ে, যিনি তার
পাকা ওস্তাদির পরিচয় দিয়েছেন; কিন্তু সব চাইতে বড় কথা
এই যে তার গভীর চিন্তাবোধের দ্বারা তিনি এই অহুতর
গুলিকে বাস্তবিক কবিতা করতে সক্ষম হইলেন।

কবিতা কি, কাব্যের রস কি—সে বস্তুটি হয়, উচ্চাঙ্গের
কাব্যের কি কি—স্বপ্ন, পূজা, দরকার, এস-সব নিয়ে অনেক

দ্রুততর আলোচনা চলতে পারে; কিন্তু কবিতায় আসল পরিচয় তাতে এতটুকুও পাওয়া যাবে না। চিনির গুণ বৃদ্ধিতে হলে তার রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্ত বাস্তব নী হয়ে এক টুকরো মুগ ফেলে বিশ্লেণেই যেমন তার নিরীক সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না; কবিতা-সম্বন্ধেও তাই। কবি হেমেন্দ্রশালার এই কাব্যসংগ্রহ থেকে গোটাচক্রেয় দায়দায় করেকটি করে চরিত্র এইখানে আমি উদ্ধৃত করে বেওয়ার শোভ সযগ্ন করতে পারলাম না, রস-পিপাসু তাই থেকেই তাঁর এই কাব্য-সংগ্রহের সত্যাকার পরিচয় পেয়ে যাবেন। অথেষের 'উদাস্ত'তে যখন পড়ি—

দখের তোবার দীপাভি হামি,
করে যৌবন সকল গার,
মুখে আর বুকে জোতির মলক,
আলোর পুলক অফোর্ডে তার।

যখন উদার অনবস্ত্র হৃদয়ের উজ্জ্বল-মধুর এক রূপ মনস্তরুর সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে। হৃদয়ের আরতির যে আনন্দ তা দেবার ভাবা আর ভাবতরুর স্পর্শে দ্ব্যয়ে দোলা জাগিয়ে দেয়, এটা যে অজবাব তা মনেই থাকে না। এই থানাই কবি হেমেন্দ্রশালার বাহ্যতরী।

মেঘবৃত্তের অসুখার মন্দাকিনী-ছন্দে অনেকে করেছেন কিন্তু ভাব-গাছাওগে ধ্বনি-গোড়াবে কবি হেমেন্দ্রশাল বহুটা মূল্যের কাছাকাছি গিয়েছেন,—এক কবি সত্যেন্দ্র হস্তকে বাদ দিলে একটা আর কেউ পারেন নি। যখন পড়ি—

বিভ্রাৎ পল্লব তোরাতে রত্বখন, ইম্মা নদী তার হর্দ্যে তার,
ইচ্ছের কাশ্মুকি তোরাতে শোভে মেঘ, শীত ছবি তার জ্যোতির গার,
গমীর গর্জন-সুনিদ মৃত্তক, বৃষ্টিতে সুখিত সে পুষ্কল,
অবের অধর সৌর কোঁর তারো—তুইই অলপকার তুলনা হয়।

তখন সংস্কৃত মন্দাকিনী-বহির্ভিত্তি ধ্বনিই কানে বেজে ওঠে।

আবার যখন পড়ি :

মানবীতের মনের সোরে

ফিল্ম ফুলকে আদ্যভাষ,

আমের বেগের কানে কানে

দখিনবার গুণ ঘনায়।

যাফুর হাশো বহুল ধ্বনি—

বহুভাবের গম্ব-বহুভে,

বন-পথের কীক কীক

বেরিয়ে এলো দাখ মেয়ে।

তখন বসন্তোৎসবের যে-রূপ মনে জেগে ওঠে তা আমাদের চিরপরিচিত অখণ্ড চিত্রমুখ। বাংলা-দেশের আমের বনে বহুল বর্ণিত, মৌমাছিরের গুঞ্জনে, গন্ধ-ভারাতর দখিনবহুর 'আনাগোনা'র বসন্তের যে-রূপ প্রতিবছর ধরা দেয় এ সেই রূপ।

মীয়ার 'কামনা'র প্রেম ও ভক্তির যে সহজ-সুন্দর সুরটি ধরা পড়েছে সে বাঙ্গালীর একেবারে প্রাণের জিনিষ; তাই যখন শুনি :

বো'নু রে অখার মীয়ার কলহ,
হোক না আঁধার নিবিড় ঘোর,
আবেক রাতেই বিবেক দেখা
গোমচরী বন্ধু তোয়।
যন নিবিড় নদীর তীরে
বধিষে হাতে মিলন জোর।

তখন প্রাণ যেন সেই 'অজানা' বন্ধুর মিলন-আশার আঁধার রাত্রে নির্জন নদীতীরে দ্রুত দ্রুত বসে, গিয়ে দাঁড়ায়। 'আবার, বর্ষা-দিনের 'অবিস্রা' বর্ণনের মধ্যে প্রেমিক-দ্বয়ের প্রিয়ের জট উদ্ভূত 'আবেহে অপমান' জিহ কেমন মনোরম ভাবে ফুটে উঠেছে। মীয়ার ভক্তনের আর ছুটি চরণে :

সরিছে বালস আবেগের,
যন যন যেন গর্জন,
বঁধুগার ই চরণের
ধ্বনি আসে তাই শোনুন মন।

তামিল কবিতার যে ছ'একটি অসুখার এর আগেও চোখে পড়েছে তাতে এ ভাবার ওপরে মোটেই শ্রদ্ধা জাগে নি, কিন্তু কবি হেমেন্দ্রশাল পাকা হজীর মত ভাষ্যমানবর ও ত্রিভুবনবহুর যে কয়টি কবিতা চয়ন করেছেন তাতে তামিল কবিতার সঙ্গে পরিচয় নিবিড়তর করার জন্তে একটা

ইচ্ছা 'আগনি' মনে জেগে ওঠে; ভাষ্যমানবরের 'ব্যাকুলতা' কবিতাটি থেকে একটা নমুনা দিচ্ছি—

যখন জেগে আলো দরার রবি,
আলোর লোমে পাগড়ি যে পথের—
যে শুভু মেঘ, তোবার আলোককে,
দগধ্বনি মোর ছুঁতে জীবনের।

আকাশ ফিরে মেঘের বোঝা জাগি,

মেঘের পানে ধরে ধরে মধু নাচে,

নিটরাজের দুস্তা বোঝার লগি,

জিহ আমার মূহুর হয়ে আছে।

এই পৃথিবীতে স্বতন্ত্রের আবর্তনে ঘেরা রস ও গানের উৎস বিচিত্র লীলার অবিশ্রাম করে পড়ছে তা সবই প্রেমিক-চিত্তে সেই চিরপ্রেমময়ের জন্ম একটা নিবিড় 'ব্যাকুলতা' জাগিয়ে তুলছে। মানব-আত্মার এই চিরন্তন ব্যাকুলতা চরণ-কয়লাতে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

সংগ্রহের সব শেষে 'হান' 'পেয়েছে কয়েকটি সাঁওতালী ও কোচগান, শেষে 'হান' পেলেও এদের সহজ সৌন্দর্য মোটেই উপেক্ষার নয়। কোচগানটির কয়েকটি চরণ এখানে তুলে দিচ্ছি, তাই থেকেই তাদের পরিচয় পাঠক পাবেন—

তোরাধু নদী তার দিগি, মহাদী নদীর পাবে
সোনার বঁধু গান খেয়ে যায়—যার সে-অস্তিত্বারে।

তোরা গানে ও চার কি দিগি, মোর গান চার ১—
কান পেতে শোন, সোনার বঁধু গান খেয়ে ওই ঘাট।

এই গীতিকবিতার সহজ সরল কয়েকটি চরণে গ্রামাণ্ডের যে উজ্জল-মধুর যন্ত্রোদ্য রূপটি ধরা পড়েছে তার তুলনা হয় না। আমোদ বেন, চোখের সামনে সেখান থেকে পাছ সেই একে বৈকে বসে বাসো নান্দাই নদী আর তার ধার দিয়ে গাওয়া ফুরের বাজুরকে, যে তার বাঁশির হুরে সরলা গ্রামাণ্ডার মনে এক 'অজানা' বাঁধার আশ্রয় ছড়িয়ে দিয়ে গেল।

যে কাব্যকাণ্ডগুলি উদ্ধৃত করলাম তা থেকে বিভিন্ন ভাবার কাব্যরূপ-সম্পদে আমাদের যে একটা স্রষ্টার ভাব 'অধমে' তা নিশ্চিত। বিরোধীভাবার কবিতাগুলিকে কবি হেমেন্দ্রশাল যে রূপ দিয়েছেন তা একেবারে বাঁট বাঙ্গালী রূপ—যে রূপ আমাদের হৃদয়ে সাড়া জাগায়। কামিলাদের 'মেঘবৃত্ত' থেকে 'সুর করে' সাঁওতালী গান পথার প্রত্যেক

কবিতার ভাবের উপযোগী যে-সুন্দর ভাষা দেহি তিনি গড়েছেন, সে অপূর্ণ। একদিকে মেঘবৃত্তের কবিতা মন্দাকিনীর ধ্বনি-বৈচিত্র্য যেমন ধরা পড়েছে, ওদিকে 'আবার সাঁওতালী' গানের সহজ সরল গ্রামাণ্ডা 'সুরটি' তেমনি মধুর ভাবেই বেজেছে। এইখানে কবি হেমেন্দ্রশালার স্তম্ভ প্রচেষ্টা সার্থক ও জয়স্কৃত হয়েছে।

'মণিবাণী'র বহির্ভূত সৌন্দর্য ও 'আচর্য্য' 'সুন্দর'। মরকো চামড়ার অলঙ্কারে যুগ্ম বাঁধাই; প্রজ্ঞা-পটটি সোনার জলে ছাপা, একটি-ভক্তগীর ছবি। হৃদয়ে তার প্রদীপ—বেশ একটা নিবেদনের ভাবজোক্ত। প্রত্যেক পাতার নীচের ছোট ছবিগুলি কবিতার ভাবমুখিকে রূপ দিতে চেষ্টা করেছে। বাংলা এবং বাংলায় বাইরের ছবিজন-বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা চরিত্র পানা সুন্দর ভিন্ন রংয়ের ছবি, বইখানার শোভাবৃদ্ধি করেছে। এরকম সুন্দর 'অলঙ্কার' নিয়ে যুবক বই-ই বেরিয়েছে—প্রকাশক ইতিহাস-পারিশিখি হাউসের এটি একটা উজ্জল ভয়স্তম্ভ।

শ্রীরাখালসহু নিয়োগী

ছোটদের বার্ষিকী

সম্পাদক : শ্রীরাখালসহু সেন। প্রকাশক : পপুলার এজেন্সী, কলিকাতা।

বর্তমান বৎসরের সর্বশ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যের শারদীয়া-বার্ষিকী বঙ্গীয় ইচ্ছাকে পরিচিত করিলে, বোধকরি বেশি বলা হইবে না। প্রথমেই ইহার ছবি 'আর ছাপা দৃষ্টিকে মুগ্ধ করিল। প্রতিটি পৃষ্ঠা বিভিন্ন কালিতে, পরিষ্কার অক্ষরে, এবং নিখুঁত-ভাবে ছাপা। বাংলা বৈশেষ 'প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকাদের লেখা ইহাতে আছে। রোমাক-গল্প ভৌতিক-কাহিনী, বিজ্ঞানের গল্প, আবিষ্কারের কথা-প্রভৃতি নানা বিভিন্ন বিষয়ে এই বার্ষিকী সমৃদ্ধ। ছেলে-মেয়েরা এ-ই পাইলে দুখী হইবে।

ছোট গল্প সাপ্তাহিক—শারদীয়া সংখ্যা।

সম্পাদক : শ্রীপ্রেমেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা। দুই শারলরেজ ইহাতে প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যা এক আনা। এই সংখ্যার মূল্য পাঁচ আনা।

বর্তমান বর্ষের শারদীয়া গরু-সাহিত্যিক পরিচিতি—এই-ই একমাত্র। এবং শুধু একমাত্র নয়, হাত-রস সাহিত্যে ঐহাদের 'ভূতীরা' নাই সেই ছই প্রাণী গরু-সাহিত্যের লেখা একই সঙ্গে ইহাতে মুদ্রিত হইয়া, এই বিশেষ সংখ্যাটিকে অননুসরণ করিয়া তুলিয়াছে। পরন্তু রসের শাখিত লেখনীতে চরিত্র-চিত্র-শাখার কত নতুন নতুন দ্বারাই খুলিয়া গেছে। কয়েকটি ছোট কথা, এবং বিশেষ বিভিন্ন ভঙ্গিতে তিনি শোক-চরিত্রের যে-সহজ, সাধারণ মুদ্রাদেয় কল্প দৃষ্টিতে আবিষ্কার করেন, তাহাতেই তাঁহার শক্তির বকীরাটা পরিষ্কৃত। প্রাচীন যুগের বনিকা উল্লেখ্য করিয়া তিনি এবার যে প্রেত-চক্রের কীলা দেখাইলেন, তাহাতে সবুধের সোকেরাই বর্ষক হইয়া তাহা উপভোগ করিলে। 'কেন্দ্রের কবচ' নামের 'কাহিনী'র সঙ্গে 'ছবি'ও আমরা অত্যন্ত উপভোগ করিয়াছি। 'নামা' যেমন অপূর্ণ রস-কাহিনী বর্ণনাছেন, তেমনিই চমৎকার ছবিও আঁকাছেন।

তারপর 'অজ্ঞাত যুগের রস-সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নাম-রূপ'। রূপসেই যমান! নাম এবং রূপ ছইটা একসঙ্গে ত' মেসেই না, বরং বিপরীতই দেখা যায়। জাপানের অতিথি-সংস্কার, জাপানী আবহাওয়া আর জাপানী তরঙ্গীত চমৎকার।

অজ্ঞার সেন, নানারসসিক লেখক। তাঁর 'শ্রী-বুদ্ধি'ও আমাদের ভালো লাগিয়াছে। অজ্ঞার সেনের 'নিব আনন্দমঠ', 'মানন্দমঠের' আনন্দিকতম রস-সংস্কার। উপভোগ্য।

নতুন প্রচ্ছদশিট শিল্পী-বাছুর বতীপ্রসূয়ার সেনের অঙ্কিত।

শুপাশিখা

একখানি সামাজিক উপভাস। গৃহস্থ-ঘরে বাহা খাটা থাকে এবং সেই সকল সহজ খটনার অস্থানে মানব-মনের যে কি বিচিত্র কীলা নিভা চলিতে থাকে আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার তাহারই একটি স্বন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তা' ছাড়া বিনিময়ে, আচার অহুতনের চেয়ে অহুতের সত্য যে অনেক বড়—তাঁহাও গ্রন্থকার স্বস্পষ্ট ভাবে দেখাইয়াছেন। আখ্যান-অংশ নতুন না হইলেও প্রচলিত, স্থানীয়। গ্রন্থের ভাষা মজ্জিত ও গ্রন্থকারের সুকঠিন ভ্রমের পরিচায়ক। বর্তমানযুগের তথাকথিত "Advanced idea"র অড়ো বক্তৃতায় গ্রন্থকারের নামক-নাথিকার অস্বাভাবিকভাবে যুগের ও অশোভন করিয়া তুলে নাই।

সর্বত্র একটা স্থলংঘত ভাব পরিষ্কৃত। কোথাও 'অন্যজীবী' অহুতরূপ-প্রচেষ্টা বা প্রচেষ্টা মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের উৎকট অভিলাষ গ্রন্থকারকে বিভ্রিত করে নাই। শুকতি পাঠক মাঝেই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আনন্দ পাইবেন না।

উপসংহারে একটি কথা বলা আবশ্যক; গ্রন্থের প্রকৃ দেখা বিষয়ে আর একটি মনোযোগ দিলে ভাল হইত। পুস্তক-খানির কাগজ, ছাপা ও বান্ধাই স্বন্দর।

[ত্রিফলসুপ ভট্টাচার্য্য এন-এ, বি-এ প্রণীত। কলিকাতা, ২২৫ বি ঝানাপুত্র লেন, বেক-সাহিত্য স্টোর হইতে প্রকাশিত। ১১৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ২।]

বিবিধ

রবীন্দ্রনাথের বানী

[আর্যদেব-প্রসঙ্গে]

[বিবদ্য] আর্যদেব মহাবিশ্বালের উদ্বোধন উৎসব-উলসকে যুক্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্তৃক মোহিত ও তাঁহার ইচ্ছামুগারে উদ্বোধন-সভার গঠিত।

একদিন ছিল যখন ভারতবর্ষ চিকিৎসা-বিজ্ঞান দূর্ব-প্রসারিত খ্যাতি ছিল। এই বিজ্ঞা পুরীকা এবং অভিজ্ঞতা যথেষ্ট ধারা তখন ক্রমশঃ গৃহগতি লাভ করছিল। নানা স্থিতিতে নানা শাখা-প্রশাখা-বিস্তারে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মানুষের জ্ঞান কোন বিশেষ শাখায়; কোন বিশেষকালে যদি আবদ্ধ থাকে, তবে তাকে আমরা প্রজ্ঞা করতে পারি না। নিভা প্রবাহিতরূপে, নিভা নতুন ভূমি অধিকার করতে থাকলে তবেই তার গৌরব ও শক্তি রক্ষা হয়। বিজ্ঞান নদীর মতো, যে নিরন্তর অগ্রসর হ'তে হ'তে আপন ভর সংশোধন ও নব নব উপলব্ধির সঙ্গে পুষ্টিত মগ্ধের সামঞ্জস্য সাধন করে উত্তরোত্তর শার্ক হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের চিকিৎসা-বিজ্ঞান সাধনা একদা সেই রকম পথ্যবেশের পথে নিয়ত পরিপুষ্ট হ'তেছিল। সাংস্কৃত্য কোনো মতকে আশ্রয় না'লে নির্ভিচারে গ্রন্থ করে শুদ্ধ হয়ে বহাগিলেন না। শরীরতত্ত্ব আরোগ্যতত্ত্বকে প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত করার দিকে তখন চেষ্টার বিরাট ছিল না। অবশেষে একদা যে কারণেই হোক, দেশের চিকিৎসা নিশ্চেষ্ট হয়ে যাওয়াতে সকল প্রকার মতবাদ মন-ক্লিষ্টা থেকে বিমুক্ত হয়ে কেবল জড়ভাবে সঙ্কয়ের সামগ্রী হয়ে উঠল, তাদের মধ্যে প্রাণদান পরিবর্তনের উত্তম রইল না।

নবী যখন চলে না তখন শুকপথের মাঝে-মাঝে সর্গীয় সীমায় বদ্ধ জলকুণ্ড থেকে বায়ু; নিশ্চল শায়ে বদ্ধ জ্ঞান ও

প্রাণ ও বিশ্বাসের ধারা সেই রকম প্রবাহিত। আর, মধ্যে কোনো সত্য নেই তা নয় কিন্তু সে সত্য রূপের সঙ্কয়ের মতো, বাণিজ্যের অভাবে তার বৃদ্ধি তো হয়ই না, অন্ধকার থেকে তার কটটা জীব হয়েছিল, বিকৃত ও নিরর্থক হয়েছিল তারও নতুন করে হিসাব পরীক্ষা করে নিতে অন্ধ বিশ্বাসের অহুতের বাধে।

মহামহোপাধ্যায় গণনাগ সেন মহাশয় আজ যে বিশ্বনাথ-আর্যদেব-মহাবিশ্বালয় প্রতিষ্ঠা করলেন, আমি তাতে প্রধান আনন্দের ও আশীর কথা এই দেখি যে, কেবলমাত্র শার অধ্যাপনাতেই তাঁর উদ্বেগ সীমাবদ্ধ নয়। তার সঙ্গে গবেষণা-মন্দির এবং সেই মন্দিরের 'অপরিসীম' আনুসঙ্গিক-রূপে আরোগ্যশালাও আছে। স্পষ্টই অহুতন কথা যায় যে, এখানে আরোগ্যের প্রক্রিয়া ও ফল, মগ্ধে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা বিস্তৃতভাবে সংগৃহীত ও বিচারিত হবে এবং তাঁর নির্দেশ অহুতের নতুন প্রাণী উদ্ভাবিত হ'তে থাকবে। অর্থাৎ একদা ভারতে নানা চিন্তের সংযোগিতায় চিকিৎসা-শাস্ত্র-সাধনার যে দ্বারা চলেছিল, সেই ধারা আবার এখনে প্রবর্তিত হোলো এবং যে মহতী বিজ্ঞা আপন জন্মভূমিতে সুস্থ হয়ে বহু শতাব্দী বিশ্বজনের প্রজ্ঞা হারিয়ে গড়েছিল, আজ তার উদ্বোধনের অহুতনে মগ্ধের ভারতবাসী যোগ দিলেন। এই মগ্ধ অধ্যাপকের প্রবর্তনার ভ্রম আমি মহামহোপাধ্যায় গণনাগ সেন মহাশয়কে আশ্বস্ত সাধুরা জানাচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দীপ্তি-স্নেহ

'দীপ্তি' কেমিক্যাল ওয়ার্কস্-এর প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত রাসায়নিক শ্রীবিজয়কুমার ঘোষ একদিন 'দীপ্তি-স্নেহ'

আমাদের পাঠিয়েছেন। মোট আমরা ব্যবহার করে দেখছি। এর অল্প কিছু গানের স্বরূপে মন প্রকাশ হয়ে ওঠে। পরশজাত এই বিলাস, জ্বাট সর্বস্ব আদর পাক আজ এই প্রার্থনা।

'বিচিত্রা' ও 'লিরাটি' পত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালক মহাশয়গণের সৌজসে আমরা অনেক সময় ব্লক প্রভৃতি ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়া থাকি। এই সুযোগে আমরা উত্তরা'র পক্ষ হইতে তাহাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

স্বদেশী মেগাফোন রেকর্ড

'উত্তরা'র পাঠকবর্গ হইতে শুনিয়া অনানুষ্ঠিত হইবেন যে বিখ্যাত গ্রামোফোন বয়ঃ-নির্মীতা কলিকাতার মেগাফোন কোম্পানী ইলেক্ট্রিক-পদ্ধতিতে স্বদেশী মেগাফোন রেকর্ড বাহির করিয়াছেন। আমরা তাহাদের প্রকাশিত প্রথম আট খানি রেকর্ড শুনিয়াছি এবং প্রত্যেকের বাণী এত সুস্পষ্ট উদ্বিগ্নে যে সতরাচর সেরকম শোনা যায় না। মেগাফোন কোম্পানীর সত্বাধিকারী মিঃ স্কে, এন. ঘোষ সঙ্গীত এবং গায়ক-নির্মীতানে যথেষ্ট আশাস স্বীকার করিয়া রেকর্ড-সঙ্গীতের ধারাকে একটা নবরূপ এবং নব-প্রাণ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মেগাফোন রেকর্ডের গানগুলি একদিকে যেমন সাধারণের চিত্তকে দোলা দিবে, অপরদিকে আমাদের সঙ্গীতের ভাঙারে অহারা চিরকাল অক্ষয় হইয়া থাকিবে বলিয়া মনে হয়।



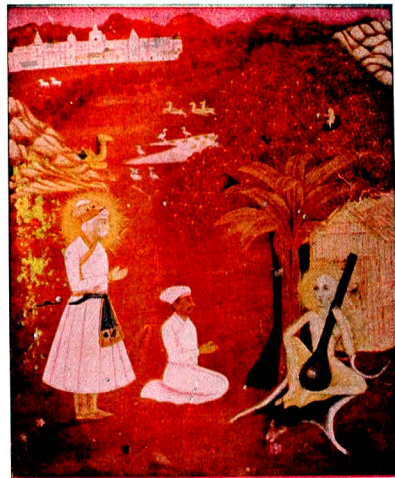
সর্বত্র পাইবেন

বিশেষ অঙ্গসজ্জানের জন্য নিম্ন টিকানার পত্র লিখুন :- গোষ্ঠী বয়ঃ ৭৮২৪ কলিকাতা।

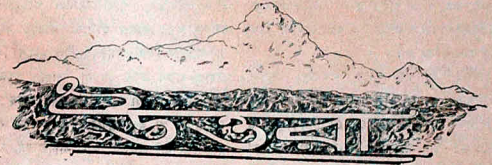
স্বীকার

আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি, ভূতপূর্ব পরেশ-পরিচালক ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত বৈজনাথ বিলাস মহাশয়ের সৌজসে অনেকগুলি বিলাসী ছবির ব্লক পাইয়াছি।

উত্তরা



স্বর-তীর্থে } স্বর-হাফিয়া
মিঞা তাহসেন
সমষ্টি আকবর



সপ্তম বর্ষ

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯

ষষ্ঠ সংখ্যা

পরিবর্তন বা পরিবর্জন

মহামহোপাধ্যায় শ্রী প্রমথনাথ তর্কভূষণ

মহাত্মা গান্ধির ছয় দিনের প্রাণোপবেশন হিন্দুসমাজে যে ভাব-প্রবণতাকে জাগাইয়াছে, তাহা আচাৰ্য্য শঙ্করের পরবর্তী কালে ভারতের দ্বিভিংশী হিন্দু-সমাজে আর কখনও যে দেখা দিয়াছে—ইতিহাসে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। হাজার হাজার বৎসর ব্যাপিয়া যে সংস্কার ও তদ্মূলক আচার কোটি কোটি হিন্দু নরনারী—বৃদ্ধ যুবা ও শিশু-নির্ধিশেষে হিন্দুধর্মের কেন্দ্ররূপে বদ্ধমূল হইয়া জমিয়া বসিয়াছিল, সেই সংস্কার ও আচারের দুর্গুণাশ্রবাপী হৃদয় বন্ধন হঠাৎ এত নিম্ন-এমন করিয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গুলিতে বিলীন হইবার উপক্রম করিয়াছে ইহা দেখিলে সকলকেই বিম্মিত হইতে হয়, অনেকের মনে করিতেছেন ইহা হিন্দুধর্মের বিশ্ববিস্ময়কর অভাবনীয় পরিবর্তন, আবার অনেকে ভাবিতেছেন ইহা হিন্দুধর্মের পরিবর্তন নহে কিন্তু ইহা হিন্দুধর্মের পরিবর্জন বা নিরর্থক ধ্বংস। হিন্দু-সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট বাহ্যিক অন্তরিকারী বলিয়া চিরপরিচিত, উচ্চশ্রেণীর হিন্দু-মাজেরই অন্তরিক বিবাস, বাহাদিগকে ছুইলে অবগাহন যান ব্যতিরেকে শুদ্ধি হয় না—মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাহ্যিক

দেবতা প্রতিমার দর্শন করিলে প্রতিমাতে দেবতার সান্নিধ্য লুপ্ত হয়, বাহ্যের ব্যবহৃত কুপের জল পান করিলে উচ্চ-জাতির সমস্ত শরীর অপবিত্র হইয়া পড়ে, প্রায়শ্চিত্ত না করিলে সেই অপবিত্রতা দূর হয় না, কুকুর বা বিড়াল অপেক্ষা বাহ্যিক ঘৃণ্য, অশুভ ও উৎপত্তি, সেই ডোম, চামার, হাড়ী, বাগ্‌দী প্রভৃতি তথা কথিত নীচজাতির সহিত একসঙ্গে দেবমন্দিরে প্রবেশপূর্বক দেবপ্রতিমার দর্শন করিবার জন্য আজ হাজার হাজার উচ্চবর্ণের হিন্দু নরনারী বিনা লঙ্ঘ্যে শত শত দেবমন্দিরের চিরনিরঙ্ক ঘর সাগরে গুলিয়া দিতেছে। কুপে পুষ্করিণীতে একসঙ্গে জলাহরণের সকল বাধা ভাঙ্গিয়া দিতেছে, একসঙ্গে একপংক্তিতে আত্মীয়-জ্ঞাতী কুটুম্বের দ্বার তাহার সহিত বসিয়া, তাহারই পরি-বেশিত অন্ন বাজানবি তর্ফণ করিতে কোনপ্রকার দ্বিধার ভাব প্রকাশ করিতেছে না। কোন দেবতার ইচ্ছিতে কোন মহাপুরুষের প্রেরণায় আজ হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র ভারতে এই বিরাট পরিবর্তন বা পরিবর্জন-লীলা যে তাণ্ডব নৃত্যের অভিনয় আরম্ভ করিয়াছে, তাহা ভাবিলেও

শরীর শিথরিয়া উত্তিরে—শিথরিয়া শিথরিয়া শৌভিত্ত্যে—
গতি মধ্যে মধ্যে কল্প হইয়া বাইতেছে। আর মধ্যে মধ্যে
অভীত ও ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিখানী হিন্দু
কিংকর্তব্যবিমূঢ় প্রায় হইতেছে।

মহাভা পান্ডির অসামান্য ভাগ্য, সত্যনিষ্ঠা, সংযম,
সুহৃৎতা, ষাটশতিকা ও স্বভাবতঃইতৎবর্ণা প্রভৃতি যোগ্যতার
গুণনিচয় সম্বলিত হইয়া হিন্দুসমাজে যে আকর্ষক ও
অভাবনীয় অবস্থাস্বর সৃষ্টি করিয়াছে তাহা এ ভারতে, শুধু
এ ভারতে কেন—সমগ্র পৃথিবীতে সকল সভ্যজাতির চিন্তা-
শীল মনোবীরকেই আজ নিসঙ্কোচে অস্বীকার করিতেছেন যে
ইহা আজ অপ্রত্যাখ্যেয় আজমান্য সত্য ইহা আমরা সকলেই
জানি কিন্তু গুণার হিন্দুসমাজের এই অদ্বতপূর্ণ পরিবর্তন,
প্রবর্তন, হিন্দু ভাতৃর জীবনের চিরকালোক্ত সমুদ্রতীর
পৃথক প্রশস্ত করিতেছে অথবা চিরকটুকাবৃত করিয়া
নিরুদ্ধ করিবার উগ্রকন্ড করিতেছে, ইহা লইয়া হিন্দুসমাজের
উদ্বাসিতিক ও স্থিতিশীল এই দুইটি বিরূপ সম্প্রদায়ের
মধ্যে যে দ্রুপদীরহস্যর মতভেদের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা
বোধ হয় কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে অস্বীকার করিতে পারেন
না। সাময়িক বিরূপ উত্তেজনার প্রবল ঝটিকার—বিরূপ
দ্রুপদীরহস্যর উদ্দেশ্যে এই মতভেদ এক্ষণে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-
প্রকাশ করিতে সমর্থ না হইলেও ক্রমে যে ইহা আত্ম-
প্রকাশ দ্বারা উদারনৈতিক ও স্থিতিশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে
অসম্বন্ধ বিচ্ছেদ ও কলহের উৎপাদন করিবে এবং তাহার
ফলে এই উত্তর সম্প্রদায়ের অস্বীকৃত সমগ্র হিন্দু-ভারতের
সংযুক্তি যে প্রতিহত হইয়া পড়িবে, তাহা ঐক্য সত্য,
এই আসন্ন দুরন্ত বিপদাপাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে না-
পারিলে এখনই শতধা বিচ্ছিন্ন ভারতীয় হিন্দুজাতি যে
আজও সহস্রধা বিচ্ছিন্ন হইয়া, আরও শোচনীয় ভাবে দ্রুপদ
হইয়া পড়িবে তাহা স্থির, এরূপ সমুদ্রতীর অবস্থার আনন্দের
এই ভীষণ সমস্তা সমাধানের জন্য কোন পন্থাকে অব্যর্থন
করিতে হইবে, তাহা আজ প্রত্যেক হিন্দুর পক্ষে ভাবিবার
বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে/তাহা কে অস্বীকার করিবে?—

যেই পন্থাকে অবিকৃত করিয়া সর্গদ্বারগণের অস্বী-

করণীয় করিয়া তুলিতে হইলে গুরুত্ব হিন্দু কৌন্ সত্যের
উপর প্রাবল্লিত, শাস্ত্র-সমুদ্রমন্ধান করিয়া—সর্বগোত্র তাহা
সর্গদ্বারগণের সমুখে স্থাপিত করিতে হইবে, হিন্দুসমাজ
পরিবর্তনশীল কিনা—পরিবর্তনশীল হইলে কিরূপ পরিবর্তনে
তাহার বাস্তব ক্ষতি হয় না—তাহাও অসম্পূর্ণতা বিচারের
ভায়া নির্দিষ্ট করিয়া সর্গদ্বারগণের গোচর করিতে হইবে,
প্রাচীনপন্থী ও নব্যপন্থীদের নেতৃবর্গের পরস্পর সম্মিলন
ব্যতিরেকে এই গুরুতর কার্য সাধিত হইতে পারে না ইহা
সকলেরই মনে রাখিতে হইবে।

বৌদ্ধধর্মের আত্মিক প্রসারের সময় যদি হিন্দুধর্মের এই
ভারতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছিল, তবে এখনও
আবার তাহা হইবে না কেন এই প্রশ্ন বিখানী হিন্দুসমাজেই
অস্বাক্ষরিত হইতে উদ্ভিত হইয়া থাকে—এই প্রশ্নের সম্বন্ধ
কি তাহারও বিচার করিতে হইবে, এইরূপ নানাপ্রকার
জটিল প্রশ্নের সমাধান ব্যতিরেকে এই যৌর ভূমি, দুরন্ত
জাতীয় সমগ্রায় হিন্দুজাতির কি কর্তব্য তাহার নির্ণয় হইতে
পারে না অথচ এই পথে অগ্রসর হইবার কোন আন্তরিক
প্রচেষ্টা কি প্রাচীনপন্থী বা নব্যপন্থী কাহারও মধ্যে দেখিতে
পাওয়া বাইতেছে না,—কেহই নিজ নিজ নির্মল ছাড়িতে
প্রস্তুত নহেন, এক্ষণে নীমায়া হওয়া সম্ভবপর মনে অথচ
এই নীমায়াসর উপর হিন্দু-জাতীয়-জীবনের অস্তিত্ব যে
ঐকান্তিক ভাবে নির্ভর করিতেছে তাহা কেহই অস্বীকার
করিতে পারেন না। আবার মনে হয়, এই জটিল
সমস্তা হইতে নিরতি লাভ করিতে হইলে অগ্রে নব্য-
পন্থীকে কি চাহেন তাহার বিস্তৃতাভাবে আলোচনা করিতে
হইবে, তাহার পর প্রাচীনপন্থী কি চাহেন তাহারও
আলোচনা বিস্তৃতাভাবে করিতে হইবে, তাহার পর উত্তর
মতের কোন কোন আশ্রয়ে সামঞ্জস্য সম্ভবপর এবং কোন
কোন অশ্রয়ে তাহা সম্ভবপর নহে তাহাও স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট
করিতে হইবে, তাহার পর উত্তর পন্থের বিস্তৃতা প্রতিবি-
বর্তের সম্মিলনের আয়োজন করিতে হইবে। আগামীবারে
তাই আমি নব্যপন্থীগণ কি চাহেন অগ্রেই তাহার আলোচনা
করিব।

কর্মণঃ

দোলা

তৃতীয় বও

শ্রীদিলীপকুমার রায়

প্রত্যাবর্তন!...

বেলা বাগেটা। সমস্ত আকাশ নীল হাসিতে উল্ছে
পড়ছে। মিসিয়ে বেনারের বাগানটা জানুয়ার কাঁক দিয়ে
উকি দিচ্ছে। একটা চির সবুজ গাছের পাতার পাতার
ধ্বংসকরণের দীর্ঘ ক্রীটী খলমল করছে। তার সামনের
রাগানী ধরণের গোল চাঁদোয়ার বাঁকে বাঁকে তুষার-কণার
ঝিকঝিক। মিসিয়ে বেনারের ভূমি ক্রমে একটা অস্টোমানে
আগুন প্রতীকমান স্বপনের মনে পড়ে যায় শৈলির—The
emerald green of leaf enchanted beams...
হঠাৎ পদশব্দ—সে ঘোরা থেকে উঠে দাঁড়ায়।

আনা ও মিসিয়ে বেনার ঘরে ঢোকে। স্বপনের বুকুর
মধ্যে কেন্দ্র করে ওঠে—আনা এত যোগা হয়ে গেছে!
...অত্যাগ যেন নিঙড়ে পড়ে তার মনের কোণে!... কিন্তু
তু আবার চোখে একটা নতুন-দৃঢ়তার আলো যেন!...
যেন এ কয় সমুদ্রে যে জীবনকে তার স্বরূপে ডিনে নিয়েছে।
যেন—আনা হাত বাড়িয়ে দেয়। স্বপন অসঙ্কোচে সে
হাটটি চুষন করে।

বুদ্ধ হেসে বলেন: “হঠাৎ? এক ময়স্থার চিত্রিগর
দেই। এমন বেসামান্য উখাও হ'লে কার ভয়ে হে?”
স্বপনের ও আনার চোখোচোখি হয়। স্বপন উত্তর
দেবার কথা বুঁজে পায় না। আনা বলে: “নতুন বন্ধ-
বান্ধী পেলে পুরনোদের ভুলে যাওয়া এই-ই তো আধুনিক!”
চল মিসিয়ে—ভুলে গেছেন কেন?”
—স্বপন কঠে হাসি হাসে...

ভাগ্যক্রমে নাকের ঢোকে: “খাবার দেওয়া হ'য়েছে
মিসিয়ে।”

তিনজনে ভোজনাপারের দিকে চলে।

অভিভাবক!...

মিসিয়ে বেনার আনার পেটে এক গুচ্ছ আঁড়র জোর
ক'রেই তুলে দিয়ে বলেন: “আহা—হা, সব চোঁ দোবাই

অমনতরো অরুণোদ-বিগোনি 'না' বলা কেন বলা তো?
একটু aphrodisiac না হ'লে তরলীর চলে?—বিশেষ
মনে রেখো এ আঁড়র সেন এনেছে তোমারই জন্য শুধু—
নীল থেকে। শোভিত দাঁড়ের জগদ্বিখ্যাত আঁড়র—
তোমার গালেসে সবে পান্না দেয় শেরি—তা এ-তুলনার ভূমি
রাগাই কর আর বাই-কর!”

আনার পাভুর গাল দুটিতে ঈর্ষ্য রক্তভা দেখা দিয়েই
মিলিয়ে গেল। সে হেসে বলল: “কিন্তু রাগ করি বা না
করি সমান রাজা জিনিষকে যে এভাবে উদরস্থ করতে হবে
তার কি মানে? তাছাড়া একটা কথা ভুলবেন না। আপনি
যে-ভাবে পানাহারী হ'তে বলেন তা শুনে আনা গ্রহিনও
Aphrodite থাকবে না নিশ্চয় জানবেন।”

—“থাকবে না তো কি হবে তুমি?”
—“Bacchante, এবং তাই-লে তার পক্ষে আর যে-
পেশাই সম্ভব হোক না কেন—মডেলগিরি যে সম্ভব হবে না
এটা ঐক্য।”

স্বপন বলল: “কিন্তু আঁড়র-এ-স্বরূপে রাতারাতি
যে-রকম ভয়াবহ বেলুনাভী-রূপ পরিণতির আশঙ্কা
কেন আনা? আঁড়র!”

আনা ছুটী কালো আঁড়র চেখে বলল: “সঠিক ভাষি
হুন্দর!” ব'লেই মিসিয়ে বেনারের পানে চোখ ফিরিয়ে
বলল: “আনার শিখটি আপনার কাছ থেকে দূরে গিয়ে
কিন্তু একটা নতুন রঙ্গ হিতা শিখে এসেছেন মিসিয়ে—
—জন্মার। উন্নতি হয়েছে বই কি।”

বুদ্ধ চোখ মিট মিট করে বলেন: “গুরুগিরির গুহ-
তত্ত্বই যে ঐ শেরি। মাগে মাগে ওঠাতে হয়। পরে এ-রূপের
রঙনিতর পরিণতিরও হসিক হবে ও, ভেবে। না—আরও কত
রস! কি বলে?”

—“মানে?”
—“সে কি একটা রস যে কিম্বদন্তি দেব মুখে
মুখে? থরো নী কেন অভিভাবকই রস।—তবে ওর

সে-মুন্টির হৃদয় এখানে গুরুগুহে ধোলতাই হবে না—সে যথাস্থানে।”

আনা উৎসুক জিজ্ঞাসা দৃষ্টিতে বুকের চোখের দিকে চেয়েই ঘিরে স্বপনের দিকে তাকালো। স্বপন একটু আশ্চর্য হইল। আনাকে কি বুঝ একটু আভাসও যেন নি আসে সে হঠাৎ নীল থেকে পারিষে এসেছে? এত সাবধানতার অর্থ কী? তার হঠাৎ কী খেয়াল চাপল, বলল: “বাবা, তোমার যে আমি নীলে বায়ু-পরিবর্তনে নিয়ে যাব—জানো না?”

আনার চোখ ছুট মুহূর্তের ভ্রম উজ্জ্বল হ’য়ে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই রানিানা সেখানে অধিকার করল, সে বলল: “ঠাট্টা?”

স্বপন কেমন একটা বোঁচা খেল। সে কত দূরে ম’রে গেছে এই মাস সেতেকে?……নাইলে? এ-প্রস্তাব আনা ঠাট্টা ভেবে বসে? সে উত্তরে গম্ভীরভাবে ভরসা দেবার আগেই ম’সিয়ে বেনার বললেন: “ঠাট্টা মোটেই নয় শেরি। আছে সে এক পরম রমণীর গভীর রহস্য। কিন্তু তার অন্বেষণে তুমতে হ’লে আগে ঐ টাট্টুই শেষ করতে হবে—এটা মনে করিয়ে দিচ্ছি। এটা তুমি ছুঁতেই ভুলে গেছ—এমন ভোলা মেরে!”

আনা টাট্টা একটুকরো নিয়ে বলল: “কিন্তু নীলে তো আপনিই আমার সঙ্গে যাবেন কথা ছিল?”

—“আরে, তখন কি সেন এসেছিল?”

আনা কৌতূহলী দৃষ্টিতে স্বপনের দিকে তাকালো। তার পাণ্ডুর গাল ডাটতে এবার একটু স্বাভাৱি গোলাপী রং ধল। সে স্বপনের চোখের প’রে তার ভাগর দৃষ্টি নিবন্ধ ক’রে বলল: “বাপার কি স্বপন?”

স্বপন বুকের দিকে তাকিয়ে শুধু একটু হাসল নীরবে। আনার স্নেহত স্বপের পিছনে একটা চাপা পন্দন। তার বুকের মধ্যে এক খিঁচ স্ফুটোস্তাপ জ্বলে উঠল আনি।

আনা আপনকার দিয়ে বলল: “কথ’খনো আমি যাবো না আর—যদি এরকম কাঁপা রহস্য-কাহ্নবের দিকে আনাকে তাকিয়ে থাকতে বলেন। বাড়ি বাপা- হ’য়ে যাব—মনও ভরে না। জিজ্ঞাসা করছি—উত্তর নেই।”

বুঝ সস্তর স্বপের ব’লে উঠলেন: “আহা হা—চটো কেন শেরি? খাও খাও—এই দেখো—ও রোম্যান্টিকটাক কাঁকর পরে যদি বর্ষা করতে হয় তো যৌবনের asbestos-এর প’রেই করো না। আমাদের বুড়ো ছাড়াই ওপরে আছে শুধু চামড়া—সইবে কেন?” ব’লে পকেট থেকে ছুটি চিকিট বার ক’রে আনার হাতে দিয়ে বললেন: “পড়তে পারছ কি রাগিণী?”—ম’সিয়ে সেন, প্রথমশ্রেণী Coupe wagon-lit—আর কেউ নয় এ কক্ষে শুধু তোমরা দুজন। সে বন্দোবস্ত আমি ক’রেছি। প’ড়তে রাগ?”

আনার চোখ ছুটির মধ্যে থেকে আলো যেন ঠিকরে পড়ল। হামিখে বলল: “ভেতরে ভেতরে বৃষ্টি-দ্রব্ধনার তারযোগে এই সব বড়বড় আঁটা হচ্ছিল?”

বুঝ চোখ মিট মিট ক’রে বললেন: “শেরি, বুড়োদের তোমরা চিরদিনই হেনসাই ক’রো—জব্ববু ব’লে—জলময় রসের-পথে কাঁটার-বারিকড ব’লে। কিন্তু তারা যে অনেক সময়ে তরল-তরলীর স্বভাব পরিবার প’রে ম’কোরও কাজ করতে পারে—এখন থেকে মানাবে তো?”

আনা ম’সিয়ে বেনারের একটা হাত নিছের হাতের মধ্যে টেনে নিল। তার মুখ এমন নির্ময়। স্বপনের বুকের মধ্যে খুঁসি বেগে ওঠে।

—“বাবা, খাও?”

—“আর খাবো না। কিছুতে না।”

—“তবে কী করবে?”

—“কিছু না, শুধু আগনার হাতটির পন্দনের মধ্যে দিয়ে আগনার মনের পন্দনের নাগাল পেতে চেষ্টা করব। টেলিপ্যাথি।”

বুঝ তার অপর ছাড়া হাতটি দিয়ে আনার গালে ছুটি টোকা মেরে বললেন: “মজুরি পোষাবে না শেরি। মনটা নবীন হ’লে হবে কি বোলা, কেহটা যে হ’য়ে গেছে জবীণ। তার চেয়ে অন্ধ বসে না একবার বেয়ে ছেয়ে।”

আনা স্বপনের দিকে চেয়ে হেসে বলল: “কী স্বপন রাগি আছো?—যাকো তো দাও তোমারই হাত।” ম’সিয়ে বেনার উপ ক’রে বললেন: “কিন্তু সে-রিকোও আবার এক নতুন মজিল আছে শেরি। বুড়োদের মনের

পন্দন টেলিপ্যাথিতে জানতে চাইলে তত বিপদ নেই—কেননা সে-মনের পন্দন রেখে তজ্জমা হয় না। গল্প এলায়িত রাত ভরসা পায় না কষ্টবিসপী হ’তে—কিন্তু তরুণদের? না, আনা জানেই নেই। তার চেয়ে স্বপনকে তোমার রহস্যতা কানিয়ে ফালা দাও এবার। মনে পন্দনের গোপাল হবে খনি পরে, নিরালায়—রাগে ম’রে। আর যখন টেলিপ্যাথির দরকারও হবে না। তার চেয়ে পন্দমান র অস্তর-অস্তরপুনের গোপন অনেক কুই’রির তত্ত্ব উদ্ঘাটন করে দেখ।”

স্বপন বলল: “কিন্তু রতজ্ঞতার ফাসাদই বা এখন কেন?”

—“বাবা—তুমি ওর জন্তে নীল থেকে ছুট এসে তরলী ঘরলতা রোমান্টিকার সব ছেড়ে। আবার আজই গল্পে পাড়ি দিচ্ছ। এতখানি স্বার্থভাগের জন্তেও যদি ও রহস্যতা প্রকাশ না করে—তবে করবে কিসে শুনি?”

আনা বলল: “কিন্তু এতখানি স্বার্থভাগের পরিবর্তে দুটা কথাই কি চিড়ে ভিজবে?”

—“কিন্তু শুধু খাবার এলাকার বাইরে তোমার ও বরদাহী টেট দুখানি এভাবে না এই-ই বা তুমি ম’রে নিতে গেলে যেন—আর নিলেই বা সেন যেনে নিতে গেল কেন—শুনি?”

আনা খুব একচোট হাসল: স্বপন বির্ণর্প বোধ করে বস।।……

হাসি ধামলে আনা বলল: “যদি বলি এরকম স্থলে একজন এগুলো আর একজন পেছনে ছ হ ক’রে?”

স্বপন জোর ক’রে হেসে বলল: “বাবা, পেছনই মানে?”

—“বলে দেব তাহলে?”

ম’সিয়ে বেনার বললেন: “তাহলে আধ্যাত্মিক ভারতীয়রা শু’ ফুলই নয় সেন? ফ’লে বেবার মতন নিবিছ ফলও ফলে রাতে?”

আনা বলল: “এবার কিন্তু ভুল সন্দেহ করলেন ম’সিয়ে। এনি অনেক ফল আছে যারা বর্ণচোরা—প্রায় ফুলেরই কটাগ পড়ে—নিম্নস্বর।”

স্বপন বলল: “মানে?”

আনা ম’সিয়ে বেনারের দিকে চেয়েই ঈষৎ স্বর করে

বলল: “এক বে ছিল বড় ফুল। সে একদা তার কোনো এক বান্দবী-মুগুকীকে নিমন্ত্রণ করল তার ভোজনাগারগাহাঘা বিতরণ করতে। বান্দবী অনিরাধ্য কারণ আসতে পারলেন না। তাতে বৃদ্ধর বৃদ্ধর ফুলে ফলল অভিমান-ফল যা ফলে বটে রাতারাতি কিন্তু এর বীজে কি ফসল ফলে বলতে চান?”

স্বপন আশ্চর্য আশ্চর্য ক’রে বলল: “অভিমান নয়—আমি—”

ম’সিয়ে বেনার বাধা দিয়ে বললেন: “তাহলে তো আমার ভাির জ্ঞান্য হ’য়ে গেছে সেন, তোমাকে ডেকে এনে। তোমাদের মান-অভিমানের পালায় তৃতীয় ব্যক্তির এরকম ভাবে।”

স্বপন বলল: “শোনেন কেন ম’সিয়ে? আমার শরীরটা একটু খারাপ হয়েছিল ব’লেই—”

—“শরীর খারাপ হ’লে কি কেউ এ ভাবে গা-ঢাকা দেয় হে? তোমার ত্রিকানাটা। পর্যাপ্ত জানলে না। না একটা চিঠি—না একটা খবর-সেওয়া কোনো হয়ে। তোমার পরামর্শিকাকে জিজ্ঞাসা ক’রে ত্রুতির পাতিয়ে তবে ত্রিকানা বার করতে হয়?”

—“অপ্রতিভ হোয়োনা সেন। ঠাট্টা রেখে একটু গম্ভীরভাবে কথা বলি এবার। বাস্তবিক, জোর ক’রে তার তোমার খাড়ে চাপানো খুবই জ্ঞান্য হবে—”

—“আগনি ক্ষেপেছেন ম’সিয়ে—”

—“আহা—হা—আমার কথাটা আগে শেষ করতেই দাও এটা। শোনো—তুমি যে ইচ্ছে ক’রেই এভাবে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে চেয়েছিলে সেটা আমার গণনার মধ্যে আসেনি ঠিক। কিন্তু বা হ’য়ে গেছে তার তো আর চারা নেই। এখন আমার বক্তব্য—যদি তুমি এ-ভার গুরুভার মনে করো—

—বা নিজেকে বিপন্ন—

—“আমার ভার নিয়ে আমি নিজেকে বিপন্ন বোধ করব— গুরুভার—একখাটা এভাবে বলছেন কী ব’লে?”

আনা একটু হেসে বলল: “তুমি এমন ক’রে পালালে ব’লে।”

স্বপন এবার ঈষৎ উচ্চ স্বরে বলল: “ও সব জেরা ছেড়ে

বসি আমাকে একটু সরলভাবে জিজ্ঞাসা করতেন আনা, কেন আমি হঠাৎ পারিস হেডেছিলাম—তাহ'লে কি আমার 'পরে একটু বেশি স্থিতির হ'ত না? আর আমিও জিজ্ঞাসা করি একটা কথা। এভাবে বার বার বৌটা দেওয়ার অর্থই বা কী? তোমরা আমার নীচে বাগ্‌য়ার মধ্যে এমন-কোনো গুপ্ততার অপরাধ দেখেছ কি—যে-অপরাধ তোমার জন্তে ফিরে আসারও স্থান হয় না?"

আনা ও ম'সির বোঝার চোখে চোখে নিশ্চল চকিতের জন্তে। আনা হুব বসলে নিয়ে বলল: "আমাকে মাফ করো! স্বপন! তুমি আমার জন্তে এত কষ্ট করে প্রব্রু নীচ থেকে এককথার এসে পড়লে, একমু কৌণার তোমাকে ছদ্মবাদ দেব—না! আরদেরে শিশুর মতন ঠোট ফোলাছি।—বেন তোমার সময়, ইচ্ছা ও বন্ধনের 'পরে আমার দাবী অবিস্মারিত!"

ম'সির বেনার আনার কাঁধে একটা হাত রেখে সিদ্ধ হুরে বললেন: "দাবী তো তুমি করো নি আনা!"

আনা ঈষৎ দ্বারা হুরে বলল: "করেছি বই কি। নইলে ওর এমন কথা মনেই বা হবে কেন যে ওর নীচ-খাণ্ডাটাকে আমি অপরাধ ব'লে গণ্য করেছি? কী অবিকার আছে আমার এমন কথা ভাববার চনি?"

স্বপন লজ্জিত হুরে বলল: "অবিকার, দাবী এসব বড় বড় কথা উড়ে এসে জুড়ে বসল কোথেকে আনা? বন্ধুর 'পরে বন্ধুর দাবী কি জাহির করে তবে সাবু করতে হয়?"

ম'সির বেনার মুগি হ'য়ে বসলেন: "বেশ বলেছ সেন। সাবাস! বন্ধুর 'পরে কোন দাবীই যদি না রইল তবে এক-বন্ধু বলাই বা কেন? নাম দাও ঐশ্বরী কিছ—বা প্রতিদান-বিন্ধু উদ্ভট প্রাচীনিক—কী বলো সেন? দাবীর পরেই সংসার চলছে। কেবল এইটুকুর প্রাতি সমাগ থাকা—যে তোমার 'পরে ওর বন্ধুরে সত্য দাবী জন্মতে পারে তখনই এখন তুমি ওর দাবী বাক্য করে আনল পাও, অর্থাৎ ও তাকে দাবী ক'রে পতি পায় না!"

আনা হেসে-বলল: "তাহ'লে আমারই জয়। কেন না আমার এ-দাবী স্বীকার করে ও আনন্দ পাবে না পাবে এক

জাহির করার দক্ষণ আমি বিবম অস্বস্তি বোধ করছি—যদিও মজা এই তাই ব'লে দাবী করতেও পেছাপাও হচ্ছিল মোটেই!"

স্বপন বলল: "না, জয় আমারও। কেন না আনার এ দাবী স্বীকার করে আমি শুধু আনন্দ না—দ্বিবিজয়-গৌরব বোধ করছি বললেও বেশি বলা হবে না। উভয়েই অপরাধিত!"

ম'সির বেনার হাত তালি দিয়ে বসলেন: "জানো! আর ছলনাই ছলনকে এখন হারিয়ে দেয় তখনই বন্ধুরে পালা-গান জমে ওঠে!"

কাছের একটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে ছুটা বাজল। আনা বলল: "হুহো আমার ওভারকোটটা—"

ম'সির বেনার বললেন: "বটে বটে। সেন—সজাট গুকে নিয়ে একবার লুজে ক'য়েকটা জিনিষপত্র কেনা আর কি। একটা ওভারকোট ও ফর্দাস দিয়েছে।"

আনা বলল: "না না। ও বেচারী এখন একটু জিরো! আমি একাই পারব!"

স্বপন বলল: "সে কী হয়? তুমি যে জর্রল এখনো!"

ম'সির বেনার তার পিঠ টাপড়ে বললেন: "সাবাস! সাবসের। তুমিই পারবে চিত্র। অভিব্যবহের টেন একেবারে হুবহু হুটে উঠেছে এখনই, হাতেগড়ির দিনেই বিভ্রাট!"

তিনজনেই হেসে ওঠে।...

ট্যাক্সিডে!...

—“জনেকদিন পরে—মনে পড়ে স্বপন? সেদিন আর এদিন?” আনার হাতটা মোটরের কাঁছনিত স্বপনের কোলের ওপর এসে পড়ে।

স্বপন নিজের সূঁঠের মধ্যে তাকে টেনে নিয়ে “পড়ে” ব'লেই হেসে বলল: “কেবল একটু তফাৎ আছে এ দুদিনের।”—“কী?”

—“সেদিন ট্যাক্সিডে করে তোমাকে তোমার বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলাম ভয়ে ভয়ে আর আনি নিয়ে বাড়ি তোমার অভিব্যবহ হ'য়ে—এই!”

—“ঈ—ম!”

—“না তো কী?”

—“অভিব্যব ছিলে মাত্র তুমি একজনের, মানে

দেশীরাগের মধ্যে। এবং সে আমি নই!”

স্বপন ফের লজ্জা পেল—শত চেষ্টা সত্ত্বেও। কিন্তু সে-লজ্জা গোপন ক'রে চটুল হয়ে বলল: “জান্?” আনা তার হাসির ঢল বইয়ে দিয়ে বলল: “বুকে হাত দিয়ে বলতো? ধর নি সে তোমাকে আঁকড়ে লতার মতন—বেগুদুমান ব্রততীর মতন?”

—“বেতার ঈশ্বরদোতো থবর এসে পৌঁছেছে—না?”

—“ম'শের, আমরা কিছু কিছু বৃষ্টি গো বৃষ্টি। নইলে—”

—“নইলে কী?”

—“না, থাক!”

—“না, বলো। নইলে—?”

—“একটা চিঠিও অস্বস্ত: লিখতে। একেবারে নিয়ামিনি নীচকে নিয়ে কেউ ভূতপুংগ বাছবীকে এরকম

বেদামুদ ভুলতে পারে না। একুই বলি আমি সত্যিকার সরস অভিব্যবহতা—রক্ষাব্যবহণ!”

স্বপন ঈষৎ লজ্জিত হুরে বলল: “দূর। মোটেই তা নয়!”

—“ছি বন্ধু, ‘অত জায়ে মোটেই কথাটা বলা ঠিক না।

জত যে উল্টো উৎপত্তি হয়। বরং যদি খানিকটা কবল করেও চেপে যেতে”—ব'লেই সে থেমে গেল। স্বপন কথা কইল না। গ্রন্থ টাঙ্গির হৃদিকের জানলা দিয়ে গ্রথারে চেয়ে রইল খানিক।

—“ধূ! ধুলকী সে, ন?”—আনা হঠাৎ ব'লে বসে।

—“অত হৃদকী আমি জীবনে কখনো দেখি নি।” ব'লেই সে এত অস্বস্ত বোধ করে!...

আনা একটু চুপ ক'রে রাত্তার দিকে চেয়ে রইল।

কেস, পরে হঠাৎ ফিরে বলল: “প্রথমার চেয়েও?”

স্বপন চুপ করে থাকে।

—“বলো না!”

—এধরণের কথাবার্তা আমার কেমন কেমন লাগে

আনা।

আনা এ-ভং'গনা গায়ে মাথার পাঞ্জী নয়,—সহজ হুরে

বলল: “আজ্ঞা মান্লাম। কিন্তু একটা কথার উত্তর দেবে? সত্যি উত্তর কিছ?”

—“কী?”

—“একটা চিঠিও লিখলে না কেন?”

—“আনা, এককথার উত্তর দিতে হ'লে—”

—“আজ্ঞা, তবে কাজ নেই। কিন্তু আর একটা প্রশ্নের?”

স্বপন হেসে বলল: “তোমাদের জাতের সব ভালো, শেতল এই এক বিষয় দেখ তোমাদের প্রাণ-টাইটানিক শব্দ ভিন্নস্বারেও টপ্পাডো হয় না—নাহতে নাহতে চলে—যতই কেন না ডুব ডুব হোক!”

—“এড়িয়ে গেলে শুদ্ধি না।—আজ্ঞা একটা প্রশ্নের তো উত্তর দাও। দিতে বাধ্য তুমি।—তাকে আমার কথা ব'লেছিলে?”

—“একটা চিঠিও অস্বস্ত: লিখতে। একেবারে

নিয়ামিনি নীচকে নিয়ে কেউ ভূতপুংগ বাছবীকে এরকম

বেদামুদ ভুলতে পারে না। একুই বলি আমি সত্যিকার সরস

অভিব্যবহতা—রক্ষাব্যবহণ!”

স্বপন ঈষৎ লজ্জিত হুরে বলল: “দূর। মোটেই তা নয়!”

—“ছি বন্ধু, ‘অত জায়ে মোটেই কথাটা বলা ঠিক না।

জত যে উল্টো উৎপত্তি হয়। বরং যদি খানিকটা কবল করেও চেপে যেতে”—ব'লেই সে থেমে গেল। স্বপন কথা কইল না।

গ্রন্থ টাঙ্গির হৃদিকের জানলা দিয়ে গ্রথারে চেয়ে রইল খানিক।

—“ধূ! ধুলকী সে, ন?”—আনা হঠাৎ ব'লে বসে।

—“অত হৃদকী আমি জীবনে কখনো দেখি নি।” ব'লেই সে এত অস্বস্ত বোধ করে!...
আনা একটু চুপ ক'রে রাত্তার দিকে চেয়ে রইল।
কেস, পরে হঠাৎ ফিরে বলল: “প্রথমার চেয়েও?”
স্বপন চুপ করে থাকে।
—“বলো না!”
—এধরণের কথাবার্তা আমার কেমন কেমন লাগে
আনা।
আনা এ-ভং'গনা গায়ে মাথার পাঞ্জী নয়,—সহজ হুরে

বলল: “আজ্ঞা মান্লাম। কিন্তু একটা কথার উত্তর দেবে? সত্যি উত্তর কিছ?”

—“কী?”

—“একটা চিঠিও লিখলে না কেন?”

—“আনা, এককথার উত্তর দিতে হ'লে—”

—“আজ্ঞা, তবে কাজ নেই। কিন্তু আর একটা প্রশ্নের?”

স্বপন হেসে বলল: “তোমাদের জাতের সব ভালো, শেতল এই এক বিষয় দেখ তোমাদের প্রাণ-টাইটানিক শব্দ ভিন্নস্বারেও টপ্পাডো হয় না—নাহতে নাহতে চলে—যতই কেন না ডুব ডুব হোক!”

—“এড়িয়ে গেলে শুদ্ধি না।—আজ্ঞা একটা প্রশ্নের তো উত্তর দাও। দিতে বাধ্য তুমি।—তাকে আমার কথা ব'লেছিলে?”

—“একটা চিঠিও অস্বস্ত: লিখতে। একেবারে

নিয়ামিনি নীচকে নিয়ে কেউ ভূতপুংগ বাছবীকে এরকম

বেদামুদ ভুলতে পারে না। একুই বলি আমি সত্যিকার

সরস অভিব্যবহতা—রক্ষাব্যবহণ!”

স্বপন ঈষৎ লজ্জিত হুরে বলল: “দূর। মোটেই তা নয়!”

—“ছি বন্ধু, ‘অত জায়ে মোটেই কথাটা বলা ঠিক না।

জত যে উল্টো উৎপত্তি হয়। বরং যদি খানিকটা কবল করেও চেপে যেতে”—ব'লেই সে থেমে গেল। স্বপন কথা কইল না।

গ্রন্থ টাঙ্গির হৃদিকের জানলা দিয়ে গ্রথারে চেয়ে রইল খানিক।

—“ধূ! ধুলকী সে, ন?”—আনা হঠাৎ ব'লে বসে।

—“অত হৃদকী আমি জীবনে কখনো দেখি নি।” ব'লেই সে এত অস্বস্ত বোধ করে!...

আনা একটু চুপ ক'রে রাত্তার দিকে চেয়ে রইল।

কেস, পরে হঠাৎ ফিরে বলল: “প্রথমার চেয়েও?”

স্বপন চুপ করে থাকে।

—“বলো না!”

—এধরণের কথাবার্তা আমার কেমন কেমন লাগে

আনা।

আনা এ-ভং'গনা গায়ে মাথার পাঞ্জী নয়,—সহজ হুরে

আনা বাধা দিয়ে বলেঃ “নিশ্চয় ওঠে।” মনে নেই এই মাত্র ম’সিয়ে বেনার দাবী সঞ্চকে কী বললেন?”

—“ফের উজ্জাদিনি চলে ক’থা? একথা কেন তুমি বিশ্বাস করবে না? তুমি যে তোমার কাছে আমার মনের দ্বার খুলে আমি আনন্দ পাই?”

আনার চোখ ছুটি উজ্জল হয়ে উঠলো। একটু চুপ করে থেকে বললঃ “তার” বলে।

শ্বপন বললঃ “ভা’লে চ্যাম্পিটাকে একটু ঘুরে যেতে বলি—নইলে মাথপথে যেতে রসকল হবে।”

—“বেশ।”

শ্বপন শোকারকে বলে দিল—Avenue de Champs Elysees মোকাত্তাবার গিরে Avenue de Neuilly ঘ’রে বরাবর গিরে সেন নীচে পড়ে তবে Louvre-এ ফিরতে। প্রায় অক্ষাণী বেশি নয়।

শোকার মহা গুণি—মোটো pourboire (বর্থিশ্ণ) মিলবে নিশ্চয়ই। গুব সোলাসে মাথা নেড়ে হঠাৎ মনে পড়ে ধারের “সবুজ জীন টেনে কামরাটিকে একটু রঙীন করে দ্বার্বক হেসে ছুটল—একবারও ঘাড় না ফিরিয়ে। পারিসের ট্যাক্সিওয়ালা তো।

শ্বপন প্রথম থাকেই বলল সব। কিছুই গোপন করল না—কেবল চোখের প্রতি তার প্রথম দিকের দ্বিধার অলুনিহু বাদ। চাচ চলে আসার দিন ইয়াবেলার তাকে ভাই বলা—তারপর নোকোর কীর্তি—সর্বশেষে চাচের জীবন-কাহিনী। ট্যাক্সির দুর্ঘটনিত আনার কোমল হাতের স্পর্শে তার মনের মধ্যে এক-বীক্যাক্রোচিত কেন্দ্রে যে এক কণ্ডির সৌভ বিবিড় হয়ে ওঠে তার এক নিভৃত আবেগভরঃ...থেকে থেকে আনা তার হাতের নরম চাপ তার হাতের পরে এত নরম করে দিচ্ছিল!...থেকে থেকে তার চোখের মধ্যে বাধা ঔৎসহ্য দরদর—সে কত প্রথম বাজনা।...থেকে থেকে ঈহং মায়—সাগর প্রম—সে কী গভীর অভিনিবেশ আনার!...খপন জানত সেই এক কালো-শ্রোতা—আজ দেখে ল মেরোগ বধন ঔৎসহ্য বোধ করে। কায়মনোবাক্যে-জনতে জানে। তার চেয়েও বেশি। হেসে। শোনে মন দিয়েই প্রদানতঃ...মেরোগ

শোনে—ঘরি শোনার তাগিদ বোধ করে অস্থ—কায়মনোবাক্যপ্রাণে।

শ্বপন বার বার এটা দেখেছে ইয়াবেলা, সন্ধ্যা, আন তিনজনাই ফেরে। শুধু তাই নয়। মেরোগের কাছে বধন সে জনগের দ্বার্বক গুলেছে এমন এক বিশেষ ধরণে তুলি পেয়েছে—যে সে...কী বলে তার বানী করবে? সে যে অনির্ধরীয়...মনে হ’লেছে পুরুষের দৌল, বাক্তি, দরদরতা। প্রভূতি বাক্তিদের কাছে বত উজ্জীবিত, প্রত্যক বন্ধুদের কাছে গুণি তার সিকির সিকির নয়। বন্ধু ও বাক্তি...ওদের সাড়াই আলাদা।—এসে অভাব অগের পূর্ণ করতে পারেই না। বিশেষ করে প্রাণের কথা-সঞ্চকে। মনের কথা বন্ধু ও টেনে বার করে জানে। কিন্তু প্রাণের—সে পারে এক বাক্তি। অস্ত্র কোনো তরল-তরলীর মধ্যে একটু খোঁসো-রঙীন সূর্য্য ক’মে পড়ে সেখানেই। এক চুপকে এক মোশা নইলে নয়—আছে স্বথ বলে, না শুনে। তারও বেশি-বানী যায়।—সেখানে বলেই বা কে? আর শোনেই বা কে? ইয়াবেলার নানা কথা নানা প্রশ্ন—নানা আত্মকথনে—আনার সাড় দেওয়া—এও এক বিচিত্র ব্যাপার যে। একটা মনে নানা মিড, নানা গমক, নানা তানি আলাপ আর একই মনের চারে কীরকম অস্থরপন তোলে—তা বেখে তা শুনে আত্মকব ক’রে কল্পনা করে তবেই না হার্মিনির আলা মেনে। স্তমসপাত। একটা স্তরের নানা বোল হয়ে মেলতির একক রেখা—আকাবাঁকা। একাকির মেলতি বাত-প্রতিভাতেও তবেই না কাউটারপাত—তবেই না হার্মিন। আজ এ ট্যাক্সিতে ইয়াবেলা ও সন্ধ্যাকে রি তার নানা কাহিনীর কাঁপনে আনার মনের যে কত বদল হুগে দোলা সে দেখল—অস্থরব ক’লে। তার জীবনে কোনোদিন ভুলবে সে? এক বিচিত্র অনাধ্যাত্ম পূর্ণ রস উপচিৎ হয়ে ওঠে যেন এ আত্মীয় বেইদারি মগে বেইদারি সাম্য। অস্থরদলে একই অস্থরবের কত রকমই হ’ল বদলায়, না? তার উজ্জিত ব’লে আনার আত্মকাহিনী শোনার মারকতা একরকম...আর আজ মোটের তার মার মনিজেনে কথা বলার রস আর একরকম...কী সুরভিত বিদ

তার বন্ধের মধ্যে ছলে ওঠে থেকে থেকে!...ভুলবার নয় এ। কত কী যে তাইে আবিহা-ভাবে!...এ-তো জীবন!...ইয়াবেলার সংস্পর্শে এসে অস্থরব্দের বেদনা? তাতে কি? সে-মস্তর বেদনা হুগে হ’লেছিল—সত্য। কিন্তু আজ? সে কি এতে করেই আনার কাছে কত বেশি চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠেনি? অভিজ্ঞতার অস্থরবের বৈচিত্র্যেই না দ্বন্দ্বদ্বারাণে তানালেশের সমৃদ্ধি! তাতেই না মানস-সঙ্গর আবেশ সস্তরের সৃষ্টি! বার বলে চাই শুধু সরলতা তার। কী জানে জীবনের গরিমা, উল্লাস, পুলকসিহরণ?—হু ছাই ঐশ্বর্য—চাই জটিলতা। একথা সে আনাকে সেদিন বলেছিল। আনা উত্তর দিয়েছিলঃ “ম’সিয়ে বেনারও এই কথাই বলেন। প্রায়ই বলেনঃ ‘গেটে মৃত্যুসংঘার বলেছিলেন—’Maecht doch den Fensterladen auf, damit mehr Licht hereinkomme.’”—জান্ণা গুলে দাও আরো আলো আহুক আরো আলো—! আহকের মাহু বলেঃ আরও জটিলতার আবর্ত রচনা কর—পাকের পরে পাক, তরুর পরে তর বাতে আমরা আরো চিনি নিজেদেরকে। শ্বপন এক কথার সাধ বেওয়া সঙ্কেও সরল সৌন্দর্যের স্বপকে একটু ওলাতি করেছিল। বলেছিল, ওর মধ্যেও ত সব আছে। তাতে আনা বলেছিলঃ “এ কথা মানি, কিন্তু রসেরও তো প্রকৃতি-বৈধম্য আছে। আমি একবার একটা গ্রামে গিয়ে একথা উপলব্ধি করেছিলাম যে মাহু গ্রাম্যও বটে নাগরিকও বটে—এবং গ্রাম্য সারসোয় মনিমা বুদ্ধিতে আগে চাই নাগরিক জটিলতার স্বাদ। তাছাড়া শুধু অস্থরব্দের অভিজ্ঞতা-বাক্তি সারনা? তাতে কি সারসোয়ই গুণ তবুই দা? যায় মনে কতো? ম’সিয়ে বেনারের বিচিত্র জীবনের ইতিহাস শুনে আমি একথা আরও গভীরভাবে অস্থরব ক’লেছি মানি, যে সারনা নয়—হার্মিন হাতেই জীবনের মগিহুতির চারি। নইলে মাহু জটিলতার দোহার স্বপের মতে লক্ষ হুগেও সইবে কেন বলা? সরল একটানা নির্ঘ জীবনেই যদি মাহুয়ের মুক্তি—তবে জটিলতার চারুতে একবার ব্যাভারহু হ’লে শেষ পর্যন্ত না গড়ির কেউ ধামতে চায় না কেন বস্তুতে পারো?”

শ্বপন একটু মান হেসে বলেছিলঃ “আর চাইলেই কি পারে।”

আনা বলেছিলঃ “হিঁদ। চাও তোমাকে সেদিন মিথ্যা বলে নি যে আমার খাদীন শুধু দেখতে। আসলে আমার পেপেথোর লক্ষ শক্তির খেগার পুতল। নইলে পরী প্রামাশ নিমেয়ে ছারবার হয় কেন বলা জীবন-পথের প্রতি বাক? ইহুপুদীর প্রতিষ্ঠা ভূমিকপের ওপরেই কেন হয় নিত্য নিয়ত?”

বিশস্ত্রাণ

রিচার্ড কুপেতে আনার ও স্বপনের ‘সুপে-দি’ টেনে প্রশস্ত করে দিয়ে টেনের বালিশ ও বিছানো বিছিয়ে দিয়ে হরানী গার্ড মধুর হেসে যে রকম অর্থপূর্ণভাবে স্বপনের দিকে তাকালো তার বাজনা আর ঘাই হোক না কেন দ্বার্বক বে নয় এ নিশ্চয়। শ্বপন ঝুট করে তাকে একেবারে কুড়ি ঝুট বর্থিশি দিয়ে ফেলল। তার মনটা যে প্রাত-কর্ণর তীর নিধায়েই বাঁধা ছিল আজকে।

গার্ড একপাল হেসে বললঃ “হুদি কাল ভোরে কি আজ রাতেই দরকার হয় ম’সিয়ে, তবে এই ঘণ্টাটি শুধু একবার বাজলেই হবে। বত রাতে কিবা বত ভোরেই হোক না কেন—সব আমি ‘সুপে-ব’তেই দিয়ে যাব। মাগমের রেস্তরা গাড়ীতে কষ্ট করে যেতে হবে না।”

শ্বপন ঈহং হেসে দ্বরদার দিয়ে তাকে বিদায় দিল। রুণচাঁদ—

আনা বললঃ “ভারি দস্তায় করলো।”

—“কী করে?”

—“অত বেশি বর্থিশি দিয়ে। তোমাদের মত ধনী বিদেশীরাই পারিসের পথে বাটের সব কর্মচারীদের নিত করে। বিশেষ করে আমেরিকানদের দাক্ষিণ্যের ফলে এমনই হয়েছিল যে ওরা বর্থিশি না পেলে এক পা এগুতে চায় না। অথচ বদাম হুগে শেপটার ফাসের একাধার।”

—“উঃ। তোমার এ-সোশ্যগ্রাণী মুক্তি তো কই আগে কোনোদিন হয় নি?”

—“খুব যে ফরাসী বাকে হাত পা কাছ দেখছি? Out Herodring Herod বলে না একেই তোমার গুরুজাতির ভাষায়?”

—“পাটকোলাট কিরিয়ে দিলে বটে আনা,—কিন্তু আমার গায়ে লাগল না—ফকে গেল। আমার নিজের গুরুজাত ইংরেজ নয়—ফরাসী। আর শুধু বাকে নয়—ছবিত্তে, কাশাপাহাড়িত্তে, বাকবীণনায়ও।”

—“শেষটতে পেনোনাও ব'ল ফোলা যান না হয় ত?”
আনার ঠোঁটের উপাশে কিজাহ হাঙ্গি—ওত্তারের মার শেষ রাখে—

স্বপন চেষ্টা সবেও একটু অগ্রতিত না হয়ে পারল না; বলল: “এ-সমস্তার সমাধান করার চেষ্টা সমস্ত পাওয়া বাবে কাল। এখন তুমি শুয়ে পড়বে? রাত দশটা বেজে গেছে।”

—“বাক্ গে। ট্রেন না চললে আমি শুতে পারি না। ততক্ষণ একটু ক'কি থাওয়া বাক্। কি বসো? একটু গরম হ'তে ইচ্ছে করছে।”

—“বেশ।” স্বপন খাটা বাজালো:—ক'কি একটু খেতে-না-খেতেই আনা রেখে দিল।

—“কী?”

—“কেমন বিশ্বাস লাগল। শীত শীত করছে।”

স্বপন ঈষৎ উদ্বিগ্ন হ'য়ে তার কপালে হাত রাখল: “এ কী! একটু গরম ঠেঁকেছে যে! খুবও যেন একটু রাজ্য মনে হচ্ছে। জর এলো না কি ফের?”

—“দূর। একটু সন্ধি ভো ভিলাই—তার গুণের ট্যাঙ্কিতে অন্ততঃ রোমান্টিক গল্প! একটু ঠাণ্ডা লেগে গিয়ে থাকবে ফের।”

—“শুয়ে পড় এবার—আর দেখি না।”

—“পাড়াও ট্রেনটা ছাড়ুক—”

—“কথাটি না। আমি অভিজ্ঞাবক মনে রেখো।”

আনা হেসে ফেলল: “উঃ! বড় ঢাল যে! আচ্ছা

—তাহ'লে তুমি একটু—”

বলতে না বলতে স্বপন বেরিয়ে এসে করিডোরে

পাঁড়ালো—কুপের নীল ক্রানটা চোখে নিয়ে।

“আসতে পারো এখন।”

স্বপন ঢুকে কুপের দরজা বন্ধ ক'রে দিল। আনার দিকে চেয়েই বলল: “এ কী! ট্রেনিং গাউন প'রে বসে? আমি বসি—বুধি রাত শেমিজ প'রে শুয়ে পড়েছো।”

—“ট্রেন না ছাড়লে শুতে গায়ে মাথব?”

—“খুব পারে—বিশেষ আসন্নজরার।”

—“ও কিছু না। একটু জল এনে দেবে?—শুধু

জল।” স্বপন বেরিয়ে গেল।

আনা ঢক ঢক ক'রে প্রায় এক গেলাস জল গায়ে

ফেলল। কিন্তু তবুও ট্রেন ছাড়বার বাশি বাজেনা। আনা

বলল: “না: আগেই শুয়ে পড়তে হ'ল দেখছি।”

স্বপন উদ্বিগ্ন স্বরে তার কপালে ফের হাত রেখে বলল:

—“হঁ। জর বৈকি। এখন—”

আনা হেসে বলল: “এখন সে নিয়ে ভেবে মল

কী বসো?—বাক্ বাটা গেল। শেষটায় ছাড়ল ট্রেনটা।

আমি ভাবছিলাম আজ সাগরাত বৃষ্টি প্লাটফর্মেই কুপেতে

বন্ধ হ'য়ে জোড়ো রোমান্সের মহাশা দিতে হয়।” স্বপন হাসল

...অনমনঃ হাসি।

স্বপন নিজের বিছানার গুণর থেকে নিজের দামী সীলসিঁন্দু কখনটা আনার গুণর বিছিয়ে দিয়ে সমস্তে ধারগুলো

ওঁড়ে দিলো।

—“ও কী করছ?”

—“পাঁড় বো।”

—“ও কিছু না, এখুনি খেঁদে যাবে—জাব'লে তোমার

কখনটা—বলতে বলতে কাঁপনি বেড়ে উঠল। স্বপন

গাড়াভাঙি তার বিছানার উপরকার ছট কপলের একটি কপল

আনার গুণর টেনে দিলো।”

—“কী হচ্ছে শুনি? রাত্তে তোমাকে বৃষ্টি ঘুমতে

হবে না—না তোমার শীতে কাঁপনি ধরলে—”

—“আমার বাকি ঐ একটা কপলেই হবে। যদি

নিঃশব্দ শীত করে আমার ফার ওভারকোটটি মারে

কে?”

—“না না—সে হবে না। এ কথলটি নাও je vous en prie—impro—”

—“চুপ—অথাটি নয়। শোনো—বাছে কথা থাক্।

তর্ক রেখে আমার কথার উত্তর দাও। খুব শীত করছে?”

—“না, দম্ভাবদ, একটু ক'মেছে। ছোট্টা এক্সট্রা

কপলেও যদি না কমে—”

—“ফের?—শোনো, আর একটা কপল দেব কি?

সভি বৃষ্টি আমার শুধু ওভারকোটেই চলবে—”

—“না না না। এবার বিস্ত্রোৎ করব কিন্তু—অভিভাবক

কতিভাবকের কাঁপা জাহাজ দেব টপিজো ক'রে।”

—“আচ্ছা আচ্ছা—” স্বপন হাসল।

—“কী?”

—“বিশেষ কিছু না।”

—“তবু?”

—“মাথাটা কেমন বাথা করছে।”

—“একটু আঁপিরিন দেব?—ব্রাণ্ডি?”

—“ব্রাণ্ডির দরকার নেই—শুধু আঁপিরিনেই হবে।”

স্বপন তার হাওঁবাগটা থেকে আঁপিরিন বার ক'রে

আনাকে বাইয়ে দিল।

—“কাঁপনি তো ক'মেছে না আনা? নাও আমার এ

কখনটা—অগ্রহাষ।”

—“ফের এমন করছ? সাগরাত তুমি শীতে হি হি

করলে হি হি আমার খুব আশ্রম হবে?”

—“আমাদের রক্তে এত হৃদয়কিরণ জন্মাত হয়ে আছে

—যে ভাঙিয়ে থাওয়া চলে—উটের পিঠের গিওর মতন।”

—“উঃ, বীরপুরুষ এরই নাম।”

স্বপন হেসে বলল: “ভাই সই। কিন্তু মোহাই তোমার,

বীমানার মতন কখনটা নাও। সভি বৃষ্টি আমি কতদিন

ট্রেন ওভারকোট চালিয়ে ঘুমিয়েছি—”

আনা চক্ষের নিম্নিয়ে উঠে বলল; রাগাতঃ হুয়ে বলল:

—“আমি কখনো শোবো না—শোবো না—শোবো না।”

—“অগ্রহাষ করি তোমাকে নিদ্রিত”

—“দাঁপ-রে—থাক্ থাক্। শোও—শোও—আর কখনের কথা তুলব না।”

আনা হেসে শুভো। স্বপন আসলো নিভিয়ে গিল।

—“স্বপন!” হঠাৎ ঘরের চাপা সবুজ বিজলি বাতিটা

জলে ওঠে।

—“কী? কষ্ট হচ্ছে?”

—“না—অরটা বোধ হয় ক'মেছে। মাথাধারও।

আঁপিরিনে উপকার হ'য়েছে। আর একটু জল দেবে?”

স্বপন জল দিল। গার্ড একটা কাঁচের ট্রাসকে ক'রে

জল রেখে গিয়েছিল।

—“কিন্তু তুমি এখনো ব'সে? আমি ভেবেছিলাম তুমি

প'ড়েছ বা।”

—“মোটে এগারটা। ব্যারটার আগে আমি শুই?”

—“আমি তি ইমাবোলা দেবাদো বে জানব?”

স্বপন অপ্রতিত হ'য়ে বলল: “কী যে সব তোমাদের

ঠাটা! শোও তো এখন ফার্সামি রেখে।”

—“আমার ঘুম পাথ মি যে—বাঃ।”

—“তবে কী পেরেছে?”

—“কথা।”

—“মনিয়ের কি সাথে বিশ্বয় প্রকাশ ক'রেছিলেন

বোবা যেনেক বিয়ে করতে চায় না এমন অর্ধাত্মনও আছে

জগতে? বাপ-রে বাপ—জর ছাড়তে না ছাড়তে কল্ কল্

কল্ কল্।”

—“আ—হা। যেন ছেলেরা সবই ওহাবানী মৌনী

বাং।”

স্বপন হেসে বলল: “তুমি পেশা জুল ক'রেছ আনা।

তোমার স্বর্ণময় মডেলিনা নয়—উকিলিনা।”

—“সই। কিন্তু গল্প করবে এবার একটু দরদীপনা

রেখে?”

—“না। তোমার অর—শোও।”

—“বেথ কপালে হাত দিয়ে—খান হচ্ছে, কখন জর

ছেড়ে গেছে।” বলে স্বপনের হাত টেনে আনা নিজের

কপালে রাখল।

—“আশ্পিরিনের জ্বর।”

—“এখানে বোসো তবে আমার পাশে। একটু গর করো।”

—“গর কি ওভাবে করা যায়?”

—“গর।—আজ্ঞা, গর যদি না করতে চাও—দু-একটা প্রেমের সত্য উত্তর পাও, দেবে?”

—“না! কাপাঙ্ক সহ্যই?”

—“ক্ষতি কি? মনে নেই তুমি ‘আজই ব’লেছ—আমার কাজে বিপর তুমি হ’তেই পারো না।”

স্বপন হাসে: “সাথে তোমাকে বলছিলাম তোমার আসল রূপটি উকীলার—কোম্পানির নয়?”

—“ওরকম করে আমার প্রশ্নকে এড়িয়ে যেতে পারবে না। বল, আমি বা বলব তার সোঁতা উত্তর সেবে কি না?”

—“সেটা কী প্রশ্ন তার ওপর নির্ভর করে না কি?”

—“তার মানে আমাকে তুমি বিশ্বাস কর না—এই ত? আজ্ঞা বাবু।” বলে আনা চৌটি ফুলিয়ে পাশ ফিরে শুল।

স্বপন হেসে বলল: “আজ্ঞা দেব দেব। অমন নির্ভর ভাবে মুখ ফিরিয়ে না।”

আনা বাগিন্দে মূব ভাঁজে উপুড় হ’য়ে শুয়ে বলল: “না, কাজ নেই। আমি হয়ত তোমাকে এমনই অস্বস্তি দব প্রশ্ন কর্তাম—”

স্বপন সাহস করে হঠাৎ ঠাট্টার স্বরে বলল: “তুমি আমার সঙ্গে আজ এমন ব্যবহার করছ যেন আমার ছদ্মনে প্রণয়ী প্রণয়িণী—”

আনা তার রাগ ভুলে পাশ ফিরে তার মুখের দিকে চেয়ে বলল: “আজ্ঞা যদি হ’তামই তাহলে সন্ধ্যা সন্ধ্যা কি খুব মর্দাহত হ’তেন? কিবা ইসাবেলা?”

—“এই-ই তোমার প্রশ্ন ছিল না কি?”

—“না—সে আর একটা প্রশ্ন। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরই দাও আগে।”

—“ও—রে। তার মানে তুমি একটার স্থলে দুটো প্রশ্ন করে নিতে চাও এই ফিরিয়ে।”

—“বদি চাই-ই—তাহলে কি ভীষণ উকিলপনা হ’য়ে পড়ে সেটা?”

—“তা নয়। তবে অত ভাবিতা করলে নিরীহ মানুষের মনে ভয় একটু হয়ই। বাদরীকে ভয় নেই ব’লেই যে জেরাকারিণীকে ও ভয় নেই তা তো সাধারণ হয় না?”

আনা হেসে বলল: “তুমি বর্তা নিরীহ সাক্ষ্য চেও তুমি ট্রিক তত্ত্বাবহি নিরীহ কি না সে বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে প্রভু।”

স্বপন হেসে বলল: “যে-লোক জীবনে একজন মেয়েরও স্বপ্ন জন্ম করেছে—তা তাকে বিয়ে করেই হোক বা না বিয়ে করেই হোক—সে-লোক ট্রিক অনায়াসে সূনের মতনই নিরীহ র’য়ে গেল একথা বললে কি তোমার সন্দেহ দূর হ’য়ে উঠবে, না ফিকে?”

আনা হঠাৎ গম্ভীর হ’য়ে তর্জনি তুলে শাসিয়ে বলল: “তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ না কিন্তু মনে রেখো।”

—“সত্যি যদি জবুর ঘোরে ভুল বক্ছ না এ সম্বন্ধে অকটো প্রমাণ দিতে পারতে।”

—“বা—ও।” বলে আনা ফের পাশ ফিরে শুল।

স্বপন হেসে বলল: “আজ্ঞা আজ্ঞা—এবার উত্তর দেব—কণ্ঠ দিচ্ছি। অমন মান করে মুখ ফিরিয়ে না। ফেরো এদিকে।”

আনা মুখ না ফিরিয়েই বলল: “ফেরালে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে বল আগে।”

—“বলছি।”

আনা মুখ ফিরিয়ে হেসে ফেলল; বলল: “আজ্ঞা, ভয় নেই, প্রশ্ন করব না।”

—“উঃ—মেন করলেই আমি গিয়েছিলাম আর কি?”

—“ফের রাগাচ্ছ আমাকে? তাহলে করব কির প্রশ্ন। আর শু শু সন্ধ্যা সন্ধ্যাই নয়।”

—“কর না বার সন্ধ্যাই হচ্ছে। আমি কি ভয় পাই।”

—“আজ্ঞা। তাহলে আমার প্রশ্ন কর কির।

দোষ নেই। প্রথমে—প্রথমার সন্ধ্যা। বসোতো বসে—তুমি আমি রাতের গাড়ীতে এরকমভাবে নির্জন স্থানে

একসঙ্গে নিরুদ্দেশ বাত্মা ক’রেছি জানতে পারলে তোমার প্রিয়তমা মর্দাহত হবেন কি না? মানে বদেনশিনীটি।”

স্বপন একটু গম্ভীর হ’য়ে গেল। বলল: “একবার উত্তর দেওয়া সুস্থি।”

—“কেন?”

—“কারণ—হিলে তুমি হয়ত ভাববে বদেনশিনীকে আমি বাড়িয়ে বলছি—যেমন সন্ধ্যাই বলে ঠাট্টার সন্ধ্যা তোমার ধারণা শুনে আর কিছু না হোক, অন্ততঃ ফরাসিনীরা একটু বৃক বল পেতো স্বপন। কিন্তু সে কথা বাবু। আমি তোমার কোনো কথা বাড়ানো কথা মনে করব না কথা দিচ্ছি। অকুঠে বল তার সন্ধ্যা বা বলতে চাও।”

স্বপন স্বর একটু নামিয়ে বলল: “সে সত্যি একটু অসুত গোছের মেয়ে আনা। প্রেম-সন্ধ্যা তার ধারণা সত্যিই যেমন একরোকা তেমনি নতলি গোছের। সে আমায় গত মেনে কি লিখেছে শুনে? না—এখন তোমার ঘুমোনে উচিত। একে তোমার জর হ’য়েছিল—আজ ঘুমোও কাল বল।”

কোথলুসে আনার মুখ যেন রীপ হ’য়ে উঠল। বলল: “আমার জর সত্যি ছেড়ে গেছে—এই দেখ—তুলতুল করে খান হচ্ছে।” বলে ওপরের একটি কথল ফেলে দিয়ে স্বপনের দ্রুত হাতই নিম্নের কপালে রাখল।

—“তাই ত। আশ্পিরিনের নামে হিপ্ হিপ্ হরে ডাক্তার ইচ্ছে হচ্ছে যে—যাবা—বাচা গেল।”

—“তাহলে বল না—কী চিঠি লিখেছে সে। আমি কাউকে বলব না।”

একসঙ্গে নিরুদ্দেশ বাত্মা ক’রেছি জানতে পারলে তোমার প্রিয়তমা মর্দাহত হবেন কি না? মানে বদেনশিনীটি।”

স্বপন একটু গম্ভীর হ’য়ে গেল। বলল: “একবার উত্তর দেওয়া সুস্থি।”

—“কেন?”

—“কারণ—হিলে তুমি হয়ত ভাববে বদেনশিনীকে আমি বাড়িয়ে বলছি—যেমন সন্ধ্যাই বলে ঠাট্টার সন্ধ্যা তোমার ধারণা শুনে আর কিছু না হোক, অন্ততঃ ফরাসিনীরা একটু বৃক বল পেতো স্বপন। কিন্তু সে কথা বাবু। আমি তোমার কোনো কথা বাড়ানো কথা মনে করব না কথা দিচ্ছি। অকুঠে বল তার সন্ধ্যা বা বলতে চাও।”

স্বপন স্বর একটু নামিয়ে বলল: “সে সত্যি একটু অসুত গোছের মেয়ে আনা। প্রেম-সন্ধ্যা তার ধারণা সত্যিই যেমন একরোকা তেমনি নতলি গোছের। সে আমায় গত মেনে কি লিখেছে শুনে? না—এখন তোমার ঘুমোনে উচিত। একে তোমার জর হ’য়েছিল—আজ ঘুমোও কাল বল।”

কোথলুসে আনার মুখ যেন রীপ হ’য়ে উঠল। বলল: “আমার জর সত্যি ছেড়ে গেছে—এই দেখ—তুলতুল করে খান হচ্ছে।” বলে ওপরের একটি কথল ফেলে দিয়ে স্বপনের দ্রুত হাতই নিম্নের কপালে রাখল।

—“তাই ত। আশ্পিরিনের নামে হিপ্ হিপ্ হরে ডাক্তার ইচ্ছে হচ্ছে যে—যাবা—বাচা গেল।”

—“তাহলে বল না—কী চিঠি লিখেছে সে। আমি কাউকে বলব না।”

স্বপন হেসে বলল: “চমৎকার ছেলে-ভোলানো স্বর মন্ডা ক’রেছ আনা। কাউকে বললেই বা কি—সে তো আমার শুভ প্রণয়িণী ও নর দেশত্যাগিনী পলাতকগণ—সাধ্য লোকসমূহ সাক্ষী রেখে ধান-দুর্গা দিয়ে বিয়ে-করা স্ত্রী।”

আনাও হাসল, বলল: “তুমি যে ভারি মুখফোঁড় হ’য়ে উঠেছ দেখছি দুদিনে।”

—“হবে না? দীক্ষাগুরু কে?”

—“বদি বলি সৈনিক বংশোদ্ভবা—নৌগ-প্রবাসিনী হেঙ্কেল-নরনা?”

—“তাহলে শুধু বলব—তুলনাক্ষমা তুমি নও। যেহেতু এবিধে তোমার কাছে কোনো বংশোদ্ভবাই পাঁড়তে পারেন না।”

—“দ্বন্দ্ববাদ। কিন্তু এ-বাজে কথা দিয়ে আসল কথাটা চাপা দিতে পারছ না তাই বলে। বল, কি লিখেছে সে।”

—“উঃ, প্রীতান্তির কোতুলল কী নাছোড়বন্ড!”

—“ধাও। চাই না শুন্তে।” বলে আনা ফের পাশ ফিরে শুল।

—“আজ্ঞা চটো কেন? ঠাট্টাও বোঝ না। শোনো—আমি খাস্ চিঠিটাই অহুবাদ করে পড়ে শোনাচ্ছি।”

আনা বিদ্রাবে মুখ ফেরাল, বলল: “চিঠিটা কি সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘোরা না কি কণ্ঠমালা করে।”

একবার উত্তর না দিয়ে হেসে তার ছোট আভাশে-কেস্ খুলে চিঠিটা বের করে পড়তে আরম্ভ করল। একটু একটু করে পড়ে থামে ও অহুবাদ করে।.....

দূর বনস্থলী

শ্রীশ্ররেশচন্দ্র চক্রবর্তী

ওই ঘূরে
ওই বেথা বনস্থলী আধারের হুরে
কি এক রহস্য ঘিরি' রচেছে আপন
মৌন-নিকেতন—
সেইখানে
দ্বিবাশি কে যে মোরে টানে
আকুল আধানে!
ধীরে ধীরে অস্ত-রবি অস্তে চ'লে যায়,
স্বপ্ন যবে পাখী-ডাক নিতরু কুলার,
বনের হিয়ায়
কিসের অকুট বেন গুঞ্জন-মুখর
কানে পশে স্বর,
ব্যাকুলতা ছেয়ে যায় মনের অন্তরে,
ওই দূর বনস্থলী কিসের মন্তরে
আধারের হুরে
দূর হ'তে ঘূরে
আমারে ভুলায়ে নেয় দিগন্তের পার,
মৌন বনানীর ওই স্বপ্ন অন্ধকার!

মৌন!—নয়—
নয় নয় ওতো কভু' মৌন নয়,
ওবে অতি প্রচণ্ড মুখর :—
নীলাকাশে উড়ে-বাওয়া পাখী-কলধর
তা হতেও বাসায়
মৌন ওতো নয়!
সাগরের কল ছল তান
সবুজ বগলে লুফে কোকিলের গান
তা হতেও তা হতেও লক্ষ কোটি বার
ওর মুখর স্বকার।

মৌন যদি কেমনে সে ধূলর সন্ধ্যায়
আমারে ভুলায়,
কেমনে সে দিবালোকে অন্ধকার অবগুণ্ঠ' টানি
স্বপ্ন করি কি' কি'সের অর্থহীন বাণী
নিবিড় নিশায়
আমারে ভুলায়,—
কেমনে সে চন্দ্রমার রজত-ধারায়
অন্ধকার-তর করি' আপন হিয়ায়
আমারে ভুলায়—
নয়—নয়—ওর ডাক অতি স্পষ্টতর
ওই মৌন বনস্থলী প্রচণ্ড মুখর।

ওই মৌন মুখরতা!
ব্রহ্মাণ্ডের রন্ধে রন্ধে, ওই আকুলতা!
মৌন বেথা বাহিরের ধ্বনি
সেইখানে আপনা আপনি
স্পষ্টতর হ'য়ে বাজে কার অবিরাম
আকুল আধানে।

কে যে প'ড়ে আছে এক! বর্ষ বর্ষ—জন্মজন্মান্তরে
আন্ত কলধরে
মিলনের তরে কারে করিছে আধানে।
নিশীথ-শয়ন—
তাই মোর হ'য়ে ওঠে বিশ্রাম-বিহীন
সেই স্তম্ভতার মাঝে মৌন বিখ-বীণ,
করণ রাগিণী তুলি' পরাণের অতি কাছে কাছে
আমার মিলন বুঝি যাচে।
সেই ডাক—সে যে অতি দুর্দ্বার আধানে;
বজ্রনাথে গিরি কম্পমান,

শতধান হ'য়ে বেন ভাঙি' পড়ে অনন্ত গগন—
বদির শ্রবণ,
তা হতেও গু-আধানে অতি স্পষ্টতর
দ্রবন্ত মুখর!
এ-বিষের মৌন মুখরতা,
ওই ব্যাকুলতা!

ওরে—বিখ মোর তরে রচিয়া আসন
তোর কোটি রন্ধে, রন্ধে, নিত্য আয়োজন
আমারে ডাকিয়া নিতে তোর মাঝখানে।
রূপে রসে গন্ধে গানে
আমি তোার বাহিরেতে চিত্ত তরি' তুলি'
বিচির সঙ্গীত মাঝে মোর কণ্ঠ গুলি'
বহাইয়া দেই মোর লক্ষ বাসনার জীবন-তরণী।
ফলে ফলে উজলা ধরণী
তারি বৃকে বাধি' নীড় তারি গন্ধ করিয়া আশ্রয়
তারি মেঘে তারি প্রেমে ভরিয়া পরাণ
মুড় হ'য়ে চেয়ে থাকি,—
তোার নিতৃতের ডাক বার্থ হ'য়ে ফিরে যায়—রাখি'
অনিকের শুধু আকুলতা,—
জন্ম-জন্মান্তর তোার ওই ব্যাকুলতা

মোর কাছে সকলি নিখল
ওরে বিখ ওরে শাস্ত নহে যে রে শুধু মোর বৈরাগ্য সম্বল।
বৈরাগ্যের নাহিক আভাস।
পেশীতে পেশীতে মোর দুর্দ্বার উন্মাদ
মৃত্য করে অবিরাম।
শব্দ গন্ধ রূপ রসে ভরা যে সংগ্রাম
ইন্দ্রিয়ের অর্থ দিয়া পূর্ণ যে ভ্রুকোপ—
তাহারি আলোক
ধায়ুতে ধায়ুতে মোর তোলে কোলাহল
বিচিত্র সংঘাত মাঝে সত্য চকল।
শোণিতের প্রতি বিন্দু মাঝে
তাণ্ডব-নর্দনে কার শূন্যস্থান বাজে
উষা হ'তে সন্ধ্যা আর সন্ধ্যা হ'তে উষা।
ইন্দ্রধনু-ভুজা
সমুদ্রেও রজি' আছে মোর অণুলোম
বাসনা-বিষল মোর আধার আলোস্ত,
মোর মর্দন্তল
পৃথিবীর কামনায় সত্য উজ্জল।
বৈরাগ্যের নাহিক আভাস,
পেশীতে পেশীতে মোর দুর্দ্বার উন্মাদ
মৃত্য করে অবিরাম।



নাড়ীর টান

—গল্প—

ত্রিভববিহারী মুখোপাধ্যায়

সকাল থেকে এক টিগ নস্তি নিতে পাই নি। সমস্ত সন্ধ্যার নিজের ছুটো নাস্তা-বিয়েরের সম্বন্ধে শুল্ক মনে হচ্ছে।

এমন অনাৰ্ণ্য দেশ! অলিতে গলিতে গাছা-গুলির ছড়াছড়ি। আর এক ভরি নস্তি মেলে না। সমস্ত বাজার হাতড়ে কি-খানিকটা গুঁড়ো কিনে-এনেছি। তার না আছে ঝার, না আছে গন্ধ। নাকে ঠাসুটি,—যেন পাশ্চাত্য। এমনটাই হ'ত না। নরেশ ভিনটের ট্রেনে এসে পৌঁছবে। তাকে wire বসেছি, কলকাতা থেকে এক টিন ভাল নস্ত আনবার জন্য। নিজের সখল যা ছিল, তাকে আজ ভিনটে পর্যায় টিকি'র সাথে রাখতে পারতুম না। কিন্তু সর্বনাশ করলো ঐ ইতভাগা জলু। এক কোটো নস্তি একেবারে উপভূত ক'রে চেলে দিলে।*

বাগের নস্তদানিতে ভোর কি দরকার বাথ? বলে, দেখতে পাই নি। তা চালুবি ত চালু শুকনো ডাডায় চালু। তা নয় একেবারে bath-room-এ! নাঃ, বরাবরই দেখে আসুচি, মেয়েটার কাজের কোন ঠ্রি নেই।

—এ দিকে ত নিয়ের বয়স পেরিয়ে গেল।

—আমিন, কাগিজ,—এমনটা প্রমাস সময় আছে।

—একটু নস্তি কোথাও মেলে না?

জলুর মার কাজে কোলা পাতা আছে। খানিকটা চেয়ে এসে home-industry করলে হ'ত। কিন্তু সাহস হ'ল না। এই শূজার বাজারে বড় ভাবাবছরী তার কোলিকলক'র 'ওগো ততোতা'?

নরেশক টেশন থেকে পাঙ্কড ক'রে আনলে হয়। কিন্তু টেনে আসবার এতদূরো অনেক দেরী। তা ছাড়া বন্দ-মাতার কোমল আঁকে হাঁটু পর্যায় ডুরিয়ে এতটা পথ হাঁটবার তাগত ছিল না। আজ কদিন থেকে শারদ্রী আকাশ

ভেঙে'নেমেছেন, মুখশাধরে;—বাসের ডগায় ডগায় ক্রো'কোর—Pola Nogi-dance! আনন্দমতীর আগমন বেশ ভেসে গেল, আনন্দসংলিলে। জ্বলো বোধ হয় শুভু খানের শীল-গুলাে।

কবি ষ্ট্রিক'ই বলেছেন, 'গর্জন্তি শরদিন, বর্ষতি।' নির্মল শীলাকাশ? সেটা অথওই আছে। তাতে আঁচড় পড়ে'নি। তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। সে দেখ কার? আর কাশের বাহার, মাঠে-মাঠে না হোক, নিজের ঘরে ত যথেষ্ট আছে,—আজ এটার, কাগ ওটার।

মার এবার কিসে আগমন, তাই ভাবি। যাতেই হোক, বাহনশুল্ক পাণ্ডাবোটে পার হবেন।

মা'র নামে দেশের রোগ না ভাগুক, রোগী ভেগেছে। দশ-বাংলা হিনের মধ্যে একটা call পাই নি।

মঙ্গ বাবুয়া নয়! Private practice ফলো'ব'লে কলকাতা-ছেড়ে এই অল্প পাড়াগায়ে এসে বাস করুন। ফলে, যত দিন যাচ্ছে, private practice বেড়ে যতে privation practice.

যাক, ওদয় অভ্যাস হয়ে গেছে। পেটের ভাত না হলে চলে। কিন্তু নস্তি না নিয়ে বাঁচি কি ক'রে?

—হঠাৎ বুজি খেয়ে গিয়ে আকাশের মুখে একটু অশ-সম্মল হাসি ফুটে উঠলো।

—কল্লাকজীর হাসি!

Water-proof-টা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে পড়বো ভাবি, এমন সময় শাত-আটজন লোক ছড়-ছড় ক'রে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। এদের একজনের কাঁধে একটা শিতর পঙ্গলিষ্ট, সিংহ, নিপুল দেহ। শিতর হুস্মার মুখে চরম সুস্থিরির বিমর্ট নিপুলিত্তা। বৃত্তে বসে'হ'ল না যে আর তার সকল খেলা, আর সকল চুটী'র অবসান হয়েছে।

আহা! কি দুর্লভ এরা! কত অসহায়! যাতে গিছলো, পরম নির্ভয়ে, জানতো না জলের মধ্যে কতটা বিখাস-খাতকতা আছে। তারপর, কল্লখালে, হাবুডুবু খেতে খেতে বোঁটার কি ভেবেছিল, কে জানে? এতটুকু নাহুয়ের জীবনে, এত অল্প সময়ের মধ্যে এক প্রচণ্ড Experience!

মনে পড়লো, আমার জলুও এই বয়সে একবার জলে পড়েছিল। অনেক কষ্টে তাকে বাঁচান হয়েছিল। কিন্তু এর কি কিছু করা যাবে? শুভলুম, জলে পড়বার ঘটটা রুই পরে বোধ হয় তাকে ভোলা হয়েছে।

আমি নই,— উৎসাহও নেই। তবু কিছুক্ষণ চেষ্টা করে দেখলুম। তারপর ছেড়ে দিলুম। বললুম, 'কিছু করতে পারলুম না।'

তাদের কিছু আশার শেষ নেই। হাত মুতে মুতে তাদের হাজার প্রাণের উত্তর দিতে হ'ল।

এই সময়ে নরেশকে গাড়ী থেকে নামতে দেখলুম। অমনি বোঁচালোটা ছুঁতে গেলে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলুম। চীৎকার করে উঠলুম,—আরে এসেছ! বললে বিখাস ক'বে না, ভাই, তোমার প্রতীক! করছিসলুম,—বক্ষপ্রাণার মত মঙ্গ পল গুণে গুণে।

—ওরেবু'নু, নরেশের জিনিষগুলো গাড়ী থেকে নামিয়ে নে। —আরে উঠে এসো। উঠে এসো। 'আমার চিরবাসিত এসো, আমার চিত্ত-সকিত এসো।'

পিছন থেকে প্রশ্ন হ'ল, 'একটা injection দিলে হয় না, ডাক্তারবাবু?'

লোকগুলো তখনো আমাকে ছাড়ে নি। আমি বেশ ঠাণ্ডা ভাবেই উত্তর দিলুম, 'কিছু করবার থাকলে নিজেই ত করতুম। আপনাদের বলতে হবে কেন?'

'Battery দিলে হয় না?'

'পাগলো'র মত কথা বলছেন কেন? মরা নাহুয়ের বরি বাঁচান যেত, তা হ'লে আর ভাবনা থাকতো না।'

মরার খবর পেলে নরেশের মাথা ষ্টিক থাকে না। সে যাত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'কি, হয়েছে কি?'

আমি, 'দেখ না! ছুটটা আগে ছেলে মরেছে। এখন আমার বসে মঙ্গ পড়ে বাড়িয়ে দিতে!'

নরেশ, 'ম'রে গেছে?—দেখি!'

আমি, 'কি আর দেখবে? চল, চল,—ও গাড়াড় হয়েছ অনেকক্ষণ।'

নরেশ আমাকে প্রায় ঠেলে দিয়েই ঘরে ঢুকলো; আর মরা ছেলেকে নিয়ে নিজের মতে ডাক্তারী আরম্ভ করল।

—একবার পেট টেপে, একবার জিত দ'রে টানে, একবার হাত দ'রে টানে।

আমি হতাশভাবে চেয়ারে ব'সে, আবাক হ'য়ে তার এই মাতব্বরী দেখতে লাগলুম।

বুঝ এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবু, আমাকে ডাক'ছিলেন।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'আমি ডাকি নি। ঐ নরেশবাবুকে জিজ্ঞাসা কর ওর কিছু দরকার আছে কি না।'

'হাঁ, হাঁ, দরকার আছে। খানিকটা গরম জল আনতে পার?'

'ব'লে নরেশ বুককে বিয়ার দিল। আমি মনে মনে বললুম, 'বেশ গরম জলই আনাও।'

আর, বাক্স, bedding, গাড়ীতে প'ড়ে প'ড়ে কিছুকিছু। আমার কি?'

ঘটীখানেক পরে ভিড় বিদায় হ'ল। আমি আবার সেই চিত্ত-সকিত বদ্বার সম্মুখীন হলুম। কিন্তু হুর কেটে গেছে।

আর তা জমলো না। নরেশ আরম্ভ করলেন, 'বাস্তবিক মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল।'

আমি চুপ ক'রে রইলুম।

কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারলুম না। বললুম, 'ষিকেরে বোকে শোখান আমি বৃত্তে পারি। সেইটুকু বুদ্ধি আমার আছে। তুমি বলতে চাও আমি আমার duty করি নি? তুমি আমাকে artificial respiration দেওয়া শেখাতে এসেছ?'

নরেশ, 'আঃ কি বল! চুপ ক'রে থাকতে পারি নি। তাই একটা কিছু করেছি। অত etiquette-এর কথা মনে ছিল না।'

আমি, 'কৈ বাঁচলো না? আমি ত মাঝবাবু বোণাড় করেছিলাম।'

নরেশ, 'না, তুমি রেগেছ। তবে আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই।'

আমি, 'হাঁ, সেই ভাল।'

নরেশ, 'তার পর? আতিথ্যের বাকীটা? সেও কি এই মতো? তা হ'লে ব'লে দাও, অল্প পথ দেখি।'

অল্প পথ দেখাতে পারলুমই স্বরী হতুম। কিন্তু দেখান হ'ল না। মনে পড়ে গেল, নস্তির টিন তার কাছে।

তবে'ছি, কোলাকার বড় বড় রাকসদের প্রাণ থাকতো ছোট একটা কোটীর মধ্যে,—শাত বাঁও জলের তয়া। এ যে কেমন ক'রে সম্ভব হ'ত, তা আজ বুঝতে পারছি।

বঙ্গবাসী জৈন মহামুনি ঋতকেবলী ভদ্রবাহু

শ্রীঅমৃতলাল শীল

কার্তিক পূর্ণিমা। শরতের পূর্ণ শশধর মধ্য গগন হইতে অমরকটা গশ্চিম হেমিরা গড়িয়াছে, নির্মল ভোঃখা শুক জগৎকে মৌত করিতেছে, উজ্জ্বল কিছু গশ্চিম রক্তজ ভরণী নক্ষত্র নিট নিট করিতেছে—ঐক যেন পূর্ণ-যৌবন নিশানাথের বিমল-জ্যোতিতে-রান হইয়া রহিয়াছে, পূর্ণ গগনে মহাকাল নক্ষত্রপুঞ্জ শশাঙ্কের সমুখে জ্যোতির্ধন দেখা বাইতেছে, নক্ষত্ররাজ শুদ্ধ ও সৌন্দর্যধারী হইয়া যেন পূর্ণগগনে মুখ নুকাইয়া রহিয়াছে, অগ্নি ও ব্রহ্মহন্য উত্তর ঋণে নিট-নিট করিতেছে। গাটনীজের রাজগঙ্গাধরের বিস্তৃত থোলা ছত্র মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত (১) একাকী পদচারণ করিতেছেন। দূর্ব পরিবার উত্তর-পূর্ণ-যৌবনী ভাগীরথী কুল কুল পূর্ণ হইয়া শোভাযুক্ত করিতেছে, পশ্চিমে যৌবনোন্মত্তা মহান সোন (২) দূর্বপ্রাচীরের বার বার আঘাত করিতেছে, উত্তর ও

পশ্চিমে বহুদূর দৃষ্টি বার জলরাশি ছাড়া আর কিছুই দেখা বাইতেছে না। অল্প ছই দিকে রাজধানীর সহস্র স্থবর্ণ-কলস বিমল জ্যোতিতে অগ্নিবিখারং বোধ হইতেছে। গাটনীপুত্র তখন জগতের শ্রেষ্ঠতম নগর, লক্ষ লক্ষ ধনবান নাগরিকের আবাসস্থান, প্রাপ্ত রাজপথের ছই দিকে উচ্চ অট্টালিকাশ্রেণী শোভা পাইতেছে, মধ্যে মধ্যে স্থবর্ণ কলস ও ত্রিশূলশীর্ষ বিমলশ্রী, ভূদ্বজাকার বিষ্ণু, শক্তি, লক্ষ্মী ইত্যাদির নব্বির দেবদেবিতা পাওয়া বাইতেছে, মধ্যে মধ্যে নগররক্ষকের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া বাইতেছে মাত্র, চারিদিকে নাগরিকরা নিরুদ্বেগে নিদ্রা বাইতেছে, কেবল সম্রাট এত রাতে চিন্তায়। তিনি নগরের নৈশ শোভা দেখিতেছেন না। অল্প কয়েক দণ্ড পূর্বে তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া বিশ্রামার্থে ব্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। এজন্য স্বপ্ন তিনি পূর্বে কখনও দেখেন নাই, স্বপ্নে বোলট ড্রব্য বোধিয়াছেন ও সেজন্য তাঁহার ভূতিগটে এমন অস্তিত্ব হইয়া রহিয়াছে যে চোঁড়া করিয়াও ভুলিতে পারিতেছেন না। তিনি স্বপ্নে প্রথমে দেখিলেন (১) হৃদয় অস্ত্রধারী হইতেছে, পরে (২) কল্পবৃক্ষের এক শাখা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, পরে (৩) আকাশ হইতে এক দিবা রথ নামিতেছে আবার উঠিতেছে, পরে (৪) চন্দ্রবিম্ব খণ্ড খণ্ড হইতেছে, পরে (৫) দ্রুত হতী দ্বন্দ্ব করিতেছে, পরে (৬) গোদুগি সময়ে খজ্যোত আলোক বিকীরণ করিতেছে, পরে (৭) একটি জল-মানবহীন শুভ ভাড়াপ, পরে (৮) রাবার

পুত্র পাটনী দূর্ব নির্মিত হইতেছে বোঝাত, ইহার চতুর্দশর্বে এক বার উৎসব হইয়া কায়ে জগতের শ্রেষ্ঠতম নগর হইবে। বৃন্দবন শির একরা ত্রিপিটকে বিবিধা রাখিয়াছিলেন। ইহার প্রায় ত্রিই শতাব্দীয়া বয়সের রাজারা এই শাটনীগ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন ও ঐ অঙ্গকামে একটি হুম্বর নগর প্রতিষ্ঠিত হইল। তখন রাজধানীর বাহন একদিকে ভাগীরথী ও অপরদিকে সোম নদী প্রবাহিত ছিল। পরে এই সোম নদ প্রায় পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে।

দুর্গপূর্ণ, পরে (২) সিংহাসনে এক মরুট আসীন, পরে (৩) স্থবর্ণপাণ্ড হইতে কুকুরে পায়স খাইতেছে, পরে (৪) অন্ন বয়স্ক ঝাঁড় গর্ভময়না ভোগ করিতেছে, পরে (৫) ক্ষত্রিয় বালকেরা গাধার চড়িয়াছে, পরে (৬) বানরে রাজহংস গড়াইতেছে, পরে (৭) গোবৎস সমুদ্র লঙ্ঘন করিতেছে, পরে (৮) মৃগাশ বৃদ্ধ বলস্কত ভাড়া করিতেছে, পরে (৯) একটি দ্বারশ-শীর্ষক সর্ব আশ্রিতেছে। এই অসংখ্য অমল্যে ঘোড়ন স্বপ্ন ব্যাঘ্রের পর ব্যাঘ্র দেখিয়াছিলেন, তাঁহার মনসপটে প্রস্তরে সৌহ-কীলকের রেখাবং অস্তিত্ব হইয়া গিয়াছে, তিনি ইহার অর্থ বুঝিতে পারিতেছিলেন না, অতএব নগরীর ব্যাকীর ভয়ে অস্তিত্ব হইয়া তিনি জ্ঞানাবতীর জিন মহাবীর স্বামীকে স্বপ্ন করিতে গিয়াছিলেন। এইরূপ চিন্তা ও অস্বস্তিতে বানিনী প্রভাতা হইল।

সম্রাট প্রাতঃজিহ্না সমাপনান্তে চিন্তিতমনে রাজপথেতে আসিয়া বসিলেন ও মন্ত্রীগণ, পুরোহিত ও বিদ্বান-মণ্ডলীকে আহ্বান করিলেন। সকলে উপস্থিত হইলে অদ্ভুত স্বপ্নকথা বলিয়া কর্তব্য স্থির করিবেন মনস্ত করিলেন। সভাসদৃদিগের আশ্রিত পুর্বেই নগর-উপকণ্ঠের রাজ-উদ্যানরক্ষক সভাতে প্রবেশ করিয়া জানাইল যে পরিভ্রাজকবর মহামুনি ভদ্রবাহু ১৩,০০০ শিষ্ণুদেব দেশে পঠান করিতে করিতে প্রাতে নগর-প্রবেশ করিয়াছেন। সম্রাট সংবাদ পাইয়াই মন্ত্রী, সেনাপতি, অমাত্যগণ ও প্রধান প্রধান নাগরিক সমভিষায়ে আসিয়া সম্রাটের আভার্যনা করিতে বাধ্য করিলেন। নগর-প্রাচীরের বাহিরে গুস্তর সহিত সাক্ষাৎ হইল। যথোপযুক্ত সন্মান প্রদান করিয়া এক রাজোজ্ঞানে তাঁহার বিশ্রামস্থান নির্দিষ্ট ও বিশ্রামস্থান ও তাঁহার শিষ্যদের নিকটে বা অন্ন রাজ স্বত্বা সম্রাট নাগরিকদের উদ্ভানে বাসস্থান করিয়া দিলেন।

ইহার পর গুস্তর পূর্ণ রাতির অদ্ভুত স্বপ্নের কথা গুনাইয়া তাহার ফলাফল সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন।

নগর ছিল। সেখানে পদব্রথ নামক এক রাজা সেখানে রাজশাসন করিতেন, তাহার রাণীর নাম পদ্মশ্রী। রাজ-পুরোহিতের নাম সোমশর্মা ও তাঁহার পত্নীর নাম সোমশ্রী ছিল। সেখানে সোমশর্মার মত জ্যোতিষজ্ঞ বিদ্বান দেশ-দেশান্তরেও খ্যাতি পাওয়া বাইত না। দেশে বৈদিক যজ্ঞ-যজ্ঞ, ভাগ্যর শাখা বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য ও আদিত্য প্রভৃতি ছিল, ইহা ছাড়া নৃতন ধর্মমতের মধ্যে শৈবন ও বৌদ্ধমতও প্রচলিত ছিল। রাজা পদব্রথ ও তাঁহার পুরোহিত সোমশর্মা শাক্ত ছিলেন কিন্তু সোমশর্মার সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, কোনও ধর্মমতের প্রতি অবজ্ঞা করিতেন না। সোমশ্রীর গর্ভে এক পুত্রের জন্ম আবির্ভাব হইল। নামকরণের সময়ে উদাহরদ্বয় শেখারি জ্যোতিষী কৈলী-কামরী করিয়া জানিতে পারিলেন যে এই শিশু ভবিষ্যতে জৈনমতের গুস্তর-স্বপ্ন হইবে। তিনি বালকের নাম ভদ্রবাহু রাখিলেন ও বালকের জাতকর্ষ উপনয়নাদি সম্বন্ধে ক্রিষ্ণাঞ্জলি জৈনমতের কবিলেন কিং একথা যখনই প্রতিবাদীসের কাছে প্রকাশ করিলেন না।

ধন্য বালক ভদ্রবাহু সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিতেছে, তখন একদিন সে অন্ন বালকের সহিত মাঠে খেলা করিতেছিল। হঠাৎ কতকগুলি জৈন সাধুরে শিষ্যসহ বাইতে দেখিয়া অন্ন বালকের সহিত সেও সাধুরে পথের কাছে আসিয়া পড়িয়া। সেই সময়ে জৈনদের মহামুনি গোবর্দ্ধন, বিষ্ণু, নন্দীমিত্র ও অপরাজিত নামক মুনি ও গোবর্দ্ধন শিষ্য সহিত সেই পথ দিয়া কোটিকপুর নামক স্থানে জম্বুধারীর সম্মানিধন দর্শন করিতে বাইতেছিলেন। মহামুনি গোবর্দ্ধন বালক ভদ্রবাহুর শাবীরে মহাপুস্তকের নামা দিচ্ছিলেন। আশ্চর্য হইলেন ও বালকের নিকটে ডাকিয়া তাহার সহিত কথা কহিয়া ইহাও দেখিতে দেখিতে আসিলেন যে—এই বালক ভদ্রবাহু একজন ঋত-কেবলী (১) হইবে। তিনি বালকের পিতার নাম জিজ্ঞাসা

১। জৈন-সাহিত্যে মগধ রাজবংশ-সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে যে নক্ষত্র, শেষ রাজার মন্ত্রী শক্তজ চাপকা নামক এক রাষ্ট্রপতির সাহায্যে উল্লেখ করিয়া বৃদ্ধ চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে আধিকার করিলেন। কিছুকাল পরে বৃদ্ধ চন্দ্রগুপ্ত আবার রাজ্য পুত্র নিম্নস্বায়কে (অথবা কিন্দুসার) দিয়া বহু চাপকোর সহিত অনেক তপস্বী করিতে লগিয়া গেলেন। কিন্দুসার কিছুকাল রাজশাসন করিবার পর আবার পুত্র অশোককে আধিকার করিয়া তপস্বী করিতে গেলেন। অশোকের পুত্রের নাম বৃদ্ধাণ, সে অন্ধ ছিল। অশোক বৃদ্ধবনের পুত্র চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে আধিকার করিয়া পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তপস্বী করিতে বসদান করিলেন। এই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই ভদ্রবাহু দ্বিতীয় শিশু ও বালকের Sandracatus অথবা Sandracatus।

ইতিহাসে দুইজন চন্দ্রগুপ্তের কাহিনী পাওয়া যায় ইহা বিদ্যে।

২। মহাবীর শাবী ও বৃদ্ধবনের রাজধানীর রাজপুত্র বয়সের রাজধানী ছিল। রাজপুত্র আশ্রিত পাটনী হইতে কয়েক মাইল দূরিত। সেখানে পদ্মার উত্তর তীরে মল্লা বাস করিত, এই মল্লা প্রায়ই মগধ আক্রমণ করিয়া উৎপাত করিত। তাহারে শাসনে রাখিবার জন্য পদ্মার তীরে, গঙ্গা ও সোমের সমন্বয়ে, পাটনী নামক স্থলস্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করা হইয়াছিল। একদিন বৃদ্ধবর আবার শিবেরে বখিরাছিলেন যে, এই যে

১। জৈন সাহিত্যে জ্ঞান পাটনাকার ১২ মহাজান ২ প্রতিজ্ঞা, ২ অধিজ্ঞান ও ৪ মধ্যপায়া জ্ঞান ও ৪ কেবলজ্ঞান। সর্বলোকোপভোগের এই জ্ঞান লাভ করিলে মনুষ্য সর্বজন হই, সকল বিষয়ে আশ্রিত্য হইয়া থাকিত পারে। ঋতকেবলজ্ঞান এই কেবলজ্ঞান অপেক্ষা আর নিম্ন, কাব্যঃ একই প্রকার। বৈদ্যীক বলেন, আকাশব্যাপ্ত আর কাহারও কেবল বা ঋতকেবলজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নহে, কেবলজ্ঞানের কাহী দ্বারা হইয়া গিয়াছে। ভদ্রবাহুনিই শেষ ঋতকেবলী, তাহার পর আর কেহ ঋতকেবলী হই নাই।

বৃদ্ধবনের বোৎসার উত্তরে আশ্রিত মহামুনি নামক যমিক পূর্বকালে পুণ্ড বর্দ্ধন বলিত। প্রাচীনকালের ইতিহাসে ও পুরাণে পুণ্ড বর্দ্ধন একটি সমুদ্রকালী প্রবেশ করিয়া গিয়াছে। ভদ্রবাহুনিই শেষ ঋতকেবলী, তাহার পর আর কেহ ঋতকেবলী হই নাই।

করিয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়া সোমশর্মাখ্য সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি সোমশর্মাখ্যকে বালকের অঙ্গে মহাপুরুষের লক্ষণগুলি দেখাইলেন ও বালককে বিজ্ঞাপিকা করাইতে চাহিলেন। সোমশর্মা মহামুনির কানাইলেন তিনি পূর্বেই বালকের ভবিষ্যৎ জানিয়াছেন সেইজন্য তাহার সংস্কার জৈনমতে করিয়াছেন। সোমশর্মা ও সোমশ্রী দ্ব্যভিঙ্গে বিজ্ঞা শিক্ষার্থে গুরুরান করিলেন, কিন্তু সোমশ্রী মহামুনির প্রতিজ্ঞা করায়া লইলেন যে যদি বালক বিজ্ঞালাভ করিয়া, সংসার অনিত্য বিবেচনা করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইবে, তবে তাহাকে নীলা গ্রহণের পূর্বেই অন্ততঃ একমাস কাল গৃহে আশ্রিয়া পিতা মাতার সেবা করিতে হইবে ও তাঁহাদের অমুখিত লইতে হইবে, এবং না করিলে মহামুনি তাহাকে দীক্ষিত করিবেন না। মহামুনি এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, পঞ্চ-বর্ষীয় শিশুকে সঙ্গে লইয়া গুরু-বর্জন ত্যাগ করিলেন, আপনার আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া অক্ষ নামক তাঁহার এক গৃহস্থ শিষ্য ও শ্রদ্ধাবান শ্রাবকের গৃহে তাহার বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

এ সময়ে ভ্রমাবাহর বর্ণপরিচয় ও সামান্য বর্ণজ্ঞান হইয়াছিল, মহামুনি গোবর্দ্ধন শ্রমপ্রদ করিয়া তাহাকে গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। মহামুনি তাহাকে নিম্নলিখিত বিষয়ে শিক্ষা দিলেন। ইহার ক্রম ইতিহাসে পাওয়া যায় না কিন্তু ইহা দ্বারা জৈন-সম্প্রদায়ের একজন বড় বিদ্বানকে কি কি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া ব্যুৎপন্ন হইতে হইত, জানিতে পারা যায়।

১। চার প্রকার জ্ঞান—যোগিনী, সরিনী, প্রজ্ঞানি, ও প্রজ্ঞাধি।

২। ব্যাকরণ।

৩। চতুর্ধের [ইহা হিন্দুদের-চার বেদ নহে]

(১) প্রথমভাগে, অর্থাৎ ইতিহাস, পুরাণ, ২৪ তীর্থঙ্করের জীবনী, ভবিষ্যৎ ও উত্তর পুরাণ, হরিবংশ ইত্যাদি।

(২) প্রথমভাগে, অর্থাৎ ত্রিলোকসার, ত্রিলোক-ভূষণ, জ্যোতিষ (গণিত ও দলিত), বীজ-গণিত, চন্দ্রপঞ্জিকা, স্বর্গপ্রজ্ঞাধি ইত্যাদি।

(৩) দর্শনযোগে অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্র, গোমতসার,

প্রভাচনসার, অষ্টমহত্মী, প্রমোদ-কমল মার্গ ও রাজবর্তিকা ইত্যাদি।

(৪) চন্দ্রাভ্যুযোগে অর্থাৎ আচার, ব্যবহার, পূজা-পদ্ধতি, ত্রিবিধচার, মূলচার, বেগমণ্ড, অষ্টপাহ, পঞ্জানন্দ পটিনী ইত্যাদি [দিগধর পত্রিকার মতে ইহাই চতুর্ধের]

৪। চতুর্দশ পূজা।

শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই ভ্রমাবাহর মনে বৈরাগ্য উদয় হইল ও ক্রমে বদ্ধিত হইতে লাগিল। শিক্ষা শেষ হইলেই তিনি গুরুর কাছে নীলাগ্রহণ ইচ্ছা [হিন্দুগণ বাহকে সন্ন্যাসগ্রহণ বলেন, জৈনরা তাহাকেই নীলাগ্রহণ বলিয়া থাকে] প্রকাশ করিলেন। মহামুনি তখন সোমশর্মা ও সোমশ্রীকে কাছে বাধা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা বলিলেন, ভ্রমাবাহও কিছুকাল গৃহস্থপ্রাণে বাস করিয়া পিতামাতার সেবা করিতে সজ্জন করিলেন। তিনি গুরুর অমুখিত লইয়া কৌটিকপুরে অভিমুখে যাত্রা করিলেন ও অল্পকালমধ্যে পিতামাতার দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। তিনি আপনার উদ্দেশ্য জানাইয়া একমাস কাল কৌটিকপুরে বাস করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

ভ্রমাবাহর কৌটিকপুরে আসিবার কয়েকদিবস পূর্বে একজন বিদ্বানগণ গম্ভীর ব্রাহ্মণ কৌটিকপুরের রাজসভাতে একধানি লেখ দেখাইয়া তাহার অর্থ বিভাজ্যা করিয়াছিল, তাহার কাণ্ডপদ্ধতি অনেকটা দিগ্বিজয়ীর মত ছিল। রাজসভায় বিদ্বানের অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার অর্থ কবিত্তে পারিতেছিলেন না। সোমশর্মা পূর্বেক সেই লেখ দেখাইলেন, ভ্রমাবাহ অস্বাভ্যাসে তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। এইরূপে সে গম্ভীর ব্রাহ্মণ পরাজিত ও লজ্জিত হইয়া পলায়ন করিল। রাজা পদ্মরথ ভ্রমাবাহকে আপনার রাজসভাতে থাকিবার ভজ্ঞ নানা প্রকারে প্ররোচিত করিতে লাগিলেন, তিনি ভ্রমাবাহকে হৃদয়ী গুণবতী ও সত্য সহিত বিবাহিত করিয়া বাস করিবার ভজ্ঞ গৃহদান করিতে চাহিলেন, বাহার ভজ্ঞ বৃত্তি দ্বারা করিয়া দিতে চাহিলেন ও নানা ধন-রত্ন দান করিতে চাহিলেন কিন্তু ভ্রমাবাহর মনে বৈরাগ্য

প্রবল হইয়াছে, তিনি হৃদয়ী স্ত্রী বা ধন রত্নে প্ররোচিত হইলেন না। নির্দিষ্ট কাল গত হইলে তিনি পিতামাতার কাছে দীক্ষিত হইবার অমুখিত গ্রহণ করিয়া গুরুর কাছে ফিরিয়া আসিলেন। ভ্রমাবাহ নীলাগ্রহণ করিয়া অতি অল্প-কাল মধ্যে জ্ঞান, ধ্যান, তপ ও সামান্য সাধন করিয়া আচাধ্য-গণে প্রসিদ্ধিত হইলেন। ইহার পর মহামুনি গোবর্দ্ধন ঋত-কেবলী ঈশ্বরপ্রাপ্ত হইলেন।

ইতিহাসে, এই ঘটনাবলীর পর কি হইল পাই না, একেবারে জীবনের শেষ নীমতে মহামুনি, আচাধ্য, ঋত-কেবলী, সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের পৃথনীয় গুরুগুরু ২৪,০০০ শিষ্য সহিত কাকিকপুর্ণিয়ার পর দিবস প্রাতে, পাটলীপুত্রে গিয়া সমাগত দেখিতে পাই।

ভ্রমাবাহ সম্রাটের স্বয়ম্ভূতান্ত্র সমিতির সন্নিধ্য এইরূপ অর্থ করিলেন। [ক্রমাবস্থায় সংসার স্বপ্নের অর্থ]

(১) পৃথিবীতে সকল জ্ঞান অক্ষকারাচ্ছ হইবে। (২) জৈনধর্মের পতন হইবে, তাম্রার উত্তরাধিকারীরা আর দীক্ষিত হইবেন না (অর্থাৎ রাজভোগ করিয়া বুদ্ধাবস্থার নীলাগ্রহণ করিয়া আর বর্নে গিয়া তপস্যা করিয়া জীবন শেষ করিবেন না।) (৩) দেবতার আর ভীরুত্বক্ষেত্রে পদার্পণ করিবেন না। (৪) জৈনদের নানা শাস্ত্র হইয়া যাইবে। (৫) মেষ আর উপাখ্যু পরিমাণে জলদান করিবেন না, শূত্র অতি সামান্য উৎসর্গ হইবে। (৬) সমাজজন লোপ পাইবে, অল্প অল্প জ্ঞানালোক নিট নিট করিবে। (৭) আখ্যাত জৈনমতশূন্য হইবে, নিখাদ প্রবল হইবে। (৮) অসত্যের প্রাধান্য ও সত্যের অপ্রকাশ। (৯) মন্দ, নীচ ও হুস্তের কলহাত-লাভ। (১০) রাজারা যতীশে তুষ্ট না হইয়া রাজকর ছুই তিন গুণ বাড়াইয়া প্রজাপীড়ন করিবেন। (১১) অন্নব্রহ্মেরা ধর্ম কর্ত্ত্ব আরম্ভ করিবে, কিন্তু বয়সকালে ত্যাগ করিবে। (১২) উজ্জয়িনীর রাজারা নীচবংশীয় সহচরের বড় ভাল বাসিবেন। (১৩) নীচবংশেরা উজ্জয়িনীরের প্রতি অত্যাচার করিয়া আশ্রমের মত করিয়া লইবে। (১৪) রাজারা প্রজাদের প্রতি শুদ্ধ ইত্যাদি অজ্ঞায় কর স্থাপন করিয়া অত্যাচার করিবে। (১৫) নীচেরা অর্ধদান বাক্যদ্বারা

উচ্চ সংস্কার বুদ্ধিদানদের ত্যাগ করিবে। (১৬) দ্বাদশ বর্ষ-ব্যাপী চুক্তিক বৈশেষ হইবে।

মহামুনি এইরূপ অর্থ করিলেন। স্বয়ম্ভূতান্ত্র হইবে যে এই অর্থ স্বয়ম্ভূতান্ত্র দ্বারা করা হয় নাই, মহামুনি ঋতকেবলী অর্থাৎ সর্গজ্ঞ ছিলেন সেই জ্ঞান দ্বারা এই অর্থ বলিয়াছিলেন, অতএব ইহাতে কোনও প্রকার ভ্রম থাকি অসম্ভব।

এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে এক দিবস ভ্রমাবাহ আপনার শিষ্যদের নগরে ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে পাঠাইলেন ও স্বয়ম্ভূতান্ত্র গৃহস্থের দ্বারা উপস্থিত হইলেন। গৃহস্থের দ্বারা ভিক্ষা কাছে এক দোলাতে একটি শিশু শুইয়া এমন ভাঁকর করিতেছিল যে ভ্রমাবাহ দ্বাদশ বার ডাকিয়া ও গৃহস্থের কানে তাঁহার 'আপনান-সাবাদ' দিতে পারিলেন না। এই লক্ষণ দেখিয়া তিনি নিকট করিলেন যে দ্বাদশ বর্ষব্যাপী চুক্তিক আরম্ভ হইয়াছে। তিনি চন্দ্রগুপ্তকে সাধনান করিয়া দিলেন। যদিও চন্দ্রগুপ্ত জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন তথাপি তাঁহার মন্ত্রী বৈদিক যজ্ঞধর্মাবলম্বী ছিলেন; এই মন্ত্রীর চুক্তিক দমন করিতে বহু পশুবধ করিয়া যজ্ঞ করিলেন, কিন্তু কোন ফলই হইল না। জৈন-সম্রাট পশুবধ গাণের প্রায়শ্চিত্ত করিতে সজ্জন করিলেন; তিনি আপনার রাজ্যে পুত্র সিংহসেনকে অতিবিক্রম করিলেন ও স্বয়ম্ভূতান্ত্র নীলাগ্রহণ করিয়া শেষ জীবন গুরুর সেবা করিয়া কাটাঠিবেন স্থির করিলেন। সিংহসেনের মন্ত্রী আবার একজন বড় যাজ্ঞিক 'আনাইয়া' আরও বড় যজ্ঞ করিবার অমুখিত আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে যাজ্ঞিক পণ্ডিত ও ভ্রমাবাহর শিষ্যদের মধ্যে যজ্ঞ পশুবধির পাপ ও পুণ্য-সম্বন্ধে তর্ক আরম্ভ হইল; বহুকাল তর্কের কোনও নিমাংসা হয় নাই, অতএব যজ্ঞ ও স্থগিত ছিল, পরে যদিও জৈনরা তর্কে জয়ী হইলেন তথাপি বহু পশুবধ করিয়া বিতীয়া যজ্ঞ করা হইল।

ভ্রমাবাহ আপনার জ্ঞান 'দ্বারা জানিতে পারিলেন যে সমস্ত উত্তরাগণও দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনারজ ও চুক্তিক হইবে, প্রজা দ্বারাও বহুতাপে পণ্ডিত হইবে ও তাহাদের ধর্মজ্ঞান কলুষিত হইবে। তিনি ইহাও জানিতে পারিলেন যে নীলগিরির দক্ষিণে চুক্তিক হইবে না। ভ্রমাবাহ সহিত সে

সময়ে ২৪,০০০ শিষ্য ছিল। পাটলীপুত্রের মত সম্রাটশালী নগর ও তাহার উপকণ্ঠে এতগুলি ভিক্ষুর আহারীয় যোগাইতে সমর্থ হইল না, অতএব তিনি অর্ধেক অর্থাৎ ১২,০০০ শিষ্য সঙ্গে গইয়া দক্ষিণ দেশে যাত্রা করিলেন ও অপরদিকে স্থলভ্রম্ণ মুনির অধীনে উত্তর-ভারতে থাকিয়া ধর্মপালন করিতে আজ্ঞা করিলেন। এই বিঘ্ন দুটিকে তাঁহাদের সকল নিয়মগুলি পালন করা সম্ভব ছিলনা, সেইজন্য আহার ও দ্রব্য-সম্বন্ধে কতক নিয়ম শিথিল করিয়া দিলেন, কিন্তু নৈতিক জীবনে আরও কঠোরতা করিতে উপদেশ দিলেন। স্থলভ্রম্ণ-সমিতি ১২,০০০ ভিক্ষু সমস্ত আধ্যাত্মিক ছড়াছাড়া পড়িলেন, ভ্রম্ণবাহ দক্ষিণ দেশে যাত্রা করিলেন। চন্দ্রগুপ্ত মুনিবেশে গুরুর সেবা করিতে করিতে চলিলেন। স্বরণ রাখিতে হইবে যে তখন জৈন ভিক্ষু মাঠেই বিপণন থাকিতেন, তখনও শ্বেতাশ্বর-সম্প্রদায় স্থাপিত হয় নাই।

ভ্রম্ণবাহ নীলগিরির কাছে এক পর্বত-শিখরের কাছে আসিয়া জানিতে পারিলেন, যে তাঁহার মহাপ্রস্থানের (১) সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তিনি বিশাখমুনি বা বিশাখা-

চর্য্যকে দক্ষিণাত্যের ভিক্ষুদের রক্ষণ ভার দিলেন ও তাঁহাদের চোল ও পাণ্ড্যদেশে গিয়া ধর্মপ্রচার ও স্বয়ং পালন করিতে আজ্ঞা করিলেন। কেবলমাত্র চন্দ্রগুপ্ত গুরুর কাছে থাকিতে অসুখতি পাইয়াছিলেন। ইহার কয়েক দিবস পরে ভ্রম্ণবাহ ঈশ্বরহ লাভ করিলেন, চন্দ্রগুপ্ত সেইস্থানে গুরুর শ্রাদ্ধ করিলেন ও সেইস্থানে তাঁহার চরণচিহ্ন স্থাপন করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।

ভ্রম্ণবাহ মুনির তিরোভাব-স্থান এখন মহীশূর রাজ্যসীমা-মধ্যে শ্রমণ বেলগোলা Sraman Belgola 12°51' N. 76°33' E নামে প্রসিদ্ধ, সেখানে চন্দ্রগুপ্ত-স্থাপিত ভ্রম্ণবাহর চরণচিহ্ন ও সমাধিস্থান এখনও বাতীরা দেখিতে যায়। নিকটে একটি শিলালেখ দ্বারা চন্দ্রগুপ্তের উপস্থিতি জানিতে পারা যায়।

১। ভ্রম্ণবাহ মুনির তিরোভাব-কাল ৩০৭ খৃঃ পূঃ কিন্তু প্রসিদ্ধ জৈন-লেখক হেমচন্দ্র আচাধ্য পুস্তক হিসাব করিয়া খৃঃ পূঃ ২০৭ নির্ণয় করেন। হেমচাধ্য গুহ্যটাকায় সোমকী কুমার পালের গুপ্ত ও সভাপতিত্ব দিলেন। কুমারপাল শেষ কিন্তু সম্রাট জোয়ান পৃথ্বীরাজের পিতার মৃত্যুর, ১১০০ খ্রীশাব্দে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন।



অমর

—গল্প—

জ্যোতিষ্ময়ী দেবী

ছোট গ্রামের—তারো চেয়ে ছোটো অলেখা ইতিহাসে ফণপ্রভা অমর হয়ে বইল।

অমর অবিশ্রা মাহুর অনেক রকমে—ধর্ম, কীর্তি, বশ, ধন সব দিয়েই হয় আবার এমনিও হয়—। ভোলেনা তাকে অনেকদিন শোকে।

প্রতিদিনের জন্মমৃত্যুর কাহিনী মাহুরের নিত্য নিজস্ব না হলে মনের পাতে জাঁকা থাকে না। কিন্তু অসাধারণ হলে নাই বা হ'ল সে স্বজন বন্ধু আপনার জন, তাকে 'কাক পক্ষী'ও ভোলে না।—

ঘটনটা হয়েছিল এই :—

ফণপ্রভা বেকালে জমেছিল সেকাল থেকে তার বিয়ের সময় অবধি সারদা-বিলকে ঠাকি দিয়ে তার বিয়ে দেবার দরকার ছিল না। কেন না সারদা-বিল পাশ হবার অনেক আগে তার বাবা বহুর ছিল। তার ওপর মেয়ে ছিল প্রমদী, ফণপ্রভার একটুখানি আসো তাকে ছুঁয়ে ছিল; আর বাপ ছিলেন বুদ্ধিমান, স্বতরাং যেমন পানের গায়ে স্থপার দেখা—ততকাল সম্পন্ন করতে বিলম্ব করেন না।

বাকো বছরের বাড়ন্ত মেয়েটিকে শাক্ষিয়ে গুছিয়ে যখন সজ্জাবনের জায়গায় নিয়ে যাওয়া হ'ল, সবাই তাকে আশ্চর্য্য হয়েই চেয়ে দেখলে।—

বিয়ে, বর, বাসর, বাশি আলোয়, রাত্রি আনন্দে যেন বললল করতে লাগল।

বৃষ্ণক না বৃষ্ণক ফণপ্রভার মনটিও যেন উজ্জল হয়ে উঠল। মেয়ে মাত্র ছিল এতদিন, এখন যেন একজন হয়ে উঠল হঠাৎ। গরম-কাপড়ে সাজানোর আদরে তাকে আঁচড়িন ধরে সবাই এমন ঘিরে রাখলে, যেন হঠাৎ কোন্ সোনার কাঠির ছোঁয়া পেয়ে তার বালিকাকালের মনের মধ্যে আর একজন কে জেগে উঠল।

দিনের রাস্তার উৎসবের মাঝে তাকে তার ইচ্ছে, অনিচ্ছের সবাই সাধারণ; সবাই পাণ্ডার—না পারলেও। সাদিনীরা কেউবা একটু বড়, কেউবা সমান, সকলেই তার সঙ্গে সমান ভাবে সমান মনে করে কথা কয়, সে যেন সেদিন সকলের একজন। 'না হয়ে থাকে, হবে, হ'ল বসে'।

শস্তরবাড়ীতেও 'আল্লাম আসে। সেখানেও তাকে ছোট মনে করা হয় না, চারমাস আগে যে খোলাধুরার ঘরে ছোট মেয়ে ছিল সে আজ তরুণীদের রহস্তময় জীবনের চৌকটের ভেতরদিকে পা দিয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাধারণ নিয়মমতই ফণপ্রভা বাওয়া-আসা করে।

বহুর হুই পরে নিজেই অজ্ঞানতে সোশ্বশন অপরিণত বালিকা-মন নিয়ে যত আদরে পরিণত তত্বদেহে তরুণ জীবনের পথে এগিয়ে দাঁড়িয়েছে; একদিন খবর এলো তার বাপের বাড়ীতে, ফণপ্রভার বরের মৃত্যু হয়েছে।

ফণপ্রভার মা বাপ প্রতিবেশী বন্ধন সকলকেই কাঁদলে।

ছেলের জন্ম বত কাঁদলে, তার চেয়ে ঢের বেশী, অনেক বেশী কাঁদলে মেয়ের জন্ম :—মেয়ের অব্যব বালিকা-বয়সের জন্ম; মেয়ের চিরদিনের কঠোর সামাজিক রুদ্ধতার জন্ম; মেয়ের প্রতিমার মতন রূপের জন্ম।

ছোট গ্রামখানির সকলের বেগুন তার বিয়ের দিনে আনন্দের উৎসাহের শেষ ছিল না, তেমনি সেদিন হৃৎসেরও গীমা রইল না।

এইবারে আবার সাঙ্গানোর পালা আসে।—

বাকুল বেদনার ভাবনার স্বজনরা তার সাজ বদলার। আলতা শিঙেরে ঢেঁকী বারগাঠীতে সাজাওয়ার সময়ও কেউ তার পরামর্শ দেয় নি; সবাই হয়েছিল, আনন্দ করেছিল, জেগেছিল;—সাজিয়েছিল। এদিনও তার সত্যমত পরামর্শ

কেউ জিজ্ঞাসা করলে না, মানলেও না। বহানীতি চির কালের চিরবিধবা কোন এক গ্রামা বহীষ্যদীকে দিয়ে তার সাজ বদলালে।

রত্নীনা শাড়ী সেমিভের অঙ্ককরে এলো যাদা মাখার পেড়ে শাড়ী,—থান অবস্থ নয়।—গহনাও রইল গলায় আর হাতে। আচারেও তাই।—নানা অঙ্ককরে বিকরে কঠোরতা রুজ্জ্ব তাকে সাময়িক লুপ্ত করে সকলে মিলে কেন্দ্রে তাকে আবারও সাজালে, বিনাযারার আমূল পরিবর্তনের পথে এগিয়ে গিলে।

এর একদিন সেদিন সে যেমন সকলের সঙ্গে হেসেছিল, এবার সকলের সঙ্গে তেমনি ক'রেই কাঁদল।

জুয়ের শেকের গুরুত্ব, যেমন অবস্থ তার জানা ছিল না কিছুই।—

তার কাছে তার মনুনের মধ্যে তাকোনা আসে কেউ সাজাতে; না আসে গর পরিহাস হাসি রহস্য করতে; সন্নিবীণ সব তাকে যেন এড়িয়ে চলে। মাও তাকে খেতে ডাকেন না তাদের সঙ্গে।

দিন গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যায়।
কণপ্রভার মা বাপের জন্মসবই হয়ে যায়।
কণপ্রভার বয়স বেগোর শেষ সীমায় এসে পৌঁছেতে।
একোপাচুর গোছা ছাড়িয়ে সে খোঁপা ক'রে মাথার পাখে,
মাথার যেন চুল ধরে না।

হান ক'রে সরু পেড়ে শাড়ীধানি প'রে আসে, অস্বভাব অরজা করে—রুজ্জ্বতাকে যেন পরিহাস ভরে অতিক্রম করে—তার সর্গাঙ্গে রূপ যেন পুশিত বিকশিত হয়ে উঠছে।

তার মনের খোলাখোলে সেই একদিনের হাসির উৎসবের খেলা সেই দিনেই রয়ে গেছে, তারপর অস্বাভাব একদিনের কালার কোলাহলও সেইদিনের সীমাতেরই খেমে গেছে এদিনে আর তার্য শৌঁছয়নি, তাই তার চোখে মালিনা নেই, মুখে বেদনা নেই, শুধু কেমন এক করুণতা আছে। যেন বিশ্বগ্রন্থ আছে।

বারা সকলে মিলে একদিন তাকে সাজিয়েছিল তারা সবাই এখন ভাবে, কি করে গুকে—ওর রূপকে—ওর ত্রীকে

মাটি করা যায়,—কি করে ওর নব-পুশিত তত্বলতাকে স্কিকিয়ে দেওয়া যায়।—

উৎসবের ঘরে বার আছরান আসে না, ডাক পড়েনা, তার সমস্ত বেহা বিরে অত উৎসব কেন?

পাড়ার গৃহিণীরা বলেন, 'কণুর মা, তোমার কণুকে এবার 'বার বেহা' করাও। যেহেতু নিষ্ঠা হোক। 'নিষ্ঠা-কিষ্ঠে' না হলে কি বিধবা মাহুয় মানায়? আর ছেলেমাছুর ক'রে রেখেচোনা।'—

মার কানে যেন শোহা গলান ঢেলে দেয় 'বিধবা' শেনা।
কিন্তু কি-না বলুয়ে।

এমনকির সময়ে কণপ্রভাকে একদিন সকালে আর পাওনা গেল না। গ্রাম এককোনার চুপ হয়ে গেল। সমস্ত কথা মনের ভেতর তোলপাড় করে সকলের—বাইরে আসবার পথ খুঁজে পায় না যেন। সন্নিবীণা ভাবে, কণু গেল?—কণু বাবে এতো মনেও হয়নি! কার সঙ্গে? কি ক'রে? কোথায়? মনে মনে প্রশ্নের শেষ সীমা থাকেনা, কিন্তু কেউ মুখে জিজ্ঞাসা করে না।

বহীষ্যদীরা ভাবেন,—মেজতী খেল কোথায়? জুয়ে মরেনি?—কি হল? বিধবার হয় না অজ কিছু যেন—
স্তোত্রাও শুধু জর্জরা জর্জরা বলে নিশাস ফেলেন।

কণুর মা কি ভাবেন কে জানে। বাণও হুত ভাবেন কত কি—কেউ কারকে বলেন।

শুধু চিরবিধবা মাদিক্বিনী ঠাকুরাণী যিনি তার সাজ বসলে ছিলেন সমস্ত নব বিধবাকে বিন্দি বাসান, তিনি বলেন, অজ কাকে এককম করে,—'তপনি বলেছিলাম কবির মাকে মেয়েকে নিষ্ঠা শোহাও, বার বেহাও করাও। দেখলে এখন কি হল?—আমার সাত বছরে বিয়ে হল, আট বছরে বিধবা হই, তবু বছরে খুন্তরা পেরাগে মিলে গিয়ে মাথা মুড়িয়ে গিলেন। অত রূপ-বৌয়ের পরকথা কি? বয়েসকালে ও সবারই মতো—' যাকে বলেন সে সন্তানের মা। সে শুধু নিশাস ফেলে বলে, 'কিন্তু দিদি কণু মেয়ে হতে ভাল ছিল'।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,—সবাই অমানি ভাগই থাকে—তোরাও এক কথা—বার জন্মে রূপ তার সঙ্গে তা পারিয়ে দিতে হু'—

মাতকিনী ঠাকুরাণীর কবার কঠোর স্বরে—অপরা আর কথা কইলে না।

মা বাপ ছাড়া যখন সকলে কণপ্রভার কথা ভুলে গেছে গ্রাম, এমনকির সময়ে একদিন কণুর মা রাহিবেলা খিড়কী দরজা বন্ধ করতে গেছেন—ছায়াগর মতন কি একটা সরে গেল যেন।

তিনি 'বাণো' বলে চমক উঠেছে—সে অতি ত্রস্ত ত্রস্ত-কণ্ঠে বলে, 'না'।

মা যেন সেইখানে পাথর হয়ে গেলেন।

ধানিকটা পরে কি মনে হল যেন—'আপত্ত হ'য়ে তার সুন্দর দিকে, সর্গাঙ্গের দিকে চাইলেন,—কিন্তু সে মিলিয়ে যায়নি তখনা, মিলিয়ে গেলো না; দেহাঙ্গের পাশে তেমনিই দেহাঙ্গ মিলে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

না, মাহুতাই, কণু! ওর মনে হচ্ছিল হুত 'অজ কিছু'—
তাই হলেই ভাল ছিল যেন।

'অমায়' হয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ চেয়ে থেকে বলেন, 'এত রাত্রে কাকোকে এলি?'

মার কণায় বোধ হয় তার ভরসা হল। সে কেঁদে ফেলে—
—চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল।

মা নির্ভীক মূর্তির মতন তার দিকে চেয়ে রইলেন। বয়া যারা, মনতা সে দৃষ্টিতে ছিল কিনা। কে জানে, শুধু এক বিরাট প্রশ্ন—বার উত্তর কণু কণপ্রভার দিতে পারে না, তাই তাঁর চোখে দৃষ্টিতে সর্গাঙ্গে ছিল।

সে চৌকাঠের ওপর ব'সে পড়ল। এইবারে মা দেখতে পেলেন, সেই স্তম্ভ তহুরেখানি আরও ক্ষীণ—আরও পাতঙ্গা যাদা ছলল হয়ে গেছে যেন। মুখ বেধা যায় না, আঁতর্মে বেধা গেল সে মুখও আর নেই।

এবারে মার কি মনে হল, বলেন, 'গুকে ডাকি?'

কণপ্রভা ব্যাকুল হয়ে উঠল, বলে, 'না, না, ওমা আমি পারব না'—

মা কটন হ'য়ে উঠলেন। 'কি পারবিনে? তাহলে কি করব?'

মেয়ে আবার মাথা নীচু করে মাটিতে মিশে যেতে চাইলে।
'তাহলে গুকে বলি?—মা আর অপেক্ষা করলেন না।

বাণী জেগেই ছিলেন। গৃহিণীর কবার তাঁর মুখ কঠোর হয়ে উঠল।

'কেন এসেছে?—কি বলে?—'—তিনকহুরে পিতা প্রশ্ন করলেন।

শিতার কঠোরতায় মায়ের মনে হুত করুণা হল। তিনি চুপ করে রইলেন।

'কেন এসেছে? বলগে, আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই ওর—চলে যা'ক'—পিতা আবার বলেন।

মায়ের কি মনে হল, বলেন, 'রাষ্ট্রীরা রামাঘরে পাড় খাকতে বলব? এত রাষ্ট্রির?'

বাপ এবারে একটু উজ্জ্বল তিনকহুরে বলেন, 'এতগুলো রাষ্ট্রির দিনের বাবুবা যে করতে পেরেছে এতদিন—তোমার আমার অভাবে—সে আজও পারবে।' বলে দাঙগে—

মা তাঁর হৃদয়, ধানিককণ দাঁড়িয়ে থেকে খিড়কীর দিকে গেলেন।

দেখানে কেউ নেই। আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে দেখলেন কেউ নেই। তবে কি চোখের জল? তবে কি অজ কিছু? বা ভেতরছিলেন আগে, তাই?—তবে কি?—

মামনে পুতুর ঘাট, বাঁয়ে বাঁশ কাঁড়,—দানকৈ পথ, হুতুখে ওপারের ভাল মারিকেল আন কাটালের বাগান। সব ঘন অন্ধকারের জমাট কাণো চোখ দিয়ে অন্ধ হয়ে গুকে, গুতর হাতের প্রবীণতায় দেখতে লাগল যেন।

মা মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন 'কণু?'

কেউ জবাব দিল না। অন্ধকারের কোনো দিকে কোনো ছায়া কিছু নড়ে উঠল না। মা আবার ডাকেন, আলো নিয়ে একটু এগিয়েও যান।

না, ভায়াও নেই,—কায়াও নেই।—

গ্রামের নির্জন পথে একটু দূরে হলেও কণপ্রভার কানে একবার ভমনীর আছরান পৌঁছল, কিন্তু শিতার শেষ কথাও পৌঁছেছিল: পাছে দাঙা খেতে, পায়ে হাঁট খেতে, কাঁটা জুত, নিজের পায়ের শব্দে—বনের পাতার মধ্যর ক্ষমিতে নিজেই অস্তরীক হতে হয়ে সে ক'রে—'পথের কোন্ দিকের উদ্দেশে যাচ্ছিল কে জানে। তার কানে শুধু বাজছিল,

ওদের ছেড়ে—এতদিন যে নিজের ব্যবস্থা করতে পেরেছে,—সে আজও পারবে! লজ্জা, দ্বিধা, ঘৃণা তার হৃদয়কে বেদনাকে কষ্টকে ভয় ভাবনাকে কোথায় ডুবিয়ে তলিয়ে দিয়েছিল।

গাঙ্গুলীদেব বৈঠকখানা। দাবা আর গল্পের বৈঠক। ক্ষুব্ধ বাবাও প্রায় আসেন। সেদিন তিনি সকাল সকাল ফিরেছেন। গানের সন্তোজ সহরে অর্থাৎ কাছাকাছি সমর কাছারীতে শিক কাজে গিয়েছিল। সে দিন ফিরেছে। ভিড় কানে বাওয়ার পর সে বলে,—এবারে সহরে একটি খারাপ খবর পেশাম।

গাঙ্গুলী উৎসুক হয়ে বলেন, 'কি খবর? কাদের?'
'আমাদের কাকর নয়,—ঐ রায় মশাইদের—'
'কি খবর—রায় মশাই তো এতক্ষণ ছিলেন, কই কিছু বলল না তো?'

সত্যক্স বল্ল—'উনি জানেন না। শুধু মেয়েকে সেদিন সহরে পেয়েছে,—জলে ডুবে মারা গেছে।'
'সে কি যে?—এতদিন পরে? এত কাছে? ছিল কোথা?'

'তাঁকে কেউ জানে না। সেদিন নৌকো থেকে নেবে দেখি ঘাটে খুব ভিড়। একটি ঝাঁলোক ডুবে বাচ্ছিন্ন দেখে বুঝি এক নৌকার মালিক তাকে তোলে, তার আর জ্ঞান হয়নি। পুলিশ সব লিখে নিয়ে তাকে হাসপাতাল পাঠাবার ব্যবস্থা করেছে—এমন সময় আমি গিয়েছি।'

'তারপর?'

'তারপর—আমার কৌতূহল হওয়াতে একটু উকি দিয়ে দেখি, ঠরং দেখে ক্ষুব্ধ মত চেহারা বেন। অবশ্ব চেনবার মত নয় তবু মনে হল।'

'তারপর, তুমি বল্ল কি তাদের? বসনি তো?'

'না!—আমি সরে এলাম সেখান থেকে। হাসপাতালের ডাক্তার তার সঙ্গে আমার আলোচনা আছে, তাকে পরে জিজ্ঞেস করলাম এমনিই বেন,—'মেয়েটি আছে না মারা গেছে? সে বল্ল, সে ছিলই না,—দুগল শরীর ছিল, প্রায় কিছুই ছিল না অবস্থা—আর তার শারীরিক অবস্থাও বাতাবিক ছিল না তাইতেই হয়ত—বল্ল।'

গাঙ্গুলী মশাই স্বস্তি হয়ে রইলেন। সত্যক্সও।
'তারপর?—অনেক পরে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন।
'আর কিছু বিশেষ জ্ঞানকে পারলাম না। ডাক্তারটি বল্ল—'আজ্ঞাওতাই হবে। আমি চুপ করেই রইলাম।'

দুজনেই চুপ করে রইলেন।
অনেকক্ষণ পরে গাঙ্গুলী বল্লেন 'হবে বা!—দেখ ঐ জন্মে আমার ভাইকে-টা—আমি সব আচার-ব্যাপারে পুত্র নিয়ম করিয়ে দিয়েছি। সেই মরলো ছ' মাস আগেই মরতে পারতো।'

সত্যক্স কোনো প্রতিবাদ করলে না।
নিষ্ঠা সংঘম ব্রহ্মভা-সম্বন্ধীয় পুত্র বিবেচনা বৃদ্ধিকে, মনুষ্যকে ছাড়িয়ে তার সত্ত্বের গুণের দ্বন্দ্ব কখন প্রভার নীলাভব্র নিমজ্জা পাড়াশ দেখখানি, বালিকা মুখখানি ভাগছিল।

কথা বাতাবিক-গহিতে ক্ষুব্ধ মা-বাবার কানও পৌঁছবে। শুধু তার শারীরিক বৈলক্ষ্য বাদ দিয়ে।
মা বাপ পাথরের মতই শক্ত হয়ে রইলেন। চোখে জল এসে জমে যায়, কবচত পথ পায় না। কথা তাঁদের আগায় আগে, এসে আড়ল হয়ে যায়, জমতি বেধে যায়।
শুধু বেন শোক নয়, গুম নয়,—প্রাণও আঘাত পাওয়ার মত কি-একটা অস্তিত্ব বিমূর্ততা—তার অসীম রানি অবগাধ-ভরা মন।

মা শুধু ভাবেন, তবে কি সেদিন সে এসেছিল শেষ দেখা দিতে?—যেমন শোনা যায় সব?—আহা কেন শব্দ করে নেননি!

মনে মনে কেবলি হিসাব করেন সে দিনটা কবে ছিল? এ খবর পাওয়ার—এই ঘটনার আগে না পরে? কিন্তু গ্রামের কেউ তো জানে না যে কণ্ঠ একদিন এসেছিল। কি করে জিজ্ঞাসা করবেন তাকে?

মৃত্যুর দিনটা সে কি তিনি ফিরিয়ে দেবার পরে? সেই 'জন্মেই তাই কি সে—তাই কি?—জননী! শিউরে ওঠেন।
সন্ধ্যার ছায়া ঘাটে ঘনিয়ে আসে, ওপারে অন্ধকার নেমে আসে, অন্ধকার-ভরা কোণে কোণে তিনি চেয়ে থাকেন, কণ্ঠ কি আর একদিনো আসবে না?

আর তাঁর ভয় নেই, লজ্জা নেই,—কণ্ঠ তো নেই আর!

সঙ্গীতে দন্দ

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

বাংলাদেশে সঙ্গীত নিয়ে আকর্ষণ একটা দৃশ্যের চেউ উঠেছে দেখতে পাই। এ দৃশ্য দেখে এটা হৃদয় করে যে সঙ্গীত-সম্বন্ধে বাংলার শিক্ষিত সমাজ-বিশ্বের নিদর্শ্য ঔপাধিক আর নেই—হিন্দুস্থানী ওস্তাদী সঙ্গীতের ভাগ্যমন্ডল নিয়ে তাঁর আলোনার মধ্যে যে প্রখর অঙ্গুষ্ঠাঙ্গার পরিচয় পাওয়া যায়, এটিকে আমি বিশেষ স্তম্ভলক্ষণ ব'লেই মনে করি। এতদিন আমাদের উচ্চসঙ্গীত শুধু রাজা কমিউনিষ্টদের মঙ্গলিশের শোভাই বর্জন করে এসেছিল—আজ রাজা-কমিউনিষ্টদের ভাগ্য-বিশ্ববর্ষের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত লুপ্তির পথ ঘাবে না, যদি জাতির প্রকৃত প্রাণব্রজ শিক্ষিত-সম্প্রদায় সঙ্গীতে আকৃষ্ট হন ও মনোভাবের সঙ্গীতের সেবা ও সাধনা করেন। শিক্ষিত-সমাজে সঙ্গীত নিয়ে যে চিন্তাতরঙ্গ ও বিচলনমুখী হওনের ঘাত-প্রতিঘাত চলছে তাতে আমি বিশেষ আশারই চিহ্ন দেখতে পাই।

অবশ্ব বাংলা গান সঙ্গীতের এক নতুন ক্ষুদ্রাঙ্গা ইতিপূর্বে বহিয়ে নিয়ে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ। তবে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টত কবি—তাঁর সঙ্গীত তাঁর গীত-কবিতাকেই মধুর ও উজ্জল করে তুলেছে। তবু একথা মতা, যে সঙ্গীতভগতে তাঁর রস অসামান্য। তিনি ওস্তাদ-সঙ্গীতের কোনও মস্তারের চোঁা করেননি—ওস্তাদ ব'লে নিজেকে তিনি মনেও করেন না কিংবা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মূর্ছনা তাঁর রসপার্শ্ব প্রাপ্তে বেভাবে প্রবেশ করেছে তা থেকে তিনি আপন অলোক-সামান্য প্রতিভাবলে নিজ-রচিত গীতির উপযোগী উপকরণ অনেক নিজেছেন। তিনি ওস্তাদ না হ'লেও সমস্ত পার বুই উৎসবের। আবাসা তিনি সত্যিকারের হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-প্রতিভার সম্পর্কে এসেছেন। বহু জটিল গান, কাশিন আলি বা ও উজীর খাঁর ব্যালাপ আজ আমাদের কাছে এক অশ্রুপ করবার বস্তু ও সঙ্গীত-গৌরবের ক্ষুদ্র মাত্র কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এসব বহুবার শুনেছেন। বহু ভর্তি রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব

বাড়ীতেই দীর্ঘদিন অবস্থান করেছেন। হস্তান্তর হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ ও মধুরতম বাকী কিছু তা তাঁর জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে—তাঁর জ্ঞাত ও মধ্য চেতনার স্থান পেয়েছে। তাঁর রচিত বাণী গানে রাগ-রাগিণীর অনেক নিপুণ মিশ্রণ তিনি করেছেন। সেগুলির দিকে নজর দিলে আমরা দেখতে পাই—রাগ-রাগিণীর যে রূপাবলী তাঁর গানে অস্বত-হুলত মঙ্গল বিশ্রামে মাজানো রয়েছে, তা সত্যি অনবদ্য—হাল আমলের ওস্তাদদের কন্ঠে রাগের সে সমবীড় বা বৌঁচ ও রাগ-গঠনের যে-সব বিশিষ্ট রেখা আমাদের দেখি না। আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করার এই যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে তাঁনের বাহানা কোথাও প্রকাশ করেন নি।

'সঙ্গীত-বিজ্ঞান-প্রবেশিকা'র শ্রাবণ-সংখ্যায় নাননীয়া লেখিকা শ্রীকৃষ্ণ ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী মহাশয়া লিখছেন "হাসি তিনি (রবীন্দ্রনাথ) চেমন ব্যবহার করেন না। মৌ ভা বৌঁচের দ্বারাই গান অলঙ্কৃত করেন। সকলেই কই বীকাল ক'রে সুভসি আকর্ষ করে না বলে' অনেক মনে করে যে তাঁর গান বেশি সরল ও নিরীভাষণ। তাঁর আধুনিক গানে অল্পস্বত তান বা ব্যবহার করেন, তাও স্বরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ,—গায়কের ইচ্ছানী তেমন ব্যবহার করেন নয়।...গান থামিয়ে অকারণ গলার কস্মৎ বা রাগের রূপ দেখাতে গেলে গানের বসনক হয় মাত্র এবং শ্রোতারও বিরক্তি দেখা হয়। অবশ্ব হিতবাক্যের মত ওস্তাদী গানেরও ভাল গায়ক এবং শ্রোতা উভাই দৃষ্টভা বীকায়। কিন্তু সে দূরবস্তার দ্বাবাধা হচ্ছে তাঁনের মতো বাড়ানো নয়—সরল স্বকন্ঠে হুজাবে বস্বর সঙ্গীত, অন্নমাত্রায় সেবন করানো। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে এই ছোটখাটো মানদণ্ডই তাঁনের হসনা দেখা দিয়েছে।"

তানসেন ও সৌমিগণ (তানসেন-বাসীরা শুনিগণ) ভারত যে সঙ্গীতের ধারা এনেছিলেন তাতেও আমরা গানে স্বরের

সঙ্গে কথার হৃদয় সামঞ্জস্য পাই—কথাকে বার দিয়ে হৃদের বিস্তার তাঁরা গানে কখনও ব্যবহার করেন নি—বিস্তারের জন্য তাঁরা ‘আলাপ’কেই যথেষ্ট মনে করতেন। সেনী-সঙ্গীতের অবিচ্ছিন্ন নিবন্ধন আজ পাওয়া সম্ভব নয়, তাই অনেকে একথা না জানতে পারেন। বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বীণা-সঙ্গীত-নাটক পরলোকগত উজ্জীর বা তানসেনের দৌহিত্র বংশধর ছিলেন। তিনি শুধু ঋণেই নয়, খেলাপ ও হুঁরিও গানের পথ বার দিয়ে তাদের “হা হা” রব পছন্দ করেন না। তিনি গানের পর গুলি অবলম্বন করেই সেগুলির অর্থকে আগে মধুর করে প্রকাশ করার জন্মেই বেন তাদের ও উপলব্ধির স্বাধীনতা অধিকতর বোধ করেন। বাণীর বরষায় শব্দের শ্রীকৃষ্ণ নিপুণত্ববাহুর মতো উজ্জীর বাণ ও হুঁরি খুবই ভালবাসতেন এবং হুঁরিকে তিনি খেলার চেষ্টাও কোনও কোনও বিষয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। উজ্জীর বাঁ বহু শত উৎসাহে হুঁরি নিয়ে রচনা করেছিলেন ও হুঁরি গানের এক অভিনব পথ বলে দিয়েছেন বা হজা হরের কারুকলায় ও রসালুতার প্রচলিত হুঁরিকে বিরস করে যায়। উৎসাহ পাঠ-পাঠিকা উজ্জীর খাঁর পুরের কাছে উজ্জীর খাঁর গীত-প্রতিভার পরিচয় পাবেন—ঋণদ খেলাপ এবং হুঁরিতও পদের পথে হৃদের সামঞ্জস্য, হৃদের অতুলনীয় গঠন-সৌন্দর্য ও হজা মনোহর কারুকলা মুগ্ধ করেন। তিনি বর্তমানে কুমার কেমেন্সের মতো হাজার মাসখয়ের আশ্রয়ে কলকাতায় আছেন।

কিন্তু উজ্জীর বা হুঁরির বিশেষ অমরগী হ'লেও ঋণদের চেয়ে হুঁরির সৌন্দর্য্য ও লালিতা অধিক একথা কখনও মনে করতেন না। উজ্জীর বা হুঁরির একজন শ্রেষ্ঠ শ্রষ্টা ও গায়ক; তাই একথা বলা চলে না যে তিনি হুঁরির রস, অমৃতত্ব কর্তে পারতেন না। রাগ-রাগিণীর নিপুণ নিশ্চয়, রঙের আলো-ছায়ায় খেলা, দ্রবরাগের বিভিন্ন প্রকাশ-মাদুরী, প্রাণের স্বাভাবিক হাসিকান্নার সীলান্বিত আবেশন, এ সবে হুঁরির দক্ষতা কতটা তা তিনি জানতেন কিন্তু তৎসত্ত্বেও গভীরতর রস-স্বাভাবিক ঋণদের ক্ষমতার শ্রেষ্ঠতা তাঁর অমূল্যবিশিষ্ট জ্ঞান ছিল এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্গালাপ ও কঠ-সঙ্গীতের মধুরতর ও গভীরতর অভিব্যক্তি ঋণদ ও ঋণদাদ আলাপকে অমরগণ করতেন। গভীরতর ঋণদ ও ঋণদাদ আলাপকে অমরগণ করতেন। গভীরতর ঋণদ ও ঋণদাদ

হুঁরি গজল প্রভৃতি গানে আনন্দ পাই আমাদের প্রতিদিনের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার “মাকে সৌন্দর্য্যের একটা মোনালিষা নয় রঙিন পর্শ। বা কবিতা, তাকে বহুতর হৃদয় করে পাওয়া যায়, আশ্রয় করা যায়, মাথায় তা চার। হৃদয়, বাগানে রোজ ফোটে আবার শুকিয়ে যায়, যা চিত্রভাষা নয়, তারও একটা মাদুরী আছে—বা ছবির বাণে করে বাণে, তাও বহুতরফাল আমাদের চোখের আড়াল না হচ্ছে, তার স্বাভাবিক আমাদের মন কেড়ে নেয়, ঘরিত্তি জানি সে স্বাভাবিক মাকে ঢাকা রয়েছে। অমর-বিরাগের গোপন অমরবিশ্ব।

ভারতের গভীরতর সঙ্গীতে কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের অমরগণ বিরাগ বিরহ মিলনের হৃদ পাই না—ভারতের রাগ-রাগিণীতে পাই বিশ্বের নিত্যকালের অন্তর-গাথা। সে গান ভোমার আনন্দ নয়—মায়া-গানের মর্ম্মবাহী বহন করে তা প্রকাশ করেছে। তাতে যে অশ্রু আছে তা অশ্রুবিশ্ব নয় তা অশ্রুর আশ্রয়—আবার তাতে যে আনন্দের বাঁধা নিয়ে আসে তা কবিতার নয়—তা চিত্রের মানব-জীবিত চিত্রবিনয়ের তাপ-হরণের জন্ম। প্রতি রাগ-রাগিণী বিরাগের এক একটা বিশিষ্ট ভাবের অভিব্যক্তি—রাগ-রাগিণীর মাঝে এই ভাবগুলিই বিশেষ বিশেষ ধরণ ও কন্ডিয়া নিয়ে জীবন্ত ও মৃতিমান হয়ে উঠেছে।

ভারতের গভীরতর সঙ্গীত হা, তা এই হুঁরি মাটির জিনিস নয়, তার কেন্দ্রবিন্দু গভীর, কোনও আনন্দময়লোক। তা মস্তো ব'য়ে আসে বিরাগের করণ্য, জগৎকে অমৃতের পর্শ দিতে। কবি গেয়েছেন—

“সর্ব্ব তব বহু কবিত্ব
মস্তো থাকে গুণে হৃদয়ে বর্নিত বিশিষ্ট মেঘবাণি”

কিন্তু স্বামী হরিশ্রবণ এবং তানসেনজী মিশ্রও প্রেমবাণী চান নি—তাঁরা চেয়েছিলেন, জীবিত স্বর্গীয় প্রেমও অমৃত জগৎ নাহিত। তাঁদের সে উজ্জীৱী আকাঙ্ক্ষা ও সে আকাঙ্ক্ষার বা কিছু সাফল্য তারই আভাষ-বিস্তার আনন্দ পাই তাঁদের স্বাভাবিক—ঋণদ ও আলাপ।

তবে এটা সত্য যে জগতে সবার অমৃতাহারী হবেন না; অমৃত ছাড়া কোনও ব্যক্তির সম্ভাবনা জগৎ থেকে আর অমৃত হ'লে বিশ্ব জারখার হ'লে। যার বা খাওয়া, তার

পক্ষে তাই উপযোগী। জগৎ বিভিন্ন, মানুষের প্রাণবস্তুর গঠন বিভিন্ন—অমৃতভুক্তি-ক্ষমতা বিভিন্ন। এই বৈচিত্র্যের বিশেষ অসম্বয়—সেচ্ছন্দ্য ও বাস্তবতা। প্রকৃতিকতবে কঠিনতবে একথা মানতেই হবে। শিল্পকার কেবলও বৈচিত্র্যকে আনন্দ বাদ দিয়ে পান না। ঋণদ, খেলাপ, টারা, হুঁরি, গজল, সঙ্গীতের এই সব বিভিন্ন প্রকাশের বিভিন্ন সার্থকতা রয়েছে—এগুলির কোনওটিকে বাদ দিয়ে নয় কিন্তু ব্যাঙ্গালাপ ব্যাঙ্গালাপ প্রত্যেকেরই উপযুক্ত বিকাশে এদেশে সঙ্গীতের পুনরুত্থান সম্ভবপর। ঋণদের বিকাশের আর কোনও পথ নেই—একথা আমি মনে করি না, এর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনায় তার আরও শেষ হয় নি—হুঁরি গজলও বাংলায় গানে নতুন প্রাণ এনেছে আমি বিশ্বাস করি। ঋণদকেও নিউজিডমে পাঠাতে হবে না, আবার হুঁরি গজলকেও উন্মার্গ উজ্জীৱণ ব'লে একঘরে করা চলবে না। ঠিক স্থানে প্রত্যেক জিনিসের স্থান না জানলেই বা কিছু গোলাযোগ গঠে। কিন্তু এ হৃদের কোনও সার্থকতা আছে আমি তা মনে করি না।

‘ওস্তাদ’ যে প্রকৃত রসজ্ঞানী নন তা রসিকমাজেই জানেন। ওস্তাদী জিনিসটা সঙ্গীতের মুখ্যভাষা ছাড়া আর কিছু নয়। ভারতের প্রকৃত সঙ্গীত-শিল্পীগণ ‘ওস্তাদ’ শব্দে অভিহিত হন না। তাঁদের গায়ক, গুণী, প্রভৃতি বলা হত। ‘সেনীগণ’কে কেহ ‘ওস্তাদ’ বলে ডাকলে তাঁরা অত্যন্ত অপ-মানিত বোধ করেন। ভারতের অধিকাংশ গায়ক ‘ওস্তাদ’

হতে পারে কিন্তু প্রকৃত গুণীর স্থান পাওয়া একবারে অসম্ভব কিছু নয়। ভারতে পূর্বে গুণীরাই স্থান পেতেন। আজ শিকিত সঙ্গীতরস-শিখারগিকে এ উচ্চতর প্রভেদ বুঝতে হবে নৈলে ভুল করা কিছু স্বাভাবিক নয়। এর মাধ্যমিক ভিত্তির রসাহুতি ভিন্ন আর কিছু হ'তে পারে না। ভারতে ভগ্ন সঙ্গীতের অমর নাই কিন্তু তবু অস্বাভাবিকতার কোনও সত্যকার পরিচয় কোথাও নেই একথা যেমন বলা চলে না—তেমি বহু কর্ণশব্দ হৃদের মল্লবাহারী অস্তিত্ব সত্ত্বেও ভারতে প্রকৃত গুণীর পরিচয় একবারেই হ্রাসিত তা বলতে পারি না।

‘ওস্তাদী’ সম্বন্ধে পরলোকগত তানসেনের বংশধর ঋণদী-শ্রেষ্ঠ মিরা মহম্মদ আলির কাছে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা শুনেছিলাম। একবার শিখার রাজসভায় ‘একজন ‘ওস্তাদ’ এসে খুব বিকট রকমের খাওয়ারবাণীর তান ভাঙ-ছিলেন। মহম্মদ আলি বাঁ সাহেব সেখানে ছিলেন—পাশে বসেছিলেন এক মৌলবী সাহেব। ওস্তাদের গান শেষ হবার পূর্বেই মৌলবী সাহেব হঠাৎ যেন মত্ত একটা সত্য আবিষ্কার করে ফেলেন এবং হঠাৎ উৎসাহ-বীজ উঠকতে মহম্মদ বাঁ সাহেবকে সোধেন ‘ক'রে বয়েন, “বী সাহেব! আজ বুঝলাম—সঙ্গীতকে কোরাণে কেন ‘হারাম’ বলেছে। এতদিন ‘আপনার মধুর শুভবাহার গান ও ‘আলাপ শুনে তা বুঝতে পারি নি—কিন্তু আজ এই খাওয়ারবাণী কোরাণের প্রকৃত তাৎপর্ষ্য আমার বুঝিয়ে দিয়েছে।’



কবিরাজ কিরণচন্দ্র কণ্ঠভরণ

শ্রীশুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সমগ্র ভারতবর্ষে জাতি-হিসাবে বাঙ্গালী এখানে যে বিশিষ্ট অবদান লাভ করিয়া থাকে, তাহা গভিরা তুলিতে বাঙ্গালার প্রবাসী সন্তানেরা যে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করিয়াছেন একথা আর আর নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালী জীবিকা-অর্জনের জন্ত বা অল্প কোন কারণে প্রবাসী হইয়াও তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে নাই। শুধু যে দেশের সহিত এই প্রবাসী-সম্প্রদায় একটি গভীর বোধ্যত্ব

রক্ষা করিয়া আসিতেছেন তাহা নয়, বিদেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনেও তাঁহার গভীরভাবে নিজেদের ছাপ রাখিয়া বাহ্যেহেমন। প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে বাঁহারা অধিকৃত তাঁহাদের কথা তাই আলোচনা করিবার প্রয়োজন চিরদিনই থাকিবে।

দিল্লীর স্বাধী কবিরাজ কিরণচন্দ্র কণ্ঠভরণ এমন একজন কৃতী প্রবাসী বাঙ্গালী। চিকিৎসক হিসাবে তাঁহার অসামান্য যোগ্যতা, নানা বিজ্ঞান তাঁহার অধিকার বানিজ্য বাবসায়ে সাফল্যলাভের জন্ত শুধু তিনি অস্বীয় নহেন। এসমস্ত গুণেরও অদিক কিছু তাঁহার ছিল। তাঁহার কর্মক্ষেত্রে শুধু তাঁহার চিকিৎসা বাবসায়েই মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিতে তিনি রেনে নাই। প্রবাসের বৃহত্তর সামাজিক ও নাগরিক জীবনকেও তিনি সন্মুক্ত করিয়াছেন। এদেশের আয়ুর্বেদের আধুনিক প্রচারক হিসাবেও তিনি যে ছদ্ম দৃষ্টান্ত পরিচয় দিয়াছেন তাহার জন্তও তিনি চিকিৎসক সমাজের শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকিবেন।

কিরণচন্দ্র কণ্ঠভরণ দিল্লীর প্রথম বাঙ্গালী কবিরাজ।

ইংরাজী ১৮৬৪ সালে বর্ধমান জেলার নওপাড়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম বিপিনচন্দ্র দাস। মাতৃ বহুর বয়সে শিকার উদ্দেশ্যে কিরণচন্দ্র কলিকাতার মাতুলালয়ে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতুল ছিলেন তরানীক্সন শ্রেষ্ঠ কবিরাজ ব্রজেন্দ্রকুমার কণ্ঠভরণ মহাশয়। প্রামে নর্যাল কুল এবং পরে সংস্কৃত কলেজ হইতে ব্যাকরণ, ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে অধ্যয়ন করিয়া কিরণচন্দ্র ধোঁড়ন তাহার বয়সে মেট্রোপলিটান কলেজে পাঠ্যরত্ত করেন। সেখানে তিনি বি এ পাঠ্য অধ্যয়ন করেন। শোনা যায় বি-এ পরীক্ষা দিবার পূর্বেই আত্মীয়স্বজনগণ তাঁহাকে চাকরী গ্রহণ করিতে পীড়াপীড়ি করায় নিতান্ত উগ্রাক্ত হইয়া কিছুকালের জন্ত তিনি কলেজ এবং গৃহ পরিত্যাগ করিয়া

ছিলেন। চাকরীর প্রতি এমনই ছিল তাঁর আত্মরিক বিতৃষ্ণা।

কলেজে অধ্যয়নকালেই তিনি তাঁহার মাতুল মহাশয়ের কাছে আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক ব্রজেন্দ্রকুমারের পূর্ণে আর কেহ ছিলেন না। কিরণচন্দ্র উপযুক্ত গুরুর কাছে শিক্ষিত হইয়া শিক্ষা-বিষয়ে চিরদিনই উদার দারবাণেয় করিতেন। মাতুলের মৃত্যুর পর কিরণচন্দ্র মাতুলের পরিত্যক্ত আসনে উপবেশন করিয়া চর্চিশ বৎসর বয়সে চিকিৎসকের ব্রত গ্রহণ করেন। এই সময়কার ‘চিকিৎসা সম্বলনী’ নামে একখানি আয়ুর্বেদবিষয়ক গতিকায় তাঁহার সংকলিত একরূপ লিখিত হইয়াছিল—“তাঁহার (ব্রজেন্দ্রকুমারের) ভাগিনেয় কিরণচন্দ্র যে মাতুল ও মাতামহের কৌতুক্য বিষয়ে উদ্যমী হইবেন না, সে আশা আমাদেয় বিলম্ব আছে।”

কলিকাতায় দশ বৎসর ধরিয়া তিনি চিকিৎসা-বাবসায়ে লিপ্ত থাকেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে দেখানো একজন হুচিকিৎসক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে বাঁহারা এখনও জীবিত আছেন তাঁহারই নিষ্কয়ই সে কথাই মাফা দিবেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে কলিকাতার একটি শিক্ষানিকেতনের ইতিহাসের সহিত তাঁহার এক অবিচ্ছেদ্যযোগ-ঘটনা যায়। Kumar Radhaprasad Institution-এর প্রতিষ্ঠাতা পোতার স্বাধী কুমার রায়দাশরায় মহাশয় কিরণচন্দ্রের উত্তোষে এবং উত্তোষে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির স্থাপনা করেন। কবিরাজ মহাশয় এই Institution-এর প্রথম অষ্টবত্নিক সেক্রেটারী ছিলেন।

ইংরাজী ১৯০০ পুর্বাংশে কিরণচন্দ্র দিল্লীতে আগমন করেন। ‘আহোবিল উগ্রহিত-মাদনই তাঁহার এই আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য। দিল্লীতে আসিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য আশাতীত-রূপে উন্নতি লাভ করে। ইহা দেখিয়া তাঁহার অক্লান্ত বক্তৃতা দিল্লীর স্বনামধন্য ডাক্তার স্বাধী হেখচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহাকে দিল্লীতেই থাকিয়া বাইতে পরামর্শ দেন। তদবধি দিল্লীতে তাঁহার কর্মজীবনের অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মধ্যে দুইবার মাত্র দিল্লীতে তিনি অস্থগতি ছিলেন।



কবিরাজ কিরণচন্দ্র কণ্ঠভরণ

আয়ুর্বেদের উন্নতিল্পে তাঁহার যে জীবনব্যাপী প্রয়াস ও প্রচেষ্টা সে সম্বন্ধ কয়েকটি কথাই উল্লেখ করিয়া আমরা এই সংক্ষিপ্ত জীবনকথা শেষ করি।

১। কিরণচন্দ্রের আগমনের পূর্বে দিল্লীতে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-সংগণের কোন একটা সম্বন্ধ দল ছিল না; তাঁহারই উত্তোষে “ইন্দ্রপ্রস্থ বৈজ্ঞ-সভা” সংগঠিত হয়।

২। শুধু দল গড়িলেই চলিবে না—সেই দলকে জন-হিতকর কাহাে নিয়োজিত করা প্রয়োজন। সেই কারণে শোণপুর মহাশয়ের আহ্বানকূলে তিনি একটি আয়ুর্বেদীয় পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। উক্ত পাঠাগারে আয়ুর্বেদ-বিষয়ক সাপ্তাহিক বক্তৃতা বাহাতে প্রবর্তন করা যায়—তিনি তাহারও সূচনা করিয়া গিয়াছেন।

৩। তিনি নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্বেদ মহামণ্ডল ও নিম্নাঃ আয়ুর্বেদ বিভাগীঠের সভ্য ছিলেন। শুধু ইহাই নহে, বিভাগীঠের তিনি অল্পতম পরীক্ষক ছিলেন এবং দিল্লীতে বিভাগীঠের পরীক্ষা সমূহ তাঁহারই তত্ত্বাবধানে অল্পতম হইত।

৪। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশে যে কয়টি আয়ুর্বেদীয় বিজ্ঞানদ্বির গড়িয়া উঠিয়াছে—সেগুলির শিক্ষাব্যাপন প্রণালী একটি কেন্দ্রস্থিত 'বিজ্ঞানীঠেঠ' নির্দেশ অনুযায়ী নিরঙ্কিত হওয়া উচিত। সেইজন্য তিনি মাদ্রাজের আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান, দিল্লীর হাকিম শ্রীমদ্বজ্ঞ জ্ঞানমল্ল বীর প্রসিদ্ধি তিব্বিয়া কলেজ, কলিকাতার অষ্টাদ আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকপ্রতি প্রভৃতি শিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে নিঃ ভাঃ বিজ্ঞানীঠের সহিত সংযুক্ত করা হইতে চাহিয়াছিলেন এবং সেজন্য বহুসাধনা চেষ্টাও করিয়াছিলেন কিন্তু দুর্য্যায়কালে তাঁহার সে চেষ্টা ফলস্বরূপ হয় নাই।

৫। শেখ জীবনে তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলার ডঃ গৌরের সহিত, বাহাতে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় 'আয়ুর্বেদ শিক্ষার জন্য একটি স্বতন্ত্র শাখা-বিভাগ উন্মোচন করিতে যুক্ত হইতে সম্মত' হইয়া গেল। তাঁহার সে চেষ্টা অসফল হইয়াছিল।

৬। নিম্নের চিকিৎসাশাস্ত্রে, কবিবাজ মহাশয় একটি আয়ুর্বেদীয় চতুষ্পাঠী গুলিয়াছিলেন। জাতিসংঘ-নির্দেশেয় সমলেই সেখানে আয়ুর্বেদ শিক্ষা অর্জন করিবার সুযোগ পাইত। স্বর্গীয় মহারাজ মৌলভীজী নবী বাহাদুর এই চতুষ্পাঠীর উন্মোচন কার্য সমাধা করেন। বসন্তঃ এই প্রবাসী বাহাদুর কবিবাজ আয়ুর্বেদের উন্নতি ও প্রসারকল্পে আজীবন একটানা প্রাণপণত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। সেজন্য তাঁহারকে প্রভুত আর্থিক কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। যখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে আজিকার আয়ুর্বেদীয় বিজ্ঞানদ্বিরগুলি হ্রাস কয়েকজনদের ব্যয়সাধ্য জগৎ পরিভ্রম করিবার চেষ্টা করিতেছিল সেই সময়ে ১৯১৪ খঃ অব্দে "মহানবাবা" কালেক্টর 'কবিবাজ চিকিৎসা ও তাহার উন্নতি' শীর্ষক প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছিলেন :

"চিকিৎসকের প্রায় সকল শাস্ত্রে অধিকার থাকা প্রয়োজন। কেবল ব্যাকরণ, ভূগোল, ভূপাতা সংস্কৃত, ভূগোল জ্যোতিষ ও চক্করের স্থান-বিশেষ মুখস্থ করিলেই

কবিবাজ হয় না। কবিবাজের যেমন প্রচলিত সমগ্র বৈদিক ও তান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সংগ্রহ হওয়া আবশ্যিক, তদুপা পান্ডিত্য বিজ্ঞানেও অধিকার থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। তাহা না হইলে জ্ঞানের বিকাশ হয় না। * * * অতীত বিজ্ঞানের যে উন্নতি হইয়াছে ও দিন দিন হইতেছে তদ্বৎসে অজ্ঞ, কেবল সংস্কৃত বচন-বাণীশরণের নিকট আমবা কি প্রত্যাশা করিতে পারি?"

উক্ত প্রবন্ধের আর একস্থানে লিখিত আছে— "সংস্কৃতজ্ঞ ও ইংরাজীতে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণকে প্রথমে মেডিকেল কলেজ অথবা পুণ প্রভৃতি হইতে শিক্ষিত করিয়া লইয়া, পরে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করাইতে হইবে। এতদ্ব্যতীত ছাত্রগণকে সাধারণ এম্বাসিয়েসনে নিয়মিতরূপে বিজ্ঞানের বহুতর অন্তিমবিধি থাকিতে হইবে।"

তাঁহার একগাণ্ডি আজ আর কিছু নূতন নহে—আজ তাঁহার ইচ্ছা বোধ হয় সার্বকর্তার পথেই ছুটিয়া চলিয়াছে। এই সার্বকর্তাই তাঁহার পরলোকগত আত্মার তৃপ্তিসাধনে সমর্থ হইবে, আর আমাদের কাছে এই জীবন-কথা, ইহা যদি আমাদের কাছে কণ্ঠের পথে উদ্ভূত করিতে পারে তবেই ইহার সার্বকর্তা।

তিনি দিল্লী কালীবাড়ী ও বাহাদুর গুলের উন্নতিসাধনের জন্য বিশেষভাবে অর্থ ও শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রাচীন বাহাদুরী জাতদের উপর প্রবাসী বাহাদুরীর যেরূপ প্রীতি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থাকা প্রয়োজন কবিবাজ কিশোরজী সেগুলি বিশেষভাবে পরিপূর্ণ ছিল। স্বামী অধিবাসীদের পরিচালিত সমগ্রস্থানে যোগদান ও পরামর্শদানে তিনি অস্বীকার্য ছিলেন। তিনি সন্তান, সন্তান-প্রতি, মৃতদেহী ও সংস্কারপ্রতির বিশ্বস্ত বন্ধ ছিলেন। একবার যিনি তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছেন জীবনে তাঁহারে ভুলিতে পারেন নাই ও পারিলেন না। এখনও কিশোরজীর অজব দিল্লীর অনেক অস্থানে, সভা-সমিতি ও পরামর্শ সভায় অস্থিত হয়।

তিনদিনের ছুটি

—গল্প—

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

৪দিন থেকে আকাশের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, নব্বের এবং ধীরে ধীরে অবস্থাও তথৈব; সকাল সাড়ে সাড়টার আগে ঘুম বাজতে চাইত না, একান্ত অনিচ্ছাতেই প্রত্যহ উঠতেই হ'বে; সমস্ত দিন ধরেই সে অস্বস্তিকৃতু কাটা-ফোটার বচনিচিচ্ করে; তারপর বিস্ত্রী গরম—গাছপালায় গাথ যে কোনো কালে নড়েছিল বা নড়ে—এমন কোন আলস বা চিহ্ন পর্যন্ত নেই; এই অবস্থায় আট চল্লিশ হারিন রোডের রথেন মিত্রির বহু পরিগ্রহ করে একথানা ছুটির দরখাস্ত লিখলে দেবিন সকালে; তাকে দরখাস্ত দেখাই দায়, তার উপর লিখবার সময় যদি ভাবনা চেপে য়ে, দরখাস্ত কতগুলো হাতের মধ্যে থাকে—কো'তে কি রকম remark করবেন, শেষ অবধি ছুটি মঞ্জু হ'বে কিনা—তা হ'লে ত আরও মুখনি শেখটায় ছুপুর নাগার হেন যোগ এসে জানিয়ে গেল, ছুটি মঞ্জু হ'য়েছে, তবে বৃথা বাধু এ তিনদিন কোথাও বেরতে পারবে না। কতৃপক্ষ যদি একবার দেখতে পান—(কারণ, কতৃপক্ষের কেউ না খেতে কোথাও না কোথাও ঠিক হাতে করে ঘুরেচেন) যে বৃথা খেটায় কোকালে পান কিছু অথবা চুট, অথবা গোনা বিশেষ কেবিনে চা-এ চুবুক দিচ্ছ, তবেই চাকরী ক্ষয় নিশ্চিত থেকে।

উত্তর কথা, রথেনের খা'তে কিছুই আসে যায় না—তিন দিন, কেমন, তিন মাস যদি যির থেকে বেরতে না হয়, আঃ! যতটুকু হারিন রোডের ব্যারান্ডায় দিচ্ছ (স্তোত্রার গায়ান অবস্থ) নীচের জনস্রোত দেখা কী আশ্চর্যের— "It is a pleasure to stand upon the shore, and to see ships tossed upon the sea; a pleasure to stand in the window of a castle, and to see a battle and the adventures thereof below." আরনের হ'লেও বড় স্বার্থপর

আরাম—রথেন ভাবে; 'আমহাষ্ট' ট্রট (কলকাতার পুরনো রাস্তার মধ্যে সব চেয়ে ভালো রাস্তা) হারিন রোডে এসে মিশেছে; বড় বড় হোটেল গুলি; দোকানদার মধ্যে কেবল টুই আর হাউসেরের দোকান; হ'কার অসংখ্য কাগজ সান্ডিয়ে বেগেছে রাস্তার মোড়ে; প্রজ্ঞান পার্কে গাছগুলো দেখা যায়—ঘণ্টার পর ঘণ্টা রথেন এদিকে চেয়ে থাকে, কিছুই আসে যায় না; তিনমাস না বেরলেও কিছুই আসে যায় না।

আম ক'রে এগুে রথেন ভাবলে কি করা যায়! প্রজ্ঞান পার্কে গাছগুলোর দিকে কতখনই বাড়াগা যায়—বড় জোর একখণ্ডী, তা'ও চেয়ে হেলান দিয়ে চুকট টানতে টানতে হরেন যোগ এখন আসবে না—দিল্লীতে তা'র লেই পাটী; অজুত কোক, হরেন যোগ; বড়ম প'রে যোগে—কি বিশ্রী শব্দ বড়মের! একটা পিঠলের খা'তে তিন মাসের গলাবল রেখে দিয়েছে, বলে germ হ'বে না। অফিকও করে—নাক টিপে ধরে সে কী কসরৎ—এদিকে চুকট ও খায়, নীহার-ও খায়! জিজ্ঞাসা করলে বলে, বেশ করি, কিছুড়ি খেতে ভালোবাসা না ভূমি? সব হ'লে ত কিছুড়ি হে সমাধ থেকে মাহুদ অবধি! একবার বসতে হ'বে, সব খেতে হ'বে—mixture হও, বুকলে! একমাত্র রুম-মেটে হরেন যোগ আসবে না পাটটার আগে! এলেই মুখনি; হাত-পা ধুয়েই হ'ল-চি'ড়ে আর কলার ফলার, উঃ কি ভীষণ ব্যাপার! রথেন ভতকণ এক কাপ চা, কি বড় জোর একথানা কেন্দ্র—হরেন যোগ বাকো না, হরেন যোগ জানে না চা-এ কি আরাম! ছ'কাণের বেশী খেলেই তার পেট গরম হ'বে! রুপার পাত এই হরেন যোগ!

জীর রোড উঠেছে, তিক্ত রোড! মাঝে মাঝে টানের শব্দ আসছে—শিব-বু—ঘট, ঘট—শিব-বু—বাস ভা'ইতার প্রাণপণে চাঁকচা করছে, হাঙড়া-বাবু, হাঙড়া! তপ্ত, ক্লান্ত

নগরীর ভাষা মুটে উঠছে কাকগুলার কর্ণ কণ্ঠে। রণেন ভাবলে—কি করা যায়, কি করা যায় এখন! এ তিন দিন কাটাই কি করে? যুগ্মতে যে পারে না—বিনের বেলায় যুগ্ম—কম সম্ভব! তবে কি করবে সে?

“অন, চিঠি লেখ না, রণেন!”

“কাক লিখি, বলা ত!”

“কেন,—অনিলাকে, মনে পড়ে না তোমার, অনিলাকে মনে পড়ে না?”

“পড়ে বৈ কি, অনিলাকে ভুলতে পারলে ত’ দুইই হ’তাম।”

“কি লিখবে, রণেন? কিছু বিশেষ কথা তোমার আছে কি?”

“আছে বৈ কি—কথার কি শেষ আছে? অনেক কিছু লিখতে পারি—অনেক কিছু।”

“লেখ, বেশ, ওঠ চেয়ার ছাড়ে, প্যাড, নাও, কলম কী’র করগো—লেখো না রণেন!”

“ভাই তু, লিখতে হ’বেই, না?”

“হ্যাঁ, লিখতে হ’বেই, গেণো!”

থেকে পড়তে আরম্ভ করেছে—এগুনি হয় ত হরেন যৌব এগে পড়বে, তার আগেই চিঠিটা পাঠাতে হবে—হরেন যৌব বেন দেখতে না পার, এমন ভাবে পড়ে খামে এটে চাকরকে দিতে হবে; সমস্তই হরেন যৌবের অপগোষে কর্তে হবে। বৈলে, চিলের মত ছেঁা দিয়ে চিঠি ছিনিয়ে নিতে হরেন যৌবের কতকগুলি বা শাণে? সন্ধ্যা দেখার উপর একটা অস্বস্ত মমতা নিয়ে রণেন চিঠি পড়তে লাগল:

অনিলা,

আমার হাতের অক্ষর তোমার কি মনে পড়ে—তুমি বাঁকা বাঁকা অক্ষর ভালোবাসতে, না? এ চিঠি বখন তুমি গুলুবে, প্রথমটা খুব অবাক হ’য়ে যাবে নিশ্চয়! তোমাদের একত্থেই কীভাবে চিঠি আগাটা একটা মন্ত বড় অনন্দ, ন কি? আমার হাতের অক্ষর তুমি কি ভিনতে পারবে? চিঠিটা খানিক পড়ে হয়ত ভাববে, তাই ত, তাই ত, এইবার মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। যাই হোক, আমার অক্ষরগুলোকে মাঝিরে পাড়িয়ে দিচ্ছি—এ যেন দৈঘরল চলছে, সারবন্ধী, সমান ভালে পা ফেলে ফেলে, মুক্ত হয় কবুতে।

আজ বোধ হয় বছর দশেক তোমাকে দেখিনি—কেমন? না দেখাই ভালো! না দেখার কী ভাে আনন্দ, অনিলা, তুমি ঠিক বৃত্তে পারবে না: মেয়েরা কী পারে না; মেয়েরা একটু না দেখলেই অমীর হয়, মুখে রঙত বা জানাতে পারে না বলে তাদের আরও কষ্ট। আমারে পক্ষে অমীরতাটাই আনন্দ—চকল চন্দন্ করছে শরী, উদ্ভান হ’য়ে উঠছে মন, উমান হ’য়ে উঠছে মন—একটা অসল অসল পথহীন বাধ্যনকে আমরা কখনার ভরে ভুলতে পারি, তোমরা তা পারো কি? ‘তোমরা’ কথাটা আমার বন্ধনা—বহুবচন-টা গৌরবেরই হয়, কিন্তু অসৌরয়ে বহুবচন ব্যবহার করলে নানান গোলযোগ। তুমি পারো কি?—না, তুমি পারো না। হয় ত পারত, কিং

এখন আর পারো না; তোমার চারদিকে গভী পড়ে গেছে অনিলা—যেমন তোমার শরীরের চারদিকে পড়েছে গভী, তেমনি তোমার মনে। তোমার আছে কেবল গভী, গভীর ভেতরই তোমার আসা-বাগড়া, রাঁধা-বাগড়া আর শোঁরা। আজ্ঞা, ভালো ‘আজ’ তুমি অনিলা, এই গভীর মতো? এক-একসময় প্রাণটা মুক্ত করে কেঁদে ওঠে না তোমার?

আশ্চর্য অনিলা, এক-একটি ক’রে দিন খসে খসে পড়ছে—চলের ওপর ফুলের পাণ্ডি যেমন খসে খসে পড়ে। তুমি হয়ত বলবে, বেশ আছি, ভালো আছি; অস্বপ্নের চিন্তা নাই, বেশী পরিশ্রম নাই—ছেলে মেয়েরা বৃষ্ আছে, খামী টাকা আনছেন, মামের পর মাস, মামের পর মাস—স্নাত্তহীন, বিস্মাহীন; বেশ আছি হয়ত তুমি বলবে। কিন্তু বেশ আছি—তুমি বলতে পারবে না অনিলা, এ একটা প্রচণ্ড অভিশাপ নিয়ে মাহুর আর মাহুরীর জন্ম হয়েছে। বেশ আছি বলতে গিয়ে হয়ত তোমার দেখে চল এসে পড়বে অনিলা, হয়ত তোমার ঠোঁটের কিনার একটু কেঁপে উঠবে। বেশ কেউ নেই অনিলা, বেশ কেউ নেই!

কয়েকটা মুহূর্ত, শুধু বেশ থাকতে পারো। সেই মুহূর্তই হয়ত তোমার কাছে ‘অমর’ হ’য়ে থাকতে পারে। কিন্তু সে মুহূর্তকে যদি তুমি খেলা বলে মনে করো? তবে খেলা ভুলতে কতক্ষণ? খেলা মনে করাই উচিত। বৈলে জীবন জুড়ি হ’য়ে উঠবে অমর্য ভালো মুহূর্তের ভাবে। তা’দের আকর্ষণ মাধ্যাকর্ষণের চেয়েও বেশী, এমন মেয়ে তোমাকে টেনে থাকবে, এত মায়াম্বক রকম তোমার মকে বিধা ক’রে তুলবে, যে, তুমি এক পাও এগুতে পারবে না! অতএব, কীভাবে মুহূর্তজনিকে ভুলে যাওয়াই ভালো, কি খেলা অনিলা?

এই ঘরো, তোমাকে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। এমনি সবাই সবাইকে ভুলে যায়—কতশোক এমন ভুলে যায় যে, হঠাৎ দেখা হ’লে হাঁ ক’রে মুখের দিকে চেয়ে থাকে। অতীতকে ভেবে নিতে তা’র অনেক দেবী লাগে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, তা’রপর বলে, ও, তাই ত

তাইত—মনে পড়েছে এবার, মনে পড়েছে। আজকে ছুটি নিরংরি কাগ থেকে—তিনদিনের ছুটি; আজ একটু আশ্বস্ত হ’য়ে নিজের অতীতটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া কর্তে কর্তে হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ে গেল। তাই না নিগে হয়ত মনেই পড়ত না। আমার ছুটির এই অপরকাশে আজ ভাষায় মুখর ক’রে দিতে চাই, কেননা আজ তোমার কথা আমার মনে পড়েছে—এই আনন্দ।

ছুটির thriller হয়ত আরও অনেক ছিল, কিন্তু আজ আর তা’ ভালো লাগল না। তোমাকে আর আমার সামনে পাড় করিয়েছি, আর তুমি ঈশ্বরী, বামিনী! তোমার সঙ্গে চিঠিতে কথা বলেই আমার আনন্দ।

দেখ, ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কেবলি প্রলোপ চলছে—কতের উপর, বেবনার উপর। সেই প্রলোপের নাক্তা এত বেশী হ’য়েছে যে; আকু তোমার মুখে আমার ভালো ক’রে মনে পড়ে না। আমার সখ তোমার সখেরই একটা অস্পষ্ট স্মৃতি—আর সেই স্মৃতির মাধ্যমানে তোমার একটা অস্পষ্টতর স্মৃতি—হ্যাঁ, অস্পষ্টতর স্মৃতি—এইটাই সত্য অনিলা, তোমার খেখর একটি রেখাও আমার ভালো ক’রে মনে পড়ে না। শুধু সখেরই স্মৃতিই বড় হ’য়ে উঠছে, তুমি প’ড়ে গেছে আড়ালে। এর কারণ কি জানো? এর কারণ শুধু অনবসর; এত বিভিন্ন সখের মাধ্যমানে আমরা ‘আমাদের’ খও খও করাই—চারদিকে নিবেদের এত ছড়িয়েছি যে, আশ্বস্ত হ’য়ে অথও কিছু ভাববার আর অবসর নেই। প্রাচীনকালের রসিকদের কি বিকীর অবসর ছিল—রেখার, রূপে স্মৃতি কত স্পষ্ট কত অমর্যগমর হ’য়ে মুটে উঠত তাঁদের কাছে! যেমন খরো,

ধনী মনির খরিফে তেলো,
নামস্বস্তে বিম্বুই-বো ধন পাগুরী গোলা।

দেখ, আমাদের মন গেছে বালু, আমাদের দুটি গেছে বদলে; আমরা হয়তো বলতে পারি, ট্যান্ড থেকে একটি আয়ালো-ইন্ডিয়ান মেয়ে লিফটিক কর্তে কর্তে বেরিয়ে এসে—মাঠের মধ্যে যেখানে গাছের ছায়া মন যেখানে আলো আর আঁধারের মিহরাণি—সেদিকে সে’চলে গেল। কিং এতখানক বন্ধ আরও বেড়ে যায়, হয়ত খানিকটা কৌতুক, খানিকটা বাস্মমিত্রিত

ছ’খটা হ’য়ে গেল; রণেন ভাবছেই। ‘অনিলা’—তোমার অনিলা? আরি এমং মমোর মাধ্যমানে: কি দীর্ঘ ছেবেখো; মনের দুষ্টি বাপুলা হ’য়ে গেছে। সেই বাপুলা দুষ্টির মাধ্যমানে অনিলাকে সে কি ক’রে আনবে? শিঠের বেগিট হয় ত জোবে আসে—ছোট একটুকরো কপাল, নাকটি ঈবৎ ঝালা, তা’র মুখখানি ঐ শায়াব একটু খুঁতের জুইই বৈন বেশী মানা’ত—খুব ভোরে উঠে বৈলীকল তুলত, মালা গাঁথবে, নয়ত পুজো করবে; তারপর বই-এর গাথা নিয়ে যেত ইঙ্গল—ভারপরে. আর অনিলাকে পাওতা যায় না। আজ কি খেয়াল হ’ল রণেনের অনিলাকে চিঠি লিখবে। হ্যাঁ, খেয়ালই ত! তা ছাড়া আর কি-ই বা হ’তে পারে?

ছ’খটা হ’য়ে গেল, রণেন চিঠি লেখা দেখে ক’রে প্রথম

কল্পনা আর বাসিন্দা হুত অবস্থা এসে মনকে আশ্রয় করে। এই আমাদের জীবন অনিশা—অসংখ্য বিফলতা, অসংখ্য সমাজকে ছাড়িয়ে গুরু একটা বড় হুতের সন্ধান আমরা দিতে পারছি নে, তার কারণ বড় হুত আমাদের কানে আর বাজছে না। প্রাচীন কলারসিকের ঐ গদ্যটি আজ বারে বারে মনে মনে শুদ্ধন করছে—

নবজন্মের বিহীন-বহু দশাধারা দেখা!

তোমারও এই জীবন অনিশা—তুমি আর কতই আমাদের গর্বে ক'রে তোমার দায়িত্বের কঠোরতম বন্ধনগুলোকে হুত তুমি মহিমাবিত কর্তে পারো, কিন্তু তেমন শক্তি, তেমন অগ্রহ তুমি কোথায় পাবে—তোমার পাশে বাঁধা আছে, তা'র দরি তোমার না সাহায্য করে? একটা বয়স থাকে অনিশা, যখন দুইটা বেশ সহজ থাকে, বেশ স্বাভাবিক থাকে। হুত' সে দুষ্টের মতো রক্ত থাকে—জড়-এর দুইটাই স্বাভাবিক, স্বস্ত, সহজ বলে আমার মনে হয়। আজ আমরা দেখানে এসে দাঁড়িয়েছি, সেখানে আমাদের দুই খোঁজাটে। এই খোঁজাটে দুই বিয়ে পিছনে তাকা'লে দেখি বা', তা'তে এখন হাসি পায়, কি ছেলেমানুষ্যই না করছি! সেই ছেলেমানুষ্য কিরিয়ে পা'খার ভঞ্জে আমার আর সবল ইচ্ছা হচ্ছে। কেন না, চারিদিকের সংসারটা কি দারুণ জরাগ্রস্ত, তা'র কৃষ্ণিত লগাটে বসিয়েবা পড়েছে; নতুন করে সে আর জমাতে পারে না—নতুন হ'তে গেলে তাকে তার দেহটা বদলাতে হ'বে—অথ বহের উপর তা'র কি ভাবনা! সনত সংসারটা খান কয় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোন্ধ, ষড়্ভাষা, আর জমাঘরের লাগ লাগ বাঁধানো পাভা নিয়ে র'সে গেছে, হিসব করছে দেনা-পানের, আশ্চর্যকর কৃষ্ণ চুল-চেরা হিসেব করছে, সেই হিসেববিত্তি তা'র সনত মনকে আচ্ছন্ন করেছে, তা'র দেহকে সেই হিসেবের গিটিকি রসে ছন্দিত করেছে, তা'র বিভিন্ন জীবনের বিভিন্ন রকম ভালোমন্দ সম্বন্ধ সেই হিসেবের বন্ধনে বেঁধেছে; আমি তা'র স্মৃতি দেখতে পাই অনিশা—তা'র মাথার সমুখ আর একগাছি চুল-ও অবশিষ্ট নেই, হুতা-বাঁধা একটা চশমা চোখে দিয়েছে; ক'রবার উপরে দীর্ঘ কয়েকটা রেশমা পড়েছে; বাক্যকোর শিখিল সাঁড় তা'র হাত কাঁপিয়ে দিচ্ছে—

তবু তার একটুও ভুল নেই, বড় বড় যোগ্য করছে এক নিমেষে, বড় বড় বিরোধ করছে এক পলাকে—এমন কি'রে এই বড় সংসার অসংখ্য কুঁকরো সংসারের মধ্যে ছন্দ দিচ্ছে—ভালো মনে, হুত হুত, বেদনার আনন্দে—এই সংসারের কাছ থেকে আমি আজ তিন দিনের ছুটি নিয়েছি; তা'কে জানিয়ে দিয়েছি আমি আজ কি'রে বা'ব পিছনের দিকে, আমাকে ছুটি দাও, ছুটি দাও।

আমি আজ সেই মাঠে কি'রে বা'ব অনিশা—সে মাঠ বাংলাবেশের নয়। বাংলাবেশের মাঠ অতি সহজে বেধা হয়ে যায়, একবার ভালো করে তাকালেই হ'ল। যে মাঠের কথা বলছি—তা'র কথা কি তোমার মনে আছে? সেখানে কি কখনো যাওনি তার পর? সেই পশাপাশ ছেলের কথা মনে সেই—সেই কাঁকর, মাটি ভের ক'রে সহ মাথা'জাগিয়ে আছে। সেই পাথরের স্তূপ, সে সব মনে পড়ে না তোমার? মাঝে মাঝে শালের বন, কাঁকরের নদী—কত পাথরের গায়ে কত জনের নাম লেখা। সেই পাথরের দেশের মাঠে আমি কি'রে বা'ব অনিশা!

সময় দিবে কাঁপ-রৌদ্রসহরে পাথর তেতে আঙন হ'য়ে উঠেছে—পথে লোক চলে গেছে। জাম্বা-পরজা বড় করে খন্ধ্য টাড়িয়ে সাবধানীয়া বুনিয়ে, আছে—তুমি একটা ছোটখাট কড়ের মত এসে বসলে—চলো রথুবা, সামনের পাগাড়টায় বেড়িয়ে আসি!

'সে কি, এই রোদে?'

'হ্যাঁ, চলো চলো—আমি দেখব ও পাগাড় কোথায় আঙন জলে! চলো রথুবা, চলো!'

'কি ছেলোমানুষ্য তোমার জন্ম? এখন একটা লোক দেখা'তে পারো পথে?'

'আজ্ঞা, বা'বে না ত? তুমি না যাও, আমি চললাম!'

বাধা হ'য়ে যেতে হ'লো! তোমরা এমন করে আমাদের টেনে নিয়ে যাও—অজ্ঞাতে অজ্ঞাতের আরা জু' চলেছি, তোমরা সঙ্কেত করছে। শুভু, তিরকাল তোমাদের বহের তোমাদের মনের প্রত্যেকটা কড়াতে নিশ্চয় সঙ্কেত করছে হ'য়ে আছে।

যেতে হ'লো শোভাট তোমার সঙ্গেই। তুমি বললে,

'কেউ জানে না, আমরা চলেছি—টিক সময় আবার কি'রে আসব, দেখো!'

আমি চুপ করে আছি দেখে বসলে,—'তোমার গুরু কত হচ্ছে রথুবা—নয়? এই রৌদ্রেরে এতখানি পথ? কত হচ্ছে, নয়?'

একবার ইউকালিপ্টাস গাছের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা একেবেঁকে চলে গেছে, সেইপাশ দিয়ে আমরা চলেছিলাম, হুপাশে মাঠ—বড় বিস্তার মাঠ; উঁচু নীচ অনেক রেখায় বিভক্ত, দুই বারে বারে কি'রে কি'রে আসে। আর-ও দেখবার বাহুল্যতায় অস্তর বারে বারে ছুপে ওঠে। একটু হেসে বললাম—'না, কত আর কি? দিবা ইচ্ছাযোরে একখানা কা'রা নিয়ে বসেছিলাম বই ত নয়—কেমন আরো ঘুমাতেম বলে ত?'

আমার আজও মনে পড়ে, এই কথায় এক মুহূর্তে তোমার মুখখানি ভাবি করণ হ'য়ে উঠেছিল, পরমুহূর্তেই সামলে নিয়ে তুমি হেসে উঠলে, বললে—'একদিন ত, আজ আমি তাই ঘুমাতে রথুবা, সেদিন রাস্তার ত' বললে, আমরা বা'ব কই পাগাড়টার একদিন—অজ্ঞাকারে মধ্যে কেমন আঙন জলে ওঠে পাগাড়টায়, দেখো নি তুমি?'

মনে পড়ে গেল, অজ্ঞাকারের মধ্যে আঙন জলে ওঠে! অসংখ্য আলোয় যেন একসঙ্গে ছুটোছুটি করে বেড়া—একটার উপর আর একটা এসে পড়ে—তারপর লক্ষ আয়-শিখি অন্ধকার আঁকিয়ে খেলা করে; চোখের সমুখ থেকে তারগুণ্ডা মিলিয়ে যায়—ছোট ছোট মিটিমিটে তারা!—তারপর সেই বহুস্তর বাহ-স্বপ্নের আভাস থেকে একখানা বাঁকা চাঁদ আঁতে আঁতে বেরিয়ে আসে—পাতুর, বিনীশ, মনিচ টায়!

বললাম,—'চলো, কত আর কি? বেশ লাগছে; তবে তোমার কত হবে—শুভু একগোড়া শিগার প'রে এতটা পথ বা'বে কি করে?'

কাঁকরের গুপ্ত গোমার শিগারের শব্দ হ'তে লাগল। রাস্তার দু'হাশে বাধা ছিল বলে রফে। ছায়ার আরাটুকু আর বেশীদূর উপেক্ষা কর্তে হ'ল না। রাস্তা থেকে নেমে পড়তে হ'ল—পায়ে-চলা হাঁটা পথে।

খানিকক্ষণ চলতে চলতে চোখমুখ জালা করে উঠল। পকেট থেকে কমান্ডটা বার করে মাথার বাঁধলাম। হুতের সে রকম স্মৃতি তা'র আগে আর দেখি নি—গাছের পাতা-গুণ্ডা আর পড়েছে—চোখের দুই বয়ে ছুটো সন্তোজাত কটিপাতার মত কলসে বিবর্ণ হ'য়ে উঠল। পাথর, গাছ, ঘাস, পথ, হুতের বন সব যেন একটা গোপন অঙ্গরীয়ে হুতরীকায় ধূম উদ্গীরণ করছে—কর, কর, হুতবেতার অসংখ্য কিরণ-রেখা যেন অজ্ঞ সংখ্যাতীত সতীশ্বপের মত একেবেঁকে আকাশ থেকে অবিধান নামছে, আবার পৃথিবীতে প্রতিহত হ'য়ে তেমনি অদৃশ্যগতিতে আকাশ-পথে উঠছে। পাগাড়ের মূখল দেহ তখনো আতঙ্কের বাইরে। তোমার সমস্ত মন লাগ হ'য়ে উঠেছিল, চুল-গুণ্ডা উচ্ছ্বাস হাওয়ার একেবারে এগোমনো হ'য়ে কপালের বিলু বিলু ঘামের স্পন্দে জ্বলিয়ে গিয়েছিল। তোমার দিকে তেরে তেরে বসলাম—'হয়ছে, আর পাগাড় যায় না, এসো এই গাছটার নীচে একটু বসো বা'ব! আরও উচ্ছ্বাস হ'য়ে উঠলে তুমি; বললে—'না, আমি বা'ব! আজ না কেলে আর বাওনা হ'লে না! বিনা বাঁধার চলে লাগলাম। সে সময়ে কী কাঁপ রথ হুজিগ তোমার উপর! সে কথা আজ এই প্রথম তোমাকে জানালাম।

খানিকদূর গিয়ে পথটা ঘুরে নীচের দিকে নান্দে আরম্ভ করল—মস্ত বড় যায়; পরশীম কয়েকটা বেলগাছ তা'দের উত্তর বাহু প্রসারিত করে ধাক্কা গা হয়ে উপরে উঠেছে—কী কুৎসিত গাছ গুলো! রক্ষ, শ্রীধন দেশ-কর্ণ, বহুদ, পলিতা পথ! তুমি সেই খাদের ধারে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত উদ্যামের মত বললে—'তাই ত, এ যে মস্ত বাধ—কি করে পার হবে রথুবা?'

বললাম—'পাগাড় কি'র আর বেশী দূর নয়! এস, জুতো গুলে ফেলা বা'ব—এই বেলগাছের পাশে জুতো রেখে বাই!'

'না, না, জুতা গুলে, আর একপাও যেতে পারব না!'

'তবে, আমার হাত ধরো বেশ এক—ভালো করে না ধরলে গিয়ে প'ড়ে যাবে কি'দা।' তুমি অতি সঙ্কেতের সঙ্গে ভয়ে ভয়ে মনে হাতখানা আমায় দিকে এগিয়ে দিলে। বললাম,—'জোরে চেপে ধরো আমার হাত; দেখছে নে,

কতটা পাড়াই নামতে হ'বে।' তুমি জোরে আমার হাত চেপে ধরল—আমার সাহস বেড়ে গেল তোমার নির্ভরতার। অত তোমার প্রাণ ক'রে সেই অর্দ্ধরক্তিমির তরু হাওয়া সমস্ত বুক জুড়ে গ্রহণ করলাম। আমাদের পারের চাপে এক-একটা পাখর গড়তে গড়তে নীচে একটা কীকরের নদীর মধ্যে গিয়ে প'ল। তারের শব্দে সচকিত হবার কেউ নেই! অন্তর্ভুক্ত কাগজটার একটা পাখীও নেই, বে, উড়ে পালায়।

আদ্যভূতাপানেক পরিপ্রভের পর নদীর মাথখানে নামা গেল। হাঁ, কীকরের নদী-ই তাঁকে বলতে হ'বে—এক-এককে কতদূরে নিরুদ্ধ হ'য়েছে। তাঁর সমস্ত বুক জুড়ে হৌরহদ কীকর—মস্ত, স্বপ্নে স্বপ্নে, দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু তটের একপ্রান্ত দিয়ে ঈর্ষ কলসেধা ব'রে গেছে—চিহ্ন বেগেছে ভিত্তে কীকরের উপর। তুমি তখনো আমার হাত ছাড়ে নি। সেইরকম তাকিয়ে, অন্তর্ভুক্ত কালকণ্ঠ বলে, 'ঐখানে জল পাওয়া বাবে রপু'বা', চলো এগিয়ে বাই।'

তোমার রক্তাক্ত আমার রক্তিম তুলিয়ে দিলে। একশণ তুমি আমাকে টেনে নিয়ে আসছিলে—এইবার হচ্ছে হ'ল তোমার আমি টেনে নিয়ে বাই। বারোখোপের নায়কদের মত আমার যদি চ'খানা বলিষ্ঠ বাহু থাকত, কিংবা থাক আর না-ই থাক, সেই মুহূর্তে এমন একটা রক্তকতার সাহস মনের মধ্যে এগিয়েছিলে, বিন্দুবার বিধা না ক'রে বামবাহু দিয়ে তোমার কটিদেশ বেঠান ক'রে ধরলাম, বললাম—'রক্ত হ'য়েছে আমি, তোমার হাত আমার কীধের উপর রাখো।' তুমি আনিত ক'লো না—এইভাবে চলতে চলতে একটু মান হেসে বলল—'বড় জল হ'য়ে গেছে রপু'বা, পাখাড়টা যে এতদূর হ'বে, তাই কি ছাট আনতাম। বাড়ী ফিরে ভয়ানক বকুনি খেতে হবে দেখো।'

'পাখাড়টার কাছে গিয়ে যদি শুধু একবার দেখেই ফিঙ্গত পাওয়া, তা হলে আর বকুনি খেতে হ'বে না—তখনো অনেক বোলা থাকবে। আমার যদি পাখাড় উঠতে চাও, তা হ'লে আর ফেরা হ'বে না—সমস্ত রাত্রি এখানেই থাকতে হ'বে—এই বাধের মধ্যে।' একটা অক্ষুট ভয়ের স্বর তোমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

'ভয় নাই'—ব'লে গান্ধে তাক'তেই দেখি স'ঁওতাগদের একটা ছোট্ট মেয়ে বাঁচ দিয়ে নদী'বাণি বুঁজছে। তুমি আমার হাতটা সরিয়ে দিয়ে দৌড়ে সেদিকে চল গেল। একটু কাছে গিয়ে দেখি, আধা বাঁশা আর আধা হিন্দীতে মেয়েটিকে তুমি প্রাণপণে বুজাচ্ছে যে তোমার হেঁটা পেয়েছে। সে কিছুর্তই বুঝতে পারেন না—শেখটার জ্ঞানি পেতে দেখিয়ে দিলাম যে, আমরা জল খেতে চাই। তারপর তাঁর বালি-সরসো অনেক পরিপ্রভের জল ছুঁলে অজ্ঞান ভাবে শোলাম। কমালা চিকিয়ে নিলাম, স্বহ, নির্মল অঙ্গসঙ্গিণি আমাদের নির্দাক্ত পরিপ্রভ অনেকখানি বুঝ করেছিল।

নদীর খাৰ থেকে আবার ওপরে ওঠা—আবার হাঁটা পথ, হ্রপাশে ছোট ছোট কুঁড় ঘর—মলিনবদন স'ঁওতাগের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করছে—কয়েকটা প্রকাণ্ড সুহর তাঁদের লজ্জকে জিব বা'র ক'রে ময়রাপাছের নীচে স্থাপ্যে ছাড়াচ্ছে। সুহর রপ তখনো সমানভাবে ছুটে বেগেছে—এতটুকু করুণা নেই তার; মুক ধরিত্রী যেন আর সে তাপ সহ করতে পারেন না। এই জনহীন রুদ্ধ বেশে স'ঁওতাগদের আঁত ধাক্তা জীবন-প্রচেষ্টা মনে-শকটী তবু আমায় দিল। পাখাড়ের নীচে ঘন বাণেশ বন—মাথার দূরে সর পথ। তুমি আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে বলল—'বাঁক, এসে পড়েছি, তা হ'লে।'

'দাঁড়াও, আগে বনটা পেরিয়ে বাই।' পাখাড়ের পিছনে দুখা; সন্মুখ একটা দীর্ঘ ছায়া ঘিরে দীর্ঘে এগিয়ে আসছে—আর একটু পরেই যে এই ছায়া সন্ধ্যার ছায়ায় মিলবে, তাঁর পূর্ণ সূচনা পাওয়া গেল। বন ঘন হ'য়ে গেল। 'পাখাড়ের সমুখে এসে পড়েছি। বললাম—'ঐ দেখ তোমার পাখাড়।'

তোমার চোখগুলি বিশুদ্ধ আনন্দে আবিষ্ট হ'য়ে এল। বিশাল বৃক্ষ প্রস্তর স্তূপ আমাদের চোখে মনে হ'ল আকাশ স্পর্শ করেছে। ওপরের দিকে চাওয়া যায় না। তাঁর নীচে ছড়ানো কতকগুলো প্রকাণ্ড পাথরের মাথখানে দাঁড়িয়ে নিজেরের কত নগণা মনে হ'ল—নে ক'বা তোমাকে জানাতে বা'ব—দেখি, তুমি একখানা পাথরের উপর ব'সে পড়েছি। বলল—

'এল, এখানে বসি—আবার এতটা পথ ফিরে যেতে হ'বে মনে ক'রে ভয় হচ্ছে রপু'বা!'

'আমার ভয় নয়, রাস্তি—আর উঠতে ইচ্ছে করছে না।'

'তবে আর বাড়ী ফিরে কাজ নেই—স'ঁওতাগরা এখানে কি ক'রে থাকে?'

'বৈশ আছে ওরা, নয়, অহু?'

'দূর, ছাই আছে; ওরকম বড়জোর একদিন থাক।

যায়—কিন্তু পাখাড় তেথলান, আগুন কৈ রপু'বা?'

'তাই ত, আগুন কৈ?'

'বোজ রাস্তির কি ক'রে সমস্ত পাখাড়টায় আগুন জ'লে ওঠে?'

পাখাড়টার দিকে একবার চাইলাম—মুক প্রস্তরের স্তূপ—কত রকমের পাথর। কিন্তু কোথাও অতিস্রু ঘাসের চিহ্নমাত্র নেই। পোড়া-পোড়া শুক ডালপালা নিয়ে অম্বাঘাছ কঙ্কাল অবস্থা পেয়েছে। উদ্ভি-কীটদের মহাশ্মশান ঘন; তাই ত, কি ক'রে সমস্ত পাখাড়টায় আগুন জ'লে ওঠে কি ক'রে জ'লে?—ভাবতে লাগলাম।

'কোন হয়, স'ঁওতাগরা আগুন লাগায়।'

'তা'তে ওদের লাভ?'

'জানি নে।'

কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা। সেই কয়েক মুহূর্তেই মনে হ'ল আমি-ও যেন পাথর হ'য়ে গিয়েছি। অন্তরকাল থেকে যেন এখানেই ব'সে আছি—মনে হ'ল, এত পাথর, এরাও কি শুক হ'য়ে আমার-ই মত ভাবছে? কে জানে?

হঠাৎ চেয়ে দেখি, তুমি আমার খুব কাছে স'ঁরে এসেছ। অজুত চোখ তোমার। আমার দিকে একদৃষ্ট চেয়ে আছি। পথের এত যে রাস্তি, তোমার চোখে তাঁর একটুও আভাস নেই। হেসে বলল—'তোমাকে ঠিক ধানী বুকের মত দেখাচ্ছে, রপু'বা।'

মনে মনে রাগন হাসি গেল আমার। বৃদ্ধ ত কোনোদিন হ'তে চাইনি। বললাম—'আর তোমাকে দেখাচ্ছে ঠিক হুজার মত।'

'দূর, হুজা'তা হ'তে বাব কেন আমি? আমি কেউ নই।'

হঠাৎ পত্তীর হ'য়ে গেলাম। দশবছর আগেকার মন—সে মন বললে, হাঁ, তোমারাই হুজা'তা অহু। হুজা'তা না থাকলে সমস্ত পৃথিবীটা এই রকম অর্দ্ধরক্ত প্রাণহীন মত হ'ত, আর যেদি না পেয়েও সমস্ত মাহু'ব আমার মত বৃদ্ধ হ'ত।

হুজা'তার কথায় ভাবতবর্ষের সেই প্রাচীন বনরত্নী, তপস্বী'র কুখার্তি সিদ্ধার্থ আর সন্তানের মঙ্গলকামনা'র জননী হুজা'তার শব্দভাষকে হুমধুর পরমাণি নিবেদন আর সেই রাগেই সিদ্ধার্থের বৈরাগ্য মনে প'ড়ে গেল। আমিও কুখার্তি হ'য়েছিলাম, বললাম—'ঠিক এট মুহূর্তেই তোমাকে হুজা'তা বলতে আগন্তি আছে আমার অহু।' তুমি চুপ ক'রে ব'সে রইলে। তোমার মন আর মন আমার কথায় বোধ হয় ছিল না। আমি হ'ল বললাম—'কেন জানে?'

উত্তরের অশ্রুনা না ক'রেই ব'লে চললাম—'এই মুহূর্তেই যদি পরমাণু পাওয়াতে না পারো, ত, তুমি হুজা'তা কিসের?'

শেষ কথাটি বোধ হয় তোমার কানে গেল—'হেসে উঠলে, বললে, আমি ত হুজা'তা হ'তে চাইনি।' তুমি যে হুজা'তা নও, বা হুজা'তা হ'তে চাও নি—সে কথা কি মনে আমার মনে ছিল,—যেহেতু আমি বৃদ্ধদেব এবং কুখার্তি বৃদ্ধদেব সেই হেতু সেই নির্জন মাঠে একটা চরকপ্রার পরমাণু বিকরনের জন্মেও অজুত তোমাকে হুজা'তা হ'তে দেখলে মুহূর্ত হ'তাম। বললাম—'এইবার ফেরা যাক, কি বলা অহু?'

'বাব, এখন-ই কি?'

'কেন বলা দেখি। পাখাড় ত দেখা হ'ল, আর কেন?'

'নাম লিপ্ত হ'বে না? পাথরে নাম খোদাই ক'রে বা'ব, আমার নাম আর তোমার নাম।' মনে মনে ভাবলাম, এর ওপর আমার নির্মাণি। খোদায় কোন ভাবনাশন-পারদর্শীর হাতে প'ড়ে বা'ব একদিন ভবিষ্যতে।

নাম খোদাই-এর কাজ আরম্ভ হ'ল। সে কা কঠিন ব্যাপার। পাথর, দিয়ে পাথরের উপর দাগ দেওয়া মুক্ত—শক্তির আর কোনো ভিনিযের পরকার—লোভ কিংবা অহু আগুও কিছু। হুজার দাগ দিতে চাই, ততবারই পণ্ডাম। একবার দাগ দিয়ে আবার তাঁর ওপর বুলোনা চলতে

লাগলো; কিন্তু তা'তে বহু সময় যায়। শেষটার ট্রিক হ'লো একটা টুকরো পাখরের উপর ছ'মনের সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। আমি পাখরখানা জোরের দ্বারা ছাড়ে, তুমি তার ওপর তোমার হাত রাখলে; তোমার হাতের কয়েকটা আঙুল পড়ল পাখরের ওপর আর বাকী অংশটা পড়ল আমার হাতে ওপর। তুমি তোমার কতটুকু শক্তি প্রয়োগ করলে জানি না, কিন্তু আমার শক্তি হ'ল বিগুন। তোমার পশের মধ্যে বাত ছিল, কয়েকটা অতি কোমল রাস্তা আঙুলের মধ্যে ছিল বেকি, আজ তা ঠিক স্রবশে আসছে না; কিন্তু তা'তে আমার অভিনিবেশে এস, উৎসাহ এস। জানি না থা'র বড়-বড় ভাস্কর, থা'র কর্কশ-কঠিন পাখরের মধ্যে তাঁদের সৃষ্টে সৃষ্টিকে অমরতার মাইনামিত করেছেন, তাঁদের কণ্ঠস্বর হাতের পিছনে কাঁদের অদৃশ্য হাত থাকে—কোনো রাস্তা কোমল আঙুলের স্পর্শ-বিভ্রাৎ তাঁদের কর্ণ-কঠিন দীর্ঘ আঙুলগুলোয় মধ্যে সঞ্চারিত হ'ত কি না!

তুমি হাসতে লাগলে—আর আমার হ'ল ঘর্ষাক্ত কলবর। নাম লেখা শেষ হ'ল। তোমার নাম লেখা হ'ল আগে, তারপর এল আমার নাম—“অহু” আর “হু”। সেই নাম ছাটির ওপর দিয়ে দশটা কথা চলে গেছে। পাখরের ওপর পাখরের সেই মাগ বুকেছে কি? তুমি বার-বার নাম ছুটি আবৃত্তি করতে লাগলে। “অহু হু” “অহু হু”। আমি বললাম—“চন্দ্রকর শোনাচ্ছে নাম ছুটো।” তুমি হাসতে হাসতে আমার বললে—“অহু হু” “অহু হু”।

হৃদয়ের তাপ ক'মে এসেছে; পশ্চিম থেকে আমার হস্তক'রে পূর্বদিকের আকাশের প্রায়শঃখা পখাৎ ঈষৎ তাম্রবর্ণ; গহবীন গাছগুলো বাতাসের ইতস্তত আন্দোলনে এতকণ ভবু-ও বা একটু দোল খাচ্ছিল, এঁরা ক্রমশ তা-ও বন্ধ হ'য়ে এল। দূরে একটা বাকা পথ দিয়ে কতগুলো শাণ্ডাল একগাڑী ঠাঁটা বাশ নিয়ে তা'দের ছোট্ট গ্রামের দিকে অগ্রগতির হচ্ছে দেখতে পেলাম—গরর গাড়ীরা একটা একটানা আগুগর; তা ছাড়া অসহীন নিঃশব্দতা। তোমার হাসির স্বর ক্রমশ বেড়ে চলল, বললে—“চন্দ্রকর শোনাচ্ছে না হু হু হু”? “অহু হু” “অহু হু”। প্রচণ্ড উত্তপ্ত বায়ু

কাঁর বাত্ময়ে অতি দীর গতিতে ক্রমশীতল হ'য়ে আসছে—অনেক দূরের পথ আমার কিংরে বেতে হ'বে—আমার সেই আলো-আশা সীমাবদ্ধ জ্ঞানামর মাহুরের রঙ—তাঁর সীমাবদ্ধ দেহ, সীমাবদ্ধ ভাবনা, এই ক্ষণকালীন সৃষ্টির আশ্রয়ে তোমার “অহু হু” “অহু হু” কথা ছুটি আমার মনের মধ্যে আর ছুটি কথা জাগিয়ে দিলে—“অগোরগীঘান”। হোবার আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমি বল'লে চললাম—“অগোরগীঘান” “অগোরগীঘান”।

‘সে কি হু হু হু?’
‘অগোরগীঘান—অগোরগীঘান!’
‘গাগল হ'য়ে গেলে না কি হু হু হু?’ ‘ওকি বলছে?’
‘তুমি বুঝতে পারবে না অহু! ‘অহু’ কা'কে বলে জানো?—atom; তা'র চেয়েও ছোট—electron! ও কথা'রানে হচ্ছে অহু'র চেয়েও ছোট!’
‘আমার চেয়েও ছোট, সে কি হু হু হু?’
‘তোমার চেয়েও ছোট, তা'র চেয়েও ছোট, তা'র চেয়েও—অহু চেয়ে বা ছোট, তা'র চেয়ে-ও ছোট—বুঝতে পারবে না অহু, বুঝতে পারবে না!’

প্রচণ্ড হাসির ধমকে হোমার চোখ ছুটি ছোট হ'য়ে এল—আমার দিক থেকে যুগ বিচিয়ে ছিছি-হি-হি ক'রে হাসতে লাগলে। আমি জানি তুমি হাসবে—বা বুঝতে পারো না, তা'তেই তোমার হাসি। কিন্তু আমি চমকে উঠলাম। ট্রিক তোমার হাসির-ই মত একটা অশ্পট হি-হি-হি হাসি আমি বেন শুনতে পেলাম ঠিক আমার শিঙ্গনে! ‘ওকি, ওকি অহু?’ তুমিও চমকে উঠলে। তারপর আমাদের সামনে, দিগ্ধনে, পাশে সেই হাসির স্বর ক্রমশ স্পষ্ট হ'তে স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। প্রচণ্ড পাহাড়টাকে বেনে ক'রে বেন সেই স্বর ক্রমশ আমাদের দিকে ঘনিয়ে এস—হি-হি, হি-হি!

তোমার হাসি কখন থেমে গেছে। বাইরের ভগবতের ক্ষণকালীন সৃষ্টি তেমন হৃদয়ের নয় মনে ক'রে তোমার হাত ধরে আমি টানতে লাগলাম—‘চলে এস, চলে এস!’ তুমিও আমার সঙ্গে ছুটতে আরম্ভ করলে। দুর্ভাগ্যবান! বনের মধ্যে কাপড়ের খানিকটা বইল ছিঁড়ে—

পাঁথের ঠোঁকর লেগে ছ'মনের পায়েই রক্ত গড়া'তে লাগল। অশ্রুবেশে সেই পাথের কাছে এসে তুমি বললে—‘আর যে ছুটতে পারছিবে নু হু হু!’ কিন্তু সে কথা শুনার অবকাশ কোথায়? যেটা অসুস্থ, অসুস্থ হাসি বল'লে মনে হ'য়েছিল, সেটা এখন আমাদের দুটিকে বিভ্রান্ত ক'রে দিলে। শন-শন ক'রে কে বেন জোর সমস্ত আকাশময় চাবুক চালাচ্ছে, আর অসংখ্য অদৃশ্য অশ্রুর স্রব থেকে উৎক্লিষ্ট হ'য়ে পৃথিবীর কীকর আর ধূলা সমুদ্রের পথ মাঠ সব একাকার ক'রে ফেলেছে। গাছগুলো প্রাণপণ শক্তিতে সেই বেগ রোধ করার চেষ্টা করছে কিন্তু তা'দের দীর্ঘ দেহকণ ও ধ'রে একটা সহস্রগুণ প্রবলতর শক্তি তা'দের মাটির দিকে নত করার চেষ্টা করছে। ছুটো বাতাসের স্রবের মধ্যে বিক্ষোভ বেয়েছে—একটা উত্তপ্ত আর একটা শীতল। পাখর, পাখর, মাটিতে, কীকরে সেই ভীষণ বিক্ষোভের অট্টহাসি, গাছের শরীরের সমস্ত রক্তকে তরঙ্গ ক'রে দিয়ে কঠোর ধরার উপক্রম করল। হৃদয়ের যেটুকু আলো ছিল, তা-ও আর নেই। পশ্চিম আর দক্ষিণ দিক থেকে বায়ুকীর সহস্র কণার মত সোদুপ উত্তপ্ত মেঘ-পুঞ্জ ক্রমশীভূত আকাশ ছেয়ে ফেলল। তোমার দিকে চেয়ে বললাম,—‘ছুটতে ব'লেই অহু, এমন ক'রে পাঠো বাঘটা পেরিয়ে ছুটতে ব'লেই লাইন পাওয়া যাবে’।

তুমি আমার সে কথা শুনেতে পেলো কি না জানি না কিন্তু হঠাৎ ছুটো হাত তুলে আমার কাছে ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলে, ভীত কপিত স্বরে বললে—‘আমাকে নিয়ে চলো হু হু হু’—এখান থেকে আমি নীচে নামতে পারব না, আমাকে বৈলে চলে!’

আমার তখন প্রাণাধিকার রাস্তা কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় ছুট হাত দিয়ে তোমাকে তুলে নিলাম। আজ সে কথা মনে ক'রে আমার হাসি পাচ্ছে—কারণ, কবিরের কাছে তোমাদের বেহের হাওয়া-লঘু কোমল হৃদয়ের বেহের হাওয়ার মত করণী সৌভাগ্য, কিন্তু সেদিন আমার যে বিকট হ'য়েছিল তা আজ মনে ক'রে আমার সত্যি হাসি পাচ্ছে। তোমার শরীরের ভাব আর কতই বা হ'বে কিন্তু রাস্তা পীরের পক্ষে যে কোনো ভাব বহন করাটাই জ্যামা

কারণ সে সময়ে তাঁর নিজের শরীরই তাঁর কাছে বল'লে মনে হয়।

বড় সমান ভাবে চলছে, এই অবস্থায় তোমাকে নিয়ে চ'লেছেটা পথ নেমেছি। হঠাৎ কি বে হ'ল! মাথাটা চক্কর মিমের ঘুরে গেল—টাল সামলাতে না পেয়ে পটিয়া আগিয়ে দিয়ে যেই একটু ঠাঁড়িয়েছি, অমন সেই চক্কর ময়ূরত্বের প্রচণ্ড ধাক্কায় একেবারে কীকরের নীরর মধ্যে ছ'মনে এসে পড়লাম। শ্রম লাবন হ'ল বটে কিন্তু সমুখে আমার খানিকটা খাড়াই আর সেই ছুটো অমল নগণ্য দেহখাড়া কীকরের—প্রতি পন্থনবেশের আশ্রিত অসুগ্রহে তা'দের চক্কর রাস্তা দেহে অসম্ভব বেননা। মাথার ওপরে চেয়ে দেখলাম, জমাট কালো খয়ের অন্ধকার—মানে মানে এক-একটা অসুস্থ কণ্ঠস্বরী হাসির উল্লাস। বুঝলাম, আজ আর বাড়া কিংরে থা'বার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তুমি অর্ধমুচ্ছিত অবস্থায় আমার বুকের উপর মাথা রেখে পড়েছিলে!

যে কোনো ময়ূরত্ব বৃষ্টি নামতে পারে—তা'রই অপেক্ষা করছিলাম। বৃষ্টি আর হ'ল না—অতের গর্জন বেড়ে চলল; মাথার ওপর কুটিল ক্রক মেঘ বেই প্রলম বেগে ইতস্তত উড়ে বেড়াতে লাগল। মনে থা'সবস্তর বল আর শালস সঞ্চয় ক'রে তোমাকে নিয়ে আবার উঠলাম, বললাম—‘কোনো রকমে এই খাড়াইটা উঠতে পারলে নিশ্চিত হ'বে! অহু!’ তুমি কথা কইলে না কিন্তু আমার কীকরে উপর হাত দিয়ে তোমার পেছের ভার রেখে ঘিরে ঘিরে অগ্রসর হ'লে। কোনো রকমে খাড়াইটা উত্তীর্ণ হ'লে আমাদের উপর এসে ঠাঁড়ালো। মাথার ওপর মেঘগুলো প্রচণ্ডবেগে ভেসে চলছে—ছিছমে খণ্ড আকাশের কীক দিয়ে মৃত হৃদয়ের শোণিতকরণের মত আলোহিত আলো সমস্ত মাঠখানিকে উদ্ভাসিত করেছে; তোমার হঠাৎ উৎসাহ ভিরে এস; আকাশ কীক থেকে হাত তুলে নিয়ে শোখা হ'য়ে ঠাঁড়ালে। মাথার চুলগুলো খড় উড়ে চলছে, চন্দ্রকর শাড়ীর ঈশলখানির খানিকটা পাহাড়ের কাছাকাছি কোনো জঙ্গলের মধ্যে আটকে আছে, শিখর কোথায় অস্বভিত হ'য়েছে—তোমার সেই ধূলিগলিন রাস্তা নয় পথ আর হৃদয়ের

সেই অমৃত পাণ্ডুর আলো—এসব আমার ঠিক মনে আছে !
 আমার দিকে চেয়ে বললে—‘দেখছ কি ? চলো চলো—
 যেমন ক’রে পারো রেলের লাইনের কাছাকাছি যেতে
 পারলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।’

তখন একথা মনে হ'ল না যে, একমাত্র রেশের লাইনই
সে অজ্ঞার যথেষ্ট নিরাপদ আশ্রয় নয়। মাহবুবে
গোলাশালী নিরাপদ নীড়-সহরতির প্রতি একটা ঘৃণা ভা-
সিয়েছিল, কিন্তু তখনকার মনোর অজ্ঞা হ'ল, সপ্তম
নিগরাতী শত্রু সিমেন্ট-পাইপে যে কোনো অবস্থানি মহা-
হতের চতুষ্কাপনিমিত্ত স্থানের প্রতি তখনকি অবিদ্যে
আজ্ঞাশ্রী। সৌভাগ্যকরে আমাদের প্রতি আর কেউর গা-
একই বিবে। শিখন থেকে বড় সাহায্য করলে-কালে
একটু তেজোটেই নিরাপদ অগিগিরে চ'লে এলাম।

সন্ধ্যা হয়ে এল, শীতল হাওয়ার স্পর্শ সচকিত হয়ে
মনে হ'ল কোথায় বুঝি রুটি নেমেছে। রেলের লাইন পিগুনসী-
থেকে বেরিয়ে এসে অর্ধচক্রাকৃতি হয়ে মাঠ প্রাঙ্গণ ক'-
আবার দিগন্তে আশ্রয় নিয়েছে। সিগনালের আলো নকল
পুল—সেখান থেকে আরও একমাইল হাটলে তবে বাড়ি
দিখা দিলে—আশোর কাছাকাছি যেতে পারলেও যে হয়।

তারের বেড়াটা টপকে এসে তোমাকে সাহায্য করলাম।
 চৌকিগাফের তারগুলো ছাড়ের শব্দ বয়ে নিয়ে চলছে—
 সোঁ সোঁ সোঁ সোঁ! এই সংবারটাই সেদিন মারাত্মক
 অকস্মাৎ দাঁবারে স্বর্গভরে বিপদাশী হয়ে উঠলো তুমি।
 চাঁদর ক'রে বসলে—“শুমাট বর থরু না”, শুমাট বর থরু না
 “শুমাট কেটে থখন বড় উঠেছে, তখন শুমাট থখনের শব্দ
 যে নিলবে একধা সেই নির্জন ভীষণ উঠবে এই বা জানু।

হোটেল প্রধান আপনার উদ্ধৃত কৃত্য নিয়ে ক
রিকের বিরোধ চাষ না। স্বর্গদ্বারায়িত অবস্থায় একাকী
জনশূন্য মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। পশ্চিমা সিংহ
আমাদের আশ্রয় দিলে। তাঁর হৃৎস্পোষা শঙ্খন নিয়ে
এক-ই এমন কত কড়ের কাত পার' করে দিয়েছে
একথা সে আমাদের স্তম্ভিয়ে দিলে। ভাগিন্স একটী রাগ
ভরিত করে সে জল রেখেছিল—তুমি আমার রমণ
সেই জলের সাধায়ে পরিজন্ম হ'বার চেষ্টা করত লাগলে

একখানি অতি দীর্ঘ মালগাছী হু-হু- করতে করতে
বেরিয়ে গেছে—তার একখানি শব্দই অতি দীর্ঘ প্রতিধ্বনি
দখান আর শুনতে পাওযা গেল না, তখন যেখি তুমি নিতান্ন
নিশ্চিন্তের মত পশিয়ার দড়িখা বাঁধায় তৈয়ারী, তখন
বেহা-ভার মনকে কন্ঠে— এতকি নিশ্চিন্ততা কোথা থেকে
তুমি গেলে জানি নে কিন্তু আমি, সেই পশিয়ার অপরিষ্কার
টুকুর ভেতর বসে প্রায় তিনশত বছর হাবার উজাক-করেছি—
বিরহনা, দুঃখি, ভবিষ্যৎ সমস্ত জ্ঞান পেয়েছি—সেই রায়ে
সব পুথিবীতে যে স্থানের চারিদিক অবশিষ্ট করছে—
বাতাস দিখি ক'রে সে যে প্রবলগেয়ে ছুটে চলেছে, তাইই
অনাহত পূর্ণাঙ্গান ধনি যেন আমার মস্তিষ্কের মাধ্যমে প্রতিভত
হ'তে পাওয়;— যদ্যেকি ক'র মনে করছি, সেটা মনে ক'র
সব—পৃথিবীর গভীর শব্দ—সেী—সেী—সেী—সেী। কতগুল
ইহাংবৈ ছিলো জানি মনে, হঠাৎ পশিয়ার কণ্ঠেরে ঢমক
ঢাকল—“বাঘী, গাছী নিয়ে এসেছি—কিছু বস, গিস।”

সেই অন্ধকার বড়ের রাতে পশ্চিমা কোথা থেকে একথানা টাঙ্গা ভাড়া করে নিয়ে এসেছে! ঘুমরাগ, অন্ধা ঘুমরাগ! কেউই তা'কে গাড়ী ভাড়া করতে বলে নি—আমাদের নিতান্ত মল্লমল্ল আর অসহ্যবাহু গাড়ী থেকে সে তা'র হুসনাখা চানচনিটা নিয়ে, কখনও গাড়ীভাড়া করতে গেছে, একটুও টের পাই নি। অর্দ্ধমিহি পাভাবীর পকেট হাতড়ে বা কিছু ছিল তা'র হাতে দিয়ে দিলাম। তোমাকে একরকম টেনে উঠিয়ে দিলাম চলাশ। পশ্চিমা বিনাবাক্যবাহু সেই আলোটা নিয়ে শাইণ করে চলে দিল। লাইনের পাশ দিয়ে বেঁকে শহর বাজার রাস্তা—খুঁহরে কাশো বড় বড় গাছ, বাহ্যময় তা'ই কিংবা দেবদ্বার—ভেঙের গর্জনকে তা'রা ভাণ্ডারের করে তুলেছে।

‘বহুং আচ্ছা’!—সে অবস্থায় চক্রাকৃতি রৌপ্য পাখ
বাঁক’করে উড়ে চলে! বাহুঘের শরীর আর মনে
কান্নি রৌপ্যচক্রের পরিমাণ জ্ঞান করে না।

তোমার চোখের চারিদিক ঘিরে ঘন তন্দ্রার খো
নেমেছে। চলমান টাঙ্গার মধ্যে কখন তোমার মাথা
আমার কাঁধের উপর গড়িয়ে পড়েছে, তা তুমি নিশ্চ

পালো না। নভাই কোথায় বুঠি হয়েছে—ঝড়ের গর্জন
 হীরে হীরে মরুর হয়ে আসছে—বিশাল বায়ুওগলে মাঝবান
 দিয়ে এক-একটা শীতল বায়ু-রেখা পোনে পোনে টেনে দিয়ে
 বাচ্ছে। রাহী। নোভাগর রাত্তার ছোট্ট ঘুটি বেগে লেগেছে—
 হুং টুং। ফেরাণ রাত্তার মাঝবান পাহাড়তালি মাঝে
 মাঝে মুদিবানায় অনোহা অলুছে—জিরাণিতের মত ছুই-একটা
 লোক সোপানে গাড়িয়ে আছে—মুখপাল বেগা যায় না।
 কর্কর পাথুরে রাত্তায় টাটার চাকা গড়িয়ে গড়িয়ে লেগেছে।
 রাহীর অন্ধকারে প্রকাশের বিস্তীর্ণ গাড়ির বন্ধুরতা। লুখ
 হয়েছে—দূরে অর্ধচক্রাকৃতির বেগের লাইন ধরে বোয়ায়
 বেশ ট্রেন শপশে অঙ্গুর হয়ে আসছে। অবসর দেহে
 মনে, অবসর মস্তকে কে যেন গীরে গীরে একখানি কোমল
 গলক বুজিয়ে থাকে। তস্মা-চেতনার গৌই অবস্থা মোহের।
 প্রত্যেক অহুচ্ছিত কোথায় বুড়ো বসেই হয়ে যায়। মন
 ইন্দিয়াতীত লোক ঘুরে ঘুরে—মনে মনে গা। মন
 আমার সমস্ত দেহ, সমস্ত চেতনার উপর দিয়ে অম্ভ্যা
 গলক বুজিয়ে থাকে—একটু নর, অম্ভ্যা। নিশীত
 উপরে লম্বুয়ে ছোট ছোট তাঁতার মাঝে মনে কেনে
 বেড়াচ্ছে—মূল আর তাঁরা-তাঁরা আর মূল। যেগুলো
 যেন একটা মূল্য মত আমার দেহে বেধেন ক’রে ধরেছে—
 আর কতকগুলো যেন আমার মুখের উপর, আমার চোয়ের
 উপর, আমার রাহ অফ ওড়ের উপর বর-বর ক’রে
 ধরে পড়ছে—আমি, অনন্তকাল ধ’রে যেন লেগেছি। অম্ভ্যা
 থও থও শব্দ, থও ছিন্ন রূপ, অপট্ট, অননহুচ্ছিত গা
 একটা বিজিত অশওতার মতো সম্পূর্ণ হয়ে উঠল—অনর,
 হুমর। অনন্তকাল ধ’রে এমনি অথকুপবলনি—এমনি সাজে
 হুনিড়। শীতল অন্ধকার—এমনি কাব্যায় কাব্যের
 মস্তকভাষে। এই সর্বস্বময় মুখ দখরীর বুকের প্রাণপশন
 অন্তে অন্তে, এই বীরে হুচ্ছিত—অনর, হুমর।
 হুস্তার মধ্যে হীরে গীরে লেগেছে—অনর, হুমর।

‘রগু দা’, রগু দা’!—জেগে উঠলাম।—‘আজকে আর
আগুন জলে নি রগু দা, দেখতে পাচ্ছ কোথাও আগুন?’

অনন্ত অবসাদেই মন্থে আজ ক্লান্ত মানুষ ঘুমিয়ে পড়েছে ।

কোণায় আগুন? বল্লাম—‘আজ কি ক’রে আগুন
জলবে? মানুষ ঘুমিয়েছে!’

দশবছরের আর স্রুষ্টি আর বিধতির পার থেকে অমল
 একবার জেগে উঠলাম, অনিলা। সত্যই বুঝিয়ে পড়ছি
 তেমনি, ঝড়ের মত আর একবার অন্তরে গুলো—‘চলো
 হুঁ না’। অমল! জেগে আমি—‘বলতে পারো
 পারো না অনিলা, আজ আর তা’ পারো না। অবকাশ
 নেই অনিলা, আজ আর আকাশ দেখবারও অবকাশ
 নেই। প্রতিদিনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত নানা ভাগে বিভক্ত
 হয়ে গেছে—নিশাখাল দেবার অবকাশ নেই। ভাঙে কা’রে
 চাইবার নেই।

দশ বছর আগেকার একটি দিন আর একটি রাত্তিকে আমি হারাতে দিই নি—সেটিকে আজ তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। যদি অপরাধ ঘটে, ক্ষমা করো।

রঞ্জন মিস্ত্রির চিঠি পড়া শেষ ক'রে ড্রয়ার খুলে খাম
বা'র করতে বা'বে—এমন সময় বাইরে সি'ড়িতে কে যেন
ডেকে উঠ'ল—'বৈকুণ্ঠ, এই বৈকুণ্ঠ !'

হরেন ঘোষ, নিশ্চয়ই হরেন ঘোষ। এসে পড়েছে—
সর্গনাশ! ধামে ধামে চিঠিটা এটে ভাঙাভাঙা টিকানা
লিখেছেন রমণ :—ঐমতী 'অনিলা দত্ত, তারপরা, তারপরা
কি ক'রবারা অ'য়? মনে রেখে! অশ্রুপাঙ্কল। মনে নেই কি
নাঃ, কিছুতেই মনে আসছে না। শুধু মনে পড়েছে 'হারভাণ্ডা।'
কিন্তু হারভাণ্ডায় 'অনিলা দত্ত আরও কত বাঁকে পাবে।
কিছুতেই মনে আসছে না—পওনাম। বাইরে মোটা
ভাণ্ডারীসারী কে বন্ধুচ্ছে—'হু' পরসার 'চিড়ে, হু' পরসার 'কালি,
হু' অ'য় পরসার দই—বাকী 'হু' পরসার ফেবং 'অনিলা
বৃষ্ণি।' খারাপ কথা এনো না ব'লে দিচ্ছি, বৈকুণ্ঠ!'
পরফর্মে 'চিড়ে-দুগুণা দই, দুগুণা দই ম'ল হ'তে লাগল।'
ধামে 'চিড়ে' এটে, নামাটী 'কেটে' দিয়ে রমণের ছুরায়
মুখে সোপানি বাবে কাগজের পাশে ফেলে রাখল।

ছাঁদ

শ্রীকৃষ্ণদেব বহু

কেবেহিলাম, একটা কবিতা লিখবো। বড় সুন্দর সন্ধ্যা: নিম্নত-পোল-হ'য়ে পুর্নিমার চাঁদ উঠেছে। আকাশ পরিষ্কার, সমস্ত বায়ুমণ্ডল মুক্তা-বুজ। তাঁর ওপর, একটু আগে যখন রাত্তার বেরিয়েছিলাম, হাওয়ার অল্পভব করেছিলাম একটা অল্পত খাদ, যে-খাদ যুদ্ধ-ক্রিয়ামূলি নিম্ন মনের মত রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে। এ-হাওয়া আকস্মিক, অনিয়মিত; স্বচক্রেবির বিধান-অস্থায়ী নয়, বিনেধ-কোনো স্বভূত নয়। বাপছাড়া, ধামেধামি এই হাওয়া, তা'তে বর্ষার আর্দ্রতা, প্রথম বনস্তের মদ্যিতা: মনের মধ্যে অজস্র স্মৃতির উজ্জীপক এই হাওয়া। শীতের প্রথম হৃদয়ান এ-হাওয়া অপ্রাসঙ্গিক—এমন কি, অশোভন। কাল সন্ধ্যাবেলাও বায়ুমণ্ডল ছিল নিখর: ঘোঁড়া আর কুয়াশা নিলে এক সাহসের ব্যাপার। আমাদের তা ব্যাপার লেগেছিলো—কিন্তু এই তো কল্‌কাতার শীত, এই তো আশা করা যায়। আজকের এই স্বচ্ছতা, হাওয়ার এই অল্পত খাদ আমাদেরকে অপ্রস্তুত করে' দিয়েছে। হঠাৎ এ কী?

কবিতা লেখবার মত সন্ধ্যাই বাটে। মনের মধ্যে একটা স্মরিত গুহন চলছে: কী একটা কথা যেন প্রকাশ-উদ্ভূত হ'য়ে উঠেছে, সেটা বুঁজে পাচ্ছি নে। সন্ধান করছি: সামনে রয়েছে কাগজ-কলম। কিন্তু মন ছড়িয়ে থাকে—প্রাণে বসেছি, তাঁর সামনে পুরস্কিতের একটা ভানিলা—ব্যায় ছ'কুট উঠু। আমি যদি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াই কি কাঁধ উঠু করে' তাকাই, তা হ'লে আকাশের চাঁদ আমার চোখে পড়ে—টিক আমার মুখোমুখি। বাব-বাব আমি তাকাছি; বামিক পর-পরই চাঁদকে একটু দেখে নিচ্ছি—সোজা এবং সলজ দৃষ্টি, সাকস অথচ অসিক্ষ—যে-দৃষ্টিতে নবীন প্রেমিক তাকায়, বাকি কখনো প্রিয়ার অনাবিষ্টত বঙ্গবল দেবায় তাঁর চোখের সামনে উন্মোচিত

হ'য়ে পড়ে। প্রায় ইন্ড্রিগতর, মাংসগত উপভোগ নিয়ে চাঁদকে আমি দেখছি—এবং সঙ্গে-সঙ্গে মনে হচ্ছে, এ না হ'লেই ভালো ছিলো। কারণ, সত্যি বলতে চাঁদটা 'আম' একটু বাড়াবাড়ি করছে। এত বেশি সৌন্দর্যে আমরা মসারের মাহুং অভ্যস্ত নই; তা'কে সন্দেহের চোখে না দেখে আমরা পারি নে। এত বেশি সৌন্দর্য নিয়ে আমরা কী-করবো—আমরা, প্রাণধারদের অশান্ত চেষ্টায় বা'রা নিরবসর? ছোট চুপে আর হুপে, আশার আর নিফলতার বায়ের জীবন দিন থেকে দিনে বোনা একটা তুচ্ছতার জাল? বা কিনা প্রিট-প্রিট, বা দেখে 'বা:!' বুজ' ওঠা যায়, তা'কে আমরা আন্তরিকভাবে ভালোবাসতে পারি। কিন্তু তাঁর পরে অথই জল; সেখানে আমাদের নিখাস আটকে আসে। 'এই আকাশপ্লাবী কোয়াং, বা'র কাছে এলে স্তব্ব হ'য়ে যেতে-হয়, মন মার হ'তে চায় এক মুহূর্তির অসত্যতা—এর প্রকাণ্ড অনাবিক্ততা আমাদের নাকের পীড়া দেয়। এর সৌন্দর্য প্রবলভাবে আমাদেরকে আকর্ষণ করে, এবং সেই আকর্ষণে আমরা আপত্তি করি, অবজ্ঞেন—প্রায় সচেতনভাবে তা'কে রোধ করি। কোনো বহির্জন্মের কাছে পরাকৃত হ'তে আমরা চাই না। আমরা তাই কোনো হৃদয় ভিষি ঘেঁষে একটু অংশসা করতে—চাপার তুলে যেতে, যুদ্ধান্ত্রিত দ্বিরে যেতে বাবাপ্রাপ্তি কাজে। বা আমাদের সত্তার অঙ্গকার মূলকে স্পর্শ করে—

কারণ এ যে তা-ই করে, আমাদের সত্তার গভীরতম মূলকে স্পর্শ করে', এই চাঁদ, বা'র আকর্ষণ আমাদের বায়ু-তন্তুতে, হৃৎপিণ্ডকে কেন্দ্র করে' অবিস্রাস্ত বের-কুস্রোত বইছে, তাঁর গতিতে। চাঁদটা চ্যাপ্টা, চাঁদটা রূপার একটা পাংখা পাংখা মত—এত পাংখা যে মনে হয় আর-একটু যুদ্ধ দৃষ্টি থাকলে তাঁর উল্টো দিকটাও আভাস পেতাম—যেদিক মাহুয়ের চোপ থেকে চিরকাল, চিরকাল সে গুচ্ছ

রেখেছে। চাঁদের উল্টো দিকে, পৃথিবীর দিকে বা সে কখনো কোয়ারি নি, আউনিজ, তা নিয়ে জরনা করছিলেন: সে কি কুচিত দহবিকশী ভ্যাল তুয়ারগর্ভত? না কি অশুর্ষ অজিষ্কুরিত। নীলমণি? জরআমটর বেরিকের কোনো আভাস পান নি—না, গ্যালিলিও নয়, হোমার নয়, কীটস—কীটসও নয়, কোনো মাহুয়কে ভালোবেসে চাঁদ কি তাঁর দিকে কোবো সেই দিক? হয়-তো আমিই সেই মাহুয়, হয়-তো কোনো অপ্রত্যাশিত, অপকল্প যুহুতে, হয়-তো এই যুহুতে—কিন্তু না তাঁর কীরকর? আমাকে যুহু করবার পক্ষে এই যথেষ্ট, মাহুয়ের যুহুতহায়ী বংশের পর বংশ চাঁদের বেরিক দেখেছে, গ্যালিলিওর চাঁদ, কীটস-এর চাঁদ। এই যথেষ্ট; প্রিয়ার হঠাৎ-উন্মোচিত স্তনভার মত এই আকর্ষণ; আকাশের গায়ে জীবন্ত একটা সচেতনতা, আমার রক্তের সাথে বা'র গোপন, অবিস্রাস্ত সহায়ভূতি। কিন্তু চাঁদ একটা মৃত উপগ্রহ, চাঁদ বায়ুহীন; চাঁদ মহাশূন্যে পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী, রকেটযোগে সেখানে বাবার চোঁটা হচ্ছে। পৃথিবী যখন পর্যন্ত অঙ্ক-তরল, ঘূর্ণবেগে তাঁর একটা অংশ স্থলিত হ'য়ে পড়ে, ঠাণ্ডা হ'তে যায়, তাঁর নাম, চাঁদ। পৃথিবীরও একদিন এ-অবস্থা হবে। 'ওঠা বলে, চাঁদ একটা পাখর,' ডি, এইচ, মের্সল উদ্ভাক হ'য়ে বলেছেন, 'চাঁদ ঠাণ্ডা, ওঠা বলে, ঠাণ্ডা ভয়ে-বাগা।' লরেন্সের এই উত্থাপিত সঙ্গেরই বোঝা যায়; আমি যে অল্পভব করছি, চাঁদ হচ্ছে স্ত্রী-সত্তার প্রজীক—না, প্রজীকমান নয়, চাঁদ সেই সত্তা, জীবন্ত, ইন্ড্রিগ্রাহ্য, অসীমপ্রাণী—আমি জানি। একটা পাখর... না, না, ঠিক আমার জানাবার বাইরেই যখন পুর্নিমা চাঁদ, ওখন অল্পত নয়, কিছুতেই নয়।

কারণ, এতক্ষণে চাঁদ একটা ওপরে উঠে এয়েছে যে ঐশা-আন্দোলন না ক'রেই তা'কে দেখতে পাচ্ছি; যথানে বসে আছি—জানালার দিকে বসে চোপ ফেরালেই হয়। চুস্তির সহিত লক্ষ্য করছি, জানালাটা বেশ উঠু; আরো বামিকল্প চাঁদ আমার দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত আছে। মনে-মনে ভাবছি, শীত তো এসে পড়লো; কুয়াশার আর ঘোঁরায় চাঁদের এ-কৌশল আর থাকবে না; কয়েক মাসের মত এই

শেষ চন্দ্রবর্শন। বিরহে চুপে—মন ভরে' উঠছে। তবু শোব আরো কয়েক রাত চাঁদকে দেখবো, এই চিন্তায় তা নিজেকে সাধনা দিচ্ছে। কিন্তু কল্পপঙ্কের চাঁদ প্রেমের শেষ পরিচ্ছেদের মত, প্রণয়ীমূল্য যখন পরপরের চোখে তাকতে সাহস পায় না, পাছে সেখানে তাঁদের ভালোবাসার মুদ্রাখণ্ডা দেখতে পায়। প্রেম যখন মরে' গেছে—অথচ চন্দ্রলজ্জার থাকিতের, অতীতের স্মৃতির সামনে, ছ'জনকে অভিনয় করে' বেতে হচ্ছে, সেই রাষ্ট্রি, সেই দিলিয়ে বাবার আভা কল্পপঙ্কের চাঁদের মুখে। আমরা সবাই যখন ঘুমিয়ে আছি, চুপি-চুপি সে উঠলো; দিনের বেশায় বুজোবার কর্তা তা'কে, হৃদয়ের আলোয় প্রজ্জ্বল। হুতরাং—কিন্তু না তাকানো যে অসম্ভব—আমার এত কাছে, জানালার ঠিক বাইরে! আমি না কেবেছিলাম, কবিতা লিখবো? কিন্তু কোথায় গেঁলো কবিতা? চাঁদের শক্তির চাপে তা টুকুরো-টুকুরো হ'য়ে গেছে, মনের কোন বিষময়-গুহায় ভুবে গেছে—এখন, যতই চেষ্টা করি, তা'কে আর কোঁড়া লগায়ে পাবো না, পাবো না কিরিয়ে অনুভব। যে-জন্মির প্রোভোত তা'র প্রথম উন্মেষ, তা'র আভিস্যের ছাঙ্ক সে পরাক্রমী। কবিতা লেখবার প্রক্রিয়াটা বড় অল্পত: মডেল সামনে রেখে লোক ছবি আঁকে, আকাশ দেখে-দেখে ফুটরে তোলে তাঁর রঙ, কিন্তু এ-প্রথা কবিতার খাটে না। যতকণ আপনি সত্যি-সত্যি একটা জিনিষ দেখছেন, দেখাতেই এত ব্যস্ত থাকেন, কথা নিয়ে ভাববার সময় পান না। শেষ বিমোহনে দেখা যাবে, কবিতা-লেখা ক্ষয়প্রাণের ব্যাপার যতটা, মনীষারও ঠিক ততখানি। কারণ, যতই আশানার মন অবগণপরিজ্ঞাত হোক, লেখবার মন আশানার নিবিষ্ট হ'তে হবে শব্দ সংযোগানয়—এবং সেটা মনোহারী কাজ। অবিশি, আপনি যে শব্দের যাচ চিকিমত ধরতে পারছেন, তাঁর কারণ ঐ আবেগ: ঐ আবেগের শব্দগুলোকে রূপান্তরিত করছে, নব-উজ্জীবিত করছে, তা'দের সঙ্গীত, অসীমপ্রাণী ইঙ্গিত, সঞ্জে আপনাকে তীকু ও নিম্নলভাবে সচেতন করে' তুলছে। কিন্তু সেটা ব্যাপক নোপলো, আশানার ওপর তা কোনো দাবী করে না, তখনকার মত কবাই হ'য়ে ওঠে আশানার পক্ষে সঙ্গপ্রদান। রস্বত, প্রত্যক্ষ-ভাবে কবিতা

লেখা বাহন না; বতফণ একটা জিনিষকে সতি-সতি দেখেছি, এমনভাবে তাঁর মোহে পড়ে বাঁধি যে ভালো করে তাঁকে দেখতেই পাচ্ছি নে। তাঁকে ঠিকভাবে, পরিপূর্ণ করে দেখবার জ্ঞান চাই কল্পনার নিরাসক্তি। কল্পনায় যখন আশ্রয় নহে, অভিজ্ঞতা তখনই ফলপ্রসূ হয়। এবং কল্পনা উল্লেখিত হয় সৃষ্টি দ্বারা। সৃষ্টি মাহুয়ের মত শক্তি। একটা জিনিষ আমাদের যখন মনে পড়ে, তাঁর সেই রূপ, কাব্যগত হিসেবে, তাঁর বর্ণনার অভিজ্ঞতার চাইতে অনেক বেশি সত্য। কবিতা, ভাষা, এখন হ'বে না; অলংকার করতে হ'বে, বসতিন না সৃষ্টির পরিলক্ষিত, কল্পনার দীপ্তিতে আজকের এই সমাজকে দেখতে পাই, এই চাঁদকে। হয়-তো কোনো গরম হুপ-বেশার সে-সুড়ই আসবে; কিংবা ইলেক্ট্রিক টেন্স-ল্যাম্পের ছোট আলোক-চক্কের মধ্যে বন্ধী, আজকের এই কবিতাকে লিখতে থাকবে; জানবো না, জানতে চাইবো না, বাইরের মেঘলা আকাশ ছিড়ে এইমাত্র একটা তারা শুকনো। কিংবা হয়-তো এককবিতা কখনোই আর লিখবো না।... হঠাৎ আবিষ্কার করলুম, আমি বতফণ কবিতার কথা ভাবছি, ভাব ততক্ষণে আমার দৃষ্টিগত থেকে অস্তিত্বই হয়েছে। বাড়ির দিকে তাকানুম, ঠিক এক ঘণ্টা। এই চেয়ারে বসে' আছি। এক ঘণ্টা; পৃথিবী এর মধ্যে মহাশূন্য বাহ্যস্তর হাওয়ার মাইল পরিভ্রম করেছে, তাঁর ফলে এখানে বসে' চাঁদকে আর দেখতে পাচ্ছি নে। 'আকাশ' একটা মনুষ্যীয় শব্দ; তা এখন শুধু আলাপিকিত, আলোচ্য নয়। যের আলো জলছে, চলছে পাখা। দেশালী জলবার শব্দ; সিগ্রেটের নীল ধোঁয়া বুকুর ভেতর থেকে শাখা হ'য়ে বেরিয়ে আসে। কিরে এসেছি সত্যতার, বৈদ্যনিক জীবনে, অত্যন্ত তুচ্ছতায়।

আজকের মত রাত্তিরে ঘরে বসে' ইলেক্ট্রিক সিট পেড়ানো লজ্জার বিষয়। অস্ত, পেশাদার প্রকৃতিপ্রেমিকরা তাই বলবে। পল্লপ্রভের সঙ্গে পরিচিত কলকো-পড়া ঘেরে, ওর বৈদ্যন স্বাভাবিক বসন্তে পাবে এমন ছোঁকা কবি, অর্থ উপার্জন এবং বায় কৃত্যবার অবসরে আট ভালোবাসে

যে সমগ্র আঁকতেই ধরা করে' দিচ্ছে এমন সৌন্দর্য আঁট-উপাধার—এরা কেউ আজকের মত রাত্তিরে ইলেক্ট্রিক সিটের অপব্যয় করবেন না। 'আজকের মত রাত্তিরে' এরা বলবে, 'লোরেঞ্জো-জেনিসকার প্রেমামিত্র, আজকের মত রাত্তিরে—কিন্তু আপনি তো ও-সব জানেন।' জানি; কিন্তু আমার প্রকৃতি 'অসদ'; আমি ঘরদুলা, বাড়ি থেকে বেরোতে না পারলেই আমি ঘুমি হুই। আজকের মত এমন একটা চাঁদ যখন আকাশে সজল, তখনও, তখনও আমার পক্ষে 'অভ্যন্তর কাটিয়ে তঁরা সহজ নয়। তখনও মধ্যে মধ্যে নিজের চেয়ারে বসে' চাঁদকে বতফণ দেখতে পেয়েছি, বেয়েছি; আমার দোষ নয়, এখন যে আমার পক্ষে সে অসুভূত হয়েছে। হাতের সময় একটা গাঁটের অর্থনীতি, বাড়তি হস্তার মত স্মৃতিছে; ভাবছি, কোনো-এক বছরের বৃন্দাবনে সঙ্গে তাঁকে ছুড়ে দেবো কিনা। সঙ্গে-সঙ্গে মনে হচ্ছে, বাইরে আকাশ আলোয় ভেসে গেলো—এত আলো, পাখীরা উঠছে ডাকাডাকি করে'। এই অকূল আলোর আকাশের নীচে ধাঁড়ানো—তা-ই একটা ঔষধ! শুধু যদি আমার একটা ছাব থাকতো! কিন্তু আমি বাস করি বেতলা বাড়ির নীচের ফ্ল্যাটে—ছাব আমার এলাকার বাইরে। আকাশের নীচে যেতে হ'লে আমার পক্ষে রাত্তার বেরুনো ছাড়া উপায় নেই। রাত্তার বেরুনো, বাস-এ চড়া, মদ্যান; কিংবা হয়-তো আলিপুরে আলোর কোনো গল্প-ছায়ারিত রাতা, গম্বা-গম্বার জট-আলোকের মত রাত্তে কল্কলার গল্পও বোধ হয় হস্তর, কোথাবার রূপান্তরিত কল্পনার শক্তি 'অপরিণীত'। আকাশের নীচে, আলোর আকাশের নীচে। কিন্তু জানি, এ আমার হ'য়ে উঠবে না। বিশ্বাস সময় কলকে বাবে, আসবে, থাকার সময়, যুগের সময়। আমি যখন মশারির নীচে বসে, চাঁদ হেলোছে পশ্চিমে; সন্ধ্যার অজগ-উজ্জ্বলিত আলো এক বিশাল তরুতার সমাহিত। কাল সন্ধ্যার আলোয় ঘুম ভেঙে এই চাঁদের কথা আমার মনে পড়বে না; চাঁদ আর থাকের কাগজ নিয়ে বসবো। হস্তরও এখনই চাঁদকে বিদায় বলতে হচ্ছে।

কিন্তু 'অনিচ্ছাস্থ্যে; বিদায় বলে'ও মনে-মনে এইছাড়া না

করে' পারছি নে, আমার ঘনি একটা ছাব থাকতো! ছাড়া একটা মুক্তি; নীমাইনতর, সৃষ্টির রহস্যময়তার সঙ্গে একটা সংস্পর্শ। মাহুয়ের আছার—অনেকের মধ্যেই রহস্য, নিবেত্ত, কারো-কারো মধ্যে নানা বিস্ময়ী শক্তির সঙ্গে নিয়ত সংগমশীল, লোকে একজনের মধ্যে পূর্ণজাগ্রত, অব্যাহতবে সত্যি—মাহুয়ের আছার যে-অবেগ, অজীবা—সাংসারিক ক্ষেত্রে, অত্যন্ত নিরবত্রে, তা ঠিক, অত্যন্ত ক্ষুদ্রভাবে—তবু বর্ণার্থ-রূপে, ছাড়া তাঁরই প্রতীক। আমাদের ঘরের বেশ; তাঁর ওপর, বাইরের সঙ্গে নিজেদেরকে যুক্ত করবার জ্ঞান অর্থব্যয় করতে আমরা অক্ষম; ছাব, তাই, বাঙালীর এত প্রিয়, নিদেনপক্ষে দোতলার থোলা একটু বারান্দা, কোনো কাঠেই বা লাগে না, বাঁজাখাখি হ'বে, ঘরের ভেতর স্থান সন্ধানই হয় তো হোক, তবু সেই থোলা বারান্দাটুকু আমাদের চাই। বলা বায়, ছাব আমাদের বাঙালীদের একটা জাতীয় প্রতীক। আমাদের গল্প-উপাধাসে, প্রেমের কবিতায় ছাব একটা Stock-in-trade গোছের। কিন্তু একটা জিনিষ যে সাহিত্যের কল্‌ভেন্সন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তা-ই প্রমাণ করে যে তাঁর 'মূল জীবনের কোনো নিমসংগে সত্য আছে। বাঙালীর মনে ছাব কত যে পরস্পর-বোঝিত চিত্তাধারে উদ্ভেক করে, তাঁরা দেশের লোকের পক্ষে তা বোঝা শক্ত। দেবেন সেন যখন বলেন, 'চিলে ছাতে বাই', এই ছোট্ট একটু কথাই বাঙালীর সমস্ত চিত্তবৃত্তী স্বভাবের হ'য়ে ছোট্ট—দিগাহাৎ থেকে সন্ধ্যার যিঘতায় নিষ্কিরণ মূর্ধ প্রিজা-সন্ধ্যার প্রত্যাশায়। হিন্দু বৌদ্ধ পরিবারে যার সঙ্গেও যখন গুণি মিলিত হওয়া যায় না; সন্ধ্যার একটু অবসর, বাড়ির লোক যে যাঁর মনে আছে—সবার ঘাে এড়িয়ে স্নানার পাশেই এশান ছাড়ে। ইয়োপোণী হস্তপ্রণীত প্রেমালীলার 'অত্যন্ত সাধারণ' যে-সব সরঙ্গান—বেস্তার। আর ঘিটের আর ট্যানি—আমাদের ভ্রমশ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশের তা সাধারণত; এবং আমাদের বাড়ি-কলার ঘরের সন্ধ্যা অবিস্মারিত তুলনার সাধারণত অত্যন্ত সুন্দর, তাঁজনে 'ধানিক সময়ের ভ্রম'ও একটা ঘর গুণপূর্ণ দখল

করতে পারার আশা নেই; বাড়ির ছাদ, তাই, একমাত্র জায়গা, প্রণয়ীরাগে যেখানে নিশ্চিন্তভাবে একটু হাতও ধরতে পারে, ছা'একটা মনুষ্যসংগত করতে পারে। আবার, উপরি-উক্ত দ্বিতীয় কারণে ছাটটা গািব্যাবরিক সাধন-স্থানের কাজ করে; ঘরগুলো ছোট, ঘরের ভেতর গরম—বাড়ির সবাই নিলে যখন গরম করতে হ'বে, কোনো পরিবার-গত, সাধারণ সমস্যার যখন সমাধান করতে হ'বে, তখন—চলো ছাড়ে বাই। আমাদের জীবনে ছাদ তা-ই, ইয়েরজের জীবনে ফায়ারগ্রেস বা—অস্ত, এককালে যা ছিলো; কাগজ, ইলেক্ট্রিক সিটের কল্যাণে, শুন্দুম, সাবেকি, যদ্যদয় ফায়ার-গ্রেস ও-বেশ থেকে সম্প্রতি প্রায় উঠেই গেছে।

বাড়ি ভাড়া নেবার সময় আমরা সবচেয়ে সব ঘরগুলো দেখে নিই—শোবার ঘর, যানের ঘর, রান্নাঘর—সেরায়ে চুলাকান করিও, মূদের ঘরে জানালার লাগাও অবশ্য কাচ, এ-ঘরটার কঠোরে নাও একটা ক্যান-পেটেন্ট, রান্নাঘরের বেঁকেতে লাগাও একটু সিনেট—সত্যক গৃহস্থ কোনো বিদ্যে জট হতে দেয় না। এবং সারাফণ—ছাব থাকে ছাদের মনে; ছাব ব্যবহারের জিনিষ নয়, ছাব কোনো কাজে লাগে না, তাঁর প্রতি কোনো মনঃসংযোগ নিষ্প্রয়োজন। শোবার ঘর, যানের ঘর, রান্নাঘর—জীবনধারণের জ্ঞ, স্বাস্থ্যকর জ্ঞ এদেরই দরকার, এরা ভালো কি মন্দ হ'লে অনেক কিছু এসে যায়; এরাই গৃহ, সাধারণ মাহুয়ের জীবনের বা বোঝা শক্ত। দেবেন সেন যখন বলেন, 'চিলে ছাতে বাই', এই ছোট্ট একটু কথাই বাঙালীর সমস্ত চিত্তবৃত্তী স্বভাবের হ'য়ে ছোট্ট—দিগাহাৎ থেকে সন্ধ্যার যিঘতায় নিষ্কিরণ মূর্ধ প্রিজা-সন্ধ্যার প্রত্যাশায়। হিন্দু বৌদ্ধ পরিবারে যার সঙ্গেও যখন গুণি মিলিত হওয়া যায় না; সন্ধ্যার একটু অবসর, বাড়ির লোক যে যাঁর মনে আছে—সবার ঘাে এড়িয়ে স্নানার পাশেই এশান ছাড়ে। ইয়োপোণী হস্তপ্রণীত প্রেমালীলার 'অত্যন্ত সাধারণ' যে-সব সরঙ্গান—বেস্তার। আর ঘিটের আর ট্যানি—আমাদের ভ্রমশ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশের তা সাধারণত; এবং আমাদের বাড়ি-কলার ঘরের সন্ধ্যা অবিস্মারিত তুলনার সাধারণত অত্যন্ত সুন্দর, তাঁজনে 'ধানিক সময়ের ভ্রম'ও একটা ঘর গুণপূর্ণ দখল

দিন থেকে দিন তাঁর জীবন গড়িয়ে চলে বাঁধা পথে—গৃহগত, গৃহাশ্রিত তাঁর জীবন। এবং সেইজন্যই আত্মা বেশি অর্থের চেষ্টায় পাগলের মত তাঁর ছুটোছুটি—রামাথরে বাঁতে পাগলের উত্তন বসাতে পারে, রানের ঘরে একটা গরম জলের কল, শোবার ঘরে বড় একটা আয়নাতে গিমির সখ গেছে, পালকের বালিশ হ'লে বড় ভালো হয়। এই সব—বাইরে থেকে বা আমাদের দেখতে পাই—এই তো বাস্তব, অস্বাভাবিক বাস্তব। কিন্তু একবার ভাবুন—এই শোভার জীবনে একটা সন্ধ্যা এলো অবসর! কী করে! এসময় কাটাতে সে ভাবো না। কী খেয়াল হ'লো তাঁর, বেরুলো ঘর থেকে; সিঁড়িটা আধো-অন্ধকার, মত রাজার বাঘে জিনিষ ছেখানে শুদ্ধীকৃত—সামান্যে উঠতে-উঠতে, হঠাৎ আলোর একটা রেফ্লেক্স লু, দরজাটা; তারপর একবারে আকাশের নীচে, সমুদ্রোত্তী, তারপরে নীচে, আলোর রাস্তা। কী মুক্তি! এতদিন, সে অবাক হ'য়ে ভাবলে, এতদিন সে এখানে আসে নি কেন? এমন কি, সে জানতোও না, শুধু কয়েকটা সিঁড়ির ওপরেই, কী অপগণ্য করছে তাঁর জ্ঞান। এ একবারের আলাদা এক জগৎ, এবং এই জগতে—হঠাৎ সে উপলব্ধি করল—তাঁরা অধিকার আছে, সে, বরপাতির দালাল, অর্থবাক্সে নিত্য-উদ্বাস্ত, তাঁরা। হঠাৎ, এক মূহুরের সচেতনতায় বিশাল বাইরের সঙ্গে সে তাঁর রক্তের সম্বন্ধ আবিষ্কার করে চমৎকৃত হ'লো।

না, ছাত্র আমাদের ব্যবহারের জিনিষ নয়, তাই সে দখল হোক। ব্যবহারের নয়, ছাত্র আমাদের বিশেষের জিনিষ। ছাত্র কোনো কাজে লাগে না; সেখানে আমাদের মনোর অবাধ, মানন অকাজ। সেখানে মুক্তি; জীবনের সব অবাধতা আছে—অন্তে নীচে তলিয়ে গেছে; সেখানে স্বচ্ছ স্বকৃত্য, গভীর শান্তি। 'ছাত্রেরে বেরো নাকো, সেখানে আকাশ অনেক বড়—সীমানাহীন।' কিন্তু ছাত্রের যে আমরা যেতে চাই, তাই যে আমাদের সত্তার গভীরতম আকাঙ্ক্ষা। কারণ এমন অন্ধ, এমন হীন, এমন নিশ্চিন্ত কোনো মানুষ নেই, যে তাঁর জীবনে কোনো-না-কোনো সময়ে সৃষ্টির রহস্যকে—হোক না অস্পষ্ট, অস্পষ্টভাবে—অনুভব না করে, কামনা না করে মহানকে, তাঁর আদ্যায় পৃথিবী-অন্তরী কোনো আলোর স্পর্শ। মর্মে-মর্মে সখাই আমরা আলোর ভিখারী। হ্যাঁ—ছাত্রের আমরা যেতে বাই; অস্বস্তি আমি তো আজ যেতাম, আজকের আকাশে বসন্তের এই গ্রীষ্মের শেষ চাঁদ জলছে, মধ্য হ'য়ে গরুতে 'আলোময় সময়হীনতা'—যদি আমরা একটা ছাত্র থাকতাম।



অল্প বর্ষে সৌন্দর্য সম্পন্ন করিতে "অদ-রগা" শাবনের তুলনা নাই। অদরগা সাধারণ সাবানের ছায় অঙ্গের কোমলতা নষ্ট করে না—ইহা ইহার বিশেষত্ব।



ফেনকা শেতিং শিক্

ফেনকার স্বরচিত ফেনপুজ ফৌর-কর্মে সত্যই আনন্দ দান করে। বিনি ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা স্বকন। আপনার ধৈর্যবানের কাছে যদি না পান, আমাদের চিঠি লিখিতে বসুন।

যাদবপুর সোপ ওয়ার্কস্

২৯নং ব্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

রসচক্র

১১

শ্রীমদ্রোজকুমার রায়চৌধুরী

সেদিন আর রামার হাদ্যনা ছিল না। সমালদের বাড়ী শিবরত্ন, তাঁর স্ত্রী ও কস্তার, বাগচীদের বড় বাড়ীতে শম্ভু, তার স্ত্রী ও ছেলেকে গুলির এবং বাগচীদের ছোট বাড়ীতে সস্ত্রীক বিদ্রুতির নিমন্ত্রণ ছিল।

এতদিন ধরিয়া সমস্ত সংসারের রামার ভার বড় বোয়ের উপরেই ছিল। সকালে উঠিয়া মান সারিয়া সে রামাথরে ঢেকে, বেলো ছুটার আগে আর বাহির হইতে পায় না। কিন্তু সেদিন আর তাহার রাঁধিবার অগ্রহ দেখা গেল না। তরকারী কোটা, বাটনা বাটা, রামার জল তোলা প্রভৃতি কাজের ভার মেজ বোয়ের উপর। কিন্তু থামের গোড়ায় বড় বোকে নিশুপুভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সেও আর থাটাইল না, কচি ছেলোটাকে কোলে করিয়া ছদ্ম খাওয়াইতে বসিল।

কিন্তু বাগচীদের 'বড় গিমি সংসারের অনেক দেখিয়া চুল পাকাইয়াছেন। শম্ভুর স্ত্রী তাঁহার মানার, বাড়ীর সম্পর্কে কিরকম ভাইঝি হয়। কপাটা তিনি রাতিতেই ভাষিয়া গিয়াছিলেন, সকাল হইতে না হইতেই তিনি শম্ভুর স্ত্রী ও ছেলেকেয়ের নিমন্ত্রণ করার ভয় এমনই চাঁৎকার করিয়া বাগধার ময়েকে তাগিদ দিতে লাগিলেন যে, কপাটা ছোট বাড়ীর রাখালেরও কানে গেল। রাখাল তখন বোরাকে বসিয়া দাতন করিতেছিল। তাড়াহুড়া মাকে বসিল,—ভালো কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছে ও বাড়ীর জোতিয়া। অগ্রে যে ওরা গৃহক হয়ে না,—বিদ্রুতির খাওয়ার ব্যবস্থা এইখানেই করা।

রাখালের মায়ের মন ভালো। তিনি নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন এবং সাঙোল গিটিকি ফিরিবার পথে সে কপাটা মাঠিয়াও আসিলেন। হস্তরং সাঙোল গিমিও বাড়ীতে পাঠাইলেন গিরিবাসনের নিমন্ত্রণ করিবার জ্ঞ।

বুড়ী পরমালাসে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া দেখিল, গিরিবাসনের বাড়ীতে কুব্জক্বেজ বাঘিয়া গিয়াছে। ব্যাপারটা খুব সামান্যই, কিন্তু কলহ হইল তুমুল,—এবং বাহাদের মধ্যে কোনোদিন কলহ হয়, নাই, তাহাদেরই মধ্যে।

শম্ভুর স্ত্রীর দোষ নাই। বেচারী একধারে কচি ছেলোটাকে দ্বন্দ্ব খাওয়াইতে ছিল। তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতে-পাকিতে বড় বোই হঠাৎ বলিয়া বসিল,—দ্বন্দ্ব খাওয়া কল থেকে বেরলো। গরু তো আমি রাখবো না,—সব বিক্রি করে দোব।

মেজ বোই প্রথমে কপাটা শুনিয়াও শুনিল না। অনেক-গুলি ছেলে-মেয়ে মারা যাওয়ার পর বড় বোয়ের ওই গিরিবাসনই মঞ্চ। তারপরে আর তাহার সন্তান হয় নাই। হস্তরং বাড়ীতে ছেলে বলিতে শম্ভুর ওই ছ'টি। বড় বোই তাহাদের আদর করিয়া নাম রিয়াছে রাম-লক্ষণ। উভাদের উপর বড় বোয়ের বেহ মেজ বোয়ের অবদিত নয়। অনেকটা সেইজন্যই সে এখনটা চুল করিয়া গেল। কিন্তু বড় বোই এই সময়ে আর দু-একটি কথা বলিতেই সে-ও আর চুল করিয়া থাকিতে পারিল না। টুকু করিয়া উত্তর দিল,—গরু বিক্রি যদি কর বড়রি, আমাকেই কোরো, আমিই কিনবো।

একটুখানি কথা, কিন্তু ইহার মধ্যে ঝাঁপ ছিল গুরু। সে ঝাঁপ বড় বোই সহ্য করিতে পারিল না, রমনার বলগা ছাড়িয়া গেল। সে চীৎকার শুনিয়া ন-বোই একবার দরজা বাহিরে উঁকি দিয়াই তখনই সরিয়া গড়িল। তাহার মাথাটা কেমন কিম্ব কিম্ব করিতেছিল। সে ক্রান্ত ভাবে শয্যা গ্রহণ করিল।

তুমুল ঝগড়া! এমন সময় বৈঠকখানা হইতে তিন ভাই অন্যরে প্রবেশ করিল। শিবরত্ন দরজার গোড়াতেই থমকিয়া

পাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মেজমতি ছেলে কোলে করিয়া পিছন ফিরিয়া বসিল। শিবরতনের পাশে পাঁড়াইয়া শব্দ এমনভাবে কট মট করিয়া সেরিক চাটিল যে, মনে হইল, শিবরতনের আজ্ঞা পাইলে সে এখনই গিয়া মেজমতির ঘরে টুট চাশিয়া ধরে। কিন্তু শিবরতন সেরূপ কোনো আদেশই দিলেন না। যেমন নিঃশব্দে তিনি আসিতেছিলেন তেমনি নিঃশব্দে বহিষ্কৃষ্টে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার মুখ দীর্ঘকাল কাহারও কানে পৌঁছিল না। শব্দ কপালে হাত দিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। আর বিকৃতি কিংকর্তব্য-বিমুঢ়ভাবে সেখানে কিছুক্ষণ পাঁড়াইয়া থাকিয়া আন্তে-আন্তে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

বিকৃতিকে দেখিয়াই জয়া ধড়মড় করিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল। কিন্তু হাসি দিয়াও সে ত্রুণের ঘৃণের স্ফুট চাকিতে পারিল না।

বিকৃতি উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার কি শরীর খারাপ করছে?

—শরীর খারাপ করবে কেন?

—তবে, এত বেশী অস্থির হয়েছিল যে?

এ প্রশ্নের আর জয়া উত্তর দিল না। বাস্তব হইতে তেল বাহির করিয়া বিকৃতির মাথাখাড়া বাইতে বসিল।

একটু পরে বলিল,—আজ গুরুতর অশ্বখাল ঠাইবগের বাড়ী তোমার বৈদ্যের।

—রাধাসের বাড়ী? হঠাৎ?

এ প্রশ্নেরও জয়া উত্তর দিল না। বলিল,—মাখার চুলগুলো কেটে বাধ, এত কাশান্ন ভাঙো নয়।

বিকৃতি হাসিয়া বলিল,—যে আছে।

—সেবি, পা-জুতা পেরি। বাবা: পা দিয়ে গড়ি উঠছে। তুমি কি পায়ে তেল মাখো না?

বিকৃতি হাসিয়া বাড় নাড়িল। তারপর কিছুক্ষণ সম্মত-দৃষ্টিতে জয়ার পানে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিল,—আর একদিন তুমি এনি ক'রে তেল মাখিতে দিবেছিল জয়া,—

ঘর-বসন্তের পরেই। মনে পড়ে?

জয়া কবির হাসিয়া হাসিয়া ফেলিল,—তুমি সে কথা এখনো ভোলনি।

—ভুলি নি। কোনোদিনই বোধ করি ভুলতে পারব না।—বিকৃতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল,—সেদিন এই নিয়ে ঘরে-পরে যে লাঞ্ছনা তুমি ভোগ ক'রেছিলে সে আমি কোনোদিন ভুলবো না। শুধু কি তুমি? আমিও লজ্জার কারো কাছে মুখ দেখাতে পারি নি। অথচ স্বামীসেবা এমনই বা কি অপরাধ? আমারে বাড়ীতে এসে অনেক লাঞ্ছনাই তুমি সহলে জয়া।

—বেশ ক'রেছি। তুমি থামো তো।

কিন্তু বিকৃতি থামিল না। বলিল,—আজ্ঞা, আজকে তোমার ভয় ক'ল না?

—না। ভয় কেন করবে?

—সবাই যদি আমার তেমনি ক'রে নিন্দে করে?

জয়া রাগিয়া বলিল,—কক্ষ পে। ভাতে তো আর যায়ে মোরো গড়বে না?

কিন্তু কথাটা বলিয়াই জয়ার মনে পড়িয়া গেল, আরও একটা ভালো উত্তর আছে। সে বিকৃতির আরও কাছে যেসিয়া ঠোঁটে একটু মধুর হাসি টানিয়া বলিল,—কিন্তু নিন্দেই বা করবে কেন শুনি? আমি কি কারো ধার ধারি?

বলিয়া সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বিকৃতির শ্বের পানে চাহিল। কিন্তু বিকৃতি শূন্য হইল, কি বিশ্রিত হইল ঠিক বুঝিতে পারিল না।

বিকৃতি টিপিয়া-টিপিয়া হাসিয়া বলিল,—ধরো না।

কিন্তু যদি মৃদুহাসি নিন্দে করেন?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে জয়ার দেহী হইতে লাগিল। কি

বলিবে প্রথমটা ভাবিয়া পাইল না। তারপরে বলিল,—

তিনি কি কখনো কারো নিন্দে করেছেন, যে আজ আমার

নিন্দে করবেন?

বিকৃতিও ছাড়িবার পাক নয়। সে বলিল,—কিন্তু

যদিই করেন?

—আমি জানি, তিনি তা করবেন না। কিন্তু তুমি

গুতো তো। গুব তেল মাখা হয়েছে। এইবার খান ক'রে

এস।

বলিয়া আলনা হইতে গানছাটা পাড়িয়া আনিয়া বিকৃতির

হাতে দিল।

বিকৃতি গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া চলিয়া বাইতেছিল। কিন্তু আজ আর তাহারে বাড়ীতে রাখা হইবে না, রাখাশের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ, এ কথাটা সে কিছুতে ভুলিতে পারিতেছিল না।

দোর গোড়াতেই হঠাৎ ফিরিয়া পাঁড়াইয়া বলিল,—আমাকে তো খুব তাড়া লাগছে। তোমাকেও তৈরী হতে হবে না?

—আমি আমার কিসের জন্তে তৈরী হব? আমার তো নিমন্ত্রণ নেই, শুধু তোমার।

—বেশ! আর তুমি থাকে কোথায়?

—আমি থাক না।

—তা তুমি পারো।

তারপরেই গলা নিচু করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আর গিরিবালার কোথায় থাকে জানো? মেজদার?

—আমি কি ক'রে জানবো?

অন্তমনস্তাবে বিকৃতি বলিল,—একবার জিজ্ঞাসা করলেও তো পারতে।

—তুমি জিজ্ঞাসা করো না।

—হঁ—বলিয়া চিত্তিস্থভাবে বিকৃতি চলিয়া গেল।

কিন্তু কথাটা আর কাহারও জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না।

— ২২ —

বিকালের রৌদ্র তখন পড়িয়া আসিতেছিল। সন্ধ্যার আর বেশী দেহী নাই। বিকৃতি কোথার বাহিরে গিয়াছিল। জয়া অত্যন্ত অলসভাবে বিছানায় শুইয়া ছিল। পিছনের থানানে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে কাঁপামাছি খেলিতেছিল। তইয়া শুইয়াই জয়া তাহারের আনন্দ-উল্লাস শুনিতে পাঠিতেছিল।

এক সময় গিরিবালার চীৎকার কানে আসিতেই জয়া স্তম্ভিত হইয়া উঠিয়া বসিল। তাড়াতাড়ি জানালার কাছে উঠিয়া গিয়া গিরিবালাকে ডাকিল।

অত্যন্ত কঠোর ডাক শুনিয়া গিরিবালার কাছে আসিয়া পাঁড়াইল।

—কি বলছো?

জয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল,—কি বলছো? বুড়া-ধাড়ী মেয়ে, লাফিয়ে-লাফিয়ে খেলা হচ্ছে, লজ্জা করে না?

আহত অভিমানে গিরিবালার বলিল,—আমি আমার লাফিয়ে-লাফিয়ে খেললাম কখন? আমি তো বুড়ী হয়েছিলাম।

—বেশ করেছিলে! এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এল, বটঠাকুরের আফিকের জায়গা করতে হবে না?

কথাটা গিরিবালার মনে ছিল না। ছোট মেয়ে, খেলার উত্তেজনায় ভুলিয়া গিয়াছিল।

গিরিবালার তাড়াতাড়ি অপ্রতিভ ভাবে বলিল,—এখনো তো সন্ধ্যা হয় নি।

বলিয়াই চলিয়া বাইতেছিল। জয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিল,—আর শোন।

—কি?

কথাটা কি ভাবে পাড়িয়ে তাবিরার জন্ত জয়া একটু সময় লইল।

তারপর বলিল,—বড়দি কি জলখাবার তৈরী করছেন? না করলে খবর দিবি, আমি বরং ঠোঁটেই দু'খানা লুচি ভেজে লোব। বুঝলি?

গিরিবালার বাড় নাড়িয়া চলিয়া গেল।

একটু পরে বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া গিরির মতো ভাবিচ্ছিল চলে বলিল,—মাকে তো দেখতে পাচ্ছি না, গুড়ীনা। কোথায় যে গেছেন জানি না। তুমি বরং দু'খানা লুচি ভাজো, আমি আফিকের জায়গা করতে চললাম।

লুচি ভাজিয়া একখানি রেকাবীতে সাড়াইয়া জয়া বাহিরের ঘরে গিয়া আসিবার জন্ত বাহির হইতেই দেখিল, বড় বৌ হস্তস্ত হইয়া আসিতেছে।

বড় বৌকে দেখিয়াই জয়া অপ্রস্তুতভাবে কিছু করিয়া হাসিয়া ফেলিল,—সন্ধ্যা হয়ে গেছে দেখে আমিই দু'খানা লুচি ভেজে দিলাম, বড়দি।

বড় বৌ এই জুই তাড়াতাড়ি আসিতেছিল। জয়ার কথা শুনিয়া গুড়ী হইয়া গেল। বলিল,—অ আমার কপাল। আমি ত ওই জুইয়ে টুটতে ছুটতে আসছি।

তারপর গলা খাটো করিয়া বলিল,—কোনো দিন কি ক'রেছি বোন, যে মনে থাক্বে? চিরদিন তোরা দুইনৈই বা হয় করেছিল। আজ যে আমরা পৃথক হয়েছি সে কথা মনেই থাকে না।

বলিতে বলিতে বড় বৌএর চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। কিন্তু ভয়ানক তখন আর দাঁড়াইবার সময় নাই। বলিল,—তাহ'লে জল খাবারটা দিয়ে আনুন, দিদি।

—না, না, না। ও তুই-ই দিয়ে আর ভাই। আমি বরং—কিন্দ...

বড় বৌ থামিল। তারপরে জ্ঞা একখানি হাত টানিয়া লইয়া বলিল,—আচ্ছা দেখ বোন, আজ থেকে সহ-সহ তো আর আমার কেউ নয়। 'আজ' থেকে হঠাৎ তোরা রাগে আমার ঘরে স্তব্ধও আসবে না। অথচ তাদের সঙ্গে ভাবনার আমার অন্ত নাই। 'আর' যে আসল লোক 'তার কথা মনেই পড়তো না।

শিবরতনের হৃদয়ে আত্মিক হইয়া গিয়াছে। জ্ঞা আর দাঁড়াইতে পারিল না। বৈঠকখানার ধারের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল।

কিন্দ আত্মিক শেষ হইতে বেশী দেরী হইল না। গিরিবালা আঁধারের জায়গা বুঝিয়া লইল। এবং বাহিরে গুড়ীমা হাত হইতে খাবার লইয়া গিয়া দিয়া আসিল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত শিবরতন কোনো কথা কহিলেন না। তারপর গুড়ীর ভাবে বলিলেন,—এ সব কথা বলতে খুব কষ্ট হয় না, কিন্তু কষ্ট ক'রে আমার খাবার তৈরী করার দরকার নাই। বড় বৌএর কাছ তো এখন অনেক কমলো। খাবার তৈরী করতে তাঁর তো আর অহুবিষে হবার কথা নয়।

গিরিবালা একবার উঁকি দিয়া দেখিল, জ্ঞা বেওয়ালে চেষ্টা দিয়া আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। শিবরতন পাছে আরও কিছু করিয়া কথা বলিয়া বসে এই ভয়ে তাড়াহুড়ি ফিস ফিস করিয়া কহিল,—গুড়ীমাকে আজকে কিছু খাবো না, বাবা। গুড়ীমা আর সমস্ত দিন শুণু একটু ছর খেয়ে আছে।

এক মুহূর্তে শিবরতন ফাস্কল হইয়া উঠিলেন,—কেন,

কেন? শরীর খারাপ নাকি? এখানে আবার ভয়ানক ইন্সুফুয়েন্সি হচ্ছে। গায়ে-হাতে বাঁধা করছে নাকি?

গিরিবালা শরীর অহুবিষের কথাই তিনিয়াছিল।

বলিল,—তা জানি না। বশেছে শরীর খারাপ।

জ্ঞা আর থাকিতে পারিল না। বাচিয়া প্রশংসা কুড়াইবার অভ্যাঙ্গ তাহার কোনো কালেই ছিল না। কিন্তু তাহুদের মুখে একটি প্রশংসার বাণী শুনিবার জন্ম তাহার পোত অপরিমীদ হইয়া উঠিল।

ইঙ্গিতে গিরিবালাকে ডাকিয়া বলিল,—বলু, মৈত্র বাড়ীর গিরি কি কোনো দিন কারও বাড়ীতে পাত পেড়েছে যে, আজকে বাবে?

গিরিবালাকে বসিতে হইল না। আরেবে আত্মবিশ্বাস জন্ম এমন ভাবেই কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিল যে, তায়া সরাসরীই শিবরতনের কানে পৌছিল।

একথা শিবরতনের মনেও স্পষ্ট ছিল না। মৈত্র বাড়ীর গৃহিণী কোনো দিনই কোনো বাড়ীতে অন্ন গ্রহণ করিতেন না। বসুধা যাইত বটে, কিন্তু তাহার পৃথক ভাবে অন্ন ককে আহার সন্মার্গন করিয়া চলিয়া আসিত। এ গ্রামে এইরূপই প্রথা দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, এবং এজন্য কথারও কোনো ক্ষোভ ছিল না। 'বহুকাল পূর্বে এই বংশে একজন দ্বিবিগ্নী পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর কতকাল চলিয়া গিয়াছে। সে পণ্ডিত আর নাই, বিহার সে আকীডাতাও এ বংশের আর কেহ অজ্ঞান করিতে পারেন না। কিন্তু পূর্বের সেই প্রথা এখনও চলিয়া আসিতেছে।

শিবরতন প্রথমটা বিস্ময়ে-আনন্দে নির্বাক হইয়া গেলেন। 'অবশেষে ভারী গলায় বলিলেন,—তোমাকে নতুন ক'রে আঁধারীকর করার কোনো কথাই তো রাখিনি না। তুই আঁধারীকর করি, এই মর্ধ্যাদামোষ বোন কোনো কারণেই ভুলি না হারাও।

শিবরতন আর বলিতে পারিলেন না। নিশ্চন্দ্রে আহার শেষ করিয়া উঠিয়া বলিলেন,—তাহ'লে আজ রাগে ভুলি কি বাবে?

উত্তরটা জানাইবার জন্ম গিরিবালা বাহিরে মুখ বাড়াইল।

কিন্দ জ্ঞা তখন চলিয়া গিয়াছে।

—১৩—
জমি, বাড়ী-ঘর, বিদ্য-সম্পত্তি সকল কিছুই বিভাগ সম্পূর্ণ হইয়াছে। তথাপি একটা গোলযোগের আর নীমাংসা হইল না।

এতদিন পর্যন্ত এই সংসারের রাম্রা-বাড়ার ভার ছিল বড় বৌএর। সেই সঙ্গে দেবর-পুত্র মদ্য-মহুড়কে তেল খাওয়ানো, দান করানো এবং খাওয়ানোর ভারটাও কি করিয়া তাহা হই উত্তর আসিয়া গিয়াছিল। সেই কাকড়া হাতছাড়া হওয়ার তাহার বিরূপ অবস্থি বোধ হয়। ওদিকেও মেজবুৎ এ কাকড়া এতদিন করে নাই। এখন ছেলে ছিন্নের কোনো দিন তেল খাওয়ানো হয়, কোনো দিন হয় না, এবং কুখার আশার না ট্যাংচাইলে তাহার আর ছেলে ছটকে খাওয়ানোর কথা মনেই পড়ে না। বড় বৌ এইগুলি দেখে আর আপন মনে গজ গজ করে। কলহর্ষ ছই এই দিন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মেজ বৌ এমন কড়া-কড়া কথা তনাইয়া দিয়াছিল যে তাহাকে শেষ পর্যন্ত চুপ করিতে হইয়াছিল। বাস্তবিকই না যদি নিজের ছেলের খরচ না করে তাহার বলিবার কি থাকিতে পারে?

ওদিকে শিবরতনের সন্ধ্যাকীড় ও জলযোগের ভারটা জ্ঞা এবং সে না থাকিলে মেজবৌ করিত। গিরিবালা ছোট মেয়ে, তাহার খেলাধুলা থাকে। সকল সময় এই কাকড়ির কথা তাহার মনে থাকিত না। বড় বৌএরও অস্বা স্বৈরজ্ঞপ। শান্তভী জীবিত থাকিতে পাড়া বেড়াইবার উপায় ছিল না। এখন নিরুশ্রুতভাবে সে, কাণ্ডাটা সারিয়া বসিতেছে। তাহারও সকল দিন মনে থাকে না। কোনো দিন কিরিয়া আসিয়া যেনে শিবরতন অজ্ঞানার ঘরে চোখ বুঁজিয়া বিশ্রামে পড়িয়া আছে। কোনো দিন বা বাহিরে হইয়া গিয়াছেন। সেদিন নদীতীরেই তিনি সন্ধ্যাহিক সন্মাপন করেন। তবে সুখিয়ার কথা এই যে, শিবরতন জীবনে শান্ত প্রকৃতির নহি। এ সম্বন্ধে তাহার কাছে বড় বৌকে কোনো দিন কোনো অভিযোগ ভনিতে হয় না। ভনিতে হয় গিরিবালাকে। শিবরতন যেদিন নদীতীরে সন্ধ্যা সন্মাপন করিতে বান সেদিন বড় বৌএর কাছে তাহার গাছনার বাকী থাকে না। কিন্তু গিরিবালা বাহিরে খাত পাইয়াছে। সে কোনো দিন ঘর কথাব ছই একটি কড়া কথা তনাইয়া দেয়, কিন্তু সাধারণত কোনো জবাব না দিয়াই নিজের কাজে চলিয়া যায়।

কিন্দ এ বিভাট বেশী দিন চলিল না। বীরে বীরে সব কাজেই সকল অভ্যস্ত হইয়া গেল। এবং খুব শান্তিত না হইলেও দিন একরকম কাটিয়া যাইতেছিল। অবশেষে

একদিন গোলযোগ বাহিল এবং তুচ্ছ গোটা কয়েক বাঁশের পাতার জন্ম।

হ্যাঁ, বাঁশের পাতার জন্মই।
খিড়কীর চরিত্রিক আচ্ছন্ন করিয়া মৈত্রদের এক বাড় বাঁশ আছে। নানা কারণে তাহা আর বিভাগ হয় নাই। এই বিশাল বাড়ীর পাবেশে জন্মশাকী হইয়া গিয়াছিল। শীতকালে হিয়ার করা পাতার খিড়কীর পুতুরের জল করণ হইয়া উঠিত এবং কি শীত কি গ্রীষ্ম হিয়ার কপার পুতুরের জলে, কোনো কালে ফুঁলালোক পড়িত না। তথাপি বাঁশের অশেষ উপকারিতার কথা মনুপ করিয়া মৈত্র বাড়ীর কর্তৃপক্ষণ এ সকল নীরবেই সহ করিতেন।

একদিন খিড়কীর ঘাটে নামিবার সময় বড় বৌ দেখিলেন বাগটাদের বড় বাড়ীর রাখাল এক একটা বাঁশ নীচু করিয়া ধরিতেছে আর একপাল গজ পরমানমে গজ ভঙ্গণ করিতেছে।

ব্যাপারটা কিছুই নয়। এবং বড় বৌও এমন প্রকৃতির নয় যে, গোটা কতক বাঁশের পাতার লোকমান সহ করিতে পারে না। কিন্তু কিছু একটা লইয়া কারণ-অকারণে গানিকটা উত্তেজনা প্রকাশ করা তাহার স্বভাব।

তিনি এ ঘাট হইতে হাঁকিলেন,—ওখানে বাঁশের পাতা খাওয়াচ্ছে কে রে?

বাগটাদের রাখাল আশ্চর্যচিত্র বিহার প্রয়োজন বোধ করিল না। সে সেগুনামান অবস্থায় থাকিয়াই উত্তর করিল,—আজ্ঞে না ঠাকরণ, গোটা কতক বাঁশের পাতাই তো?

—সে আমি জানি রে হারামজান, তুই নাক।
রাখালটা চলিয়া যাইতেই বড় বৌ শিখন ফিরিয়া দেখিল, মেজ বৌ খিড়কীর দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বড় বৌএর চোখে চোখ পড়িতেই সে নিশ্চয়ে বাড়ীর ভিত্তর চোখা গেল।

বড় বৌএর ঘাটের কাজ সাহা হইল না। তাড়াহুড়ি বাড়ী ফিরিয়া মেজ বৌকে উদ্দেশ্য করিয়া কছার গিল,—আস্বীভ্যত দেখাতে বসে, নিজের ভিনিয় দিয়ে বেধাও। মাগ্জার ভিনিয় নিয়ে আমরা আস্বীভ্যত দেখানো ভালো নয়।

হুটা তুচ্ছ বাঁশের পাতা লইয়া খিড়কীর ঘাটে বড় বরষ আচরণ মেজ বরষ ভালো লাগে নাই। এখন সেই তুচ্ছ ব্যাপার উল্লেখ করিয়া আস্বীভ্যতের বৌটা বেওয়ায় সে অনিয়া উঠিল।

বলিল,—তা দেখাবো নাই বা কেন? ওতে কি আমার ভাগ নেই। আমার ভাগ আমি থাকে খুশী বো।

—দিবী? কিন্তু তোর তো একা নয়। আমি আছি, জ্যা আছে,—

জ্যা রাগাঘরে ছিল। হাসিতে হাসিতে উঠিয়া আসিয়া বলিল,—আচ্ছি তো। কিন্তু জুতো তুচ্ছ বাপের পাতা, ও নিয়ে আর সত্যক বেশার—

বড় বোঁ তাঁকিয়া উঠিল,—তাই বটে। তোর কি লো? বাজা মাদ্রু, মদ্রুখ চেইয়ে দিলেও তোর গায়ে লাগবে না কিন্তু আমার তো তা নয়!

বড় বোঁ ক্রমগত বকিতে লাগিল এবং একবারও শ্রম করিল না যে, ছেলে তাহারও নাই। মক্খ শুধু একমাত্র মেয়ের সুরেই লইয়া সে জয়ার একেবারে মদ্রুখলে বা দিয়াছে।

পল্লীগ্রামে গনেশো পার হইলেও বাহার ছেলে হয় না তাহাকেই বদ্বা বলে। এবং তখন হইতেই শাক্তী অথবা তৎস্বানীয়া মহিলাগণ তাহার গলায় এবং বৃত্তিতে বহু স্থানের অস্বাভাবিক বাঁধিতে আরম্ভ করেন। বৎসরের অধিকাংশ

কাল কলিকাতার পিরাশয়ে থাকার জন্ত জ্যাকে এ দুর্ভোগ পোহাইতে হয় নাই। এবং খসড়ালায়েও এ বিষয়ে উচ্চভাষা করিবার সুযোগ হয় নাই। কিন্তু কেহও এ সম্বন্ধে কিছু বলুক আর না বলুক, যে আকাজ্ঞা সে সকলের দৃষ্টির পরিণামে আপনাদর মনে মনে অত্যন্ত সজ্জিতভাবে লাগন করিতেছিল সেইখানে অর্থাৎ পাইয়া সে একেবারে কাঠের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সংজ্ঞা কিরিয়া আসিতেই সে একেবারে বাবিনীর মতো গর্জন করিয়া বলিল,—ছেলে থাক, না থাক, আমাদের জিনিস আমার থাকে খুশী বলিয়ে দোব ভাতে আপনাদর কি বলুন তো? বড় বোঁও চাঁৎকার করিয়া বলিল,—আমাদর কি? ভাগের ভাগ করে নে, নিয়ে থাকে খুশী দে। সাজার জিনিস দিতে গেলেই আমি বকবো।

জ্যা ধাত্তে দাঁত চাপিয়া বলিল—তাই হবে। ভাগ বন্ধন হ'লই শুখন সব জিনিসের চুল চেয়া ভাগ হওয়া দরকার। বলিয়া উদানে জল ঢালিয়া দিয়া শোবার ঘরে প্রবেশ করিল।

ক্রমশঃ

চন্দন-সাবান

সভাতার আদিযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত চন্দন, সফল শুভ-কার্যের ও পরিব্রততার অঙ্গ। অতি পুরাতন হইলেও ইহা চিরনূতন। চন্দনের অবিকল পদ্ধতি রং আমাদের সাবার্নে প্রতিফলিত

—আমাদের সাবান—

ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়।

কলিকাতা মোপ ওয়ার্কস

কলিকাতা।



“চন্দন দেখা দ্বারে দ্বারে
চন্দনমালা ছলিতে বায়ে।”

বিবিধ

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

গত বৎসর বড়দিনের অবকাশে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের দশম অধিবেশন প্রায়াগে হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছিল কিন্তু কলিকাতার রবীন্দ্র-জয়ন্তীর উদ্যোগিগণের অহুরোধে তাহা সেই সময়ে কাঁচো পরিণত হইতে পারে নাই। ঐ স্থগিত দশম অধিবেশন আগামী বড়দিনের অবকাশে অঙ্গুলিত হইবে। মাননীয় বিচারপতি শ্রর লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। অধ্যাপক কিরণচন্দ্র সিংহ মহাশয় কাব্যাধ্যাপক নির্বাচিত হইয়াছেন। ডাঃ দেবনাথ সাহা, ডাঃ নীলরতন ধর, ডাঃ প্রমথকুমার আচার্য্য, ডাঃ দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, ডাঃ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক কামিন্যরতন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক অমৃতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক অমরনাথ ব'া, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দেব, অধ্যাপক নলিনবিহারী মিত্র, অধ্যাপক ভূপেন্দ্রনাথ চক্ৰ, শ্রীযুক্ত হরিন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত বিদ্যুৎকণ মল্লিক, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অশুতোষ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ মিত্র, শ্রীযুক্ত হরিকেশব খোষা, শ্রীযুক্ত অন্তর্যমণ মটক, শ্রীমতী প্রতিকা দেবী, শ্রীমতী প্রজা দেবী, শ্রীমতী রমা দেবী, শ্রীমতী শক্তি দেবী, শ্রীমতী হলতা দেবী প্রভৃতি সমিতির সুযোগ্য সদস্যবৃন্দ।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য ও সত্তা রক্ষা করিবার জন্ত, প্রবাসী বাঙ্গালীদের সামাজিক ও নৈতিক বন্ধন বলুৎ করিবার জন্ত, ভাবাবিনিময় দ্বারা পরস্পরের উন্নতি সাধনকল্পে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সাহিত্যের এই মাইলদল ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, ভাবের আনন্দ প্রদান করিয়া আমাদের প্রবাস-জীবনের সমস্তগুলির সমাধান করা সকলের কর্তব্য।

অধিবেশনের সাধারণতঃ, প্রবাসী বাঙ্গালী-সাধারণের কাঁচা। আপনাদের উৎসাহ ও সাহায্য ব্যতিরেকে সম্মেলনের কাঁচা সফলতা হ্রাসের হওয়া সম্ভবপর নহে। অতএব সকলে সমবেত হইয়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্প, সঙ্গীত, গুরুত্ব, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ও আলাপের প্রবাস-জীবনের সমস্তগুলির সমাধানের সম্বন্ধে সমবেত উপস্থাপিত করিয়া এবং মিলকলা ও কাঁচাখোঁজের নির্দেশ দেখাইয়া অধিবেশনের পূর্ণতা সাধন করিতে এই সম্মেলন সকলকে অহুরোধ করিতেছে।

অধিবেশনের দিন—আপাততঃ ১২ই, ১৩ই ও ১৪ই পৌষ (ইং ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে ডিসেম্বর) এবং স্থান—

আপাঙ্গো বেঙ্গলী ইন্টারনিউজিটে কলেজে স্থির করা হইয়াছে।

মহিলাদিগের জন্ম স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত ও মহিলাসম্মেলনের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইবে।

সম্মেলনের পক্ষ হইতে যে পত্রমালা প্রকাশ করা হইয়াছে এখানে তাহা মুদ্রিত করা হইল।

বিনীত নিবেদন—

আপনি বেধে হয় অবগত আছেন যে, গত বর্ষে বঙ্গ-দিনের অবকাশে, প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের দশম অধিবেশন প্রায়াগে হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছিল। তাহার আয়োজনও চলিতেছিল, কিন্তু রবীন্দ্র-জয়ন্তীর উদ্যোগিগণের অহুরোধে তাহা সেই সময়ে কাঁচো পরিণত হইতে পারে নাই। তারপর গুড শুইডেই প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন, এইরূপ আলোচিত হয়; কিন্তু গুড শুইডের অবকাশ মাত্র তার দিন বলিয়া সম্মেলনের অধিকাংশ সভা ইহা অহুমোদন করেন নাই। এই জন্ত ত্রুণের সঠিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, গত বর্ষে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের দশম বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হয় নাই। ঐ স্থগিত দশম অধিবেশন, আগামী বড়দিনের অবকাশে প্রায়াগে অঙ্গুলিত হইবে, ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য ও সত্তা বঙ্গের বাহিরেও বাহ্যতে অব্যাহত থাকে, বঙ্গসাহিত্যের রসমাধুর্য্য ভারতীয় অস্বাভাবিক প্রাদেশিক ভাষায় কিরূপে পরিবেশিত করা বাইতে পারে, এবং অস্বাভাবিক প্রাদেশিক ভাষার ভাব ও চিন্তাধারা কিরূপে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে অহুরোধ করিয়া বঙ্গভাষার রসমাধুর্য্যকে পরিপূর্ণতার করা যায়, এতদ্বন্দ্বিত্বেই বঙ্গের বাহিরে বঙ্গভাষীর এই পবিত্র হৈমঘট সংস্থাপিত হইয়াছে। এবার জাহ্নবী-বনুনা-জল-চলুতি প্রয়াগবীরের দ্বারা শীতল অক্ষয়-বট-মূলে বঙ্গভাষীর আবাহনের উদ্বৃত্ত গম্ভীর বাণী প্রবাসী বাঙ্গালীর প্রাণে অপূর্ণ রস-সম্পূর্ণের সৃষ্টি করিবে। আপনাদিগকে এই সাধন-যজ্ঞের গোতা, উদ্বাটা ও অক্ষয়ী গদ গ্রন্থ করিবার জন্ত সাধরে আমন্ত্রণ করিতেছি।

ভারতবাসী চায়, জগতের মহিতি চায়। উচ্চ করিয়া চলিতে। তাহার এই কামনা পূর্ণ করিতে হইলে জগতের সকল জাতির সহিতে আন্তরিক মিশন-স্থরের দৃঢ় বন্ধনে তাহাকে বদ্ধ করিতে হইবে। এই বন্ধন তাহার সাহিত্যের

রসেই দূতর হইয়া থাকে। বাঙ্গালীকে দেখাইতে হইবে, ভারতীয় চিন্তা-প্রবর্তের অভিব্যক্তি বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া তাহাকে অপরূপ প্রাণবন্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই রসধারার সন্ধান করিবার জন্তই এতদিন ধরিয়া এইরূপ আয়োজন হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আমরা ইচ্ছাতে কতদূর রক্তকণা হইতে পারিয়াছি, জানি না। ৬ বিখ্যাতের পাদমূলে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের এই যে স্বক্ৰম নিশ্চিৎ অনুগ্রহণ করিয়াছে, এখন সে একারণ বর্ষে পদার্পণ করিল। কিন্তু এই একারণ বৎসরে সে কি শিখিয়াছে? এবার তার মূলমন্ত্রের অনুসন্ধান করিয়া বঙ্গ-বাণীর ধৈর্যকলস শ্রদ্ধার অশীতল গন্ধোদেক পূর্ণ করিতে হইবে।

অতীত অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে আমি আপনাকে সাদরে আমন্ত্রণ করিতেছি। এই সম্মেলন সাহিত্যের এক পূণ্যতীর্থ। এই তীর্থে সমবেত হইয়া আপনি সাহিত্য দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্প প্রভৃতি ললিতকলা, প্রত্নতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অধিবেশনের পূর্বভা বিধানের সন্মতি হইবে, ইহাই বিনীত প্রার্থনা। অধিবেশনের সাক্ষা-সাধন প্রবাসী বাঙ্গালী-সাধারণের কাজ। আমরা সকলের হইয়া উদ্যোগ করিতেছি মার।

আপনি স্থানীয় অধিবাসী। স্বতন্ত্র তত্ত্বা বঙ্গবাসিগণের

১৮৮ কর্ণেলগঞ্জ
এলাহাবাদ
৮ই ফাল্গুন
১৩০২

বিনীত নিবেদক
শ্রীকিরণচন্দ্র সিংহ
কাপাধ্যাক্ষ—অভ্যর্থনা-সমিতি

আপনাদের পছন্দ ও ডিজাইন অনুযায়ী
সকল রকমের স্বদেশী রেশমে প্রস্তুত

শুভানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ও প্রিয়জনের

উপহার উপযোগী

বেনারসী সাড়ী ও জ্যাকেট

একমাত্র আমরাই প্রস্তুত করিয়া থাকি

এবং আধুনিক রংয়ের ও নানা ক্যাসনের

তসর গরদ, মটিকা, খন্দর ও সিল্কের চাদর

প্রভৃতি আমাদের কারখানায় প্রস্তুত হয়।

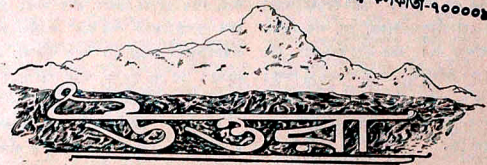
ভূদেব উইভিং ক্যান্ট্রী

পোর্টল্যান্ড
সো-ক্রমা: — বেনারস দিগি।



নর-দেবতা

[কিনো চিত্র হইতে]



সপ্তম বর্ষ

পৌষ, ১৩৩৩

সপ্তম সংখ্যা

রূপ ও স্বরূপ

শ্রীযুক্তদেব বসু

পৃথিবীর প্রায়-অতীতন মুষ্টি বস্তুর মধ্যে যে-স্বল্পসংখ্যক বই, শুধু যে বহুবার পড়া যায়, তা নয়, বহুবার না পড়লে বাঁদের সমস্তটা ইঙ্গিত ধরা পড়ে না, বাঁদের থেকে সম্পূর্ণ আনন্দ নিষ্কাশন করা যায় না, তাঁদের মধ্যে, আমাদের পক্ষে, অজ্ঞতন হচ্ছে আলিস ইন্ ওয়াগালগাও। দশ-বারো লাইনে সমাপ্ত একটি গীতিকবিতাকে যে-কারণে সহস্রবার পড়ে ও যথেষ্ট পড়া হয়েছে বলে মনে হয় না, ঠিক সেই কারণেই এ-বই কখনো শেষ হ'বার নয়। কারণটা এই যে; যেমন গীতিকবিতায়, তেমনি আলিসে, পাঠকের কল্পনার বিচরণ কবীর ঈশ্ব প্রচুর ফাঁকা রয়েছে; যেটুকু বলা হয়, সেটুকু ধরে মাত্র, নাটকোক্তির cue; আলিস উল্লিখিত উচ্চারিত হয় পাঠকের মনের নেপথ্যে। উপমা বদলে বলা যায় যে লিখিত কথাগুলো শুধু পর-পর সাজানো একসার সুইচের কাজ করে; অভিব্যক্তির আলোটা অলে পাঠকের মনে। (মানে, পাঠক নিজের কাছেই নিজে বলে যায়; কী বলতে হবে, শুধু তা'র আভাস দেয় ছাপার স্বরূপ।)

কিন্তু পার্থিব ইলেকট্রিসিটির মত মনের আলো সর্বদা নিভুল, সর্বদা একভাবে জ্বলিশীল নয়; আমাদের মন ব্যাপারটা জটিল, অনেক তা'র অবস্থার বৈষম্য; সব সময় সবগুলো সুইচ জলে না, বা ঠিকভাবে, পরিপূর্ণভাবে জলে না, সব সময়, আবার, একই সুইচ, একভাবে জলে না। আলিস ইন্ ওয়াগালগাওর, তাই, যে-কোনো সময় আনাজে যে-কোনো পৃষ্ঠা গুললে একটা-না-একটা বিশ্বের ধাক্কা খেতেই হয়, এমন কোনো-না-কোনো জিনিষ চোখে পড়েই, যা এর আগে কখনো ঠিক সেইভাবে চোখে পড়ে নি। সেদিন একটা উপন্যাসে ব্যবহার কবীর জন্ম ও বই থেকে একটা লাইন খুঁজতে-খুঁজতে হঠাৎ এক জায়গায় হোঁচট খেতে হ'লো; সোনা খুঁজতে-খুঁজতে পেয়ে গেলুম হীরে। ধরগোশের গর্ভের ভেতর গিটে খেয়ে আলিস প্রকাণ্ড লম্বা হয়ে গেছে। এত কথা যে তা'ই পা ছটোকে মনে হচ্ছে সে—ই কোন দূরে। অবাক হ'র আলিস ভাবছে, এ কী হ'লো? আমি কি বদলে গেলুম? যদি বদলে গিয়ে

থাকি, আমি তবে কে? সেইটেই তো সাংখ্যাত্মিক প্রশ্ন। আমি কে? তবুও ভাবি: “আমি নিশ্চয়ই অ্যাডা নই, কারণ তবু তো কৌতুহ্য-কৌতুহ্য চূলা, আর আমার চুল মাটেও কৌতুহ্য নয়। আর মাথাও আমি নই, কারণ আমি তো কত জিনিষ জানি, আর ও জানে না কিছু। তা ছাড়া, ও হচ্ছে ও, আর আমি হচ্ছে আমি, আর—” এখানে হাল ছেড়ে দিয়ে আলিস বসে উঠেছে, ‘নাঃ, এ বড় গোলমালে বাপার।’

আমি কে? চিরকাল শিশুর মনে এ-প্রশ্ন ভেগেছে; বা’র একটা অংশমাত্র হচ্ছে, আমি কী করে? হ’লাম? কারণ, এ প্রশ্নটার শিক্কা তা’র বর্ষাধি-প্রজনন-প্রক্রিয়া জানতে চায় না; সে বা জানতে চায়, তা’ হচ্ছে কেন সে হ’লো? তা’র পারিপার্শ্বিক বিশ্বকে তা’র মন সবে গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে; তা’র চারদিকে সে দেখে বহু লোকজন, সেবে নানারকম পশুপাখী, গাছ পাটা ফুল, আশা আর মেঘ, বুটী আর বিদ্যুৎ। ‘পৃথিবী’ বলতে সে বা বোঝে, তা যে তা’কে অতিক্রম করে’ও আরো অনেক কিছু, এটুকু জান তা’র হয়েছে। এবং এ-ও সে জানতে পারে যে এমন-একটা সময় ছিলো, যখন সে ছিলো না, অথচ এই সব-কিছুই ছিলো, আর তা’র অতীতে সব-কিছুর কোনো অস্তিত্বই ছিলোনা, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তখনই তা’র মনে এ-প্রশ্ন ওঠে: আমি কেন হ’লাম? তা’কে বাব দিয়ে ‘পৃথিবী’র ঘরি চলতেই, তা’হলে কেন সে হ’লো? আর এই সে ব্যাপারটিকে? সে এখন বলছে, আমি, তখন বা’কে বোঝাচ্ছে, সেটিকে সে না হ’লে কেন তা’র বাবা হ’লো না কি ও-বাড়ির লম্বী হ’লো না কি একটা গোত্র কি বাজ, হ’লো না? এই যে আমি, এ কোথেকে এলো? হ’বার আগে এ ছিলো কোথায়? এমনি লাগে জিজ্ঞাসা কর্তৃত্বের পদে শিশুর মন, যা’কে সে প্রশ্ন করে এক কেজলগত, সক্রিয় প্রাণে: আমি কে? বাপ-না জ্বাংর বেন, ‘কে আবার?’ তুমি আমাদের পোকা ন।’ মুখে

কিছু বলে না; চুপ করে’ সে-উত্তর মেনে নেবার ভাগ তার, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে তা’র সম্বন্ধ থেকেই যায়। তা’র জিজ্ঞাসা চিত্তকে স্পষ্ট করে’ রূপায়িত করবার ও তা প্রশংসা করবার ক্ষমতা যদি তা’র থাকতো, তা’হলে সে বলতো: ‘তা তো বুঝলুম, আমি তো মাদারের খোকন; কিন্তু সত্যি সত্যি আমি কে?’

আমি কে? এই হচ্ছে মানুষের দর্শনের প্রথম জিজ্ঞাসা, এবং বিজ্ঞানের, এমন পর্যায় জন্ম, শেষ অব্যবসায়। দর্শন এর উত্তর পেয়েছে উপলব্ধির নিবিড়তার: বসেছে, তুমি সেই-ই, তুমি হচ্ছে ঈশ্বর। যা’র মানে প্রকারান্তরে এই কথাই বলা, তুমি হচ্ছে তুমি। বাসু, এর ওপর আর কথা নেই। স্বতরাং যুরের আবার দেখানোই আসা গেলো: আনিসিমের সংসার থেকে যে আমরা এক পা-ও এগোতে পারব না, তা নয়। রাসায়নিক বস্তু-হিসেবে আমি তিনিঘটকে বিশ্লেষণ করা গেলো: পরমাণবিক বলগণন, ‘তুমি হচ্ছে’ মুখ্যত আয়োনিয়া, কার্বন আর জলের সমষ্টি।’ এ-উত্তর আমরা শোনাভিন্ন প্রত্যাখ্যান করছি; স্পষ্টত, এটা ভুল। বিজ্ঞান নিছক পরাধীনভাবে ওপর আর-এক পা এগোলো; উত্তর হ’লো জীবনতত্ত্বের বা বারমাত্র। জীবনবিশ্ব বংশন, ‘প্রাণের প্রজনন-প্রকৃতির তুমি একটা ফল, স্বতরাং তুমি অনিবার্য’; সীমাহীন জীবনপ্রবাহের মধ্যে তুমি একটা মুহূর্তের তরঙ্গ মাত্র, স্বতরাং তুমি তুচ্ছ; তোমার জাতির লুপ্ত না হ’বার যে-কর্তার চেষ্টা, তুমি তা’রই একটা ক্ষুদ্রাতীক্ষর কিছু সত্য প্রকাশ, সেই হিসেবে তুমি মূল্যবান। তুমি সেই প্রাণের প্রতিনিধি, যা তোমার আগে ছিলো তোমার পিতার, পিতামহের, সহস্র শতাব্দী ধরে’ তোমার অগণ্য পিতৃগণের মধ্যে, তা’রো আগে বাসে, তা’রো আগে জেলি-মাছে, বিশালকায়, অসুনিবৃত্ত জন্তুতে, আরো আগে কেলি-মাছে, আরো, আরো আগে বায়ুবিহারী অদৃশ্য আয়িমায়। কিন্তু এক প্রতিফল বিশ্বের মধ্যে সেই প্রথম প্রাণ-কণা কী করে’ হ’লো এই পৃথিবীতে, তা আমি বলতে পারবো না; সে-রহস্য, মনে হচ্ছে, চিরকাল অজ্ঞাত থাকবে।’ এ-পার্শ্ব, জীবনবিদ্যের উত্তরই সব চেয়ে গ্রন্থবোধ্য; শিশুর সমস্ত জিজ্ঞাসাই সেটার চেষ্টা এতে আছে। এ-উত্তর সম্পূর্ণ

নয়—না, সম্পূর্ণতার এ অনেক দূরে; তবু, মানুষের জ্ঞানের বিশেষ একটা অবস্থা পর্যায় এটাই চরম।

কিন্তু মানুষের জীর্ণাযোজ্য অধিকার স্বত্বই নতুন-নতুন ক্ষেত্র, উল্লেখ্য নতুন থেকে নতুন-নতুন অজ্ঞাতকে জানা, এত বড় ব্যাপারের কথা মানুষের আগে কোনো জীব উচ্চারণ করে নি; জানুয়ার ইচ্ছাতেই তা’র জীবনের বিশেষ প্রকাশ, তা’র মহাশক্তি। সেইজন্যই সৃষ্টির জন্ম-বিবর্তনে নিঃসংশয়রূপে সে স্রেষ্ঠ প্রাণী। মানুষের সভ্যতা তা’র এরোপ্সেন বেতার ডুবুরি কাছাকাছি নয়; মানুষের সভ্যতা তবু এই যে সে জানতে চেয়েছে—এবং পেরেছে। মানুষ জেনেছে; এবং কার্যকারীভাবে সেই জানারই, বলা ভেতে গারে পরোক্ষ, ফল হ’য়েছে ডুবুরি কাছাকাছি বেতার এরোপ্সেন। মানুষ জানতে চেয়েছে, ফল কেন মাটিতে পড়ে, পৃথিবীর কেন সমুদ্র উপলব্ধি ওঠে, জলে কাঠ কেন ভাসে, সোনা ভাসে না। এ-সব জিনিষ জানতে কাঠ, এত বেশি করে’ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অহুত্বই যে এদেরকে যে সে ‘এমনি’ বলে’ মনে নেয় নি, এইটেই সব চেয়ে আশ্চর্য্য। এবং এখন সে জানতে চাইছে সমুদ্রের তলদেশ, হিমালয়ের চূড়া; যেতে চাইছে টানে, ধর প্যাঠাতে চাচ্ছে মঙ্গলগ্রহে। এক-এক সময় মনে হয়, ১৯২০-এ আমার সভ্যতার শৈশবে মাত্র অবসান হচ্ছে।

বিশ শতাব্দীতে দেখা দিলো মনোবিজ্ঞানরূপ শাস্ত্র। আমাদের জ্যোতিষ থেকে শুধু শক্তিশালী অহরহকণের চোখে পড়ে, এমন রোগবিদ্যা পর্যায় স্বত্বগণিতে বা-কিছু ভর-ভর করে’ জানুয়ার পুর মানুষের হঠাৎ নজর পড়লো অরের কাছে তা’র মনের ওপর। চেয়ে দেখলো, বিশ্বের জ্যামিতিক চাইতে তা’র মন কিছু কম জটিল, রহস্যময় নয়। আগে গেলো তা’র অবেগে, পরবেগে, বিশ্লেষণে। এখন পর্যায় চলছে পরীক্ষার সময়; মনোবিজ্ঞান এখানে কোনো পাকা সিদ্ধান্ত পৌঁছে পেরেছে বলে’ মনে হয় না। তবু, ‘এই মধ্যে যেটুকু জানা গেছে, তা আমাদের জীবনকে দেখবার ভরী সম্পূর্ণ বদলে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।’ বিবর্তনগত মানুষ থাকবে বলে’ কিছু স্বীকার করে নি; অথচ তা’র মনের জগতে অনেক আচরণ, অনেক চিন্তা, কথা, ভাবকে

সে এতন্তাল খামকা ভেদে এগেছে। এতদিনে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছে, তা’র মনের আপাতত অবাস্তব, তুচ্ছতম কোনো ক্রিয়ারও একটা গভীর স্তোভনা আছে, তা’র সমস্ত ব্যক্তিত্বের সন্ধি কোনো স্তোভনা সত্যি আছে। বৃত্তিতে আরম্ভ করেছে, পরার্থক্ষেত্রে যেমন, মনের ক্ষেত্রেও যেমনি কিছুই অবাস্তব নয়। নিশ্চয় জানো: আমাদের শায়ের এই বাণী এতদিনে সফল হ’তে চললো। আমি কে? মনোবিজ্ঞানিক একদিন এই প্রশ্নের সম্পূর্ণতম উত্তর দেবেন, মুক্তিপনতাবে এমন আশা করা যায়।

মানুষের মনের ‘সব হুন্স গতিবিধি—তা’র অযৌক্তিক ভয়, বিধা, নিষেধ, তা’র অতি-মানবীয় আনন্দ, মুগ্ধতা, গাঢ় আবেগপ্রবৃত্ত তা’র উদয়ন—এ-সবের ওপর পড়েছে নতুন অহুত্বজ্ঞানার আলো; সে-আলোর, এতদিনে, সমস্ত বিধি পায় হ’লে, মানুষকে আমরা স্পষ্ট করে’ দেখতে পারি। সমুদ্রের অজ্ঞাত গভীরতাকে মানুষ ভয় পায় নি; মনের গাঢ়তত্তা, সম্ভাব্যরূপে ভয়াবহতত্তা ঝুঁককারেও মানুষের চোখের পলক পড়ে নি; মোহহীন দৃষ্টি সে মেনে রেখেছে, ধোঁয়েছে। আসিসির সেইটুকু ফ্রান্সিস, অসীম-কৃপার ভোনে, রাসকৃষ্ণ পরমহংস—যে-ধরনের চরিত্র মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা—এর মত, বাবের ক্ষুধাভাতার ওপর দেবত্ব কি ভাইনীত্ব (একই কথা) আরোপ না করে’ উপায় ছিলো না, তাঁদেরকে সম্পূর্ণরূপে, একান্তরূপে মানুষ হিসেবেই দেখা জাচ্ছে আমাদের পক্ষে কঠিন নয়, তাঁদের মনের সব ক্রিয়া-আজগিজ—বা’র ফল তাঁদের আপাতত অসাহচরিক চরিত্র—বৈধাশীল অবেগ-প্রায়ে আমরা বৃত্তিতে পারি। মানুষের মধ্যে থাকা বড়, মানুষ বলেই, মানুষ হ’বার জন্তেই তাঁরা বড়; দেব বা দানবের অংশ নিম্নয়োজন। কারণ, মানুষের মন আশ্চর্য্যরকম জটিল: মুগ্ধগত বা একই কারণ, তা থেকে উৎপন্ন হয় নানা বিভিন্ন ফল, একই আবেগ আপাতত পরস্পর-বিরোধী যোতে আত্মপ্রকাশ বোঝে। অসংখ্য হুন্স ঘাত-প্রতিঘাত, প্রাক-জন্ম-লক্ষ স্বপ্নাভ, শৈশবের অহুত্ব, কামনার অবতরণ নিদীপিত কি ক্ষান্তি—এই-সব, এবং এ ছাড়াও আরো অনেক-কিছু—তা’র ফল হচ্ছে মানুষের চরিত্র, তা’র কণ্ঠি, স্বীকৃতি, চিন্তা, অহুত্ব—

জীবনচরিত্রকারও 'আর্টস্ট' (লিটন স্ট্রিচি তাঁর Eminent Victorians-এর সাংক্ষিপ্ত কিন্তু উজ্জ্বল ভূমিকা একথাটাই বিশেষ করে) বসতে চেয়েছেন) : এবং একথাটা একবার মেনে নিলে অনেক সত্যের দৃষ্টি পড়ে। কারণ, আর্টস্টের সব চেয়ে মূল্যবান অধিকার হচ্ছে তাঁর স্বাধীনতা। তাঁর হাতে থাকতে পারে রাজ্যের উপাধান, কিন্তু তা থেকে তিনি অনেক দূর দাবেন, কল্পনা থেকে মনেব, তাঁর পদ সজলস্বাক্ষে মাজাবেনে শিল্প-রঙে। বেছে নেননি, আর কি লেখবেন, কে-বিধের তাঁর অঙ্ক-পটিল ওপর কথা কইবাব

কেউ নেই। উপভাসিকের নায়কের সমস্ত জীবনই তো তাঁর হাতে; কিন্তু সে-তুলাস্বর কতদূরই বা তিনি বলল। এই যল্পবর্ণিত হ'চ্ছে, স্ট্রেচারি ভাষায় 'a brevity which excludes everything that is redundant and nothing that is significant.' এ বর্ণিত উপভাসিকের সঙ্গে কেউ তুলনার কল্পিত আসে না; জিজ্ঞেস করে না, অষ্টম আর নবম পরিচ্ছেদের মধ্যে যে-বেতুন্য কাটিলে, তার মধ্যে তোমার নায়ক কী করলে না করলে, তা তো বললে। কিন্তু জীবনচরিত্রকারের বেলায় ফোকে অন্তায় ভাবে আশা করে যে সে সব বস্তু, ফোকে ফোকে কিছু বাস পড়লে তাঁর মনে ফলা নেই। কিন্তু 'বাক্যে আমের facts বসি, অনেক সময় তা জঞ্জালই কিছু নয়, সত্যের মুখ তা থেকে রাখে। এখানেই জীবনচরিত্রকার প্রয়োগ করেন তাঁর আঁট; তিনি নির্দ্বন্দ্ব করেন, বর্জন করেন 'everything that is redundant and nothing that is significant,' খুঁটি করেন সম্পূর্ণ একটা ছবি। কিন্তু কোনো বাহ্যল আশা কনট্রা ইন্সটিমুথ, তাঁর শেষ বিচার অবস্থি আর্টিস্টেরই হাতে; আমরা যেটাকে মনে করছি খুব প্রয়োজনীয়, স্বতন্ত্র-বাস্যক, সেটা হয়-তো তাঁর পক্ষে বাহ্যল; আশা আমরা যেটাকে মনে করছি চুক্ত, আবাস্তর, তাঁরই মধ্যে তিনি হয়-তো পাবেন তাঁর বিশেষ ছবির ছবি তাঁর শেষের ছোপ। এবং, জীবনচরিত্র পেছবার এক পদ্ধতির সঙ্গে দুঃস্থ অবস্থি দিয়ে গেছেন স্ট্রেচারি নিজেই। পল্লভগ্রাম্য তথ্যের ভেতর থেকে তিনি বেছে নিয়েছেন ট্রিক যৌকৃত তাঁর শিল্পগত প্রয়োজন, বাছতি কিছু সেই এবং কিছুই বাদ পড়ে নি, এবং তাঁর প্রয়োজন দেখায় পর হস্ত রেখার রং পর শব্দ রেখের ছোপে এঁকে গেছেন তাঁর ছবি, হস্তশল্য না তাঁর পা। প্রয়োজের পেছবার শিল্প রক্তন্যাস হ'য়ে বেঁচে উঠেছে। তাঁর পক্ষে সেই জীবন, সেই প্রাণ-পূর্ণ ব্যক্তিই তিনি অল্পতর কল্পনে নিজের মধ্যে; তাঁর মনেই রক্তন্যাস কেন সুস আবার বেঁচে উঠে 'অনন্য কই' যেতে; তিনি দেখছেন—আর লিখে যেছেন। আর সেই তাঁর দৃষ্টিকে প্রভাস সমীচে কি লিখে কি সাময়িক কোনো বিরহনায়। তিনি ঝাপসা হ'তে পরিবেন না; তাঁর মনের

মধ্যে তাঁর পার্থক্যিক বেভাবে দেখা দিচ্ছে, সেটাই তিনি লেখার ধরনের। একথাই বড় হৃদয় করে তিনি বলেছেন : 'Human beings are too important to be treated as mere symptoms of the past. They have a value which is independent of any temporal processes—which is eternal, and, must be felt for its own sake.' এবং সেই বা মানুষের চিরন্তন মূল্য, তাঁর নিজের ব্যক্তিরেই বা অস্থায়ী, তাই তো হচ্ছে ছবি, বিশেষ একজনের মনে বিশেষভাবে তোঁটা ধরা পড়েছে। সে-মূল্য সকলের পক্ষে সমান, সে-ছবি সকলের পক্ষে এক হ'বার দরকার নেই : সে-মূল্য সে-ছবি শিল্পী যদি সত্য বলে উপলব্ধি এবং সত্যভাবে প্রকাশ করে থাকেন, তা হ'লেই তিনি তাঁর দায়িত্ব মোচন করেন। সেই ছবিকে সম্পূর্ণ কব্জার জ্ঞান সৃষ্টি, এমন কি, তথাকথিত সত্যের, সরকারি সত্যের অপমাণ করতে কুটী করেন নি; উক্তর আলগোঁপ গা ছুটোকে যে তিনি ধর্ম্মাভিলাষী বলে বর্ণনা করেছেন, যে-দৃষ্টান্ত সকলেই জানেন। এবং, অজস্র হাল্জি লি যেমন বলেন, আমরা যখন জানতে পারি যে সৃষ্টিচরিত্র এই বর্ণনার মূলে কোনো তথ্যের ভিত্তি ছিলো না, তখন তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আরো বেড়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ, তা হ'লে, যাঁকে বলছেন সত্যকে আভাস-করে-রাখা কুলাশ, তা হচ্ছে আটমটির মনের রঙ, যাঁর সাহায্যে হুটে ওঠে ছবি। তিনি দিয়েছেন বুদ্ধদের দৃষ্টান্ত, এবং বুদ্ধের সত্যকে আমরা কিছু বলতে সাহস হয় না। বোধ হয় ভালোই, বুদ্ধদের সত্যকে যে বলতে গেলে কিছুই জানা যায় না; ভালোই, কাহিনীর স্বপ্নগুলোকে তিনি চির-অন্তিম হয়ে আছেন। তাঁর কারণ, তিনি নিজকে দান করে গেছেন তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে, তাঁর সত্তা থেকে আমাদের কোনো স্থগিত নয় : তাঁর সাধনা যে-স্বপ্নের, তা'তে বুদ্ধদের যে-বাক্য, 'আধারে-বিহীন-অজ্ঞান-মূর্ত্ত্যুদায়ক', নানা কৃত্রিম সম্পূর্ণতার যে-মাত্র, সে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক; তা'কে জানতে কিছুই জানা হয় না। কিন্তু যারা আটমটি, যারা আত্মদান করে' যান 'অজল রূপস্বর্গে', তাঁদের সত্যকে

সে-কথা খাটে না, কেননা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন জানা তাঁদের স্বর্গে বোধবার পক্ষে একটা মন্ত সাহায্যক। অনেক ক্ষেত্রে, একহিসেবে সব ক্ষেত্রেই, শিল্পীর জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে তাঁর স্বর্গের সম্পূর্ণ অর্থটা ধরা পড়ে। কারণ, শিল্পীর স্বর্গেই তো তিনি নিজে-তা নয় তো কী? শিল্পীর চরিত্রকে, তাঁর জীবনের পারিপার্শ্বিককে, তাঁর সময়েক জানতে পারলে বৃত্তে পারি, কেন তাঁর স্বর্গে এই বিশেষ রূপ ধারণ করে' ফুটে উঠে। বুদ্ধদের সত্যকে এত কম জানা যায় বলে' ফোঁত নেই; কিন্তু কালিদাস সত্যকে কিছুই জানা যায় না বলে' আগশোষ না করে' পারি নে। বুদ্ধদের, ধর্ম্মা যাক, নথ কামড়বার অজ্ঞান ছিলো কি ছিলো না, যাঁকে কিছুই আগে যায় না; কিন্তু এমন যদি হয় যে টলস্টয়ের পরিত্যক্তা-শ্রেণীর বৃত্তান্তের প্রতি মিলেবে একটা দৃষ্টান্ত ছিলো, তা হ'লে তা জানবার অবিকার আমাদের নিচ্ছই আছে; কারণ, তাঁর মধ্যে এই আত্ম-বিরোধের যন্ত্রণা তাঁর রচনার ফুটে-ওঠা তীব্রভাবে বোধবার সহায়তা করে। আটমটির ব্যক্তিগত জীবন-সত্যকে যে-কৃৎসিত কোঁড়ুল বারনের শমন্যই দেখবার লোভে চাকরদের ঘৃণ দিতে; তাঁর প্রতি তাঁর বিকৃত ছাড়া কিছু অহত্ব করা সম্ভব নয়; কিন্তু এ-ও তিক্ত যে আটমটির ব্যক্তিগত পটভূমি (মানে-আমাদের বর্গ-ই-তাঁর জীবনের পারিপার্শ্বিকের, চরিত্রের, সময়ের পরিচয়) না জানলে তাঁর শিল্পের প্রকাশ আমাদের পক্ষে অসম্পূর্ণ থেকে যাবার আশঙ্কা আছে। এবং দেখানো, যে-কোনো বৃত্তিটি সম্ভাব্যরূপে মূল্যবান, কোনো জিনিষই চল্টি অর্থে তুচ্ছ বলেই তুচ্ছ নয়, চল্টি অর্থে 'অবাস্তব' বলেই অবাস্তব নয়।

যা'কে আমরা বলে' থাকি তুচ্ছ, অবাস্তব, তা কতখানি প্রাসঙ্গিক, মূল্যবান হ'তে পারে, সেদিক জীবনের চাইতে ভালো প্রশ্ন। তাঁর কিছু হ'তে পারে না। শিল্পের কবিতা আমরা সকলেই কম কি বেশ পড়েছি (প্রশংসকৃত, বাঙালিদের শেলি আর গুডার্বার্ড, ভাগ্যবানরা করে' সমস্ত ইংরেজি কাব্যের গৌরবকার বহন করছেন), অনেকের পড়েছি জাঁজে মোরোয়ার এরিয়েল। এবং শেলি সত্যকে প্রচলিত ধারণা এই যে শেলি পাগলই দেবশিশু,

সৌন্দর্য-সমাজ-উৎপীড়িত অগ্রিপ্রাণ বিদ্রোহী, পরিভ্রাতা ও সোমশ্রীর অবতার। এ-ধারণা ভুল, তা বলবো না। যে-বাক্য 'One word is too often profaned'-এর মত কবিতা লিখতে পেরেছিলো, সে যে খানিকটা দেব-শিশু; যে-ছেলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশের অন্ধকারেই ঈশ্বর নেই, তাঁর এই সিদ্ধান্ত রচনা করতে গিয়েছিলো, তাঁর' আগে যে ছিলো বিদ্রোহের অগ্রিমূল্য; যে-পুঙ্খ সম্ভ্রমভায়ে মনের ভুলে একেবারে নয়দেহে একশর মেয়ের মধ্যে আবর্তিত হ'তে পেরেছিলো, তাঁর সৌন্দর্য ও পরিভ্রাতা যে অসামান্য, এদের কোনোটাকেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু শেলি-সত্যকে এই শেষ কথা বা সবটা কথা নয়। বাকি যেটুকু, তা পাওয়া যাবে, প্রকল্পের জটিলতায় শেলি-জীবনের সমালোচনাগুলো মাথু অর্জিত, নিজে শেলির যে-সংক্ষিপ্ত ও তীক্ষ্ণ জীবনচরিত্র লিখেছেন, তা'তে। সেই লেখা পড়ে' শেলির নিষ্ঠুরতা, নির্ধোঁষ বার্ষণরতা, অবিশ্রান্ত হাজারসমোদহীনতা, অপার কাণ্ড-মুগ্ধতা, অপার হাঙ্গামাহাঙ্গামাহীনতা, তরুনী কাণ্ডজ্ঞান-মুক্ততা না হয়, তাও বলা ও-সব কথার কোনো মানেই হয় না। সারাটা জীবন শেলি কাটিয়ে গেছেন ব্যস্ত শিশুর মত; যে-কোনো হৃদয় মেয়ের ওপর চোখ রাখলে, তা'কেই বললে ভালোবাসি; বললে, তুমি আমার আত্মার বোন। দেবীকে চাই, হারিয়েও থাক, ছেঁকেও না হ'লে তো চলেই না, এমিলিয়া ভিক্তোরিকো হ'লেও ভালো হয়-এক আধ্যাত্মিকতাময় মহা-গডাডগড়, আর কি। আর, শেলির এই ভাব যে প্রেম হচ্ছে শুধু ছুঁই দেহত্বের পাখার সঙ্গে হৃদয় পাখার মুখ স্পর্শ, এবং সেই আত্ম-প্রভাটরার আড়ালে ইন্দ্রিয়-বিদ্যে তাঁর কামা-ভবনে দেখতে গেলে তা ঈশ্বর স্বভাবমূলক হ'ত্বে। যেটার কখনো সত্যি বাপারগটকে মুগ্ধমুখি দেখবার সাহস কলিয়ে উঠতে পারে নি; নিজকে

সে এক রকম করে' বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছিলো যে তাঁর পুঙ্খের ভালোবাসা দেহত্বস্বপ্নের পাখা-কাপট্যের বেনি কিছু নয়। কিন্তু এ-সব সত্ত্বও শেলির কবিতা আমরা ভালোবাসি, শেলিকে আমরা ভালোবাসি। যদি প্রশ্ন ওঠে, এ ছুঁয়ের মধ্যে কোনটা সত্য শেলি, বলবো, ছুঁই তো নয়, ছুঁয়ে মিলে যে এক; একটা আর-একটার কাণ এবং ফল; এটা অস্ত্রতার অনিবার্য অংশ। আগা-গোড়া একই চরিত্রকে আমরা দেখতে পাচ্ছি; তাঁর বিদ্রোহে, সৌন্দর্যে, পরিভ্রাতার যেমন, তেমনি তাঁর বার্ষ-পরতা, নির্ধোঁষতা, আত্ম-প্রভাটরার কব্জার অসীম ক্ষমতায় শেলির শেলিইই প্রকাশ পাচ্ছে। প্রকৃতভাবে একটা নিম্ন অর্থে, যে-জ্ঞত একটিকে আমাদের বা উপরি-পাওনা খাটে, অগ্রিমিলে সে-জ্ঞত তিক্ত সেই অগ্রপাওনে দান দিতে হয়। 'One word is too often profaned'-এর মত কবিতা লেখার জ্ঞত শেলিকে তার হাঙ্গামসমোহ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হয়েছিলো; জেইনকে, সেই বিশ্বাস্ত নিম্নগণ পাঠার জ্ঞত তা'কে সেই হয়েছিলো অজ, অবিশ্রান্তভাবে বার্ষণর। যে-কারণে তাঁর বৈশিষ্ট্য, তিক্ত সেই কারণেই তাঁর সহজাতীয় ছেলেমানুষি, নিজের কাছেই ছেলেমানুষ হ'বার অনপসারীয় ভাণ। শেলির কবিতা কী এমন আত্মস্বাধীনতা হতে পারলো, তা বৃত্তে হ'লে জানতে হয় শেলির জীবনে রীতিমত সব ব্যাপারের বৃত্তিটি, জানতে হয় মেয়েদের সঙ্গে নানা কৃত্রিম আচরণের নির্ধোঁষ নিষ্ঠুরতা, সম্পূর্ণরূপে মানবীয় প্রেম পরিত্যক্তা কব্জার সময় নিজকে রোগী ও প্রিয়াকে শুক্র-কারিণী বা ঐ ধরণের কিছু-একটা কল্পনা কব্জার আশোদায়ী বদমাশ। শেলিকে আমরা ভালোবাসি, তাঁর চরিত্র ও-সমস্ত শুক্রতার অজাব থাকে সত্ত্বও নয়, ও-সব আছে বলেই; কারণ ও-সব অজাবেরই পরিপূরণ তাঁর তেজে, তাঁর তীব্রতা, বস্তার মত তাঁর অরণে। ও-সব জীবনের ভাজে শেলি পড়ে' হ'তে পেরেছিলো; আমরা, শেলিকে কী ভালোবাসি, তুচ্ছ বলে, 'অবাস্তব বলে' ও-সব জিনিষ বর্জন করবো না, বরং ও-সবের ভেতর দিয়েই দেখবো শেলির সম্পূর্ণ প্রকাশকে।

হিক্রর ছায়াভূসরণে

শ্রী অজিতকুমার দত্ত

১

তোমার মুখের চুমা পাই যেন, হে মোর হৃন্দর !
মধুর তোমার প্রেম, হুরার চেয়েও মোহময় ।
হে মোর আত্মার সখা ! কেমনে তোমার পরিচয়
ওদের বোঝাবো আমি ? তুমি যে অস্বাক্ষর মনোহর !
তুমি যেন রাজরথে বিশাল, উদ্দাম, খরতর
অশ্বদল, তুমি যেন শান্ত সিদ্ধ, মুক্তার আলয় ;
তোমার বাহুতে আমি পরাইবো সোনার বলয়,
দোলাবো মুক্তার মালা, আমি তব বৃকের উপর !

২

চন্দনের মালা তুমি, আমার বৃকের মাথখানে
আমারে জড়িয়ে থাকো সারারাত নিবিড়, গভীর !
হে হৃন্দর, হুশীতল ! ঘাসে যেথা পড়েছে শিশির
তরল মুক্তার মত, আমাদের শয়ন সেখানে ;
বটের নিবিড় ছায়া সেখানে গভীর শান্তি আনে,
মাধবীর ঘন ছায়ে সেথা হয় নিঃশ্বাস মদির !

মোরে সে রেখেছে বেঁধে ডান হাতে বন্ধের সম্পূর্ন,
আমার মাথার নীচে বাম বাহু রেখেছে সে তার,
ওগো যত জেকসালেমের মেয়ে ! স্বপন আমার,
আমার প্রিয়ের ঘুম দেখো যেন নাহি যায় টুটে ;
শান্তজলে তারকার ছায়া সম উঠিয়াছে ফুটে
যে-স্বপ্ন আমার চোখে, ভাঙিয়োনা সে-স্বপ্ন সোনার ।

পরিবর্তন বা পরিবর্তন

নব্যপন্থীর মত

মহামহোপাধ্যায় শ্রী প্রমথনাথ তর্কভূষণ

নব্যপন্থী হিন্দু বর্তমান সময়ে দুই ভাগে বিভক্ত, প্রাচীন
আচারের আবদ্ধকতা নাই, সহস্র বৎসরের পরীক্ষায় ইহার
কৃৎসল যে হিন্দুর সঙ্গ প্রকার জাতীয় উন্নতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তাহা
প্রমাণিত হইয়াছে সুতরাং বাচিনা থাকিয়া জীবন-সংগ্রামে
জড় হইতে হইলে, ঐ সকল আচার একেবারে পরিবর্তন
হিন্দুর পক্ষে যত শীঘ্র সম্ভব কর্তব্য, এই মত বাঁধার পোষণ
করিয়া থাকেন—তাঁহারা প্রথম পক্ষের অন্তর্গত । দ্বিতীয়
পক্ষে—বাঁধার প্রতি, তাঁহারা বলেন প্রাচীন সকল আচারই
যে পরিবর্তনীয়, তাহা বলিতে পারা যায় না, প্রাচীন আচার
বাগ বর্তমান সময়ে চলিতে পারে না তাহারই পরিবর্তন
করিতে হইবে আর যাংরা অধুনা জাতীয় বৈশিষ্ট্যের রক্ষণ
করিয়া থাকে, তাহা আবদ্ধ হইলে বাহু আচারের
পরিবর্তন করিয়া ও নূতন সমগ্রোপযোগী আচারে সর্বথা
পালনীয় । এই দুই প্রকার নব্যপন্থীর মত ভাল করিয়া
বুঝিতে হইলে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দ্বারা উত্তর মতেরই
বিমূর্ষণ করা একান্ত আবশ্যক । সুতরাং সেই বিষয়েই
প্রথমতঃ প্রস্তাব করা যাইতেছে । এই দুই দলের মধ্যে প্রথম
দলকে পরিবর্তনবাদী নব্যপন্থী এবং দ্বিতীয় দলকে পরিবর্তন-
বাদী নব্যপন্থী বলা যাইতে পারে ।

এক্ষণে দেখা যাক পরিবর্তনবাদী নব্যপন্থী হিন্দু কি বলিয়া
থাকেন । তাঁহারা সংবাদপত্রে ও সভাসমিতিতে নিম্নোক্ত
বলিয়া থাকেন যে ক্ষতি দৃষ্টি ও পুরাবিদ্যা শাস্ত্র সমস্ত বর্ণাশ্রম
ধর্মই হিন্দুর বর্তমানে ও ভবিষ্যতে সকল প্রকার সৌক্য
উন্নতির একান্ত বিরোধী । এই বর্ণাশ্রম ধর্ম হিন্দু-সমাজকে
শতধা বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে—মাহুষ কেবল জন্ম দ্বারা উন্নত
বা নিকট হইয়া থাকে—স্পৃহা বা অস্পৃহ হই, এইরূপ সিদ্ধান্তের
উপর এই শাস্ত্রমুখোক্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত, এই ধর্ম
প্রত্যেক মানবের বাক্ষিকত বাদীভার অস্তিত্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতা,
উচ্চতর বিজ্ঞান ও দর্শন দ্বারা পরিচালিত বর্তমান সভ্যতার

ঘূর্ণে এই ধর্ম শক্তিত বাক্তির পক্ষে সর্বথা উপেক্ষণীয় ।
মাহুষ জন্মের পর হইতে মরণ পর্যন্ত মাহুষই থাকে—কুখ
কুখা ভোগ বাসনা প্রত্যেক মাহুষেরই আছে ও আদরণ
পাকিবে । কুখা কুখাকে নিবৃত্ত করিয়া আত্মমুখিক ভোগ
বাসনাকে চরিতার্থ করিয়া বাচিনা থাকিবার যে অধিকার
তাহা প্রত্যেক মাহুষেরই আছে ও থাকিবে । সেই অধিকার
যদি অপর মাহুষের স্বার্থের বিরোধী না হয়, তাহা হইলে
তাঁহাতে বাধা দিবার শক্তি কাহারও থাকে উচিত নহে, ইহাই
হইল মাহুষের আত্মমুখিক প্রকৃতিসিদ্ধ অধিকার—যে ধর্ম বা
আচার এই অধিকারের বিরোধী তাহা মাহুষের ধর্ম বা
আচার বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না । এই মাহুষের
আত্মমুখিক অধিকারের বাধা অহুতুল ও পরিপোষক সেই
ধর্ম বা সেই আচার—উৎকৃষ্ট ধর্ম বা উৎকৃষ্ট আচার,—
বর্তমানকালে বর্ণাশ্রম ধর্ম বা বর্ণাশ্রমচার আমাদের মধ্যে
প্রচলিত রহিয়াছে তাহা এই প্রকৃতিসিদ্ধ মানবাধিকারের
একান্ত বিরোধী, এই কারণে তাহা যত শীঘ্র সম্ভব, একেবারে
পরিবর্তনীয় ।

একই জগৎপরে কৃত্রিম বা যুগল জল পান করিতেছে, সেই
জগৎপরের জল উচ্চজাতির পক্ষে অবজ্ঞনীয় নহে কিন্তু এক-
জন তথাকথিত নীচ জাতির মাহুষ যদি সেই জগৎপরে হইতে
পানীয় গ্রহণ করে তাহা হইলেই তাহার জল অপেক্ষ হইবে
—এই যে আচার তাহা সমস্ত শাস্ত্র দ্বারা সমর্থিত
হইলেও মাহুষের বিবেকদ্বারা কিছুতেই সমর্থিত হইতে পারে
না । অথচ এই চিরন্তন প্রচলিত আচারকে রক্ষা
করিবার জন্ত প্রাচীনপন্থী হিন্দুগণ বিরাট আন্দোলনের
সৃষ্টি করিতেছেন—সনাতন ধর্ম গেল, হিন্দুজাতির সর্বনাশ
হইল, হিন্দুর বৈশিষ্ট্য রসাতলে ডুবিয়া, এইরূপ কোলাহলে
আকাশপনব সুধরিত করিয়া তুলিতেছেন, ইহা অপেক্ষা
বিশ্বদয়ক ব্যাপার আর কি হইতে পারে ? মুসলমানের

জীৱগণের হোটেলের ধনী ও মধ্যবিত্ত হিন্দু বিনা সন্ধ্যাকে উপস্থিত হইয়া সকল প্রকার চর্চা, চোচ্চ, লেখ ও পোষের আশ্বাসন করিতেছে, সমস্ত তাহা দেখিয়াও দেখিতেছে না।

তাই পরিবর্তনকামী নবাহিন্দুগণ বলিতেছেন, হিন্দুকে বাচিতে হইলে বাচিয়া পৃথিবীর উদীয়মান জাতিগণের মধ্যে আত্মস্থান রক্ষা করিতে হইলে প্রাচীন বর্ণাশ্রমভাচার পরিত্যাগ করিতে হইবে, হিন্দুগণ মধ্যে জাতিগত উচ্চনীচ ভাব একেবারে ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে, সাম্য স্বাধীনতা ও মৈত্রীর বিজয়পতাকার নীচে সকল হিন্দুকে সমবেত হইতে হইবে—সম্মত শক্তি সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দ্বারা ব্যক্তিগত লুপ্ত শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করা, বাতিলের বহুমান সময়ে হিন্দুগণ এই ভারত সপন্থানে ব্যাচিয়া থাকা সম্ভবপর নহে ইহা প্রত্যেক হিন্দুকে বুঝিতে হইবে। এই সম্মত শক্তি লাভ করিবার জন্ত তাহাৎকে বহিঃসকল শাস্ত্রগ্রন্থ আপাততঃ হিন্দুকে পুরিয়া রাখিতে হয়, তাহাও করিতে হইবে, আবার যদি জাতীয় জীবনের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয় তখন স্বতন্ত্র হইয়া সমর্থ হইয়া, সমগ্র বিশ্বকে সম্পন্ন সেই হিন্দুকে তাল। ভাঙিতে পার—সেই সকল শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িয়া প্রাচীনকালে কি ভাল ছিল—এখন তাহা ভাল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে কিনা তাহার বিচার করিতে পার, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, বৃগঞ্জ'লাভ বংগিনী না হয়, ততদিন পর্যন্ত আর শাস্ত্রীয়, বচনবাগ্মিশতার কোন আবশ্যকতা নাই, হিন্দুর পুনরুজ্জীবনের একমাত্র নিদান হিন্দুর সম্মত শক্তির জাগরণের বাহ্য বাহ্য প্রতিস্থল তাহার বর্জনেই এখন হিন্দুগণ স্বধর্ম ইহা ছাড়া অস্ত্র ধর্ম বর্তমান সময়ে হিন্দুধর্ম বলিয়া বর্তমান ভাৱতে পরিপূর্ণ হইতে পারে না।

কিন্তু পরিবর্তনকামী নবাহিন্দুগণ বলিতেছেন, হিন্দুকে বাচিতে হইলে বাচিয়া পৃথিবীর উদীয়মান জাতিগণের মধ্যে আত্মস্থান রক্ষা করিতে হইলে প্রাচীন বর্ণাশ্রমভাচার পরিত্যাগ করিতে হইবে, হিন্দুগণ মধ্যে জাতিগত উচ্চনীচ ভাব একেবারে ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে, সাম্য স্বাধীনতা ও মৈত্রীর বিজয়পতাকার নীচে সকল হিন্দুকে সমবেত হইতে হইবে—সম্মত শক্তি সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দ্বারা ব্যক্তিগত লুপ্ত শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করা, বাতিলের বহুমান সময়ে হিন্দুগণ এই ভারত সপন্থানে ব্যাচিয়া থাকা সম্ভবপর নহে ইহা প্রত্যেক হিন্দুকে বুঝিতে হইবে। এই সম্মত শক্তি লাভ করিবার জন্ত তাহাৎকে বহিঃসকল শাস্ত্রগ্রন্থ আপাততঃ হিন্দুকে পুরিয়া রাখিতে হয়, তাহাও করিতে হইবে, আবার যদি জাতীয় জীবনের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয় তখন স্বতন্ত্র হইয়া সমর্থ হইয়া, সমগ্র বিশ্বকে সম্পন্ন সেই হিন্দুকে তাল। ভাঙিতে পার—সেই সকল শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িয়া প্রাচীনকালে কি ভাল ছিল—এখন তাহা ভাল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে কিনা তাহার বিচার করিতে পার, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, বৃগঞ্জ'লাভ বংগিনী না হয়, ততদিন পর্যন্ত আর শাস্ত্রীয়, বচনবাগ্মিশতার কোন আবশ্যকতা নাই, হিন্দুর পুনরুজ্জীবনের একমাত্র নিদান হিন্দুর সম্মত শক্তির জাগরণের বাহ্য বাহ্য প্রতিস্থল তাহার বর্জনেই এখন হিন্দুগণ স্বধর্ম ইহা ছাড়া অস্ত্র ধর্ম বর্তমান সময়ে হিন্দুধর্ম বলিয়া বর্তমান ভাৱতে পরিপূর্ণ হইতে পারে না।

কর্মণঃ



দোলা

বিতর্ক !...

ত্ৰিদিলাপকুমার রায়

পড়া শেষ হ'লে আনা খানিক চুপ করে হইল; পরে বলল: "ভারি মিষ্ট তো তোমাদের ভাবা!" অনেকটা ফরাসীদের মতন আবার।

—“গুরিয়ে নিজের স্ত্রী?”

আনা রুখে উঠে বলল: “মোটাই না। সত্যিই আমার হারি অসুখী লাগছিল—স্থানে স্থানে উজ্জ্বল পঙ্ক্তির মালা। তোমাদের ত দু, উচ্চহিন্দু—কী রকম ‘আত্মা ফরাসী উজ্জ্বলগণের মতন। ইংরাজী বা জার্মানির সঙ্গে তুলনা করে দেখ ত?”

—“শব্দন হাসতে লাগল।

আনা বলল: “শুধু তাই নয়। শ্রামিনী ধবলিনীর ওপর ছড়াটির মধ্যেও ফরাসী রসিকতার আবেশ।”

—“কেন বল বা একটু বাড়াবাড়ি আছে এর কিলসফির মধ্যে।”

—“মোটাই না—ছব্ব সত্য।”

—“কেনম করে? যুরোপে কি শ্রামচর্চের প্রতি শোকের জাগ্রি বিবেক নেই বলতে চাও?”

—“অজট বলেছিল না—নৌদের হোটেল যেতে সেই কাকি পুরুষের সঙ্গে স্বন্দরী ফরাসিনীর প্রীতি দেখে ইমামেলা বলেছিল সেটা তার চোখে একটুও অসম্ভব ঠেকে নি?”

—“ইসাবেলার কথা আলাদা—”

—“একটুও না। লায়নি জাতের যে-কোনো মেয়ের সংকেই ঐ কথা। মাস্তরের মধ্যেও—বর্ণবিষ নেই।”

—“কিন্তু ধর টিউটন বা আনোমাসান?”

—“ওদের মেয়েদের মধ্যেও নেই বোধ হয়। অন্ততঃ অনেক স্থলেই যে নেই এ নিশ্চয়। ইসাবেলা যুব টিক কথাই বলেছিল যে অনেক ক্ষেত্রেই বহর উল্টো: শ্রামদের প্রতি খেদাশ্রিনীর বহর বেশি চান।”

—“কিন্তু শ্রামদের প্রতি বা Yellow-peril-এর প্রতি যুরোপের বাণ্যক বিমুগ্ধতার কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ।”

—“মোটাই না। কিন্তু আমরা তো এখন সমস্তটির রাষ্ট্রগত বা জাতিগত বাণ্যকতার বিচার করছিলাম না, করছিলাম ওর যৌনগত সত্তার। আমার বক্তব্য ছিল—এদিক দিয়ে দেখতে গেলে বৈদ্যদৃষ্টই যে অনেক সময় বেশি চান এ একটি স্বাভাবিক জ্ঞান। ডাক্তারি সত্য। স্বাক্ষর ছড়াটি তাই গভীর হয়েছে।”

—“শব্দন হেসে বলল: “আডমিরেশন যে ক্রমেই বেড়ে উঠছে?”

—“সত্যি, তাকে দেখতে এত ইচ্ছে করছে আজ।”

—“শব্দন চুপ করে থাকে।

—“আনা হঠাৎ বলল: “তাকে তার করে দাও না নীসে আসতে।”

—“শব্দন হো হো করে হেসে ফেলল: “সাবে কি আর মেয়েমানুষকে বিধাতা মেয়েমানুষ নামে ডেকেছেন।”

—“আনা রাগতে হুরে বলল: “যেন একেবারে তারি অসম্ভব প্রস্তাব করেছি।”

—“কর নি? কলকাতা থেকে নীসে আসা কি সম্ভব কথা না কি?”

—“কেন নয় ভনি? তোমরা ধনী—তোমার স্ত্রী পাকা নব্যা মেয়ে—নটলে এ ধরণের কবিতা লিখতে পারত না।

—“আমি যদি এক কথায় তোমার মতন গৃহিনীর আশাশীল সঙ্গে একজোড়ের একটা পারিস—থেকে নীসে পাড়ি নিতে পারি তাহলে তার পক্ষে নিরাপত্তে কলকাতা থেকে যুরোপে আসা কি এতই অসম্ভব নী?”

—“বাস—দুঃস্বপ্নের কথাটা বেমালুম স্কলেই যাচ্ছ।”

—“আজকের দিনে তাকে বিদ্য কতটুকু—যদি টাকা থাকে? তাছাড়া, যে-তরঙ্গী এ-ভাবে দুঃস্বপ্ন থেকে স্বামীকে

হয়ত তাকেই স্বপ্ন দেখেছে !!! তার বৃক্কের রক্ত উৎসল হয়ে ওঠে!

হঠাৎ আনার একটি অনাবৃত বাহু তার গায়ে এসে ঠেকে।...সে তড়িৎস্পৃষ্ট হয়ে সঁচের যায়। তার রক্তের মধ্যে মুহূর্তে বিদ্যাতর তাল ওঠে বেজে। পজ্ঞনের মধ্যে কলোলের পরফলসি।...

কিন্তু হঠাৎ আনার কাতরোক্তি শুনে সে ফের চমকে ওঠে।

—“কী আনা?” মুহূর্তে বিভ্রাৎ বিয়ততার মেঘের শ্রামলতার রূপান্তরিত হয়।

—“আমার ফের আর এল যেন মন হচ্ছে। মাথাটা বড্ড ধ’রেছে।”

—“টিপে দেব?” স্বপ্নন সেই সবুজ বাতিটার হুইট টেপে।

—“ন—ন—ন মানসি শের, মেনি।” *
এমন কোমল কৃষ্ণে তাকে আনা কণ্ঠনে “প্রিয়বন্ধু আমার” বলে সম্ভাব্য করে নি। তার কণ্ঠস্বরে যেন অজ্ঞাতা, কৃতজ্ঞতা, মাধুর্য—উপলব্ধ পড়ছে।

স্বপ্ননের রক্তের মধ্যে নিবিড় হয়ে ওঠে কাপ্তান, সমবেদনা, কোমলতা। সে ওভারকোটটা গায়ে দিয়ে উঠে বসে আনার বারের বিধরে বসে তার মাথায় হাত বুদিয়ে দিতে থাকে। কপালটা ফের যেন একটু বেশি গরম!

—“এ কী আনা?” ফের আর এগেছে যে খুব? গা যে পুড়ে যাচ্ছে?”

—“ও কিছু নয়।” একটু থেমে মুহূর্তের আনা বলল—
“আগে একবার আঁসোশীনে বেডোড, গিয়ে ভীষণ মালোরিয়ায় দুসি মাস হয়েক। তার পর থেকে আর আমার বখনই হয় একটু বেশিই হয়। ওতে ভাববার কিছু নেই—তোমার হাত কী চমৎকার ঠাণ্ডা কিন্তু! তোমার শীত করছে না তো?” তার কণ্ঠস্বরে কোমলতা এমন স্পন্দমান।

—“না না। দেখছ না আমার গায়ে ওভারকোট।”

—“তুমি এত ভালো মানসি শের—বেচারী!”

স্বপ্ননের মনের মধ্যে কোমলতার জোয়ার তুলে ওঠে। সে তার ঘাড় মাথা টিপে দিতে দিতে বলে: আচ্ছা গো আচ্ছা—হয়েছে। এখন ঘুমোবার চেষ্টা করবে কি একটু?”

আনা তার একটা হাত নিজের চোঁহাতের মধ্যে টেনে নিয়ে নিজের গালে কপালে ঘাড় কণ্ঠে রাখতে লাগল। শেষে বলল:—“আঃ—। কী ঠাণ্ডা!”

হঠাৎ চোখ মেলে আনা বলল: “হ’য়েছে—এবার তুমি ঘুমাও স্বপ্নন।” স্বপ্নন হুদিয়ে ক’রে মাটিতে তার কবচটা বিছিয়ে বসে ওর মাথা টিপে দিলেন।

—“আচ্ছা গো আচ্ছা। আমার ঘুমের ভাবনা রেখে নিজের ঘুমের চরকার তেল দেবে কি একটু?”

আনা মান হাসে। আবছা সবুজ আলোয় তার মুখখানি এমন হৃদয় রেখায়!...কণ্ঠ অনাবৃত। হুজুটা নয় বাহু কব্জলের বাইরে। একহাত স্বপ্ননের কোলে—আর একহাত স্বপ্ননের করতলের মধ্যে মুছিত। স্বপ্ননের দিকেই গাশ ঘিরে শুয়ে। মাঝে মাঝে এমন ক’রে তাকায়!...স্বপ্ননের বৃক্কের কাছে তাঁর মাথা। কত কাছে!...কয়েকগাছি চুর্ণালক তার শুভ্র গ্রীবার টেনের কাঁকুনিতে অঙ্গ কাঁপে... কণ্ঠের ত্রিক্ত ব্যাকথনে একটি সুক সোনার হারে বাঁধা একটি লকেট।...কী মোহম্বর দেখায় তার এ নিখাড়া অসতর্পিতা মুষ্টি! ত্রিক্ত যেন বিশঙ্কতার একটি ছবি। ছবি...ছবি... ছবিই বটে—স্বপ্নন গা...।

আনার শ্বাস প্রাণাঙ্গ মধুর হয়ে আসে। ঘুমিয়ে পড়ে।... তখনও দেহ তালে তালে ওঠে পড়ে।...দেহের কত রেখা... স্বপ্নন একদৃষ্টে চেয়ে দেখে। কিন্তু সে-দৃষ্টান্ত আর মানসি নেই একটুও। সে তার সমগ্র চেতনা দিয়ে একটি ছবি দেখেছিল।—সত্যিই ছবি।—একটি নির্ভরশীল হৃদয়ী তরুণীর অঙ্গদায়তার আঁকা ছবি যেন। তার বৃক্কের মধ্যে তৃপ্তি উপলব্ধি পড়ে একটা গর...আবেশ...মাংসকতা...

আনার ত্রিক্ত অবধি কবচটা ভালো ক’রে সন্তর্পণে টেনে নিয়ে সে চারদার শুভে দিলো ভোখকের নীচে। তারপর সবুজ খোটা আলোটি দিলো নিবিধে।

পাড়ী ছলতে ছলতে চলে। পাশে আনার নিম্নমিত ছন্দে রৌপ্যনিঃশ্বাস শোনা যায়...

প্রাস!

স্বপ্নন নীচে আনাকে নিয়ে গেল না। নীচে এ সময়ে এত ভিড়! কোন্ সময়েই বা নয়?—সে সোজা গিয়ে উঠল এখানে Hotel Beau Sejour-এ।

ছোট্ট হোটেলটি,—কিন্তু যেমন হৃদয় তার বাগান মেমনি উপভোগ্য তার নির্জনতা। প্রাসের প্রায় শেষ প্রান্তে। এখানে লোকচালাচলও বিরল হ’য়ে এসেছে একটু। মানের সৈকন্ত ধপ্পল সাধা। সকালে ঝিক্‌মিক্‌ ঝিক্‌মিক্‌ করে এমন।...আনা দেখে জরের তড়িৎগে গুণি হ’য়ে ওঠে। যখন তাকে এমন এক গৌরবের রোলেলা বোধ করে—যেন এ-হোটেলের আবহৌনী তার নিজেরই স্বষ্টি!...

ত্রিক্ত সন্দের উপরেই ওদের ছুটি ঘর। পাশাপাশি। প্রতি ঘরের সামনে অর্দ্ধ চক্রাকৃতি ব্যালকনি। আনা আরও গুণি হ’য়ে উঠল তার ঘরের ব্যালকনিতে দেখে। জরের বেনাও যেন ও ভুলে গেল মান্দের শ্রামল আন্তরনের দৃশ্যে। স্বপ্ননকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল: “কী হৃদয় হোটেলটি!” আনাকে পলক-উল্লেখচিন্তে তার বিছানায় বেশ পরিপাটি করে শুইয়ে দিয়ে ও ডাক্তার ডাকতে পাঠালো।

তার শেখরাজের দিকে অরটা একটু কপলও—এখনো তার মুখগো বোণ রক্তা ছিল। স্বপ্নন একটু উদ্বিগ্ন বোধ করছিল। হোটেলের এক একটু ভরসা পেলে যেন।...

—“ডাক্তার না আসা পর্যন্ত কাছে বসো স্বপ্নন।” স্বপ্ননের এত ভালো আগে এ সহজ দাবীর হুর। এ তো স্বপ্ননের নয়—যেন আদেশ। আদেশও সময়ে সময়ে কী খুব লাগে!...স্বপ্নন তার পায়ের উপর নিজের মোটা গীলনির কবচটা বিছিয়ে দিলো—হঠাৎ।

—“ও কী করছ? আমার কি এখনো শীত রয়েছে না কি?”

—“আহা!—কেবল তর্ক করে কেন বসো তো? ডাক্তার আসছেন—ততক্ষণ পর্যন্তও কি মন্তব্য দেওয়া স্বগিত থাকতে পারে না তোমার পায়ের কবল দেওয়া সম্ভব?” স্বপ্নন তার মাথায় হাত বুলাতে থাকে।...

হঠাৎ আনা বলল: “আহা বেচারী! একটা পথের বেঘের হচ্ছে—”

—“পাখাবে একটু? কেমন বোধ করছ?”

—“বৃক্কের মধ্যে কি রকম যেন ক’রে উঠছে থেকে থেকে। তারি তারি লাগছে—বাখার মতন। নইলে ভালোই।”

স্বপ্নন আরও ভর পেয়ে গেল।...

ডাক্তার স্বপ্নন এলেন শুধন সন্ধ্যা প্রায় ছটা। আনার বৃক্ক পিঠ পরীক্ষা করে তার সামনে হেসে বললেন: “কিছু না—একটু ইন্সুলয়েজা মতন। তার ওপর এতটা পঁখ জরীল শরীরে টেনে আসা—ওটা নামা”—ইজ্যাদি। কিছু হাইরে এসে স্বপ্ননকে বললেন: “এখানকার সবচেয়ে বড় হাট পোশাণিট ডাক্তার সিয়েরাকে কাল কনসাল্টেশনে ডাকা ভালো বোধ হয়।”

স্বপ্নন শুদ্ধমুখে বলল: “ভয়ের কারণ আছে না কি?”

—“খুশতে পারছি না, বা ফুস্‌সে একটা জারগায়— কিন্তু ডাক্তার সিয়েরাকে কনসাল্ট না ক’রে কিছু বলতে চাই না। মাঝামাঝি কথাটা গুণিসি হয়েছিল কি?”

—“হী মাস হিনেক আগে।”

ডাক্তার সাহেবের মুখ আরও অন্ধকার হ’য়ে গেল।

—“কী?”

—“কিছু না। কাল সকালেই ডাক্তার সিয়েরাকে নিয়ে আসব তাহলে?”

—“নিশ্চয়। জিজ্ঞাসা করছেন কেন একথা?”

ডাক্তার বললেন: “ওটার ফীটা একটু চড়া।”

স্বপ্নন উদ্ভাঙ্গের হাসি হেসে বলল: “ভাতো কি?”

ডাক্তার উদ্ভাসিত হাসি হেসে মাথা নিড়ে বিবাহ মিলেন। বিদেশী স্বপ্নর্শন যুগ্কটির বেশভূষা যে আশাপ্রভা ত বুঝতে

তার বিশেষ বিলম্ব হয় নি। তার টাইপিনটির মুরকতটির পানে কয়েকবার চেয়ে দেখছিলেন থেকে থেকে। হঠাৎ স্বপনের কি মনে হয়। সে ছুটী ঠাকৈ মোটরের পাদানীতে ওঠবার সময় খ'রে বেশে বলে : "ভদ্রন, ডাক্তার সিয়েরাকে এগনি ডেকে আনবে পারেন না?"

— "পারি, —তার বাড়িও পুর কাছে। কেবল"—একটু থেমে, "সন্ধ্যায় তাঁর ফী-টা—"

— "ভলসী কী দিলে হবে না?"
ডাক্তারের মুখে হাসির চাপা সৌধামিনী খেলে গেল।
লোকটা ছছরি!

আনার ঘরে প্রায় আশ্বখটী খ'রে তাকে পতীক। ক'রে ডাক্তার সিয়েরা স্বপনের ঘরের দোরে টোকা মাগলেন।

— "আমুন।...কী দেখলেন?"
— "ওকে জানাবেন না—তবে আপনায় কেনে রাখা দরকার যে গরিও এক-আট বিশেষ-কিছু নয়—কিন্তু হঠাৎ কোনো আখ্যাত বা মানসিক উৎকণ্ঠা বা প্রবল উত্তেজনার খুবই খালাস দিকে বেক নিতে পারে।"

স্বপন উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলল : "ফের প্রুগিস বা নিউমোনিয়ার ভয় নেই তো?"

— "সে ভয় তত নেই। আসল ভয় গুর রায়বিক অবস্থার জ্ঞতে। সন্দ্ব্যাস মেনিঞ্জাইটিস হয়েছিল। মনঃকষ্টও—না?"

— "খুব বেশিই গেছে"—স্বপন মুখ একটু নিচু ক'রে বলে।

— "সেইটোতেই বা থেয়েছেন—খুব জখম হয়ে গিয়েছে তাতে গুর রায়ও গুণী। কোনোরকম উত্তেজনা যাতে না হয়। হ'লে হঠাৎ মূর্ছা হ'তে পারে—আর জ্বশ্মিওও একটু গ্রবল আছে। তাই বিশেষ করে দরকার ঠেকে সাধামত প্রুগুর রাখা—উপেগ উৎকণ্ঠা থেকে বতহুর সম্ভব বাচিয়ে রাখা।—কিন্তু অত ভয় পাবার কিছু নেই। চোয়ালির দেহভরও বিকল হয় নি, হৃৎকরও তেঁজ আছে। তাছাড়া এখানকার হাওয়াও খুব ভালো। শুধু দেখবেন খুব শান্তি—মুনের শান্তি যাতে

মানাম পান। মনটাকে যতটা পারেন প্রুগুর রাখবেন। আর—ও কিছুই না। কালই ছেড়ে থাকে।"

দায়িত্ব!...

আনার অর সতিই তার পর দিন ছেড়ে গেল।
কিন্তু স্বপন তাকে বেরতে বিন না তার বেরতে চাওয়া সত্ত্বেও। বাইরে বাগানেও না। নতুন অভিব্যবকের গাভীরা!—স্বপন পা ভুলিয়ে বলে। আনা হেসে বলল : "যাকে তোমাদের গুরুজাতির ভাষায় বলে চাল অফ ইয়ার লাইফ টাইম—না স্বপন? নাও খাটিয়ে নাও গুরুগিরি।"

স্বপন হেসে বলে : "কী করি বল? যে নিজে অস্থ—বেশাল—তাকে একটু নজরবন্দীর মধ্যে রাখতেই হয় সামুদ্রিক হ'লে।" পাগলকে ভেলভেট-মোড়ী দেয়ালওয়ালা ঘরে রাখে অনেক সময় ধরে জানো তো?"

ফের ছজনদের মধ্যে গলিত পরিহাস ও কথা কাটাকাটি চলে। স্বপনের বুক থেকে যেন পাখর নেমে যায়।

আনা শেষে রাগ ক'রে বলে : "যদি বেশি বাড়িবাড়ি কর তাহলে মক্কেল কিছু কিছুই হবে বলে রাখছি।"

স্বপন হেসে বলে : "তোমার মনিবাগ-স্বপন খুঁটি যে এখন—আনার ওদারকে—যদি ছি'ড়ে যাবে কোথায় বল?"

আনা রুখে উঠে বলে : "ঈ শ—যেন—" কিছু কী বলছে বুজে পায় না।

ছজনই হেসে ওঠে।
এদিক ক'রে চটুল গর ও হাতপরিহাসের মধ্যে আনা ছদিনেই হ্রস্ব হয়ে ওঠে।

বিচিত্র!

বিচিত্র জীবন? তা বই কি—একশোবার। কোথায় ছিল সে আর কোথায় আনা—মাত্র ছদিন আগে। ও কী কেউ ভেবেছিল যে বিশেষও তার জীবনে এমন অভিব্যবকের তার পড়বে।—আর একবার নয়—

হুইবার!...ইদাবোলা আজ কোথায়? নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করে। আশ্চর্য ভ্রমেনেই আবার সে কতখানি দূরে খ'রে গেছে! আর আনা ফের হ'য়ে উঠেছে—এত বাস্তব!

আনার সঙ্গে কত আজ-বাজে গরই না হয়। মাঝে মাঝে সে নিজেই আশ্চর্য হ'য়ে ওঠে যে এক সজপরিচিত বিশেষণীর সঙ্গে এত সহজে এক বাজে গল্পের মধ্যে মশগুল হ'য়ে বেতে পারে সে!...সময়ের যেন পাখা উঠেছে। বেশতে দেখতে তিন চার দিন কেটে যায়।

আনা সমুদ্রের হাওয়ায় ও গলাগলে মহা আনন্দে থাকে। একটু একটু ক'রে তার জন্মে মোটের এদগের ওদগের বেতে বেতে আরম্ভ করে। কারণ আনা এখনও বেশি শিশু হিটেতে পারে না। ডাক্তার সিয়েরাও বলেন ইটো বেশি ভালো নয়—কারণ ওর বায়ু, দুগ্ধ, মাথা সবই এখনো দরল—জেনেরাল এস্টেপনের পরে অনেক দিন সাধারণ থাকতে হয়। স্বপন সর্বদা সচেত থাকে তার সঙ্গে ফট-নষ্ট করতে। গম্ভীর আলোচনা তুলতেই দেয় না। কোনো তর্ক উঠলে এতই সাবধানে কথা কয়।

আনা প্রথম প্রথম তার সাবধানতা লক্ষ্য করে নি। কিন্তু শেষটার দেখতে পায় যে তর্ক জ'মে তঁার উজ্জ্বল হ'লেই স্বপন হার যেনে দেয়। সে জেরা লক্ষ্য করে। যখন বলে : "খাবে না। তর্কে মাহুর বৃষ্টি সব সময়ে পাট্টা জবাব বুজে পায়?"

আনার মনে কিছু শৃংখর জাগে। মাঝে মাঝে টোট হুগিয়ে আনিনদের আনিন করে। কিন্তু স্বপন তা-ও গায়ে মাখে না—পাশ কাটিয়ে যায়। আনা দ্রবং আহত হয়—কিন্তু বোঝে।...স্বপন কেমন যেন সাবধান-সাবধান ব্যবহার করছে। স্পষ্ট করে একপ্রগড় তোলাও করিন। এনতুন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কেমন যেন কোথায় একটা হ্রস্ব বাধা—গরমিলের অবাচ্ছন্দ্য। দেহের মধ্যে এক এক রকম বাধা মাঝে মাঝে দেখা যায় না বার স্থান নির্দেশ করা বড় করিন? ওদের অন্তরঙ্গতার মধ্যকার হ্রস্ব গরমিলটা অনেক সময়ে ঠাড়াই যেন অনেকটা ঠিকরকম। যেন

লাঠি হাতে ক'রে অন্ধকারে চলা—অগে লাঠি ফেলে তারপর পদক্ষেপ। নির্ভীক বেগেরেয়া লম্বুগতি ত নয় এ!...আরও মুদিল এই যে একটু একটু ক'রে ও বেরুত হচ্ছে এটোও স্বপন বোঝে।—বোঝে, যে আনার এক-প্রুগুরতার মধ্যেও একটা হ্রস্ব অবাচ্ছন্দ্যের টুকুরা দেখা উড়ে এসে জুড়ে বলে থেকে থেকে, ও সে-সেখের আয়তন হুগুছেই যিনি-বিন...ইগাবোলার সঙ্গে কিছু ঠিক এরকমটা হয় নি। সে সতিই ছিল দমকা হাওয়া। মেঘ জন্মে সাধা কি? তাছাড়া ইগাবোলার ক্ষেত্রে একটা হুগিবাং ছিল যে—স্বপন ভাবে। সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি ছিল যে। প্রমে two is company three is none বটে—সময় বিশেষে—কিন্তু বহুস্থ ও প্রেমের মাঝামাঝি ত্রিশত্বের অবস্থায়! স্বপনের সতিই সময়ে সময়ে ইচ্ছে হয় যদি চাং থাকত আজ। আর ইগাবোলা। তাইগে নিশ্চয় ওদের সখকটা চের সহজ নির্দেশ হয়ে উঠে, তখন, না? অথচ আনকে একা পাঠবার মুখ্য এমন একটা মারকাতও ছিল যে—

আনার পরিচর্যা করতেও তার এত ভালো লাগে!...সে-সময়ে মনে হয় আনাকে একলা পেয়ে ভালোই হ'য়েছে, তৃতীয় ব্যক্তির সাহিধ্যে কৃতী বাড়ত বই কমত না। আনাকে নিয়ে যখন তখন বেড়াতে নিয়ে যাওয়া; প্রাতঃসম্রকতে পাশাপাশি ছুটি মাথা ছাটার নীচে রেখে বেরে রৌদ্রে মেলে দিয়ে বিশ্রান্তালাপ; কোনো ঐক্য স্থান আনার দেখার ইচ্ছে হ'তে না হ'তে বাথাক্সরতর মতন—পূর্ণ করা—আরও কত কী ছোটোবড় রমা ফাইকরমাশাটা। কয়েক দিন আগের নীসের গোপালিক পরিষেও তার ভারি কাজে আসে এখন। সে খুব বিজ্ঞভাবে সাহায্য দিয়ে থাকে। নিয়ে যায় মটিকালোঁতে, মনাকোঁতে, বোলিয়ে-তে। কখনো বা সমুদ্রের মধ্যে পাশে জলা জেতে-তে নিয়ে যায় নাচ দেখতে। কখনো বা সাধারণ খুব-তব্বা নিরাশ্রি দেহেরে বাস নাভলে। ইগাবোলার কলাপে ও-এক নতুন রসবোধের ইঙ্গিত বিকশিত হ'য়েছে যে তার দেহের গোমে নোমে। অর্ধ ইগাবোলার সঙ্গে যতটা নিশ্চয় ভাবে নাচে-পারত—আনার সঙ্গ্যে যেটা ক'রেও ততটা অশ্রুত হ'তে পারে কই?...এতটুকু

একজ্ঞে কোনো সন্ধ্যায় আনার চোখ তাকে অস্থূল
তিরস্কার করলে পরদিন তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় আবার
মটা করতে। যেমন স্বর্গদেব প্রথর হ'লে সামনের শীতল
নীলাবৃত্তে গিয়ে ডুব দিয়ে আসা—অন্ন সঁতার কেটে।
এতে আনা বড় খুশি। কখনো বা কয়েকটা খাতনামা
এদেশের কারখানার নিয়ে যাওয়া। দামী এদেশ কিনে
দেওয়া?—সে ত বলাই বেশি! তাতে আনার দ্রাণ করা?—
আহা সেইখানদেই না অর্থের অপব্যয়ের উল্লাস!...কখনো
বা ইরাকী থিয়েটারে গুকে শঙ্করা অভিনয় দেখানো—
রাশি রাশি বিজ্ঞ বাখ্যা সমেত। যতটা পারে বৈজ্ঞানিকের
আনন্দ তাকে দেওয়া। মাঝে মাঝে এসবে গভীর এত আনন্দে
কাটে!...

—কিন্তু তবু সে অস্থতির ভাবটা তো কই
কাটে না একেবারে? শান্তি তো আনন্দে না—বরং সময়ে
সময়ে আনার কৃতজ্ঞ চাহনি, বাহুর বা করতলের মুঠ চাপ,
হৃদযাত্রা, নীরব অব্যেগ, নিষ্ঠ হাসি—তাকে বেশ একটু ফেন
চক্কলই করে তোলে। আনার সে সুখা চট্টা ভাবটা
কেটে গেছে—কিন্তু তার পরবর্ত্তে যে ভী ও মেহুরতা তার
মুখে ঘরে ঘরে ফুটে উঠল তাতে তার মনের বৈশাঘ এক
নতুন চাক্ষুশের ডেউ তোলে যে! ভাবে জীবনে চক্কলতার
উপাধান কি অশেষ নাকি? ইসাবেলার সান্নিধ্যের হাত
থেকে নিষ্কৃতি পেতে না পেতে.....

হঠাৎ একদিন এক স্বপ্ন দেখে অঙ্কুত। সন্ধ্যা যেন
আকাশ-পাশে উড়ে এসে নামূল ঠিক তাবের হোটেলের
সামনের গেটে। সে যেন আনাকে নিয়ে বেরাঞ্জিল
পের্টাইনিয়ের একটা Problem-Play দেখতে। সন্ধ্যা
বধন বলল: “দরি ছেলে বাহোঁক তুমি। একটা পথে-
কুড়ানো মেয়ের গজ্ঞে এত? আর আমার অস্থতের বোনা
সব ছেড়ে দিয়েছিলে তোমার জোঠনুতো বনের উপর।
হৃদের সাধ ধুখে মোটাবার অধিকার—একচেটে বুঝি শুধু
পরকীয়ার?” সে কী একটা অজিহা করল। কিন্তু
সন্ধ্যা “ছি মিসি, কেন আর. প্রবোধের এ ব্যঙ্গ অভিনয়”
বলতে বলতে সর সর করে কঁদে ফেলল। স্বপন ব্যাখ্যল

হ'য়ে বাহু বিস্তার করতেই যুগ ভেঙে গেল। প্রত্নাধের চাপা
আলো এমন মান লাগে!...

সন্ধ্যার নব মূর্ত্তি!...

স্বপন বাইরের ব্যালকনিতে আরামকোরা টেনে বসে।
একটু শীতলীত করে—তবু আকাশের দিকে চেয়ে থাকে।
সেখানে ছেঁতে ছেঁতে মেঘ জড়ো হয়েছে এক ঝাঁক। পক্ষিমের
বিদ্যুৎ বৃষ্টির গুপার ঝাঁকডামাখা শিশিরবর্ষ এক দানব
জগদল পাথরের মতন চেপে ব'সে উদ্ভূতের উষালোকের বৃষ্টির
উপর। পূর্বদিকের আকাশে একটা মেঘের ফুঁকুর মধ্যে
আলোর ফুল্লিধ থেকে থেকে প্রাণপণে ঝিলিক মেয়ে
বেরুতে চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। আর সেই ব্যর্থতার
সারা আকাশ কঁদে মরছে।...

স্বপন নির্মিমেখনেই আলোর সঙ্গে মেঘের এই
বৈরতের দিকে চেয়ে থাকে!...মেঘনা দিন এক এক
সময়ে এত হৃন্দর! কিন্তু ভোর-বেলায় শবাতাগের সময়
বোধ হয় নয়। মনের সমস্ত বিদ্যাহীন করে অনাস্রাত পুষ্পের
মতন পরিষ্ক নিরলংগ বালাকল—আদাআলো আঘাঘার
মিলনলাগ—তারার মিটিমিটানি—অন্ধবিচ্ছল জুই বেল চামকী
করবার গন্ধ। সে সময়ে মেঘ? না! “সকালে জীবন চার
অভিনন্দন—প্রাণে—আলোর—সেটা না গেলে স্বপনের
বৃষ্টির মধ্যে, শুধু আজ ব'লে না বরাবরই, যেন কেমন করে
ওঠে!...মেঘালোকে ভরতি ছুবিনোপাত্তখাওঁ চেষ্টা।
কর্ত্তাশেষ প্রণবিনি জনে”—কালিদাস সময়ে সময়ে এমন
ভারাজাত্য করে তোলেম নাহয়কে! মনের বিমল ছবি তাঁর
রসের মূহুরে নিজের প্রতিবিম্বের প্রতিভাসে যেন আরো ফুটে
ওঠে—যেমন মর্দল্লের রূপন ঘরের আলো!...সবে একটু
করসা হয়েছে। স্বপন আবহা বিদ্যাজাত্য হ'য়ে কল
ধরে। এ সময়ে তার লিখতে বড় ভালো লাগে। শুধু
বিদ্যাকে প্রকাশ করার আনন্দে?—হবে। তার ওটপ্রাণে
মান হাসি ফুটে ওঠে। লেখে:

“সন্ধ্যার নব মূর্ত্তি

তোমাকে দশ-বার দিন আগে যে-চিঠি লিখেছি এ-মেলের
আগের মেলেই পেয়ে থাকবে। এ-মেলের আনারখবর দিই!

ব'লে আনার অস্থতের ও এখানকার জীবনের একটা
মোটামুটি বিবৃতি দিয়ে লিখল:

“আমার গুপার ডাক্তারের অবেশ শুনবে? আনাকে
প্রশ্নল রাখা। কিন্তু তার দরদণ আমার প্রাণশক্তি কতখানি
নিয়োগ করতে হচ্ছে হঠাৎ আজ সকালে অস্থতব করলাম।
কাল শেষ হাতে স্বপ্ন বেবেছি যেন তুমি এই নিয়ে আমাকে
ভারি খোঁটা দিচ্ছ—তারপর থেকেই মনটা কি জানি কেন—”
হঠাৎ ঘরের ঢোরে আঘাত। স্বপন চমকে উঠে বলে:

“কে?”

—“আমি মসিয়ে—একটা চিঠি!”.....

স্বপন চিঠি অসমাপ্ত রেখে পড়া শুরু করে:

“হগো আমার রজনী বোধন স্বপনার,

গত মেয়ে তোমাকে খুব এক চোট ঠেস দিয়ে চিঠি
লিখে অস্থতাপ হয়েছিল। মাঝের মেলে তার প্রায়শ্চিত্ত
করল ইচ্ছে ছিল—কিন্তু বাবার হঠাৎ সন্ধ্যা রোগের মতন
হঠাৎ পিঠালয়ে যেতে হ'য়েছিল—সেখানে সত্যিই নিঃশ্বাস
কেনারও অবশ্য ছিল না, বিশ্বাস করে।

কিন্তু তাতে ভালোই হ'ল একদিক দিয়ে। মাঝের
মেলে তোমার নীশ-পালানোর খবর পেলাম।
এ মেলে নবভার। বাবু এতদিনের, সখী-গ্রন্থিকের
স্বতীপূর্ণ মিলছে এবার—থারাসারে। ফসল যখন ফলে
এদনিই ফলে, না? শুধু ছুটু সরস্বতীই নন—ললিতার
লোচাচাওগাওর আসেন দল বেঁধে। জীবন-দেবতার বৃত্তক
লাগানোর ভদ্রীও যেমন—বরদানের ভদ্রীও তেমনি রহস্তময়,
না? ইন্দ্রদেব মাতিকে যখন রোজে পুড়িয়ে থাকে করে
গিতে থাকেন তখন সাধা কি কেউ সন্দেহ করে সামনে
‘ধুমজ্যোতিঃসালিলমকতাঃ সন্নিপাত্তে’ হৃদাসমুদ্র ভেঙে পড়বার
অপেক্ষার আছে। সম্প্রতি এই ধরনের একটা আইডিয়া
এলো—‘শিশা’:

নলে যে বঁধু কল্লুর নিরহরনে
নখী উল্লাসে যনে—
গুঠে যে হাবি মুখিয়া মুহুরনে
ভাকে হুয়াসে যনে—

প্রোমে নুপুর শিঠিয়া ফিলসনে

রক্তে হুয়াসে কুমা—
দানে সে রতি বক্তিয়া বরধনে
গানে মিলয়ে শিশা।*

“সত্যি না? দর্শনে বরিতই যদি না রাখতে পারল—
তবে পূর্বঘের সৌন্দর্য হইল কোথায় বলা বেশি? সেণু রাধার
হাতে বলা নি—বেজেছিল রক্তেরই হাতে। বশীরা থেকে
হৃদের দিশাটুকু মার পাঠিয়েই ত্রাণহৃন্দনের দায়বৃদ্ধি।
বেদনা-পাণার লজ্জন করে তাতে সাড়া দেবার ভার—
কাঁটাপূর্ণ তুচ্ছ করে ছোটোর ভার তার নয়।

“মনে কোরো না আমি ছুঁব করছি। মোটেই না।
বিরহ?—তাতে আমি ক্ষুব্ধ নই—বাখা পেলেও না। কেননা
দয়িত-দয়িতার মধ্যে নিঃস্ব য-বিরহের ব্যবধান, যে-
নৈশ্বাসের সমুদ্র—তাতে চেটে ওঠে হেই না-পাণওয়ার খসিত
পবনে। এছাড়া আরও একভাবে বিরহকে দেখা যায় মনে
হয়: ও যেন এক নিবাত নিষ্কণ প্রত্যাশার অবস্থা। এতটাই
আবেগের চাপ-বৈষম্যের সৃষ্টি। একজনর মন নিঃসর্গীর
হয়—আর একজনর মনের মলম ছোটে সে সূক্ততা পূর্ণ
করতে। এরই নাম তো বিরহের পরে মিলন। সম্প্রতি
হরিদাস বাবাজীর কীর্তন শুনলাম। শ্রীরাধার বিরহোদ্যোগের
পাশ। কী হৃন্দরই গান!...শুনতে শুনতে আনন্দ কোবলই
এই ধরনের নানা কথা মনে হচ্ছে। একটা ভাব ভিড়
ক'রে এলো রাধাভাগ্নের ছবি কল্পনা করে। শুনবে?

গান চায়ে...পায় রিক রিক ধায়
শিখি যে সে—তার
রঙ্গ-রাসে:

রাধা পায়...নীড়ে... গমনে—গহারে
নিতি নাহি ফিরে
মুহন গমনে।

গান চায়ে দল ব্যাখি-বায়তা
ওঁলি মেমনতা
ভক্তিত-দাখা—

বর-বস্ত্র যোনে উৎসব
গানি নিতি নব
বদন মাল: ৩

* শার্দি ল কলিওটি হুদ-লমুগুত উভায়ণ

রাখা এক-স্বর শেষের নুসর-

নুতা বিদুর

নিজা বিদা

জুরি' আপনায়— উরধ-আসার

বাচে বাহবার

গাভরী নিজা।

জান পার ঘন নব নব ঘন

বিবয়ে—নিমন

বর-বহরী:

রাখা দ্বিতী তপে নিয়ালে—নীরব—

তার বৃক কবে

স্বরাংশবরী?

ইতি তোমার ধূসারমানা সন্ধ্যারাগি।

নব সূক্ষ্ম...!

সন্ধ্যার এ কী সূক্ষ্ম? ওর গত চিত্তির সঙ্গে এর তুলনা করলে কী তোখে ঠেকে সব-আগে? ওর এ-সংঘর্ষাক্ত রূপ এর আগে 'তো' সে কখনো দেখেনি? ওর গত চিত্তির সঙ্গে এ চিত্তির মিল কতটুকু? অথচ কোথাও এতটুকু অমুখোণ নেই, উপরোধ নেই, পঙ্কার নামগন্ধও না। তবু ওর দৃশ্য কী স্বচ্ছ হ'য়েই না ফুটে উঠেছে এ ছুটি কবিতা থেকে!...

তার হেলান কেদারায় ব'সে স্বপন তখনো সমুদ্রের দিকে চেয়ে। আকাশটা একটু পরিষ্কার হ'য়েছে। সূর্য্যের দেখা এখনো মেলে নি—তবে ঈশং উজ্জ্বল একটা দীপ্যমান চক্রাকৃতি অর্ধমণ্ডল—তার যেন ঠিক কেন্দ্রে মেঘের চাঁদোয়ার একটা জ্বলন্ত স্থল দিয়ে এক বলক রূপালি আভা!.....পিরামিডের আকৃতি। যেন বাধা পেয়ে একরাশ আলো আরও জোর ক'রে নিজে থেকে চলে গিয়েছে এক সঙ্কীর্ণ প্রণালীর মধ্য দিয়ে। যেন সমস্ত পৃথিবীতে একটা বার্ষিক বন্থ। ঐটুকু আলোর প্রণতি? এ পুঞ্জ মেঘের চাপে কী আশা ওদের? যেন শুধুমাত্র মেঘের কাছে—নিখার কাছে—আলোর, সত্যের পরাক্রম। ঐ চূর্ণশ্রুতির আঁশা ছিল যদি এক দমকা

হাওয়ায় এ মিথ্যার মেথকে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে উড়িয়ে দিতে পারেন কোনো সত্য-বিপ্লবী। 'সত্য' না পারলে? বৃষ্টি মিথ্যাকে স্বাকার ক'রে নেওয়াই ভালো। সে হঠাৎ স্বির ক'রে বসল যতদিন না আশেকার মতন অকপট পূর্ণ সত্যটুকু লিখতে পারবে ততদিন আর তাকে লিখবেই না কিন্তু তার পরেই আবার প্রবল ইচ্ছা হয় মোটর-বোটে স্বপন ইয়াবেল-সংঘর্ষ সত্যটুকু লিখে ফেলতে। কিন্তু আশ্চর্য—মনের হয় অসম্ভব। আশ্চর্য নয়?—যখন চাংকে বলতে পারল—আনাকে আনাব দিতে পারল? মনের মধ্যে কোথায় একটা তার গভীর তিরহরের সুর মেঘের মতন কালো হ'য়ে ওঠে। অকপটে সবকিছু বলতে-পারাই তার সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব—তার চরিত্রের। আর সেইটেই কিনা সে খোঁজতে ব'সেছে? —না। সোঁজা মিথ্যাপুত্র বা ভালো এর চেয়ে। নয়?—নিশ্চয় ভালো। সমগ্রণ ভাবে মিথ্যা বলা—মিথ্যার দায়িত্ব নিয়ে।

তাতে চরিত্রের মধ্যে গতির যোতা অন্ততঃ বজায় থাকে। সত্যের যোতা যায় এক দিকে—মিথ্যার অজ দিকে। কিন্তু ছুটার মধ্যেই একটা যোতা আছে। তাই মিথ্যার মোড় কখনো কখনো মুহূর্তে বিপ্লবের মতন সত্যের দিকে ফেরানো যায়। কিন্তু অর্ধদগতা যে নিশ্চেষ্ট—পশু। ওকে গতি দেয় সাধ্য কার? ঠিক! এ আশ্চর্যপ্রসারণা আর না। সন্ধ্যাকে আর সে চিত্তিই দেবে না। তার বাবাকে বা লিখবে তা-থেকেই ও তার খবর পাবে। যতদিন না—যতদিন না কী? কথাটার খেই হারিয়ে যায়।—তবু সে মনস্থির করে। অনৈশিকতার দোশার হাত থেকে মুক্তি পায়। বাগেশক মনটা তার একটু স্থব্ব হ'য়ে ওঠে তবু!...

হঠাৎ এক পশুতা ব্যুটি শুরু হয়। সমুদ্রের বক পাটল হ'য়ে ওঠে। সে রশ্মি-পিরামিড কখন ডুবে গেছে। কেবল একটা চাপা আলোর সভা রান মূখে পরামর্শ করছে মেঘসমূহ তলায়—কী ক'রে তাদের দ্রুতগতি ফিরে পায় ঐ নির্জিত আকাশে।

তার মনটা আরও রান হ'য়ে আসে। আলোরগতি জগৎ কী রান! আর সন্ধ্যাকে সে তার চিত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবে? কিছুই লিখবে না? দূর। হয় কখনো!—

কিন্তু লেখবেই বা কোন মুখে? কত গোপন করবে তার কাছে? তার চেয়ে নিষ্ঠুরের মতন চুপ ক'রে যাওয়াই কি শ্রেয় নয়?—

না, আঙকের চিটিটা অন্ততঃ শেষ করবে সে। রফা হ'ল। এর পর আর না। সে ফেরে শুরু করল। এবার আনার সখকে ছুটারটে খবর দিল। কয়েকটা সত্য খবরও দিয়ে ফেলল। লেখার কোঁকে কুঠা কেটে যায় খানিকটা (এ যে তার কতবার হ'য়েছে!) আনাকে তার ভালো লাগছে—ছজনের মধ্যে আড়ষ্টভাবে একটা পাতলা পরদা—আনার সন্ধ্যা-সখকে তীব্র ঐংহুকা—তাকে এয়ারোপ্লেনে উড়ে আসতে লেখার জ্ঞা পীড়াপিড়ি—অসম্বন্ধ ভাবে এসব লিখে গেল প্রায় পাঁচ পাতা। পরে লিখল: 'তোমার রাধাঙ্গন-ভকসাদীর পালাগান সত্যই ভালো লাগল। একটা উত্তর গুজল ক'রে উঠল মনোহর—'না বনমাঝে গেয়ে সেই ধাপর যুগে কৃষ্ণ রাধার 'মানভদ্র' ক'রেছিলেন, সন্দেহ? শোনো তবে:

কেন এত মান? তোমার কোটি দান
পাগরতে ভাল
পারে কি রাখে?

শিখিনী বিহনে স্বর্গ-ধরনে
শিখী কবে ভবে
রথ—সাধে!
তোমার এক স্বর হোমের নুসর
জুনি' যে বিদুর
হ'ল ধর্মী!
আশ্রয়নিবিতলে লো অচকলে!
তোমার চেয়ে জলে
মুহুর্তমণি।
তোমার মাগা জাপি হ'ল দৌরভী
ছিলা লো—গরবী—
নিষ্ঠাধর:
তোমার মধুচিমা-দীপ্ত-মতিমা-
ঘ্যানে মর-সীমা
আসিত তরে।
দিকে দিকে ধাই—... ব্যাধি সহাই
চাঁহেলা—স্বরাই
দীপন-গীতি:
জুগু—তার মিড 'পদম-পহারী...
রঙে হোয়ই নীড়
মিলুতে নিতি।

ইতি তোমার বর্ণপ্রেমী সন্ধ্যা স্বপন-মণি।

—ক্রমশঃ



ভাবলোকে মৌটারলিঙ্গ

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

৫

‘এন্ড্রোভেন ও সেন্সিভেস’ প্রকাশিত হওয়ার চার বৎসর পরে ১৯০০ সালে ‘৩য় বিয়াটিস’ নামক যে নাটকখানি প্রকাশিত হয় তাহার সহিত পূর্বেকার নাটকের কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। পূর্ববর্তী নাটকে মৃত্যু-বিকীরিকাই ছিল একমাত্র বিষয়; পরে তাহার মধ্যে আমরা প্রেমের অভিনব শক্তির আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়াছি। প্রেম যে মৃত্যুর মত ভীষণ শক্তিকেও উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারে মেটারলিঙ্গ সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এ পঞ্চম একমাত্র মৃত্যুর নিকট জিজ্ঞাসার মত অসহায় আত্মসমর্পণের কথা ছাড়া কোনও অতীন্দ্রিয় শক্তির নিকট সাহায্যের আশ্বাসবিবরণের কথা কোথাও উত্থাপন করেন নাই। এই নাটকেই বোধকরি সর্বপ্রথম মেটারলিঙ্গ বিয়াটিসের মুখ দিয়া বলিলেন, ‘আমার অন্তরে আমি অসহজ করিতেছি মৃত্যু খুবই কোমল’ শুধু ইহাই নয়, বিয়াটিস চরিত্রটিই মেটারলিঙ্গের জগতে নূতন। মেটারলিঙ্গ খৃষ্টধর্মবিশ্বাসী গোড়া পুঠান নহেন, বিশেষতঃ পুঠমাতার অস্তিত্ব এবং মহিমার উপর তাঁহার কোনও আস্থা নাই। অথচ ইহা সত্ত্বেও তিনি বিয়াটিসকে কাব্যলিঙ্গ সম্যাদিনী করিয়া তাহাকে পুঠমাতার প্রতি পরম ভক্তিমনা করিয়া স্তুতি করিয়াছেন, পুঠমাতার প্রতিমাকে জীবন্ত করিয়া নাটকে দেখাইয়াছেন এবং সঙ্গত নাটকে পুঠমাতারই নির্মাণা কর্তব্য করিয়াছেন। প্রথম এই যে মেটারলিঙ্গ এই ভাবের গজটিকে নাটকের ভিত্তি করিয়া কেন গ্রহণ করিলেন? বার্ক, বিখেল, সকলেই দেখাইয়াছেন যে মেটারলিঙ্গ এই নাটকের আখ্যান-গানের ভ্রম অন্তরে নিকট স্বীকৃতি, কিন্তু কেহই উপলোকে প্রসারিত নীমাংসা করেন নাই।

নাটকের আখ্যানংশটি ‘অতি সামান্ত। মঠবাসিনী বিয়াটিস, প্রিয় বেলিজেরে ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া, অন্তরের

আবেগ দমন করিতে না পারিয়া মঠ পরিত্যাগ করিল এবং সংসারপ্রবেশ প্রবেশ করিবার ভ্রম কামনা করিল। বাওয়ার বেলো পুঠমাতার নির্দোষ নিশ্চল প্রতিমার নিকট আপনার অন্তঃসম্প্রদায়ের ও অক্ষমতার বেদনাদি জানাইয়া বিলায় লইল। ইহার পর ২৫ বৎসর কাটিয়া গেল, কেহ জানিতেও পারিল না যে বিয়াটিস মঠভাগিনী হইয়াছে। শুধু সকলেই দেখিল পুঠমাতার মূর্তি অপসারিত হইয়াছে এবং বিয়াটিস পুঠমাতার বেশদ্বারা গ্রহণ করিয়াছে। প্রথম সকলেই বিয়াটিসকে পুঠমাতার বেশাধারিত্বী বনিয়া দেখা করিলেও পরে অলৌকিক শক্তির প্রভাবে তাহারা বুঝিতে পারিল যে বিয়াটিস দেবাহুগৃহীতা, তাহার কোনই অপরাধ নাই। আসল ব্যাপার কিন্তু এই: বিয়াটিসকে দেখিতে পুঠমাতারই মত ছিল। বিয়াটিস চমিয়া বাওয়ার পর হইতে পুঠমাতাই বিয়াটিসের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এদিকে ২৫ বৎসরে বিয়াটিসের জীবনে নিরাক্রম ত্রুটি নামিয়া আসিয়াছে। মঠ হইতে বাওয়ার ভিনমাগ পর্বে বেলিজের-পরিত্যক্তা বিয়াটিস বাউচারের পথে গা ঢালিয়া দিল, অবশেষে ভিনটি সন্তানের শেখটিকে সে পাগলের মত হত্যা করিয়া বলিল। এমনই চরম অধোগতির পথে বিয়াটিস চলিয়াছিল। জীবনের শেষ রাত্রির শোকাচ্ছন্ন অন্ধকারে বিয়াটিস মঠে পুঠমাতার পদতলে মৃত্যুব্রাত্য করিতে আসিয়া যখন বেথিতে পাইল মঠবাসিনীরা কেহই তাহাকে এতদূর অশ্রদ্ধা করে না বরং পরম শ্রদ্ধার অঞ্জলি দেয়, তখন সে উদ্ভ্রান্তের মত কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে নিজের নিদারুণ পতনের কাহিনী সমস্তই বলিল, কিন্তু কেহই তাহার কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না, কারণ তাহারা যে ২৫ বৎসর ধর্মত্যাগ দ্বারা পূর্ণ পবিত্র আত্মা রাখিয়াছে। মঠবাসিনীদের বর্ণনার মধ্য দিয়া বিয়াটিস পুঠমাতার অপার কল্পনার আভাস পাইল,

১৩৩২

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

উত্তরা
৪৭৩

ব্যাপার যেন কতকটা বৃষ্টিতে পারিল, কিন্তু এত দূরায় যেন সে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। তাই সে তাহার ব্যাধার্দীর্ণ দীন দ্বয়দ্বারা নত করিয়া দিয়া পুঠমাতার চরণমূল-সেবায় প্রাণ প্রদান করিল।
অনেকের নিকটই এই নাটকখানির বিষয়বস্তু ভাল লাগে নাই। সহস্র বাউচারেও যে বিয়াটিস পুঠমাতার কল্পনায় এবং সহস্রাতার পরমপুণ্যদ্বারা বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত হইয়া গেল ইহা কাহারও ভাল লাগে নাই। ইহাতে নাকি জীবনের নৈতিক মূল্য অস্বীকার করা হইয়াছে। বিয়াটিসের মঠ পরিত্যাগের পর পুঠমাতার উক্তির মধ্য দিয়া নাটককার বিয়াটিস-চরিত্রের সমস্তা সমাধান করিয়াছেন। আমরা সেই উক্তিটি লইয়া এই নাটকখানির বক্তব্য বুঝিবার চেষ্টা করিব। দ্বিতীয় অন্তরে প্রথমেই পুঠমাতার মুখে এই সঙ্গীত শুনিতে পাই:

I hold to every sin
To every soul that weeps.
My hands with pardon filled
Out of the stony deeds.
There is no sin that lives
If love have vigil kept;
There is no soul that dies
If love but once have wept.
And though in many paths
Of earth love lose its way,
Its tears shall find me out
And shall not go astray.

‘প্রত্যেকটি পাপকে আমি গ্রহণ করি, যে আত্মা অশ্রুপাত করে থাকে আমি গ্রহণ করি। তারকার্পণ গভীরতার রূপি রূপি অমায়িক হৃদয় ভরা হইয়াছে। যেখানে ভালবাসা আঘাতে সেখানে কোনও পাপই বাড়াই ধ্বংসিত করে না। যেখানে ভালবাসা একবার অশ্রুপাত করিয়াছে সেখানে কোনও আত্মাই মরিতে পারে না। পৃথিবীর মন পথে ভালবাসা পথ হারাইতে পারে হঠাৎ, কিন্তু তাহার অক্ষ আমাকে পুঞ্জি পাইবেই, সে কখনও পথভ্রান্ত হইয়া থাকিবে না।’

মেটারলিঙ্গ যে এই নাটকের মধ্যে পুণ্ডর্য কোন সম্প্রদায়-বিশেষের বিশ্বাসকে প্রচার করিবার চেষ্টা করেন নাই এই কথাটি আমাদের মনে রাখিতে হইবে। মেটারলিঙ্গ পুঠমাতার চরিত্রটিকে প্রতীক হিসাবে ধরিয়া লইয়া মানবাত্মার

স্বভবে তাঁহার নিতম্ব মতব্যপটিকেই ব্যক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বিয়াটিস চরিত্রের সমালোচনা করার পূর্বে আমাদেরকে মেটারলিঙ্গের প্রচারিত কয়েকটি কথা স্মরণ করিতে হইবে। মানবাত্মার অহর্মিহিত নিত্য সৌন্দর্য এবং পরিভ্রমণের কথা, বচিষ্ঠীবনের সংস্রব দুর্বলতা এবং পাপ-সংস্বেদ, সত্যজীবনের দিক দিয়া তাহার চিরপরিভ্রমণের কথা ‘দীনের সম্পদে’ কি ভাবে প্রচারিত হইয়াছে তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু শুদ্ধ মাত্র এই কথাটি বিয়াটিস চরিত্রের মূল কথা নয়। কোন চরিত্র কেবলই যুগ্ম পাপ-পঙ্কজের অহুতর হইয়াছে। বিয়াটিস চরিত্রের মূল কথা তাহাকে রক্ষা করিয়া মাহুয়ের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র বলিয়া প্রচার করিয়া চলিয়াছেন এমন কথা নাটককার লিখিলেই তাহা আমাদের চিত্তে সত্য হইয়া উঠিতে পারে না। মানব-চরিত্রের নৈতিক বিচারে তখন চরিত্র কখনই প্রশংসা পাইতে পারে না। দৈববাণীর দ্বারা পরিভ্রমণ যোবনা করিলেই মাহুয় শুদ্ধমাত্র সেই দৈববাণীর অহুতরো সমস্ত পাপকে চোক বজ্রিয়া অস্বীকার করিতে পারিবে না। এই প্রশ্ন যদি কেহ নাটকে ঠিক এই ভাবে কিছু দেখাইতে চেষ্টা করেন তবে সে চেষ্টা বার্থেই হইবে। পরিভ্রমণ ভাবায় তাহা যতকণ নাট্যকার দেখাইতে না পারিবে, ততকণ ‘পাপটা কিছু নয়’ বলিলেই সে ব্যাঘাত হইবে না। ২৫ বৎসর ধরিয়া বিয়াটিস চূড়ান্ত বাউচার করিল অথচ পুঠমাতা তাহাকে কমা করিয়া তাহাকেই মঠবাসিনীগণের শ্রদ্ধার আসনে বসাইলেন ইহা কেমন করিয়া মাহুয় সমর্থন করিবে? মেটারলিঙ্গ কি বলিতে চান?

মেটারলিঙ্গ বাহা বলিতে চান তাহা পুঠমাতার উক্তির মধ্যেই রহিয়াছে। পুঠমাতার নিকট বিয়াটিসের বিচার, জাগতিক বিচার নহে ইহা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। সংসারের নিয়ম আছে, সে নিয়মভঙ্গের শাস্তিও আছে। বিয়াটিস সে শাস্তি গ্রহণ করিয়াছে, তাহার আভাস নাটকে রহিয়াছে। মানব-সংসারে বিয়াটিস পতিভা বিয়াস নিরতিশয় ব্রতদণ্ড ও অপমান সহ্য করিয়াছিল। কিন্তু যখন দীর্ঘ প্রাণখানি লইয়া বিয়াটিস শাশ্বতী মাতৃকার চরণোপাঙ্গে

উপস্থিত হইয়াছে তখনও কি সংসারের বিচারই সমাদৃত হইবে? বিয়াটসের আশার অক্ষয় বেনার কি কোনই মূল্য নাই? যে আত্মশক্তি আমাদের জ্ঞান জীবনের অধিজিহ্মী সেবতা তাহার নিকটও কি আমাদের দুর্ভাগ্যতা স্রষ্টা ও ক্রুটি চরম অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইবে? মেটারলিঙ্গ ইঙ্গিত করিতে চান কখনই নহে। স্রষ্টা কখনই কঠোর হও পণ্ডিত হইতে পারে না। বিয়াটস মাৎসের ভালবাসা চাহিয়াছিল, কিন্তু না পাইয়া সে উদ্ভ্রান্ত হইয়া মোহের পথে পা বাড়াইয়া দিল। কিন্তু সে মোহের পথে মোহটাই তার চরম সত্য ছিল না। অন্তরে তাহার অসহায়তার নিশানগুলি জন্ম ছিল, সে জন্মই মাহু শোনে নাই। বিয়াটসের মধ্যে গোড়াতেই অন্তরের সত্যপ্রিয়তা দেখিতে পাই; মানবীয় ভালবাসার আকর্ষণকে সে প্রতিরোধ করিতে পারিতোহে না, সে জ্ঞান তাহার কাতরতাত্ত্বী আনন্দের চিত্তকে কলুষার্জ করিয়া তোলে। জীবনের পরম দেবতা ধৃষ্টমাতার মুখে তাই বড় বৃন্দব কন্মার বাণী শুনিতে পাইশাম। এই কন্মার আমাদের নিকট আত্মত্যাগিক মনে হয় না। বিয়াটসের সূক্ষ্ম অত্মত্যাগ ও মনোবৃত্তিক দৃষ্টদর্শন দিকে চাহিয়া, তাহার সুরল স্বীকারোক্তি সন্মুখে পাড়ইয়া মাহু কখনও বিয়াটসকে পাপী বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে না। তাই অসুতাপরিতত্ত্ব বিয়াটস কিরিয়া আসিয়া। যখন তাহার নটের পরিত্যক্ত বেশভূষার দিকে চাহিল তখন কদাৰ্থ ২৫ বৎসরের মোহাঙ্ক জীবন বেন কোথায় নিত্য কৃপিকের খয়ের মতই মিলাইয়া গেল; নিত্যশুদ্ধ জীবনের জাগৃত আলোকে তাই সে বলিয়া উঠিল:

'But is not this the mantle that I left
Yesterday.....five-and-twenty years ago?'

‘এ বেন আমার সেই গোপাল যা আমি গতকাল...২৫ বৎসর পূর্বে ছেড়ে গিয়েছিলাম?’ এই ‘গুটি কথার মধ্য দিয়া মেটারলিঙ্গ তাহার এই বিশ্লেষণকেই প্রচার করিতে চাহিয়াছেন যে মানবাত্মার গভীরতম সত্তাকে পাপ কখনও মলিন করিতে পারে না, কণিকের জ্ঞান ছায়ায়ান করিতে পারে মাত্র।

মেটারলিঙ্গ মানবাত্মার নিত্যশুদ্ধ স্বরূপের কথা প্রচার

করিতে চাহিয়াছেন সত্য কিন্তু বিয়াটস চরিত্রের দ্বারা তাহাকে খুব সাধারণ করিয়া দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বিয়াটস যখন মঠ পরিত্যাগ করিয়া বাইতেছিল তখন সে আশ্রমবর্ষ ছাড়িয়া কোনও পাপের পথে বাইতেছিল না; সে বেলিজোরের সহিত দ্বন্দ্বমগ্নত বিবাহহুত্রে আবদ্ধ হইবার আশায় দিয়াছিল। কিন্তু তাহার হ্রিন মাস পরেই যখন বিয়াটস-পরিত্যক্তা হইল, তখন বিয়াটসের পক্ষে যথেষ্ট ব্যতিক্রমের পথে নামিয়া পড়া একেবারেই স্বাভাবিক হয় নাই বলিয়া আমাদের মনে হয়। বেলিজোর-পরিত্যক্তা হইয়া বরং তখনই বিয়াটসের কিরিয়া আসা স্বাভাবিক ছিল। বরং শেষ জীবনের তীব্র অসুতাপ বিয়াটসকে শুদ্ধ করিয়া দিয়াছে সন্দেহ নাই, তবু বিয়াটসের এই শোচনীয় অসুতাপ অত্যন্ত আকর্ষণিক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। চতুঃমুখ ২৫ বৎসরের কোনও চিত্রই মেটারলিঙ্গ বেন নাই; শুধু শেষ বিয়াটসের যুগে আমরা তাহার চরণের কাহিনী শুনিতে পাই। বিয়াটসের মুক্তিকে উজ্জ্বল করিয়া দেখান যে নাটকের উদ্দেশ্য সেই নাটকে তাহার মোহাঙ্ক জীবনের মধ্যে মুক্তির জন্মটিকে দেখানও শিল্পের দিক দিয়া স্বাভাবিক ও সমস্ত ছিল। তাহা না করা হইত নাটকখানির অর্থহীন হইয়াছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস। মহাপাপী ও অন্তরে চিত্তবদ্ধ এই গুটি নাটকের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু নাট্যকার যদি মহাপাপের মধ্যেও পাপীর অন্তর্ভুক্তগতের দৃষ্ট উল্লেখিত করিয়া অন্তরের শুদ্ধতা সার্থক করিয়া না দেখাইতে পারেন তাহা হইলে সেই নাটকখানি কখনও সত্য হইতে পারে না। ভদ্রী বিয়াটস নাটকখানি এই জুই মেটারলিঙ্গের সৌন্দর্য্য মনোদা রক্ষা করিতে পারে নাই বলিয়া সমালোচকগণে বিবাস। বিশেষতঃ ইহার মধ্যে মেটারলিঙ্গীয় নাটকের আবহাওয়াটি (Atmosphere) তেমন করিয়া অঙ্কন করা যায় না। যে বহুভাষ্যভূতি মেটারলিঙ্গীয় নাটকের বিশেষত্ব তাহা এখনো নাই বলিলেই হয়।

১৩০১ সালে ‘আদিমী’ ও ‘নীলপাড়ি’ নাটকখানির মধ্যে কিন্তু আমরা আমরা মেটারলিঙ্গকে ঊর্ধ্বার ভাবভঙ্গতের আবহাওয়ার মধ্যে কিরিয়া আসিতে দেখি। আমরা বেন

তিনি ঊর্ধ্বার প্রথম যুগের অঙ্ককার নিশীথদ্বন্দ্বের মধ্যে অল্পই রহন্তের অঙ্গদ্বন্দ্বের বাহির হইয়াছেন মনে হয়। এই নাটকখানির মধ্যে আমরা মানবাত্মার অসহায়তা, জীতি এবং বিবাহের সম্বন্ধ পাই। বলিতে গেলে এখানিককে এই সময়কার লেখাই বলা যায় না; ভাবজীবনের বিকাশের পথে ইহাকে আমরা ‘তিথাজিগেনে মৃত্যু’র ত্রিক পরভত্তী বলিয়া ধরিতে পারি। মেটারলিঙ্গ বেন এই জুই ভদ্রী বিয়াটস এবং এই নাটকখানিকে প্রকৃত নাটক বলিয়াই স্বীকার করিতে চাহেন নাই। তিনি বলেন ‘These two little plays are really librettos’ অর্থাৎ গীতিনাট্যকার ভূমিকাভ্রমণ তিনি এই দুখানি লিখিয়াছিলেন। মেটারলিঙ্গ বাহাই বলুন, সমালোচকগণ এই দুখানিকে libretto বলিয়া উল্লেখ করিতে পারেন নাই; আর বাস্তবিক তাহার কোন কারণও নাই। এই লেখা দুখানির মধ্যে দিয়াও মেটারলিঙ্গ কিছু সৃষ্টি করিয়া প্রকাশ পাইয়াছেন।

‘আদিমী’ ও ‘নীলপাড়ি’ নাটকখানির অপর নাম দেওয়া হইয়াছে ‘বার্ধক্য’। এই নামের মাত্র দ্বিগুণ নাটকখানির ভাবটী ফুটিয়া উঠিয়াছে। নৃশংস নীলপাড়ি একে একে পাচটি নারীকে আনিয়া তাহার চর্যতলের অঙ্ককার গুণায় বিন্দী করিয়া রাখিয়াছে। তাহার কারণ ইহা হইয়া থাকেই তাহার ‘আদে’ উপলক্ষে ‘সোনার স্ত্রী’র দ্বারা উল্লেখিত করিয়াছে। বর্ধ নারী আদিমী লোকের নিবেদকে অগ্রাহ্য করিয়া নীলপাড়ির চরণে গুপ্তিত হইয়াছে। জনসাধারণের সাহায্যতা সে নীলপাড়িকে জয় করিতে চায় না, সে চায় আপনার অন্তরের শক্তি ও সৌন্দর্য্য দিয়া তাহাকে জয় করিতে। নীলপাড়ির দেওয়া ছদ্ম চর্যতল ও একটি নৌনার চালি ইহা সে বহু চর্যতলগুলি খুলিতে উজ্জ্বল হইল। সোনার স্ত্রী খোলা নিষিদ্ধ বলিয়া আদিমী বিশেষভাবে তাহাই খুলিতে বাধ্য হইয়া পড়িল। সপ্তম চর্যতল খুলিতেই নীলপাড়ি আসিয়া তাহাকেও অপরাধী বলিয়া বিন্দী করিতে উজ্জ্বল হইল। আদিমীর চীৎকারে, বাহিরের লোকেরা তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিলে আদিমীর নিকরিয় কণ্ঠে তাহারিগকে বলিল, ‘আমার উপর কোন অত্যাচার হয় নাই, তোমরা যাও।’ আদিমীর

নিজের মুক্তির জ্ঞান আসে নাই, সে পক্ষ বিন্দীকে মুক্তি দিতে আসিয়াছে। তাই নীলপাড়ি জুড় হইয়া যখন আদিমীকে দেখে, সেস্টেট, মেলিগাওয়া, ইয়েন, বেশাভিয়ার এবং আশাদীন এই পক্ষ বিন্দীর গুণায় রাখিয়া তখন সে আনন্দিত হইয়া বলিল:

‘Meanwhile with all that
his love refused
Has granted: we shall find what
here is hid!’

‘যা হোক, তাহার ভালবাসা বাহা অস্বীকার করিয়াছিল, তাহার ক্রোধ তাহাই বিল: এখানে কি আছে তাহা আমরা দেখি।’ বিন্দীর চিত্তের দৌর্ভাগ্য ও অসহায়তার দিকে চাহিয়া আদিমীর চিত্তে মনের বেহাগিরা উঠিয়াছে; সে বলিতেছে:

Behold me like a mother here
Feeling in darkness, and my children.....
.....they
Await the dawn to clear.

গুণায় গোপন পথ দিয়া যখন আদিমী বাহিরে আসিয়া পাড়াইল তখন আলোকময় বিশ্বের সঙ্গীতে আসিয়া বিন্দীর চিত্তকে আনন্দ-বিহ্বল করিয়া তুলিল। কিন্তু আদিমীর ছাড়া আর কারও চিত্তে ত্রুণ ছাড়িয়া রাখার সাহস নাই। ইহাদের প্রত্যেকেই অন্তরের মধ্যে শক্তিময় হইয়া আছে। আদিমীর তাহাদের অন্তরের সৌন্দর্য্যকে জাগাইয়া তুলিয়া তাহাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস উদ্ভূত করিয়া তুলিবার সত্য চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুই হইল না। অবশেষে আত্ম নীলপাড়িকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে যখন চালাই তাহাকে চরণে লইয়া ‘আগিল, আদিমীর চালাদের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিল। নীলপাড়িকেও মুক্তি দিয়া সে যখন চলিয়া যাওয়ার পথে পক্ষ বিন্দীকে—আরান

* পক্ষ বিন্দী সত্যে এখানে একটি বজ্রা আছে। মেটারলিঙ্গ নাম ‘জিহ্মা’ পান নাই বলিয়া যে পূর্নচিহ্ন নাটক কখনো হইতে এই কণ্ঠ নাটক সংগ্রহ করিয়াছেন এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। পূর্নচিহ্ন নাটকে এই কণ্ঠ চরিত্রের মধ্যে মৌলিক এক অসহায়তা ও অল্পই হস্তের সন্মুখ শক্তিমতীর ভাব ফুটিয়া তুলিয়াছেন। এই কণ্ঠ চরিত্র নীলপাড়ির চরণে নিরাশ্রয় আমরা আশ্রয় করা মরবে, আদিমীর মত শক্তিময়ী আসিয়া ইহারিগকে আরাণ হইলেও ইহা মুক্তির পথে প্রাণত্যাগ করিতে পারবে না, নাট্যকার এই কথাটি কিসে অতি সূক্ষ্মভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন।

করিল তখন তাহার। কেহই যাইতে সাহস পাইল না।
অস্তরের শক্তিবোধের অভাবে ইহার মুক্তিকে গ্রহণ করিতে
পারিল না। এই ভুলই ইহার নাম বার্থমুক্তি। আদিয়ানী
মেটারলিঙ্কের শক্তিময়ী নারী, সে আপনার অস্তরের শক্তিকে
আবিষ্কার করিয়াছে। আদিয়ানীর মাতৃ রিরা মেটারলিঙ্ক
এই কথাটি বলিতে চাহিতেছেন যে অস্তরের সৌন্দর্য্যই
শক্তি, ইহাকে আবিষ্কার করিতে পারিলে নীলশাড়ির সাধ্য
নাই যে সে কোন অত্যাচার করে। বন্দিদের দিকে চাহিয়া
এই ভুলই আদিয়ানী বলিতেছে :

"In truth I do not wonder any more,
He never loved you as he should have loved,
Or that he coveted a hundred yet
Possessed no woman.
.....Fear nothing ! And to-night let us be beautiful."

আদিয়ানী এই কথাটিই বুঝাইতে চাহিয়াছে যে মুক্তি
বাহিরের সহায়তার উপর নির্ভর করে না। অস্তরের
সৌন্দর্য্যবোধেই প্রকৃত শক্তি ও মুক্তি নিহিত রহিয়াছে—
বাহিরের শত চেঁচায়ও কেহ কাহাকে এ মুক্তি দিতে
পারে না।

কেহ কেহ বলেন এই নাটকখানি স্ত্রী-স্বাধীনতা
আন্দোলনের উপর মেটারলিঙ্কের টপ্পনী। তিনি নাকি
বলিতে চান যে স্ত্রীজাতি বন্দিই ইহা আছে বটে, কিন্তু
অত্যাচারী পুরুষের হস্ত হইতে তাহাকে মুক্তি দিলেও তাহার

দামস্বাভ্যন্ত প্রাণ অত্যাচারীকে বন্ধন করিতে পারিলে না।
আমার মনে হয় 'বার্থমুক্তি' নাটকখানির মধ্যে মেটারলিঙ্ক
মানবাত্মার মুক্তির সত্য কারণটিকেই দেখাইবার চেষ্টা
করিয়াছেন। স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলন একদিক দিয়া
আংশিক মুক্তির আন্দোলন বলিয়াই তাহার আভাস এই
নাটকের মধ্যে সমালোচকেরা আবিষ্কার করিয়াছেন। তবে
বর্তমান যুগের শিক্ষিতা নারী-সমাজেরও প্রকৃত অবস্থা যে
বাস্তবিক শোচনীয়, নারী-সমাজ যে তাহাদের বন্দিই অবস্থা
স্বন্ধে অচেতন হইয়া দিনান্তিপাত করিতেছে, মেটারলিঙ্ক
তাঁহার ভায় রহস্ত প্রবন্ধে আর বোাপস্ভাসের নারী-চরিত্র
সমালোচনায়ই তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন* এবং ওই
উক্তিটির উপর নির্ভর করিয়াই সমালোচকগণ 'বার্থমুক্তি'কে
স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলন স্বন্ধে মেটারলিঙ্কের মত বলিয়া
মনে করিয়াছেন।

* Mystery of Justice Sec. 26. 27.

"And these women so fully conscious of themselves, whose
gaze can penetrate so deeply into the consciousness of others—
these women who forever are pondering the loftiest, grandest
problems of justice, of the morality of men and of nations—
never throw one questioning glance on their fate or for an
instant suspect the abominable injustice whereby they are the
victims.....are we so sure that they who come after us shall
not some day find in our present social condition, a spectacle no
less disconcerting?"

— 0 —

পত্রলেখা

দুই

১৭/১০/৩০

প্রীতিভাষ্য,

আপনার চিঠিখানি পাইয়া বড়ই আনন্দলাভ করিলাম। আপনি যে তীর্থসংস্থার এবং বিশেষ করিয়া এখানকার
জগন্নাথ-মন্দিরের সংস্থারের প্রভাব করিয়াছেন তাহাতে আমার একান্তই সমাহৃতি ও সমর্থন আছে। কিন্তু কাজটি
যে কত কঠিন তাহা অবশ্য বুঝিতেই পারিতেছেন। ইহার প্রকৃত প্রতিকার যুগেচৈতন্যশীল ব্রাহ্ম প্রতিষ্ঠা না হইলে সম্পূর্ণ
হইবার আশা নাই। কারণ ভ্রূষের বিষয় বশপ্রায়ে বাতীত এখনও পৃথিবীতে প্রায় কিছুই সিদ্ধ হয় না।^১ সমস্ত
তীর্থক্ষেত্রগুলি ঘিরিয়াই এমন প্রবল ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও স্বার্থভক্তের হস্ত হইয়াছে যে রাজকীয় শক্তি ত্রিশ তাহার
অপসারণ একরকম অসম্ভব। এ বিষয়ে দুই একটি দৃষ্টান্তেই বর্ণিত পারিবেন। মন্দিরের ভূতপূর্ব তত্ত্বাবধায়ক বার
বাহাদুর সর্দার মন্দিরের শৃংখলা ও পরিচ্ছন্নতা বিধানের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মন্দির-বাবসারী
উদ্বোধিত ততই বৃদ্ধ হইতে গিয়াছে। তাহার জীবনই বিশেষ নিরাপত্তা ছিল না বলিয়া শোনা যায়। তবু তিনি গভর্ণমেণ্ট-নিযুক্ত
উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন বলিয়াই বাহা কিছু করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষই অসহযোগিতা বোধ
করাতেই সম্ভবতঃ পরে ঐ পদটিই লুপ্ত হইয়াছে। তারকেশ্বরের ব্যাপার ত জানেনই, স্বয়ং চিত্তরঞ্জন চৌধুরী করিয়াও
বিশেষ সফল হইতে পারেন নাই। ভ্রূষের কথা কি আর বলিব, জগন্নাথ-মন্দির ত বহুকালের বিরাট ব্যাপার। এখন
যে নতুন মন্দির নির্মিত হইতেছে তাহাতেও কি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতার প্রতি তেমন দৃষ্টি দেওয়া হয়?—সেগুলির
আশোনাশেও এত আবর্জনারূপ জমিয়া থাকে যে পথে চালাইলে কষ্টকর হয়। সর্দারীতা এবং পূর্বকালের হ্রদয়
ভাবসমূহের অভাবও এইগুলিতেই অধিকতর। আসল কথা আমাদের জাতীয় জীবনেই এসকল বিষয়ে চৈতন্য বোধ
ভ্রান্ত হয় নাই বলিয়া সন্দেহই এই ভাব। মিউনিমিপ্যাটিও দেশের লোকের হাতে থাকা সত্ত্বেও তাহাতেও এই ভ্রান্ত।
উহাকে খাটাইয়া লইবার জন্য সর্গসাধারণের তাগিদও নাই। শিক্ষা এবং আধুনিক মনোভাবের বহুল প্রচারের দ্বারা
সকলের মধ্যে এই চৈতন্য-স্রোত জাগাইতে হইবে। আপনি আপনাকে প্রাচীনপন্থী বলিয়াছেন। কিন্তু শিক্ষা এবং
এই আধুনিক মনোভাবের জন্তই আপনিও ইহা দেখিতে পাইতেছেন ও বৈশ্ববোধ করিতেছেন। প্রাচীনকালে কি
পরিচ্ছন্নতার জ্ঞান ছিল না?—বলিতে পারেন।—জাতি যখন সজীব থাকে তখন নানাদিকেই তাহার চৈতন্য ও সজাগ
থাকে, স্তব্ধতা তখন অবস্থা সম্ভবতঃই একরূপ ছিল না। তবে তাহার প্রেরণা অস্বল্প ছিল। কিন্তু এখন আমাদের
মধ্যে এ সকল বোধ কি আধুনিক মনোভাবেরই ফল নয়? বাহা হউক, আমাদের মূল কথাতেই আসা যাক। সর্গ-
সাধারণের এসকল বিষয়ে দৃষ্টি এবং দাবী আসিলেও পাণ্ডাপুরোহিতদিগের সহিত যুদ্ধের একটি পাল্লা আসিবেই।
রাজশক্তির সাহায্য না পাইলে তখন গান্ধীজী প্রবর্তিত অসহযোগ বাতীত উপাস্তব্রহ্ম নাই। আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাপক
সভা হইতে এক-একটি আইনও করিয়া লইতে হইবে। যেমন পাণ্ডাপুরোহিতদের পরীক্ষা পাশ না করিয়া কাক
না পাওয়া (আপনি বাহা বলিয়াছেন) ইত্যাদি। বরোদারও ইহা কার্যে পরিণত হইয়াছে বলিয়াও শোনা যায়।
অর্থাৎ তীর্থ-মন্দিরাদি ক্রমেই সাধারণের সম্পত্তি করিয়া সাধারণের হস্তে ও তত্ত্বাবধানে আনিতে হইবে।

আর বাহা আপনি প্রসঙ্গক্রমে বলিরাছেন এইবার সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। আপনি মন খুলিয়া সব বসায় আমিও মন খুলিয়া বলিতে সাহসী হইয়াছি। আশাকরি কিছু মনে করিবেন না ও অপরাধ লাইবেন না। একটু কথা গুণের সহিতই জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে বাহারা আপনারের প্রাচীনপন্থী বলেন তাঁহাদের কাহারও কাছেই বৃথা, বিদেহ, বিরূপাবি বাস্তব আপনার মত সম্ভাব্য আমরা পাই নাই। আর আমাদের তাঁহাদের বোঝা কষ্টকর না হইলেও তাঁহারা আমাদের কিছুমাত্র বোঝেন নাই, বৃথিতে চেষ্টাও করেন নাই। প্রাচীনপন্থী বলিতে আপনি “দ্বুশ্চিন্তাপ্রবৃত্তি ও ভাবপন্থী” অর্থ করিয়াছেন। ইহা অনেক পরিমাণে সত্য হইয়াছে। কারণ আমাদের প্রাচীন বিরাট, এক গুণের সহিত অপর গুণের মিল অম্মই। তবে দ্বুশ্চিন্তাপ্রবৃত্তিরও বহু মত ও বাখ্যা আছে তাহা ভাবনেনই। তদ্বির প্রচলিত হিন্দুধর্ম সমাজে স্থানভেদে নানাবিধ লোকাতার ও তাহার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। সুতরাং এখনকার প্রাচীনপন্থী অর্থে প্রচলিত হিন্দুধর্ম সমাজগণ্যই বস্তুতঃ বোঝান হয়। এই উত্তরাধিকার ও প্রতিবেশের মধ্যে আমরা উভয়েই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু আধুনিক ভাব ও শিক্ষা আমাদের উভয়ের মধ্যেই আগায় কেহই আমরা বর্তমান অবস্থায় তৃপ্তি পাইতেছি না। তবে পারিবারিক ও ব্যক্তিগতভেদে উহার কম বেশী আমাদের স্পর্শ করিয়াছে এবং আমাদের মধ্যে পার্থক্যের হইতে পারিয়াছে। আপনার সংস্কারেচ্ছা ও আধুনিক মনোভাব প্রণোদিত ও বর্তমান অবস্থাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া উহাতে আমার শ্রাব আছে। কিন্তু যেখানে তাহা উহার মূলশিক্ষার বিরোধী সেইখানেই আমাদের অমিল। গান্ধীজী এবং বিবেকানন্দের (বা রামকৃষ্ণ সঙ্গপ্রায়ের) সহিত আপনার বেশী মিলিতে পারে। তাঁহারা উভয়েই প্রচলিত ধর্মসমাজ গ্রিক রাবিয়াই বহুব্র হইয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যেও অবশ্য মতভেদ আছে। তবে ঐ আদর্শই উভয়ের অনেকটা দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলিম এই তাঁহাদের মতেরও যে পদাঙ্ক ঐ আধুনিক মনোভাবের “অহুধারা” অর্থাৎ বর্তমান পদাঙ্ক মানবজ্ঞানের অবিরোধী—আমাদেরও তাহাতে সম্মত আছে। কিন্তু প্রচলিত যে সব মত গ্রহণের জন্যই তাঁহাদের লোকপ্রিয়তা, সেইখানেই প্রায় আমরা বাধ্য পাই।

আধুনিক মনোভাব বলিতে বাহা বুঝাইতে চাহিয়াছি কবির কথ্যভেই তাহা দেখিয়াছেন। সুতরাং বলা বাহুল্য উহাতে বৃদ্ধ কাগর ও মুক্তি বুঝাইতেছে। জীবনের সকল বিভাগেই সব মাহাত্ম্যকে বিকাশের ইচ্ছা পূরণ এবং চুখ-অচুখ বহুদূর হয় নিরাপত্তার চেষ্টা ইহার ধর্ম। সেইজন্য আপনার মূল সংস্কারেচ্ছার সহায়ত্বিত থাকিলেও কেবল তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে পারি না,—এইখানেই আমাদের ভিন্নতা। আপনি আমাদের প্রাচীনকে ধ্বংস না করিয়া তাহার উপরই নবীনকে গড়িয়া তুলিতে বলিয়াছেন। কিন্তু “প্রাচীন” বলিতে কি বোঝায় তাহা লইয়াই যে মতভেদ হইতে পারে অগ্রেই তাহার আলস্য দিয়াছি। পরবর্তী প্রাচীনপন্থী প্রাচীনের মধ্যেই যদি আমরা তৃপ্তি ও গ্রহণীয় বস্তু বেশী পাই, তাহা হইলে কিছু আমাদের অপরাধ দিতে পারেন না। প্রাচীনকে ধ্বংস আমরা করিতে চাই না,—তাগ করা অসম্ভবও। আমাদেরও রক্ত মাংসের মধ্যেই ত. তাহা রহিয়াছে। মানবের দ্বিত্বজ্ঞে,—তাহার জ্ঞান, কর্ম, ভাবসম্পদে প্রাচীনের বাহা কিছু স্নাতন অর্থাৎ নবীনের ভিত্তি আমরাও তাহার উপরই গড়িতে চাই। আপত্তিকর প্রধা-সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছেন তাহা হইতেই আমাদের মতভেদ। আপনি বাহাকে “নিভাত্ত আপত্তিকর প্রধা”—তাহারও ২৪টিকে হয়ত আমরা তাই মনে করি। আর কতকগুলি নিভাত্ত আপত্তিকর না হইলেও কিছু আপত্তিকর মনে হয়;—আর আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন তাহাতে মিটে না। আরও কয়েকটি সম্বন্ধে আদর্শ একভাবে ভাব হইলেও তাহাতে স্নায়-নিয়ন্ত্রণের অভাব, মাহাত্ম্যের স্বাভাবিক প্রকৃতি ও স্বাধীনতাকে অধীকার এবং সর্বাধিকার জ্ঞান পরিবর্তন প্রয়োজন মনে করি। এদিকে আবার আপনিও যেগুলি নিভাত্ত আপত্তিকর মনে করেন অনেকে হয়ত সেগুলিকেও তাহা মনে করেন না। সকলে মিলিয়া একসঙ্গে চিন্তা করিলে ত সম্বন্ধেরই বিদ্য হইত। তাহার অভাবে চুপে আমাদেরই বেশী জানিবেন।

কারণ আপনার সংস্কার-প্রচেষ্টার আমরাও অগ্রসর থাকিলেও আমাদের প্রয়োজনে আপনারদের রূপা পাই না। আপনারদের মহদুঃখেরও আমরা অন্ধ নই। আর নূতনের নামে যে সব বাজে ও খেলাে জিনিষ আসিয়া থাকে, তাহা রোধ করিতেও আমাদের পাড়াহুইতে হয়। তাই ছই দিকের মারই যখন আমাদের পাইতে হয়, তখন মনে হয় আপনারা আমাদের প্রতি দয়া করিলে নূতনের মেকিগুলি ঠেকান ও আপনারদের ভাল জিনিষগুলি গ্রহণ আমাদের কতটাই সহজ হইত!—সকলের গতি কেহই রোধ করিতে পারে না, নূতন হুতরাং আসিবেই। কিন্তু সব ভাল জিনিষের জন্মই আয়াস আবস্তক—নূতনের ভাল জিনিষের স্থান প্রস্তুত না করিলে বাজে জিনিষগুলিই শুধু অবশ্যজীবীকরণে ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। তবে ছই পক্ষেই এই চুখভোগ বোধ হয় অনিবাধ্য। কারণ, মাহাত্ম্যের শক্তি, প্রকৃতি, প্রয়োজন বিভিন্ন,—সেইজন্য বিভিন্ন পন্থাই তাহার আবশ্যক। সুতরাং প্রকাশ ও হয়ত এই ভাবেই হইয়া থাকে। আমরা ছই ভাবে চেষ্টা করিতে থাকিলেও মানব-সভ্যতাকে আর একটু অগ্রসর বোধ হয় করিতে পারিব,—তেননি আমাদের দেশকেও।

শ্রীঅনিমিত্তা দেবী



চন্দন-সাবান

সভ্যতার আদিযুগ হইতে আজ পর্যন্ত চন্দন, সকল শুভ-কার্যের ও পবিত্রতার অঙ্গ। অতি পুরাতন হইলেও ইহা চিরনূতন। চন্দনের অবিকল গন্ধ ও রং আমাদের সাবানে প্রতিফলিত

—আমাদের সাবান—
ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়।

কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস

কলিকাতা।

“চন্দন লেখা ছারে ছারে
চন্দনমালা ছুলিতে বায়ে।”

আই, সি, এস-এর বো

গল্প

ঐমার্শিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আই, সি, এস-এর বো হওয়ার জন্ত মেয়েদের রীতিমত তপস্যা করিতে হয়। কিন্তু সব মেয়ে এ তপস্যার যোগ্য নয়। এ তপস্যা যে করে তার বখেট রূপ থাকা দরকার—নহিলে ফল লাভের সম্ভাবনা খুবই কম। কোন হুমকী মেয়েকে কলঙ্ক পড়িতে দেখিলে সকলের 'আগে একথা মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে মেয়েটি আই, সি, এস-এর বো হওয়ার জন্ত তপস্যা করিতেছে। নহিলে আর কলঙ্ক পড়া কেন? তপস্কাই বা কি কারণে? রাংসা দেশে বনের অভাব নাই।

গৌরী যে টিক আই, সি, এস-এর 'বো' হওয়ার জন্ত তপস্যা করিতেছিল একথা জোর করিয়া বলা যায় না। তবে বা বাপের আশার খবর তাহার জানা ছিল। তবিত্ত ভর্তাটির কথা ভাবিতে গিয়া যে সব চমক-বেগা ছেলে 'ক' করিয়া বিদ্যাত বুঝিয়া আসিয়া হাজার টাকার কাছাকাছি মানিয়ার চাকরী বাগাইয়া বসে, তেমনি একটি ছেলের কথাই সে ভাবিত।

সামান্যতার তার অস্থ ছিল না। পাছে কোন গোল বাধে এই ভবে কোন দিন সে কোন প্রেমিক ছেলেকে আসল দেখে নাই। তার চেয়ে রূপে শুণে নিষ্ঠুর মেয়েরা বখন নিশ্চিন্ত মনে (কারণ তার আই, সি, এস-এর আশা রাখিত না) ভালবাসার খেলা খেলিত তখন মায়ে মায়ে মন চলিয়া উঠিলেও তবিত্তের কথা ভাবিয়া সে আত্মসম্বরণ করিত। ভাবিত, ওরা সাধারণ মেয়ে, ঘেরের কথা আলাদা। এখন একটু ক্ষুধি 'ক'র না নিলে জীবনে হয়ত আর ক্ষুধি করার সমাই পাবে না।

ভাবিয়া গৌরী প্রাণপণে তপস্যা করিত।

সে তপস্যা সহজ নয়। পড়াশোনার ভাল হওয়া চাই, অথচ রাত জাগিয়া পড়িলে রূপ নষ্ট হয়। আর শুধু কি পড়াশোনা? গান-বাজনা 'শিখিবে কি কম সময় আর পরিশ্রম লাগে? ভাতের উট্টিয়া রাত দশটা অবধি শুধু

শেখো আর শেখো। তারপর এক গ্রাস দুধ খাইয়া মুখে ক্রীম মাখিয়া শোও, আর এই ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাও যে আর কতদিন?

মায়ে মায়ে,—মায়ে একদিন কি ছুইদিন কি বড়জোর তিনদিন—গৌরীর সহসা কিছুকালের জন্ত বৈরাগ্যা আসিত। তার মনে হইত এতখানি মূল্য দিয়া বাহা সে পাইবে তাহা মূল্যবান তো? বাবার যতদিন মোটার ছিল না ততদিন মনে হইত নিজেদের একটা কার থাকিলে বোধ হয় হুয়ের অস্ত থাকে না। কিন্তু নিজেদের গাড়ী বখন হইল এমন কি স্থখটা তাহার হইয়াছিল? কয়েক দিনের মধ্যে মোটার না থাকার অবস্থাটি এমন পরিপূর্ণভাবে অভিজ্ঞ হইয়া গিয়াছিল যে মোটার থাকার অবস্থাতিকে কোন মূল্যই প্রায় দেওয়া সম্ভব হয় নাই। কামা তবিত্তটাও যদি এমনি ভাবে তাহাকে ঠিকায়?

তার চেয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় আশাকে 'অবতার' রকম পুট না করিয়া জীবনের যে সহজ আশা আকাঙ্ক্ষাগুলি মাহুগকে কখনো ঠিকায় না সেগুলির চর্চা করিলে ভাল হয় না? নিজেই গ্রাস করিয়া ফেলিতে পারে নিজের মধ্যে এমন কিছু স্থিতি করা কি বুদ্ধিমতীর লক্ষণ?

তারপর নকশাল সেনের তলায়ে বখন সত্য সত্যই সিদ্ধিলাভ হইল তখন আর গৌরীর আশাশেষ করিবার কিছু রহিল না। আ, এমন না হইলে জীবনী ভালবাসে গাঢ়লাসা, টাকাকে টাকা, সম্মানকে সম্মান, তত্ত্বগরি চরম অভিজ্ঞতা! ভাল বাওয়া, ভাল পরা, চমাকেরা কথাবার্তার সভ্যতা ও ভাবতা, বড় কথা ভাবা আর বড় কাজ করা, মনের অন্ধকার কোণগুলিকে আলোকিত রাখা, এ সমস্তের অন্তরিক্ত কিছু সে যেন পাইয়াছে, জীবন যেন কি কারণে হস্ত, মোলায়েম, আট্টিকি, একটা টাকা দান করিয়া গুণী হইতে না পারার মত একটা আশ্চর্য উদারতা যেন

নানা রূপে নানা রসে জীবনে সঞ্চারিত হইয়াছে। জন্ম উপবাসী নাই, মস্তক অবহেলিত নয়,—জীবনে এক অপরূপ সামঞ্জস্য সভব হইয়াছে। এর বেশী আর কি চাওয়া যায়?

মানে, হুখ আর 'ক'কে বলে?

জানিয়া বুঝিয়া হুখী হওয়াটা যে কি পরিমাণ বিশ্বয়কর গৌরী তাহা বোকে না। সে যে হুখী একথাটা সে জানিল কি করিয়া? হিসাব করিয়া নাকি? হুয়ের আবার হিসাব।

মাহুখ বখন সত্যই হুখে থাকে তখন তাহার হুয়ের চেতনা থাকে না। মানে, তখন তার নিজের অবস্থা-সম্বন্ধে মাথা ঘামাইবার সময়ের অভাব হয়। সে শুধু বাঁচে। জীবনটা অব্যবে আপন মনে বহিয়া যায়। কেন্দ্র করিয়া যায় সে খবর জীবিত থাকে না।

ক্রাব হইতে ফিরিয়া নন্দ বখন তাহাকে সন্ধ্যা আগ্রহে ভক্তভাবে চুপন করে গৌরীর তখন অত্যন্ত আনন্দ হয়। কিন্তু আনন্দ সে শুধু উপভোগ করে না, আনন্দ যে হইয়াছে এবং কি কারণে কি ভাবে হইয়াছে এ বিষয়েও সে সচেতন হইয়া ওঠে। অর্থাৎ একান্তভাবে বাহা তাহার জন্মের জিনিষ তার ধানিকটী তাহার মাথার চলিয়া যায়।

ইহার কারণ সম্ভবতঃ তাহার তপস্যা। মনটা অমনই হইয়া গিয়াছে। পানিশ-করা পাণ্ডনেত আনন্দলাভের অভাস যেমন এই তপস্যা হইতেই সে পাইয়াছে, তেমনি সহজভাবে সে—আনন্দকে গ্রহণ করিতে না-পারার অভাগাও এই তপস্যাতেই যোগাইয়াছে। আগান দান চুকাইয়া দিয়া এমন অস্বাভাবিক একটা অবস্থাই সে সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছে যে বাই সে পা'ক বাচাই করিয়া না দেখিয়া তার নেওয়ার ক্ষমতা নাই। ঠিকিবার আশঙ্কা তার এ-জীবনে ঘুরিবার নয়।

মানে, যেমন করিয়াই হোক নিজেই তার বোঝানো দরকার যে সে ঠিক করে না।

মনের মধ্যে এ স্ফু-কাসটা স্থিতি না হইলে গৌরীর জীবনে আর দশটি একেলে মাজিত-কুটি-সম্পদা বধুর জীবনের চেয়ে অভিরিক্ত কোন জটিলতা থাকিত কিনা সন্দেহ। ক্রাবকথার সাক্ষ্যতা ভিন্ন সকল অবস্থার সকল

শোচনীয় নয়। ও তুফা চাপিয়া রাখিও হুখী হওয়া যায়। অল্প অল্প স্টাটি-এর সাহায্যে গ্রহের সাধ যোগে মোটামোর মত ও তুফা একরকম দোঁটোনা যায় না এমনও নয়। কিন্তু জীবনটা তাহাকে কেন্দ্র করিয়া কি ভাবে ঘুরিতেছে সন্দেহ সন্দেহ নিজেও ঘুরিয়া তাহা আবিষ্কারের চেষ্টা করিতে গিয়া গৌরীর অন্তরালের মনটি খুঁটিয়া উঠিতে লাগিল। এবং এই শ্রেয়ী প্রাণেকের পক্ষে সেটা বড় ভয়ের কথা।

কারণ জীবনের প্রতি অভিরিক্ত বাধ্য বলিয়া ইহাদের মধ্যে একটা অপরূপ অবস্থাতা থাকে। একটা ঘূব ছোট উদাহরণ দিতে গেলে বলা যায়, বিবাহের আগে আর পাঁচটি সাধারণ মেয়ের দেখাদেখি তারও যে অস্ত্র, একটু প্রেম করার ব্যাকুল কামনা জাগিত সেটা এই স্বয়ংক্রিয় অবস্থাতা ভিন্ন 'জার কিছু নয়। মনে গোশমাশ না থাকিলে মেয়েরা ভালবাসার খেলা খেলিতে না পারার জন্ত মনে মনে কঁদিয়া ফেলিতে চায় না, হয় সত্য সত্যই ভালবাসে, না হয় স্নেহ ভালবাসে না, এবং জটিল অবস্থাতেই সমান হুখী থাকে। গৌরীর মধ্যে এই জটিল অঞ্চল প্রবল অবস্থাতা না থাকিলে চুট, বন্ধুদের নকল করার কথা মনে করিলেও তার 'হাসি আসিত,—মহা লাগিত; নির্লিপ্যচারিত্ত সে নিজেই বলিতে পারিত 'ঘূব বা'গে'ক আদি।'

এবং বলিয়া হয়ত সামান্য একটু প্রেম করিত। কারণ, প্রেম যে সে করে নাই সেটা জীবনের প্রতি অভিরিক্ত বাধ্যতাবশতঃ অব্যাবার ভিত্তরে অপরূপ অবস্থাতার জন্ত একথা তোর করিয়া বলা যায় না। হুয়ের এমন অনেক বিস্তার আছে বাহা আপনাকে আপনি প্রতিহত করে।

বিকালে একবার এ্যাডিশনাল জজের বাড়ী বাওয়ার দরকার ছিল। জজটি বাঙ্গালী এবং বৃদ্ধ, প্রাণমত রিটারার করার আগে একটু এ্যাডিশনাল জজগিরি করিয়া নিতেছেন। এবং সম্ভবতঃ আপানী নববর্ষে একটা উপলি লাভ করিবেন। লোকটি যেমন সেকেল, তেমনি রূপণ। পরিবারটি প্রকাণ্ড। নারীর জীবনে যতখানি রূপকতার প্রয়োজন তার অভাবটা

পাচ পাচটি মেয়ের পাঁচজনেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং ঐটি ছেলের বো গবে আসিয়াছে। মেজ বো আর তিন কল্লানহ বাড়ীর গৃহিণী গত ববিবার গৌরীর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। ঠিক দুপুর বেলা, মাহুথ বধন দরজা কানাল বন্ধ করিয়া ঘরের ভিতর আবছা অন্ধকারে বিশ্রাম করে।

সঙ্গে গিয়াছিল মেজ ছেলে। কোন বিপদ আগদ না হয়। কিন্তু তার সঙ্গে আসিবার আগল কাপটীয়া অম্মমান করিতে গৌরীর বিলম্ব হয় নাই। সন্ধ্যার করা ছাড়া ওর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল না।

সন্ধ্যার করার উপযুক্ত লোকই সে বটে, যেমন স্থল অস্বাভাব্য, তেমনি ক্ষুদ্র ব্যবহার, অস্বাভাবিক কথাবার্তা। কয়েক মিনিটের মধ্যে গৌরীর বৃত্তিতে বাঁকি থাকে নাই যে, বহিঃ ওর নাম অস্ত, বাড়ীও বন্ধ সকলে ওকে ভয় করিয়া চলে।

বুদ্ধিগত সে বিশেষভাবে বৌটিকে লক্ষ্য করিয়াছিল। অল্প সন্তান-সন্তানবীর স্বপ্নে লক্ষণ আর মুখে গৌরীর চেয়ে গানের রক্ত ফসি হওয়ার গর্ভ ছাড়া ছুপ বা আপশোষের ইতিবৃত্তই ওর আবিষ্কার করা যায় নাই। জীবনে সে যে ঐকিয়াছে তাহাকে দেখিয়া একথা মনে করা যায় না।

গৌরী আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল। মেয়েটার মধ্যে আপশোষের অজাব তাহার ভাল লাগে নাই। যে দিনম তাহার নিজের জীবনে থাকিয়াছে এ যেন তার ব্যতিক্রম। অস্ত বিশেষ কিছু আশা করা বা অস্বাভাবিক কোন দাবী থাকার উপযুক্ত মেয়ে ও নয়, তবুও সে গিয়াছে তাই নিরাপত্তা পাশা ওর উচিত হয় নাই। কাজের ছুতার নন্দলাল ইংরাজ আসিবার কয়েক মিনিট পরেই লাইব্রেরীতে পালাইয়াছিল বটে, কিন্তু তুলনা করিতে সেই সময়টুকুই যথেষ্ট। অস্তসময় বাই করুক, এমন একটা তুলনার পর বৌটি তার প্রতিমিত শাস্তিক বিনা আগ্রাসে আগ্রহ করিয়া রহিল কোন মুক্তিতে?

গৌরী নিজেই গাড়ী চালায়। প্রথম প্রথম মোকারকে সে সঙ্গে নিত, আজকাল ক্রিনার বিকৃতি পিছনের সিটে বসিয়া থাকে। এবং একচোখের তীব্রদৃষ্টিতে গৌরীর মাথা আর ঘাড় আর গালের দৃশ্যমান অংশটুকু চাহিয়া থাকে।

অস্তান্ত সম্মতি গৌরী এ বিষয়ে সচেন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এ চেতনার কোন মানে সে খুঁজিয়া পায় নাই। কয়েক মাস আগে তার উম্মারই বাকি পুড়াইতে গিয়া যে অস্বাভাবিক জানোয়ারের একটা চোখ কাশা হইয়াছে অস্ত চোখটি দিয়া সে একটু বিশেষভাবে তাহার শিখন দিকটা দেখিতেছে কি দেখিতেছে না একথা মনে উন্নত হইবারও সম্ভব কারণ নাই। একটু চোখের মূলা-বাধ ও একশ টাকা বখশিস পাইয়াছে। ওর চোখ সম্পর্কিত বাবুতীর ব্যাপারের সেইখানে কি ইতি নয়?

অস্ততঃ তাই হওয়া উচিত। জীবনের এই সমস্ত উচিত-অনুচিত ছোট ছোট বড় ছোট, বড়ের মধ্যে গৌরী এত কড়া যে বিকৃতির এক চোখের চাহনিকে তুলু করিয়া দিতে না পারিয়া এই তুলু ব্যাপারটিকে নিষাই সে আজকাল অনেক সময় ব্যাপৃত হইয়া থাকিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এবং এই নিষাই তার জীবনের সবটুকু গোলামাল, সবটুকু অসামঞ্জস্য। একটা চোখ বিকৃতির মুখে যেন খণপছাড়া, তার জীবনেও তেমনি। তার সাভানো-গোছানো মনে এই চোখটি বিশ্বখলা আনিয়াছে।

পথের মাঝখানে গৌরী পাঁচ, করিয়া গাড়ী থামাইয়া ফেলিল। মুখ ফিরাইয়া বলিল 'ছোট জজসাহেবের বাড়ী কোন্‌দিকে জানিস?'

'আজ্ঞে জানি'

'আজ্ঞে বলিস না। জি বলবি, না হয় হস্ত্রর বলবি।

গাড়ী চালাতে পারিস乎?

'পারি হস্ত্রর।'

'আর।'

স্থান-পরিবর্তনের পর গৌরী সহসা একটা অস্বস্ত প্রণ করিল।

'ক' বছর মান নিরস করিস তুই?'

বিকৃতি প্রতিবাদ করিয়া বলিল 'রোজ করি হস্ত্রর, আজ গাড়ী সাফ করছিলাম কিনা—'

'তুই একটা গাথা।'

একথা সে কেন বলিল? নীরবে নিজের গাধার স্বীকার করিয়া নিয়া বিকৃতি গাড়ী চালাতে আরম্ভ করিল বটে, কিন্তু

গৌরীর অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। বলিবার অধিকার আছে বলিয়াই যে যদি ওকে গাধা বলিত তবে ভাবনার কথা ছিল না, কারণ সেটা হইত স্বাভাবিক। কিন্তু বলা চলে এতজ সে কথাটা বলে নাই, লোকটার মুখভঙ্গা খোঁচা খোঁচা দাড়া দেখে অবশি ওকে জানোয়ার, গাধা, উল্লুক কিংবা এই ধরনের যা যাকে একটা স্বাভাবিক কথা বলিয়া অস্বাভাবিক ঠাট্টা করিবার ইচ্ছাই তাহার হইতেছিল। এবং এখন তাহার আপনমনে হাসিবার সাধ জাগিয়াছে। ওর একচোখের চাকলা লক্ষ্য করিতে করিতে ওকে গাধা বলার মত মজার ব্যাপার যেন আর নাই।

গৌরী গভীর হইয়া বসিয়া রহিল। সে বোকা নয়, সে জানে কৌতুক কথাতো মিথ্যা। যার মধ্যে স্রজা কিছুই নাই তাই নিরাপত্তা করিতে চাওয়ার কোন অর্থ হয় না।

কৌতুক যে নয় এটা সে আরও ভাল করিয়া বৃত্তিতে পারিত, যদি কোদারবানুর বাড়ীতে পা দিবার অল্পকালের মধ্যে পৃথিবীতে এত বোকো থাকা সত্ত্বেও সে যে বিকৃতির সঙ্গে অভয়ের তুলনা করিতে বলিল—এই আশ্চর্য মানসিক প্রক্রিয়াটির সঙ্গে বিকৃতিতে গাধা বলার সংযোগটি আবিষ্কার করিতে পারিত। জীবনের বহু আবাস্তর জ্ঞানসাধের মত এটা বিস্ময়কর জ্ঞানও এই উপলক্ষে আজ তার কন্মিয়া হাটতে পারিত, এ বাড়ীর মেঝে-বেড় সেদিন কেন যে নন্দলালের সঙ্গে স্বাধীর তুলনা করিয়া ক্ষুণ্ণ হয় নাই এটা আর বহুজ থাকিত না। বিশ্বাস না করুক, এ সন্দেহ গৌরীর হইতই যে মাধ্যম হিট না থাকিলে কোন স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে নিজের চেয়ে ভাগ্যবাতীর ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্যের তুলনা করিয়া গ্রহণ হয় না, এমন কি পাচ্ছে গ্রহণ হয় এই ভয়ে তুলনা করিতেই বিরত থাকে। তুলনা করে থাকের কপাল আরও মন্দ তারের পক্ষে। শুধু এই ধরনের তুলনাত্রেই যথ ও সাধনা হই পড়ে।

তার গায়ের রক্ত যে গৌরীর চেয়ে ঘনই। এটুকু মেঝে-বেড় সকল অবস্থাতেই লক্ষ্য করিয়ে, কিন্তু নন্দলাল আর অভয়ের পার্থক্যটুকু কখনো সে নিজের চোখে পড়িতে দিবে না;—যদি, নন্দলালের মনে পালকের ঝাঁড় কাটারও 'অক্ষমতা-সমৃদ্ধ' নিজের তার কোন সন্দেহ না থাকে। 'অন্ত ফসি' হওয়া সত্ত্বেও এই শ্রেণীর মেজ-বোদের ওরকম সন্দেহ বড় একটা থাকে না। কারণ, বহিঃ ওরা নিঃসংশয় বিশ্বাস করে যে আত্মীয় এবং স্ত্রীরদের ছাপ-মাগ পরিচিত কয়েকজন ভগ্নলোক ছাড়া পৃথিবীর আর সমস্ত পুরুষ হুয়াগে পাইলেই ওদের লুটীয়া হওয়ার ভয় ও পতিভ্যা আছে, তথাপি স্বামী ভিন্ন আর কোন পুরুষের মনে দাগ কাটিবার ক্ষমতা নিজেদের থাকিতে পারে—একথাটা ওরা স্বেচ্ছা-ভুলিয়া গিয়াছে। এবং এদের মজাগত কণ্ঠের সত্যিদের অস্তমত কারণও এই ভুলিয়া যাওয়া।

গৌরী বেশীক্ষণ বসিল না। মেঝে-বো-এর ছেলে-মাঝখা লজ্জা আর গর্ভ, মেজ-মেয়ের অবিরাম বহুনি, আর বড় মেয়ের মিল চাহনি তাহার ভাল লাগিতেছিল না। এক বাড়ীতে এতগুলি লোক যে জীবন-বীণার সঙ্গে মেজে মোটা তারটা উন্নীতও একভাবে বাজাইয়াও এমন ভাবে মতিভ্যা থাকিতে পারে সে যেন এ বাড়ীর প্রত্যেককেই অপহা। কলেবর-গাড়া ছোট ছোটো লুটীয়া যেন কেমন কেমন। স্মৃতি হইতে চাহিয়া তিন মিনিটের মধ্যে হাঁপাইয়া উঠিয়াছে।

গৌরী বিদায় নিল। বিকৃতি বাহিরের রোডকে বসিয়া বিড়ি টানিতে টানিতে প্রায় একশ' গজ ধূর এক হিন্দুস্থানী মেয়েকে এক চোখে ফোকাস করিতেছিল, তাড়াতাড়ি বিড়ি ফেলিয়া উঠিয়া গাড়ীর পিছনের দরজা খুলিয়া দিল।

গৌরী বলিল 'তুই উঠে বোস।' 'আবি চালাবা।' 'বিকৃতি বলিল 'জি।' 'তেল ভরা আছে?'

'জি।' 'গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া গৌরী বলিল 'ষ্টার্ট দে।' গাড়ীতে সেলফ-ষ্টার্টের ছিল। বিকৃতি বলিল 'ইন্সট্যান্ট ঠিক আছে হস্ত্রর।'

গৌরী ধমক দিয়া বলিল 'তুই ষ্টার্ট নেতো।' গৌরীর জুতার, গৌরীর পায়ে হাত বুলাইয়া বিকৃতি হাতল পুজিয়া নিয়া গেল। হাতল বুলাইবার সময় ওকে বহুদূর মত দেখাইবে। শালুকে কাঁচা চুলচুলি দুলব, বোতাম ছেঁড়া থাকি সাটটার ঠাক দিয়া সমস্ত বুটো খোলা

বাইরে। বৃক্ক অবস্থ লোমের কল্ল, কিন্তু যেমন চওড়া তেমনি মাংসপেশীতে ভরা। দেখিলে সর্বাঙ্গ শিহরিয়া ওঠে।

মনে হয়, গরিলা ভিন্ন ভটা মানুষ নয়।

গৌরীর ইচ্ছা হয়, একদিন জ্ঞাতশুদ্ধ প্রাণপথে ওই বৃক্কটাকে একটা মাঝি মাঝিরা দ্বারা কি দল ধাঁড়ায়।

কিন্তু কল কি ধাঁড়াবে সেটা অসম্ভব কল্পা শব্দ নয়।

হুই হাতে পাটিকে ধরিয়া বিকৃতি ঘরি তাকে বনেটের উপর আছাড় না মারে, গৌরীর কপাল নেহাৎ ভাল বলিয়াই মারিবে না।

ইন্ডিজের প্রাণ-সন্ধান হওয়া মাত্র গৌরী গিয়ার টেনিয়া ছিল। বিকৃতি লাফাইয়া সরিয়া গেল এবং লাফাইয়া পিছনে উঠিয়া পড়িল। গৌরী কিরিয়াও তাকাইল না। কিরিয়া না তাকানোর অভ্যাস তাহার হইয়া গিয়াছে।

গাড়ী সে থামাইল পাছবার টিপাস দিচ্চেন। কাঁচা মাটির ঘাটা ছাড়িয়া কোণে-ভরা মাঠে উঠিয়া ওলঙ্কের বত কাছে বাওয়া সত্ত্ব তত কাছে গিয়া।

বাগাটটা সহর হইতে প্রায় এগার বার মাইল দূরে।

টিলার উপরে একবা নাকি কোন এক রাজার বাড়ী ছিল, হুই ছাটীয়া থাম এখানেও ধাঁড়াইয়া আছে। সহরে ঘাঙ্গের মোটা আছে, তারা বছরে দুই একবার থামগুলি দেখিয়া যায়।

টিলার পশ্চিম দিকে প্রকাণ্ড ওলঙ্ক আরম্ভ হইয়াছে, পশ্চিম সাহেবের সঙ্গে শিকারে আসিয়া নন্দমালা এই জলজ হইতে একদিন একটা ভালুক মাঝিয়া নিয়া গিয়াছিল।

টিলার অল্প তিনদিনের গ্রাম আছে বটে কিন্তু এক মাইল বেড় মাইল এদিকে নয়। আঙ নিয়া তিনদিন গৌরী

বিকৃতিকে সঙ্গে করিয়া এখানে আসিয়াছে। প্রথম দিন

বন্দুক সঙ্গে আনিয়াছিল এবং ঘোড়ের বসিয়াই একটা ঘুঘু

আর একটা ভিত্তির মাঝিরা ঘুঘু হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর

সে আর বন্দুক আনে নাই। বন্দুক সঙ্গে থাকিলে ভয় করে

কম।

বসন্ত, ভয় করার জন্যই যখন এখানে আসা, বন্দুক

সঙ্গে আনা বোকামি ভিন্ন আর কিছু নয়।

প্রথমটা কিছু বোঝা যায় না। সহর ছাড়িয়া গৃহের ও

জনাকীর্ণ পথের নিরাপদ আস্রের ছাড়িয়া সে যে কতদূরে

আসিয়া পড়িয়াছে সেটা বুঝিতে সমর্থ লাগে। তাহাড়া

আকাশে থাকে রোদ, বনে থাকে পাখীর শব্দ এবং বিকৃতির

মুখ আর চোখের দৃষ্টি থাকে শান্ত ও নিরীহ চাকরেরই মত।

রোদের তেজ কমিয়া আসার সঙ্গে ভয় বাড়ে। প্রথমে

গা ছুঁ ছুঁ করে, শেষে বৃকের মতো চিল্প চিল্প করিতে আরম্ভ

হয়। এমন একটা অস্বস্ত উদ্ভেতনা হয় বলা যায় না।

শুধু বনের জঙ্ঘর ভয় নয়, নির্জনতার ভয় নয়। বিকৃতির

ভাটাই আর সমস্ত ভয়কে ছাপাইয়া ওঠে।

এখানে পৌছিয়াই বিকৃতি নীচে নামিয়া পড়ায়।

গৌরী বলে 'কোথাও যাসু না। আমার ভয় করবে।'

'না, হচ্ছুর।'

বলিয়া বিকৃতি অদূরে একটা পাথরে চুপচাপ বসিয়া

থাকে। তাহার একচোখের কুটিল সন্ধান দৃষ্টি বারবার

গৌরীর দিকে কিরিয়া আসে, পকেটে হাত ভরিয়া সে হাত

বাহির করিয়া আনে, 'কু'কিয়া পাথের নিকট হইতে একটুকু

তুকানো গাছের ডাল ছুড়িয়া নেয়, এবং অনবরত উন্মুগ্ন

করে।

ভয়ে গৌরীর হাত পা অবশ হইয়া আসে। সহর, সভ্যতা

কতদূরে পড়িয়া আছে, এই নির্জন নিস্তব্ধ বনপ্রান্তে যে

আর ওই অতিকার গোঁয়ার পুরুষটির মধ্যে ব্যবধান রহিয়াছে

শুধু পাতনো-ঐচ্ছ-ভূতের সম্পর্কেই। কি তাকান না।

একবার যদি মাছেরের সৃষ্টি করা এই জর্জর বাঘটির

বিকল্পে ভগবানের সৃষ্টি করা ওর ভিত্তিকার বস্তুতা কথিয়া

ওঠে ভালব ভালব আজ আর বাড়ী ফেরার কোন উপায়

থাকিবে না।

আজ আসিয়া পৌছিতেই বোলা পড়িয়া গিয়াছিল।

বিকৃতি বোধ হয় আজ সারাদিন ধরিয়া কোন একটা সহর

স্থির করিয়াছে, নিজের পাথরটিতে বসিয়া কয়েক মিনিট

গরেই সে হুগাহারীর মত পকেট হইতে বিড়িও দেশলাই

বাহির করিত। কিন্তু সহসা বিড়ি ধরাইতে পারিল না।

ইহুত্ত: করিতে লাগিল।

গৌরী বলিল 'বাতি তো বা বিড়ি।'

বিকৃতি বিড়ি ধরাইল, কিন্তু বিড়ি টানিবার অবস্থা তার

নয়। তার রক্তের উত্তাপ, তার শক্তির ঔজ্জ্বল্য তাকে

অঙ্গোদ্রাধ করিয়া তুলিয়াছে। এমন নির্জনে, আসন্ন সন্ধ্যায়

নিরুপার নারীর সামনে এমন পুতুলের মত বসিয়া থাকার

প্রকৃতি তাহার নয়। আর শুধু কি নারী? ওর দেহে যেমন

যৌবন আছে, কানে তেমনি হীরার ছল আছে, আঙ্গুলে

হীরার আঁটি আছে, গলার সোনার চেন-হার আছে, হাতে

সোনার চুড়ি আছে। বা হাতের কজির বাড়ীটাও নিশ্চয়

সোনার।

আর ওকে নিয়া সে বা ঘুরী করিতে পারে। যত ঘুরী

চোখ রাঙ্গাক, যত ঘুরী চোকে তার ভয় পাওয়া কিছু নাই,

ওকে কেহ রক্ষা করিতে আসিবে না।

যতক্ষণ রোদ রহিল গৌরীর কানের ছল চিকচিক

করিল, তার বিবর্ণ মুখে রঙের ছাপ লাগিয়া রহিল। ওই

ছল আর ওই গাল কোনটার লোভই বিকৃতির কম নয়।

এক চোখ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সে গাছের ছায়ায় দীর্ঘ সম্প্রদায়

চাইয়া দেখিল, ঘুরে ঘুরে দৃষ্টি বৃণাইয়া আনি। ভয়ে

তারও বৃক্ক কাঁপিতেছে। হঠাৎ কেহ আসিয়া পড়িবে শুধু

এই ভয় নয়, কাল হোক পরন্তু হোক দয়া পড়িলে কি হইবে

শুধু এই দুর্ভাবনা নয়, গৌরীর ভাটাই তাকে পাথরের গদে

আটকাইয়া রাখিয়াছে। উদ্ভিগ্না গিয়া একবার ওর মাথনের

মত নরম হাড়টি শব্দ করিয়া ধরিতে পারিলে বাকীটা সহজ

হইয়া যায়, কিন্তু শব্দ করিয়া হাত ধরিলে রক্ত পাথর

ছাড়িয়া হঠাই শব্দ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিকৃতি উঠিল।

কিরিয়ার আগে শুটোনা হুড়ের উপরে মাথা রাখিয়া

গৌরী দুই এক মিনিটের রক্ত চোখ বুজিয়াছিল। চোখ

মেলিয়া তার বৃকের ভিতরটা হিম হইয়া গেল।

'কি চান?'

'বাড়ী যাবেন না?'

'যাব। তুই বোসু গিয়ে ওখানে।'

'জি।'

বিকৃতি নীরবে পাথরটিতে কিরিয়া গেল। সন্ধ্যায়

অন্ধকার অতি দ্রুত নামিয়া আসিতেছে, আর খানিকপরে

গৌরীর মুখও দেখা যাইবে না, হীরার ছলও দেখা যাইবে না।

বিকৃতি আরও উন্মুগ্ন করিতে আরম্ভ করিল। তার আর

একটা বিড়ি ধরাইবার ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু গৌরীর

পূর্ণবস্ত্র অমুহুরিত কথা মনে করিয়াও বিড়ি সে ধরাইতে

পারিল না। আশু সাহসে হয় না।

এবং গৌরী আগাগোড়াই এটা জানিত। ভয় বতই

করক, ভয়ের সত্য-সত্যই কিছু নাই। বিকৃতি বৃক্কই

কেপিয়া উঠুক একটু ধনক দিলে কৃষ্ণের মত সে চিরদিন

তার বাসবার পাথরটিতে কিরিয়া যাইবে।

কিন্তু এটা জানা না জানার জন্ত কিছু আসিয়া যায় না।

আবার যদি বিকৃতিকে সঙ্গে নিয়া সে কোনদিন এখানে আসে

তার ভয় করিবে—পারক ভয় করিবে।



একেকটি সন্ধ্যা যায়

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একেকটি সন্ধ্যা যায়, জীবনের ভাঙা জানালার
একেকটি পাখী বৃজে আসে। স্পন্দমান অন্ধকারে
নাই সেই শব্দময় নিস্তব্ধতা; আকাশ নিরাভ; রাতিময় রোমান্টিক প্রতীকার বহিমান ভাষা
নিবে গেছে তারাদের চোখে; সূর্যমান কালচক্রে
শুনি না সে সজ্জার সানন্দ গুঞ্জন; নাই সেই
প্রাণ-সিদ্ধ-বিফার-বেদনা; মাত্ৰ প্রাণধারণের
সেই তিক্ত মধুরতা, লবাক্ত সে শাবিত বাদ
গেছে মরে; তেজস্বী উজ্জীন পক্ষে শুষ্ক হ'ল আজ
সেই বর্জ্যটাময় যাত্রার জোয়ার। আজ শুধু
রুদ্ধকন্ধ্যা মরুদী, ছই পারে বালির বিছানা,
বীক-চোরা ক'টি চাঁদ ভাঙা-ভাঙা জলের উপরে
মানরেখা, স্থিমিত, শীতল; শুধু কীর্ণ প্রেতজ্বালা
সে প্রথর বেগমন্ত্রতা, ধাবমান উল্লাসের
মুহূর্তস নিস্তেজ কন্ধ্যা; আজ শুধু তুপীভূত
প্রতাহের কণ্ঠস্রাব, রাশীকৃত বিমর্ষ বিশ্রাম
অনর্থক, দিনানুদৈনিক। নাই সেই বিরহের
অন্ধকার মহাকাশে সৃষ্টির উদাত্ত সমুজ্জ্বল;
আজ শুধু দ্বিগমপিনী শারীর শূন্যতা। "একদিন
যে অমর্ত্যলোকের আলোকে, পৃথিবীর মনে হ'ত
সুচির গোপলি, যেন স্পর্শাতীত, রহস্যধূসর,
সে আলো গিয়াছে অস্ত; সে আধ-উদ্ভীল চোখে
পড়িয়াছে নিষ্ঠুর আঘাত, নিলঞ্জ সে জাগরণ—
তাই াজ রূঢ় গজ, স্পষ্ট, স্থল, প্রত্যঙ্গ, বাস্তব,
সুকঠিন কুটিল সন্দেহ জিজ্ঞাসায় সূতীক লেখনী
সমাধান-সন্ধান-বাকুল; নাই সেই স্বপ্নাভাস,
সে বিশাল বিশ্বায়ের আদিম চেতনা; নাই সেই
গভীর মন্দির মিশ্রা, অপক্লপ, অনির্ধ্বজনীয়;
নাই আর ছন্দোময় পরম জীবন; লেখনীতে
নাই সেই উত্তেজিত কল্পনার মধুর গ্যাত।
কেন এই অপমৃত্যু? জানো না কি? জানো না কি তুমি?
প্রেম নাই। পৃথিবীতে প্রেম নাই। প্রেম গেছে চলে।



মন্দল শীল

বাঙালার বাহিরে এক বিরাট বৃহত্তর বাংলা গড়িয়া উঠিয়া
আজ সমগ্র বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ স্বপ্নের দিকে উজ্জল
দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। মাতৃভূমির কাছে বিদায় গ্রহণ
করিয়া ঝাঁপরা প্রবাসে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন,—
তাঁহাদের মধ্যে সদয়তা ও মনীষার বলে, ঝাঁপরা আজ
কীৰ্ত্তিমান—দ্বি-চরিত-কথা আলোচনা করিয়া তাঁহাদের
উদ্দেশ্যে সুরুজ্ঞ শ্রদ্ধা নিবেদন করা, শুধু প্রবাসী বাঙালীর
নয়, সমগ্র বাঙালী জাতিরই কর্তব্য। এমন কিরিয়াই দেশ,
উদার এবং জীন্তু মনের পরিচয় দেয়।

যুক্ত-প্রদেশের প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে এমনই একটি
উজ্জলতম রত্ন গত বৎসর মোক্ষদামে গমন করিয়াছেন।
তিনি পূর্ণাঙ্গাঙ্ক নন্দলাল শীল।

১৮৬৮ ঈশাব্দের কাছাকাছি কলিকাতার দক্ষিণে বড়িশা
গ্রাম হইতে বৈদ্যোক্তানার্থ শীল নামক এক যুগ কালী
আসিয়াছিলেন। সেকালে পশ্চিমে আসা কম সাহসের
কাজ ছিল না, অনেকগুলি বাতী একত্রিত হইলে নৌকাযোগে
আসিতে হইত। কালী হইতে বৈদ্যোক্তানার্থ কিছু
বানিজ্য-সম্ভার সংগ্রহ করিয়া নদীপথে আগ্রা যাত্রা
করিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন,
যোগপুত্র, পুষ্কর দেখিয়া দিল্লী, লঙ্কা, অববোহার পথে জাবার
কালী ফিরিয়া বাইবেন। কিন্তু যখন-বন্ধে বাইবার সময়ে
কলেশ্বর শিবের স্থান, কালপীর কাছে তাঁহার ও তাঁহার
সঙ্গীদের নৌকাগুলিতে ডাকাত পড়িল। দেখিতে দেখিতে
তাঁহারা একেবারে নিঃশেষ হইয়া পড়িলেন। স্ভাকতির পর
মাত্র ছয় আনা পরগা গুলন লইয়া বালি পারে ইটায় আগ্রা
গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেকালে আগ্রাতে গবর্নর
জেনারেলের অফিস ছিল। তখন এবেশ ইংরাজ-জানা
লোক চম্পা ছিল। তিনি শীলই একটি চাকরী বোগাড়
করিয়া লইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে পশ্চিমে দেবিবার
মত স্থানগুলি দেখিয়া দেশে ফিরিয়া বাইবেন। অর্ধ সংগ্রহ
করিয়া এক-একদিকে বেড়াইয়া আসিতে ১৮৭৫ সাল
আসিয়া পড়িল। তখন তিনি ছয়বাসের জ্ঞা একটি চাকরী
খোঁকার করিয়া ইটাওয়া আসিলেন। সেখানে নানা
কারণে ছয় মাস পরে দেশে বাওয়া হইল না। ১৮৭৭
সালে সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে ইটাওয়া হইতে বাঙ্গালীরা
সম্মানী সাজিয়া ছই বা তিন জন এক এক সঙ্গে তীর্থলমণ
করিতে যাত্রা করিলেন। ইংরাজ-অধিকার হইয়াছে ও
শান্তিস্থাপন হইয়াছে সংবাদ পাইয়া তিনি ১৮৭৮ সালের শেষে
ইটাওয়াতে ফিরিয়া আসিলেন। এক্ষণ বিদ্রোহের পর
শান্তিস্থাপন করিবার সময়ে নানাপ্রকার কঠোরতা করিতে
সরকার বাধ্য হন। সে সময়ে অপরাধীদের সহিত অনেক

নিরপরাধও নিশ্চিত হন। জৈলোক্যাবাসু এইরূপ নিরপরাধের নানা উপায়ে রক্ষা করতে নগরে তাঁহার সম্মান অত্যন্ত বেশী হইয়া গেল। তিনি সরকারী কলেজটাকার অফিসে দ্বিতীয় ক্লাসে নিযুক্ত হইলেন। ১৮৮২ সালে তিনি প্রয়াগের মুষ্টিগঞ্জবাসী ৩০বৎসরবয়সের বিদ্যায় কল্যাণ বিবাহ করেন। মাসিক্তে বেশী-বাবু পিতা ৬৩জনরায়ণ যোগ ১৭২২ কিঞ্চ ১৮০০ সালে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার বংশধররা মুষ্টিগঞ্জের যোগ বলিয়াই পরিচিত, বহিঃ বংশীর ভাগ এখন চাকরী উপলক্ষে নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন, তথাপি মুষ্টিগঞ্জে গুজনরায়ণ বাবু ১৮০০ সালে নিশ্চিত ভিত্তির কতক অংশ এখনও ভাল অবস্থায় আছে ও তাহাতে তাঁহার প্রপৌত্র প্রবীণ জেলাকোর্টের উকীল বীরেন্দ্রনাথ যোগ বি, এ, বি, এল, বাস করিতেছেন। জৈলোক্যাবাসু হীটগায়েতে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত ছিলেন, তাহার পর সরকারী চাকরী হইতে পেনশন লইয়া দক্ষিণ হায়দ্রাবাদে নিজাম রাজ্যে চাকরী স্বীকার করেন। তিনি যখন ১৮৮৭ সালে মার্চ মাসে পরগনার গমন করেন তখন তাঁহার পাঁচপুত্র, তিন বিবাহিত ও একটি অবিবাহিত কন্যা বর্তমান। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অন্তঃকাল শীল এলাহাবাদে এল, এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, দ্বিতীয় পুত্র নন্দলাল ১৮৮৬ সালে এগ্রেশন মাসে ইটাওয়া হিউমস হাই স্কুল হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া মাত্রা ও ভাই-ভাইদের লইয়া এলাহাবাদে মুষ্টিগঞ্জে আসিয়া বাস করিতেছিলেন ও মুইর সেন্ট্রাল কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণিতে পাঠ করিতেছিলেন। মার্চ ১৮৮৭ সালে জৈলোক্যাবাসুর স্বর্গবাস হইলে অন্তঃবাবু বিজ্ঞানদের উচ্চতম শিক্ষা পাইবার আশায় কলকাতা পাঠ করিতে লাগিলেন। নন্দাবু পাঠ পরিত্যাগ করিয়া সত্তর বৎসর বয়সে হায়দ্রাবাদে নিজাম-রাজ্যে ‘ফাইনান্সিয়াল সেক্রেটারী’ অফিসে যটটাকা বেতনের চাকরী পাইলেন। এ যট, হায়দ্রাবাদের টাকা, ইংরাজী-পকাশ টাকার সমান। এই সামান্য আয়ে হায়দ্রাবাদে নন্দাবু আশ্রয় বার্ষিক আশাধারাদে সংসারের ভার চালাইতে লাগিলেন। ১৮৯০ সালে অন্তঃবাবু এন্-এ পাশ করিয়া হায়দ্রাবাদে চাকরী পাইয়া গেলেন কিন্তু ১৮৯১-তে নিরাস হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন, তখন নন্দাবু, যট টাকা হইতে নব্বই টাকান্তে উন্নীত হইয়াছেন। অন্তঃবাবু এলাহাবাদে মুইর সেন্ট্রাল কলেজে ষষ্ঠ বার্ষিক

শ্রেণী পর্যন্ত কেন্দ্রীয় পড়াইবার চাকরী পাইলেন কিন্তু কিছু দিন পরেই এক ছুটিমাসে তাঁহার হীপানি রোগ হওয়ায় চাকরী ছাড়িতে বাধ্য হইলেন। নন্দাবু তখন হায়দ্রাবাদে চাকরীর অবসর সময়ে পার্শ্ব ও আরব্য ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিতেছেন। হিন্দু ও বাঙ্গালীদেহী হায়দ্রাবাদ-সমাজেও তিনি কেবল আপনাব গুণে ও প্রশ্রয়ে, রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। ও যে ‘ফাইনান্সিয়াল সেক্রেটারী’ অফিসে এপ্রিল ১৮৮৭-তে যট টাকা বেতনে নকলনবীশ রূপে চুকিয়াছিলেন সেই ‘ফাইনান্সিয়াল সেক্রেটারী’ অফিসে তেরো বৎসর বাবে ১৯০০ সালে ‘ফাইনান্সিয়াল সেক্রেটারী’র ফাইল ‘আসিট্যান্ট গভর্নমেন্ট টাকা বেতনে উন্নীতকৃত করিলেন। তখন ‘ফাইনান্সিয়াল সেক্রেটারী’ কেহ ছিলেন না অতএব গভর্নমেন্ট ‘ফাইনান্সিয়াল সেক্রেটারী’র দায়িত্বপূর্ণ কাল করিতে হইত।

কিছুকাল পরে তিনি পনরশত টাকা বেতনে পুরা ‘ফাইনান্সিয়াল সেক্রেটারী’ হইলেন ও নিজাম বাহাদুর নবাব মাহবুবালি খাঁ তাঁরকে সরকারী ভোখাখানার ভার দিলেন—তাঁহার জন্ত তিনি অতিরিক্ত স্বল্প তিনশ টাকা পাইতে লাগিলেন। ১৯১২ সালে নবাব মাহবুবালি খাঁ স্বর্গবাসী হইলে নবাব ওসমান আলী খাঁ রাজ্যভার করিলেন। তিনি যখন দিল্লীর রাজস্ব যন্ত্রে যোগদান করিতে যান, তখন নন্দাবু তাঁহার সহিত ‘ফাইনান্সিয়াল সেক্রেটারী’ ও সমস্ত ভোখাখানা বা ধনরত্নের রক্ষা রূপে গিয়াছিলেন। তাঁহার কিছুদিন পর নবাব ওসমান আলী খাঁ আপনাব প্রধান মন্ত্রী মাহরাজা কুম্ভগ্রাদকে সরাইয়া সকল কাজ নিজে দেখিতে লাগিলেন, সেই সময় নন্দাবুকে পেশদার দেওয়া হয়। তিনি পাঁচশত সত্তর টাকা পেশদার পাইতেন। তাঁহার পর তিনি প্রায়ই মাত্রাসে থাকিতে ভালবাসিতেন। সেখানে কিছু বাসনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র ও তিন কন্যা। বড় পুত্র কেশবচন্দ্র মাত্রাসের দোকান বেধেন, ছোট হেমচন্দ্র এখনও লন্ডনে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। তাঁহার দুই কন্যা বিবাহিত, বড় ভ্রাতার মেজর সমরেন্দ্রলাল নিজ আই, এম, এল, এখন

পটনাতে বেহারের ‘ভাইরেটর’ অফ ‘হেলথ’। দ্বিতীয় ভ্রাতার রমেন্দ্রনাথ বহু ম্যাকটোরে ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করিয়া গত বৎসর ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইংল্যাণ্ড যাইবার পূর্বে তিনি লন্ডনেই রেলের ইলেক্ট্রিক বিভাগে কাজ করিয়াছেন, এখন তাঁরকে ইনস্পেক্টরের কাজ দেওয়া হইয়াছে। নন্দাবু গত ১৯০১-২২য়ের ১১ই নভেম্বর মঙ্গলবার সূর্যোদয়ের পূর্বেই জ্বরগেয়ে মারা গিয়াছেন। তিনি এই রোগে বহুকাল হইতে জুগিতিছিলেন। তিনি গত কাছহারী মাসে অন্তঃবাবুর একমাত্র পুত্র অধ্যাপক নিম্ন-ভূপের বিবাহ উপলক্ষে মাত্রাস হইতে এলাহাবাদ আসিয়াছিলেন, তাঁহার পর অসুস্থতার জন্ত আর মাত্রাসে ফিরিয়া যাওয়া হয় নাই। নিম্নবাবু এখন হায়দ্রাবাদ গবর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে অধ্যাপক।

হায়দ্রাবাদে নন্দাবু যে সকল কাজ বা উন্নীতকরণ করিয়াছিলেন, তাহা মনে এইগুলি বড়।

১। হায়দ্রাবাদে পূর্বে অতি সামান্যই বজের মত একটা খাড়া করা হইত। C. E. Crawley নামক এক

ইংরাজ ‘ফাইনান্সিয়াল অ্যাডভাইসার’ নিযুক্ত করা হয়। তিনি ও নন্দাবু-মিলিয়া প্রথম রীতিমত বজের প্রস্তুত করেন। ২। Crawley-র সাগোবে হায়দ্রাবাদে হিঙ্গাব-সরকে বিধি-ব্যবস্থা করা হয়, ‘ক্যাফিউট’-এর নিয়মাবলী ‘সিবিই সিস্টেম’ রেশ-শেন’-এর মত নিয়ম উদ্ভূত প্রস্তুত বাবস্থা। ৩। ‘সিটি ট্যাক্স’ প্রচলন।

৪। হায়দ্রাবাদে প্রথম ৬% Promissory Note—Loan of ২০ Lacs। তাঁহার পূর্বে হায়দ্রাবাদ গবর্নমেন্টের অনেক দেনা হইয়া গিয়াছিল ও বাজারে ১২ শত-করার কম দাম পাওয়া অসম্ভব ছিল। কয়েক বৎসরের চেষ্টাতে সব দেনা শোধ হইয়া এত Credit হইল যে Premissary Note-র ৬% ও বেশী বোধ হইতে লাগিল।

৫। নন্দাবাদের চৌর্যে ইটনানী চিকিৎসা শিক্ষাদানের ও হাকিম পরীক্ষার ব্যবস্থা। এখন হায়দ্রাবাদের হকীমরা রীতিমত Anatomy, Botany, অঙ্গ করা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা পাইয়া থাকেন। সরকারী চৌর্যেতে নানা প্রকার গুণপ্রস্তুত করিয়া নগরনগরে ডিস্পেনসারীতে পাঠান হয়। প্রত্যেক বড় নগরে আশোপাণিক (Male Female



নন্দলাল শীল

Branch)-র পাশে 'মুনানী' চিকিৎসা হয়। সমস্ত রকমে বাধার পাতন ঐধ বিক্রয় করে তাহাদের দোকানের জন্ত লাইসেন্স লইতে হয়। সরকারী ইনস্পেক্টরের তাহাদের ঐধ পরীক্ষা করিয়া দেখেন, যাহাতে কেহ ধারাপ ঐধ বিক্রয় করিতে না পারে।

৬। শিক্ষাবিভাগের নানাপ্রকার উন্নতি প্রত্যেক জেলাতে হাইস্কুল-এখন গেইগুলি ইন্টার কলেজ হইয়াছে। হায়দ্রাবাদ সহরে পাড়ার পাড়ায় প্রাইমারী স্কুল, তাহাতে উর্দু ও একটি বেশী ভাষা মাগারী, গুজরাতি, তেলগু, কানারিস, হিন্দী, তামিল প্রভৃতি গড়ান হয়। ওমানিয়া ইউনিভার্সিটি অন্তঃ নন্দাবুর পেনশন লইবার পর আরম্ভ হইয়াছে কিং তাহার উত্তোগ আরম্ভ উনিই করিয়াছিলেন।

৭। হায়দ্রাবাদ সহরে 'সিটি ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট' আরম্ভ। এই সকল উন্নতির জন্ত এখনও দেশবাণীরা তাহাকে সম্মানের সহিত স্মরণ করিতেছে।

৮। হায়দ্রাবাদ পাবলিক লাইব্রেরীর বিস্তার।

৯। ঊর্ধ্বার চেণ্টারে Theosophical Society-র সন্মার সাইরো হরি নিম্ভাণ।

১০। অচ্চ, আত্মরায় স্তান, তাহাদের পাকিবার জন্ত পাকা বাড়ি ও খাইবার ব্যবস্থা।

১১। ১৯০৮ সালের Moosi River Flood-তে অনেক দোকান মারা যায় ও নগরের অনেক অংশ নষ্ট হইয়া যায়। সেই সময়ে জলে ডোবা 'অংশ' গার্ডনেট করিয়া Improvement Trust আরম্ভ করেন ও ভবিষ্যতে Flood বাহাতে না হয় সেজন্ত একটা বড় বাধ দিয়া এক tank প্রস্তুত করান। এই Tank বা ওমান সাগর জলপূর্ণ হইলে 50 Sq. miles aron হয়। বাধ করিতে প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। নন্দাবুর সময়ে আরম্ভ ও অবসর লইবার পর শেষ হইয়াছে।

১২। পঞ্জিকা সংস্কার—Leap Year প্রথা। আগে ৩২ দিন হইতে ২৯ দিন পঞ্চাঙ্গ মাস ছিল, সংস্কারের পর ৩০, ৩১, ৩২ দিন ও চার বৎসর অন্তর ৩৬৬ দিন

১৩। অরবী ও পার্সী ভাষার কয়েকটি বড় বড় বিদ্যান আরম্ভ ও ইরাণ হইতে অনায়াস ভাষা ভাষা নৃত্য দিয়া হায়দ্রাবাদে বাস করািবার ব্যবস্থা। ঊর্ধ্বার গৃহে বলিয়া, ইচ্ছক বিভাগীদের বিভাগান করেন।

১৪। Improvement of Coin, Regulation of Exchange rate, Currency Notes.

১৯০১ সালে অমৃতাবার দ্বী-বিবেগের পর আবার তিনি হায়দ্রাবাদ বাইতে বাধ্য হন। পরে কিছুকাল Principal Training School-এ ছিলেন। হায়দ্রাবাদের Dar-ul-uloomi আরবী বিজ্ঞার ভারতে প্রধানতম কলেজ, সেখানে আরবী শিক্ষাই বেশী বেওয়া হইত সেইজন্য সেখানকার graduates-রা ভাল মৌবীরা মোয়া হইলেও অচ্চ কোন অক্লিমে উন্নতি করিতে পারিত না। অমৃতাবকে এই কলেজে পঠান হইত। ইংরাজি as optional subject, কিছু ইতিহাস, ভূগোল, অচ্চ, পদার্থ-বিজ্ঞা, কেমিস্ট্রী ইত্যাদি প্রচলন করিলেন। ক্রমে এই কলেজেই ওমানিয়া ইউনিভার্সিটি কলেজের Theological Section হইয়াছে। নন্দাবুর আর এক ভ্রাতা মন্তিলাল হায়দ্রাবাদে Assistant accountant General ছিলেন। তিনি হায়দ্রাবাদেই দেহরক্ষা করিয়াছেন।

পূর্বনন্দাব মহম্মদ আলী শাহের সর্বস্ব একবার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কিছুকাল শিক্ষা-বিভাগে ধর্মশিক্ষা দেওয়া বাইতে পারে এই বিষয়ে বিবাহ হয়। তাহার নিষ্পত্তির জন্ত কয়েকটি মৌলভী ও কয়েকটি পণ্ডিতের এক সভা নিযুক্ত হরকিচ্ছ অনেক ধর্মজিগ্য ও তাহার উপযুক্ত সভাপতিত্ব পাওয়া যায় নাই। সভাপতিত্ব উত্তরে বরুণা কনিয়া বিহার ও নিষ্পত্তি করিতে হইবে। শেষে নন্দলালকে বিচারে সর্ম্পকগো পাগান্দী বলিয়া নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তখন ওমানকর মৌলভী-সমাজের যোগাধা ঘনিষ্ঠভাবে নন্দকে জানিতেন, ঊর্ধ্বার বিদ্যাধিগনে যে মুসলমান ধর্ম-সমাজে নন্দলালের বে জ্ঞান-আছে তাহা অনেক মৌলভীর নাই। নন্দলাল এই কাজে নিতান দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়াছিলেন ও ইহার জন্ত গর্ষ করিতেন। একজন বাঙ্গালী হিন্দুর গকে ইহা সবধয়ে বড় সম্মান।

ছুটি

—গল্প—

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

বেহালার দিক থেকে এসে মাঝের হাটের পোলের চড়াইটুকু উঠেই টিক পোলের নামানামি বন্ধককে হৃদয় সন্ধ্যা চেহারার মোটরটা দেখে গেল।

প্রশান্তবাবু ভেতরের গদিতে আরাম করে' হোশান দিয়ে বসে' সামনের সীটের পিঠে পা ছুটি তুলে নতুন চিনির কারখানার প্রসপেক্টস্টি পড়ছিলেন। 'মোটরের থামটা প্রথম তাঁর নজরেই পড়েনি। কিন্তু কিছুক্ষণ বসেও মোটরের চার কোন আঁচা না পেয়ে গাফজের পাতা থেকে মুখ তুলে একবার সামনে চাইলেন। 'আশ্চর্য, সামনের পর একবারে ঝাঁক! গাড়ি ঘোড়ার ভেঁড়ে মোটর থামতে হয়েছে মনে করে' অতক্ষণ তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন, এবার একটু বিরক্ত হয়ে ডাকলেন—'রতন!'

উদ্ভিগরা মোকার এঁরি মধ্যে মেয়ে গিয়ে ইঞ্জিনের ঢাকনি ঘুরে কি পরীক্ষা করছিল; প্রশান্তবাবু ডাকে পেশাম করে' এসে ভয়ে ভয়ে জানালে 'মোটরের ইঞ্জিন হঠাৎ থামা গিয়েছে, একটু দেরী হবে।

দেরী! প্রশান্তবাবু মনে মনে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বারোটার সময়ে আজ ডিক্টেটরদের মিটিং, তাঁর পরেই জা'খান একগাটির রায়ে ইটা'র ভিডি! দেরী হ'লে চলবে কেন!

কিন্তু হৃদয়ের শিক্ষা ও অভ্যাসের দরশ সে উদ্বেগ তাঁর মুখে প্রকাশ পেল না। শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—'কত দেরী হবে?'

উদ্ভিগরা মোকার গভরে জানালে—'মিনিট গোনেবো!'' 'মিনিট গোনেবো! প্রশান্ত বাবু মনে মনে হিসেব করে' দেখলেন, মিনিট গোনেবো দেরী হলে তেমন কিছু ক্ষতি নাও হ'তে পারে। বজাল কোম্পানীর মানোজার আঙো বাড়িতে এসে অপেক্ষা করে' দিয়ে যাবে বটে। কিন্তু তা

যাক! টাকা ধার করা ভারই গরজ। একদিনের জায়গার ছুদিন অপেক্ষা করলে সে হাতছাড়া হ'লে যাবে না।

জ্ঞান—'বেথো পোনেবো! মিনিটের বেশী দেরী না হয় মনে!'

প্রশান্তবাবু আবার মোটরের ভেতরেই উঠে বসতে থাকিলেন হঠাৎ কি ভেবে সে সমস্ত পরিত্যাগ করলেন। সামনে মাঝের হাটের কাটা খাল—বাতাবিক নদীর সৌন্দর্য্য বহুর সম্ভব নকল করে' বহুরের দিক্‌চক্রবালে সোজা গিয়ে মিসিয়ে গেছে। পোলের ওপর থেকে পশ্চিমের যে বিস্তারিত উজ্জ্বল ভূখণ্ড দেখে যায়, মাঝের হাটের স্পর্শ লেগে তার এক অভিনব, প্রকৃতির অতীত রূপ হয়েছে। দ্বারের লেলের জটিল লাইন, খালের ওপর দূরে অসংখ্য কুলি-সমেত বৃহৎ ড্রোয়ারের মাট-কাটা ক্রেনের মাস্তল, ডিস্ট্যান্ট মিসগালের স্বল্প দীর্ঘ দণ্ড প্রভাবের মিত্ত অলোকে রাস্তা দুখটিকে 'অপকল্প অতিপ্রাকৃতিক' একটি বাজনা দিয়েছে। তার ওপর শরতের প্রথম রোদে সকাগটি ভারী মিষ্টি লাগছিল।

প্রশান্তবাবু মনে সকলের এই রঙ লেগেছিল একথা এখনও সাহস করে' বলা যায় না। প্রশান্তবাবুর মন সহজে রঙ ধরবার মত যে নয় এটুকু তাঁর সঙ্গে পরিচয় থাকলে নিঃসন্দেহে রসা যায়।

বন্ধককে সন্ধ্যা দীর্ঘদেহ মোটরটির মত তাঁরও চেহারার, বেশভূষার ও মনে একটি সহজ সজ্জির ছাপ আছে কিন্তু তার মধ্যে আছে মোটরের ঘনিষ্ঠত্ব বেহের কাঠি। জীবনের 'অনিশ্চিত' তরলতাকে বধ্যাসম্ভব বর্জন করবার শিক্ষা ও সাধনাই তিনি করে' এসেছেন। 'অজের সংখ্যার মত তাঁর সমস্ত সত্তার যোগফল- 'হিস, নির্দিষ্ট। তাকে যে-কোন উত্তেজনা-দিয়ে গুণ করলে এবং যে কোন অস্বস্থি

বিয়ে ভাগ করলে একই কল দেখা যাবে। তা-ছাড়া মনের কাঠমও তাঁর কঠিন। যে কোন দিকে যে কোন প্রভাবে সহজে ভাটেন না।

সারাজীবন হুনিদ্বিহী একটি পথ তিনি অবচলিত ভাবে অনুসরণ করে এসেছেন, সে পথে বার্ষিকতার সঙ্গে সাক্ষাৎ তাঁর অতি অল্পই হয়েছে। ‘আপাগোড়া’ সাধক হয়ে আশার ফলে একটি সহজ ভাবাদিক প্রায়শঃ তাঁর মুখে ও বাহ্যরে সঙ্গীরাই প্রকাশ পায়। চেহারা তাঁর ঠিক অজিত্যত বলা যায় না কিন্তু অপর্যাপ্ত অর্থ ও ক্ষমতার ছাপ তাতে অত্যন্ত স্পষ্ট। অপরিচিত হান্দেও লোকে তাঁকে আপনা থেকেই সন্ম প্রদর্শন করতে বাধ্য হয়, তাঁর মুখে কথা কইতে এসে সাধারণ লোকের কণ্ঠ তাঁদের অজ্ঞাতেই ভয় ও শঙ্কার মূঢ় হয়ে আসে। প্রশান্তবাবু এসময় সম্মানে এমনি অত্যন্ত হয়ে যেনেমন যে আত্মকাল তাঁর চোখেও এসব পড়ে না। তাঁর নিজের আর্থ অল্পসারে প্রশান্তবাবু স্বামী, পরিতৃপ্ত—জীবনের যে ক্ষেত্র তিনি বেছে নিয়েছেন সেখানে তাঁর অগাধ প্রতিপত্তি, অপ্রতিরূপ ক্ষমতা।

তাঁর জীবনের ক্ষেত্র হয়ত সীমার কিছু প্রশান্তবাবু তা জানবার অবসর পান নি; বাজে কথা চিত্রা করবার তাঁর সময়ও নেই। সকালে উঠতে না উঠতেই—গাত, আটটা টেলিফোনের সংবাদ তাঁর জন্তে মজুত হ’য়ে থাকে। প্রাতঃস্তুতা সমাপন করে, নীচে বাড়ির নিচুত অক্ষিস ঘরে নামবার আগেই সেক্রেটারী তাঁর সমস্ত ব্যবসা-সংক্রান্ত চিঠিপত্র গুলে গুলার প্রয়োজনীয় তথ্য টুকে রাখে। অক্ষিস একদম চিঠিপত্র তা অক্ষিই তা ছাড়া বাড়িতেও চিঠিপত্র বড় কম আসে না। সে চিঠি নানা ধরণের, নানা লোকের কাছ থেকে। কল্যাণপ্রাপ্ত, বৃদ্ধ ভ্রাতৃদের ভিকার পত্র থেকে লাটসাহেবের প্রীতিভাজে নিমন্ত্রণ-পত্র পর্যন্ত সব রকম চিঠিই তাঁতে আছে।

ধরনের কাগজে দেয়ার মার্কিটের বিবরণের ওপর একবার চোখ বুলিয়েই সে চিঠিপত্রের উত্তর সেক্রেটারীকে মুখে বলে যেতে হয়। এইই মধ্যে ভেতর থেকে চাকর এসে ওরফের ছুটি বড়ি ও একদল জল রেখে যায়। প্রশান্তবাবুর শরীর পুষ্ট হলেও ঠিক হুই নয়, কটি-

বাতের লক্ষণ দেখে বাড়ির ডাক্তার আগে থাকতেই সাবধান করে দিয়েছেন। রক্তের চাপও বৈশ্বাবিক অবস্থান—যা হওয়া উচিত তার চেয়ে একটু বেশী। ডাক্তার বলেছে, একটু বিশ্রাম নিতে পারেন না? বলে ডাক্তারও হেসেছে, প্রশান্তবাবুও স্তব্ধ হেসেছেন। হেসে বলেছেন—“বিশ্রাম একেবারে হেব!”

ডাক্তারবাবু একেবারে সহানুভূতিতে গলে গিয়ে বলেছেন—“সে কি বলছেন, আপনার উত্তরোপীধান ভাইট্যানিটি, আশির একবারে কিছুতে কালু করতে পারবে না। তবে মায়ে মায়ে একটু বিশ্রাম দরকার বই কি!”

প্রশান্তবাবু ‘হু’ বলে চুপ করে গেছেন। ডাক্তারের ওপর তাঁর বিদ্মুদার বিশ্বাস নেই, শোকটা একটা হামবায়। অধিকাংশ ডাক্তারই তাই, তবু শরীরের জ্বলে জ্বলে-রোদান একটু হুই নিতে হয়, নইলে হুইলা জোনে আশে-কোনে তুলবে। হুইলার স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে বাবুল উপদেশের চেয়ে যে-কোন ডাক্তারের যে কোনো বড়ি উপাদেয়। প্রশান্তবাবু বিনা প্রবিবাদে তাই ডাক্তারের বড়ি নিয়মিত ভাবে গলাধঃকরণ করেন।

জ্ঞাতের একেবারে যে নিস্তার আছে তা নয়, হুইলাকে প্রতিদিন জানাতে হয়, কোথায় রাখা কেমন আছে, একটু সরেছে না একটু বেড়েছে ডাক্তারকে আর একবার ডাক দরকার কিনা! হুইলা শরীর নিয়েই ব্যস্ত। তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন নিজের ও পরের স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে দ্রুতিভা করা। অবস্থ পেটেট বুলু, ডাক্তার, পাওয়া-দাওয়ার নিয়ম-কানুন নিয়েই সে ব্যগ্র হুইলা থাকে থাক। এক হিসেবে বয়ঃ ভালই। বর্ধন সাহেবের স্ত্রীর মত তার যে সাময়িকতার নেশা নেই ও মস্ত একটা লাভ। স্ত্রীর মরমাগা বাটতে বাটতেই তা বর্ধন সাহেবের অর্ধেক সময় যায়—বাবসাও তাই ফেল পড়তে বসে। ওরকম ভাবে নিত্য নিত্য স্ত্রীর অগাধ পাটিতে জড়ভরত সেজে বসে থাকতে হলেই হয়েছিল আর কি!

ওরফের বড়ি দুটি গলাধঃকরণ করেই সমস্ত দিনের কাজের একটা খলড়া করতে হয়। সেক্রেটারী নেট বইতে সময়সত সব স্মরণ করিয়ে দেবার জন্ত টুকে রাখে। এরি মধ্য

বাড়িতে কয়েকজন দেখা করতে আসে। তাদের সকলের সঙ্গে দেখা করবার দুরত্বও হয়ত হয় না। সরকারের সমস্ত দিনের হিসাবের খাজানায় একবার চোখ বুলিয়ে একটা সহী করেই তিনি ভেতরে চলে যান।

দান, বেশ পরিবর্তন, আহার—কতক্ষণই বা তাঁর জন্তে থরক গ্যা যায়। আহারের সময় স্ত্রী সামনে এসে বসেন—সমস্ত দিনের ভেতর স্বামী স্ত্রীর আলাপের সময় মাত্র দুবার, একবার সকালে ও একবার রাতে আহারের সময়। তাও রাতে এক একদিন ফিরতে দেবী হয়ে যায়। স্ত্রীর বারমাসে মাথার যন্ত্রণা; রাতেই বাড়ে। যেদিন বেশী হয়, সেদিন আর তিনি রাতে আসতে পারেন না।

আহারের সময় আলাপ হয় বটে কিন্তু অত্যন্ত ভাষা-ভাষা। স্ত্রীর যুগের বিকে চেয়েও যে তিনি কোন দিন ভালো করে দেখেছেন তা মনে পড়ে না। হঠাৎ একদিন ‘হয়ত বলে, “বাস: এই নতুন শাড়ীর পাড়টা ত বেশ,” তারপর একটু রসিকতা করবার চেষ্টা করে বলেন—“মানিয়েছে চমৎকার!”

স্ত্রী মুখ ভাব করে উত্তর দেন—“শাড়ীটা নতুন নয়, অস্থত: একশ দিন তোমার সামনে এ শাড়ী পরেছি,—এই কালকেও!”

প্রশান্তবাবু অগস্তত হয়ে ভাড়াভাড়ি কথা পাটে দেন এবং কবিত্বভূত শাড়ী-সম্বন্ধে আলোচনা করেন না মনে মনে স্থির করে কেলেন।

আহার শেষ করে প্রশান্তবাবু নীচে নামেন—মোটর ইতিমধ্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। ধরনের কাগজটা মোটরেই আর একবার পড়বার চেষ্টা হয়।

তারপর অক্ষিস—দরওয়ানের সেলাম, লিফটবয়ের সেলাম, বোয়ালদের সেলাম, কোষাণীদের সম্মানে উঠে ধাঁড়ান, ফোন্নিং ডোরের বৃহৎ একটু আগুওয়া, চোরাং টেনে বসা।

তারপর কাণা, কাজ। সেক্রেটারী কে কাজের সবে পান্না দিয়ে চলেত পারেন না, সেই জন্তেই তার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অধি নেই। প্রশান্তবাবু এটুই জানেন: সেক্রেটারীর এই বিশ্বস্ত প্রকৃতিই উপভোগ ও করেন। সেক্রেটারী বিশ্ব-বিজ্ঞানের বড় ছাপান্না ভালো জেলে,—বিশ্ব-বিজ্ঞানের

ছাপ-সকলে প্রশান্তবাবুর একটু দুর্গলতা আছে—সেই জন্তেই সেক্রেটারীর নীরব শ্রদ্ধা তিনি স্পষ্ট হ’ন। তাকে প্রত্যেক দিন অবাধ করে দিতে তাঁর ভালো লাগে।

অক্ষিস থেকে বেরিয়েই হয়ত চাকর বাড়ি সান্না-ভোজের নিমন্ত্রণ। সান্না-ভোজটা ছুতো মার—আসল হচ্ছে নতুন কোম্পানীর কিছু দেয়ার কেনবার জন্তে তাঁকে জপারার চেষ্টা। প্রশান্তবাবু মনে মনে হাসেন হয়ত,—তবু বাগ্ম্য দরকার।

অক্ষিস থেকে বেরবার পথে হঠাৎ একটা টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে পড়ে তিনি ইংরাজীতে বলেন—“হু” এই রকমই আমি ভেবেছিলাম। এখানে একটা লাল কালির স্টোয়াত বোধ হয় থাকবার কথা।”—আধা বাস আধা পাঞ্জীঘীর স্বর।

কোষাণী তখন সম্মুখনে দাঁড়িয়ে আছে। থাকে লম্বা করে কণাটা বুলু হয়ে সে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে বলে, “ওটা আজ সকালে অগাধানে পড়ে ডেডে গেছে।”

“বেশ ত আরেকটা চেয়ে পাঠান নি কেন? এ অক্ষিসের কি এত দুর্দশা হয়েছে যে একটা মোবাত শঙালোর আর একটা জোগাতে পারেন না?”

কোষাণী অমতা-অমতা করে কিছুই ভালো বলতে পারেন না। প্রশান্তবাবু আবার তাঁর সেই অনন্যকরণীয় স্বরে বলেন, “আজ সমস্ত এটুই ওই কালো কালিতে হয়েছে ত!—বোয়াল! রমেশবাবুর টেবিলে লাল কালি।”, হুইম নিয়েই তিনি গোলা বেরিয়ে যান।

আশ্চর্য! কি তীব্র দৃষ্টি। প্রশান্তবাবু যেতে যেতে মানস-চক্ষু যেন সমস্ত কর্মজারীদের সপ্রশংস দৃষ্টি দেখতে পান। মনে মনে তাদের বিস্মিত স্তম্ভ্য তিনি যেন স্তম্ভতে পান—আশ্চর্য, কিন্তু ওর দৃষ্টি এড়ায় না!

যৌবনে সত্যিই তাঁর তীব্র দৃষ্টি ছিল। এখন তারই হুইনাম বজায় রাখার জন্তে যদিও মাঝে মাঝে বেশ একটু যেন বেগ পেতে হয়। মাঝে মাঝে যেন জেসেমাছরি হয়ে যান। চেষ্টা করে খুঁটিনাটি ব্রুঁকে বার করা ছাপান কম নয়। তবু হুইনাম খোঁজান ত যায় না।

অক্ষিস থেকে বেরিয়েই প্রশান্তবাবু সান্না-ভোজে যান, বাড়ি ফিরে বেশ বদলাবার আর সময় নেই।

রাজে সমস্ত কাজ সেয়ে যখন বাড়ি ফেরেন, তখন রাস্তা—হাঁ। একটু রাস্তাই নিজেই মনে হয় বই কি। কিন্তু পরিত্যক্ত,—প্রাণহবাবু অত্যন্ত পরিতৃপ্ত বোধ করেন। সমস্ত রিনটা কি রকমই না কেটেছে। একেবারে কাজে ঠাসা; কোথাও একটুই ফাঁক নেই।

মোটরের দীট হেলান দিয়ে যেতে যেতে বর্জন সাহেবের কথা মনে পড়ে। বর্জন সাহেবকে আজকাল কেমন যেন রাতদিনই বিরত দেখায়; চারিধারে তার সব যেন কেড়ে পড়ছে, সে সাম্যশতে পারছে না। আগেকার মোটরটা বেতে বেতে বর্জন একটা সত্তা সেকে ওড়াও মোটর কিনেছে। বলে, “হালিশ কার,”—ইহিন নাকি ভারি ভাল। প্রাণহবাবুর একটু হাসি পায়। এই বর্জনই একদিন সমস্ত বাজার মাং করে রেখেছিল। সে গুণের জ্ঞান তিনি নীচে; প্রতি দাপে তাঁকে জাগরণে জন্মে সঞ্চার করতে হয়েছে।

মোটরে না উঠে প্রাণহবাবু গেলের রেলিঙের ধারে গিয়ে হাঁড়ালেন। নীচেই ট্রেন, ট্রেন নেই, জনশূন্য প্লাটফর্মের লাল ঝাঁকরগুলো সকালের রোদে ঝকঝক করছে। বা সিক দিয়ে ট্রেনে নামবার ইটের সিঁড়ি। প্রাণহবাবু কি ভেবে বলা যায় না হঠাৎ সিঁড়ি দিয়ে নামতে আস্ত করলেন। মোটর সাগা হবার আগেই উঠে আসলেন। নিৰ্জন ট্রেনটি ভারী হৃদয় দেখাচ্ছে। একটু বেড়িয়ে এলে কতি কি?

সিঁড়ি দিয়ে নামতে একটু কষ্ট হয়। ওঁরবার সময় বোধ হয়—আরো কষ্ট হবে। এতখানি সিঁড়ি বেয়ে অনেক দিন কোথাও নামেন নি। নীচের ধাপে পা দিয়ে হাঁপ ছাড়েন, সেই মুহূর্তে, তাঁর জামার হাতার টান পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে কে ডাকে “বাবু?”

প্রাণহবাবু অবাক হয়ে যান, গত বিশ বছরে তাঁর জামার হাতা ধরে এরকমভাবে টানতে কেউ সাহস করেন নি।—কেউ তাঁর কাছে আসতে ভরসা করলে ত? পাশ ফিরে দেখেন, বেদেদের একটি বড় দূশের মেয়ে, পরণে মোড়া তালি দেওয়া শাখরা, গায়ে নানা রঙের বিচিত্র, ময়লা জামা,

মাথায় লম্বা বিহুনি। কালো মুখখানি কিন্তু চুইমিতে, স্বাস্থ্যের জ্যোতিতে উজ্জ্বল। মুখ জোখের একটা চমৎকার তুলি করে, ঘাড়টি বিহুনি সমেত এক পাশে হেলিয়ে, তাঁর জামার আন্তিন ধরে আরেক টান দিয়ে সে বলে “বাবু”।

মিনিট কুড়ি বাবে মোটরের ত্রুটি শুধরে সোফার মনিবের সঙ্গে এদিক ওদিক তাকাপ।—ব্রাহ্মণ গুণের বাবু নেই। মনিব এখনও প্লাটফর্মের কাছে মনে করে—সোফার সিঁড়ি দিয়ে কেনে গেল। ধানিক আগেই একটা ট্রেন বজবেজের মুখে চলে গেছে। সেই ট্রেন থেকে যে করজন যাত্রী নেমেছিল তাবেরই কেউ কেউ তখনও মোটরটি নিয়ে খাবার আয়োজন করছিল। তাগের ভেতরও প্রাণহবাবু নেই।

আশ্চর্য বাগ্যার। সোফার এদিক ওদিক, প্লাটফর্মের পানের বোতল ঘর ইত্যাদি সমস্তই খুঁজে দেখল। প্রাণহবাবুর সন্ধান কোথাও মিলল না। অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে হয়ত মনিব অজ্ঞা কোন দিক দিয়ে মোটরেই উঠে এসে বসেছেন ভেবে সোফার তাড়াতাড়ি মোটরের কাছে নিয়ে এল; কিন্তু সেখানেও প্রাণহবাবু আছেননি।

প্রাণহবাবুর অন্তর্দান হওয়া অবস্থার রহস্যময় বাগ্যার কিন্তু তাই নিয়ে বোমাঙ্কর কোন ডিটেকটিভ উপভাসের স্বরণগত হবার সম্ভাবনা নেই।

বেদেদের মেয়েটির দিকে একটু বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে প্রাণহবাবু আবার গম্ভীরভাবে এগিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু মেয়েটি হঠাৎ তাঁর জামার হাতা ছেড়ে সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাত পেতে বললে “বাবু পরয়া।”

মুখে বেশ একটু বিরক্তি প্রকাশ করেই প্রাণহবাবু তাকে পাশ কাটায়ে খাবার চেষ্টা করলেন—মেয়েটি কিন্তু নাছোড়খানা। ঘাড়টি বাঁকিয়ে ভারী নিটী একটা হাসি হেসে সে আবার সামনে এসে হাঁড়াল। প্রাণহবাবুর জীবনে এমন ঘটনা কখনও ঘটে নি। তাঁর পরমমায়াদ, তাঁর গাভীরা চিরদিন

তাঁর চারিধারে একটি গতি রচনা করে রেখেছে। সে গতির সীমা লঙ্ঘন করবার হুঁসাহস কখনও কারও হয় নি। সংসার, পৃথিবী, জীবনকেও প্রাণহবাবু চিরদিন সেই গতির প্রান্তেই দূর থেকে দেখেছেন। আজ যেন সেই হৃদয় পৃথিবীই তার একটি প্রতিনিধি পাঠিয়েছে সে গতি লঙ্ঘন করবার জন্তে।

প্রাণহবাবুর গাভীরা আর বইল না। মেয়েটি এমন আশ্বাসের ভঙ্গিতে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছে যেন সে কতকালের চেনা। একটু হেসে প্রাণহবাবু বাগ থেকে একটি আনি বার করে তার হাতে ধিলেন।

মেয়েটি আনটি পেয়েই কিছু করে’ একটু হেসে কলে ঘাড় নেড়ে বেণী হুলিয়ে ছুটে চলে’ গেল। প্রাণহবাবু একটু খন্দক দাঁড়ালেন।

কেন যে প্রাণহবাবু দাঁড়ালেন তা বুঝিয়ে বলা শক্ত; তিনি নিজেও তা কালো করে’ বোধ হয় বুঝেন নি। ওই ছোট্ট মেয়েটির গতিভঙ্গিতে উজ্জলিত প্রাণশক্তির সহজ সাবলীল প্রকাশ দেখে হয়ত তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, হয়ত প্রাণহবাবুর হৃদয়ের যে সমস্ত উৎসং একেবারে শুকিয়ে যায় নি সন্দেহ হয়েছিল মাত্র, তারই বলে ওই মেয়েটির হৃদয়ময় মুখখানি অসম্ভাং যুগ্ম আঘাত করে’ছিল; বিচ্-চকম্বল দিয়ে যখন সীমানা নিরূপণ করার যে ধারা—মেয়েটির রক্তে প্রবাহিত, অকস্মাৎ নিজের অজ্ঞাতে তারই সঙ্গে তাঁর আত্ময়ের সংগ্রাম ও সাধারণ সঙ্ঘর্ষ দেখেছিল কিনা কে বলাতে পারে?

প্রাণহবাবু আবার এগুতে হৃদয় করলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হ’ল—শেনাট ভারী হৃদয়। প্লাটফর্মের পেছনে লোহার বেড়ার গা-বেয়ে যে লতাগুলি উঠেছে তার নাম তিনি জানেন না। কিন্তু সেই নামহীন পুষ্পিত লতা তাঁর কাছে হঠাৎ অগুরু ঠেকে।

শেনা থেকে দেখা যায়, কাটাগুলোর গুণর ফুল পুখু ও রমণী ড্রেজারের গুণর থেকে কাটা মাটি চুবড়ি করে খালো ধারে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অনেককণ অকারণে সেদিকে তিনি চেয়ে রইলেন। ওই স্থাপত্যকার মাটি সম্ভার কড়াইটি করে’ কিনে কত লাভে কোথায় বিক্রি করা যায় গতিই সে কথা তিনি ভাবছিলেন না। সে পৃথিবীর দিকে চেয়ে

অকস্মাৎ তিনি মুগ্ধ হয়ে গেছিলেন, তাকে, লাভ-লোকসানের অর্থে অসুখার করে’ কিছুতেই হিসেবের পাতায় তোলা যায় না। বেদেদের ওই মেয়েটি কি কোশল বলা যায় না তাকে নতুন এক পৃথিবীর সন্ধান দিয়েছে। প্লাটফর্মের লোহার বেষ্টিটায় গিয়ে হেলান দিয়ে তিনি একটু বসলেন। সামনে রেলের মধ্যে পা ছড়িয়ে একটা কুঁহর আরাম করে’ ঘুমাচ্ছে, ঘুমাতে ঘুমাতেও মাছি তাড়াবার জন্তে তার কান নড়ে উঠেছে। কাটা কাঁক রেলের লাইনের ধারে কি একটা মহার্ঘ জ্বালা নিয়ে ভ্রমণ কর হৈঁচৈ বাবিয়ে তুলেছে। মহার্ঘ জিনিষটি আশা কিছু নয়, ষ্টেশনের খাবারের বোতল থেকে কলিমা ছোট একটা শালগাভার ঠোঁট। ঠোঁটটিয়া খাবার কিছু আছে কিনা কে জানে। ঠোঁট নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে করতে হঠাৎ নতুন মজার সন্ধান পেয়ে কাটা কাঁক উড়ে’ যায়। একটা চিলি কেশুণ থেকে এক টুকরো মাছ সংগ্রহ করে এনেছে। কিন্তু কেশুণা তাকে নিভস্ত হয়ে তা আহার করতে দেবে না। তার চিলের আশে পাশে উড়ে’ বেড়ায়, পেছনে থেকে ছেঁ’মেরে নেবার চেষ্টা করে। চিল বেটারা রেগে একবার নিফলভাবে তাড়া করে যায়, তারপর অজ্ঞা জায়গায় উড়ে’ গিয়ে বসে কিন্তু সেখানেও তার নিস্তার নেই—

প্রাণহবাবুর আত্মগে নিজেই আবার বসে গেলেন। এ সমস্ত জিনিষ জীবনে তিনি ত’ কখন লক্ষ্য করেন নি। একটু লজ্জিত হয়েই তিনি মোটর ফিরে খাবার জন্তে বেধি থেকে ওঁরবার উপকল্প করছিলেন, এমন সময় সেই বেদে মেয়েটি কোথা থেকে ছুট কাঠের গুঞ্জনির মত একটা যন্ত্র বাজাতে বাজাতে উঠেই তাঁর আঁকড়ে দেবার চেষ্টা করেন।

মেয়েটি তাঁকে দেখেই কিছু করে’ একটু হাসল, কিন্তু সে হাসি যে অতিরিক্ত পরয়া আধারের কোণাল নয়, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভঙ্গি মাত্র, এটা বুঝতে তাঁর দেহী হ’ল না। কাঠের টুকরো দুটিকে অগুরু কোশলে একে একে ধরে’ বাজাতে বাজাতে প্রাণহবাবু বরফির কাছে ছেঁয়ে গাটফর্মের ঝাঁকরের গুণর সে বসে’ পড়ল।

প্রাণহবাবুর মুখে হাসি এল, মেয়েটি তাঁর দিকে গিছেন ফিরে বসেছে। হাসি দিয়ে আনিনের রূপ শোধ করে’ এখন সে যেন নিৰ্জন প্লাটফর্মে শুধু ঘুমন্ত কুহুরটাকেই তার বাজনার

কোশল দেখাতে ও শোনাতে বসেছে। ঘুমন্ত স্ত্রীরা নিতান্ত বেরনিক। কাঠের খজনির আগুদকে একবার মুখ তুলে একটি চোখে অর্ধ-নিমিলাত করে' প্রথম সে একই বিরক্তি প্রকাশ করলে, কিন্তু তাকেও কোন কল না হওয়াতে উঠে বসে' সবথেকে একবার কানঝাড়া দিয়ে এক পা এক পা করে' সরে' গেল।

প্রশান্তবাবু এবার ডাকলেন—“শোন—”
মেয়েটির হাতের কাঠের খজনি খেমে গেল। মাথা নীচু করে' মুখ টিপে হাসতে হাসতে ঈহৎ গান কিয়ে প্রশান্তবাবুর বিক তাকিয়ে সে বললে—“কি জন্মে ডাকছে?”
তার কচি শোনের ডাড়া ডাড়া অস্তুত হিন্দুখানি শুনতে ভারী মিষ্টি লাগে।

প্রশান্তবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—“তোমার নাম কি?”
মেয়েটা মাথা নেড়ে বলল, “বলব না।” তারপর এত বড় একটা রসিকতায় নিকেই বিল বিল করে' হেসে উঠল। নাম জানার আশা তার্য্য করে'ই বোধ হয় প্রশান্তবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—“পয়সা নিয়ে কি করলি?”
পয়সা? পয়সা নিয়ে এক পয়শার সে ভিলাখী খেয়েছে, এক পয়সা বিরিয়েছে নানীকে আর ছুটো পয়সা এখনো তাঁর আছে জ্বা। ছেঁড়া মেরেজাই-এর পকেট থেকে পয়সা ছুটো সে বার করে' দেখিয়েও দিলে।

এর পর প্রশান্তবাবু আর কথা খুঁজে পেলেন না। কথা আর তাঁর খোঁজবার দরকারও ছিল না। মেয়েটি প্রথম আলস্যের আড়চোরা তখন কাটিয়ে উঠেছে। তার অনর্গল কথার স্রোতে প্রশান্তবাবুই আর থই পেলেন না। এক কথার জ্বা বদিত আর কথার খেই হারিয়ে গেল।
“ও হাওয়া-গাড়ীটা তোমার—না?”

প্রশান্তবাবু গজ্জবাহে সে কথা স্বীকার করলেন।
ও হাওয়া-গাড়ীতে একবারে হাওয়ার মত বাতাস বায়, না?
...আর অনেক দূর—বহুত দূর—সেই—যেখানে স্বর্গ ভাঙে, সেখানেও বাওয়া বায় না? নিচ্ছাই যাক—প্রশান্তবাবু কেন, স্বর্গ ভাঙে যেখানে সেখানে বেরতে বায় না?—সে কোন হাওয়া-গাড়ী চড়ে নি—কি করে হাওয়া-গাড়ী চলে, সে জানে। বিশেষ, সে নিচ্ছয় চানতে পারে—কত হাওয়া-গাড়ী

রাস্তার ধারে পাড়িয়ে থাকে—একদিন বখন কেউ থাকবে না তখন সে উঠে বেবে চালিয়ে...আর মোটে থামাবে না—এত জোরে চালাবে যে কেউ তাকে ধরতে পারবে না—একটা হাওয়া-গাড়ীর দাম কত?

এই অবিশ্বাস প্রবণতায় ফাঁকে প্রশান্তবাবু সুযোগ পেলে এক আধটা উত্তর হয়ত বলিয়ে দিচ্ছিলেন। অনেক বড় বড় ব্যবসার সভার অনেক সদাগর সম্রাটের সঙ্গে আলাপ তিনি জীবনে করেছেন কিন্তু এমন কাবে আলোচনার কোন্ঠাসা হবার গৌড়াগা তাঁর কখন হয়নি। তাঁর নিজের যে মোটর তিনি ছ'বেলা পুরো জুতার মত ব্যবহার করেছেন হঠাৎ তা'র অসীম বহুত আবিষ্কার করে' তিনি যেন অবাক হয়ে যান। তাঁর মোটরটা যে সময় মত বরাহ রাখবার একটা কল নয়, পৃথিবীর বিশ্বকর্ষক বিশালতাকে উপলব্ধি করবার একটা উপায়, একথা কে জানত?

তবু মোটর নয় প্রশান্তবাবু হয়ত নিজেকেও নতুন করে' আবিষ্কার করেন।
হঠাৎ কি খেয়ালে তিনি মেয়েটিকে মোটরে উঠিয়ে একটু বেড়িয়ে আনবার প্রস্তাব করতে বাচ্ছিলেন, কিন্তু সময় হল না।

মেয়েটি কাঠের খজনি ছাট তুলে নিয়ে উঠে একটু হেসে স্রোতে প্রাক্ষর্যের অম্পর প্রান্তে চলে গেল। সেখান থেকে তাঁর বৃদ্ধা নানী বৃষ্টি তাকে ডাকছে।

হাতকর প্রস্তাবটা নেহাৎই করে' ফেলেন নি বলে' প্রশান্তবাবু একটু ষ্টিত বোধ করছিলেন। ছি, তাঁর হয়েছিল কি? এবার গুঁহার সময় হয়েছে। বারোটার ডিক্টরেটরের মিটিং, জার্মানি এম্বাসীর সঙ্গে আলোচনা। কিন্তু হঠাৎ অস্বাভাব্য প্রশান্তবাবুর সমস্ত কেমন বিরাধ লাগে। ডিক্টরেটর! ডিক্টরেটর মানে ত রাজেন বোস, আর রাস চট্টাচার্য্য, আর হুসুম চাঁদ। রাজেন বোস একটা হুসুম বোর—তাঁর সমান্তর ডিসপেনসারী বেনে পৃথিবীর সবথেকে আশ্চর্য্য ঘটনা। সবাই তাঁর বিরণ শোনার জন্মে সারাগঞ্জ উগ্রদ্বীপ হয়ে আছে বেন। কাল সামাজ্য একটু কোয়েকার ভঙস খেয়ে তার পেট কি বকন করেছিল, আর ডাঃ সরকারের কথা না মেনে নিজের চিকিৎসা

আজ সে কেমন আছে, আর শীগগিরই ইউরোপের কোথাকার রেলপথে সে যাবে, এই বসে' বসে' শোন তাঁর কাছে। না শুনলে আবার অভিমান, জরাজীর্ণতার অপব্যব। কিন্তু বোসের চেয়েও অসহ চট্টাচার্য্য, আর তাঁর বামনাই-এর অহংকার। সে যে টাকার ক্ষমীর হয়েও সাহেব হয়ে নি, এখনো কটকি চাট পায়ে দিয়ে, নানাবর্ণী গায়ে, ডিক্টরেটরদের মিটিং-এ আসে, হুজুরা ছুটো আহ্নিক-উপাসনা করে, স্বপাক ছাড়া খায় না,—এর দেখাকেই সে গেল। আর হুসুম চাঁদ! তাকে কি আহ্নিক প্রক্রান্তে হাঘর ব'লেই ত' মনে হয় না। কাপড়-আমায় ঢাকা একটা গোপাগা—তেমনি সূক্ষ্ম শাণিতদৃষ্টি, সমস্ত চেহারায কথাবার্তার তেমনি ফুকারজনক নোংরাণি।
আর মিটিং—তাঁর মানে ত অপরের চোখে থুলা দিয়ে নিজের কোলে ঝোল টানবার চেষ্টা। ভাবাতার ছায়ারূপে নিশ'জ্ঞ শরত।

চট্টাচার্য্য বলবে—“আমার ইচ্ছে নতুন কারখানার কন্সট্রাক্ট। মুখার্জি কোম্পানীকেও দেওয়া হোক। জ্বরের চেয়ে সত্তা টেওয়ার হয়ত আছে। কিন্তু সত্তা মানেই ত' ফাঁকি।
সবাই মনে মনে বলবে—“হু, মুখার্জি কোম্পানীর ছোট কর্তার সঙ্গে চট্টাচার্য্যের মেয়ের বিয়ের একটা সম্বন্ধ চলেছে না?” মুখে বলবে—“কেন, মিটিং ইঞ্জিনিয়ার” সেবার আদ্যেরে কাঁচটা কি খারাপ করেছিল? হাজার হ'লেও বড় কোম্পানী, সত্তা টেওয়ার দিয়ে তাঁর মান রাখতেও পারে।”

তারপর রোযেরি, জ্বা বিজ্ঞপ, শেষ পর্যন্ত যেমিকে বেশী লোকের খ্যাতি আর বেশী প্যাচাল বৃদ্ধি সেইবিকেরই সাময়িক জিং।

তবু উঠেই হবে। সারাজীবন যে জগৎ তাঁর পরিচিত, যে-জগতে তিনি অভ্যস্ত, তা পরিচায় করবার সাহস তাঁর নেই। কেমন একটু অপরম মনেই প্রশান্তবাবু গুঁহার উদ্যোগ করেন।

নিজের শৈশব হঠাৎ মাহুদের ভীড়ে কোলাহলে সঙ্গরাম হয়ে উঠেছে। বালীগঞ্জ থেকে ট্রেন আসছে বৃষ্টি।

উঠতে গিয়েও গুঁহা হয় না। প্রাক্ষর্যের জনতার এই বাস্তবতা, দুই টেনের ইঞ্জিনের সশব্দ গতি অত্যন্ত তাঁর ভালো লাগে। এ ট্রেন বেনে তাঁর হৃদয় শৈশবকে বহন করে' আনছে। সেই অধীর টেন্ডরকা, সেই চঞ্চল আনন্দ তিনি নতুন করে' অহুত্ব করেন। প্রাক্ষর্যের জনতার বৈচিত্র্যো তাঁর মন নতুন কোন রসের স্বাদ পায়। পৃথিবীকে ভাগ করা আর ঝুল ভাবে ভোগ করা নয়, এমনি নিশ্চিন্ত আরাগমে নিশ্চিন্ত সুদীর্ঘে উপভোগ করার আনন্দ তাঁর ত' জানা ছিল না।

ট্রেন সশব্দ এসে থেমে যায়। লোকের নান্দ-গুঁহার হুড়াহুড়ি; টেন্ডারের, গিরিগুলাদের বাস্তবতা, সবক বেনে আজ তিনি নতুন করে' দেখতে পেনেন। ট্রেন ও প্রাক্ষর্যের প্রত্যেকটি লোক একটি বিভিন্ন কাহিনীর ধারা বহন করে' নিয়ে'চলেছে, সেই বিভিন্ন কাহিনীর সমস্তা তাঁর মন মত হয়ে যায়। চায়ীদের একটি মিশকালো ময়লা কাপড়-পড়া বৃষ্টি মেয়ে এক কাঁখে একটি পুঁটলি আর একহাতে লঠন ঘটিগাটী সৈমত একটি বাশ্টি নিয়ে বাস্তব সমস্ত হয়ে প্রাক্ষর্যের মুখে বেড়িয়েছে। একলাই বৃষ্টি সে কোথায় চলেছে। ট্রেনে গুঁহা তাঁর কাছে একটা ভ্রাতৃবৎহ পাণ্ডার—মুখে তাঁর ভয় হুঁজবানার গভীর রেখা ফুটে উঠেছে। যাকে দেখে তাকেই সে শুধায়—“হা বাবা মেয়েছেলের পাড়ী কোন্টা বাবা! ও বাবা, পাড়ী যে ছেড়ে দেবে গো!”

প্রশান্তবাবু তাকে অধরে মেয়েদের পাড়ী দেখিয়ে বেন। মেয়েটি দৃষ্টিবাহ বেন না। দিতে জানলেও তাঁর সময় নেই। শূন্যবাস্তবে সে কাম্যাবীর ধারে গিয়ে ডাকে—“ওগো দরজা খোলনা গো—পাড়ী যে ছেড়ে দিল।”

কোথায় সে চলেছে কে জানে? হাতের রাগ করে' খসরগাড়ি থেকে বাগের বাড়ি, হয়ত আর কোন কাশে? চায়ীদের গুঁহা মাথার মোটা করে' নিছির-সেওয়া, কোন কাঁচের চুড়ি-পরা মেয়েটির জীবন-সম্বন্ধে প্রশান্তবাবু কিছুকলী হয়ে ওঠেন।

একটি আট নয় বছরের ছেলে কিছুকলী পাড়ী থেকে মানবে না। পাড়ী ত' এই সব চড়েছে সে, এর মহো

সে নামের কেন? এখানে গাড়ী কতদূরে থাকে, কত গাম, কত মাঠ, কত নদী পেরিয়ে। সে কেনমন করে' নামে বস। তার বাবা আর দাদা তাকে বোঝায়। দরজার হাতল ধরে' সে কাঁদতে থাকে।

প্রশান্তবাবুর আগনের সামনেই একটি খাড়িক্রাশ কামরা। তার জানালার, মাথার লাল চড়চা পাড় শাড়ীর খোমটি-বেতরা একটি বড় গোলাগাল মোটা-মোটা একটি বছর ধানেকের মেয়েকে সজোরে ধরে' আছে। মেয়েটির মাথার গম্বীর কান-ঢাকা লাল টুপি, গায়ে ছিটের ফ্রক। হাতে তার কঠোর একটি কুম্ভূনি। কুম্ভূনিটির খাদ পটীকা করে' তুল না হয়ে সে মোটা নাড়তে নাড়তে প্রশান্তবাবুর দিকে চেয়ে হাসে। কালো মেয়েটির ফোলা ফোলা গাল গুটিতে চোখের কাজল মাখামাখি হয়ে গেছে। হঠাৎ জানালার অন্তিম কণা মেয়েটির অত্যন্ত ঐয়োজন পড়ে। জানালা দিয়ে ক'কে পড়ে' প্রাণপণে সে মার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে এবং তাতে সক্ষম না হয়ে রাগ করেই বোধহয় কুম্ভূনিটা বেগে দেয় নীচে।

মুহুরের বধুটি বোধহয় 'তার' স্বামীকে তাই জানায়। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বছর পচিশের একটি ছেলে বিস্কৃত হয়ে বলে—'দেখলে! বয়স ঠকে জানালার ধারে রেখানা, দিলে তা' ফেলে। গাড়ী আবার একুনি ছাড়বে।' এবার বধুটির কথা শোনা যায়, 'জানশায় না পাড়লে কানে যে!'

ছেলোটি নামবার উল্লেখ করবার আগেই প্রশান্তবাবু উঠে কুম্ভূনিটি মেয়েটির হাতে তুলে দেন।

ছেলেটি লজ্জিত হয়ে বলে, 'আগনি আবার কষ্ট করে' দিলেন কেন?'

"না কষ্ট আর কি?" মেয়েটির গাল ছুটি টিপে প্রশান্তবাবু একটু আদর করেন। কিন্তু মেয়েটি নতুন থেলা করেছে। কুম্ভূনিটা আবার সে ফেলে দেয়। প্রশান্তবাবু হেসে আবার সেটা ফুটিয়ে দেন।

গাড়ী চলতে আরম্ভ করেছে। মেয়েটিকে জানালা থেকে সরিয়ে নেবার আগেই সে আবার কুম্ভূনি দিয়ে বোধহয় ভাগ্য পটীকা করে' দেখে। প্রশান্তবাবু সেটা আবার ফুটিয়ে নেন। কলকাতার সাতটা বড় বড় কোম্পানীর ডিরেক্টরের ভাগ্যে এমন কাজ জুটবে কে জানত!

মেয়েটি ভেতরে কাঁদতে শুরু করেছে। গাড়ী এগিয়ে যাবার দরুন জানালার দর দর। যায় না। খোলা দরজা দিয়ে-ই উঠে পড়ে' প্রশান্তবাবু কুম্ভূনিটা মেয়েটির হাতে দিতে যান।

মেয়ের বাবা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বলেন, "দেখুন দিক আপনাকে অস্বাভাব্য কিরকম কষ্ট পেতে হ'ল। ছি, ছি,—কিন্তু গাড়ী যে জোরে চলছে। নামবেন কি করে'?"

তাই' নামা যাবে কি' করে! প্রশান্ত স্বরকণের জুজ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। চলন্ত গাড়ী থেকে নামবার বয়স তাঁর নেই। কেন? কালোই-বা ছিল? কিন্তু সে উল্লেখ তাঁর মুখ প্রকাশ পায় না।

হঠাৎ বেকির একধারে মজুর-শ্রমীর একটি লোকের পাশে বসে পড়ে' তিনি বলেন—"না নামনা, আমিও যাচ্ছি যে!"

ত্রেম বাবে মাত্র বজ্রবল। কিন্তু প্রশান্তবাবুর অকিসের পথ থেকে বজ্রবল অনেক দূর, আর রূপকথার পুরাতন কাছাকাছি।

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন

সমিতির নিবেদন

আগনি পূর্বেই অবগত আছেন যে, প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের দশম অধিবেশন আগামী ১১ই ১২ই ও ১৩ই পৌষ (ইং ২৬ হইতে ২৮ ডিসেম্বর) এলাহাবাদে হইবে। অতীর্থনা-সমিতি আপনাকে এই সম্মেলনে যোগ দিবার ভ্রম সাধরে আরম্ভ করিতেছেন। শ্রীমুক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মূল সভাপতি ও মাননীয় বিচারপতি জ্ঞানলালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় অতীর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং শ্রীমতী অম্বরুণা দেবী মহিলা-সম্মেলনের সভানেত্রী নির্বাচিত হইয়াছেন।

প্রতিনিধিগণের দেয় চাঁদা (৫ টাকা ও ছাত্র-ছাত্রী-গণের ৩ টাকা) অতীর্থনা-সমিতির কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীমলিনবিহারী মিত্র মহাশয়ের নিকট (৫ নং কোটাশার্গ—এলাহাবাদ) পাঠাইলে অগ্রহণ্য হইবে।

প্রতিনিধিগণ বিজ্ঞান, মশারি ইত্যাদি সঙ্গে আনিবেন। স্থানীয় এলো বঙ্গনী ইন্টারমিডিয়েট কলেজে প্রতিনিধি-নিবাস নির্দিষ্ট হইয়াছে। অহরাদির বন্দোবস্ত অতীর্থনা-সমিতি করিবেন। মহিলা-প্রতিনিধিগণের অবস্থানের ভ্রম স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। মহিলা-বিভাগের সম্পাদিকা শ্রীমতী প্রতিকা দেবী।

প্রবন্ধাদি আগামী ২০এ ডিসেম্বরের মধ্যে কাৰ্য্যধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

এলাহাবাদে তিনটি রেষন আছে। প্রত্যেক রেষনেই প্রত্যেক আপ-ভাউন ট্রেনের সময় খেজালসহকরণ উপস্থিত থাকিবেন। খেজালসহকরণ প্রতিনিধিগণকে প্রতিনিধি-নিবাসে পৌছাইয়া দিবেন।

এই সম্মেলনের সংস্বে একটি শিরপ্রশ্ননী খোলা হইবে। আগনি অগ্রহণ্যপূর্বক প্রশ্ননীর শেঠকরমে চিহ্ন, হুশিয়ারি, সহকারী কাৰ্য্যধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণনাথ বোধ, অনুল-সুটার-৭৮, লুকারগঞ্জ—এলাহাবাদ এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

এলাহাবাদ
১২ই অগ্রহায়ণ
১৩৩৯

বিনীত
শ্রীকৃষ্ণনাথ সিংহ
কাৰ্য্যধ্যক্ষ—অতীর্থনা-সমিতি
১৫৮, কর্ণেলগঞ্জ—এলাহাবাদ

কাৰ্য্যক্রম

সভার স্থান—এলো বঙ্গনী ইন্টারমিডিয়েট কলেজ।

১০ই পৌষ, ২০এ ডিসেম্বর, রবিবার রাত্রি ৭ ঘটিকা
—পরিচালক সমিতির অধিবেশন—

[ঐ সমিতির কাৰ্য্যধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণনাথ সিংহ কর্তৃক আহুত]

১১ই পৌষ—২৬এ ডিসেম্বর—সোমবার
কাৰ্য্যারম্ভ—মধ্যাহ্ন ১২টা হইতে ৪টা

- ১। উদ্বোধন-সঙ্গীত।
- ২। অতীর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিবাদন।
- ৩। সভাপতি নির্বাচন এবং সভাপতির অভিবাদন।
- ৪। সঙ্গীত।
- ৫। গুরু আশ্রম অধিবেশনের কাৰ্য্য-বিবরণী পাঠ।
- ৬। পরিচালক সমিতির বার্ষিক বিবরণী পাঠ।
- ৭। বিশ্ব-নির্বাচন-সমিতির সভা নির্বাচন।
- ৮। আলোক-চিত্র গ্রহণ।

অপরাত্ন ৫টা হইতে ৬টা

- ১। মহিলা-সম্মেলন।
- ২। বিশ্ব-নির্বাচন-সমিতির অধিবেশন।
- ৩। রাত্রি ৯টা হইতে
- ১। সঙ্গীত ও আবৃত্তি।

১২ই পৌষ—ইং ২৭এ ডিসেম্বর—মঙ্গলবার

পূর্বাহ্ন ৮ হইতে ৯-৩০ মঃ

- ১। 'রক্ত-বাসলা' শাখার অধিবেশন।
- মধ্যাহ্ন—১২ হইতে ২-৩০ মঃ
- ১। সঙ্গীত।
- ২। সাহিত্য-শাখার অধিবেশন।
- ২-৩০ মঃ হইতে ৪টা
- ১। সঙ্গীত।
- ২। সাধারণ সভা।
- ৩। বিশ্ব-নির্বাচন-সমিতির প্রস্তাবাদি আলোচনা।

অপরাত্র—৪-৩০ মিঃ হইতে ৫-৩০ মিঃ।
সান্দ্য-সংলন।

সায়াত্র—৬-৩০ মিঃ হইতে ৮-৩০ মিঃ
বিজ্ঞান-শাখার অধিবেশন।

রাত্রি ১০টা হইতে
সভাসভা।

১৩ই পৌষ—ইং ২৮-এ ডিসেম্বর—বৃহসবার

পূর্বাষ্ট্র—৮টা হইতে ৯-৩০ মিঃ
দর্শন-শাখার অধিবেশন।

মধ্যাহ্ন
ইতিহাস-শাখার অধিবেশন—১২টা হইতে ১-০০ মিঃ
অর্থনীতি-শাখার "—১-৩০ মিঃ হইতে ২-৩০ মিঃ
শিল্প-শাখার "—২-৩০ মিঃ হইতে ৩টা

সায়াত্র—৬টা হইতে ৬টা

সভাসভা।
বিদায়-অভিভাষণ।

উদ্বোধন—
বিশেষ প্রয়োজনানুযায়ী কাছাকাছ পরিবর্তিত হইতে
পারে।

শাখা-সভাপতিগণ

সাহিত্য-শাখা—গণিত বৃহস্পতির শাস্ত্রী।

(শান্তিনিকেতন)
বৃহস্পতি-বঙ্গ-শাখা—ডাঃ কালিদাস নাগ। (কলিকাতা)
ইতিহাস-শাখা—প্রায়বাহ্যের রমা-প্রসাদ চন্দ্র।

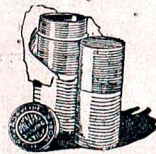
(কলিকাতা)
অর্থনীতি-শাখা—ডাঃ যোগেশচন্দ্র সিংহ। (কলিকাতা)
দর্শন—শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবির (Andhra University)।

শিল্প—শ্রীযুক্ত হিরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। (লাহোর)
বিজ্ঞান—শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ চৌধুরী। (লাহোর)
সভাসভা—শ্রীমতী সরলা দেবী-চৌধুরাণী বি. এ।

এলাহাবাদের নিকট কৌশাম্বী, কড়া, প্রতিষ্ঠানমূল্য,
কীটা প্রভৃতি বৌদ্ধগণে স্থাপিতচিত্র ও ইতিহাস-প্রসঙ্গ দর্শনীয়
স্থান আছে। সমাগত প্রতিনিধিগণ বহিঃ একল স্থান
পরিদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে অধিবেশনের শেষে
কাধ্যাধ্যক্ষ মহাশয় তারার ব্যবস্থা করিতে পারেন।



JADAVPUR SOAP WORKS
অন্ধ বর্ণে দৌন্দ্য-সম্পত্তি কারতে "অন্ধ-
রাগ" সাবানের তুলনা নাই। অন্ধরাগ
সাধারণ সাবানের হায় অন্ধের কোমলতা
নষ্ট করে না—হৃদাই হবার বিশেষত্ব।



ফেনকা শেভিং টিক

ফেনকার ঘূর্ণিত ফেনপুঞ্জ ঘোঁ-কার্কে
সত্তাই আনন্দ দান করে। বিনি ব্যবহার
করিয়াছেন তাহাকেই জিজ্ঞাসা করুন।
আপনার স্টেনামের কাছে বনি না
পান, আমাদের চিঠি লিখিতে বসুন।

যাদবপুর সোপ ওয়ার্কস্

১৯২৫ ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

বিবিধ

গ্রন্থকার মণ্ডলী

নিম্ন-স্বাক্ষরকারী লক্ষ্যপ্রতি লেখকগণের নিকট, হইতে নিম্ন-
লিখিত বিজ্ঞপ্তিটুকু প্রকাশের জন্য আমরা পাইয়াছি—সাবরে
ইহা মুদ্রিত হইল এবং তাঁদের এ-আয়োজনে আমাদের পূর্ণ
সমর্থন আছে।

সম্প্রতি আমরা একটি গ্রন্থকার-মণ্ডলী স্থাপিত করিছি;
তাঁর উদ্দেশ্য স্বতন্ত্রভাবে ও যথাসম্ভব কম দাম কুরে'
আমাদের নিজেদের বই প্রকাশ করা। অনেকের কাছে
অভিযোগ অনেকি যে আমাদের বইয়ের খুব বেশী দাম বলে'
তাঁরা কিনতে পারেন না। সব সময় সাধারণ লাইব্রেরি
থেকে নিয়ে বা অন্য কারো কাছ থেকে দার করে' বই পড়া
সম্ভব হয় না—এবং আমাদের দেশের এই বই দার দেখা
ও নেয়ার অভাঙ্গ যত শিগ গিরদুই হয়, ততই মঙ্গল। তা
ছাড়া, অনেক বই কিনতে চান, রাখতে চান; এবং যেহেতু
অধিক সঙ্কটান্বিত রসজ্ঞতার কোনো দান নয়, সকল শ্রেণীর
মধ্যে, বিশেষ করে', পরিচিত আয়ের পাঠকের মধ্যে যাতে
আমাদের লেখার বিস্তৃত প্রচার হয়, সেইজন্য আমাদের এই
উদ্দেশ্য।

প্রথমত, এই গ্রন্থকার-মণ্ডলীর পক্ষ থেকে আমরা
অতিষ্ঠাকুরার সেনগুপ্ত ও বুদ্ধদেব বস্তুর কয়েকটি নতুন কবিতা
কবিতা পুস্তিকা করে প্রকাশ করছি। তাঁদের নাম যথাক্রমে
'অমরা' ও 'একটি কথা'। কবিতাগুলি বস্তুর হৃদয়ে
নির্মাণিত হয়েছে; উভয় কবির কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতা
আমরা দিচ্ছি। প্রতি পুস্তিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা যথোক্ত, কাগজে
বীথাই, দাম চার আনা। ক্রিসমাসের ছুটির আগেই এ-
ছটি প্রকাশিত হবে; এবং জালুয়ারী মাসে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও
অজিতকুমার দত্তের অমূল্য কাব্যপুস্তিকা বেরোবে। প্রতি
পুস্তিকার পাঁচ শো কপি ছাপা হবে—এবং এই

পুস্তিকাগুলির আর পুনর্মুদ্রণ হবে না।
পাঁচ আনার ডাকটিকিট পাঠালে ভারতবর্ষের যে-কোনো
ঠিকানায় একটি পুস্তিকা পাঠানো হবে। একসঙ্গে চার কপি
নিলে এক টাকা মনিঅর্ডার কল্লেই চলবে; ডাকমাণ্ডল
লাগবে না। এত কম দামের বই বলে' ভি-পি করে' না
পাঠানোই ভালো। "অর্ডার রেবার ঠিকানা এম, সি, সরকার
এও সঙ্গ.", ১৫ নং কলকাতা স্টোরার, কলিকাতা। বি. বুদ্ধদেব
বহু, ৪৩১, রমেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। বীর
আমাদের লেখা ভালবাসেন, তাঁরা আশা করি আমাদের এই
উদ্দেশ্যে প্রচুর সাহায্যোত্তি করবেন।

(স্বাক্ষরিত) প্রেমেন্দ্র মিত্র

অজিতকুমার দত্ত

অজিতকুমার সেনগুপ্ত

বুদ্ধদেব বহু

ভারতে বৈজ্ঞাতিক বাতি-নির্মাণ

বর্তমানে ইলেক্ট্রিক আলোর ব্যবহার কেবলমাত্র
বিলাসিতার স্বল্প বলিয়াই পরিচালিত হয় না অধিকন্তু অতীত
আরম্ভকালী জিনিষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এই ইলেক্ট্রিক বাতি
আমাদের দেশে প্রস্তুত হয় না। প্রত্যেকটি বাতিই
আমাদিগকে বিদেশ হইতে প্রধানতঃ ইংলণ্ড, হঙ্গারী,
জার্মানী ও জাপান হইতেই আমদানী করিতে হয়। অতীত
গতকের বিষয় যে এই নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য আমরা
সম্পূর্ণরূপে বিদেশের মুখাপেক্ষী।

আমদানী-পুস্তকে আমরা দেখিতে পাই ভারতবর্ষে
ইলেক্ট্রিক বাতি প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ৫৮ লক্ষ টাকার
আমদানী হয়। ১৯২৪-২৯ সালে ৪৯ লক্ষ, ১৯২৯-৩০ সালে
৬৫ লক্ষ এবং ১৯৩০-৩১ সালে ৬১ লক্ষ টাকার আমদানী
হইয়াছিল। গড়ে ইংলণ্ড ১৮ লক্ষ, জার্মানী ১৬ লক্ষ,

কাপান ৭ লক্ষ টাকা'র মাল আমদানী করে। ইহাতে আমরা দেখিতে পাই যে একমাত্র ইলেকট্রিক বাতির জন্যই আমাদের দেশ হইতে গড়ে ৬০ লক্ষ টাকা চলিয়া যায় এবং আমাদের দরিদ্র দেশ ঐ পরিমাণে প্রতি বৎসর অধিকতর দরিদ্র হয়। এই অবস্থা হইতে উদ্ধারের উপায় ইলেকট্রিক বাতি সঞ্জন করিয়া নহে; বাহাতে এই জিনিষ আমাদের দেশে তৈয়ার হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া।

আমাদের দেশে ইলেকট্রিক বাতির ব্যবহার ক্রমশঃ বেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে ইলেকট্রিক বাতি তৈয়ারীর ভবিষ্যৎ অতির উজ্জ্বল। প্রত্যেক গৃহস্থই নতুন নতুন ইলেকট্রিক সরবরাহ করিবার কারখানা, সহরে ও বন্দরে স্থাপিত হইতেছে এবং পুরাতন কারখানাগুলিও বিস্তৃতিলাভ

করিতেছে। এমতাবস্থায় এ-দেশে প্রস্তুত ইলেকট্রিক বাতির বিক্রয় সখ্যে কোন প্রকার সম্বন্ধের স্থান নাই।

আমরা শুনিয়া স্বামী হইলাম যে এই উদ্দেশ্যে ইলেকট্রিক বাতি-নির্মাণ-কৌশলে বিশেষ অভিজ্ঞ শ্রীযুত এন্স, এন্স, মজুমদার, এ, এম, ই, ই, আস্‌স, আই, ই, ই, (গওন্) মহাশয় কলিকাতার কতিপয় বিখ্যাত ব্যবসায়ী-সহযোগে "দি ইন্ডিয়া ইলেকট্রিক কোম্পানি লিমিটেড" নামে একটি কোম্পানী, "এন্স" ডালহৌসী স্টোর (ইষ্ট), টিমেন্‌ হাউস্‌ কলিকাতার স্থাপন করিয়াছেন এবং কোম্পানি প্রস্তুত করিবার জন্য ইউরোপে যাইয়া মেশিনারীর অর্ডার দিয়াছেন। আমরা সন্মতঃ করণে এই মহৎ উদ্দেশ্যের সাফল্য কামনা করি।

আপনাদের পছন্দ ও ডিজাইন অনুযায়ী
সকল রকমের স্বদেশী রেশমে প্রস্তুত
শুভানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ও প্রিয়জনের
উপহার উপযোগী

বেনারসী সাড়ী ও জ্যাকেট

একমাত্র আমরাই প্রস্তুত করিয়া থাকি

এবং আধুনিক রংয়ের ও মানা ফ্যাসানের

তসর, গরদ, মটিকা, খন্দর ও সিঙ্কের চাদর

প্রভৃতি আমাদের কারখানায় প্রস্তুত হয়।

ভূদেব উইভিং ক্যান্ট্রী

সো-রুম-—
পোপুলার
বেয়ার্স দিটি।



বিবস্থান